সাহিত্য-সংহিতা।

(সাহিত্য-সভার মাসিক পত্রিকা।)

দ্বাদশ খণ্ড।

শ্রীগোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

১৩১৮ সাল।

কলিকাতা।

১০৬।১নং গ্রেষ্ট্রীট, সাহিত্য-সভা হইতে প্রকাশিত।

সূচীপত্র

সাহিত্য-সংহিতা।

দ্বাদশ খণ্ড] ১৩১৮ সাল, বৈশাখ। [১ম সংখ্যা।

বর্ষ-আবাহন।

এস মনোরম!
কোয়েলা দোয়েলা গায়
মধুর মলয়া-বায়
রসাল-মুকুলে মধু মাধবে মিলন!
জীর্ণ বাস পরিহরি
নব কিশলয় পরি
সেজেছে প্রকৃতি রানীরী উৎসবে নূতন!
বেলা-যূথী-শ্বাস-বাসে
শুচি-শুভ্র-স্মিত হাসে
তোমারে হে নববর্ষ! করে সম্ভাষণ!
হৃদয়-মন্দির-মাঝে
পূত শঙ্খ ঘণ্টা বাজে
এস হে নবীন! কর আসন গ্রহণ!
সমুজ্জ্বল বেশে আসি
মনের মালিন্য নাশি
নব আশা নব শক্তি কর সঞ্চারণ!
ঘুচে যাক হিংসা দ্বেষ
না রহে খলতা-লেশ
মানব-মানস হোক্ প্রেম-প্রস্রবণ!
পুরাতন ব্যথা যত
হোক্ হোক্ চিরগত
পুরাতন বর্ষ সহ চির নিমগন!
নূতন উদ্যম রাশি
দীপ্ত তেজ পরকাশি
হে নূতন! লভে যেন তোমার সজন!
আন কর্ম্মে সফলতা
দাও ধর্ম্মে একাগ্রতা
কর প্রাণে পর-দুঃখ-মোচন-প্রবণ!
তোমারো সময় যবে
কলাকল দেখি, সবে
লোকে যেন বলে ধন্য বর্ষ পুণ্যতম!

অনাথকৃষ্ণ দেব।

আর্য্য-ধর্ম্ম

যাঁহারা সংকুলসম্ভূত, তাঁহারাই আর্য্য নামে নামী, এবং তাঁহাদের অনুষ্ঠেয় যে ধর্ম্ম, ঐ ধর্ম্মই আর্য্যধর্ম্ম। সেই ধর্ম্ম বেদবিহিত ক্রিয়াকলাপাদিরূপ অসাধারণ ধর্ম্ম। এই ধর্ম্মে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চতুর্ব্বর্ণেরই অধিকার আছে। ম্লেচ্ছ বা অন্য জাতীয়ের অধিকার নাই। ইহাদিগের কেবল অহিংসা, সত্য, দয়া, অস্তেয় ইত্যাদি সাধারণ ধর্ম্মেই অধিকার আছে, অসাধারণ ধর্ম্মে অধিকার নাই। ধর্ম্মের শাস্ত্রোক্ত লক্ষণ এই—"চোদনালক্ষণোঽর্থো ধর্ম্মঃ" প্রেরণা অর্থাৎ প্রবর্ত্তকবিধিরূপ বেদই প্রমাণ যে অর্থের সেই অর্থই ধর্ম্ম অর্থাৎ বৈদিকপ্রমাণগম্য পুণ্যনামক অদৃষ্ট বিশ্বাসই ধর্ম্ম। ইহাতে তার্কিকদিগেরও সম্মতি আছে। তাঁহাদিগের বাক্য এই—"বিহিতক্রিয়য়াসাধ্যো ধর্ম্মঃ পুংসো গুণোমতঃ। প্রতিসিদ্ধক্রিয়াসাধ্যঃ সগুণোঽধর্ম্ম উচ্যতে।" বেদবিহিত ক্রিয়ানিষ্পাদ্য পুরুষের শুভাদৃষ্টরূপ যে গুণ উহাই ধর্ম্ম, বেদনিষিদ্ধ ক্রিয়াসাধ্য পুরুষের দুরদৃষ্টরূপ যে গুণ, উহাই অধর্ম্ম। এই ধর্ম্মকে হেমাদ্রি নিজকৃত ব্রতখণ্ডে পাঁচ প্রকারে বিভক্ত করিয়াছেন। বর্ণধর্ম্ম, আশ্রমধর্ম্ম, বর্ণাশ্রমধর্ম্ম, গৌণধর্ম্ম, নৈমিত্তিক ধর্ম্ম। বর্ণমাত্রকে আশ্রয় করিয়া যে ধর্ম্ম প্রবৃত্ত হয়, উহা বর্ণধর্ম্ম, যেমন দ্বিজাতির উপনয়নাদি; ইহা দ্বিজাতিবর্ণ মাত্রকে আশ্রয় করিয়া প্রবৃত্ত হয়; এই জন্য ইহা বর্ণধর্ম্ম। আশ্রম মাত্রকে আশ্রয় করিয়া যে ধর্ম্ম প্রবৃত্ত হয়, উহা আশ্রমধর্ম্ম। যেরূপ ভিক্ষাবলম্বন ও দণ্ডাদিধারণ; উহা ভিক্ষাশ্রম ও দণ্ডাশ্রমকে অবলম্বন করিয়া প্রবৃত্ত হয়, এই জন্য উহা আশ্রমধর্ম্ম। বর্ণ এবং আশ্রম এই উভয়কে আশ্রয় করিয়া যে ধর্ম্ম প্রবৃত্ত হয়, উহা বর্ণাশ্রমধর্ম্ম, যেরূপ মুঞ্জ মেখলাদি ধারণ, উহা দ্বিজাতিবর্ণ ও ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম এই উভয়কে আশ্রয় করিয়া প্রবৃত্ত হয়, সুতরাং উহা বর্ণাশ্রমধর্ম্ম। গুণ মাত্রকে আশ্রয় করিয়া যে ধর্ম্ম প্রবৃত্ত হয় উহা গুণধর্ম্ম, যেরূপ মূর্দ্ধাভিষিক্তদিগের প্রজাপরিপালন। নিমিত্ত মাত্রকে আশ্রয় করিয়া যে ধর্ম্ম প্রবৃত্ত হয়, উহা নৈমিত্তিক ধর্ম্ম। যেরূপ পাপরূপ নিমিত্ত উপস্থিত হইলে প্রায়শ্চিত্তাদির অনুষ্ঠান। এই বিষয়ে প্রমাণ হেমাদ্রিধৃত ভবিষ্য পুরাণবচন যথা—

"বর্ণধর্ম্মঃ স্মৃতস্ত্বেবং আশ্রমাণামতঃপরং।
বর্ণাশ্রমস্তৃতীয়স্তু গৌণোনৈমিত্তিকস্তথা॥
বর্ণধর্ম্মঃ স উক্তস্তু যথোপনয়নং নৃপ।
আশ্রমঞ্চ সমাশ্রিত্য যো ধর্ম্মঃ সম্প্রবর্ত্ততে।
স খল্বাশ্রমধর্ম্মস্তু ভিক্ষাদণ্ডাদিকো যথা।
বর্ণত্বমাশ্রমত্বঞ্চ যোঽধিকৃত্য প্রবর্ত্ততে॥ স
বর্ণাশ্রমধর্ম্মস্তু মৌঞ্জী মেখলা যথা। যো
গুণেন প্রবর্ত্তেত গুণধর্ম্মঃ স উচ্যতে॥ যথা
মূর্দ্ধাভিষিক্তস্য প্রজানাং পরিপালনম্।
নিমিত্তমেকমাশ্রিত্য যো ধর্ম্মঃ সম্প্রবর্ত্ততে।
নৈমিত্তিকঃ স বিজ্ঞেয়ঃ প্রায়শ্চিত্তবিধির্যথা॥"

চতুর্ব্বর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণের অসাধারণ ধর্ম্ম যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, দান ও প্রতিগ্রহ এই ষট্ কর্ম্ম। এই জন্যই উক্ত ষট্কর্ম্মশালিত্বই ব্রাহ্মণের লক্ষণস্বরূপে শাস্ত্রে কীর্ত্তিত হইয়াছে। ক্ষত্রিয়ের অসাধারণ ধর্ম্ম যজন, অধ্যয়ন, দান, প্রজাপালন। বৈশ্যের অসাধারণ ধর্ম্ম যজন, অধ্যয়ন, দান, কৃষিগোরক্ষণাদি। শূদ্রের অসাধারণ ধর্ম্ম—দ্বিজাতিশুশ্রূষা। চতুর্ব্বর্ণের সাধারণ ধর্ম্ম যথা—শ্রাদ্ধকর্ম্ম, ব্রতোপবাস-নিয়মরূপ তপস্যা, সত্য, অক্রোধ, স্বীয় বিবাহিতা স্ত্রীতেই সন্তোষ, শুচিত্ব, বিদ্যা, অসূয়ারাহিত্য, আত্মজ্ঞান

সহিষ্ণুতা। এই বিষয়ে মহাভারত-বচনই প্রমাণ। বচন এই—"শ্রাদ্ধকর্ম্মতপশ্চৈব সত্যমক্রোধ এবচ। স্বেষু দারেষু সন্তোষঃ শৌচং বিদ্যানসূচিতা। আত্মজ্ঞানং তিতিক্ষাচ ধর্ম্মঃ সাধারণো নৃপ॥" শূদ্রের উপনয়ন সংস্কার না থাকায় বেদবিদ্যাতে ও বেদবিচারজনিত আত্মজ্ঞানে অধিকার না থাকিলেও "শ্রাবয়েচ্চতুরোবর্ণান" ইত্যাদি উপদেশ থাকায় শূদ্রের পুরুষাদি প্রতিপাদ্য বিদ্যাতে এবং পুরাণবচননিচয়জনিত আত্মজ্ঞানে সম্পূর্ণ অধিকার আছে। যে বেদবিহিত ক্রিয়ারূপ ধর্ম্ম আর্য্যসন্তানের অবশ্য অনুষ্ঠেয়, সেই বেদ কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড ভেদে দ্বিধা বিভক্ত। যে পর্য্যন্ত চিত্তশুদ্ধি না হয়, সেই পর্য্যন্ত জীবের কর্ম্মকাণ্ডে অধিকার। কর্ম্মকাণ্ডোক্ত কর্ম্মদ্বারা চিত্তশুদ্ধি করিয়া জীব জ্ঞানকাণ্ডে অধিকার লাভে সমর্থ হয়। অনন্তর জ্ঞানমার্গে সমারূঢ় হইয়া জ্ঞানমার্গোক্ত উপায়াবলম্বন দ্বারা জীব, ভগবানের স্বরূপ কিরূপ, নিজের তাত্ত্বিক অবস্থাই বা কিরূপ এই বিষয়ে সম্যক জ্ঞান লাভ করিয়া জীবন্মুক্ত হয়। কিছুকাল প্রারব্ধ কর্ম্মভোগার্থ দেহ ধারণ করিয়া প্রারব্ধ কর্ম্মভোগাবসানে জীব নির্ব্বাণলাভে সমর্থ হয় যে নির্ব্বাণের পর জীবকে পুনর্ব্বার সংসারানলসন্তাপে সন্তপ্ত হইতে হয় না। গীতাতে কর্ম্মকাণ্ডের প্রসংসাবাদও আছে এবং নিন্দাবাদও আছে, সুতরাং উহার অধিকারিভেদেই ব্যবস্থা করিতে হইবে, অর্থাৎ যাঁহাদের চিত্ত শুদ্ধি নাই তাঁহারা কর্ম্মকাণ্ডেই অধিকারী, তাঁহাদের নিকটই কর্ম্মকাণ্ড প্রশংসনীয়। তাঁহারা যদি বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিয়া, "একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম" এই রূপ শুষ্ক চীৎকার করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের ঐ শুষ্ক চীৎকারে কোনরূপ ফললাভ হয় না, অধিকন্তু তাঁহাদিগকে বিহিত কর্ম্মের অননুষ্ঠানজনিত প্রত্যবায়ী হইতে হয়, পরন্তু যাঁহারা জ্ঞানী, তাঁহাদের নিকটই কর্ম্মকাণ্ড নিন্দনীয়, তাঁহারা শাস্ত্রীয় নিয়ম পালনে বাধ্য নহেন। শিষ্টগণ ইহাই বলিয়াছেন—"বিদিতেচ পরে তত্ত্বে সমস্তৈর্নিয়মৈরলং। তালবৃন্তেন কিং কার্য্যং লব্ধেমলয়মারুতে॥" ভগবত্তত্ত্ব যে জীবের সম্যক্‌রূপে পরিজ্ঞাত সেই জীবকে শাস্ত্রোক্ত নিয়মের অধীন হইতে হয় না। সন্তাপ শান্তির জন্ত সেই পর্য্যন্তই ব্যজন বায়ুর প্রয়োজন হয়, যে পর্য্যন্ত সম্যক্‌রূপে মলয় বায়ু প্রাপ্ত না হয়।

যিনি যে কার্য্যে অধিকারী, তিনি যদি সেই কার্য্যের অনুষ্ঠান না করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে প্রত্যবায়ী হইতে হয়। দ্বিজাতির বৈদিক সন্ধ্যানুষ্ঠানে অধিকার আছে; দ্বিজাতি যদি বৈদিক সন্ধ্যানুষ্ঠান না করেন, তাহা হইলেই তাঁহাকে প্রত্যবায়ী হইতে হয়। শূদ্রের বৈদিক সন্ধ্যানুষ্ঠানে অধিকার নাই, সুতরাং তাঁহারা বৈদিক সন্ধ্যার অনুষ্ঠান না করিলে প্রত্যবায়ী হইবেন না বরং অনুষ্ঠান করিলে প্রত্যবায়ী হইতে হইবে। যাঁহারা আর্য্যসন্তান তাঁহাদিগের শাস্ত্রোক্ত নিয়মপালনের অধিকার আছে, অনার্য্যদিগের অধিকার নাই, সুতরাং আর্য্যসন্তানগণ যদি শাস্ত্রোক্ত নিয়মের বাহিরে পদক্ষেপ করেন বা শাস্ত্রনিষিদ্ধ অনার্য্যাচরণে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে প্রত্যবায়ী হইতে হইবে, অনার্য্যদিগের প্রত্যবায়ের সম্ভাবনা নাই। আর্য্যসন্তানদিগের অনার্য্যসেবিত পথের অনুবর্ত্তনে যে প্রত্যবায় হয়, সেই প্রত্যবায়-ফলে উত্তরকালে পরলোকে তাঁহাদিগকে নরকভোগ করিতে হয়। সেই নরকভোগ আমরা দেখিতে পাই না সত্য, পরন্তু আমরা ইহলোকে অনেক স্থলে দেখিতে পাই যে, যাঁহারা

অনার্য্যসেবিত পথের অনুবর্ত্তী, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে অল্পায়ু ও উৎকট রোগাক্রান্ত হইয়া থাকেন, আর যাঁহারা অনার্য্যসেবিত পথের অনুবর্ত্তন করেন না, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে দীর্ঘায়ু হইয়া থাকেন এবং তাঁহাদিগকে উৎকট রোগাক্রান্ত হইতেও দেখা যায় না। এই বিষয়ে অপর দৃষ্টান্ত দেখাইবার প্রয়োজন নাই, আমি স্বয়ংই এই বিষয়ে প্রধান দৃষ্টান্ত। আমার ৬৪ চতুঃষষ্ঠি বৎসরের অধিক বয়স হইয়াছে, এই দীর্ঘ বয়সের মধ্যে সময়ে সময়ে জ্বর ও উদরাময় পীড়াতে আক্রান্ত হইয়াছি, কিন্তু আমার ফুসফুসের মধ্যে কখনও জলও জমে নাই এবং উদরের অভ্যন্তরে স্ফোটক আক্রমণ করায় আমাকে কখনও অস্ত্রচিকিৎসকের শরণাগত হইতে হয় নাই। আমার একজন পরিচিত বয়স্য অনার্য্যসেবিত মদ্যাদি পানে নিরত ছিলেন, তিনি যৌবনাবস্থায় বিলক্ষণ হৃষ্টপুষ্টও ছিলেন, কিন্তু পরিণামে উৎকট পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া দীর্ঘকাল অত্যন্ত ক্লেশ পাইয়াছিলেন। তিনি তৎকালে আমার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন এই যে, যদি এই যাত্রা জীবন রক্ষা হয়, তাহা হইলে হবিষ্যান্ন ভক্ষণ করিব, আর অনার্য্যসেবিত খাদ্যের অনুবর্ত্তন করিব না। দুঃখের বিষয় এই যে, তিনি সেই পীড়াতেই ইহধাম পরিত্যাগ করিলেন, তাঁহাকে আর হবিষ্যান্ন ভক্ষণ করিতে হইল না।

অনেকের কুসংস্কার আছে; তাঁহারা কুসংস্কার নিবন্ধন বলিয়া থাকেন যে, ম্লেচ্ছগণ, ত্র্যহস্পর্শে ও বৃহস্পতির শেষে, এবং মঘা নক্ষত্রে যাত্রা করিয়া থাকে, পরন্তু তাহাদের কোনরূপ অফল ফলিতে দেখা যায় না, তবে আমাদেরই কি কারণে কুফল ফলিবে? আমার মতে তাঁহারা অত্যন্ত ভ্রান্ত, কারণ, ম্লেচ্ছগণ শাস্ত্রোক্ত নিয়মের বাহিরেই অবস্থান করে, তাহারা শাস্ত্রোক্ত নিয়ম পালনে অনধিকারী; শাস্ত্রোক্ত নিয়ম পালন না করিলে তাহাদের প্রত্যবায়েরও সম্ভাবনা নাই ও অনিষ্ট ফলেরও সম্ভাবনা নাই, কিন্তু যাঁহাদিগের উক্ত নিয়ম পালনের অধিকার আছে, তাঁহারা নিয়মের বাহিরে এক পদ অগ্রসর হইলেই তাঁহাদিগকে অনিষ্ট ফল ভোগ করিতে হইবে। তবে যে স্থলবিশেষে ব্যভিচার দেখা যায়, সে কেবল বলবন্ত শুভাদৃষ্টের গুণে, অর্থাৎ তিনি বলবন্ত শুভাদৃষ্টসম্পন্ন; তাঁহার নিকট দুর্ব্বল দুরদৃষ্ট ফলোন্মুখে সমর্থ হয় না; কালে শুভাদৃষ্টের ক্ষয় হইলে পূর্ব্বসঞ্চিত দুরদৃষ্ট অত্যন্ত বলসম্পন্ন হইয়া অনিষ্ট ফল দানে সমর্থ হয়।

যে বেদবিহিত ক্রিয়ারূপ ধর্ম্মে আর্য্য-সন্তানগণের অধিকার আছে, সেই বেদান্তঃপাতি কর্ম্মকাণ্ডোক্ত কর্ম্মনিচয়ের অনুষ্ঠায়ী যাঁহারা, তাঁহারা কর্ম্মযোগী, এবং জ্ঞানকাণ্ডোক্ত সাধনানুষ্ঠায়ী যাঁহারা, তাঁহারাই জ্ঞানযোগী। কর্ম্মযোগেরও সীমা আছে, যাবজ্জীবন কর্ম্মপথের অনুসরণ করিতে হয় না। জ্ঞানপথে পদার্পণের উপযোগী চিত্তশুদ্ধি যে পর্য্যন্ত না হয়, সেই পর্য্যন্তই কর্ম্মযোগের অনুসরণ করিতে হয়। এই সম্বন্ধে গীতাবচনই প্রমাণ। গীতাবচন এই—"আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম্মকারণ-মুচ্যতে।"। জ্ঞানযোগে আরোহণেচ্ছু পুরুষের কর্ম্মই চিত্তশুদ্ধিকরত্ব নিবন্ধন একমাত্র কারণ। জ্ঞানীর লক্ষণাক্রান্ত না হইয়া নিজে আমি জ্ঞানী ইহা মনে করিলে জ্ঞানী হইতে পারে না। জ্ঞানীর লক্ষণ এই—"যদাহিনেন্দ্রিয়ার্থেষু ন কর্ম্মস্বনুষজ্জতে। সর্ব্বসংকল্পসন্ন্যাসী যোগারূঢ়স্তদোচ্যতে॥" যিনি ইন্দ্রিয়ের ভোগ্য শব্দাদিতে এবং তৎসাধনভূত কর্ম্ম সকলে আসক্ত না হন,

তিনিই জ্ঞানীপদের বাচ্য হন। যাঁহারা আমি জ্ঞানী এই বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়া থাকেন, তাঁহাদের কেবল অভিমান মাত্র। এই সংসারে অধিকাংশ জীবই ভগবত্তত্ত্ব বিষয়ক অজ্ঞান-বিজৃম্ভিত-শোক-মোহজালে সমাচ্ছন্ন হইয়া কতিপয় জীব নিজ ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরধর্ম্মানুষ্ঠানে তৎপর হইতেছেন, আবার কতিপয় জীব সকল ধর্ম্মেতেই বিদ্বেষ-বুদ্ধির পরিচয় দিতেছেন ইহা দেখিয়া সকল লোকহিতার্থ অবতীর্ণ পরমকারুণিক শ্রীকৃষ্ণ সেই শোকমোহ-সাগর হইতে জীবসকলের উদ্ধরণেচ্ছু হইয়া গীতাশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। দুঃখের বিষয় এই যে, ঐ গীতামৃত শাস্ত্রের বিদ্য-মানতাবস্থাতেও অনেক জীবের বুদ্ধিভ্রংশ হইতেছে, উহাই বর্ত্তমানকালের বিচিত্র মহিমা।

উক্ত কর্ম্মকাণ্ড দ্বিবিধ, বৈধ ও নিষিদ্ধ। বৈধ কর্ম্মানুষ্ঠানে পুণ্য সঞ্চিত হয়, নিষিদ্ধ কর্ম্মানুষ্ঠানে পাপ সঞ্চিত হয়। স্বর্গাদি ইষ্ট ফলের হেতু বলিয়া শাস্ত্রে যাহা নির্দ্দিষ্ট আছে, উহাই বৈধ কর্ম্ম। নরকাদি অনিষ্ট ফলের হেতু বলিয়া শাস্ত্রে যাহা করিতে নিষেধ আছে, তাহার নাম নিষিদ্ধ কর্ম্ম, যথা সুরাপান, পারদারিকতা, প্রাণিহিংসা প্রভৃতি। নিত্য নৈমিত্তিক ও কাম্য কর্ম্মভেদে বৈধ কর্ম্ম তিন প্রকার—যে কার্য্যের অকরণে প্রত্যবায় জন্মে, তাহার নাম নিত্য কর্ম্ম, যথা—ত্রিকাল-সন্ধ্যা, তর্পণ, শিবপূজা, বিষ্ণুপূজা, পিত্রাদির শ্রাদ্ধ প্রভৃতি। কোনও একটী নিমিত্ত উপলক্ষে অনুষ্ঠিত কর্ম্ম নৈমিত্তিক কর্ম্ম, যেরূপ পুত্রেষ্টি যাগ প্রভৃতি। যাহার দ্বারা স্বর্গাদি অভীষ্ট লাভ হয়, তাহাকে কাম্য কর্ম্ম বলে, যেরূপ জ্যোতিষ্টোম যাগ এবং সোমযাগ প্রভৃতি। কতিপয় কর্ম্ম কাম্য ও নিত্য উভয়বিধ অর্থাৎ যাহাদের অনুষ্ঠানে স্বর্গাদি ইষ্ট ফল লাভ হয় এবং অকরণে প্রত্যবায় জন্মে, যেরূপ দুর্গোৎসবাদি। পাপকর্ম্ম ও পুণ্যকর্ম্ম উভয়ই এক প্রকার কর্ম্মবন্ধন। এই কর্ম্ম বন্ধন হইতে জীব মুক্ত হইতে না পারিলে সদগতি লাভের সম্ভাবনা নাই। বৈধ কর্ম্মদ্বারা যে পুণ্য সঞ্চিত হয়, সেই পুণ্য ফলে জীব স্বর্গলোকে দেবতাদিগের সহিত সুখ ভোগ করিয়া, অনন্তর পুণ্যক্ষয় হইলে মর্ত্ত্যলোকে উত্তম গৃহে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া পুনর্ব্বার পুণ্য কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। আর নিষিদ্ধ কর্ম্মদ্বারা যে পাপ সঞ্চিত হয়, জীব সেই পাপ ফলে অনন্ত নরক ভোগ করিয়া পরে ইহলোকে নীচ গৃহে জন্ম পরিগ্রহ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার পাপ-কর্ম্মানুষ্ঠানেই প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। দুঃখের বিষয় এই যে, কাল-মাহাত্ম্যে অনেক আর্য্য সন্তানের ঈশ্বরে ও পরকালে বিশ্বাস নাই। পরন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, আর্য্য শাস্ত্রের সম্যক পর্য্যালোচনা করিলে, ঐ বিষয়ে অবিশ্বাস হইবার কারণ উপস্থিত হইতেই পারে না। এই জন্য আর্য্য শাস্ত্রের সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সাধারণের অবগতির জন্য উল্লিখিত হইল। মর্ম্ম এই—লোকে আকারবিশিষ্ট বস্তু হইলেই দেখা যাইতেছে যে, তাহার একজন কর্ত্তা আছে। এই জগতে আমরা এইরূপ কোনও বস্তুই দেখিতে পাই নাই, যাহা কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক নির্ম্মিত নহে। যে সকল স্থলে আমরা কর্ত্তার উপলব্ধি করি, সেই সকল স্থলে সচেতন কর্ত্তারই উপলব্ধি করিয়া থাকি, কোন স্থলেই অচেতন কর্ত্তা দেখিতে পাই নাই। তুরী তন্তু প্রভৃতি অনেকই বস্ত্রের কারণ আছে সত্য, কিন্তু বস্ত্রের কর্ত্তৃত্ব তন্তুবায়রূপ সচেতন পুরুষ ভিন্ন অন্যে সম্ভাবিত নহে, ইহাতেই বিবেচনা হয় যে, যখন জগতের আকার আছে, তখন

জগৎ নশ্বর, নশ্বর হইলেই কার্য্য, কার্য্য হইলেই কর্ত্তার অধীন। পরন্তু এই জগৎ নির্ম্মাণ বিষয়ে অস্মদাদির কর্ত্তৃত্ব অসম্ভব, যেহেতু এই জগতের অন্তঃপাতি অগম্য নিবিড় অরণ্যস্থ বৃক্ষ প্রভৃতি নির্ম্মাণে অস্মদাদির কর্ত্তৃত্ব নাই, সুতরাং অস্মদাদি ভিন্ন একজন অসাধারণ-শক্তিসম্পন্ন জগন্নির্ম্মাণ-নিপুণ সচেতন পরাৎপর পরমেশ্বর আছেন তাহার সন্দেহ কি? এবং সেই পরমেশ্বর যে সর্ব্বজ্ঞ ইহাতেও কোন সংশয় নাই, যেহেতু যে ব্যক্তি যে বস্তু না জানে, সেই ব্যক্তি হইতে কখনই সে বিষয় সম্পন্ন হয় না। যখন পরমেশ্বর সকল বিষয় সম্পাদন করিতেছেন, তখন তিনি যে সকল বিষয় জানেন না, ইহা কদাচ সম্ভবপর নহে। এই স্থলে অপর বক্তব্য এই যে, এই জগতে সাতিশয় অর্থাৎ তারতম্যরূপে অবস্থিত বস্তু মাত্রেরই শেষ সীমা আছে, যেরূপ অল্পত্ব ও মহত্ত্ব পরিমাণের শেষ সীমা যথাক্রমে পরমাণু ও আকাশ। এইরূপ কোন ব্যক্তিকে কেবল কাব্য ও অলঙ্কার শাস্ত্রে অভিজ্ঞ, কোন ব্যক্তিকে কেবল স্মৃতি শাস্ত্রে অভিজ্ঞ, আর কোন ব্যক্তিকে কেবল দর্শন শাস্ত্রে অভিজ্ঞ দেখিয়া স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, জ্ঞানাদিও সাতিশয় পদার্থ, অতএব জ্ঞানাদিও কুত্রাপি শেষ সীমাপ্রাপ্ত হইয়া নিরতিশয়তা পদে পদার্পণ করিয়াছে। যে পদার্থ যাদৃশ গুণের সদ্ভাব ও অভাবে যথাক্রমে উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্টরূপে পরিগণিত হয়, সেই পদার্থের সর্ব্বতোভাবে তাদৃশ গুণবত্তা-রূপ অত্যুৎকৃষ্টতাকে নিরতিশয়তা বলে। অণুর পরম অণুতা, স্থূলের পরমস্থূলতা, মূর্খের পরম মূর্খতা, পণ্ডিতের অত্যন্ত পাণ্ডিত্যই অত্যুৎকৃষ্টতাপদের প্রতিপাদ্য, তদ্বিপরীত স্থূলতাদি অণুপ্রভৃতির উৎকৃষ্টতা নহে। এইরূপে জ্ঞানের উৎকৃষ্টতা ও অপকৃষ্টতা বিবেচনা করিতে হইলে, অধিক বিষয়কতা ও অল্পবিষয়কতাকেই যথাক্রমে উৎকৃষ্টতা ও অপকৃষ্টতা পদের লক্ষ্য বলিয়া স্থির করিতে হইবে। এই জন্য কিঞ্চিন্মাত্র শাস্ত্রজ্ঞকে অপকৃষ্ট জ্ঞানী আর অধিক শাস্ত্রজ্ঞকে উৎকৃষ্ট জ্ঞানী বলিয়া লোকে নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। এই প্রকারে অধিক বিষয়কতাই যখন জ্ঞানের উৎকৃষ্টতা বলিয়া সিদ্ধ হইল, তখন এই অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মাণ্ডস্থিত খেচর, বনচর ও অস্মদাদির পরিচ্ছিন্ন দৃষ্টির অগোচর সকল পদার্থবিষয়কতাই যে, জ্ঞানের অত্যুৎকৃষ্টতারূপ নিত্যনিরতিশয়তা তাহা আর বলিবার অপেক্ষা কি? ঐ নিত্য নিরতিশয় জ্ঞানস্বরূপ সর্ব্বজ্ঞতা কদাচ অস্মদাদি জীবের সম্ভবে না, যেহেতু জীবের বুদ্ধিবৃত্তি রজোগুণ ও তমোগুণ দ্বারা কলুষিত থাকায় দৃক্‌শক্তি পরিচ্ছিন্ন। পরিচ্ছিন্ন দৃক্‌শক্তি দ্বারা কখনই সর্ব্বগোচর জ্ঞান সম্ভবে না, সুতরাং অপরিচ্ছিন্নদৃক্‌শক্তি-মানকেই তাদৃশ সর্ব্বজ্ঞতার একমাত্র আধার বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে সন্দেহ নাই। ঐ অপরিচ্ছিন্নদৃক্‌শক্তিমান যিনি, তিনিই অস্মদাদির অভিমত পরমেশ্বর, এতদ্ব্যতিরিক্ত পুরুষকে আমরা পরমেশ্বর বলিয়া অঙ্গীকার করি নাই। এইরূপে যখন পরমেশ্বর-সত্তা সিদ্ধ হইল, তখন পরমেশ্বর নাই বলিয়া শুষ্ক চীৎকার করা কেবল নিজের দুরদৃষ্টের পরিচয় মাত্র সন্দেহ নাই। পরমেশ্বরে যে দৃঢ় বিশ্বাস হওয়া, ইহাও জন্মান্তরীণ পুণ্য-সাপেক্ষ, সকলের ভাগ্যে ঘটে না। এবং যে বেদশাস্ত্রের পর্য্যালোচনা দ্বারা লোক সকল জ্ঞান ও মুক্তি লাভ করিতে সমর্থ হয়, তাহাও সর্ব্বনিয়ন্তা সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বর কর্ত্তৃক প্রণীত হইয়াছে বলিয়া প্রতীত হইতেছে। পাতঞ্জল-দর্শনের যোগপাদের ষড়্‌বিংশ সূত্রে লিখিত আছে যে, "স

পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ কালানবচ্ছেদাৎ।" সেই পরমেশ্বর আদি সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মাদিরও গুরু অর্থাৎ উপদেষ্টা। যেহেতু তিনি অতীতা নাগত, বর্ত্তমান এই কালত্রয়ে সর্ব্বত্র বিদ্য-মান আছেন। এই ব্রহ্মাদি সৃষ্টিকর্ত্তারাও তাঁহা হইতে উৎপন্ন ও শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া সৃষ্টিকার্য্য সাধন করিয়া থাকেন। শাস্ত্রা-ন্তরেও উক্ত আছে যে, ব্রহ্মার হৃদয়ে পরমেশ্বর বেদের প্রকাশ করেন, এবং ব্রহ্মা সেই বেদ শব্দকে অবলম্বন করিয়া সৃষ্টিকার্য্য সাধন করিয়া থাকেন। ফলতঃ বেদ যে পরমেশ্বর-প্রণীত এই বিষয়ে বিশিষ্টযুক্তিও আছে। যুক্তি এই--যখন দেখা যাইতেছে যে, এই পৃথিবীর মধ্যে কোনও এক প্রদেশে একটী ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপন করিতে হইলে, তাহার রক্ষার নিমিত্ত রাজাকে সর্ব্বাগ্রে এইরূপ কতকগুলি নিয়ম প্রচার করিতে হয়, যাহার অনুবর্ত্তী হইয়া তথাকার সকল প্রজাকেই চলিতে হয়। তাহা না করিলে অচিরাৎ সেই রাজ্য বিপ্লবাবস্থায় পতিত হইয়া বিনষ্ট হয়। তখন ইহা কোন ক্রমেই অসম্ভব নহে যে, যে সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বর এই অসীম বিশ্ব-সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছেন, তিনিই ইহাকে সুনিয়মে পালন করনার্থ সর্ব্বসাধারণের প্রতি করুণা প্রকাশ করিয়া বেদ রচনা করিয়াছেন। তাঁহার বেদরচনার তাৎপর্য্য এই যে, সর্ব্বসাধারণ জনগণ স্ব স্ব বুদ্ধি বৃত্তির অনুবর্ত্তী হইয়া বেদোক্ত অত্যুত্তম মার্গ অবলম্বন করিয়া নিজ নিজ অভিলষণীয় পদবীতে অধিরূঢ় হউক এবং অসন্মার্গে পদার্পণ করিয়া ঘোরতর ক্লেশকর নরকপুরীর অভিমুখে আর কেহ যাত্রা না করুক, সকলই ঐ অসন্মার্গ অবলম্বনের দোষ দর্শন করিয়া ঐ মার্গ এককালে পরিত্যাগ পূর্ব্বক সন্মার্গের শরণাপন্ন হউক। এবং বেদ যদি কোনও প্রতারক কর্ত্তৃক রচিত হইত, তাহা হইলে কখনই বেদোক্ত যাবদ্বিষয়ের সত্যতা থাকিত না, কোনও কোনও অংশ অবশ্যই মিথ্যা হইত সন্দেহ নাই। যেহেতু অস্মদা-দির মধ্যে এইরূপ কোনও ব্যক্তিই দৃষ্ট হয় না, যাহার কোন বিষয়ে কোন অংশে ভ্রান্তি নাই। প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণেরও সূক্ষ্ম বিষয়ের কথা দূরে থাকুক অতিস্থূল বিষয়েও ভ্রান্তি জন্মিয়া থাকে। অতএব পরমেশ্বর ভিন্ন সকল পুরুষই ভ্রান্ত। ভ্রান্ত ব্যক্তির কোনও কথা কাকতালীয় ন্যায়ে কোনও অংশে সত্য হইলেও কখনই সর্ব্বাংশে সত্য নহে। এবং ভ্রান্ত ব্যক্তির কথাতেই বা কোন্ ব্যক্তি বিশ্বাস ও সমাদর করে? কিন্তু যখন শিষ্টগণ বেদোক্ত বিষয়ের সর্ব্বাংশে সত্যতা জানিয়া সমধিক শারীরিক ক্লেশ ও অর্থব্যয় স্বীকার করিয়া বিশ্বাস পুরঃসর তদ্বিষয়ের অনুষ্ঠান করিতে-ছেন, তখন বেদ যে নির্দ্দোষ তাহা বলিবার আর অপেক্ষা কি? ঐ বেদোক্ত স্বর্গ নরকাদিরূপ পারলৌকিক স্থান সকলকে অলীক বলিয়াই বা কি প্রকারে বিশ্বাস করিব? তাহা হইলে কোনও মহাত্মাই সমধিক শারীরিক ক্লেশ ও অর্থব্যয় করিয়া বেদবিহিত যাগাদির অনুষ্ঠান করিতেন না এবং পরদারাভিগমন এবং পরধনাপ-হরণাদিরূপ বেদনিষিদ্ধ কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইতেন না; বরং ঐহিক সুখাভিলাষে প্রবৃত্ত হইবারই সম্ভাবনা। ঐ পরমেশ্বরের প্রীতি সম্পাদন করাই আর্য্যদিগের অনুষ্ঠেয় সকল ধর্ম্মের মুখ্য উদ্দেশ্য; পরমেশ্বর প্রীত হইলেই জীব নিস্তার পাইতে পারে, উপায়ান্তর নাই। রাগ-দ্বেষ বিষয়ের বশবর্ত্তী মূঢ়লোক শিশ্নোদরপরায়ণ হইয়া জীবন ধারণ করে। যেরূপ দুষ্ট অশ্ব সারথিকে কুপথে লইয়া যায়, সেইরূপ

ইন্দ্রিয়গণ ভ্রান্তচেতা জীবকে কুপথগামী করে। ইন্দ্রিয়গণ স্ব স্ব বিষয় পরিপ্রাপ্ত হইলেই পরিতৃপ্ত হইয়া থাকে। মূঢ় ব্যক্তির মন যখন ইন্দ্রিয় বিষয় ভোগে ধাবিত হয়, তখন তাহার ঔৎসুক্য ও প্রবৃত্তি জন্মিয়া থাকে; পরে মূঢ় ব্যক্তি বাসনা কর্ত্তৃক বিষয়বাণে বিদ্ধ হইয়া জ্যোতির্লুব্ধ পতঙ্গের ন্যায় লোভাগ্নিতে পতিত হয় এবং পরে যথেচ্ছ আহার বিহারে মুগ্ধ হইয়া বিষয় ভোগ লালসায় এরূপ নিমগ্ন হয় যে, তখন আপনাকেও বুঝিতে পারে না। অজ্ঞ ব্যক্তিরা এই প্রকারে ইহ সংসারে অবিদ্যা, কর্ম্ম এবং তৃষ্ণা দ্বারা চক্রবৎ ভ্রাম্যমান হইয়া নানারূপ ধারণ পূর্ব্বক কখনও জলে কখনও স্থলে, কখনও বা অন্তরীক্ষে পুনঃ পুনঃ জন্ম পরিগ্রহ করত ব্রহ্মা হইতে তৃণ পর্য্যন্ত সর্ব্বভূতে পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে। এই সংসার অশেষবিধ দুঃখ ও সুখের আকর। ইহাতে ভয়ঙ্কর বিষয়ানুরাগ অসম্যক্-দর্শি নরগণকে কখনও বিষধরের ন্যায় দংশন করিতেছে, কখনও তীক্ষ্ণধার অসির ন্যায় ছেদন করিতেছে, কখনও রজ্জুর ন্যায় বন্ধন করিতেছে, কখনও প্রজ্বলিত অগ্নিশিখার ন্যায় দগ্ধ করিতেছে, কখনও ঘোরান্ধকারময়ী কুহু যামিনীর ন্যায় মোহান্ধকারে নিক্ষেপ করিতেছে। এই সংসারে এরূপ দুঃখ কিছুই নাই যাহা সংসারী মাত্রকে ভোগ করিতে না হয়। ফলতঃ এই সংসার নরকের ন্যায় কেবল দুঃখ ভোগের আকর। এই সংসারে আসিয়া যে সকল মহাত্মা বেদোক্ত নিয়মে ভগবদুপাসনা দ্বারা জীবন যাপন করিতে সমর্থ হন তাঁহারাই ধন্য, তাঁহাদেরই জন্ম সফল। আর যাঁহারা এই সংসারে আসিয়া কেবল আহার নিদ্রা ও মৈথুনাদি দ্বারা জীবন অতিবাহিত করেন, তাঁহাদের জন্ম বিফল, তাঁহাদের বৃথা তার দ্বারা কেবল পৃথিবী আক্রান্তা। জন্মান্তরীণ সুকৃতি বলেই জীব আর্য্য-বংশে জন্ম পরিগ্রহ লাভে সমর্থ হয়, আর্য্যকুলে জন্ম লাভ করিতে পারিলে জীব বেদে অধিকারী হইয়া বৈদিক নিয়মে ভগবদুপাসনা দ্বারা উত্তর কালে সদ্গতি লাভে সমর্থ হইতে পারে। দুঃখের বিষয় এই যে, ইদানীন্তন কালে অনেক জীব আর্য্যকুলে জন্মলাভ করিয়াও অনার্য্যসেবিত পথের অনুসরণ দ্বারা আর্য্যত্ব হইতে বিচ্যুতি লাভে সমুৎসুক হইয়া থাকে।

জন্মান্তরীণ দুষ্কৃতিবলেই জীব অনার্য্য-কুলে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া থাকে; অনার্য্য-কুলে জন্ম লাভ করিলে বেদাধিকার হয় না। সুতরাং বৈদিক নিয়মে ভগবদুপাসনা দ্বারা জ্ঞান লাভ সুদূরপরাহত হইয়া থাকে। জ্ঞান লাভ করিতে না পারিলে, সংসার-যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি লাভের কোন সম্ভাবনা নাই। অগ্নিশিখা যেরূপ বর্ষাসিক্ত বন-রাজিকে দগ্ধ করিতে সমর্থ হয় না, সেইরূপ সংসার-যন্ত্রণা জ্ঞানীর কোনরূপ অনিষ্ট সাধন করিতে সমর্থ হয় না। ইহা যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে কথিত হইয়াছে যথা,—

"প্রাজ্ঞং বিজ্ঞাতবিজ্ঞেয়ং সম্যগ্‌দর্শনমাধয়ঃ।
ন দহন্তি বনং বর্ষাসিক্তমগ্নিশিখা ইব।"

প্রথমে বেদ শাস্ত্রের পর্য্যালোচনা দ্বারা পরাৎপর পরমেশ্বরে বিশ্বাস স্থাপন পূর্ব্বক আর্য্য-সন্তান মাত্রেরই পরমেশ্বরের উপাসনা বিষয়ে যত্ন করা কর্ত্তব্য যেহেতু তাঁহার অনুগ্রহ ব্যতীত পরম দুর্লভ তত্ত্বজ্ঞান রূপ যোগ-সাধনে সম্যক্‌রূপে কৃতকার্য্য হওয়া অতীব দুরূহ ব্যাপার। কারণ, জ্ঞান সাধন কেবল বিচারের অনুগত, এবং সেই বিচার কেবল বুদ্ধির অনুগত। অতিশয় সূক্ষ্ম পরমার্থতত্ত্ব স্থূল বুদ্ধি দ্বারা কেহই অবগত হইতে পারে না, কিন্তু কেবল বিশুদ্ধবুদ্ধি মহাত্মারাই

অত্যন্ত স্থির এবং সূক্ষ্ম বুদ্ধি দ্বারা জানিবার যোগ্য হয়েন। বিচারানভিজ্ঞ কঠোরচিত্ত ব্যক্তিরা ব্রহ্ম-বিচারে প্রবৃত্ত হইলে বিচার-কালে বুদ্ধির এরূপ জড়তা জন্মে যে, তাহারা বহুক্ষণ অতি সূক্ষ্ম পরমার্থ বিষয়ের নির্ণয় করিতে অথবা নির্ণিত বিষয় অন্তঃকরণে ধারণ করিয়া রক্ষা করিতে নিতান্ত অসমর্থ হইয়া উঠে। তখন তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ হঠাৎ একপ্রকার উন্মাদগ্রস্ত হয়; কেহ বা দুর্ভাগ্যবশতঃ পরমার্থ বিষয়ে সন্দিগ্ধমনা হইয়া নিজের ইহলোক ও পরলোক নষ্ট করিয়া ফেলে। আর কেহ বা একেবারে নাস্তিক হইয়া পড়ে। ফলতঃ জ্ঞানযোগ সাধনকালে লোকের এইরূপ বহুবিধ বিঘ্ন সংঘটন হইয়া থাকে, কিন্তু পরমগুরু পরমেশ্বরে ঐকান্তিক ভক্তির সঞ্চার হইলে তাঁহার কৃপায় সমুদায় বিঘ্নই দূরীভূত হইয়া যায়, সুতরাং সাধকের অন্তঃকরণে নির্ম্মল জ্ঞান সমুৎপন্ন হয়, এবং সেই জ্ঞানবান সকল জীবন্মুক্তি লাভ করিতে সমর্থ হয়। এইজন্য শাস্ত্রকারেরা যোগ রম্ভকালে ভক্তি পূর্ব্বক ঈশ্বরোপাসনার উপদেশ দিয়া থাকেন। পাতঞ্জল দর্শনের ১ম পাদের ২৩ সূত্রে লিখিত আছে যে—"ঈশ্বর, প্রণিধানাদ্বা।" ঈশ্বরে প্রণিধান অর্থাৎ ঈশ্বরে ভক্তি বিশেষ দ্বারা যে উপাসনা করা যায়, তাহাতে তাঁহার অনুগ্রহে শীঘ্র যোগ ফল লাভ হয়। বিষয়-ভোগাভিলাষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরমগুরু ঈশ্বরে সমস্ত ক্রিয়া সমর্পণের নাম ভক্তি বিশেষ। অতএব ভক্তিপূর্ব্বক ঈশ্বরের ধ্যান করাই যোগ সাধনের প্রকৃষ্ট উপায়। যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন যে, সেই পরমেশ্বর কিরূপ, তাঁহার প্রভাবই বা কি প্রকার তাহা না জানিলে তাহাতে ভক্তির উদয় কিরূপে হইবে? তাহাতে বক্তব্য এই যে, সেই পরমেশ্বর সকলেরই নিয়ন্তা, বিশ্বসংসারের কর্ত্তা, সকলের অন্তর্য্যামী, অপরিচ্ছিন্ন জ্ঞান, ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, শক্তি, তেজ প্রভৃতি গুণসম্পন্ন, সমস্ত বস্তুই তাঁহার শরীরস্বরূপ এবং পুরুষোত্তম বাসুদেবাদি তাঁহার সংজ্ঞা। তিনি পরম কারুণিক ও ভক্তবৎসল হেতু উপাসকদিগের যথোচিত ফল প্রদান করিয়া থাকেন। পূর্ব্বোক্ত পাতঞ্জল দর্শনের ১ম পাদের ২৪ সূত্রে কথিত আছে যে, "ক্লেশ-কর্ম্ম-বিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ।" অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ, অভিনিবেশ এই পাঁচ প্রকার ক্লেশ, অনিত্যে নিত্যত্ব বুদ্ধি, অশুচিতে শুচিত্ব বুদ্ধি, দুঃখে সুখত্ব বুদ্ধি, অনাত্মাতে আত্মত্ব বুদ্ধির নাম অবিদ্যা; আমি, আমার এইরূপ অভিমানের নাম অস্মিতা, বিষয়-বাসনার নাম রাগ, ঈর্ষার নাম দ্বেষ, মরণভীতিজনক অজ্ঞান বিশেষের নাম অভিনিবেশ, ধর্ম্মাধর্ম্ম হেতু যাগ-হিংসাদির নাম কর্ম্ম, জাত্যায়ুর্ভোগের নাম বিপাক, জন্মের নাম জাতি, জীবন-কালের নাম আয়ু, সুখ-দুঃখ-সাক্ষাৎকারের নাম ভোগ, ধর্ম্মাধর্ম্মের নাম আশয়, এই সকলের সম্বন্ধরহিত পুরুষ বিশেষই ঈশ্বর। যদি কেহ বলেন যে, অনেক দার্শনিকের মতে সকলের আত্মাই ক্লেশশূন্য, ক্লেশ অন্তঃকরণের ধর্ম্ম, তবে ঈশ্বরে আর মনুষ্যে বিশেষ কি? ইহাতে বক্তব্য এই যে, সকল জীবের আত্মা ক্লেশশূন্য হইলেও অভিমান-শূন্য নহে; সেই সকল আত্মা যে সময়ে চিত্তের সহিত একত্র মিলিত থাকে, সেই সময়ে চিত্তগত ক্লেশাদিকে আত্মগত বলিয়া অভিমান করিয়া থাকে। যেরূপ যোদ্ধবর্গ যুদ্ধক্ষেত্রে যে জয় পরাজয় লাভ করে, তাহাতে স্বকীয় জয়পরাজয় হইয়া থাকে, সেইরূপ চিত্তগত ক্লেশাদি সংস্পর্শ দ্বারা আত্মারই ক্লেশ-স্পর্শাদি অনুমিত হইয়া

থাকে। সাধারণ লোকের ন্যায় ত্রিকালের কোন কালেই ঈশ্বরের ক্লেশাদি সংস্পর্শ নাই, এই জন্য অন্য পুরুষরূপ আত্মাতে উপদেশ দিতে হয়, কিন্তু ঈশ্বরকে কোনরূপ উপদেশ দিতে হয় না। অন্যের আত্মা চিত্ত ও ইন্দ্রিয়ের কার্য্যে আবদ্ধ হয়; কিন্তু ঈশ্বর সেরূপ নহেন। কারণ তিনি ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির অনাদি। কেবল সেই অনাদিভূত ঈশ্বরেরই সর্ব্বোৎকর্ষ আছে, অন্য কাহারও সেইরূপ সর্ব্বোৎকর্ষ নাই। তাঁহারই ইচ্ছাতে প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগ হয়। ঈশ্বরের ইচ্ছা ব্যতিরেকে প্রকৃতি পুরুষের সংযোগ-বিয়োগের অন্য কারণ নাই। সেই প্রকৃতিই অন্যান্য প্রাণিগণের চিত্তকে সুখদুঃখময় দেহাদিতে পরিণত করে। সাধারণ প্রাণির নানা প্রকার অবস্থা ঘটিয়া থাকে, কিন্তু ঈশ্বরের সেরূপ হয় না, তিনি চিরকালই নির্ব্বিকারভাবে অবস্থান করেন। আর যে বেদাদি শাস্ত্র বিচার দ্বারা লোকের জ্ঞান ও মুক্তি লাভ হয়, সেই শাস্ত্রেরও কর্ত্তা পরমেশ্বর, এবং তিনি স্বয়ং মুক্ত পুরুষ বিধায় তাঁহার মুক্তির প্রয়োজন নাই। অতএব তুলনারহিত অদ্বিতীয় এবং সর্ব্বশক্তিমান পুরুষ বিশেষই ঈশ্বর। পাতঞ্জল দর্শনের ১ম পাদের ২০ সূত্রে উল্লিখিত হইয়াছে যে, "তত্র নিরতিশয়ং সর্ব্বজ্ঞবীজং"। সেই পরমেশ্বরে নিরতিশয় সর্ব্বজ্ঞ বীজ বিদ্যমান আছে। তিনি অতি ক্ষুদ্র পরমাণু ও ব্যাপক আকাশ এবং ভূতভবিষ্যৎ বর্ত্তমান বিষয় সকল জানেন। তিনি কল্প, মহাকল্প, এবং লয় ও মহাপ্রলয় সকল অবগত হইয়া যথাকালে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় ও জীবের উদ্ধারাদি কার্য্য করিতে অধ্যবসায় প্রকাশ করিয়া থাকেন। স্বয়ং ভগবান, মহাত্মা অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন "হে মহাবাহো! আমি তত্ত্বতঃ জন্মরহিত হইয়াও নানা বিভূতি দ্বারা আমার যে আবির্ভাব, তাহা দেবগণ এবং মহর্ষিগণও জানেন না। ইহার কারণ এই যে, দেবতা ও মহর্ষি সকলের সর্ব্বপ্রকারে উৎপাদক হেতু এবং তাঁহাদের বুদ্ধ্যাদির নিয়ামক বিধায় আমি সকলের আদি অর্থাৎ কারণস্বরূপ, অতএব আমার অনুগ্রহ ব্যতিরেকে আমাকে কেহ জানিতে সমর্থ হয় না। যে ব্যক্তি আমাকে সর্ব্বনিয়ন্তা অনাদি জন্মশূন্য ও সমস্ত লোকের মহেশ্বর বলিয়া জানে, মনুষ্য সকলের মধ্যে সেই ব্যক্তি সম্যক প্রকারে মোহবিরহিত হইয়া সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়। বুদ্ধি, ক্ষমা, সত্য, শম, দম, সুখ, দুঃখ, জন্ম, মৃত্যু, ভয়, অভয়, অহিংসা, সমতা, সন্তোষ, তপস্যা, দান, যশ, অযশ, প্রাণিগণের এই সকল ভিন্ন ভিন্ন ভাব আমা হইতেই উৎপন্ন হয়। সুরাসুরগণ এবং মহর্ষিগণ আমারই প্রভাবসম্পন্ন ইহা জানিয়া সুধীগণ ভক্তিসহকারে আমাকে ভজনা করেন। আমাতে যাঁহারা চিত্ত প্রাণ ও জীবন সমর্পণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে অনুগ্রহ প্রদর্শন করিবার জন্য আমি তাঁহাদের বুদ্ধিবৃত্তিতে অবস্থিত হইয়া দীপ্তিশীল জ্ঞান প্রদীপ দ্বারা অজ্ঞান অন্ধকার বিনষ্ট করিয়া থাকি।" গীতা পাঠ করিলে অর্জ্জুনের প্রতি ভগবানের এই সকল সারগর্ভ উপদেশ অবগত হওয়া যায়।

বেদে ও পুরাণাদিতে যে সকল আর্য্য ধর্ম্মানুষ্ঠানের উল্লেখ আছে, তাহার প্রধান উদ্দেশ্য ভক্তিসহকারে ভগবৎ-প্রীতি সাধন করা। ভগবান কাহারও বাধ্য, প্রিয় বা অপ্রিয় নহেন, তিনি ভক্তিসাধ্য পদার্থ। যে ব্যক্তি একান্ত ভক্তিসহকারে তাঁহাকে ভজনা করে, তিনি তাহারই ঈশ্বর। তাঁহার নিজ ভক্তগণই তদীয়

আরাধনায় সমর্থ হইয়া, তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে সমর্থ হন। তিনি ভক্তেরই আরাধ্য এবং ভক্তেরই দৃশ্য, অভক্ত ব্যক্তি কখনও তাঁহাকে দর্শন করিতে সমর্থ হয় না। সুরাসুর-পন্নগগণ কেহই তাঁহাকে দেখিতে পায় না। তিনি যাহাকে অনুগ্রহ করেন, কেবল সেই ব্যক্তিই তাঁহাকে দেখিতে সমর্থ হয়। যজ্ঞফল, দান, তপোনুষ্ঠান ও সংযমাদি দ্বারা কেহ ভগবানকে দেখিতে পান না। তবে যিনি তাঁহার যথার্থ ভক্ত, যাঁহার মন ও প্রাণ তাঁহাতেই সমাসক্ত এবং যিনি তৎপরায়ণ, তিনিই কেবল জ্ঞানবলে স্বকীয় পাপরাশি বিচূর্ণিত করিয়া ভগবানকে দেখিতে সক্ষম হন। ভগবান প্রসন্ন হইলে দুর্লভ কিছুই থাকে না। তাঁহাকে প্রসন্ন করিতে পারিলে, ধর্ম্ম, অর্থ, ও কামের প্রয়োজন কি? তাঁহার প্রসাদের নিকট ঐ সমুদয় অতি তুচ্ছ পদার্থ। অতএব যাঁহারা নিষ্কামব্রহ্মস্বরূপ অনন্ত গুরুকে আশ্রয় করিতে সমর্থ হইবেন তাঁহারা নিঃসন্দেহভাবে মোক্ষরূপ ফললাভে সমর্থ হইতে পারিবেন। এই সকল বিষয় পুরাণাদি শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে। পুরাণাদি শাস্ত্রের প্রমাণ যথা,—"ঈশ্বরঃ কস্য বা বাধ্যোঽপ্রিয়ো বাপিপ্রিয়স্তথা। সত্ততং ভক্তিসাধ্যশ্চ যো ভক্তশ্চ তদীশ্বরঃ॥ নিজ ভক্তাতিসাধ্যশ্চ ভক্তস্যারাধ্য এবচ। শশ্বৎ দৃশ্যঃ স্বভক্তস্যাভক্তস্যাদৃশ্য এবচ॥ ন শক্যঃ স সুরৈর্দ্রষ্টুং নাসুরৈর্ন চ পন্নগৈঃ। যস্য প্রসাদং কুরুতে সবৈতং দ্রষ্টুমর্হতি॥ নহি যজ্ঞফলৈর্দানৈর্ন তপোভিস্ত সংযতৈঃ॥ শক্যতে ভগবান্ দ্রষ্টুং জ্ঞাননির্দগ্ধকিল্বিষৈঃ। তস্মিন্ প্রসন্নে কিমিহাস্ত্যলভ্যং ধর্ম্মার্থকামৈ-রলমল্পকাস্তে। সমাশ্রিতাদ্ ব্রহ্মতরোরনন্তাৎ

যে মোক্ষফল উল্লিখিত হইয়াছে, সেই সেই মোক্ষ পাঁচ প্রকার—সালোক্য সারূপ্য সার্ষ্টি সাযুজ্য নির্ব্বাণ। যে ব্যক্তি অজ্ঞানবর্জ্জিত, ও কামনাবিহীন হইয়া নিরন্তর ভগবানের পূজা করে, সেই ব্যক্তি ভগবানের সহিত একলোকে বাস করতঃ অভীষ্ট ভোগ সকলের উপভোগ করিয়া থাকে। ইহারই নাম সালোক্য মুক্তি। যে ব্যক্তি ভগবানকে বিদিত হইয়া যাবতীয় কামনা বিসর্জ্জন পূর্ব্বক ভগবানেরই অর্চ্চনা করে, সেই ব্যক্তি ভগবানের ন্যায় রূপ ধারণ করতঃ তাঁহার লোকে প্রস্থান করে। ইহাই সারূপ্য মুক্তি। যে ব্যক্তি ভগবানের সন্তোষ উৎপাদনার্থ ইষ্টাপূর্ত্তাদিকর্ম্ম সমূহের অনুষ্ঠান করে, সেই ব্যক্তি সেই সেই কর্ম্মের উপযুক্ত ফলভোগ করিয়া থাকে। ইহার নাম সার্ষ্টি মুক্তি। যে ব্যক্তি কোনও কর্ম্মের অনুষ্ঠান, ভোজন, হোম, দান ও তপশ্চরণ প্রভৃতি সমস্ত কর্ম্ম ভগবানে সমর্পণ করে, সেই ব্যক্তি ভগবানের প্রভাসম্পন্ন হইয়া তাঁহার লোকে প্রস্থান পূর্ব্বক সুখভোগ করে, তাহাকে সাযুজ্য মুক্তি বলে। যে ব্যক্তি শান্ত্যাদিগুণসম্পন্ন হইয়া নিরন্তর ভগবানকে আত্মস্বরূপে দর্শন করে, সেই ব্যক্তি পরম জ্যোতিঃস্বরূপ অদ্বৈত ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থান করেন, ইহাকে কৈবল্য অর্থাৎ নির্ব্বাণ মুক্তি বলে। প্রথমোক্ত চারি প্রকার মুক্তিতে জীবকে কখনও না কখনও পুণ্যক্ষয়ে এই সংসারে পুনর্ব্বার জন্মমৃত্যুর বশীভূত হইতে হয়, কিন্তু শেষোক্ত নির্ব্বাণমুক্তি লাভ হইলে, জীব অহংজ্ঞানপরিশূন্য হইয়া সচ্চিদানন্দময় পরব্রহ্মরূপ মহাসমুদ্রে একেবারে বিলীন হইয়া যায়, সুতরাং তাঁহাকে আর জন্ম মৃত্যুর বশীভূত হইতে হয় না।

রীতির সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণন করিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব। প্রাতঃকালে আর্য্য-সন্তান ইষ্টদেবতার নামোচ্চারণ ও গুরুপাদপদ্ম চিন্তা করতঃ শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া শৌচ ও স্নান ক্রিয়া সমাপনান্তে যাঁহারা দ্বিজাতি-বংশীয়, তাঁহারা প্রাতঃকালীন বৈদিক ও তান্ত্রিক এই উভয় সন্ধ্যা যাঁহারা শূদ্র-বংশীয় তাঁহারা কেবল তান্ত্রিক সন্ধ্যা করিয়া স্বয়ং হোম করিবে। নিজে হোম করিলে যে ফল হয়, অন্য দ্বারা করাইলে তাহা হয় না। তবে পুরোহিত, পুত্র, গুরু, ভ্রাতা, ভাগিনেয় অথবা জামাতা ইহারা প্রতিনিধিভাবে হোমাদি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে নিজের হোমানুষ্ঠান সিদ্ধ হয় অর্থাৎ স্বয়ং হোমাদি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে যেরূপ ফল লাভ হয়, পুরোহিতাদির দ্বারা করাইলেও সেই ফল লাভ হইয়া থাকে। পরে দেবপূজা ও গুরু সমীপে অবস্থান করিয়া গুরুপাদপদ্ম ও মঙ্গল দ্রব্য দর্শন করিবে। পূর্ব্বাহ্নে দেবপূজা, মধ্যাহ্নে মনুষ্যপূজা অর্থাৎ অতিথি-সৎকার, অপরাহ্নে পিতৃপূজা অর্থাৎ পিতৃলোকের উপাসনা শ্রাদ্ধাদি যত্নের সহিত অবশ্যানুষ্ঠেয়। পূর্ব্বাহ্নে যাহা কর্ত্তব্য তাহা যদি কেহ সায়ংকালে করে, তাহা হইলে বন্ধ্যা স্ত্রী সহবাসের ন্যায় তাহার ফললাভ হয় না। তবে নিরবকাশস্থলে পূর্ব্বাহ্নের কার্য্য মধ্যাহ্নে বা অপরাহ্নে, মধ্যাহ্নের ও অপরাহ্নের কার্য্য পূর্ব্বাহ্নে অপর্য্যুদস্ত কালে করিলেও কার্য্য সিদ্ধ হইবে। দিবসের প্রথমভাগে এই সকল কার্য্য কর্ত্তব্য ;—দিবসের প্রথম ভাগে অধিকারানুসারে শাস্ত্র পর্য্যালোচনা করিবে। বিশেষতঃ বিপ্রদিগের বেদাভ্যাসই পরম তপস্যা। এবং ষড়ঙ্গের সহিত বিধি পূর্ব্বক বেদাভ্যাসই ব্রহ্মযজ্ঞ বলিয়া নিকট শিক্ষা, পরে বেদতত্ত্ব-নির্ণয়, অনন্তর অভ্যাস, তদনন্তর জপ, তৎপরে অধ্যাপনা দ্বারা তাহা শিষ্যদিগকে বিতরণ, এই পাঁচ প্রকার বেদের অভ্যাস। এবং দিবসের দ্বিতীয় ভাগই সমিৎ, পুষ্প, ও কুশাদি আহরণ কাল বলিয়া উক্ত হইয়াছে। দিবসের তৃতীয়ভাগে পোষ্যবর্গের পালন নিমিত্ত অর্থ সংগ্রহ করিবে। পিতা, মাতা, গুরু, ভার্য্যা, সন্তান, ও আশ্রিতগণ, অভ্যাগত ও অন্যান্য অতিথি, ইহারা পোষ্যবর্গের মধ্যে পরিগণিত। জ্ঞাতি, বন্ধুজন, রোগী প্রভৃতিও পোষ্যবর্গ। ইহাদের প্রতিপালন প্রশস্ত কার্য্য ও স্বর্গ প্রাপ্তির সাধন। পোষ্যবর্গের পীড়া দিলে নরক হয়, এই জন্য যত্নের সহিত তাহাদিগকে প্রতিপালন করিবে। যাহাকে অবলম্বন করিয়া বহু লোকের জীবিকা নির্ব্বাহ হয়, সেই ব্যক্তি প্রকৃত জীবিত, আর যে সকল মনুষ্য, স্বার্থপর, তাহারা জীবিত থাকিতে মৃতের সমান। কোনও ব্যক্তি বহুলোকের প্রতিপালন নিমিত্ত জীবন ধারণ করে, কেহ বা স্ত্রী পুত্র কুটুম্ব ভরণের জন্য জীবন ধারণ করে, অপর ব্যক্তি কেবল নিজের উদর ভরণের জন্য জীবন ধারণ করে এবং অন্য ব্যক্তি তাহাতেও সমর্থ হয় না, নিজের উদর ভরণের জন্যও ব্যাকুল হইয়া থাকে। দরিদ্র, অনাথ ও বিশিষ্ট গুণশালী ব্যক্তিদিগকে মঙ্গল কামনা করিয়া দান করিবে। যাহারা দান না করে, তাহারা পরজন্মে পরভাগ্যোপজীবী হইয়া জন্মগ্রহণ করে। সৎপাত্রকে যাহা দান করা যায়, সেই ধনই প্রকৃত ধন। সৎকার্য্যে যে ধন ব্যয়িত না হয়, সেই ধন ধনীর নিজের নহে, ধনী কেবল তাহার রক্ষক মাত্র। দিবসের চতুর্থ ভাগে মধ্যাহ্ন স্নান করিবে। স্নান

উহাদিগের মধ্যে যে নিত্য স্নান, তাহাও তিন প্রকার—যাহা দ্বারা শরীরের মল সকল অপসারিত হয়, তাহার মলাপহরণ স্নান, তাহার পর সংকল্প করিয়া জলে যে স্নান তাহা মন্ত্রযুক্ত স্নান। এবং উভয় সন্ধ্যায় উপাসনাকালে মার্জ্জন-মন্ত্র দ্বারা যে স্নান উহা সন্ধ্যা স্নান, এই তিন প্রকার স্নান। দিবসের পঞ্চম ভাগে পিতৃলোক, দেবলোক, মনুষ্য ও কীটজাতির যথাযোগ্য আহার বিভাগ গৃহস্থের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। দেবগণ, মনুষ্যগণ ও কীটপতঙ্গগণ গৃহস্থকে অবলম্বন করিয়া প্রত্যহ জীবিকা নির্ব্বাহ করে, এই জন্য গৃহস্থাশ্রমই শ্রেষ্ঠ। এই গৃহস্থাশ্রমই ব্রহ্মচর্য্য, বানপ্রস্থ ও পারিব্রজ্য আশ্রমের উৎপত্তিস্থল। যেরূপ বৃক্ষের মূল হইতে প্রকাণ্ড, তাহা হইতে শাখা, তাহা হইতে পল্লব সকল উৎপন্ন হয়, বৃক্ষের মূল বিনষ্ট হইলে সকল বিনষ্ট হয়, সেইরূপ এই সংসারে গৃহস্থাশ্রম নষ্ট হইলেই অপর তিন আশ্রমও নষ্ট হয়। এই জন্য অতিশয় প্রযত্নের সহিত গৃহস্থাশ্রমীকে ভূম্যাদি দান ও চৌর্য্যাদি ভয় হইতে রক্ষা করা রাজার সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। এবং অপর তিন আশ্রমীর গৃহস্থাশ্রমীকে সর্ব্বদা আশীর্ব্বাদ করা ও গৃহস্থের কুশল কামনা করা অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। সর্ব্বদা যজ্ঞানুষ্ঠান-নিরত ও অতিথি-সৎকার-কুশল গৃহস্থই সকলের পূজনীয় ও সম্মানযোগ্য। পরন্তু কেবল গৃহনির্ম্মাণ দ্বারা গৃহাশ্রমী হইলে পূজনীয় ও সম্মানভাজন হইতে পারে না, এবং গৃহস্থ অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম অতিথি-সৎকারাদি কার্য্যে পরাঙ্মুখ হইয়া; কেবল স্ত্রী-পুত্রাদির ভরণ-পোষণ করিলেও সম্মানভাজন হইতে পারে না। যে নিত্য দেবতা ও অতিথি প্রভৃতিকে অন্নাদি বিভাগ করিয়া দেয়, যে ক্ষমাশীল, দয়ালু, এবং দেবতা ও অতিথি-গণের ভক্ত, সেই গৃহস্থই ধার্ম্মিক। যাহার দয়া, লজ্জা, ক্ষমা, শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রভৃতি গুণ আছে, তাহাকেই প্রধান গৃহস্থ বলে। এই জন্য গৃহস্থ অতিথি প্রভৃতিকে অন্নাদি বিভাগ করিয়া দিয়া অবশিষ্ট যাহা থাকিবে, তাহাই ভোজন করিবে। ভোজনানন্তর স্বচ্ছন্দে উপবেশন করিয়া ভুক্তান্ন পরিপাকানন্তর ইতিহাস-পুরাণাদি শাস্ত্রের পর্য্যালোচনা দ্বারা দিবসের ষষ্ঠ ও সপ্তম ভাগ যাপন করিবে। এইরূপে দিবসের অষ্টমভাগে লৌকিক কার্য্য সমাধানানন্তর সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইলে, সায়ং সন্ধ্যা সমাপনান্তে যথাকালে রাত্রি সার্দ্ধ প্রহরের মধ্যে পবিত্র ভোজনানন্তর যাম দ্বয় নিদ্রা দ্বারা অবস্থিতি করিলে, গৃহস্থ ব্রহ্ম-পদ লাভ করিয়া ঘোর সংসার নরক হইতে পরিত্রাণের অধিকার পাইবার যোগ্য হইতে পারে। এই সংসারে জন্ম গ্রহণ করিলে একদিন মৃত্যুমুখে অবশ্যই পতিত হইতে হইবে, অতএব যাঁহারা ঐহিক ও পারলৌকিক সুখ বাসনা করেন, সেই সকল গৃহস্থের আলস্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক যথাশক্তি শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম সকলের অনু-ষ্ঠান সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। এই সকল বিষয় ধর্ম্মশাস্ত্রে বিশদভাবে বর্ণিত আছে; যাহারা বিশদভাবে ঐ সকল বিষয়ের অবগতি করিতে বাসনা করিবেন, তাঁহারা ধর্ম্মশাস্ত্র পর্য্যালোচনা করিলেই বিশদ ভাবে সকল বুঝিতে পারিবেন।

শ্রীকামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ।

গীতোক্ত যোগ-সমন্বয়।

শ্রীশ্রীনারায়ণের শ্রীচরণকমলে শত শত সভক্তি প্রণাম-পূর্ব্বক এই অতীব গভীর এবং দুরূহ বিষয়ে হস্তার্পণ করিতেছি। গীতোক্ত কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ এবং ভক্তিযোগের দ্বারা সমন্বয়-সাধন অদ্যকার প্রবন্ধের বিষয়। নিখিল বেদান্তশাস্ত্রের শিরোমণি, অতি দুরবগাহ সমুদ্রস্বরূপ শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার মধ্যে এই যোগত্রিতয়ই সর্ব্বোত্তম, সর্ব্বোজ্জ্বল রত্ন। কর্ম্মজ্ঞান ও ভক্তিমার্গে আজন্ম বা কোটী কোটী জন্ম সাধনা করতঃ যে সকল ভাগ্যবান মহাপুরুষ সিদ্ধিলাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন, তাঁহারাই এইরূপ প্রবন্ধ লিখিবার অধিকারী। আমাদের মত মদমোহান্ধ জীবের এইরূপ চেষ্টা করাই যে তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। তথাচ আমরা যে এই অতি সাহসের কার্য্যে অগ্রসর হইতেছি সে কেবল সেই পরমপুরুষ দয়াময়ের দয়ার ভরসায়। তিনি কৃপা করিলে মূকও বাচাল হয়, এবং পঙ্গুও গিরি-লঙ্ঘন করিতে সক্ষম হয়। বিশেষতঃ বাসুদেবের পবিত্র প্রসঙ্গে পাপীর পাপ দূর হইয়া যায় এবং অশুদ্ধ মনকে বিশুদ্ধ করে। সেই ভরসায়, তাঁহার মহতী কৃপার উপরে নির্ভর করিয়া ভগবানের মহামহিমময়ী বাণী আমাদের পাপপঙ্কিল-হৃদয়ে যেরূপ প্রতিভাত হইয়াছে, সজ্জন-সমীপে তাহাই সবিনয়ে এবং সভয়ে নিবেদন করিতেছি। আশা আছে, সুধীগণ নিজ নিজ উদারস্বভাবানুরূপ রচনার দোষ ত্যাগ পরিত্যাগ করতঃ গুণভাগ গ্রহণ করিয়া অধম লেখককে বাধিত ও উৎসাহিত করিবেন।

গীতা শ্রীশ্রীভগবানের শ্রীমুখনিঃসৃত বেদ-বেদান্ত-জ্ঞান-গৌরবশালিনী মহামহিমাময়ী বাণী। ভারতের আর্য্যধর্ম্মতত্ত্বের যাহা শ্রেষ্ঠ এবং সার—গীতাশাস্ত্রে তাহাই উপদিষ্ট হইয়াছে। সুবিশাল আর্য্যধর্ম্মশাস্ত্র বিষয়ক ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে ভিন্ন ভিন্নরূপে কর্ম্ম, জ্ঞান এবং ভক্তিমার্গের বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে এবং উহাদের বহু প্রশংসাবাদ ও কীর্ত্তিত হইয়াছে; অনেক আচার্য্য এই তিনটী পথকে পরস্পরের বিরোধী বলিয়া প্রকাশ করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। গীতা শাস্ত্র যে সময়ে প্রচারিত হয়, সেই সময় অর্থাৎ দ্বাপরযুগের শেষাংশে ভারতে ধর্ম্ম সম্বন্ধে অতি ভীষণ এবং তুমুল মতবিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল। সর্ব্ব ধর্ম্মতত্ত্বের মূল উৎসস্বরূপ বেদশাস্ত্রের অর্থ ও তত্ত্ব-সম্বন্ধে নানাবিধ ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ সৃষ্ট হইয়া ধর্ম্মজগতে এক বিষম বিভ্রাট উপস্থিত করিয়াছিল। অনেক আচার্য্য বেদবাণীর ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা করতঃ ভিন্ন ভিন্ন পরস্পর-বিরোধ মতবাদ প্রচার করিতেছিলেন। কাহারও মতের সহিত কাহারও মিল রহিল না; মতের ভিন্নতা বা স্বাধীনতাই যেন মুনিত্বের পরিচায়ক হইয়া উঠিল। "নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্‌" যে বিখ্যাত শ্লোকের একটী অংশ, সেই শ্লোকটীও সেই সময়ে রচিত হইয়াছিল। ধর্ম্মজগতের তৎকালীন দুরবস্থার চিত্র মহাভারতের মহর্ষি অতি সংক্ষেপে অথচ কি সুন্দর এবং সুস্পষ্টভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন! দেখুন,—

"উর্দ্ধং দেহাদ্বদন্ত্যেকে নৈতদস্তীতি চাপরে।
কেচিৎ সংশয়িতং সর্ব্বং নিঃসংশয় রথাপরে ॥১॥
অনিত্যং নিত্যমিত্যেকে নাস্ত্যস্তীত্যপি চাপরে।

একরূপং দ্বিধেত্যেকে ব্যামিশ্রমিতি চাপরে ॥২॥
মন্যন্তে ব্রাহ্মণাদেবা ব্রহ্মজ্ঞাস্তত্ত্ববাদিনঃ।
একেমেকে পৃথক্ চান্যে বহুত্বমপি চাপরে ॥৩॥
দেশকালাবুভৌ কেচিৎ নৈতদস্তীতি চাপরে।
জটাজিনধরাশ্চান্যে মুণ্ডাঃ কেচিদসংবৃতা ॥৪॥
অস্নানং কেচিদিচ্ছন্তি স্নানমপ্যপরেজনাঃ।
আহারং কেচিদিচ্ছন্তি কেচিচ্চানশনেরতাঃ ॥৫॥
কর্ম্ম কেচিৎ প্রশংসন্তি প্রশান্তিং চাপরে জনাঃ।
কেচিন্মোক্ষং প্রশংসন্তি কেচিদ্ভোগান্ পৃথগ্ বিধান্ ॥৬॥
ধনানি কেচিদিচ্ছন্তি নির্ধনত্বমথাপরে।
উপাস্যসাধনাস্ত্বেকে নৈতদস্তীতি চাপরে ॥৭॥
অহিংসানিরতাশ্চান্যে কেচিদ্ধিংসাপরায়ণাঃ।
পুণ্যেন যশসাচান্যে নৈতদস্তীতি চাপরে ॥৮॥
সদ্ভাবনিরতাশ্চান্যে কেচিৎসংশয়িতেস্থিতাঃ।
দুঃখাদন্যে সুখাদন্যে ধ্যানমিত্যপরে জনাঃ ॥৯॥
যজ্ঞমিত্যপরে বিপ্রাঃ প্রদানমিতি চাপরে।
তপস্ত্বন্যে প্রশংসন্তি স্বাধ্যায়মপরে জনাঃ ॥১০॥
জ্ঞানং সন্ন্যাসমিত্যেকে স্বভাবং কৃতচিন্তকাঃ।
সর্ব্বমেকে প্রশংসন্তি ন সর্ব্বমিতি চাপরে ॥১১॥"

অশ্বমেধপর্ব্ব—মহাভারত ॥

অর্থাৎ কেহ কেহ বলেন যে, দেহ নাশের পরেও আত্মা অবস্থিতি করে, কেহ কেহ দেহান্তে আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। কেহ বা তদ্বিষয়ে সংশয়বাদী, কেহ বা নিঃসংশয়। মীমাংসকেরা আত্ম-বস্তুকে নিত্য, তার্কিকেরা অনিত্য, শূন্যবাদীরা আছেন, সৌগতেরা নাই,—এইরূপ বলিয়া থাকেন। যোগাচারেরা একরূপ এবং দ্বিরূপ, উভয়লোবাগণ নানারূপ অর্থাৎ ভিন্ন ও অভিন্ন কহিয়া থাকেন। তত্ত্বদর্শী ব্রহ্মজ্ঞগণ (ব্রাহ্মণগণ) একমাত্র ব্রহ্মই বিদ্যমান আছেন এইরূপ মনে করিয়া থাকেন। সগুণ ও সাকারোপাসকগণ ব্রহ্মকে পৃথক্ পৃথক জ্ঞান করেন। পরমাণুবাদীগণ ব্রহ্মের বহুত্ব স্বীকার করিয়া থাকেন এবং জ্যোতির্ব্বিদেরা দেশ ও কাল উভয়কে ব্রহ্ম বলেন। বৌদ্ধেরা উহাকে স্বপ্নরাজ্যের মিথ্যা চিদ্বিলাসস্বরূপ বলিয়া থাকেন। কেহ কেহ জটাজিনধারী হইয়া ব্রহ্মের উপাসনা করিতে প্রবৃত্ত হন, কেহ কেহ মুক্তকেশ এবং কেহ কেহ বা মুণ্ডিতমস্তক হইয়া ব্রহ্মোপাসনা ফলোপধায়ক মনে করেন। কোন কোন সাধক স্নানের পক্ষপাতী, কেহ কেহ আবার অস্নাত অবস্থায় উপাসনা করিতে ইচ্ছুক। কেহ কেহ আহার করিয়া উপাসনা করিতে অভিলাষী, কেহ কেহ অনশনের পক্ষপাতী। কেহ কেহ কর্ম্মের প্রশংসা করেন, কেহ বা সন্ন্যাসের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করেন। কেহ কেহ ভোগ-বিলাসের আকাঙ্ক্ষায় ব্যস্ত, কেহবা মোক্ষলাভের প্রয়াসী। উপাস্য দেবের নিকট কেহ ধন, কেহ সাধনা, কেহ বা নির্ধনতা প্রার্থনা করিয়া থাকেন—কেহ বা আবার কিছুই যাচ্ঞা করেন না। কেহ কেহ অহিংসাপরায়ণ, কেহবা পুনশ্চ হিংসায় পক্ষপাতী। কেহ কেহ পুণ্য এবং যশোলাভ লোভে অত্যন্ত প্রযত্ন করেন, কেহ বা যশ অথবা পুণ্যের অস্তিত্বই স্বীকার করেন না। কেহ কেহ শ্রদ্ধাবান কেহ বা সংশয়াত্মা। কেহ সুখ, কেহ দুঃখ, কেহ বা ধ্যান অবলম্বন করেন। কেহ যজ্ঞ, কেহ দান, কেহ তপস্যা, কেহ বা স্বাধ্যায়ের প্রশংসা করেন, কেহ জ্ঞান, কেহবা সন্ন্যাসকে প্রশংসা করেন, কোন কোন চিন্তাশীল ব্যক্তি প্রকৃতি অথবা স্বভাবের প্রশংসা করেন। কেহ কেহ এই সমুদয়কেই

প্রশংসা করেন, কেহ বা আবার ইহার মধ্যে কোন একটীকেও প্রশংসা করেন না।

এই বিষম সংকটময় ধর্ম্মবিপ্লব-কালে দয়াময় শ্রীভগবান্ ধর্ম্মসংস্থাপনের নিমিত্ত সমগ্র পৃথিবীর নরনারীবৃন্দের আধ্যাত্মিক ব্যাধির মহামহৌষধস্বরূপ অজ্ঞানতান্ধকারের দিব্যালোকস্বরূপ, বিশ্ব-বিস্ময়জনক এই মহতী গীতার সৃষ্টি করিলেন। এই অলৌকিক গ্রন্থে কেবল ভারতের কেন, সমগ্র জগতের নিখিল ধর্ম্মগ্রন্থের মূলতত্ত্ব নিহিত হইয়াছে। এই অত্যাশ্চর্য্য পুস্তকে চতুর্ব্বেদের, যাবতীয় উপনিষদের, সমস্ত দর্শনের,—এক কথায় সমগ্র আর্য্য ধর্ম্মশাস্ত্রের সুন্দর সমন্বয় সাধিত হইয়াছে। গীতা প্রচারের পূর্ব্বে কর্ম্মিগণ জ্ঞানিগণের প্রতি, জ্ঞানিগণ কর্ম্মিবৃন্দের প্রতি এবং ভক্তগণ কর্ম্মী এবং জ্ঞানী উভয়ের প্রতি ঘৃণা ও দ্বেষদৃষ্টিতে দর্শন করিতেন এবং একজন অপরকে বিপথগামী মনে করিয়া সাম্প্রদায়িক বিবাদপরম্পরায় ধর্ম্মজগতকে উত্তপ্ত এবং ঘোর অশান্তিময় করিয়া তুলিতেন। গীতা এই বিষময় বিবাদাগ্নিতে অমৃত সেচন করিয়া সে অনল নির্ব্বাণ করিয়া দিলেন, জগৎ শীতল হইল এবং সাম্প্রদায়িক সংগ্রাম কোলাহল শান্ত হইয়া গেল। গীতা অতি সুন্দরভাবে, সুকৌশলে বুঝাইয়া দিলেন,—কর্ম্ম জ্ঞান ও ভক্তিমার্গের মধ্যে কোন বিরোধ নাই, উহারা মুক্তিপথের সোপান বিশেষ মাত্র। গীতা দেখাইয়া দিলেন যে, মোক্ষ-সৌধে আরোহণ করিতে হইলে যে সোপান অবলম্বন করিতে হইবে, কর্ম্ম জ্ঞান এবং ভক্তি সেই সোপানের এক একটী পৈঠা বা পাদস্থাপনী মাত্র। মুমুক্ষু ব্যক্তির পক্ষে জ্ঞান ভিন্ন উপায় নাই,—কর্ম্মযোগ সেই জ্ঞান লাভের একমাত্র উপায় আর জ্ঞান এবং ভক্তি প্রকৃতপক্ষে একই বস্তু। এই কর্ম্ম জ্ঞান এবং ভক্তিমার্গের উপাদেয়তা এবং উপযোগিতা প্রদর্শন এবং উহাদের সুষ্ঠু-সমন্বয় সাধনই গীতার মুখ্য উদ্দেশ্য এবং কি উপায়ে সেই মহান্ উদ্দেশ্য সাধিত হইয়াছে, তাহা প্রতিপাদন করাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের লক্ষ্য।

প্রকৃত বিষয় আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে একটী কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক। গীতা যে নিখিল বেদবেদান্ত শাস্ত্রের সারসংগ্রহ এবং সকল দর্শনশাস্ত্রের সমন্বয় তাহা প্রত্যেক হিন্দুসন্তানই অবগত আছেন সন্দেহ নাই;—কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ এবং ভক্তি-যোগ আবার সেই গীতা শাস্ত্রের সার। একটী ক্ষুদ্র প্রবন্ধে এরূপ অত্যন্ত গভীর এবং দুরূহ বিষয় বিশদভাবে বিবৃত করা একরূপ অসম্ভব। এই যোগ ত্রিতয় অব-লম্বন করিয়া তিন খানি স্বতন্ত্র প্রকাণ্ড পুস্তক রচনা করিলে তবে বিষয়ের গৌরব রক্ষা হয়;—তথাচ সমুদয় বিষয় সরলভাবে বুঝান যায় কি না সন্দেহ। এরূপ ক্ষেত্রে আমাদের মত অল্পজ্ঞ ব্যক্তির দ্বারা অল্পা-য়তন ক্ষুদ্র প্রবন্ধে এই বিষয়ের সম্মান রক্ষা এবং তদ্দ্বারা সাধারণের মনোরঞ্জন যে কত কঠিন তাহাও সহৃদয় পাঠকবৃন্দ কৃপা করিয়া মনে রাখিবেন।

কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ যে গীতায় প্রথম আবিষ্কৃত বা কথিত হইয়াছে তাহা নহে। প্রকৃতপক্ষে আমাদের ধর্ম্ম সম্বন্ধে প্রচলিত সমুদায় মতবাদের মূল বেদে নিহিত রহিয়াছে এবং দার্শনিক ঋষিগণের মধ্যে এক এক জন এক একটী মূলতত্ত্ব লইয়া তাহার বিবৃতি এবং ব্যাখ্যা দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন দার্শনিক মতের সৃষ্টি করিয়া বৈদিক ধর্ম্মতত্ত্ব বুঝিবার এবং সাধনপথে অগ্রসর হইবার সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। অন্যান্য দেশে দর্শনশাস্ত্র ধর্ম্মশাস্ত্রের সহিত

অঙ্গাঙ্গী এবং অচ্ছেদ্যভাবে সম্বদ্ধ নহে,—তথায় উহা কেবল জ্ঞানী ব্যক্তিদিগের সাধারণ জ্ঞানবৃদ্ধির উপায় অথবা মনস্তত্ব বিদ্যার শাখারূপে পঠিত ও আলোচিত হইয়া থাকে। এদেশে দর্শনশাস্ত্র ধর্ম্মশাস্ত্র বিশেষ—উহা বেদের উপাঙ্গ। মহর্ষি জৈমিনী তৎকৃত পূর্ব্বমীমাংসা গ্রন্থে কর্ম্ম, ঋষিপুঙ্গব বাদরায়ণ তৎপ্রণীত উত্তরমীমাংসায় জ্ঞান এবং ঋষিশ্রেষ্ঠ শাণ্ডিল্য ও নারদ তাঁহাদের লিখিত ভক্তিশাস্ত্রে ভক্তি সম্বন্ধে অবশ্য জ্ঞাতব্য অনেক কথা বলিয়াছেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধে ঐ সকল দার্শনিক শাস্ত্রোল্লিখিত তত্ত্বনিচয়ের বিচার অথবা মীমাংসার একান্ত স্থানাভাব এবং বিশেষ আবশ্যকতাও নাই। গীতাশাস্ত্র এই যোগত্রিতয় সম্বন্ধে কি বলেন, আমাদের তাহাই আলোচ্য।

শ্রীশ্রীগীতাগ্রন্থ অষ্টাদশ অধ্যায়ে বিভক্ত এবং উহার প্রত্যেক অধ্যায়ই ভিন্ন ভিন্ন "যোগ" নামে পরিচিত। তন্মধ্যে তৃতীয় অধ্যায় "কর্ম্মযোগ", চতুর্থ অধ্যায় "জ্ঞান-যোগ" এবং দ্বাদশ অধ্যায় "ভক্তিযোগ" নামে প্রসিদ্ধ। আমরা প্রধানতঃ এই তিন অধ্যায় এবং প্রসঙ্গক্রমে গীতার অন্যান্য অংশ অবলম্বন করিয়া, এই যোগত্রয়ের তত্ত্ব বুঝিবার চেষ্টা করিব।

শ্রীভগবান্ গীতার তৃতীয় অধ্যায় আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে কামনাযুক্ত অথবা সকাম কর্ম্মের যথেষ্ট নিন্দা করিয়া বলিয়াছেন যে, সকাম কর্ম্ম দ্বারা স্বর্গাদি শুভফল প্রাপ্তি হইলেও সেই সকল ফল ক্ষণস্থায়ী সুতরাং বৃথা। সকাম কর্ম্ম দ্বারা পাপ অথবা পুণ্য যাহাই কেন উপার্জ্জিত হউক না, সেই ফলভোগ অবশ্যম্ভাবী সুতরাং তজ্জন্য বার বার ভিন্ন ভিন্ন যোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়, অতএব দেখিতে পাওয়া যাইতেছে সেরূপ কর্ম্ম বন্ধন মাত্র। অথচ জীবমাত্রকেই সর্ব্বদা কোন না কোন প্রকার কর্ম্ম করিতেই হয়,—এমন কি আহার নিদ্রা, শ্বাস প্রশ্বাস প্রভৃতিও কর্ম্ম,—কর্ম্ম ব্যতিরেকে ক্ষণমাত্রও জীবন ধারণ অসম্ভব। তবে উপায়? উপায় গীতোক্ত কর্ম্মানুষ্ঠান। কর্ম্মও করিব অথচ সেই কর্ম্ম আমার বন্ধন হওয়ার পরিবর্ত্তে মুক্তির উপায়স্বরূপ হইবে—এই ভাবে কর্ম্মানুষ্ঠানই "কর্ম্মযোগ"। সেই কৌশলই "কর্ম্মযোগ"। ভগবান্ প্রিয়তম সখা এবং অনুগত শিষ্য অর্জ্জুনকে উপদেশ দিলেন,—

"যোগস্থঃ কুরুঃ কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা
ধনঞ্জয়।" ২।৪৮॥
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যো সমোভূত্বা—

অর্থাৎ হে ধনঞ্জয়, তুমি আসক্তি অথবা কামনা পরিত্যাগ করতঃ যোগস্থ হইয়া এবং সিদ্ধি ও অসিদ্ধি তুল্যজ্ঞান করতঃ কর্ম্ম কর। যোগের ব্যাখ্যাস্বরূপে পরবর্ত্তী শ্লোকাংশে বলিতেছেন,—"সমত্বং যোগ উচ্যতে॥" সকল বিষয়ে সমভাবকে 'যোগ' বলে। কোন বিষয় পাইলে হর্ষ এবং না পাইলে বিষাদ, অথবা কোন বিষয় পাইলে বিষাদ, না পাইলে হর্ষোদ্রেক, এরূপ ভাব না হওয়াকে "সমত্ব" বলে। ভগবান্ আরও বলিলেন,—

"বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃতদুষ্কৃতে।
তস্মাদ্ যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্ম্মসু
কৌশলম্॥" ২।৫০॥

জ্ঞানী—অর্থাৎ প্রকৃত জ্ঞানী ব্যক্তি শুভ অথবা অশুভ—স্বর্গ অথবা নরকপ্রাপক সকাম কর্ম্ম মাত্রকেই পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। তুমিও "কর্ম্মযোগ" সাধনে ব্রতী হও,—এই যোগ কর্ম্ম করিবার এক সুন্দর কৌশল। এই কৌশল দ্বারা যোগীর কর্ম্মবন্ধনের কারণ না হইয়া মোক্ষের উপায়রূপে পরিণত হয়। যিনি কেবল মাত্র কর্ত্তব্যবুদ্ধি-প্রণোদিত

হইয়া শাস্ত্রবিহিত "কর্ম" ("অকর্ম" বা "বিকর্ম" নহে) করিয়া যান, সেই কর্মের কর্মফলের আকাঙ্ক্ষা মাত্র রাখেন না, তিনি কর্মযোগের অনুষ্ঠাতা। কর্মের ফলাফলে যাঁহার মনে কোনরূপ হর্ষ অথবা বিষাদের উদ্রেক হয় না, তিনি ধন্য, কর্মযোগে তাঁহার সিদ্ধি লাভ হইয়াছে। আর যিনি কর্মফলে অভিলাষী,—কর্মের অনুকূল ফলে হর্ষোৎফুল্ল এবং প্রতিকূল ফলে দুঃখে অবসন্ন হন,—তিনি ইন্দ্রিয়বর্গের দ্বারা পরিচালিত হইয়া রাগ-দ্বেষবশে কর্ম হইতে কর্মান্তরে ধাবিত হইতে থাকেন এবং তাঁহার কৃত কর্মের শুভাশুভ ফলে তাঁহাকে ভববন্ধনে দৃঢ় হইতে দৃঢ়তররূপে আবদ্ধ হইতে হয়। যাঁহার মন যথেচ্ছগামী ইন্দ্রিয়গ্রামের অনুসরণ করে, তাঁহার আর নিস্তার নাই। যাঁহার ইন্দ্রিয়গণ বিজিত হয় নাই, কামক্রোধাদি রিপুগণ যাঁহার বশ্যতা স্বীকার করে নাই, তাঁহার বুদ্ধি প্রকৃত তত্ত্ব-জ্ঞানপথে স্থির থাকিতে পারে না, সে বুদ্ধি আত্মধ্যানে অসমর্থ। আত্মধ্যানে অসমর্থ ব্যক্তির মনে শান্তি আসিতে পারে না, আর অশান্তচিত্ত পুরুষের প্রাণে যে সুখ নাই, তাহা বলাই বাহুল্য। বিধিবিহিত "কর্মযোগ" অভ্যাস করিতে থাকিলে ইন্দ্রিয়গণ বশীভূত, রিপুদল আয়ত্ত, বুদ্ধি আত্মধ্যানতৎপর, চিত্ত বিশুদ্ধ এবং মন সুশান্ত হয়। এরূপ মনে সহজেই ব্রহ্মজ্ঞানের উদ্ভব হয় এবং ব্রহ্মজ্ঞানের উদ্ভব হইলেই মোক্ষ করতল-গত হয়। যে "কর্মযোগ" দ্বারা এরূপ মহৎফল সাধিত হয়, ভগবান্ এইবার সেই "কর্মযোগের" পরিচয় দিতেছেন—

যথা,—

"কর্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরণ।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স
উচ্যতে ॥ ৬
যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেঽর্জুন।
কর্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে ॥ ৭
নিয়তং কুরু কর্ম ত্বং কর্ম জ্যায়োহকর্মণঃ।
শরীরযাত্রাঽপিচতে ন প্রসিদ্ধ্যেদকর্মণঃ ॥ ৮
যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর ॥ ৯
সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষবোঽস্ত্বিষ্ট কামধুক্ ॥ ১০
দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ ॥ ১১
ইষ্টান্ ভোগান্হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞ-
ভাবিতাঃ।
তৈর্দত্তানপ্রদায়ৈভ্যো যো ভুংক্তেস্তেন
এব সঃ ॥ ১২
যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্ম-
কারণাৎ ॥ ১৩
অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি পর্জ্জন্যাদন্নসম্ভবঃ।
যজ্ঞাদ্ভবতি পর্জন্যো যজ্ঞঃ কর্মসমুদ্ভবঃ ॥ ১৪
কর্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাঽক্ষরসমুদ্ভবম্।
তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে
প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ১৫
এবং প্রবর্ত্তিতং চক্রং নানুবর্ত্তয়তীহ যঃ।
অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স
জীবতি ॥" ১৬

গীতা তৃতীয় অধ্যায়।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, পূর্ব্বকালে জ্ঞানী এবং কর্ম্মী সাধকদিগের মধ্যে ঘোরতর বিরোধ ছিল। কর্ম্মীগণ প্রায়ই সকাম যাগ যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানে ব্যস্ত থাকিতেন এবং এরূপ কর্ম বন্ধনের উপায়মাত্র বলিয়া জ্ঞানিগণ সকলপ্রকার কর্মের প্রতি বীতস্পৃহ ছিলেন এবং তাঁহারা সমস্ত কর্মকে অমঙ্গলের হেতু বোধে কর্মমার্গ এবং সংসারাশ্রম বিষবৎ পরিত্যাগ করতঃ দিগম্বর সন্ন্যাসী হইয়া কেবল জ্ঞানমার্গের সাধনাকারী

যোক্ষ লাভের চেষ্টা করিতেন। তাঁহারা বাহিক কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেও, প্রকৃত পক্ষে ত্যাগী বা সন্ন্যাসী হইতে পারিতেন না। প্রত্যুত: অসংযত মন এবং ইন্দ্রিয় সমূহ লইয়া কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে গিয়া তাঁহাদিগকে নানা কৃত্রিম উপায়ে কর্ম্মেন্দ্রিয়গণকে দমন করিতে হইত;—কেহ বা চক্ষুর দৃষ্টিশক্তি লোপ করিতেন,—কেহ কর্ণেন্দ্রিয়ের ধ্বংস সাধন করিতেন,—কেহবা অতি অস্বাভাবিক কুৎসিত উপায়ে কামেন্দ্রিয়ের দমন করিতেন। তাহাতে কর্ম্মেন্দ্রিয়গণ সুশান্ত হইবার পরিবর্ত্তে ধ্বংস প্রাপ্ত হইত, কিন্তু মন নিজে অসংযত হওয়া হেতু ঐ সকল ইন্দ্রিয়ের বিষয় লইয়া সর্ব্বদা আলোচনা করিতে ব্যস্ত থাকিত,—সুতরাং সাধনা একটা প্রকাণ্ড কপটতায় পর্য্যবসিত হইত। ভগবান্ এই ভ্রান্তি ও কপটতার ঔষধস্বরূপ কর্ম্মযোগের উপাদেয়তার প্রতিপাদন করিতেছেন। তিনি অর্জ্জুনকে বলিলেন,—

যে ব্যক্তি কর্ম্মেন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া, মনে মনে ইন্দ্রিয়-ভোগ্য বিষয় সকল চিন্তা করিতে থাকে, সেই মূঢ় ব্যক্তি কপটাচারী বলিয়া অভিহিত হয়। কিন্তু যিনি জ্ঞানেন্দ্রিয়গণকে মনের দ্বারা অনুশাসিত করিয়া, সমস্ত কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা অনাসক্ত ভাবে কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তিনি মহাত্মা। অকর্ম্ম বা কর্ম্ম পরিত্যাগ অপেক্ষা শাস্ত্র-বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান অধিকতর শ্রেষ্ঠ। কর্ম্ম পরিত্যাগ করাও অসম্ভব, যেহেতু কর্ম্মত্যাগ করিলে শরীরযাত্রাও রক্ষা হইতে পারে না। অতএব তুমি সংযতচিত্তে শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর। হে কুন্তীনন্দন,—যজ্ঞের (১) উদ্দেশ্যে কর্ম্মানুষ্ঠান ব্যতীত, অন্য কর্ম্ম এই পৃথিবীতে বন্ধনের কারণ হয়। অতএব তুমি নিঃসঙ্গভাবে যথার্থ কর্ম্ম কর। প্রজাপতি সৃষ্টির প্রারম্ভে জীবগণকে যজ্ঞ অথবা নিষ্কাম নিত্যকর্ম্মের সহিত সৃষ্টি করিয়া বলিয়াছিলেন, "হে প্রজাগণ, তোমরা নিষ্কামভাবে ঈশ্বরোদ্দেশ্যে স্ব স্ব কর্ত্তব্য কর্ম্মানুষ্ঠান কর। এই নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা তোমাদের মঙ্গল হউক, এবং তোমরা ইহলৌকিক এবং পারলৌকিক অভীষ্ট লাভ কর। এইরূপ নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠান বা যজ্ঞ দ্বারা তোমরা দেবতাদিগের পূজা কর; তাঁহারাও তোমাদের সম্বর্দ্ধনা করিবেন। দেবতাগণ যজ্ঞ দ্বারা পূজিত হইয়া অভিলষিত বিষয় তোমাদিগকে প্রদান করিবেন।" অতএব তাঁহাদিগের প্রদত্ত ভোগ্যবস্তু তাঁহাদিগকে না দিয়া যে নিজে ভোগ করে সে ব্যক্তি তস্কর, সন্দেহ নাই। (২) সাধুগণ যজ্ঞাবশিষ্ট ভোজন করেন, তাঁহারা সকল পাপ হইতে মুক্তিলাভ করেন; আর যাহারা কেবল নিজের উদর পূর্ণ করিবার জন্য ভোজ্যবস্তু প্রস্তুত করে, তাহারা পাপাত্মা,—পাপই ভোজন করে। ভক্ষ্যবস্তু বা অন্ন হইতে প্রাণিগণ উৎপন্ন হয়, বৃষ্টি হইতে যাবতীয় ভক্ষ্যবস্তুর উৎপত্তি হয়,—যজ্ঞ হইতে বৃষ্টির কারণ মেঘ সমুৎপন্ন

(১) যজ্ঞ—পরমেশ্বর, "যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ" ইতি শ্রুতেঃ। যজ্ঞ অর্থে পূর্ব্বোক্ত পঞ্চমহাযজ্ঞকেও বুঝায়। ঋষিযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ এবং ভূতযজ্ঞ এই পঞ্চ মহাযজ্ঞ নিত্যকর্ম্ম বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। বেদাদি ধর্ম্মশাস্ত্রাধ্যয়নকে ঋষিযজ্ঞ অথবা ব্রহ্মযজ্ঞ, অগ্নিহোত্রকে দেবযজ্ঞ, অতিথি-সেবার নাম নৃযজ্ঞ, শ্রাদ্ধ ও তর্পণকে পিতৃযজ্ঞ এবং বলি বৈশ্বদেবকে ভূতযজ্ঞ বলে। মনু ৩য় অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

(২) অন্যত্র দেখুন "সর্ব্বেপ্যেতে যজ্ঞবিদো যজ্ঞক্ষপিতকল্মষাঃ। যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্ ।৩০। নায়ং লোকোঽস্ত্যযজ্ঞস্য কুতোঽন্যঃ কুরুসত্তম ।৩১।" গীতা ৪র্থ

হয় এবং কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা যজ্ঞ সম্পন্ন হয়। কর্ম্ম বেদ হইতে উৎপন্ন এবং অবিনাশী পরমাত্মা হইতে বেদের উৎপত্তি; অতএব সর্ব্বব্যাপক পরমাত্মা সর্ব্বদাই যজ্ঞে বর্ত্তমান রহিয়াছেন। হে পার্থ, যে ব্যক্তি ইহলোকে প্রবর্ত্তিত এই কর্ম্মচক্রের অনুবর্ত্তী না হয়, সেই ইন্দ্রিয়দাস পাপীর প্রাণ ধারণ বৃথা।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসত্যবন্ধু দাস।

গায়ত্রী।

গায়ত্রীই দ্বিজগণের প্রাণপ্রিয়তর মন্ত্র; এবং ইহাই বেদের সারভূতা, চতুরাশ্রমের একমাত্র অবলম্বনীয়া, পরমানন্দস্বরূপ মোক্ষধামের অদ্বিতীয় অধিরোহিনী, সাধকের আত্মসহায়িকা, ও ঈশ্বরোপসনার মূলমন্ত্রস্বরূপা। এই অবিদ্যানাশিনী, জ্ঞানার্ক-কাশিনী, মেধাসংদায়িনী গায়ত্রীর ব্যাখ্যান আর্ষপদাঙ্কানুসরণে প্রকাশিত করিলাম, যদি কোন স্থল অসংলগ্ন বোধ হয়, গায়ত্রিবিদ্‌গণ ক্ষমা করিবেন।

এই প্রবন্ধে প্রথমতঃ গায়ত্রী শব্দের নিরুক্তি, তৎপরে ব্যাখ্যান, জপাদির নিয়ম কাল, ফল ও মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। নিম্নোক্ত গ্রন্থ নিচয় হইতে এ সম্বন্ধে প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছে :—

শতপথ ব্রাহ্মণ, ছান্দোগ্যোপনিষদ্, অথর্ব্ববেদ, আচার্য্য পিঙ্গলের ছন্দঃসূত্র, ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, আচার্য্য যাস্কের নিরুক্ত, নারদীশিক্ষা, মনু-স্মৃতি ইত্যাদি।

ব্রহ্মর্ষি অগ্নি ঋগ্বেদ, বায়ু যজুর্ব্বেদ, ও রবি সামবেদ প্রচার করিয়া গিয়াছেন। (অগ্নি বায়ুরবিভ্যস্তু ত্রয়ং ব্রহ্ম সনাতন। দুদোহ যজ্ঞসিদ্ধ্যর্থমৃগ্‌যজুঃসামলক্ষণম্॥ মনু, ১অ) তাঁহাদের নিকট হইতে ব্রহ্মা, বিশ্বামিত্র, এবং নারায়ণ আদি মহর্ষিগণ বেদজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। মহর্ষি বিশ্বামিত্র (রামচন্দ্রের সমসাময়িক বিশ্বামিত্র নহেন) ও নারায়ণই গায়ত্রী মন্ত্রের আদি ব্যাখ্যাতা; যেমন কলা, শিল্প ও অন্যান্য শাস্ত্র এবং দর্শনগুলির আর্য্যভাষ্য এক্ষণে অপ্রাপ্য, তদ্রূপ বেদের আর্ষ ব্যাখ্যানও অপ্রাপ্য; বৌদ্ধ, জৈন, তান্ত্রিক এবং যবনগণ ভারতের সরস্বতী-ভাণ্ডার ভস্মস্তূপে পরিণত করিয়া বিদ্যাহীনতার কি সুন্দর দৃষ্টান্তই প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছে! যাউক এক্ষণে গায়ত্রী শব্দের নিরুক্তি নিরুক্ত করা যাইতেছে :——

"প্রাণাবৈগয়াস্তৎ প্রাণাংস্তত্রে তদ্যদ্‌গয়াং স্তত্রে তস্মাদ্ গায়ত্রীনাম।" শতপথ ব্রাহ্মণ, ১৭।৮।১।৬।৭॥

গয় শব্দের অর্থ প্রাণ; এই প্রাণ যদ্দ্বারা ত্রাণ প্রাপ্ত হয়, তাহাকেই গায়ত্রী বলে।

অথবা—"গয়ান্ প্রাণান্ ত্রায়তে সা গায়ত্রী"।

যাহা প্রাণ ও প্রাণীর ত্রিতাপ নাশ করিয়া চরম ও পরম সুখ মোক্ষ প্রদান করে তাহাই গায়ত্রী।

তথাচ—"বাগ্বৈ গায়ত্রী···। গায়তি চ ত্রায়তে চ"। ছান্দোগ্যে—৩।১২।১॥

ঈশ্বরের বাক্যই গায়ত্রী, কারণ তাঁহার বাক্যানুরূপ কার্য্য করিয়াই জীবকুল ত্রাণ প্রাপ্ত হয়, এবং গায়ত্রী তাঁহারই বাক্য, ইতর মানবের নহে।

গায়ন্তি—ঈশ্বর, জীব ও প্রকৃতির গুণ যদ্দ্বারা গীত হয়, বা যদ্দ্বারা গীয়মান্ পুরুষের রক্ষা হয়, তাহাই গায়ত্রী। সুতরাং আমরা,

ব্যাকরণের বলে বিশেষকেও গায়ত্রী বলিতে পারি, যদ্যপি তদ্দ্বারা ঐরূপ ত্রাণ ও রক্ষা হয়।

বেদে যে সকল ছন্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহার মধ্যে গায়ত্রী ছন্দ অতীব সুগেয়, সুশ্রাব্য ও সুখোচ্চার্য্য।

অথর্ব্ববেদে ১৯।৩।২।১ মন্ত্র——গায়ত্র্যুষ্ণিগনুষ্টুব্ বৃহতীপঙ্‌ক্তিস্ত্রিষ্টুব্ জগত্যৈ॥

গায়ত্রী, উষ্ণীক্ অনুষ্টুপ্ বৃহতী, পঙ্‌ক্তি, ত্রিষ্টুপ্ ও জগতী, বেদে এই ৭টী ছন্দ ব্যবহৃত হইয়াছে; এইগুলি আবার অষ্টধা বিভক্ত যথা আর্ষী, দৈবী, আসুরী, প্রাজাপত্যা, যাজুষী, সাম্নী, আর্চী ও ব্রাহ্মী, এই এই সকল ছন্দ মিলিয়া ৭×৮=৫৬ রূপ হইয়া থাকে; ইহাদেরও আবার অনন্ত ভেদ আছে, বৈদিক ছন্দঃ-সূত্রকার মহর্ষি পিঙ্গলাচার্য্য স্বকীয় গ্রন্থে এই বিষয়ে বিশদ ব্যাখ্যান করিয়া গিয়াছেন।

ছান্দোগ্যে ৩।৭।১——"চতুর্ব্বিংশত্যক্ষরা গায়ত্রী।"

প্রোক্ত গায়ত্রী ছন্দ ২৪টী অক্ষরে অক্ষরে গ্রথিত।

বৃহদারণ্যকে—৫।১৪।১—"অষ্টাক্ষরংহবা একং গায়ত্রৈ পদম্"।

গায়ত্রীর এক এক পাদে ৮টী করিয়া অক্ষর থাকিবে।

পিঙ্গলসূত্র—"গায়ত্র্যাবসবঃ"।

গায়ত্রী প্রতিপদের বর্ণ পরিমাণ বসু—৮টী। অতএব জানা যাইতেছে গায়ত্রীর তিনটী চরণ, প্রতি চরণে ৮টী করিয়া মোট ২৪টী বর্ণ আছে। গায়ত্রীর পাদত্রয়ঃ—

১ম—তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং। ২য়—ভর্গো দেবস্যধীমহি। ৩য়—ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ।

হসন্ত বর্ণগুলি গ্রাহ্য নহে। ত+স+বি+তু+র্ব্ব+রে+ণ্য+ং—৮টী; ভ+র্গো+দে+ব+স্য+ধী+ম+হি—৮টী; ধি+য়ো+যো+নঃ+প্র+চো+দ+য়া+ৎ=৮টী। চরণের অন্তস্থ যকার সর্ব্বত্র বর্ণ বিভিন্নরূপে গৃহীত হওয়ায় ণ+যং এইরূপ ধরা হইয়াছে।

বেদচতুষ্টয়ে গায়ত্রিচ্ছন্দ-কথিত বহুমন্ত্র আছে, তন্মধ্যে "তৎসবিতুঃ" নামক মন্ত্রটীও উক্ত ছন্দে গ্রথিত বলিয়া উহার নাম গায়ত্রী হইয়াছে। এই ছন্দটী বিশেষ সরল, সুগেয় ও শ্রুতিরসায়ণ অথচ গম্ভীর গূঢ়ভাবব্যঞ্জক বলিয়া এই ছন্দেই ঋক্ ও সামবেদ আরব্ধ হইয়াছে (অগ্নিমীড়ে পুরোহিতং" ইতি ঋগ্‌বেদে; "অগ্ন আয়াহি বীতয়ে" ইতি সামবেদে); এবং এইজন্যই ইহা মাণবককে প্রথমেই প্রদত্ত হইয়া থাকে। এক্ষণে কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, বেদে যখন বহু গায়ত্রিচ্ছন্দোবদ্ধ মন্ত্র আছে, তখন "তৎসবিতুঃ" মন্ত্রটীই বা কেন গায়ত্রীরূপে ব্যবহৃত হয়? ইহার উত্তরে বলিতে হয়, যখন যে কোনও একটী গায়ত্রীছন্দগ্রথিত মন্ত্র অবশ্যই বলিতে হইবে, তখন "তৎসবিতুঃ" মন্ত্রটী বলিতে বাধা কি? যদি বাধা থাকে তবে উভয় পক্ষেই সমান। বিশেষতঃ যে গায়ত্রীছন্দোবদ্ধ ঋক্‌টী বালকের শিক্ষণীয় এবং যে ঋক্‌টী বিদ্যার্জ্জনে মাণবকের সহায়ক, সেই ঋক্‌টীই তাহাকে প্রদান করা কর্ত্তব্য; গৃহীত ঋক্‌টী তদুপযোগী বলিয়াই মাণবককে প্রথমেই প্রদত্ত হয়।

প্রাচীনকালে বিদ্যাদাতা গুরুই বালকের উপনয়ন সংস্কার করিয়া গায়ত্রীমন্ত্র প্রদান করিতেন বলিয়া, গায়ত্রী মন্ত্রের নামান্তর গুরুমন্ত্র। বৈদিক যুগে—এমন কি তান্ত্রিক যুগের পূর্ব্বেও লোকে গায়ত্রীকেই গুরুমন্ত্র বলিয়া জানিত। বর্ত্তমানে তন্ত্রসারাদি ও বৈষ্ণবপদ্ধতিতে যে সকল বীজমন্ত্র দৃষ্ট হয়, পুরা

কালে লোকে তাহার নামগন্ধও জানিত না। এক্ষণে হিন্দুগণের সমূহের মিল, সুতরাং গুরুমন্ত্রের গুরুত্ব হৃদয়ঙ্গম করা তাঁহাদের পক্ষে গুরুতর ব্যাপার।

গুরুমন্ত্র গায়ত্রীর আর একটী নাম সাবিত্রী; কারণ ঐ মন্ত্রের দেবতা সবিতা। ছন্দ, দেবতা বা ঋষির নামানুসারেও মন্ত্রের নাম হইয়া থাকে। এস্থলে ছন্দানুসারে গায়ত্রী এবং দেবতানুসারে সাবিত্রী নাম রক্ষিত হইয়াছে। জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে দেবতাটা কি? উত্তর—

"যা, তেনোচ্যতে সা দেবতা" ইতি যাস্কাচার্য্য। মন্ত্র'পিত বিষয়ই মন্ত্রের দেবতা; অত্র সবিতা জগতঃ প্রসবিতা জনয়িতেশ্বরো দেবতা অস্যা ইতি সাবিত্রী। এই বিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উৎপাদক ঈশ্বরের নাম সবিতা এবং তৎসম্বন্ধীয় ঋক্ বলিয়া ইহার নাম সাবিত্রী হইয়াছে।

এক্ষণে ঐতরেয় নামক সুপ্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ গ্রন্থ হইতে "সৌপর্ণ্য" নামক একটী গায়ত্রী আখ্যান পাঠককুলের অবগতির জন্য উদ্ধৃত হইল,—

সোমো বৈ রাজা·····আচক্ষতে। ৩য় পঞ্চিকা। ২।১ ॥

পরলোকে সোমরাজ থাকিতেন, দেব ও ঋষিগণ তাঁহার স্মরণ করিলেন, এবং কিরূপে সেই সোমরাজ তাঁহাদিগের নিকটে আসিবেন, এ বিষয়ে বিচার করিতে করিতে বৈদিক ছন্দ সকলকে আহ্বানপূর্ব্বক বলিলেন—"আপনারা সোমরাজকে আমাদের নিকট আনয়ন করুন"। তাহারা "তথাস্তু" বলিয়া যথাক্রমে সুপর্ণ (দিব্যপক্ষযুক্ত) হইয়া উপরে চলিল, কিন্তু জগতী প্রভৃতি কোন ছন্দই সোমরাজকে আনয়ন করিতে সমর্থ হয় নাই। ছন্দগুলি সুপর্ণ হইয়া উপরে গিয়াছিল বলিয়া, এই গল্পের নাম "সৌপর্ণ্য" হইয়াছে।

"তে দেবা অব্রুবন্······সোমং রাজানং সমগৃহ্ণাৎ" ৷৩৷৫৷২ ॥

জগতী প্রভৃতি ছন্দগুলিকে অপারগ দর্শনে দেব ও ঋষিগণ গায়ত্রীছন্দকে বলিলেন—"আপনি সোমরাজকে আমাদিগের নিকটস্থ করুন"। তখন গায়ত্রী "এবমস্তু" বলিয়া কহিলেন—"আপনারা আমাকে সমগ্র স্বস্ত্যয়ন দ্বারা অনুমন্ত্রণ করুন।" তাঁহারা তাহাই স্বীকার করিলেন, এবং গায়ত্রী উপরে উড়িয়া চলিলেন। দেব ও ঋষিগণ তৎকালে তাঁহাকে "প্র—চ—চ" এইরূপ স্বস্ত্যয়ন দ্বারা অনুমন্ত্রণ করিতে লাগিলেন। প্র—প্রকৃষ্টরূপে, চ—পুনঃ পুনঃ; প্রকৃষ্টরূপে বার বার ঈশ্বর স্মরণের নাম "প্র—চ—চ।" অনন্তর গায়ত্রী তথায় গমনপূর্ব্বক সোমরাজকে ভয় প্রদর্শন করিয়া চরণ ও মুখদ্বারা তাঁহাকে ধরিলেন এবং দেব ও ঋষিবৃন্দকে প্রদান করিলেন।

ইহা রূপক বর্ণনামাত্র; সোমরাজ—ঈশ্বর; গায়ত্রীর চরণ "তৎসবিতুঃ",—১ম চরণ; "ভর্গোদেবস্য"—২য় চরণ; "ধিয়োযোনঃ"—৩য় চরণ; এবং মুখ—ওঙ্কার। অতএব এই আখ্যায়িকার ভাবমান্ অর্থ এই যে, প্রণব ও গায়ত্রী-সাহায্যেই পরমাত্মার উপাসনা করিলেই তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

বিশ্বামিত্র ঋষি; সবিতা দেবতা, ছন্দঃ—নিচৃদ্গায়ত্রী, ষড়্জঃ স্বরঃ ॥

ওতম্। তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি। ধিয়োযোনঃ প্রচোদয়াৎ। ওম্। ঋগ্বেদে ৩য় মণ্ডলে, ৬২সূক্তে ১০মোমন্ত্রঃ। যজুর্ব্বেদে ৩অধ্যায়ে ৩৫শতমন্ত্রঃ ॥ ২২শো২ধ্যায়ে ৯মোমন্ত্রঃ ॥ ৩০শোঽধ্যায়ে ২য়োমন্ত্রঃ—ঋষিঃ—নারায়ণঃ ॥

ওতম্। ভূর্ভুবঃ স্বঃ। তৎসবি-

ভূর্ব্বরেণ্যং ইত্যাদি। যজুর্ব্বেদে ৩৬শো-হধ্যায়ে ৩য়ো মন্ত্রঃ। সামবেদেও ঋগ্বেদের মত মন্ত্রটী আছে, উত্তরার্চিক অ ১৩, প্র ৬, খ ১০, ম ১ দ্রষ্টব্য। উপাসনার সময় মন্ত্রটী এইরূপে ব্যবহৃত হয়ঃ—

ওঁম্। ভূর্ভুবঃ স্বঃ॥ তৎসবিতুর্বরেণ্যং। ভর্গো দেবস্যধীমহি॥ ধিয়ো যোনঃ প্রচোদয়াৎ। ওম্॥

বেদ ঈশ্বরের বাক্য, সুতরাং এই মন্ত্রটীও ঈশ্বরবাক্য। এই বাক্যের প্রণেতা মানব নহে। এই মন্ত্রের ঋষি অর্থাৎ আদি ব্যাখ্যাকর্ত্তা ও আদি অর্থপ্রত্যক্ষকর্ত্তার নাম ব্রহ্মর্ষি বিশ্বামিত্র।* আজকাল যেরূপ গ্রন্থের টীকা ও ব্যাখ্যাকার আছেন, প্রাচীন কালেও তদ্রূপ ছিল। কারণ ব্যাখ্যাকর্ত্তা না হইলে গ্রন্থ সর্ব্বসাধারণে বুঝিতে পারে না। এখন যেমন মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের সহিত দুর্গাদাসাদির ও কালিদাসের কাব্যের সহিত মল্লীনাথের নামোল্লিখিত হয়, বেদমন্ত্রের সহিতও তদ্রূপ "ঋষির" উল্লেখ করা হয়। তবে বেদমন্ত্রের ঋষি ও সাধারণ ব্যাখ্যাকারের কিছু প্রভেদ আছে, এই ভেদের জন্যই মন্ত্রব্যাখ্যাতাকে "ঋষি" নাম দেওয়া হইয়াছে।

কর্ম্ম ও জ্ঞানের মিলন হইলে তবেই মন্ত্রের ঋষিত্ব হয় এবং কেবল মাত্র জ্ঞান হইলেই সাধারণ ব্যাখ্যাকার হওয়া যায়। ঋষির জ্ঞান প্রত্যক্ষীকৃত এবং টীকাকারের জ্ঞান অপ্রত্যক্ষ। যেমন মনে করুন—"ঈশ্বর নিরাকার" এই কথা যদি একজন মহামূর্খ উচ্চারণ করে, তবে তাহার, ঈশ্বরের নিরাকারত্ব বিষয়ে যে জ্ঞান, তাহাই সাধারণ ব্যাখ্যাতার ব্যাখ্যার তুল্য; এবং ঈশ্বরপরায়ণ বিদ্বানের, ঈশ্বরের নিরাকারত্ব বিষয়ক যে জ্ঞান, তাহাই ঋষিকৃত ব্যাখ্যা তুল্য। যজ্ঞ ও সূত্রবর্ত্তী প্রভেদবোধ যেরূপ, সাধারণ ব্যাখ্যাতা ও ঋষিতে প্রভেদ ঠিক সেইরূপ। দুঃখের বিষয় আমাদের আর্য্যসন্তানের কেহ কেহ ঋষিকে মন্ত্রের নির্ম্মাতা মনে করেন, বেদ বিষয়ে অজ্ঞানই যে তাহার বীজ তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যাহারা ইতিহাস (মহাভারত রামায়ণ) ধর্ম্মশাস্ত্র (স্মৃতি) বেদান্ত (উপনিষদ্, ব্রাহ্মণ), দর্শন (সাংখ্য, বৈশেষিক, যোগ, মীমাংসা, ন্যায়, বেদান্ত) শাস্ত্র যথারীতি পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা বেদকে মনুষ্য-রচিত বলিতে পারিবেন না। যাহা হউক সে বিষয়ে বিশদরূপে বলা এখানে অনাবশ্যক। প্রতি মন্ত্রের উপরে ঋষির নাম থাকার তাৎপর্য্য এই যে—যাঁহারা বেদপাঠ করিবেন, তাঁহারা উক্ত ঋষির ব্যাখ্যান অবলম্বন করিয়া সহজেই পাঠ্য বিষয় বুঝিতে পারিবেন। বেদে বহু মন্ত্র আছে, সকল গুলির ব্যাখ্যা করা কোনও এক ব্যক্তির কার্য্য নহে, এই জন্য এক এক ঋষি কতকগুলি মাত্র মন্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। এইরূপে যিনি যে মন্ত্রের ব্যাখ্যান করিয়াছেন, তাঁহারই নাম সেই মন্ত্রের উপরে গ্রন্থাদিতে পাঠকের সুবিধার জন্য লিখিত হইয়াছে। সুতরাং এখানেও বিশ্বামিত্রের নাম লিখিত আছে। দুঃখের বিষয় রাষ্ট্র ও ধর্ম্মবিপ্লবের জন্য বিশ্বামিত্রাদির বেদব্যাখ্যান আর এখন পাওয়া যায় না। বৌদ্ধ ও মুসলমানগণ, হিন্দুগণের গ্রন্থ স্তূপাকার করিয়া ভস্মীভূত করিয়াছেন। যে সকল গ্রন্থের রক্ষণ যোগী সন্ন্যাসীগণ পর্ব্বত-গুহাদিতে করিয়াছিলেন ও তাঁহাদের প্রচার বহুল ছিল, সেইগুলিই এখনও পাওয়া যাইতেছে। যুদ্ধ, অগ্নি, বিদ্যুৎ, ভূগোল, খগোল, গণিত, উদ্ভিদ, প্রাণী, ভূগর্ভ, পূর্ত্ত ইত্যাদি বিষয়ক গ্রন্থ প্রায় পাওয়া

* ইনি রামচন্দ্রের সমসাময়িক মহেন।

যায় না। যদি বর্ণিকৃত ব্যাখ্যান পাওয়া যাইত, তবে সে শব্দ অসঙ্গতি ঘটিত না।

এই মন্ত্রের দেবতা অর্থাৎ বর্ণিত বিষয় "সবিতা"; ব্রহ্মর্ষি বিশ্বামিত্র এইরূপ নির্ণয় করিয়াছেন। বঙ্গভাষায় যেরূপ পয়ারাদি ছন্দ আছে সংস্কৃতেও তদ্রূপ গায়ত্রী আদি ছন্দ আছে; এই মন্ত্রের ছন্দঃ—"নিচৃদ্-গায়ত্রী"; স্বর—অর্থাৎ উচ্চারণ রীতি—ষড়্জঃ। যে শব্দ উচ্চারণ করিতে হইলে নাসা, কণ্ঠঃ, উরঃ, তালু, জিহ্বা ও দন্ত এই ছয়টীর সাহায্য দরকার হয়, তাহাই ষড়্জ নামে খ্যাত। ষড়্জ স্বরিত হইতে জাত। (নারদীশিক্ষা—৮।৮)

ওতম্ এস্থলে সংক্ষেপে ইহার অর্থ করা যাইতেছে;—অ+উ+ম্=ওম্; আদিতে উচ্চারণ করিবার সময় প্লুত হয় বলিয়া "ও" এবং "ম" ইহাদের মধ্যে "৩" লিখিত হইয়াছে; উহা প্লুতস্বরজ্ঞাপক চিহ্নবিশেষ; ১-২-৩ উচ্চারণ করিতে যত সময় লাগে প্লুতের উচ্চারণেও তত সময় লাগে। বাক্যের শেষস্থ ওঁকার প্লুত না হইয়া 'ওম্' এইরূপ হয় বলিয়া মন্ত্রটীর আদি ও অন্তে উক্তরূপ লিখিত হইল। অ=বিরাট, অগ্নিঃ, বিশ্বঃ। বিরাট যিনি বিবিধ জগৎ প্রকাশ করেন। অগ্নিঃ যিনি জ্ঞানস্বরূপ ও সর্ব্বত্র প্রাপ্ত; বিশ্বঃ—যাহাতে সর্ব্বজগৎ অবস্থিত এবং যিনি সর্ব্বজগতে স্থিত। উ=হিরণ্যগর্ভ, বায়ু, তৈজস। হিরণ্যগর্ভ=যাহার গর্ভে সূর্য্যাদি তেজোময় পদার্থ স্থিত এবং সূর্য্যাদি তেজোময় পদার্থের যিনি ব্যাপক; বায়ু—যিনি অনন্ত বলবান ও সকলের ধারণকর্ত্তা; তৈজস—যিনি প্রকাশ স্বরূপ ও সকল জগতের প্রকাশক। ম—ঈশ্বর, আদিত্য প্রাজ্ঞ। ঈশ্বর যিনি সর্ব্বজগতের উৎপাদক, সর্ব্বশক্তিমান্ স্বামী ও ন্যায়ালু; আদিত্য—নাশরহিত, প্রাজ্ঞ—যিনি জ্ঞান-স্বরূপ ও সর্ব্বজ্ঞ। উপনিষদ্ ও স্মৃতিতে উহার এইরূপ অর্থই আছে। (ক্রমশঃ)

শ্রীসিদ্ধেশ্বর বাৎস্য বেদার্থী।

আহার-রহস্য *

আহার কথার প্রয়োজন।

যাহা না থাকিলে কিছু থাকে না, তাহার আলোচনার প্রয়োজন অনুভবে না আসিলে কাতর কথা। চরক বলিয়াছেন—

সর্ব্বমন্যৎ পরিত্যজ্য শরীরমনুপালয়েৎ
তদভাবে হি ভাবানাং সর্ব্বাভাবঃ শরীরিণাম্।

সব ছাড়িয়া শরীরের অনুপালন করিতে হইবে। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ যাহা কিছু—শরীর না থাকিলে সম্পাদিত হয় না। এই শরীর পালনে যুক্তিযুক্ত আহার, নিদ্রা ও

---

* রাজবাটীতে আহারের সংবাদে অনেকেই অনেক আশাতে আসিয়াছেন, ভাণ্ডারে সম্ভারও প্রচুর বটে কিন্তু পরিবেষ্টার দোষে অনেককেই হয়তো বঞ্চিত থাকিতে বঞ্চিত হইতে হইবে। এটুকু অগ্রে বলার প্রয়োজন এই যে "মধুরেণ সমাপয়েৎ" মনে করিয়া অনেকে হয়তো শেষের অপেক্ষা করিতে পারেন, তাহা হইলে কিন্তু পরিণামে তাঁহাকে অনুতপ্ত হইতে হইবে। এই জন্য আমার সবিনয় প্রার্থনা যদি কিছু এবং যাহা কিছু অদৃষ্টে ঘটে প্রথম হইতেই সেটুকু সংগ্রহ করিবেন। রাজবাটীর ভাণ্ডার বলিতে রূপকভাবে কেহ কেহ যদি সনাতন শাস্ত্র মনে করেন, তাহাতে আমার বিশেষ আপত্তি নাই, আমি শাস্ত্র হইতেই কিছু কিছু লইয়া বিলি করিতেছি মাত্র। পাক ঠিক হইলেও যেমন পাতে পাতে লবণ দেওয়ার প্রথা আছে, পান দিলেই একটু অতিরিক্ত চুণ দিতে হয়, আমিও শাস্ত্রাতিরিক্ত যাহা বলিয়াছি, পাশ্চাত্য জগতের রসায়নে ভিন্নরুচি জনের রুচি সম্পাদনার্থ মাত্র।

সাহিত্য-সভার অধিবেশনে পঠিত।

ব্রহ্মচর্য্য এই তিনটি প্রধান উপায়। গৃহধারণে স্তম্ভ যেমন, শরীরধারণে এই তিনটী তেমনই প্রয়োজনীয়। বাগ্‌ভটে উক্ত হইয়াছে—"আহারশয়নব্রহ্মচর্য্যৈঃ যুক্ত্যা প্রয়োজিতৈঃ। শরীরং ধার্য্যতে নিত্যমাগার ইব ধারণৈঃ॥" স্তম্ভ যেমন গৃহকে ধারণ করিয়া থাকে (পড়িতে দেয় না), যুক্তিযুক্ত আহার, নিদ্রা, ব্রহ্মচর্য্যও সেইরূপ শরীরকে ধারণ করিয়া থাকে, (অযথা ক্ষয়ের পথে যাইতে দেয় না।) এই তিনের মধ্যে আবার আহারই প্রধান। সুশ্রুত বলিয়াছেন—"প্রাণিনাং পুনর্মূলমাহারঃ।" প্রাণিনাং এই বহুবচন প্রাণীমাত্রবোধক, পুনঃ শব্দ নিশ্চয়ার্থক;—অর্থাৎ আহারই প্রাণীমাত্রের (কেবল মনুষ্যের নহে) মূল। শাস্ত্রান্তরেও এ কথা পুনঃপুনঃ কথিত হইয়াছে—যথা ছান্দগ্যোপনিষদে—"তস্য ক্ব মূলং স্যাদন্যত্রান্নাৎ।" তৈত্তিরিয়ও কহিয়াছেন—"অন্নং ব্রহ্মেতি ব্যজানৎ অন্নাদেবহি খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, অন্নেন জাতানি জীবন্তি।" অন্ন ব্রহ্মরূপে বিজ্ঞাত। অন্ন হইতেই এই সকল ভূত জন্মে এবং জন্মিয়া অন্নের দ্বারাই বাঁচিয়া থাকে।

যখন অন্ন ব্রহ্ম বলিয়া ভারতে উপাসিত হইতেন, তখন তাহার স্বাস্থ্য-সুখ-সমৃদ্ধি অতুলনীয় ছিল। বর্ত্তমানে আহারের প্রয়োজন বিষয়ে জনে জনে মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। এখন অনেকেই রসনার পরিতৃপ্তিই আহারের প্রয়োজন মনে করেন। পোলাও, কালিয়া, কাবাব, কোপ্তা, কোর্ম্মাই ইঁহাদের নিকট প্রধান আহার্য্য বলিয়া গণ্য। "ইন্দ্রিয়প্রীতিজননং বৃথা পাকং বিবর্জ্জয়েৎ"—যে দেশের সম্প্রদায়-মুখ্যেরা বলিয়া গিয়াছেন, সে দেশ হইতে এ মতের প্রবর্ত্তন হয় নাই। এই দলেরই কথা "পরান্নং প্রাপ্য দুর্ব্বুদ্ধে মা শরীরে দয়াং কুরু। পরান্নং দুর্ল্লভং লোকে শরীরং জন্মজন্মনি।" অর্থাৎ "নিমন্ত্রিত হইয়াই হোক, অনাহুত হইয়াই হোক বা বরাহুত হইয়াই হোক, পরান্ন পাইলে শরীরের দিকে দৃষ্টি করিবে না, যেহেতু পরান্ন দুর্ল্লভ, শরীর তো জন্মে জন্মেই হইবে।" এমত কেহ কেহ আছেন, যাঁহারা অধিক পরিমাণে শারীরিক বলসঞ্চয়ই আহারের একমাত্র উদ্দেশ্য মনে করিয়া থাকেন। গোমাংসাদি, শারীর-বলের সাধন বটে কিন্তু সব সময়ে ও সব দেশে তাহা বলোৎপাদনের অনুকূল কি প্রতিকূল তাহার বিচার করিয়া লইতে হয়। আরও এ দেশের মনীষিসম্প্রদায় অনেক সময়ে শরীর বলিলে এতটা বুঝিতেন যে "কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি খলু পঞ্চ তথা পরাণি, জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি মন আদি চতুষ্টয়ঞ্চ প্রাণাদি পঞ্চকমথো বিয়দাদিকঞ্চ, কামশ্চ কর্ম্মচ তমঃ পুনরষ্টমী পুঃ।" অর্থাৎ কর্ম্মেন্দ্রিয় পাঁচ, জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচ, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত, প্রাণাদি পাঁচ, আকাশাদি পাঁচ আর কাম কর্ম্ম অবিদ্যা। সুতরাং আহারাদি দ্বারা কেবল রস-রক্তাদির পুষ্টিই তাঁহারা দেখিতেন না, কেবল বল বর্ণ সম্পাদন তাঁহারা বুঝিতেন না, তাঁহাদের আরও উচ্চ লক্ষ্য ছিল—সত্ত্বোদ্রেক। আবার আর এক দল আছেন, যাঁহারা মনে করেন মুহূর্ত্তে যাহা মূত্র পুরীষে পরিণত হইবে, তাহার জন্য এত ব্যয়—এত আয়াস স্বীকার অর্ব্বাচীনতা। ইহা যে কেবল মূত্র পুরীষে পরিণত হয় না, বহু অংশই ধাতুতে পরিণত হয়, এ কথাটা তাঁহারা বোধ হয় ভুলিয়া যান। অনাহারের দিকে ইঁহাদের আসক্তি অত্যধিক।

চরক বলিয়াছেন—

"নাভোজনেন কায়াগ্নির্দীপ্যতে নাতিভোজনাৎ
যথা নিরিন্ধনো বহ্নিনাল্পোবাতীন্ধনাবৃতঃ।"

না খাইলেও অগ্নির দীপ্তি হয় না, অধিক খাইলেও হয় না। আগুণে একেবারে কাঠ না থাকিলেও জলে না এবং অল্প আগুণে প্রচুর কাঠ নিঃক্ষেপ করিলেও জলে না। এই স্থানে গীতার উপদেশ তাঁহাদের স্মরণ করা উচিত—কর্ষয়ন্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামসচেতনঃ। মাঞ্চৈবান্তঃ শরীরস্থং তান্বিদ্ধ্যাসুরনিশ্চয়ান॥ কেহ কেহ পাশ্চত্য অনুকরণেই আহারের প্রয়োজন সিদ্ধি করিয়া থাকেন। পাশ্চাত্যেরা যেরূপ ভাবে আহারের আয়োজন করিয়া থাকেন অবিতর্কিতভাবে ইঁহারা তাহারই অনুষ্ঠান করিয়া চরিতার্থ হয়েন। "নদেবং চরিতঞ্চরেৎ" এ কথাটা তাঁহাদের স্মরণেই আসে না। পাশ্চাত্যের আকৃতি, তাহাদের প্রকৃতি, তাহাদের দেশ, আহারানুষ্ঠানে ইহা অবশ্য অনুসন্ধেয়। এই সকল মতভেদের মূল অনুসন্ধান করিলে পাওয়া যায় অনুরাগের বশবর্ত্তিতা এবং না জানিয়া শুনিয়া খাওয়া। ন্যায়কুসুমাঞ্জলি গ্রন্থে আচার্য্যপ্রবর শ্রীমদুদয়ন বলিয়াছেন "ভক্ষ্যাদ্যনিয়মইতিরাগেণঃ।" যাহারা অনুরাগের বশে খায় তাহাদের ভক্ষ্যাভক্ষ্যের নিয়ম নাই। চরক বলিয়াছেন—"ন রাগান্নাপ্যবিজ্ঞানাদাহারমুপযোজয়েৎ পরীক্ষ্য হিতমশ্নীয়াদ্দেহোহ্যাহারসম্ভবঃ।" অনুরাগ-বশে আহার করিতে নাই, না জানিয়াও আহার করিতে নাই, পরীক্ষা করিয়া হিতভোজন করিতে হয়। কেন খাইতে হয়, কি খাইতে হয়, কেমন করিয়া খাইতে হয়, সকলই জানিয়া খাওয়া উচিত, কেন না আহার হইতেই দেহের উৎপত্তি। সুতরাং আহার রহস্য আলোচ্য এপক্ষে বোধ হয় বিসম্বাদ নাই।

একে আমার ন্যায় অযোগ্যের হস্তে ভার, তাহাতে আবার অল্প কয়েক দিন পূর্ব্বে প্রবন্ধ লিখিবার নিশ্চয় সংবাদ অবগত হওয়ায় এবং সেই কয় দিনের মধ্যে আবার বহু সময়েই আমাকে কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত থাকিতে হওয়ায় এ বিষয়ে ভাল করিয়া পর্য্যালোচনা করিবার অবসর পাই নাই। বিষয় জটিল। সুতরাং এ প্রবন্ধে নানা ত্রুটী থাকিবে ইহা কিছুমাত্র বিচিত্র নহে। পরিণামে যোগ্য ব্যক্তির দ্বারা এ সকল সংশোধিত হইবে এরূপ আশা আমার আছে। এ নিবন্ধের অন্তর্গত আহারের প্রয়োজন প্রভৃতি প্রত্যেক বিষয়ই বিস্তৃতরূপে আলোচ্য। এই সকল প্রাচীন মতের সহিত বর্ত্তমান প্রচলিত অভিনব মতের অনেক স্থানেই বিরোধ দেখিতে পাওয়া যায়। এ সকল বিরোধ অবশ্য মীমাংস্য কিন্তু তাহা এক দিনের কায নহে। এই সভায় উপস্থিত আমার অনুগ্রাহকবর্গ যাঁহারা আমার ন্যায় ক্ষুদ্রের কথা উপেক্ষা না করিয়া শুনিবার জন্য এত আয়াস স্বীকারে প্রস্তুত হইয়াছেন, তাঁহাদের নিকট আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি এবং আমার প্রবন্ধের ন্যূনতা জন্য ত্রুটী স্বীকার করিতেছি।

আহারের স্বরূপ।

ক্ষুন্নিবৃত্তি, তৃপ্তি ও পোষণের জন্য যাহা গলাধঃকরণ করা যায়, তাহাই আহার। কেবল মাত্র পোষণের জন্য গলাধঃকরণ বলিলে ঔষধও আহার হইয়া পড়ে, কাজেই ক্ষুন্নিবৃত্তি ও তৃপ্তি বলিতে হয়। পুরীষ ভক্ষণ করিয়া মত্তোন্মত্ত ব্যক্তি ক্ষুন্নিবৃত্তি ও তৃপ্তি সম্পাদন করে, তাহা পোষণানুকূল নহে বলিয়া আহার নহে। অনেক সময়েই এমন হয়, মুখ-গহ্বরে সহসা কীট প্রবিষ্ট হইলে গিলিতে হয়, তাহা গলাধঃকরণ হইলেও ক্ষুন্নিবৃত্তি তৃপ্তি ও পোষণের অনুকূল নহে বলিয়া আহার নহে। হিতাহার অর্থেই

এস্থলে আহার শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। শাস্ত্রেও অনেক সময় এইরূপই দৃষ্ট হইয়া থাকে। সুশ্রুতের সুশ্রুতার্থ-সন্দীপন-ভাষ্যে এই মতই সমর্থিত হইয়াছে, যথা—"আয়ুর্ব্বেদে হি মুখ্যয়াবৃত্ত্যা হিত সমাখ্যাতে চান্নপানাদৌ যথাহ্যক্তে স্নানাচমনাদৌ চাহারাচার শব্দৌ প্রবর্ত্তেতে, ইতরএতু ভক্ত্যা।" হিতাহারেই আহার পদের শক্তি অন্যত্র লক্ষণা। গলাধঃকরণ ভিন্নও আহার পদের প্রয়োগ পরিদৃষ্ট হয় যেমন "ধাতবোহি ধাত্বাহারাঃ।" রক্তাদি ধাতু. স্বপূর্ব্বধাতু অর্থাৎ রসাদি ধাতু আহার করিয়া থাকে। "ভুবনজ্ঞানং সূর্য্যে সংযমাৎ" এই পাতঞ্জল সূত্রের ভাষ্যে ভগবান ব্যাস বলিয়াছেন—"সর্ব্বেতে (ব্রহ্মাদয়ঃ) ধ্যানাহারাঃ।" ধ্যান অবশ্যই গলাধঃ করণানুকূল ব্যাপারে সম্ভব নহে।

আহার চতুর্ব্বিধ ;—অশিত, পীত, খাদিত, লীঢ়। যথা চরকে—

"নাভিস্তনান্তরং জন্তোরামাশয় ইতিস্মৃতঃ
অশিতং খাদিতং পীতং লীঢ়ঞ্চাত্র বিপচ্যতে॥"

যাহা চিবাইয়া খাইতে হয়, তাহা অশিত। তাহা কঠিন দ্রব্য তণ্ডুলাদি। না চিবাইয়া কেবল তালুযোগে যাহা গলাধঃকরণ করিতে হয় তাহা পীত,—দ্রব বস্তু জলাদি। জিহ্বার দ্বারা আকর্ষণ ও আস্বাদ গ্রহণ করিয়া যাহা খাইতে হয় তাহা লীঢ়,—মধু প্রভৃতি। অবশিষ্ট যাহা চুষিয়া খাইতে হয়, তাহা খাদিত, ইক্ষ্বাদি।

এইরূপ অর্থের ব্যভিচারও বিরল নহে।

আহারের প্রয়োজন।

সকল বিষয়েই লৌকিক পরীক্ষক ভেদে প্রয়োজনের ভেদ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।
"তত্রাহ সুখ সংজ্ঞেষু ভাবেষজ্ঞো বিরজ্যতে,
রজ্যতে ন তু বিজ্ঞাতা বিজ্ঞানেষ্বহলী কৃতে।"
আপততঃ যাহা শুভকর, অজ্ঞ তাহা পাইলেই শান্ত হয়। বিজ্ঞ তাহাতেই পরিতৃপ্ত হয়েন না, তিনি পরিণামের অনুসন্ধান করেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—

"ন রাগান্নাপ্যবিজ্ঞানাদাহারমুপযোজয়েৎ।"

প্রসক্তো হি প্রতিষিধ্যতে—যাহার প্রসক্তি আছে তাহারই নিষেধ হয়। আহারে অনুরাগও আছে, গুণাগুণ অনেকের জানাও নাই,—তাই ঋষি নিষেধ করিয়াছেন—অনুরাগের বশে ও অজ্ঞানের বশে আহার করিতে নাই। লৌকিক অনুরাগের বশে আহার করে—সুতরাং তাহারা আহারের প্রয়োজন দেখে ক্ষুন্নিবৃত্তি ও তৃপ্তি। পরীক্ষক দেখেন শরীর আহার চাহিতেছে, ক্ষুধা তাহার অনুমাপক মাত্র ;—শরীর আর আহার চাহে না, তৃপ্তি তাহারই অনুমাপক মাত্র। তার পর পরীক্ষান্তে পরীক্ষক দেখেন—আহারের প্রয়োজন—শরীরের পুষ্টি, বল এবং সুখায়ুঃ। নিখিল আয়ুস্তন্ত্রে আহারের এই প্রয়োজন স্বীকৃত হইয়াছে।

সুশ্রুত বলেন—আহারাদেবাতিবৃদ্ধির্ব্বলমিন্দ্রিয় প্রসাদশ্চ।

চরক বলেন "কেবলং শরীরং বলবর্ণ, সুখায়ুষা যোজয়তি"—আহার, শরীরকে পোষণ ও বল-বর্ণ-সুখায়ুতে উপযোজিত করে। কথা একই।

ছান্দোগ্যোপনিষদে একটী উপাখ্যান আছে। গুরু শিষ্যকে বলিলেন—বৎস, উপবাস কর। শিষ্য তাহাই করিলে কয়েকদিন পর শিষ্য জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিলেন, গুরো! আমি আপনাকে ভিন্ন কিছুই দেখিতে পাইতেছি না। আরও উপবাসে অনুজ্ঞাত হইলে, পরে গুরু কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া অতি কষ্টে শিষ্য বলিলেন, আমি আর কিছুই দেখিতে পাইতেছি না। তখন গুরু কিঞ্চিৎ আহার করাইলেন। আবার দেখা শুনা চলাফেরা সব চলিতে লাগিল। গুরু বুঝাইলেন

আহারই সকলের মূল। এই গল্পটীতে আহারের প্রয়োজন সুন্দর বুঝা যায়।

দুর্ভিক্ষে না খাইতে পাইয়া অসংখ্য মৃত্যু প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। না খাইতে পাইলে মানুষ মরে, খাইতে পাইলে মানুষ বাঁচে, ইহা নিত্য প্রত্যক্ষের বিষয়। কেন এমন হয়? বল, পুষ্টি যাহা কিছু শরীরের সঙ্গে সঙ্গে জন্মে. শরীর থাকিতেও তাহা যায় কেন? ইহা বুঝিলে আহারের প্রয়োজন ভাল করিয়া বুঝা যাইবে; তাহা বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক।—শৃ ধাতুর উত্তর ঈরণ প্রত্যয় করিয়া শরীর পদ নিষ্পন্ন; যাহা শীর্ণ হয়—ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, তাহাই শরীর। বাক্ বুদ্ধি শরীরারম্ভ অর্থাৎ শরীরের মনের ও কথার কায এবং শ্বাস প্রশ্বাস যাহাকে শাস্ত্রে প্রবৃত্তি ও জীবন যোনি বলে, তাহা শরীরে সর্ব্বদাই সংসাধিত হইতেছে। কায করিলেই ক্ষয় অবশ্যম্ভাবী এই জন্যই ব্যায়াম ক্ষয়ের এবং ক্রিয়াতিযোগ অতি কৃশতার হেতুরূপে উক্ত হইয়াছে, আহার এই ক্ষয় পূরণ করে। এস্থলে আরও একটু বিবেচ্য আছে,—জগতের কার্য্য কারণ ভাব সম্বন্ধ লইয়া দেখিলে সর্ব্বদা এবং সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায় ক্ষয় মাত্রেই অগ্নির সহায়তা আছে। এক কড়া জল আগুণে ফুটাইতে ফুটাইতে নিঃশেষে ক্ষয় প্রাপ্ত হয় ইহা সকলেই দেখিয়াছেন। শরীর ব্যাপিয়া অগ্নি শরীরের নিত্যক্ষয় সংসাধন করিতেছে, আহার এই ক্ষয়ের পূরণ করে। সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র চরক চতুরানন মহামহোপাধ্যায় শ্রীমচ্চক্রপাণি দত্ত বলিয়াছেন."যাগ্নিপাক ক্ষীয়মান ধাতোঃ শরীরস্যাশিতাদিনা উপচয়াদি যোজনং উপপন্নং যদি হি পাকক্ষীয়মানং শরীরং ন স্যাৎ তদা স্বতঃসিদ্ধে উপচয়াদৌ কিমশিতাদি কুর্য্যাৎ।" শরীরের ধাতু সকল শরীরের অগ্নি দ্বারা সর্ব্বদাই ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে। অন্নাদি দ্বারা শরীরের সেই ক্ষয়ের পূরণ উপপন্ন হয়, যদি শরীর পাকের দ্বারা ক্ষয় প্রাপ্ত না হইত, তাহা হইলে শরীরের স্বতঃসিদ্ধ উপচয় থাকিয়াই যাইত, সুতরাং অন্নের কোনও প্রয়োজনই হইত না। স্থানান্তরেও বলিয়াছেন "বিশুদ্ধাহারাচারাভ্যাং সদা ক্ষীয়মান শরীর পোষণেন।" সর্ব্বদা ক্ষীয়মান দেহের বিশুদ্ধ আহারাচার দ্বারা পোষণ। এই অগ্নির বৈচিত্র্য এইটুকু যে ইহাতে পাক সমাধা হয়, অথচ পুড়ে না, যেহেতু উহা দ্রবাংশ সম্মিলিত উষ্মস্বরূপ। ইহার নাম পিত্ত, তপতীতি পিত্তং। পিত্ত তাপোৎপাদন করে।

এখন বিশুদ্ধ আহার দ্বারা সদা ক্ষীয়মান শরীরের পোষণ কিরূপে হয় দেখা যাউক—

চেষ্টা, ইন্দ্রিয় এবং অর্থের আশ্রয় শরীর পঞ্চ মহাভূত-বিকারাত্মক, ইহাকে বিশ্লেষণ করিলে রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা, শুক্র, শিরা স্নায়ু, চর্ম্ম প্রভৃতি কতকগুলি ঐ ভূতের বিকৃতি উপলব্ধি হয়। এই গুলিরই ক্ষয় হইতেছে, সুতরাং ঐ গুলির পূরণ আবশ্যক হয়। আহার কিরূপে তাহার পূরণ করে দেখা যাউক।

অনেকেই জানেন, সেপ্‌টিক্ ট্যাঙ্কে যতকিছু মল সর্ব্বকলুষনিবারিণী সুরধুনী-বক্ষে জল হইয়া মিশিয়া যায়, ইহা পাকক্রিয়া-নিষ্পন্ন। এমন কঠিন আহার ভাঙ্গিয়া চুরিয়া রসে পরিণত হয় ইহাও পাকক্রিয়া-নিষ্পন্ন। উষ্মা বায়ু ক্লেদ স্নেহ কাল আর সমযোগ এই পরিণতি সম্পাদন করে। প্রথমতঃ অন্ন-মুখ-গহ্বরে প্রবিষ্ট হইলেই রসনা কোন্‌টী লইতে হইবে বা না হইবে, রসবোধন দ্বারা তাহা বুঝিয়া দন্তদ্বারা চর্ব্বণ করাইয়া এবং এবং নিজে লালারসে সিক্ত করিয়া ছাড়িয়া

দেয় ; তখন "বায়ুপকর্ষতি," বায়ু অন্নবহ স্রোত দ্বারা দূরে আমাশয় কোষ্ঠে লইয়া গিয়া ছাড়িয়া দেয়, এই বায়ুর নাম প্রাণ বায়ু। দাঁত চিবাইয়া ভাজিয়া চূরিয়া দিয়াছে বটে কিন্তু অবয়বের সংঘাত সম্যক ভাঙ্গে নাই—এখনও যেন কিছু কিছু গোটা আছে। এমন অবস্থায় আমাশয়ে অন্ন যাইবামাত্র এক বিশিষ্টধর্ম্মিক দ্রব তথায় পাকক্রিয়ার বিশেষ সাহায্য করে, উহাকে স্নিগ্ধ এবং মৃদু করে, উহার নাম ক্লেদ এবং স্নেহ। "ক্লেদঃ শৈথিল্যমাপাদয়তি স্নেহো মৃদুতাং করোতি।" তন্ত্রান্তরে ইহার নাম ক্লেদনশ্লেষ্মা। নব্যতন্ত্রে ইহাই কি সেপ্টিক জুস?

অগ্নিতো পাকক্রিয়ায় লাগিয়াই আছেন, কিন্তু পাক করিতে করিতে যেন শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন, তখন আবার বায়ু অগ্নিকে উদ্দীপিত করিয়া দেন, এই বায়ুর নাম সমান বায়ু। মুক্তাবলীর বায়ু গ্রন্থে মহাদেব লিখিয়াছেন, "আহারেষু পাকার্থবহ্নেঃ সমুন্নয়াৎ সমানঃ।" উহার ব্যাখ্যাতা রামরুদ্র, সমুন্নয়নের অর্থ উদ্দীপনা বুঝিয়াছেন, তবেই পাচকাগ্নির উদ্দীপনকারী সমান বায়ু।

তার পর "কালঃ পর্য্যাপ্তিমভিনির্ব্বর্ত্তয়তি।" কালপাক নিষ্পত্তি করে। আমাশয় হইতে পচ্যমানাশয়ে—সেখান হইতে পক্কাশয়ে ঘুরিয়া ফিরিয়া নানারূপ ব্যাপারের পর নিশাবসানে আহার ধাতু মলে পরিণত হয়। বালক যেমন কালে বৃদ্ধ হয়, আহার তেমনি কালে রক্ত এবং বিষ্ঠাদিতে পরিণত হয়। দিনের আহার সাধারণতঃ রাত্রিশেষে পরিপাক হয়, এইজন্য নিশাবসানে কথিত হইয়াছে। পরন্তু যে আহার্য্য পরিপাক করিতে যত সময় প্রয়োজন হয় তাহাই তাহার পরিপাক কাল।

সমযোগ।

আহার দ্রব্যের প্রকৃতি করণাদির সমযোগ (যেটী যেমন দরকার সেইটী তেমনি) হইলে তবে আহার রসরক্তে যথাকালে পরিণত হয় এবং তন্নিবন্ধন স্বাস্থ্য রক্ষা হয়। অন্যথা প্রকৃত্যাদির বিরুদ্ধ আহার করিলে প্রকৃত্যাদির দোষে আহার সম্যক পরিপাক পায় না। যেমন মাষকলাএর প্রকৃতি মাষকলাই গুরু, মুগের প্রকৃতি মুগ্ লঘু। অগ্নি আছে বটে কিন্তু তেমন বলবান নহে, এমত অবস্থায় মাষকলাই খাইলে পরিপাক করিতে বিলম্ব হইবে। ব্যাধিও হইতে পারে। পক্ষান্তরে দশক্রোশ রাস্তা হাঁটিয়া ক্ষুধায় প্রাণ অস্থির, চারিটী মুগের ডাল ভিজা খাইলে তখন চলিবে না, তখন গুরুদ্রব্য মাষকলাই ভিজা খাইতে হইবে বা চাল চিবাইতে হইবে। ক্ষুধা কম আছে, কাঁচা চাউল খাইলে পরিপাকের ব্যাঘাত হইবে, কিন্তু আগুণে ভাজিয়া মুড়ি করিয়া খাইলে তাহা অপেক্ষা সহজে পরিপাক হইবে। ইহা করণসাধ্য। করণ অর্থাৎ সংস্কার। এসকল কথা প্রকৃত্যাদি প্রস্তাবে উল্লিখিত হইবে।

শার্ঙ্গধর এই পাকপ্রণালী এইরূপে স্পষ্ট করিয়াছেন—

"ষাত্যামাশয়মাহারঃ পূর্ব্বং প্রাণানিলেরিতঃ
মাধুর্য্যং ফেনভাবঞ্চ ষড়্রসোঽপি লভেত সঃ।
অথ পাচক পিত্তেন বিদগ্ধশ্চাম্লতাং ব্রজেৎ
ততঃ সমান মরুতা গ্রহণীমভিনীয়তে।
গ্রহণ্যাং পচ্যতে কোষ্ঠ বহ্নিনা জায়তে কটুঃ
রসো ভবতি সম্পকাৎ অপকাদামসম্ভবঃ
বহ্নের্ম্মলেন মাধুর্য্যং স্নিগ্ধতাং যাতি তত্র সঃ
পুষ্ণাতি ধাতূনখিলান্ সম্যক্ পক্কোঽমৃতোপমঃ।

আহার প্রাণবায়ু দ্বারা প্রথমে আমাশয়ে যায়। ষড়্রস আহারও তথায় মধুরতা এবং ফেণভাব প্রাপ্ত হয়। যাহাকে চলিত কথায় চিনির পাক বলে। পরে পাচক দ্রব দ্বারা অর্দ্ধপক হইয়া অম্লভাবাপন্ন হয়। পরে

সমান বায়ু দ্বারা গ্রহণীতে (পচ্যমানাশয়ে) যায়। সেখানে কোষ্ঠস্থ অগ্নির দ্বারা পরিপক্ক হইয়া কটুরস হয়; এইরূপে সম্যক পক্ব হইলে রসে পরিণত হয়। অন্ন অপক্ক হইলে আম হয়। সেখানে আবার বহ্নির তেজে মধুর এবং স্নিগ্ধ হইয়া নিখিল ধাতুর পূরণ করে। আর মন্দাগ্নির দ্বারা পরিপক্ক হইলে কটু এবং অম্ল হইয়া বিষভাব পায়। এইরূপে বিশুদ্ধ আহার রক্তাদিতে পরিণত হইয়া সদা ক্ষীয়মাণ শরীরের পোষণ সম্পাদন নিত্যই করিতেছে। ওদিকে শরীরের ধাতুর ক্ষয়ও যেমন ২ চলিতেছে এদিকে বিশুদ্ধ আহার দ্বারা সেই সকল ধাতুর পূরণ ও তেমনি ২ চলিতেছে। সুতরাং শরীর রক্ষাকল্পে আহারের প্রয়োজন সমধিক বুঝা গেল।*

জগতের আদি গ্রন্থ কি?

কোন্ দেশ জগতের মধ্যে আদি সভ্যতম স্থান? জ্ঞানের বাল-সূর্য্য কোথায় সর্ব্বাদৌ আপনার নবীন কিরণচ্ছটা বিকীর্ণ করিতেছিল? কোন্ দেশে সকলের প্রথমে ভাষা ও অক্ষরের সৃষ্টি হইয়া লিখন ও পঠনপাঠনার রীতি প্রবর্ত্তিত হয়? কোন্ গ্রন্থ জগতের আদি গ্রন্থ? ইহা লইয়া আলোচনা করিতে যাইয়া পাশ্চাত্য কোবিদবৃন্দ, অগ্রপশ্চাদ্ ভাবে নানা বিসংবাদপূর্ণ ঐতিহ্যের অবতারণা করিয়া গিয়াছেন ও এখনও অবতারণা করিতেছেন। আমরা এই প্রবন্ধে সেই আদি গ্রন্থসম্বন্ধে দুচার কথা বলিব।

তাঁহারা কেহ বলিয়াছেন, মিশরের মতন প্রাচীনতম সভ্যভূমি এ জগতে আর দ্বিতীয় নাই, উহার বয়ঃক্রম প্রায় ছয়সহস্র বৎসর। বাইবেলের দেশ বাবিলনের কথা লইয়া অনেকে স্পর্দ্ধা করিতেছিলেন, মিশরের পিরামিডের বার্দ্ধক্যসমর্পণে তাঁহারা পরাভব স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু যদি আমরা জগতের মধ্যে দ্বিতীয় প্রাচীনতম ভূমি ভারতের কথাও ভাবিয়া দেখি, তবে তাহার নিকট সার্দ্ধ পঞ্চ সহস্র বৎসরের অর্ব্বাচীন মিশর একটী অপোগণ্ড শিশু বলিয়াই বিবেচিত হইবে। ফলতঃ জগতের মধ্যে ইলাবৃতবর্ষ বা আদি স্বর্গই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনতম সভ্য জনপদ, ঐ স্থানেই জগতের আদি ভাষা গীর্ব্বাণবাণী ও আদি অক্ষর দেবনাগরের সমুদ্ভব হয় এবং এই পবিত্র জনপদে জগতের আদি দেবকবিগণের কোমলকণ্ঠ হইতে যে সকল সাম গীত হইয়া মেরুশিখর মুখরিত করিতেছিল, সেই সকল সামের সমবায়সমুত্থ গ্রন্থবিশেষ অর্থাৎ সর্ব্বদেশীয় মানবজাতির আদি পৈতৃক সম্পৎ সামবেদই জগতের আদি গ্রন্থ।

অবশ্য আমাদিগের এ কথায় পাঠক ও শ্রোতৃবৃন্দ কিংবা সামাজিকগণ চমকিয়া উঠিবেন, এবং আমাকে কলম্বসের ন্যায় বিপ্রলাপী মনে করিয়া উপহাস করিতেও পশ্চাৎপদ হইবেন না। কিন্তু আমরা কি করিব? আমরা প্রমাণের দাস, যখন বেদ ও উপনিষৎকদম্বকই সামবেদের আদিমত্ব বিনির্দ্দেশ করিতে সমগ্রসর, তখন আমরা কিপ্রকারে বেদ না মানিয়া সাধারণ মানুষের কথায় আস্থা সংস্থাপন করিব? ভট্ট মোক্ষমূলর তাঁহার বহু গ্রন্থে ঋগ্বেদকে আদি বেদ ও সামবেদকে So-called বেদ বলিয়া

* শ্রীযুক্ত কবিরাজ শ্যামাদাস বাচস্পতি কর্ত্তৃক সাহিত্যসভার অধিবেশনে পঠিত।

সংহচিত করিয়া গিয়াছেন। কেবল তৎপদ মতবৰ্ত্তী তৎপ্রচেতাঃ নব্য যুবকেরা নহেন পণ্ডিতপ্রবর এবং স্বর্গগত রমেশচন্দ্র দত্ত C. I. E. মহাশয় ও ভারতের ইংরাজী বাঙ্গালা ও মহারাষ্ট্রাদি প্রাদেশিক ভাষার ঐতিহাসিকগণও নানাভাষার ইতিহাসে—

'শুকমুখগলিতা যথা নৃণাং বাণী।'

র ন্যায় মোক্ষমূলরধ্বনির প্রতিধ্বনি করিয়া আমাদিগের কোমলমতি বালক বালিকাগণকে বিশেষতঃ পরপ্রত্যয়নেয় বুদ্ধি যুবকদিগকে উৎপথগামী করিতেছেন দেখিয়া আমরা বাধ্য হইয়া এই নারাজী দরখাস্ত খানা দিয়া রাখিলাম, সম্যগ্দর্শী প্রবীণগণ তথ্যনির্ণয় করিবেন।

মহামতি মোক্ষমূলরের অজুহত কি? তিনি বলিতেছেন যে, "বস্তু লইয়া বিচার করিতে গেলে সামবেদ অতি নগণ্য বস্তু হইয়া পড়ে। কেননা ইহাতে সারগর্ভ জ্ঞানের কথা আদবেই নাই। পক্ষান্তরে ঋগ্বেদ বহু সম্পদ্‌পূর্ণ। তৎপর দেখা যায় যে ঋগ্বেদের কতকগুলি মন্ত্র লইয়াই সামবেদের দেহ প্রতিষ্ঠিত, সুতরাং উহাকে কিছুতেই ঋগ্বেদের পরবর্ত্তী ভিন্ন পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থ বলা যায় না"। ভারতসন্তান দত্তজমহাশয় তাঁহার ঋগ্বেদের ফুটনোটে বলিয়া গিয়াছেন যে—"সায়ণ "স্তোম" অর্থে সামবেদের স্তোত্র ও উকৃথ অর্থে ঋগ্বেদের স্তোত্র ধারণা করিয়াছেন; কিন্তু ঋগ্বেদের এই ঋক্‌গুলি যে কালে রচিত হয়, তখন সামবেদ বা অন্য কোনও বেদ রচিত হয় নাই। সুতরাং ঋগ্রচয়িতা ঋষিরা সামবেদের কথা কিরূপে বলিবেন? ঋগ্বেদের মন্ত্র রচিত হইলে পর সেই ঋক্ ভাঙ্গিয়া ও রূপান্তরিত করিয়া অন্যান্য বেদ রচিত হয়। ঋগ্বেদে অন্য বেদের মন্ত্র দেখা যায় না, সাম ও যজুর্ব্বেদে ঋগ্বেদের মন্ত্রই অনেক। ১৩ পৃষ্ঠা।

সামবেদের তৃতীয়াংশ এই ঋগ্বেদের নবম মণ্ডলহইতে গৃহীত"। ১২৪৭ পৃষ্ঠা, দত্তজ ঋগ্বেদ।

আমরা ইহার একটী কথাও তথ্যবাহিনী বলিয়া স্বীকার করিতে পারিলাম না। অবশ্য কতকগুলি মন্ত্র সাম, ঋক্, যজুঃ ও অথর্ববেদে সাধারণ। কিন্তু তাহাতেই কেহ এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবেন না যে, ঐ মন্ত্রগুলি ঋগ্বেদের আদি সম্পৎ, অন্যান্য বেদসমূহ উহা হইতে ঋক্ গ্রহণ করিয়াছেন। ফলতঃ ঐ মন্ত্রগুলি সামবেদেরই পরমার্থতঃ আদি সম্পৎ। আমরা মানবের আদি জন্মভূমি ইলাবৃত বর্ষ বা আদি স্বর্গ মঙ্গলিয়া হইতে ভারতাদি যে যে স্থানে আসিয়া উপনিবিষ্ট হইয়াছিলাম, ঐ সকল মন্ত্রসমূহও আমাদিগের সহিত এদেশে আসিয়া হাজির হয়। তৎপর যখন মহর্ষি অগ্নিদেব ও মহর্ষি অথর্ব্বা ভারত হইতে ঋক্ ও অথর্ব্ববেদের এবং ত্বষ্টার জামাতা মহর্ষি বায়ুদেব ভুবর্লোক বা অপোগস্থানাদি হইতে মন্ত্রসমাহারপূর্ব্বক যজুর্ব্বেদের দেহ প্রতিষ্ঠা করেন, তখন সামবেদের উক্ত মন্ত্রসমূহও যুগপৎ অন্যান্য বেদে স্থান গ্রহণ করে। সুতরাং ঋগ্বেদের কোন অংশ লইয়া সামবেদ গঠিত হইয়াছে, এই সিদ্ধান্ত বাধিত হইতেছে। অপিচ যখন ঋগ্বেদের ব্যাহৃতি ভূ বা ভারতবর্ষ ও যজুর্ব্বেদের ব্যাহৃতি বা আহরণ স্থান ভুবর্লোক বা তুরুষ্ক, পারস্য ও অপোগস্থান মনুষ্যবসবাসেরও উপযুক্ত হইয়াছিল না, সেই সত্যযুগে সামবেদের মন্ত্র সকল মুখে মুখে প্রণীত হইতেছিল, সুতরাং এ হেন বর্ষীয়ান্ সামবেদ কি প্রকারে তাঁহার অধর্ব্ব ঋক্ প্রভৃতি বেদ হইতে বস্তু গ্রহণ করিতে পারেন? *

অপিচ সামবেদে জ্ঞানবিজ্ঞান ও

কবিত্বাদির বিশেষত্ব এবং মানবজাতির সামাজিক ও মানসিক উৎকর্ষের বিষয় অতি অল্পই রহিয়াছে। কিন্তু সেই বস্তুসম্পদ্‌গত দৈন্যই সামবেদের আদিমত্ব পরিস্ফুটিত করিয়া থাকে। সামবেদের যুগে বর্ণ বা অক্ষরের সৃষ্টি হয় নাই, ভাষাও সংস্কারপ্রাপ্ত হইয়া ছিল না, সুতরাং সে সকল উন্নত বিষয়ের কোনও কথা সামবেদে কি প্রকারে থাকিতে পারিবে? অক্ষরাদি সৃষ্টির পর যে সকল বেদের অধিকাংশ প্রণীত হইয়াছে, অবরকালের সেই সকল বেদেই ঐ সকল তত্ত্ব থাকিবার কথা ও তাই অর্ব্বাচীন ঋক্‌প্রভৃতি বেদে তাহা রহিয়াছে। সামবেদে ব্রহ্ম ঈশ্বর স্রষ্টা বা আরাধ্য বস্তু বলিয়া কোন পদার্থের আভাসও দেখিতে পাওয়া যায় না— পক্ষান্তরে ঋগ্‌বেদের বহু অংশ ঐ সকল বিষয়ের জিজ্ঞাসা ও তত্ত্বেই পরিপূর্ণ। কেন? সামবেদ শৈশবের সম্পদ, উহাতে একমাত্র প্রকৃতি বা জড়পূজার কথাই ওতপ্রোত ভাবে বিদ্যমান।

তৎপর ভাষা লইয়া বিচার করিতে গেলেও আমরা দেখিতে পাইব যে সামবেদের সকল মন্ত্রই বৈদিকসংস্কৃতবহুল পক্ষান্তরে ঋগ্‌বেদের কতকগুলি মন্ত্র যেমন বৈদিক সংস্কৃতবহুল তেমনই বহু মন্ত্রই লৌকিকসংস্কৃতবহুল। যেমন—

সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ।
দিবঞ্চ পৃথিবীং চান্তরিক্ষমথো স্বঃ॥

৩-১৯০সূ ১০ম।

তৎপর দেখা যায় যে সামবেদের কোনও স্থানে বর্ণ বা জাতির একটী প্রসঙ্গও বিদ্যমান নাই, পক্ষান্তরে ঋগ্‌বেদের বহু মন্ত্রে বর্ণ বা জাতির কথা সতেজে অবতারিত রহিয়াছে। যেমন—

ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীৎ বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।
ঊরূ তদস্য যদ্‌ বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত॥

১২—৯০সূ—১০ম

সামবেদের কোনও মন্ত্রে বর্ণ বা জাতির কথা নাই, ঋগ্‌বেদেরও বহু মন্ত্রে বর্ণ বা জাতির কথা দেখিতে পাওয়া যায় না, যজুর্ব্বেদ ও অথর্ব্ববেদের বহু মন্ত্র নানা আধুনিক জাতির তত্ত্ববহুল, ইহার কারণ কি? ইহার কারণ ইহাই যে সামবেদের মন্ত্রসমূহ গোটা সত্যযুগ ও ত্রেতাযুগের মধ্যাহ্ন কাল পর্য্যন্ত সময়ে প্রণীত, তখন বর্ণ বা জাতি হয় নাই, তজ্জন্য উহাতে পুরুষ-সূক্ত থাকা সত্ত্বেও উহাতে বর্ণজাতিঘটিত একটী বর্ণও অবকাশ লাভ করে নাই। ত্রেতাযুগের অবসানসময়ে ভারতে চাতুর্ব্বর্ণ্যের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, তজ্জন্য ভারতীয় সম্পৎ ঋগ্‌বেদের তৎপূর্ব্বকালবিরচিত মন্ত্রসমূহেও বর্ণ বা জাতির কথা স্থান প্রাপ্ত হয় নাই, পরবর্ত্তী কালের মন্ত্রসমূহে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। ফলতঃ কেবল একমাত্র বর্ণ বা জাতির কথা নহে, জীবাত্মা, পরমাত্মা, জন্ম, পুনর্জন্ম, এক ঈশ্বর, স্রষ্টা ঈশ্বর, ইত্যাদি বিষয়ক একটী কথাও সামবেদে দৃষ্ট হইয়া থাকে না। কেন? সামবেদ আদিমযুগে বিরচিত, তখন সরলহৃদয় ঋষিরা জড় প্রকৃতির আরাধনা করিতেন, মহান্‌ জড়সূর্য্য তখন জগৎপ্রসবিতা ও বুদ্ধিদাতা বলিয়া আরাধিত হইত, সুতরাং এহেন প্রাথমিক যুগের সামবেদে ঐ সকল উৎকর্ষের যুগের কথা স্থান পাইবে কেন?

অনন্তর কেবল পাশ্চাত্যগণ নহেন, এ দেশের সায়ণপ্রভৃতি বেদাচার্য্যগণও ঋগ্‌বেদকে আদি বেদ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। যথা—

অথ কেচিদাহঃ:—ঋগ্‌বেদস্য প্রাথম্যম সর্ব্বত্র আম্নাতত্বাৎ "অভ্যর্হিতং পূর্ব্বং" ইতি ন্যায়েন অভ্যর্হিতত্বাৎ।

অর্থাৎ যখন সকল ব্যক্তিই ঋগ্‌বেদের নাম প্রথমে গ্রহণ করিয়াছেন, তখন ঋগ্‌বেদই যে প্রথম বেদ তাহা মনে করা যাইতে পারে। কিন্তু ইহা প্রকৃত সংবাদ নহে। কেন না সায়ণই ন্যায় অধ্যাহার করিয়া বলিতেছেন যে,—

যে সমধিক অভ্যর্হিত
অর্থাৎ পূজনীয়, তাহার নামই
প্রথমে করিতে হয়।

কিন্তু আমরা কি কেহই সাম অপেক্ষা ঋগ্‌বেদকে সমধিক পূজার্হ বলিয়া মানিয়া থাকি? ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই কি গীতায় বলিয়া যান নাই যে—

বেদানাং সামবেদোঽস্মি ?

আমি বেদের মধ্যে সামবেদের ন্যায় প্রধান? বস্তুতঃ ঋগ্‌বেদ প্রধান বা আদি বেদ বলিয়া উহার নাম কেহ প্রথমে গ্রহণ করেন নাই, পরন্তু উহা ভারতীয় সম্পৎ বলিয়াই আমরা উহার নাম অগ্রে লইয়াছি ও লইয়া থাকি।

গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী ও সপ্তসিন্ধু প্রভৃতি ভারতীয় নদনদীর নাম সামবেদে নাই, পক্ষান্তরে ঋগ্‌বেদে রহিয়াছে। ঋগ্‌বেদের ব্যাহৃতি বা মন্ত্রাচরণ স্থানও ভূ বা ভারতবর্ষ সুতরাং ঋগ্‌বেদ ভারতীয় সম্পৎ, সামবেদ ভারতীয় বস্তু নহে।

হাঁ। প্রশ্ন হইতে পারে যে, সামবেদ বৈদিক সংস্কৃতবহুল, উহাতে জড়োপাসনা ভিন্ন ঈশ্বরোপাসনা বা শ্রাদ্ধাদির কথা নাই, বর্ণ বা জাতির প্রসঙ্গ নাই, কেবল তজ্জন্যই কি উহার আদিমত্ব স্বীকার করিতে হইবে? না, উহার আদিমত্বের আরও বহু বলবৎ কারণ বিদ্যমান রহিয়াছে। সামবেদের প্রাচীনতমত্বের প্রধান কারণ উহার বয়োজ্যেষ্ঠতা। উহার জন্ম সকলের আদিতে হইয়াছে, তাই উহাকে আদিমত্বের আসন দিতে আমরা বাধ্য। ঋগ্‌বেদই বলিতেছেন যে—

দেবীং বাচমজনয়ন্ত দেবাঃ
তাং বিশ্বরূপাঃ পশবো বদন্তি।

১১—৮৯ সূ—৮ম

এই দেবীবাণী সংস্কৃত ভাষার আদি স্রষ্টা স্বর্গের দেবতাগণ। তাঁহারা সংস্কৃত ভাষার সৃষ্টি করিলে পর জগতের অন্যান্য লোকেরা উক্ত সংস্কৃত ভাষার কথোপকথন করিতে আরম্ভ করেন। তাই বাইবেল ও রামায়ণ বলিয়া গিয়াছেন যে পূর্ব্বে মানুষের ভাষ এক ছিল। সেই ভাষাই সংস্কৃত ভাষা। ঋগ্‌বেদ তৎপর স্থানান্তরে বলিলেন যে—

সূক্তবাকং প্রথমমাদিৎ
অগ্নি মাদিৎ হবি রজনয়ন্ত দেবাঃ।
স এষাং যজ্ঞো অভবৎ তনূপাঃ,
তং দ্যৌ র্বেদ তং পৃথিবী তমাপঃ।

৮—৮৮সূ—১০ম

দেবতারা সকলের আদিতে সকলের প্রথমে সূক্তবাক্ বা বেদমন্ত্রসমূহের প্রণয়ন, অরণি সংঘর্ষণদ্বারা অগ্নির উৎপাদন ও দধি হইতে ঘৃত উৎপাদিত করেন। সেই শরীররক্ষাকারী অগ্নি তাঁহাদিগের প্রথম যজ্ঞ বা যজনীয় উপাস্য দেবতা হয়েন। উক্ত অগ্নির কথা স্বর্গবাসী, ভারতবাসী ও অপোগস্থানবাসীরা অবগত আছেন।

স্বর্গে প্রণীত এই আদি মন্ত্রসমূহের সমবায়েই সামবেদ গঠিত। তখন আমরাও উক্ত স্বর্গেই ছিলাম, আমরা মহাদি দেবতারা ভারতে ও মাতা (?) মনুর সন্তান দ্বিতীয় বরুণ প্রভৃতি ভুবর্লোক বা অপোগস্থান ও পারস্যাদি দেশে আসিয়া উপনিবিষ্ট হইয়া যে সকল মন্ত্রের প্রণয়ন করি ও করেন, তাঁহারই নাম যথাক্রমে ঋগ্‌বেদ ও যজুর্ব্বেদ। এবং ঋগ্‌বেদের মন্ত্র সমাহারের পর ভারত হইতে অন্য সকল মন্ত্র সমাহৃত হইয়া যে বেদ খাড়া করা হয় তাহারই নাম অথর্ব্ব বেদ।

আমরা ভারতে আসিয়া তবে ঋগ্‌বেদের প্রণয়ন করিয়াছি, সুতরাং উহার পূর্ব্বে প্রণীত সামবেদ কি প্রকারে অবরজ হইতে পারে? ঋগ্‌বেদই বলিতেছেন যে—

অগ্নিঃ পূর্ব্বেভি ঋষিভি রীড্যঃ
নূতনৈরুত। ২—১সূ—১ম।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রাচীনতম ঋষিরা অগ্নির উপাসনা করিয়াছেন ও আমরা নূতন ঋষিরাও সেই একই অগ্নির উপাসনা করিতেছি।

এই প্রাচীন ঋষিগণই সামবেদের ঋষি ও নূতন ঋষিগণই ভারতীয় ঋগ্‌বেদের ঋষি। সুতরাং এতদ্দ্বারা সামবেদেরই আদিমত্ব সপ্রমাণ হইতেছে। তৎপর কৃষ্ণযজুও বলিতেছেন যে—

দেবলোকো বৈ সাম দেবলোকাদেব
অন্যমত্তং মনুষ্যলোকং প্রত্যবরোহন্তো
বস্তি। ৪৭৭পৃ।

সামবেদ দেবলোক স্বর্গে প্রণীত, উহা তথা হইতেই মনুষ্যাদি অন্যান্য লোকে আনীত হইয়াছে। মনুও বলিয়াছেন যে—

সামবেদঃ স্মৃতঃ পিত্র্যঃ। ১২৪—৪অ

সামবেদ আমাদিগের পিতৃলোক অর্থাৎ মানবের আদি জন্মভূমি আদি স্বর্গে প্রণীত এই জন্য উহার নাম "পিত্র্যঃ"। অবশ্য মেধাতিথি ও সায়ণাদি বলিয়াছেন, যাহা পিতৃকার্য্য শ্রাদ্ধতর্পণাদিতে সাধু তাহারই নাম পিত্র্য। কিন্তু সামবেদে তর্পণ বা শ্রাদ্ধের কোনও নামগন্ধ নাই। মহামতি বুলার ও মোক্ষমূলর যে বলিয়া গিয়াছেন যে—

Samaveda is
sacred to the manes.

অর্থাৎ সামবেদ প্রেত বা পিতৃলোকে পবিত্র ইহাও উক্ত ভাষ্যকারগণের ভ্রান্তির উদ্বমন মাত্র। ফলতঃ পারলৌকিক কোন পিতৃলোক নাই ও ছিল না। মানবের আদিজন্মভূমি আদি স্বর্গ ইলাবৃত বর্ষ বা মঙ্গোলিয়াই পিতৃলোক (!) ও তজ্জন্য বলিয়াই সামবেদের বিশেষণ পিত্র্য। সার্ণি মনুর পিতা মহর্ষি সূর্য্যদেব উহার মন্ত্রসমাহর্ত্তা, সমাহারস্থানও উক্ত পিতৃলোক স্বর্গ, তাই সামবেদের ব্যাহৃতি বা আহরণস্থান "স্বঃ"।

স্বরিতি সামভ্যঃ। ছান্দোগ্য।

আচ্ছা স্বীকার করিলাম যে সামবেদ স্বর্গেই প্রণীত কিন্তু ভারতের ঋগ্‌বেদের প্রণয়নের পরও ত উহা স্বর্গে প্রণীত হইতে পারে! না তাহা নহে, কেন না যে সকল বেদমন্ত্র স্বর্গেই প্রথম প্রণীত হয় সামবেদ তৎসমুদয়েরই সমষ্টি বিশেষ মাত্র। তৎপর ঋগ্‌বেদের ঋষিরা আপনাদিগকে নূতন ঋষি বলিয়াও নির্দ্দেশ করিতেছেন। পরন্তু কেবল ইহাই নহে, আমরা ভারতে আগমন কালে তিনটি ছন্দে বেদগান করিতে করিতে আসিতে ছিলাম—যথাহ শুক্ল যজুঃ—

দিবি বিষ্ণুর্ব্যক্রংস্ত জাগতেন ছন্দসা
ততো নির্ভক্তো যো স্মান্ দ্বেষ্টি
যঞ্চ বয়ং দ্বিষ্মঃ॥
অন্তরিক্ষে বিষ্ণুর্ব্যক্রংস্ত ত্রৈষ্টুভেন ছন্দসা
ততো নির্ভক্তো যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি
যঞ্চ বয়ং দ্বিষ্মঃ॥
পৃথিব্যাং বিষ্ণুর্ব্যক্রংস্ত গায়ত্রেণ ছন্দসা।
ততো নির্ভক্তো যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি
যঞ্চ বয়ং দ্বিষ্মঃ॥
অস্মাৎ অন্নাৎ অস্যৈ প্রতিষ্ঠায়ৈ
অগন্ম স্বঃ সংজ্যোতিষা ‧ অভূম।
২৫ ক—২অ।

বামন বিষ্ণু জগতীচ্ছন্দে বেদ গান করিতে করিতে স্বর্গ হইতে বহির্গত হইয়া স্বর্গৈকদেশ কিম্পুরুষবর্ষের একত্র বিশ্রাম গ্রহণ করিলেন, উহাই তাঁহার প্রথম পাদ বিক্ষেপ। বেদমন্ত্রে কি গান করিতে ছিলেন? অতঃপর যে আমাদিগকে দ্বেষ করিবে, আমরাও তাহাকে দ্বেষ করিব।

অনন্তর তিনি ত্রিষ্টুভ ছন্দে ঐরূপ গান করিতে করিতে অন্তরিক্ষ বা অপোগস্থানে আসিয়া (!) দ্বিতীয়-পাদ-বিক্ষেপ করিলেন তৎপর গায়ত্রীছন্দে বেদ গান করিতে করিতে আসিয়া পৃথিবী বা ভারতবর্ষে তৃতীয় পাদ বিক্ষেপ করিয়াছিলেন।

কেন বামন বিষ্ণু ভারতে আগমন করেন? দৈত্যদানবগণকর্ত্তৃক স্বর্গভ্রষ্ট মঘাদি দেবগণের অন্ন ও বাসস্থানের জন্যই তিনি ভারতে আগমন করেন, তাই ভারত বসুন্ধরা "বিষ্ণুক্রান্তা" নামের বিষয়ীভূত। তৎপর তিনি বৈবস্বত মনুকে ভারতে বরমূল্য করিয়া স্বর্গে যাইয়া দৈত্যদানবগণকে পরাভব পূর্ব্বক আপন জ্যোতিতে পূর্ণ হয়েন।

আমরা মঙ্গোলিয়া হইতে ভারতে আসিয়া ঋক্ ও অথর্ব্ববেদের প্রণয়ন করি, আর মাতা (!) মনুর সন্তানেরা পারস্য ও অপোগ স্থানে মনুষ্যলোকে আসিয়া যজুর্ব্বেদের মন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন, সুতরাং তৎপূর্ব্বে আমাদের কোন বেদ ছিল না? সুতরাং বিষ্ণুপ্রমুখ দেবগণ আমরা যে বেদ গান করিয়া ভারতে আসিয়াছিলাম উহাই সামবেদ, সুতরাং সামবেদই আদি বেদ হইতেছে।

সমগ্র বেদের সংস্করণ আটাশটী। মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন এই অষ্টাবিংশতি সংস্করণের শেষ সংস্করণকর্ত্তা, উঁহার বয়ঃক্রম এখন ৫০১১ বৎসর, উহা কলির প্রথমে সম্পাদিত হয়। সুতরাং ঐ হিসাবে সত্যযুগের সাম বেদের বয়ঃক্রম কত, তাহা ভাবিয়া দেখ। সত্যযুগের বয়ঃক্রম ন্যূনকল্পে দৈব চারি সহস্র বৎসর; ত্রেতাযুগের তিন ও দ্বাপর যুগের বয়ঃক্রম দৈব দুই সহস্র বৎসর। সুতরাং সে হিসাবে সামবেদের বয়ঃক্রম বহুলক্ষ বৎসর হইয়া পড়ে। যদি তোমরা অতটা বিশ্বাস করিতে ভয় পাও, তাহা হইলেও উক্ত সামবেদ যে ছয় সহস্র বৎসরের মিশর, উনচল্লিশ শত বৎসরের পুরাতন বাইবেল, সাতাইশ শত বৎসরের গ্রীক ও দ্বিসহস্র বৎসরের লাটিন ও চীন এবং বার শত ৭৮ বৎসরের কোরাণ হইতে বয়সে বহু বড় তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। অবশ্য জেন্দাভস্তা বয়সে মিশর হইতেও বড়, কিন্তু যখন ভারতের ব্রহ্মদ্বিট্ বা বেদদ্বেষী অসুরেরা ইরাণে যাইয়া উহার রচনা করিয়াছেন, তখন উহার বয়ঃক্রমও স্বর্গের সাম দূরে থাকুক ভারতের ঋগ্বেদ হইতেও অল্প ভিন্ন অধিক হইতে পারে না। অতএব কোন্ গ্রন্থ জগতের আদি গ্রন্থ এইক্ষণ তাহা ভাবিয়া দেখ। (*)

শ্রীউমেশচন্দ্র গুপ্ত বিদ্যারত্ন।

হৃদয়-রাণী।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

সম্রাট আকবর, দিল্লীর প্রাসাদের সংগীত-কক্ষে একাকী বসিয়া একটী সারেঙ্গের সুর বাঁধিতেছেন। সংগীতজ্ঞ সম্রাটের শিক্ষিত হস্ত, সারেঙ্গের সুর ঠিক করিয়া লইতে ব্যস্ত, কিন্তু কি যেন কি কারণে সারেঙ্গের তারাবলীর মধ্যে একটা না একটা তার বেসুরো বাজিতে লাগিল। সম্রাট কিয়ৎক্ষণ পরে

(*) লেখক এই প্রবন্ধে যে সকল মত প্রকাশ করিয়াছেন, সেই সকল মতের সহিত আমাদিগের মতের মিল নাই।—সাহিত্য-সংহিতা সম্পাদক।

মৃদু হাসি হাসিয়া মনে মনে বলিলেন, "সারেঙ্গ বেসুরো বাজিতেছে, না আমার কাণটা আজ বেসুরো শুনিতেছে?" কোন্‌টা ঠিক তাহা স্থির করিতে না পারিয়া, সম্রাট সারেঙ্গ লইয়া একটু আলাপ করিয়া গান ধরিলেন,—

"এ ভুবনে রমণী-রতন আছে যত—"

না, আর গান গাওয়া হইল না। সম্রাট ভাবিলেন, সারেঙ্গ ঠিক সুরে বাজিতেছে, তিনিই কেবল বেসুরো গান ধরিয়াছেন। পুনরায় একটু আলাপ করিয়া আবার গান ধরিলেন,—

"এ ভুবনে রমণী-রতন আছে যত—
সবার মুখকমল যদিরে একটী হত।"

সম্রাট ভাবিলেন, গলার সুরে আর সারেঙ্গের সুরে এইবার ঠিক মিলিয়াছে। কিন্তু আমাদিগের সে বিষয়ে বিষম সন্দেহ আছে। যাহা হউক, সম্রাট আমার গান ধরিলেন,—

"সাদরে করি চুম্বন,
সফল হত জীবন,
হত তৃষা নিবারণ,
আমার জনমের মত।"

গীতটী সমাপ্ত না হইতে হইতেই সারেঙ্গের একটী তার হঠাৎ ছিন্ন হইয়া গেল। সম্রাট মৃদু হাস্যসহকারে সারেঙ্গটীকে রাখিয়া দিলেন।

পরমুহূর্ত্তেই সেই কক্ষ মধ্যে একটী মূর্ত্তি প্রবিষ্ট হইল। মূর্ত্তি কুর্ণিশ করিতে করিতে অগ্রসর হইবা মাত্র সম্রাটের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। সম্রাট সহাস্য আস্যে বলিলেন—

"তানসেন! আজকাল তোমার সব যন্ত্রই দেখছি বেসুরো বাজে। ব্যাপার খানা কি?"

তানসেন ধীরে ধীরে বলিলেন, "গায়ক ও বাদকের দোষ।"

"সে কি রকম?"

"সারেঙ্গ প্রভৃতির কাণ গুলো খুব কসে মুচড়ে সুর বেঁধে দিলে, আর বেসুরো বাজতে পারে না।"

"তা বটে, কিন্তু তোমার এই সারেঙ্গের সুর ঠিক রাখিবার জন্য যে কাণটা যেমন দরকার, সে কাণটা সেইমতই মলে দিয়েছিলাম, তবু বেসুরো বাজতে লাগল। শেষ এই দেখ একটা তার পর্য্যন্ত ছিঁড়ে গেল।"

"জঁাহাপনা! ক্ষমা করিবেন, সত্য বলিতে কি, আজকাল আপনিই বেসুরো ও বেতালা হইয়া পড়িয়াছেন—"

"হতে পারে—হতে পারে।" সম্রাট এই কথা বলিবা মাত্র তানসেন প্রফুল্ল-বদনে গান ধরিলেন,—

"এ বুকে সব সইতে পারি,
পারিনাক বিরহ-বিকার।
কোথা হতে সে কে এসে,
এ দুর্দ্দশা ঘটালে আমার॥"

গায়ক, গাইতে গাইতে পার্শ্বস্থিত তানপূরাটী তুলিয়া লইয়া, হাসিতে হাসিতে সম্রাটের প্রতি প্রশ্নপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে গাইতে আরম্ভ করিলেন,—

"না হতে সুখ-মিলন,
না হইতে আলাপন,"

সম্রাট প্রীতিপ্রফুল্লচিত্তে পাখোয়াজ লইয়া, ধামার বাজাইতে আরম্ভ করিলেন। গায়ক হাসিতে হাসিতে হাতে তাল দিতে দিতে গাহিলেন,—

"না হতে সুখ মিলন,
না হইতে আলাপন,
কে জেলে দিলে এমন,
দারুণ বিরহাগুণ—প্রাণে বাঁচা ভার॥"

গায়ক হাসিতে হাসিতে তানপুরাটী রাখিয়া দিলেন। সম্রাট সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিলেন—

"গান থামিল কেন?"

"পাখোয়াজের দোষ ; ওটা বেতালা বাজিতেছিল !"

"ও আমারই দোষ। গান শুনে এতই মুগ্ধ হয়েছি যে, তাল ঠিক রাখিতে পারি নাই।"

গায়ক পুনরায় তানপুরাটী লইয়া গান ধরিলেন,—

"হয়েছি আপন হারা,
হয়েছি পাগল-পারা,
একেমন প্রেমের ধারা,
না হতে মরণ—দেহ পুড়ে হল ছার !"

সম্রাট বিহ্বল, সুতরাং হাত আর চলিল না। তানসেন বিনা বাদ্যেই গানটী সমাপ্ত করিলেন।

পরক্ষণে কক্ষ মধ্যে আর একটী পুরুষ মূর্ত্তি প্রবিষ্ট হইল। ইঁহার নাম আবুল ফৈজি। ইনি সম্রাট আকবরের পরমপ্রিয় বয়স্ত। সম্রাট, তাঁহার প্রতি প্রীতি-দৃষ্টিতে চাহিয়া, আসন গ্রহণের অনুরোধ করিলেন।

ফৈজি আসন গ্রহণ করিবা মাত্র সম্রাট সোৎসুকে প্রশ্ন করিলেন, "কি দেখিলে ?"

"হোমাগ্নি-শিখা।"

"হোমাগ্নি-শিখা ! তাকেত স্পর্শ করিবা মাত্রই ভস্ম হইতে হয়—"

ফৈজি হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"জাঁহাপনা ! ভ্রম—ওটা মহা ভ্রম। মন্ত্রপূত হোমাগ্নি-শিখা অতি পবিত্র।"

"তা ত জানি।"

"আমি মহাভারত তরজমার সময় যখন কাশীতে পূজনীয় শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণমণ্ডলীর নিকট বাস করিতাম, তখন অনেক যজ্ঞে অনেক হোমাগ্নি-শিখা দেখিয়াছি। যখন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ বিচিত্র সুন্দর স্বরে বেদ মন্ত্র পাঠ করিয়া স্বাহা শব্দে হোমকুণ্ডে ঘৃতাহুতি প্রদান করিতেন, তখন সেই কুণ্ড হইতে অগ্নিশিখা প্রজ্বলিত হইয়া, যখন দীর্ঘাকার ধারণ করিয়া ঊর্দ্ধে উঠিত,—তখন তাহার নীল-লোহিত বর্ণ কি সুন্দর প্রভা বিকাশ করিত ! তখন সে দৃশ্য—সে শোভা স্বর্গীয় বোধ হইত ! বেদীর উপরিস্থ চন্দ্রাতপ স্পর্শ করিলেও সেই হোমাগ্নি-শিখা তাহা দগ্ধ করে না।"

"তাহার কি দাহিকা-শক্তি নাই ?"

"কে বলিল নাই ? বেদমন্ত্র দ্বারা পূত বেদী—বেদমন্ত্র দ্বারা পূত হোমকুণ্ড—বেদ-মন্ত্র দ্বারা পূত হোমাগ্নি-শিখা অবশ্যই মহা পবিত্র। পবিত্র-দেহ—পবিত্র-চরিত্র—পবিত্র-চিত্ত পুরুষ, পবিত্রভাবে সেই হোমাগ্নি-শিখাকে আলিঙ্গন করিলে স্বর্গীয় শান্তি লাভ করে, আর অপবিত্রভাবে স্পর্শ করিলে তাহার ফল—মরণ। জাঁহাপানা ! সে হোমাগ্নি-শিখা দেবভোগ্যা।"

"তবে আমার ভোগ্যা নহে ?"

ফৈজি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "সে কি কথা ? হিন্দুস্থানের সমস্ত হিন্দু কি সমস্বরে বলিতেছে না—'দীল্লিশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা' ? এই হিন্দুস্থানে আপনিত নিজ পূত-চরিত্র-বলে দেবতারূপেই পূজ্য।"

সম্রাট সে কথার কোন উত্তর না দিয়া সাগ্রহে কহিলেন, "ভাল ফৈজি ! ভাবটা কি বুঝিলে ? উজীর আবুল ফজল হতাশ্বাস হইয়াছেন। তুমি কি বুঝিলে ?"

"কি জানেন জাঁহাপনা ! তাহারা বাণিজ্য-ব্যবসায়ী লোক—চতুরের চূড়ামণি —জীবন্ত স্বার্থপরতা—"

"তাত জানি, কেবল মাত্র অর্থো-পার্জ্জনের জন্যই এ ত দূরদেশে পর্ত্তুগিস আসিয়াছেন। কিন্তু এ ত বাণিজ্য-ব্যবসায়ের কথা নহে।"

ফৈজি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "বণিক পর্ত্তুগিস এ কার্য্যকেও একপ্রকার

ব্যবসায় বলিয়া স্থির করিয়াছে, কথার ভাবে এমত বোধ হইল।"

সোৎসুকে সম্রাট প্রশ্ন করিলেন, "তবে তিনি কিছু অধিক অর্থ প্রত্যাশা করেন নাকি?"

"কেবল তাহা নহে। তদতিরিক্ত আরও কিছু—"

"তদতিরিক্তটা কি? আমার সাধ্য না অসাধ্য?"

"শীঘ্রই জানিতে পারিবেন। তাঁহারা শীঘ্রই আপনার দরবারে উপস্থিত হইবেন।"

পাঠক! অবশ্যই বুঝিতে পারিতেছেন, এস্থলে সেই পোর্ত্তুগীজ যুবতী মেরি সম্বন্ধে আলোচনা হইতেছে।

"বটে?—বটে? তাঁহারা এখনই আসিবেন?—এখনই?" সম্রাট এই কথা বলিয়া, পরক্ষণে দণ্ডায়মান হইয়া কক্ষ মধ্যে অন্যমনে পাদচারে বিচরণ করিতে লাগিলেন।

তানসেন মৃদুমধুরস্বরে গান ধরিলেন,—

"বিষম বিরহ-বিকার—
কণ্ঠাগত প্রাণ আমার—বাঁচা হল ভার।"

গায়ক, গীতের এই অংশটুকু বারম্বার আলাপ করিতে লাগিলেন। সম্রাট যেন হটাৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিলেন—"তানসেন! তার পর?"

সুর ঊর্দ্ধে উঠিল,—

"তাহারি নাম হৃদে করহ অঙ্কন,
তাহারি নাম কর সবে সংকীর্ত্তন,
তাহারি গুণগান কর অনুক্ষণ,
বাঁচিলে বাঁচিতে পারি এবার।"

সম্রাট ঈষৎ হাস্য-সহকারে তানসেনের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কক্ষ ত্যাগ করিলেন।

কবিবর ফৈজি এবং তানসেন সম্রাটের পশ্চাদ্‌গমন করিতে বিলম্ব করিলেন না।

নবম পরিচ্ছেদ।

দিল্লীর প্রাসাদের একটী গুপ্ত মন্ত্রণা-কক্ষে দুইটী পুরুষ উপবিষ্ট। দুই জনেই পাঠকগণের পরিচিত। প্রথমটী পোর্ত্তুগীজ পাদরী একোয়া বিভা এবং দ্বিতীয়টী পোর্ত্তুগীজ বণিক গঞ্জালিস। কক্ষ মধ্যে আর জন প্রাণী নাই। উভয়ে স্বভাবসিদ্ধ অতি ক্ষীণ স্বরে কথোপকথন করিতেছেন। পাদরী বলিলেন,—

"বৎস গঞ্জালিস! সাবধান, অতি সন্তর্পণে কথা কহিও।"

"যে আজ্ঞা।"

"এখানে বাণিজ্য-ব্যবসায়ের রীতি অনুসারে কথা বার্ত্তা চলিবে না। এখানে রাজনীতির চাল চালিতে হইবে।"

"রাজনীতির সহিত কোন কালেই আমার কোন সম্বন্ধ ছিল না, এখনও নাই।"

"তাহাত জানি। আমি সঙ্গে আছি। তুমি কোন কথা কহিও না।"

"না পিতঃ! আমি আর এ বিষয়ে কোন কথা কহিব না; আপনি যাহা ভাল বুঝেন, তাহাই করুন।"

কথা শেষ না হইতে হইতে সম্রাট আকবর এবং ফৈজি সেই কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। পাদরী বিভা এবং গঞ্জালিস সসম্মানে দণ্ডায়মান হইয়া অভ্যর্থনা করিলেন। সম্রাট, সিংহাসনে উপবেশন করিয়া সহাস্য-আননে পাদরীর প্রতি দৃষ্টি দান করিয়া প্রশ্ন করিলেন,—

"আপনার শারীরিক সমস্ত কুশল ত?"

"প্রভু যীশুর অনুগ্রহে সমস্ত মঙ্গল।"

"আপনি কেমন আছেন?" সম্রাট, বণিক গঞ্জালিসকেও সাদরে এই প্রশ্ন করিলেন।

গঞ্জালিস করযোড়ে কহিলেন, "যখন

আপনার আশ্রয়ে আছি, তখন অমঙ্গলের সম্ভাবনা কোথায় ?”

সম্রাট, তখন স্বভাবসিদ্ধ মৃদু-মধুর-বচনে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কুমারী মেরি কেমন আছেন ?”

“সে আপনার আশ্রিতা, সুতরাং সে কুশলেই আছে।” এই কথা বলিয়া পাদরী, করযোড়ে বলিলেন, “জাঁহাপনার শারীরিক সমস্ত মঙ্গল ত ?”

“যিনি জগতের সকল ধর্ম্মাবলম্বী সকল জাতির ভগবান, তাঁহার চরণ স্মরণ করিলে, অমঙ্গলের সম্ভাবনা থাকিবে কেন ?”

কুশল প্রশ্নের পর কয়েক মুহূর্ত্ত সকলেই নীরবে রহিলেন। সম্রাট এবং পাদরী উভয়েই যেন কিছু বলিতে অভিলাষী অথচ উভয়েই কিছু বলিতে পারিতেছেন না। শেষ পাদরী, সাহসভরে করযোড়ে কহিলেন,—

“জাঁহাপনার আদেশে এখানে উপস্থিত হইয়াছি—”

“আদেশ কেন ? আপনিত আমার প্রজা নহেন। আপনি আমার মাননীয় অতিথি।”

“আপনার ন্যায় বিশ্ববিখ্যাত সম্রাটের সমক্ষে উপবেশন করাই আমার বহু সৌভাগ্যের ফল জ্ঞান করি। এক্ষণে যদি অভয় দান করেন, তাহা হইলে নির্ভয়ে একটী বিষয়ের আলোচনা করিতে পারি।”

“এখানে ভয় বা সঙ্কোচের কোন কারণ নাই। নির্ভয়ে বলুন—”

পাদরী একোয়া বিভা যেন একটু সাহস-ভরে বলিলেন,—“আপনার প্রধান উজীর এবং এই কবিবর, আমাদিগের নিকট একটী প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন, তাহা বোধ হয় আপনার সম্মতি অনুসারে—”

সম্রাট বলিলেন “অবশ্য, সেই জন্যই আপনাদিগকে এখানে আহ্বান করিয়াছি।”

পাদরী নতমস্তকে সম্মান প্রদর্শন করিয়া কহিলেন,—“জাঁহাপনা! আপনি অভয় দিয়াছেন, সেই সাহসে দুই এক কথা বলিব। কিন্তু কথা অপ্রিয় হইলেও আপনি ক্ষমা করিবেন, এমত আশা করি।”

“আপনার যাহা বলিবার নির্ভয়ে বলুন।”

“আপনার প্রস্তাবটী অতি গুরুতর, অতি কঠিন।”

“কিছু না।” সম্রাট সানন্দে কহিলেন, “প্রস্তাবটী কিছু মাত্র কঠিন নহে।”

পাদরী যেন দৃঢ়তার সহিত কহিলেন, “বৎস গঞ্জালিসের নিকট পূর্ব্বে কখনও কেহই এরূপ প্রস্তাব উপস্থিত করেন নাই। বিশেষতঃ প্রস্তাবটী অসম্ভবজনক।”

সম্রাট বলিলেন, “তাহা হইতে পারে। কিন্তু ইচ্ছাময় ভগবানের ইচ্ছায় এ জগতে কি অসম্ভব সম্ভব হয় না ?”

পাদরী বিভা দৃঢ়ভাবে ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন,—“কখনও কখনও হয় বটে কিন্তু এ ব্যাপারে একান্তই অসম্ভব। আমাদিগের জাতির মধ্যে—দুইটী বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী স্ত্রী পুরুষের মধ্যে পরিণয় হয় না —হইতে পারে না।”

“ইয়ুরোপের সকল খৃষ্টানই কি সমধর্ম্মাবলম্বী ? তাঁহাদের মধ্যে কি মতভেদ নাই ? খৃষ্টান জাতির মধ্যে কি পরস্পরমতবিরোধী শাখা প্রশাখা নাই ?”

“অবশ্য আছে। তবে তাহারা সকলেই খৃষ্টান বলিয়া গণ্য।”

“হউক গণ্য, তবে তাহাদিগের মধ্যে অবশ্যই মতভেদ আছে। তাঁহাদিগের মধ্যে কি পরস্পরের আদান প্রদান চলে না ?”

"সম্পূর্ণরূপে না হউক, চলে।"

"তবে এ স্থলে আপত্তি কেন?"

"এ স্থলে পাত্রী খৃষ্টান আর পাত্র—"

বাধা দিয়া সম্রাট হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "দেখুন একটা কথা বলি। কে বলিতে পারে যে, কুমারী মেরী আমাকে অনতিবিলম্বে খৃষ্ঠ-ধর্ম্মাবলম্বনের উপযুক্ত পাত্ররূপে স্থির করিয়া দিবে না? কে বলিতে পারে যে, মেরির সাহচর্য্যে—সহাতার খৃষ্ঠধর্ম্মে আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিবে না? এবং সেই সূত্রে আমি প্রকাশ্যে খৃষ্ঠধর্ম্ম অবলম্বন করিব না?"

পাদরী বা গঞ্জালিস সম্রাটের নিকট হইতে এরূপ উত্তর প্রত্যাশা করেন নাই, সুতরাং সম্রাটের এই কথা গুলি শুনিয়া পাদরীর হৃদয়ে যেন আনন্দের উৎস উথলিয়া উঠিল। তিনি যেন দেখিলেন, স্বয়ং যীশু, সম্রাটের শিরে শান্তিবারি বর্ষণ করিতেছেন। আর গঞ্জালিস? তিনিও এরূপ উত্তর প্রত্যাশা করেন নাই। তাঁহার হৃদয়ও আনন্দোদ্বেলিত হইয়া উঠিল।

সম্রাট পুনরায় অনুরাগভরে বলিলেন, "দেখুন খৃষ্ঠধর্ম্মের সারমর্ম্ম জানিতে কি আমার বাকি আছে?"

"না।" পাদরী এই উত্তর দান করিয়াই বলিলেন, "জাঁহাপনা! আপনি সকল ধর্ম্মেরই তত্ব জানেন, কিন্তু খৃষ্ঠধর্ম্ম যে, সকল বিষয়ে সকল ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ এবং প্রভু যীশুর করুণায় জীব যে, সহজেই মুক্তি প্রাপ্ত হয়, ইহাও বোধ আপনার অবিদিত নাই।"

সম্রাট বলিলেন, "একথা আপনি আজ নূতন কি শুনাইতেছেন? বহুদিন হইতেই ইহা জানি। প্রভু যীশুর যদি আমার প্রতি দয়া থাকে, তাহা হইলে মেরির সহায়তায় সেই দয়া লাভ করিতে পারিব, এমত আশা করি। একথাগুলি মৌখিক নহে, আন্তরিক।"

সম্রাট আকবরের এই কথায় পাদরী আনন্দে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। তিনি কখনও এরূপ উত্তরের আশা করেন নাই। তিনি প্রীতিভরে বলিলেন, "জাঁহাপনা! আপনার অদৃষ্টে মুক্তি না থাকিলে, প্রভু-যীশু আপনার মনে এ ভাবের উদয় করিয়া দিবেন কেন?"

সম্রাট, মেরির সাহায্যে খৃষ্ঠধর্ম্ম অবলম্বন করিতে পারেন, এমত ভাব প্রকাশ করায়, গঞ্জালিস প্রথমটা হৃষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু শেষটা মস্তিষ্কে যেন কি একটা চিন্তা-তরঙ্গ আসিয়া আঘাত করিতে লাগিল। গঞ্জালিস ভাবিলেন, তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য বা পাদরীর দোষে ব্যর্থ হইয়া যায়। তিনি তখন যেন আত্মহারা হইয়া বলিয়া উঠিলেন—"জাঁহাপনা! আপনি অবশ্যই জানেন, আমি এ হিন্দুস্থানে কন্যা বিক্রয় করিতে আসি নাই।"

গঞ্জালিসের এই কথা গুলি পাদরীর বক্ষে যেন বজ্রের ন্যায় আঘাত করিল। তিনি ভাবিলেন, সম্রাট আকবরকে খৃষ্ঠান করিবার সমস্ত উপায় বা পণ্ড হইয়া গেল। কিন্তু সম্রাট অবিলম্বে হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "বণিকবর! কে বলিল আপনি আপনার কন্যাকে বিক্রয় জন্য হিন্দুস্থানে আসিয়াছেন? আপনি কি ভাবিয়াছেন যে, আমি পণ্য দ্বারা মেরিকে ক্রয় করিতে অভিলাষী?"

সম্রাটের উক্তি শেষ না হইতে হইতে বাধা দিয়া পাদরী আরক্তিম-নয়নে গঞ্জালিসের প্রতি তাত্র দৃষ্টি দান করিয়া কহিলেন,—"বৎস! কোথা হইতে হঠাৎ কি কথার উত্থাপন করিলে? আমি না তোমায় বলিয়াছিলাম যে, এ বিষয়ে নীরব থাকাই তোমার পক্ষে ভাল?"

গঞ্জালিস অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, "পিতঃ! ক্ষমা করিবেন। কন্যা মেরির প্রতি স্নেহই আমাকে অন্ধ করিয়া রাখিয়াছে।"

পাদরী বিভা, এক্ষণে ধীরভাবে বলিতে লাগিলেন, "জঁাহাপনা! গঞ্জালিস একজন সম্ভ্রান্তবংশীয় বণিক। কন্যা মেরির সহিত শুভ পরিণয় যদিই হয়, তাহা হইলে হয়ত স্বদেশে রাষ্ট্র হইতে পারে যে, গঞ্জালিস অর্থের বশীভূত হইয়া, কন্যার অমতে তাহাকে বিক্রয় করিয়াছে।"

সম্রাট বলিলেন—"একথা সঙ্গত বটে। কিন্তু মোগলেরা কখনও শুল্ক দিয়া পাণিগ্রহণ করে না—বিশেষতঃ দিল্লীর সম্রাট। তবে একটী কথা এই যে, তাঁহার সহিত সম্বন্ধ বন্ধন হইলে, আমার রাজ্য-ধন সমস্ত উঁহারই হইবে। তখন উনি মনে করিলে যত ইচ্ছা ধনরত্ন লইতে পারিবেন, ইচ্ছা না করিলে নাও লইতে পারেন।"

সম্রাটের এই কথাগুলি গঞ্জালিসের হৃদয়ে শান্তিজল ঢালিয়া দিল।

পাদরী করযোড়ে বলিলেন, "যদি অনুমতি করেন, তাহা হইলে আর একটী কথা বলিতে ইচ্ছা করি।"

সম্রাট উৎসাহ দানে বলিলেন,—"কি বলিবেন—বলুন।"

"কথা এই যে, এ সম্বন্ধে কুমারী মেরির কি অভিমত তাহা না জানিয়াত অর্থাৎ তাহার সম্মতি না পাইলেত আমরা এখন আর কোন কথা বলিতে পারি না।"

সম্রাট ধীরভাবে বলিলেন, "অবশ্য-মেরির মত গ্রহণ সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন, কিন্তু সে ভার আপনাদিগের উপর অর্পিত। আপনারা যাহা স্থির করিবেন, আমার বিশ্বাস মেরী কখনই তাহাতে অমত করিবেন না।"

পাদরী বলিলেন, "অবশ্য, তিনি আমাদিগের অবাধ্য নহেন। তবে ব্যাপারটী বড় সহজ মনে করিবেন না।"

"হয়ত সে সম্মত নাও হইতে পারে।" গঞ্জালিস এই উত্তর দান করিয়া, সম্রাটের মুখ প্রতি দৃষ্টি দান করিতে লাগিলেন।

সম্রাট আকবর, সহাস্যে বলিলেন, "আপনাদিগের যদি কোন আপত্তি না থাকে, তাহা হইলে আমি নিজে গিয়া মেরির নিকট এই শুভ প্রস্তাব উপস্থিত করিতে পারি।"

সম্রাটের এই কথা শুনিয়া, গঞ্জালিস, পাদরীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। পাদরী একটু অপেক্ষা করিয়া বলিলেন—"না, ইহাতে আপত্তি কি? আপনি স্বচ্ছন্দে সাক্ষাৎ করিতে পারেন।"

এইবার সম্রাট আকবরের হৃদয়ে আশার উৎস উথলিয়া উঠিল। তিনি আনন্দের সহিত "অদ্য অপরাহ্নে সাক্ষাৎ করিব" বলিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। পাদরী ও গঞ্জালিস অগত্যা সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

কৈজি মনে মনে বলিলেন, "দেখা যাউক, জগতে কে জিতে বা কে হারে।"

প্রাচীন ভারতের ছাত্রজীবন।

প্রাচীন ভারতের ছাত্রজীবন সম্বন্ধে আমরা একটু আলোচনা করিতে অভিলাষী। এই আলোচনায় বৃথা সময় নষ্ট হইল বলিয়া বোধ হইবে না, বরং তুষ্টি লাভের

সম্ভাবনা। আর্য্য ঋষিগণ, আর্য্য ছাত্রদিগের জীবনগঠন জন্ত কিরূপ বিধি-নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন এবং পুরাকালে সেই বিধানগুলি কি অমৃতময় ফল প্রসব করিত, তাহা পাঠ করিলে, মনোমধ্যে অননুভূতপূর্ব্ব আনন্দের উদয় হয়।

ত্রিকালদর্শী ঋষিগণ এ সম্বন্ধে কি কি বিধি নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, সর্ব্বাদৌ সে সম্বন্ধীয় তথ্যগুলির প্রতি আমাদিগের দৃষ্টি দান করা প্রার্থনীয়। আমাদিগের ধর্ম্ম শাস্ত্রেই সেই সমস্ত তথ্য বিদ্যমান। আমাদিগের সর্ব্বাদিম এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মগ্রন্থ - বেদ। বেদের আদিম একটী নাম ত্রয়ী। কারণ প্রথমে কেবল মাত্র ঋক্, যজু, এবং সাম এই তিন খানি বেদ ছিল বলিয়া, ত্রয়ী নাম হইয়াছিল। তৎপরে অথর্ব্ব বেদের উৎপত্তিতে চারিটী বেদ হয়। সেই চারি খানি মূল বেদের মধ্যে ছাত্র-জীবনের বিশেষ কোন উল্লেখ বা বিধি-ব্যবস্থা দেখা যায় না।

বেদের পর বেদাঙ্গ। ব্রাহ্মণ এবং আরণ্যক গ্রন্থগুলি বেদাঙ্গ। সর্ব্বশেষ— বেদান্ত। উপনিষদ্গুলিই বেদান্ত - বেদের শিরোভাগ। বেদাঙ্গে এবং বেদান্তে তৎকালীন ছাত্রজীবনের কতক অপরিস্ফুট অস্তিত্ব দেখা যায়। সেইগুলিই আমাদিগের প্রথম লক্ষ্য।

ছাত্র-জীবনের আলোচনার পূর্ব্বে আমাদিগকে প্রসঙ্গক্রমে সর্ব্বাদৌ কয়েকটী কথার অবতারণা করিতে হইতেছে। সকলেই জানেন যে, বেদে আর্য্যজাতির তিনটী বর্ণের উল্লেখ দেখা যায়—ব্রাহ্মণ, রাজন্ত এবং বৈশ্ব ; শূদ্রবর্ণ অনার্য্য জাতি।

আর্য্যজাতির তিনটী বর্ণের প্রত্যেক বালকেরই নির্দ্দিষ্ট বয়সে দীক্ষা হইত। সেই সাবিত্রী-দীক্ষাদ্বারা ব্রাহ্মণ, রাজন্ত এবং বৈশ্ব-কুমারগণের দ্বিতীয় জন্ম হইত। সেই সূত্রে সেই তিনটী বর্ণের দীক্ষাপ্রাপ্ত বালকেরা 'দ্বিজ' নামে অভিহিত হইতেন। দীক্ষাদাতা গুরুই এই দ্বিতীয় জন্মদাতারূপে পূজ্য হইতেন।

শাস্ত্র-বিধিমত যে সকল আর্য্য বালকের সাবিত্রী-দীক্ষা না হইত, তাঁহারা ব্রাত্যনামে-গণ্য এবং আর্য্য-সমাজচ্যুত হইতেন। এই সমাজচ্যুতির ভয়ে প্রত্যেক বর্ণের প্রত্যেক আর্য্য বালকের যে উপনয়ন হইত, ইহা সহজেই অনুমেয়। দীক্ষাদাতা গুরু শাস্ত্রীয় বিধিমত দীক্ষাদান করিলে পর প্রত্যেক দীক্ষিত ছাত্রই গুরুগৃহে অবস্থান করিয়া শিক্ষা লাভ করিতে বাধ্য হইতেন। উপনয়নের পর দ্বিজ উপাধি লাভ করিয়াই আর্য্য বালকেরা যে, স্বেচ্ছাক্রমে পিত্রালয়ে আসিয়া বাস করিতে পারিতেন না, শাস্ত্রে তাহার প্রবল বিধি বিদ্যমান। প্রত্যেক আর্য্যবালকের পক্ষে দীক্ষা গ্রহণ অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া বিধান ছিল, এবং দীক্ষার পর গুরুগৃহে বাস করাও অবশ্য কর্ত্তব্যরূপে নির্দ্দিষ্ট ছিল।

এখন মূল কথার আলোচনা করা যাউক। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, মূল বেদ চতুষ্টয়ে ছাত্রজীবনের কোন বিধান স্পষ্ট দেখা যায় না। বেদাঙ্গ এবং বেদান্তে কতক আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। উপনিষদে আমরা শিক্ষা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কথাগুলি প্রথম দেখিতে পাইতেছি,—

"পূর্ব্বে শ্বেতকেতু নামে অরুণের এক পুত্র ছিল। তাহার পিতা উদ্দালক, তাহাকে বলিলেন, হে শ্বেতকেতু! ব্রহ্মচর্য্য পূর্ব্বক শিক্ষা লাভ কর। হে সৌম্য! আমাদিগের বংশে এপর্য্যন্ত বেদাধ্যয়ন ব্যতীত কেবল জন্মদ্বারা কেহ ব্রাহ্মণ হন নাই।

দ্বাদশ বর্ষ হইতে চতুর্ব্বিংশতি বর্ষ পর্য্যন্ত শ্বেতকেতু সমস্ত বেদ অধ্যয়ন করিয়া, বেদ-

বিদ্যাভিমানী এবং গম্ভীরস্বভাব হইয়া গুরুগৃহ হইতে পিতার নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।" ছান্দোগ্যোপনিষৎ, ৬।১।

উপরে উদ্ধৃত প্রমাণে আমরা জানিতে পারিলাম যে, তৎকালে আর্য্য বালক, গুরুগৃহে অবস্থান পূর্ব্বক শিক্ষা লাভ করিতেন। পিত্রালয়ে থাকিয়া পিত্রাদি গুরুজনদিগের নিকট শিক্ষা লাভ করিবার বিধি তখন ছিল না।

শিক্ষা সমাপ্তির পর গুরু, শিষ্যকে যে উপদেশ দিতেন, উপনিষদ্ হইতে নিয়ে তাহা উদ্ধৃত হইল,—

"সত্য কহিবে। ধর্ম্ম প্রতিপালন করিবে। জ্ঞানোপার্জ্জন করিতে কখনও বিরত হইবে না। আচার্য্যকে মনোমত ধন (দক্ষিণা) দান করিবে। প্রজাতন্তু কখনও বিচ্ছিন্ন করিবে না অর্থাৎ সন্তানোৎপাদনাদির দ্বারা স্বীয় বংশ রক্ষা করিবে। সত্য হইতে কখনও নিবৃত্ত হইবে না। ভূতি হইতে কখনও নিবৃত্ত হইবে না। বেদের অধ্যয়ন এবং প্রবচন হইতে কদাচ নিবৃত্ত হইবে না।

দেব এবং পিতৃলোকের কার্য্য হইতে কদাচ নিবৃত্ত হইবে না। মাতাকে দেবতা জ্ঞান করিবে। পিতাকে দেবতা জ্ঞান করিবে। আচার্য্যকে দেবতা জ্ঞান করিবে। অতিথিকে দেবতা জ্ঞান করিবে। যে সকল কর্ম্ম অনিন্দনীয়, তাহারই অনুষ্ঠান করিবে, অন্যবিধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে না। আমাদিগের যে সমস্ত সুচরিত, তুমি তাহারই অনুষ্ঠান করিবে, তদ্বিপরীত অনুষ্ঠান করিবে না।

আমাদিগের অপেক্ষা যে সকল শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ আচার্য্যগণ আছেন, তাঁহাদিগকে আসন দানে সম্মানিত করিবে। অশ্রদ্ধার সহিত দান করিবে না। সহর্ষ, সলজ্জ, সভয় এবং সদাচার হইয়া দান করিবে। যদি তোমার অনুষ্ঠেয় কর্ম্মে কোন সন্দেহ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে, তাহার বিচারক্ষম অক্রুর এবং ধর্ম্মকাম আর্য্যগণ সে কর্ম্মে নিযুক্ত হউন বা না হউন, তাঁহারা সেই অবস্থায় যেরূপ করিতেন, তুমি সেইমত করিবে।

কোন কর্ম্মে দোষের কথা উত্থাপন হইলে, তথায় বিচারক্ষম এবং অক্রূর ও ধর্ম্মকাম আচার্য্যগণ সে কর্ম্মে নিযুক্ত হউন বা না হউন, তাঁহারা সেই অবস্থায় যেরূপ করিতেন, তুমি সেইরূপ করিবে।

ইহাই আদেশ, ইহাই উপদেশ, ইহাই বেদের উপনিষৎ। ইহাই অনুশাসন। এই মত অনুষ্ঠান করিবে, এই মত আচরণ করিবে।" তৈত্তিরোপনিষৎ, ১ম বল্লী। ১১ অনুবাক।

যে সময়ে ভারতে উপনিষদ্‌সমূহের প্রবল প্রাদুর্ভাব, সে সময়ে আর্য্যভূমি উন্নতির সমুচ্চ সোপানে সমারূঢ় এবং আর্য্যজাতি শিক্ষাজ্ঞানে সমুন্নত। সে সময়ে যে, সকল প্রকার বিদ্যারই সমূহ উন্নতি সাধিত হইয়াছিল, উপনিষদেই তাহার প্রমাণ বিদ্যমান।

দেবর্ষি নারদ, স্বীয় শিক্ষার পরিচয় দিতেছেন,—

"আমি ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, চতুর্থ অথর্ব্ববেদ, পঞ্চম ইতিহাস, পুরাণ; ব্যাকরণ, পিত্র্য (পিতৃলোকের যজ্ঞক্রিয়া), রাশি (গণিত) দৈব, নিধিবিদ্যা, বাকোবাক্য, একায়ন (নীতিশাস্ত্র), দেববিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যা, ভূতবিদ্যা, ক্ষত্রবিদ্যা (সমর-শাস্ত্র), নক্ষত্রবিদ্যা, জ্যোতিষ, সর্পবিদ্যা, এবং দেবজনাবিদ্যা (নৃত্যগীত-বাদ্য প্রভৃতি) শিক্ষা করিয়াছি।" ছান্দোগ্যোপনিষদ্, ৭।১।

দেবর্ষি নারদের উক্ত উক্তিতেই আমরা

বুঝিতে পারিলাম, উপনিষৎগুলির প্রাবল্যের পূর্ব্বে আর্য্যভূমিতে বিবিধ বিদ্যার কিরূপ উৎকর্ষতা সাধিত হইয়াছিল।

বেদের পর আর্য্য ধর্ম্মশাস্ত্রনিচয়ের মধ্যে বিভিন্ন ঋষি-প্রণীত কল্পসূত্রগুলিই আর্য্যভূমিতে প্রথম প্রাদুর্ভূত হয়। এই কল্পসূত্রগুলির মধ্যেই আমরা সর্ব্বপ্রথম আর্য্যজাতির ধর্ম্ম, নীতি, সমাজ—এমন কি প্রত্যেক বিষয় সম্বন্ধে ধারাবাহিক বিধি-নির্দ্দেশ দেখিতে পাই। এই কল্পসূত্রগুলিই প্রাচীন আর্য্যভূমির ছাত্রজীবনের পূর্ণ আলেখ্য আমাদিগের সমক্ষে প্রথমে উপস্থিত করিতেছে। অনেক ঋষিই অনেক কল্পসূত্র প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। কল্পসূত্র গুলির মধ্যে কোন কোন বিষয়ে মতভেদ থাকিলেও মূলে সকলের মধ্যেই একতা বিদ্যমান। সেই কল্পসূত্রাবলম্বনে এক্ষণে প্রাচীন ছাত্রজীবনের বিষয় আলোচনা করা যাউক।

আর্য্যজাতির মধ্যে চারিটী আশ্রমের কথা অনেকেই বিদিত আছেন। সেই চারিটী আশ্রম যথা—(১) ব্রহ্মচর্য্য, (২) ভৈক্ষব, (৩) সংসার এবং (৪) সন্ন্যাস। এই চারিটী আশ্রমের মধ্যে প্রত্যেক আর্য্যসন্তানের পক্ষে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে নিয়মিত কাল অবস্থান অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দিষ্ট ছিল। প্রত্যেক আর্য্যসন্তানই এই আশ্রমে ব্রহ্মচর্য্য পালন এবং বেদাদি শিক্ষা লাভ করিতেন। যিনি সাবিত্রী-মন্ত্রদাতা—যিনি দ্বিতীয় জন্মের পিতা, সেই গুরু-গৃহ ব্যতীত অন্যত্র ব্রহ্মচর্য্য পালনের বিধি ছিল না। সুতরাং প্রত্যেক আর্য্যসন্তান বাল্যজীবন হইতে যৌবন-জীবন পর্য্যন্ত গুরুগৃহে বাস পূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্যপালন সহ শিক্ষা সমাপ্ত করিতেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য এই তিনটী বর্ণ লইয়াই আর্য্যজাতি গঠিত। এই তিনটী বর্ণের প্রত্যেক বালকই যখন দীক্ষার পর গুরুগৃহে অবস্থান পূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্য পালন ও বেদশিক্ষা করিতে বাধ্য ছিলেন, তখন সহজেই জানা যাইতেছে যে, প্রত্যেক আর্য্যের পক্ষে বিদ্যাশিক্ষা লাভ অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট ছিল।

আর্য্যসন্তান নবীন ব্রহ্মচারী হইয়া, গুরু-গৃহে অবস্থান করিতে প্রবৃত্ত হইলে, তাহাদিগকে যে উপদেশ প্রদান করা হইত, এস্থলে গোভীল-গৃহ্যসূত্র হইতে তাহা পাঠকগণের অবগতির কারণ উদ্ধৃত হইল,—

"আচার্য্যের অধীন এবং তাঁহার মতানুগামী হইবে এবং আচার্য্য কোন অধর্ম্মাচরণ করিলে তাহার অনুসরণ করিবে না, এবং তিনি কোন অধর্ম্মাচরণ করিতে বলিলে তাহাও করিবে না। ক্রোধের কারণ উপস্থিত হইলেও ক্রোধ প্রকাশ পূর্ব্বক বিবাদ করিবে না এবং মিথ্যা কথা কহিবে না। কোন নারীসঙ্গ করিবে না। গুরুর শয্যা অপেক্ষা উচ্চ শয্যায় শয়ন করিবে না। যাহাতে মনে বিকার জন্মে, এমত নৃত্য, গীত, বাদ্য প্রভৃতি করিবে না। চক্ষে অঞ্জন দিবে না। স্নানকালে জলক্রীড়া করিবে না। তিলকাদির দ্বারা মুখের সৌন্দর্য্য সাধন করিবে না। দন্ত রঞ্জিত করিবে না। অধিকক্ষণ ধরিয়া পাদ প্রক্ষালন করিবে না। ক্ষুর দ্বারা কেশ লোমাদি মুণ্ডন করিবে না। মধু এবং যে মাংস অভক্ষ্য নহে, তাহাও আহার করিবে না। গোবাহিত শকটে আরোহণ করিবে না। গ্রামের মধ্যে চর্ম্ম-পাদুকা ব্যবহার করিবে না।" * গোভীল গৃহ্যসূত্র, ৩।২।

মহর্ষি বৌধায়ন বলিতেছেন,—

"সর্ব্বদা সত্যবাদী, বিনয়নম্র, এবং অহঙ্কারশূন্য হইয়া থাকিবে। যাহাতে জাতি যায়, গুরু এমন কোন কার্য্য করিতে বলিলে কেবল সেই কার্য্য করিবে না, নতুবা গুরুর প্রত্যেক আজ্ঞা পালন করিবে।" বৌধায়ন ধর্ম্মসূত্র. ১ম অধ্যায়।

মহর্ষি আপস্তম্ব বিধি দিতেছেন—

"গুরুর উপকারজনক কার্য্য করিবে। গুরুর কোন কথার প্রতিবাদ করিবে না। শ্রাদ্ধ ও যজ্ঞের অন্ন আহার করিবে না। লবণ, মধু, মাংস এবং তেজস্কর মসলা আহার করিবে না, দিবসে নিদ্রা যাইবে না। সুগন্ধী দ্রব্য ব্যবহার করিবে না। সুখের জন্য উষ্ণ জল ব্যবহার করিবে না। শরীর কোন অস্পৃশ্য দ্রব্যে অপবিত্র হইলে গুরু যাহাতে দেখিতে না পান, এমত স্থানে মৃত্তিকা বা জল দ্বারা পরিষ্কার করিবে।

মস্তকের সমস্ত কেশ গ্রন্থি বন্ধন করিয়া রাখিবে। দ্যূতক্রীড়া-স্থলে বা উৎসব-স্থলে গমন করিবে না। গল্প করিবে না। নিতান্ত প্রয়োজনীয় কার্য্যের জন্য স্ত্রীলোকের সহিত কথা কহিতে পারিবে, নতুবা নহে। ক্ষমাশীল হইবে। সমস্ত ইন্দ্রিয় দমন করিবে। নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য পালনে দৃঢ়রূপে আগ্রহান্বিত হইবে। বিনম্র-নম্র হইবে। আত্ম শাসন করিবে। উদ্যোগী হইবে। ঈর্ষা করিবে না।

প্রত্যহ প্রাতঃকালে এবং অপরাহ্নে পাত্রহস্তে ভিক্ষা করিতে গিয়া যাহা কিছু পাইবে তাহা গুরুকে দিবে। নীচজাতি এবং অভিশপ্ত ব্যতীত অন্য সকলের নিকট ভিক্ষা করিবে। ব্রাহ্মণ ছাত্র "ভবতি ভিক্ষাং দেহি।" ক্ষত্রিয় ছাত্র "ভিক্ষাং ভবতি দেহি।" এবং বৈশ্যছাত্র "ভিক্ষাং দেহি ভবতি।" বলিয়া ভিক্ষা করিবে। খাদ্য ব্যতীত পশু এবং কাষ্ঠ প্রভৃতি ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য গুরুকে দিবে।

অপরাহ্নে এবং প্রাতঃকালে গুরুর ব্যবহার জন্য কলসে করিয়া জল আনিবে। প্রত্যহ বন হইতে গুরুর জন্য কাষ্ঠ আনিবে কিন্তু সূর্য্যাস্তের পর কাষ্ঠ আনিবে না। বেদী এবং তাহার চতুষ্পার্শ্ব পরিষ্কার করিয়া, অগ্নি প্রজ্বলন পূর্ব্বক শাস্ত্র-বিধিমত সমিধ্ কাষ্ঠ দিবে।

প্রতিদিন রাত্রির শেষ প্রহরে গাত্রোত্থান করিয়া গুরুর পাদ বন্দনা করিবে। প্রাতরাশের পূর্ব্বে গ্রামস্থ অন্যান্য ব্রাহ্মণদিগকে নমস্কার করিবে। ব্রাহ্মণ-কুমার কর্ণ পর্য্যন্ত হস্ত প্রসারণ, ক্ষত্রিয়গণ বক্ষ পর্য্যন্ত এবং বৈশ্যগণ কটীদেশ পর্য্যন্ত হস্ত প্রসারিত করিয়া যুগ্মকরে অভিবাদন করিবে। প্রত্যহ রাত্রিতে গুরুর পাদ ধৌত করিয়া দিয়া, তাঁহাকে শয্যায় শয়ন করাইয়া পরে নিজে শয়ন করিবে।" আপস্তম্ব-গৃহ্যসূত্র, ১ম প্রশ্ন।

গৌতম-গৃহ্যসূত্রে নিম্নলিখিত বিধি দেখা যাইতেছে;—

"গুরু অনুমতি করিলে, পাঠারম্ভ করিবে। পাঠারম্ভ জন্য গুরুকে অনুরোধ করিবে না। গুরুর প্রতি যেমন ব্যবহার করিবে, তাঁহার স্ত্রী এবং পুত্রগণের প্রতি সেইমত ব্যবহার করিবে। গুরু, গুরুপত্নী এবং গুরুপুত্রগণের নাম গ্রহণ করিবে না।

গুরু, শিষ্যকে শারীরিক দণ্ড দিবেন না। যদি অন্য কোন উপায় না থাকে, তাহা হইলে সূক্ষ্ম রজ্জু বা সূক্ষ্ম বেত্র দ্বারা শিষ্যকে প্রহার করিবেন। যদি গুরু অন্য কোন দ্রব্যদ্বারা প্রহার করেন, তাহা হইলে রাজা সেই গুরুর দণ্ড বিধান করিবেন।" গৌতম-গৃহ্যসূত্র, ২।

বশিষ্ট-ধর্ম্মসূত্রের ৭ম অধ্যায়ে দেখা যাইতেছে,—

"যদি আচার্য্য পাদচারে গমন করেন,

তবে তাঁহার পদানুসরণ করিবে। আচার্য্য উপবিষ্ট থাকিলে দণ্ডায়মান থাকিবে, যদি আচার্য্য শয়ান থাকেন, তবে উপবেশন করিবে।

ভিক্ষা করিয়া যে কিছু দ্রব্য আনিবে, আচার্য্যকে তাহা জ্ঞাপন করাইয়া পরে তাঁহার অনুমতি লইয়া আহার করিবে।

পর্য্যঙ্কে শয়ন করিবে না, তৈল মাখিবে না, পাদুকা বা ছত্র ব্যবহার করিবে না। দিনের মধ্যে তিনবার স্নান করিবে।"

মহর্ষি শাঙ্খায়ন বলিতেছেন,—

"শিষ্য, আচার্য্যের পাদ বন্দনা পূর্ব্বক জল দ্বারা হস্ত ধৌত করিয়া, কুশোপরি দক্ষিণ জানু পাতিত করিয়া উপবেশন পূর্ব্বক দুই হস্তে কুশ গ্রহণ করিলে, আচার্য্য বাম হস্তে সেই কুশাগ্রভাব গ্রহণ করিয়া দক্ষিণ হস্তে জল সিঞ্চন করিয়া, বেদাধ্যয়ন আরম্ভ করাইবেন।" ২।২।

শাঙ্খায়ন গৃহ্যসূত্রের অন্যত্র প্রকাশ,—

"আচার্য্য পূর্ব্ব বা উত্তর দিকে বসিবেন। শিষ্য দক্ষিণ দিকে উত্তরমুখ হইয়া বসিবেন। দুইটী শিষ্য, অথবা স্থান সংকুলান হইলে দুই জনের অধিকও ঐরূপ বসিবেন। শিষ্য গুরুর সমক্ষে উচ্চাসনে বসিবে না এবং গুরুর সহিত একাসনে বসিবে না। পদদ্বয় ছড়াইয়া বসিবে না। পদের নীচে হস্ত রাখিয়া বসিবে না। পৃষ্ঠ দেশে হেলান দিয়া বসিবে না। যেরূপে কুঠার ধারণ করে, সেভাবে পদ ধারণ করিয়া বসিবে না।" শাঙ্খায়ন-গৃহ্যসূত্র; ৪।৮।

কল্পসূত্রানুসারে বহু শত বর্ষ কাল আর্য্য-জাতি শাসিত, আর্য্যসমাজ পরিচালিত, এবং ধর্ম্ম কর্ম্ম প্রভৃতি সকল কার্য্যই নির্ব্বাহিত হইয়াছিল। তৎপরেই আমরা সংহিতা বা ধর্ম্মশাস্ত্রগুলির আবির্ভাব দেখিতে পাই। প্রধানতঃ কল্পসূত্রগুলিই শ্লোকাকারে পরিবর্ত্তিত হইয়া সংহিতা নামে প্রচলিত হয়। সংহিতাগুলির অপর নাম ধর্ম্মশাস্ত্র। সেই সংহিতা বা ধর্ম্মশাস্ত্র সমূহে প্রাচীন ছাত্র-জীবন সম্বন্ধে কি কি বিধি ব্যবস্থা আছে, এক্ষণে তাহা দেখা যাউক।

সংহিতাগুলির মধ্যে মনুসংহিতা সর্ব্বপ্রধান। মহর্ষি মনু বলিতেছেন,—

"ব্রহ্মচারী গুরুগৃহে ষট্‌ত্রিংশৎ বৎসর যাবৎ বেদত্রয়াধ্যয়নার্থ ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমবিহিত ধর্ম্মের আচরণ করিবেন। অথবা তাহার অর্দ্ধেক কাল, কিম্বা চতুর্থাংশ কাল, অথবা যতদিন পর্য্যন্ত তিনবেদের সম্পূর্ণ গ্রহণ না হয়, ততকাল গুরু-গৃহে যাপন করিবেন। তিন বেদ, দুই বেদ, অথবা এক বেদ-শাখাদি যথাক্রমে অধ্যয়ন করিয়া বিদ্যালাভ হইলে পর স্ত্রীসংপ্রয়োগ হইতে অস্খলিত ভাবে নিরস্ত থাকিলে পর দারপরিগ্রহে অধিকারী হওয়া যায়।

গুরু, শিষ্যের উপনয়ন দিয়া, প্রথমতঃ তাহাকে আদ্যোপান্ত শৌচ-ক্রিয়া শিক্ষা দিবেন। আচার, অগ্নি-পরিচর্য্যা, এবং সন্ধ্যোপাসনাও শিখাইবেন। অধ্যয়নকালে শিষ্য, শাস্ত্রানুসারে আচমন করিয়া, ইন্দ্রিয় সংযম পূর্ব্বক উত্তরাভিমুখে ব্রহ্মাঞ্জলি করিয়া পবিত্র বেশে উপবেশন করিবেন। বেদাধ্যয়নের আরম্ভ ও অবসান কালে শিষ্য প্রতিদিন গুরুর পদদ্বয় গ্রহণ করিবেন। এবং অধ্যয়নকালে কৃতাঞ্জলিপুটে গুরু সমীপে অবস্থান করিবেন। ইতরেতর বিপর্য্যস্ত (আড়াআড়ি) হস্তদ্বয় দ্বারা গুরুর পদ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। উত্তান দক্ষিণ হস্ত উপরে এবং উত্তান বাম হস্ত নীচে করিয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারা বামপদ স্পর্শ করিবেন। গুরু সদা অবহিত থাকিয়া, শিষ্য যখন পাঠ অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ

করিবেন তখন তাহাকে 'ভো! অধ্যয়ন কর' বলিয়া পাঠারম্ভ করাইবেন। এবং সমাপ্তি কালে 'এই স্থানে পাঠ রহিল' বলিয়া অধ্যয়ন শেষ করাইবেন। বেদাধ্যয়নের আরম্ভে এবং সমাপনে ব্রাহ্মণ সর্ব্বদা প্রণব উচ্চারণ করিবেন। প্রথমে প্রণব (ওঁ) উচ্চারণ না করিলে, ক্রমে ক্রমে অধ্যয়ন নষ্ট হইয়া যায় এবং অধ্যয়নাবসানে প্রণবোচ্চারণ না করিলে, সমুদয় বিস্মৃত হইতে হয়। ব্রহ্মচারী যতদিন না বেদাধ্যয়ন সমাপ্তির পর পিত্রালয়ে সমাবর্ত্তন করেন, ততদিন গুরুকুলে থাকিয়া, প্রতিদিন প্রাতঃ সায়াহ্নে সমিধ্ দ্বারা অগ্নি প্রজ্বলন, ভিক্ষাচরণ, খট্টাদিতে শয়ন না করিয়া নিম্নে শয়ন এবং গুরুর হিতকর কার্য্য সকল সমাপন করিবেন।

গুরুকুলে বাসকালীন ব্রহ্মচারী, ইন্দ্রিয় সংযম পূর্ব্বক আত্মগত অদৃষ্ট বৃদ্ধির জন্য নিম্নকথিত নিয়মগুলি প্রতিপালিত করিবেন। তিনি প্রতিদিন স্নান করিয়া শুদ্ধভাবে দেব, ঋষি ও পিতৃগণের তর্পণ করিবেন। দেবতাদিগের পূজা করিবেন এবং সায়ংপ্রাতে সমিধ্ দ্বারা হোম করিবেন। ব্রহ্মচারী মধু ও মাংস ভোজন করিবেন না। গন্ধ দ্রব্য সেবন, মাল্যাদি ধারণ, গুড় প্রভৃতি রস গ্রহণ এবং স্ত্রীসম্ভোগ করিবেন না। যে সকল বস্তু স্বাভাবিক মধুর কিন্তু কারণ বশে অম্ল হয়, দধি প্রভৃতি সেই সমুদয় শুক্ত দ্রব্য ত্যাগ করিবেন এবং প্রাণী-হিংসা করিবেন না। তৈল দ্বারা মস্তক সর্ব্বাঙ্গ অভ্যঞ্জন, কজ্জলাদির দ্বারা চক্ষু রঞ্জন, পাদুকা বা ছত্র ধারণ, কাম, ক্রোধ, লোভ, নৃত্য, গীত, বাদ্য, অক্ষক্রীড়া, লোকের সহিত বৃথা কলহ, দেশবার্ত্তাদির অন্বেষণ, মিথ্যাকথন, কুঅভিপ্রায়ে স্ত্রীলোকের প্রতি কটাক্ষ বা তাহাদিগকে আলিঙ্গন, পরের অনিষ্টাচরণ, ব্রহ্মচারী এসকল হইতে নিবৃত্ত থাকিবেন। সর্ব্বত্র একাকী শয়ন করিবেন। কামবশতঃ রেতঃপাত করিলে, ব্রহ্মচর্য্য একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। এমন কি যদি অকামতঃ স্বপ্নদোষেও ব্রহ্মচারীর রেতঃ স্খলন হয়, তাহা হইলে তিনি স্নান করিয়া সূর্য্যদেবের অর্চ্চনা করিবেন এবং "পুনর্ম্মাং এতু ইন্দ্রিয়ং" ইত্যাদি বেদমন্ত্র বারত্রয় জপ করিবেন।

আচার্য্যের প্রয়োজনমত কলসপূর্ণ জল, পুষ্প, গোময়, মৃত্তিকা এবং কুশ আহরণ করিবেন। নিজে প্রতিদিন ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করিবেন। যে সকল গৃহস্থ বেদানুষ্ঠানযুক্ত, যাঁহারা সন্তুষ্টমনে স্ব স্ব বৃত্তিতে কালযাপন করিতেছেন, ব্রহ্মচারী প্রতিদিন শুচি হইয়া, তাঁহাদিগের গৃহ হইতে ভিক্ষা সংগ্রহ করিবেন। গুরুর বংশে, আপনার জ্ঞাতি-কুলে, মাতুলাদি বন্ধুকুলে ভিক্ষা করা ব্রহ্মচারীর কর্ত্তব্য নহে। তবে যদি কোন গৃহস্থের গৃহে ভিক্ষা না মিলে, তাহা হইলে উক্ত পূর্ব্বপূর্ব্বকুল ত্যাগ করিয়া মাতুলাদি কুল হইতে ভিক্ষা আরম্ভ করিবেন। পূর্ব্বোক্ত ভিক্ষাদাতা লোকদিগের অভাব হইলে সংযতেন্দ্রিয় ও ভিক্ষাবাক্য বর্জ্জনে মৌনী হইয়া, গ্রামভিক্ষা অর্থাৎ চাতুর্ব্বর্ণের নিকট ভিক্ষা করিবেন, কিন্তু অভিশপ্ত মহাপাতকাদিযুক্ত গৃহস্থকে ত্যাগ করিবেন।

ব্রহ্মচারী যদি অনাতুর অবস্থায় নিরন্তর সপ্তরাত্র ভিক্ষাচরণ ও সায়ং প্রাতে সমিধ্ কাষ্ঠ দ্বারা হোম না করেন, তাহা হইলে তজ্জন্য তাঁহাকে অবকীর্ণি প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। প্রতিদিন ভিক্ষাচরণ করা ব্রহ্মচারির কর্ত্তব্য কিন্তু ভিক্ষান্ন একজন গৃহস্থের নিকট হইতে সংগ্রহ করা উচিত নহে। ভিক্ষান্নদ্বারা ব্রহ্মচারির জীবিকাকে ঋষিগণ উপবাসসম পুণ্যজনক বলিয়া

নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ব্রহ্মচারী, দেবতার উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত কার্য্যে ব্রাহ্মণ-ভোজনে নিমন্ত্রিত হইয়া ইচ্ছামত মধু-মাংসাদিবর্জ্জিত ব্রহ্মচারীব্রতবৎ অন্ন এবং পিত্রাদি উদ্দেশ্যে আরণ্য-নীবারাদি ঋষিবৎ অন্ন গ্রহণ করিতে পারেন। ইহাতে তাঁহার একান্ন সেবনের দোষ বা ভিক্ষাব্রতের হানি হয় না। মন্বাদি ঋষিগণ, ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারির প্রতি এইরূপ শ্রাদ্ধাদির স্থলে একান্ন ভোজনের বিধি দিয়াছেন। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ব্রহ্মচারির প্রতি ভিক্ষাচরণ বিধি আছে বটে, কিন্তু একান্ন সেবনের বিধি নাই।" মনুসংহিতা, ২য় অধ্যায়।

বিষ্ণু-সংহিতায় লিখিত হইয়াছে ;—

"গুরুর পূর্ব্বে শয্যা হইতে উত্থান এবং গুরু শয়ন করিলে শয়ন করা কর্ত্তব্য। দণ্ডায়মান থাকিয়া, শয়ান থাকিয়া, আহার কালে, অথবা পরাঙ্মুখ থাকিয়া, গুরুর অভিভাষণ করিবে না। গুরু আসীন থাকিলে, স্বয়ং দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার অভিভাষণ করিবে। গুরু গমন করিতে থাকিলে, স্বয়ং অনুগমন করতঃ তাঁহার অভিভাষণ করিবে, গুরু আগমন করিতেছেন দেখিলে, প্রত্যুদ্গমন করিয়া তাঁহার অভিভাষণ করিবে। গুরু ধাবমান হইলে, তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন পূর্ব্বক অভিভাষণ করিবে। গুরু পরাঙ্মুখ হইয়া থাকিলে, অভিমুখ হইয়া তাঁহার অভিভাষণ করিবে। গুরুর সমক্ষে যথেচ্ছভাবে বসিয়া থাকিবে না। গুরুর নাম উচ্চারণ করিবে না। তাঁহার গমন-চেষ্টা বা কথনাদির অনুকরণ করিবে না। যেখানে গুরুর নিন্দা হইবে, সেখানে থাকিবে না। শিলাফলকে, নৌকা এবং রথাদি যান ব্যতীত গুরুর সহিত একাসনে উপবেশন করিবে না।" ২য় অধ্যায়।

মহর্ষি সম্বর্ত্ত বলিতেছেন,—

"ব্রহ্মচারী, কোন কারণে মধু কিম্বা মাংস ভোজন করিলে, প্রাজাপত্য ব্রতানুষ্ঠান করিতে হইবে। ব্রহ্মচারী পর্ব্ব দিবসে পুরোডাস প্রদান করিবে এবং শাকল হোমান্ত মন্ত্র দ্বারা অগ্নি মধ্যে ঘৃত হোম করিবে। স্নান না করিয়া যে ব্রহ্মচারী ভোজন করে, সে একশত আটবার গায়ত্রী জপ করিয়া শুদ্ধ হইবে। যে ব্রহ্মচারী শূদ্রের দ্বারা আনীত অন্ন বা পানীয় দ্রব্য ভোজন বা পান করে, সে এক অহোরাত্র উপবাসান্তে পঞ্চগব্য পান করিয়া শুদ্ধ হইবে। শুষ্ক, পর্য্যুষিত, উচ্ছিষ্ট এবং কেশদুষ্ট অন্ন ভোজন করিলে, অহোরাত্র উপবাসের পর পঞ্চগব্য পান করিবে। যে ব্রহ্মচারী সুস্থশরীরে কদাচিৎ দিবাভাগে নিদ্রা যায়, সে স্নানান্তে সূর্য্যদেবের অর্চ্চনা করিয়া একশতবার গায়ত্রী জপ করিয়া শুদ্ধ হইবে।" সম্বর্ত্ত-সংহিতা।

মহর্ষি হারীত বেদাধ্যয়ন সম্বন্ধে বিধি দিতেছেন,—

"ব্রহ্মচারী যথ বিধি বেদাধ্যয়ন করিবে। বিধি পরিত্যাগ করিয়া অধ্যয়ন করিলে, অধ্যয়নের ফল লাভ হয় না। যে কোন ব্যক্তি দুঃস্বভাববশতঃ বিধি পরিত্যাগ করিয়া বেদাধ্যয়ন করে, সে সেই অধ্যয়নের ফল লাভ করিতে পারে না এবং বিধি-বিরুদ্ধ-কর্ম্মকারী, বিধি অর্থাৎ মঙ্গলজনক পুণ্যাদি হইতে বিযুক্ত হয়।"

হারীত সংহিতা, ৩য় অধ্যায়।

মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন,—

"ব্রহ্মচারী, দণ্ড, অজিন, যজ্ঞোপবীত, এবং মেখলা ধারণ করিবে এবং স্বীয় জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ জন্য অনিন্দনীয় ব্রাহ্মণ-বাটীতে ভিক্ষা করিবে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য যথাক্রমে আদিতে, মধ্যে এবং অন্তে ভবৎ শব্দ প্রয়োগ করিবে, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ বলিবে, "ভবতি ভিক্ষাং দেহি।", ক্ষত্রিয় বলিবে, "ভিক্ষাং ভবতি দেহি", এবং বৈশ্য বলিবে 'ভিক্ষাং দেহি ভবতি"। অগ্নি-কার্য্য করিবার পর গুরুর অনুমতি অনুসারে ভোজন করিবে।" যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিত, ১ম অধ্যায়।

(ক্রমশঃ।)

শ্রীঃ—

সাহিত্য-সংহিতা।

দ্বাদশ খণ্ড] ১৩১৮ সাল, জ্যৈষ্ঠ। [২য় সংখ্যা।

সুখ ও দুঃখ। *

আজ আমি আপনাদিগের সমক্ষে সুখ ও দুঃখ বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠে উদ্যত হইয়াছি। বিবিধ দর্শনশাস্ত্রে সুখ বা দুঃখ সম্বন্ধে যে সমুদয় আলোচনা হইয়াছে, এ স্থলে তাহার বিশদরূপে উল্লেখ হইবে বলিয়া এ প্রবন্ধ লিখিত হয় নাই। সুখ বা দুঃখ বলিলে আমরা কি বুঝিয়া থাকি? সুখ বা দুঃখ বলিলে জীব মাত্রের ভোগ্য বিশেষ বিশেষ অবস্থার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। রাজা ও প্রজা, জ্ঞানী ও অজ্ঞান, ধনী ও দরিদ্র, সুখ ও দুঃখ বলিলে যাহা বুঝিয়া থাকে, সেই সর্ব্বসাধারণের অনুভূত সুখ ও দুঃখের আলোচনা করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। শারীরিক ও মানসিক সকল প্রকার সুখ ও দুঃখই অদ্যকার প্রবন্ধের আলোচ্য। ইহাতে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, তাহা বলিতে পারি না।

সুখ বা দুঃখ প্রধানতঃ আমাদিগের অনুভব-শক্তি ও তাহার উত্তেজক কারণগুলির উপর নির্ভর করিয়া থাকে। এবং অনুভব-শক্তি, শরীর ও মনের উপাদান ও গঠন এবং উত্তেজক কারণের সংযোগ কালীন তাহাদের কার্য্যকরী অবস্থার উপর নির্ভর করে। অতএব দেখা যায় যে, সুখ বা দুঃখ ভোগের কোন অবস্থাই নিত্য নহে।

যুক্তি ও তর্কদ্বারা সুখ বা দুঃখ ভোগের প্রকৃত অবস্থার নির্ণয় বা উহার অনিত্যতা প্রতিপাদন সহজেই করা যাইতে পারে। কিন্তু যুক্তি ও তর্কের বলে তদবস্থার স্থায়িত্বের কাল বৃদ্ধি করা সম্ভবপর নহে; বরং দেখা যায় যে, কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়া বা কর্ম্মদ্বারা ইহার স্থায়িত্ব কথঞ্চিৎ বৃদ্ধি করা সম্ভবপর হয়। এই জন্য অনেক নরনারী যুক্তি ও তর্কে বৃথা কালক্ষেপণ না করিয়া, স্ব স্ব কর্ম্মে মনোনিবেশ পূর্ব্বক প্রভূত সুখলাভে সমর্থ হয়। যুক্তি ও তর্ক, সুখ-দুঃখের অনিত্যতা প্রতিপাদন করিয়া, দুঃখ প্রশমনের উপায়স্বরূপ হয় বটে, কিন্তু সেই সঙ্গেই সুখেরও তীব্রতা দমন করিয়া সুখবৃদ্ধিরও প্রতিকূল হইয়া উঠে। সুখ দুঃখের কারণ পরিজ্ঞাত হইলেই কি আমাদিগের দুঃখ দূর হইয়া সকল প্রকার সুখ লাভ ঘটে? অতি অল্পসংখ্যক ব্যক্তিই এ জগতে আত্মপরীক্ষা বা আত্ম বিশ্লেষণ দ্বারা সুখ লাভে সমর্থ হইয়াছেন। সুখ বা দুঃখ মায়াময়, অলীক এবং অনিত্য এই ধারণা মনোমধ্যে জাগরূক থাকা সত্ত্বেও প্রিয়জন-বিরহে আমরা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হই। দুঃসহ ব্যাধি-যন্ত্রণা বা দারিদ্র্যজ্বালার উৎপীড়নে আমরা আত্মহারা হই। আত্ম-পরীক্ষা বা আত্মবিশ্লেষণ, "এই সংসার

---

* সাহিত্য-সভার ১২শ বার্ষিক ২য় মাসিক (২৮শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৮ সাল) অধিবেশনে শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর কর্তৃক পঠিত।

মায়াময়" এই প্রবোধ বাক্যে আর তখন মতিস্থির করাইতে পারে না। এমন কি সর্ব্বনিয়ন্তা পরমকারুণিক পরমেশ্বরকেও এই অনুযোগ করি যে, তিনি আমাদিগকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর দুঃখক্লিষ্ট করিতেছেন। অবিমৃষ্যকারিতা ও অপরিণামদর্শিতা হেতু অনেক সময় আমাদিগকে দুঃখ ভোগ করিতে হয়। জ্ঞানার্জ্জন ও চেষ্টা দ্বারা এই প্রকার স্বকার্য্যজনিত দুঃখের অনেক উপশম হইয়া থাকে।

সুখ ও দুঃখ কি? এ বিষয়ে নানাপ্রকার মতবাদ প্রচলিত আছে। সকল গুলির আলোচনা এস্থলে হইতে পারে না। সংক্ষেপে কয়েকটী মাত্র বিভিন্ন দলের মতের উল্লেখ করা যাইতেছে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দার্শনিকগণের মধ্যে সুখ-দুঃখের মূলপ্রকৃতি সম্বন্ধেই বিরুদ্ধ প্রকারের ধারণা বিদ্যমান আছে। হিতবাদী (Utilitarian) দিগের সিদ্ধান্তে সুখই ভাল, দুঃখই মন্দ। যে কার্য্যের ফলে মানবমণ্ডলীর সুখ বৃদ্ধি হয়, তাহাই ধর্ম্ম এবং যাহার ফলে দুঃখ বৃদ্ধি হয়, তাহাই অধর্ম্ম। হিতবাদিগণ কহিয়া থাকেন, কর্ত্তব্যজ্ঞান, বিজ্ঞস্বার্থজ্ঞান ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই জ্ঞান বহুকালব্যাপী পরীক্ষার ফল মাত্র। ম্যানডেভিল (Mandeville) তাঁহার "নৈতিক ধর্ম্মের উৎপত্তি সম্বন্ধে অনুসন্ধান" (Enquiry into the Origin of Mroal Virtue) নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন যে শাসকগণের চতুরতা হইতেই ধর্ম্মের উৎপত্তি হইয়াছে। রিপুকে প্রশ্রয় দেওয়া অপেক্ষা তাহার বেগধারণ মহত্তর, এই উপদেশ প্রচারের সহিত পরোপকারের জন্ত সুখ্যাতি, পদ-মর্য্যাদা, ও স্মারকচিহ্নাদির ব্যবস্থা করিয়া তাঁহারা লোক সকলের অভিমান উদ্দীপন করেন, ও তদ্দ্বারা আপনাদিগের কার্য্যসিদ্ধি করিয়া লয়েন। এই ভাবে স্বার্থত্যাগাদি ধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া তাহাদের ফলস্বরূপ দুঃখ নিবারণ ও সুখবৃদ্ধি হয় বুঝিতে পারিয়া, লোক সকল ধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছে। The chief thing therefore which lawgivers and other wise men that have laboured for the establishment of society have endeavoured has been to make the people they were to govern believe that it was more beneficial for everybody to conquer than to indulge his appetites and much better to mind the public than what seemed his private interest......observing that none were either so savage as not to be charmed with praise or so despicable as patiently to bear contempt they justly concluded that flattery must be the most powerful argument that could be used to human creatures. Making use of this bewitching engine they extolled the excellency of our nature above other animals......by the help of which we were capable of performing the most noble achievements. Having by this artful flattery insinuated themselves into the hearts of men they began to instruct them in the notions of honour and shame &c—Enquiry into the Origin of Moral Virtue. দার্শনিক হবস (Hobbes) বলেন—কাহারও পক্ষে কোন কার্য্য ভাল কি মন্দ ইহার বিচার করার অর্থ

এই যে সেই কার্য্য তাহার স্বার্থের অনুকূল কি প্রতিকূল ইহার নিরূপণ করা মাত্র। ভাল ও মন্দ আমাদিগের অনুরাগ ও বিরাগের অপর নাম মাত্র।

I conceive that when a man deliberates whether he shall do a thing or not do it he does nothing else but consider whether it be better for himself to do it or not to do it. (Hobbes—On Liberty and Necessity.)

Good and evil are names that signify our appetites and aversions. (Leviathan Part I Ch xvi.)

ব্রাউন (Brown) বলেন যে, সুখলাভেচ্ছা ভিন্ন মনুষ্যের অপর কোন কার্য্যপ্রবৃত্তি নাই।

The only reason or motive by which individuals can possibly be induced to the practice of virtue must be the feeling immediate or the prospect of future private happiness. (Brown-On the Characteristics p. 159.)

বেন্থামের মতবাদ এই যে, প্রকৃতি, মনুষ্যকে সুখ ও দুঃখের সম্পূর্ণ অধীন করিয়াছে এবং সুখ ও দুঃখই আমাদের কর্ত্তব্য ও কার্য্যের স্বরূপ অর্থাৎ ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম নির্দ্দেশ করিয়া দেয় এবং যুক্তি ও তর্ক কার্য্যের ফল বিচার পূর্ব্বক ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম নির্দ্ধারণ বিষয়ে আমাদিগের পথপ্রদর্শক হয়।

Nature has placed mankind under the governance of two sovereign masters pain and pleasure. It is for them alone to point out what we ought to do as well as to determine what we shall do...(Bentham's Principles of Morals and Legislation Chap. I.)

দার্শনিক লকের মতও উপরোক্ত সুধীগণের মতের অনুকূল। তিনি এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ভাল ও মন্দ, সুখ ও দুঃখ ব্যতিরেকে আর কিছুই হইতে পারে না; অর্থাৎ যাহা হইতে সুখের উৎপত্তি হয়, তাহাই ভাল এবং যাহা হইতে দুঃখের উৎপত্তি হয় তাহাই মন্দ। যে কার্য্যের স্বাভাবিক ফল সুখবৃদ্ধি, স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া সেই কার্য্য করাই পুণ্য এবং তদ্বিপরীত কার্য্যের অনুষ্ঠানই পাপ। এবম্বিধ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত কার্য্যের ফলস্বরূপ শাসকদিগের বা নিয়মসৃষ্টিকারকদিগের নিয়মানুযায়ী সুখ বা দুঃখ ভোগই পুরস্কার বা দণ্ড নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

Good and evil are nothing but pleasure and pain or that which occasions or procures pleasure or pain to us. Moral good and moral evil therefore is only the conformity or disagreement of our voluntery actions to some law whereby good and evil is drawn on us by the will and power of the lawmaker, which good and evil, pleasure or pain attending our observance or breach of the law by the decree of the lawmaker is that we call reward or punishment. (Locke's Essays Book II Chap xxvii.)

এই মতাবলম্বী দার্শনিকগণের মতে নীতিবিজ্ঞানের উদ্দেশ্য সমাজবদ্ধ অবস্থায় থাকিবার কালীন লোক সমূহের সুখবৃদ্ধি ও দুঃখনিবারণের উপায় নির্দ্ধারণ করা মাত্র।

রীতি, মতবাদ, সংস্কার ও প্রবৃত্তির বৈলক্ষণ্য হেতু মানবগণ মধ্যে বিবাদ, বিসম্বাদ ও পরিণামে যুদ্ধবিগ্রহ পর্য্যন্ত ঘটিয়া থাকে, সুতরাং সকলেই স্বীকার করেন যে, শান্তি সম্ভোগই সুখকর ও শান্তিপ্রদ উপায় সমূহই ভাল অর্থাৎ ন্যায়পরতা, কৃতজ্ঞতা, অদাম্ভিকতা, দয়া, সহানুভূতি প্রভৃতি গুণ সকলের অনুশীলনই কর্ত্তব্য। ইঁহারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, নিস্বার্থ পরোপকারী বীরচরিত্র, অভ্রান্ত স্বার্থবিচারের ফল মাত্র। অধ্যাপক বেন (Bain) বলেন যে, আপন চিত্ত ব্যতিরেকে অপরের চিত্ত দ্বারা সুখের উপলব্ধি হইতে পারে না। কতকগুলি সুখ এরূপ আছে যে, তাহা আহরণ করিতে হইলে অপরকেও সুখী করিতে হয়, যথা দয়া, সহানুভূতি ইত্যাদি। আবার কতকগুলি এমন সুখ আছে যে, তাহাদের উপভোগের জন্য অপর কাহাকেও সুখে বা দুঃখে জড়িত করিতে হয় না। পান, ভোজন, স্বাস্থ্যরক্ষা, সম্পত্তি-সম্ভোগ, কর্ত্তৃত্ব ও পদমর্য্যাদা ইত্যাদি এই প্রকারের সুখ। আর এক প্রকারের সুখ আছে, যাহার উপভোগের জন্য অপরকে দুঃখে নিমগ্ন করিতে হয়। মৃগয়া, উৎপীড়ন প্রভৃতি দ্বারা সুখার্জ্জন করা এই প্রকারের সুখ। তৃতীয় শ্রেণীর এই নিকৃষ্ট সুখকেই স্বার্থপরতা প্রভৃতি নিন্দাসূচক আখ্যায় অভিহিত করা হয়। দ্বিতীয় বা মধ্যম শ্রেণীর সুখও কতক নিন্দাভাজন এবং প্রথম শ্রেণীর সুখই নিঃস্বার্থতা, উদারতা, আত্মোৎসর্গ প্রভৃতি প্রশংসাসূচক আখ্যায় অভিহিত হইয়া থাকে।

All pleasure is necessarily self-regarding for it is impossible to have any feelings out of our own mind. But there are modes of delight that bring also satisfaction to others from the round that they take in their course. Such are the pleasures of benevolence. Others imply no participation by any second party, as, for example, eating, drinking, bodily warmth, property and power ; while a third class are felt by the pains and privations of fellow beings, as the delights of sport and tyranny. The condemnatory phrase, selfishness applies with special emphasis to the last mentioned class and in a qualified degree to the second group, while such terms as unselfishness, disinterestedness, self-devotion are applied to the vicarious position wherein we seek our own satisfaction in that of others. (Bain on the Emotions and Will p. 113.)

চার্ব্বাক-মতাবলম্বী প্রাচ্য দার্শনিকগণ উপরোক্ত পাশ্চাত্য দার্শনিকদিগের সহিত এ বিষয়ে একমত। তাঁহারাও সুখই জীবনের লক্ষ্য এই মত প্রচার করিয়াছেন। চার্ব্বাকগণ অনেক স্থলে বর্ত্তমান সুখের অত্যন্ত পক্ষপাতী। তাঁহারা অপহরণ করিয়াও ঘৃত পান করিতে বলেন ; ঋণ করিয়াও সুখ সাধন করিতে বলেন। পাশ্চাত্য হিতবাদিগণ কার্য্যের সুখপ্রদ ফল সম্বন্ধে বিবেচনা করিতে এত সঙ্কীর্ণ প্রথা অবলম্বন করেন নাই। বেস্থাম (Bentham) বলেন যে, সুখ দুঃখের পরিমাণ স্থির করিতে হইলে, তাহাদিগের নিম্নলিখিত অবস্থার বিষয় আলোচনা করা আবশ্যক,—

১ম—তীব্রতা।

২য়—স্থায়িত্ব।

৩য়—নিশ্চয়তা।

৪র্থ—নৈকট্য।

৫ম—উৎপাদিকা-শক্তি অর্থাৎ এক প্রকারের সুখ বা দুঃখ হইতে অপর প্রকারের সুখ বা দুঃখ হয় কি না।

৬ষ্ঠ—নির্ম্মলতা অর্থাৎ সেই সুখ বা দুঃখ হইতে তদ্বিপরীত দুঃখ বা সুখ উৎপন্ন হয় কি না।

৭ম—বিস্তৃতি অর্থাৎ সেই সুখ বা দুঃখ কত লোক ভোগ করে।

অষ্টিন (Austin) বলেন, কার্য্যের ফল বিচার করিবার সময় একাকী সেই কার্য্য করিলে কি ফল হয়, তাহার বিবেচনা করিলেই চলিবেক না, পরন্তু জনসাধারণ সেই কার্য্যে ব্রতী হইলে, তাহার ফল কিরূপ হয়, তাহাই বিবেচনা করিতে হইবে।

এইরূপে হিতবাদ পরার্থতার সহিত সংযুক্ত হইয়া, চার্ব্বাক-অভীপ্সিত ঘোরতর সঙ্কীর্ণ স্বার্থবাদ হইতে পৃথক হইয়া পড়িয়াছে।

গ্রীক ও রোমান দার্শনিকগণ সাধারণতঃ স্বার্থবাদী নহেন। তাঁহাদিগের সৌন্দর্য্য বোধ ও সম্পূর্ণতার পক্ষে বিভিন্ন অংশের সুচারু সম্মিলনের আবশ্যকতার অনুভব শক্তি বিশেষ প্রবল ছিল। তাঁহারা সর্ব্বগুণাধার মনুষ্যত্বের উপাসক ছিলেন। বন্ধুতা, বদান্যতা, ন্যায়পরতা, পরার্থতা ও বীরত্ব প্রভৃতি সদ্‌গুণ দেবচরিত্র নিষ্পাপ আদর্শ মনুষ্যের উপযুক্ত বলিয়াই এই সকলের অনুশীলন করিতেন। তাঁহারা ফলাফলের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া, গুণের নিমিত্তই গুণের পক্ষপাতী হইতেন। বিভিন্ন মতাবলম্বী দার্শনিকগণের মনোভাব ব্যাখ্যা করিবার উদ্দেশ্যে দার্শনিক লক (Looke) বলেন যে, "প্রতিজ্ঞা পূরণের কর্ত্তব্যতার হেতু কি?" এই প্রশ্নের উত্তরে পরজন্মে সুখ দুঃখ ভোগে বিশ্বাসী ক্রিশ্চিয়ান বলিবেন, যে ইহা পাপ-পুণ্যের অনন্ত-ফলদাতা সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের আদেশ; হবস্-মতাবলম্বী দার্শনিক বলিবেন যে সমাজ শাসকের ইহা নিয়ম এবং নিয়মভঙ্গ করিয়া, প্রতিজ্ঞা পূরণ না করিলে, প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গকারী নিয়মমতে দণ্ডিত হইবে। খ্রীষ্ট-পূর্ব্ব দার্শনিক বলিবেন যে, এরূপ না করা অসৎ কার্য্য, মনুষ্যত্বের গরিমানাশক, ধর্ম্মবিরুদ্ধ ও মনুষ্যত্বের সর্ব্বাঙ্গীন স্ফূর্ত্তির বিরোধী।

If a Christian who has the view of happines and misery in another life, be asked why a man must keep his word, he will give this as a reason because God, who has the power of eternal life and death, requires it of us. But if an Hobbist be asked why, he will answer, because the public requires it and the Leviathan will punish you if you do not. And if one of the old heathen philosophers had been asked, he would have answered, because it was dishonest, below the dignity of man and opposite to virtue, the highest perfection of human nature, to do otherwise. (Looke's Esseys I. 3.)

প্রাচীন দার্শনিকদিগের মধ্যে এপিকিউরাস (Epicurous) সুখবাদী ছিলেন। কিন্তু তাঁহার মতবাদ সে সময়ে আধুনিক কালের ন্যায় এত বিস্তৃত ভাবে আদৃত হইত না। ফলতঃ প্রাচীন দার্শনিকদিগের সাধারণ মত এই ছিল যে, সুখই যদি জীবনের লক্ষ্য হইত, স্বার্থসিদ্ধিই যদি আমাদিগের কর্ত্তব্য হইত, তাহা হইলে বন্ধুতা, ন্যায়পরতা, বদান্যতা প্রভৃতি

মনুষ্য হৃদয়ের সদ্বৃত্তিগুলির লোপ হইয়া যাইত। মনুষ্যমধ্যে বীরত্বের উত্তেজনা কি থাকিত? ক্লেশকে যে দূরে রাখিতে চায়, সে কি কখনও বীর বলিয়া গণ্য হইতে পারে? মহাজ্ঞানী সক্রেটিস পাপকে শরীরের স্ফোটকের স্বরূপ বর্ণনা করিয়া দুঃখকে স্ফোটকে অস্ত্র প্রয়োগের সহিত তুলনা করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, অস্ত্র প্রয়োগ দ্বারা যেমন স্ফোটকের দূষিত রক্ত বাহির করা হয়, সেইরূপ দুঃখ ও কষ্ট ভোগ দ্বারা আমাদিগের পাপক্ষয় হইয়া থাকে।

ফলাপেক্ষী না হইয়া সদ্‌গুণের জন্যই সদ্‌গুণের চর্চ্চা করিবার প্রবৃত্তি সম্বন্ধে হিতবাদিগণ বলেন,—

কতকগুলি প্রিয় জিনিসের দ্বারা আমাদিগের ভাল অর্থাৎ সুখ বৃদ্ধি হয় বলিয়া আমরা প্রথমতঃ ধারণা বা কল্পনা করি। ক্রমে সেই সকল জিনিস ও সুখবোধ একত্র মনোমধ্যে এরূপভাবে বিজড়িত হইয়া পড়ে যে, একের চিন্তা করিলে অপরটী সঙ্গে সঙ্গে মনোমধ্যে উদিত হয়। এবং মনের এই সংমিশ্রণ ভাব, সংমিশ্রণের প্রকৃত কারণ লোপ হইতেও মনে থাকিয়া যায়। এই সঙ্গে অর্থ বা ক্ষমতা দ্বারা আমাদিগের সঙ্কল্প সিদ্ধি হয় বলিয়াই অর্থ ও ক্ষমতা অর্জ্জনের জন্য সকলেই চেষ্টিত হয়।

We first perceive or imagine some real good; i.e. fitness to promote our happiness in those things which we love or approve of.........Hence these things and pleasures are so tied together and associated in our minds that we cannot present itself, but the other will also occour. And the association remains even after that which at first gave them the connection is quite forgotten, or perhaps does not exist, but the contrary. Gay's Essays p. p. 11

Thus as soon as we come to apprehend the use of wealth or power to gratify any of our original desires we must also desire them. Hence arises the universality of those desires of wealth and power, since they are the means of gratifying all our desires. (Hutchison on the Passions.)

হিতবাদিগণের বিরুদ্ধমতাবলম্বী দার্শনিকগণ বলেন যে, অন্যান্য বৃত্তির ন্যায় আমাদের সদসৎ বিচারের বা কর্ত্তব্য বোধের একটী বৃত্তি আছে। সেই বৃত্তি কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়াই আমরা কর্ত্তব্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হই। যদি এই বৃত্তি না থাকিত, তাহা হইলে কোনও কার্য্য সুখদায়ক হইলেই যে তাহা আমাদের কর্ত্তব্য কার্য্য ইহা আমরা কিরূপে বুঝিতে পারি? সদ্‌গুণের আনুষঙ্গিক ফল সুখ হইতে পারে, কিন্তু এই ফল লক্ষ্য করিয়াই যদি কার্য্য করা হইত, তাহা হইলে সেই সদ্‌গুণের সুচারু অনুশীলন হইতেই পারিত না এবং নিঃস্বার্থ না হইলে এইরূপ কার্য্যের গরিমা বা মহত্ব থাকিত না।

যে সুখ দুঃখের কথা হইতেছে, তাহা লৌকিক, জন্ম ও অবস্থা-সাপেক্ষ; ইন্দ্রিয়াদি ও মানসিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। দেখা যায় শারীরিক ও মানসিক বৃত্তির অনুশীলনের ফলে শরীর ও মন গঠিত হইলে বাহ্যবস্তু সকল বিভিন্ন ভাবে শরীর ও মনকে উত্তেজিত করে এবং তৎফলে সুখ ও দুঃখের অনুভব বিভিন্নরূপ হয়। বেন্থাম (Bentham) বলেন যে, অনুভবশক্তি প্রধানতঃ জন্মগত প্রকৃতি অর্থাৎ জন্ম-

কালীন শারীরিক উপাদান ও জীবনব্যাপী মূল প্রবৃত্তির উপর নির্ভর করে। জন্মান্তরবাদিগণ ইহাকে পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সংস্কার বলিয়া থাকেন। এই সংস্কার পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের স্বকৃত কার্য্যের ফলস্বরূপ ভৌতিক শরীরের উপাদান সকলের সমবেত চেষ্টা মাত্র। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন "যাহা হইতে ভূত সকলের উৎপত্তি ও বৃদ্ধি হয় তাহাই কর্ম্ম"। এইরূপে জন্মগত প্রবৃত্তি বা মূল সংস্কার, বাহ্যবস্তুর সহিত সংযোগকালীন শরীর ও মনের অবস্থা এবং বাহ্যবস্তু এই তিনটীর উপর আমাদের সুখ দুঃখ নির্ভর করে। কর্ম্মবদ্ধ প্রাণীগণ আসক্তি ও তাহার ফলস্বরূপ সুখ ও দুঃখের প্রভাব এড়াইতে পারে না। সুখ ও দুঃখের এবংবিধ সর্ব্বগত প্রভাব উপলব্ধি করিয়া পাশ্চাত্য হিতবাদিগণ সুখ দুঃখকে তাঁহাদের নীতিশাস্ত্রের মূলভিত্তি করিয়াছেন।

The principle of utility recognises this subjection (the governance of two sovereign masters pleasure and pain) and assumes it for the foundation of that system, the object of which is to rear the fabric of felicity by the hands of reason and of law. Bentham's Principles of Morals and Legislation book 1.

এবং দণ্ডনীতিজ্ঞ সুধী ও সমাজশাসকগণ ইহাদিগকে পুরস্কার ও দণ্ড স্বরূপে ব্যবহার করিয়া সমাজ রক্ষার উপায়ে পরিণত করিয়াছেন।

চার্ব্বাক-বিরোধী প্রাচ্য দার্শনিকগণ উপরোক্ত অবস্থাসাপেক্ষ অনিত্য সুখ দুঃখের অধীনতা মুক্তির বিরোধী বলিয়া সুখ ও দুঃখ উভয়ই বর্জ্জনীয় না হইলেও বাঞ্ছনীয় নহে বলিয়াছেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন "হে অর্জ্জুন বাহ্য বস্তুতে ইন্দ্রিয়ের অভিনিবেশই শীতোষ্ণ সুখ দুঃখের হেতু। উহা উৎপত্তি ও বিনাশশীল সুতরাং অনিত্য, অতএব তাহা সহ্য কর"।

বেন্থাম বলেন, যে প্রাণীর মনে আমরা সুখ বা দুঃখের উদ্রেক করিতে না পারি, সে আমাদের আয়ত্তের সীমার বহির্ভূত-সম্পূর্ণ স্বাধীন। মুক্তির লক্ষণ সম্বন্ধে হিন্দু-দর্শনশাস্ত্রে মতভেদ দেখা যায়। কোন কোন দর্শনের মতে দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তিই মুক্তি। লৌকিক প্রতীকারে দুঃখের নিঃশেষ হয় না। কিয়ৎকালের জন্য নিবৃত্ত থাকিয়া, পুনর্ব্বার প্রকাশ পায় অথবা এক প্রকার দুঃখের শান্তি হইলে, অন্য প্রকার দুঃখ উপস্থিত হয়। অতীত দেহের জন্মাবধি মরণ পর্য্যন্ত জীব কেবল দুঃখের প্রতীকার করিয়াছে, বর্ত্তমান দেহেরও জন্মাবধি মরণ পর্য্যন্ত তাহাই করিতেছে এবং ভাবী দেহেরও জন্মাবধি মরণ পর্য্যন্ত তাহাই করিবে। কিন্তু কোন প্রকার উপায়ে যদি অনন্তকালের মধ্যে আর কখন দুঃখের মুখাবলোকন করিতে না হয়, তাহা হইলেই দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি হইল—তাহাই মুক্তি। লৌকিক সুখ মাত্রেই দুঃখমিশ্রিত। কোন কোন প্রাচীন ও আধুনিক দার্শনিকের মতে দুঃখের সাহায্য ব্যতিরেকে সুখ আত্মপ্রকাশে অসমর্থ। তৃষ্ণায় কণ্ঠ শুষ্ক হইলেই সুশীতল জলপানে আনন্দ জন্মে; ক্ষুধায় কাতর হইলেই ভোজনে সুখবোধ হয়। এইরূপ লৌকিক সকল প্রকার সুখই দুঃখের অপেক্ষা করিয়া থাকে। এ সুখ সুখই নহে। দুঃখের সহায়তা ব্যতিরেকে অনন্তকাল নিরবচ্ছিন্ন সুখানুভবই সুখ এবং তাহাই মুক্তি। বেদান্ত মতে জীবে বাস্তবিক দুঃখ সম্বন্ধ নাই, অবিদ্যাই জীবের দুঃখের কারণ।

দুঃখে সুখভ্রান্তি, অনিত্যে নিত্যতাভ্রান্তি, অশুচিতে শুচিতাভ্রান্তি ও জড়ে চৈতন্য ভ্রান্তিই অবিদ্যা। উপনিষদ বলিয়াছেন, যদি জীব, ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন হইলেন, তাহা হইলে তাঁহার স্বরূপও ব্রহ্মের ন্যায় আনন্দময়। সেই আনন্দস্বরূপের অবিদ্যারূপ আবরণ উন্মোচিত হইলেই জীব মুক্ত অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থিত হয়।

সুখ দুঃখের প্রভাব কি অলঙ্ঘনীয়? অদৃষ্টবাদিগণ কহিয়া থাকেন যে, পূর্ব্বজন্মকৃত কার্য্যের ফলস্বরূপ ইহজন্মে আমরা সুখ ও দুঃখ ভোগ করিয়া থাকি। অধুনাতন কালে এই দুরূহ ও গভীর সমস্যার কেহ যে সন্তোষজনক মীমাংসা করিতে সক্ষম হইবেন তাহার সম্ভাবনা অল্প। দৈবশক্তি দ্বারা মনুষ্যজীবন কিভাবে শাসিত হইতেছে, তাহা আমাদিগের অজ্ঞেয়। চিন্তাশীল ফরাসী পণ্ডিত ভলটেয়ার কহিয়াছেন, ঘটনাবলীর মূল আবিষ্কার করিবার শক্তি আমাদের নাই। জগতে আসিয়া কার্য্য করিয়া থাকি এবং সময় আসিলেই মরিয়া যাই। বঙ্গের খ্যাতনামা প্রতিষ্ঠাশালী কবি ও লেখক শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষের বুদ্ধদেব-চরিত নামক পুস্তক হইতে নিম্নলিখিত গীতটী এ স্থলে উদ্ধৃত করিলাম,—

"জুড়াইতে চাই——কোথায় জুড়াই?
কোথা হতে আসি কোথা ভেসে যাই?
ফিরে ফিরে আসি কত কাঁদি হাসি
কোথা যাই সদা ভাবি গো তাই।
কে খেলায় আমি খেলি বা কেন,
জাগিয়ে ঘুমাই কুহকে যেন,
এ কেমন ঘোর হবে নাকি ভোর,
অধীর—অধীরে যেমতি সমীর
অবিরাম গতি——নিয়ত ধাই।"

এই সকল উক্তি প্রাণীগণের অনিত্যতার উপলব্ধির সহিত তাহাদের নিত্যতার অনুভবের সংমিশ্রণ-জনিত সংশয়ের মধুর অস্ফুট কাকলি বলিয়া মনে হয়। জীবের অনিত্যতা ও নিত্যতা সম্বন্ধে উপলব্ধির তারতম্য অনুসারে সুখ ও দুঃখের প্রকৃতি সম্বন্ধে মতের পার্থক্য ঘটিয়া থাকে। অনিত্যতা বোধের প্রাবল্যের উপর অনেক সময়েই বর্ত্তমান অবস্থার প্রতি আস্থার প্রাবল্য নির্ভর করে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে সুখের প্রতি আসক্তিও প্রবল হয়। আসন্ন ধ্বংসের সুস্পষ্ট উপলব্ধি করিয়া ইজিপসিয়ান ফারওয়া বলিয়াছিলেন যে, আজ পান ভোজন ও আনন্দে উন্মত্ত হও, কারণ কালই আমাদিগকে মরিতে হইবে। কোন বাউল সম্প্রদায়ও গাহিয়াছিল—"হেসে খেলে নাও রে যাদু পার যে কদিন।" প্রাণীগণের অনিত্যতা, কামের প্রভাব ও লোভের কার্য্যকারিতা স্বীকার করিয়াই স্বার্থবাদের উৎপত্তি হইয়াছে এবং প্রত্যেক মনুষ্যের বিনাশ ঘটিলেও সমাজের নিত্যতার ব্যতিক্রম হয় না ইহা উপলব্ধি করিয়াই স্বার্থবাদ আধুনিক পরিসর প্রাপ্ত হিতবাদে পরিণত হইয়াছে। আধুনিক হিতবাদিগণের মতে, কার্য্যের ফল সম্বন্ধে বিবেচনা করিতে হইলে, ব্যক্তিবিশেষের সুখের পরিমাণ দেখিলে চলিবে না সমাজের সুখের পরিমাণও দেখিতে হইবে, অর্থাৎ greatest good দেখিলেই চলিবে না, greatest good of the greatest number দেখিতে হইবে। মুক্তিমার্গাবলম্বী ভারতীয় দার্শনিকগণ জীবের নিত্যতা স্বীকার করিয়া বর্ত্তমান জীবনের সর্ব্বপ্রাধান্য স্বীকার করেন না। এবং বর্ত্তমান অনিত্য, অবস্থাসাপেক্ষ সুখ দুঃখকে তাহাদের ক্ষণিক-ধর্ম্মিত্বের উপযুক্ত স্থান নির্দ্দেশ করেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—"ভূত সকল আদিতে অব্যক্ত, মধ্যে ব্যক্ত, আবার নিধনে অব্যক্ত, সেখানে

শোক বিলাপ কি ?"—"বুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তি সুকৃত দুষ্কৃত উভয়ই পরিত্যাগ করিবেন", অর্থাৎ মুক্তিলাভের জন্য সুখপ্রদ ও দুঃখপ্রদ উভয়বিধ কার্য্যই অনাসক্ত হইয়া করিবেন। বিনাশশীল ব্যক্তিদ্বারা গঠিত আমাদের স্থিরস্থায়িত্ব স্বীকারের ফলে স্বার্থবাদ যেরূপ হিতবাদে পরিণত হইয়াছে, সেইরূপ ব্যক্ত জীবের অব্যক্ত অবস্থা অর্থাৎ ভূত সকলের নিত্যতা এবং কাম ও লোভের মুক্তি-বিরোধিত্ব ও তাহাদের প্রভাবের অতিক্রমণীয়তা স্বীকারের ফলে ঈশ্বরবাদী হিন্দু দার্শনিকগণের হস্তে হিতবাদও মুক্তিবাদে পরিণত হইয়াছে। নিত্যজীবের অনিত্য অবস্থার প্রতি আসক্তি পরিহার্য্য বলিয়াও সমাজরক্ষার্থ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে কহিলেন, "যাহারা প্রকৃতির গুণে বিমূঢ়, তাহারা ইন্দ্রিয়ের কর্ম্মে অনুরাগযুক্ত হয়, সেই সকল মন্দবুদ্ধি অল্পজ্ঞান ব্যক্তিদিগকে জ্ঞানীগণ বিচালিত করিবেন না।" "হে ভারত! যেমন অবিদ্বানেরা কর্ম্মে আসক্তিবিশিষ্ট হইয়া কর্ম্ম করিয়া থাকে, তেমনই লোকসংগ্রহচিকীর্ষু (অর্থাৎ লোকরক্ষার্থ) বিদ্বানেরা অনাসক্ত হইয়া কার্য্য করিবেন।"

হিতবাদিগণ মুক্তিবাদীদিগের স্বীকৃত বদ্ধাবস্থা ও সুখ দুঃখের প্রভাব অনাতক্রম্য বলিয়া থাকেন কিন্তু মুক্তিবাদিগণ জীবের নিত্যতা স্বীকার করিয়া এই অবস্থা অতিক্রম্য বলিয়া থাকেন। অর্জ্জুন মনের নিগ্রহ বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করিলে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, "হে মহাবাহো! মন দুর্নিগ্রহ ও চঞ্চল ইহাতে সংশয় নাই; কিন্তু হে কৌন্তেয়, কর্ম্মযোগাভ্যাস দ্বারা এবং তদুৎপন্ন বৈরাগ্য দ্বারা মনকে নিগৃহীত করা যায়।" এ সম্বন্ধে বিবেচনা করিতে হইলে "জীবের স্বাধীনতা কত দূর ?" এই প্রশ্ন মনোমধ্যে উদয় হয়। দার্শনিকগণ ঈশ্বরে জীবের চালকতা, কর্ম্মফল, নিয়ম প্রভৃতি স্বীকার করিয়াও জীবের স্বাধীনতা প্রায় অসীম বলিয়া থাকেন। এ বিষয়ের সবিস্তর আলোচনা এ স্থলে অনাবশ্যক। মহামতি বার্ক (Burke) কহিয়াছেন যে, মনুষ্যই তাঁহার ভাগ্যচক্র পরিচালন করিয়া থাকেন অর্থাৎ তিনিই তাঁহার অদৃষ্টের বিধি স্বরূপ। (It is the prerogative of man to be in a great degree the creature of his own making) দার্শনিক কাণ্ট (Kant) বিবেচনা করেন যে, জীবের যদি স্বাধীনতা না থাকিত, তাহা হইলে মনুষ্য-হৃদয়ে এত অধিক পরিমাণে বিবেচনা ও কর্ত্তব্যবোধ পরিস্ফুট হইত না। শক্তির বহির্ভূত কার্য্যের জন্য কেহ দায়ী হইতে পারে না, এবং দায়িত্ব না থাকিলে কর্ত্তব্যও আইসে না। সুতরাং স্বাধীনতা না থাকিলে পাপ ও পুণ্যের পার্থক্য থাকে না, কারণ ঘটনাচক্র দ্বারা মনুষ্য যদি সম্পূর্ণরূপে পরিচালিত হইত, তাহা হইলে তাহার পক্ষে কোন কার্য্যই পালন করা উচিত বলিয়া বিবেচিত হইত না। অতএব স্বীকার করিতে হয় যে, কর্ত্তব্যের পরিমাণ আমাদিগের সামর্থ্যের উপর নির্ভর করিতেছে। এক্ষণে দেখা যাউক স্বাধীনতা কি ? যে ইচ্ছা করিলে যাহা করিতে পারে, সে তদ্বিষয়ে স্বাধীন, যে যাহা না করিয়া পারে না সে তদ্বিষয়ে অধীন। দেখা যায় একই কর্ম্ম সম্বন্ধে একদিকে আমরা স্বাধীন কিন্তু অন্যদিকে অধীন। আমি ইচ্ছা করিলে ভোজন করিতে পারি, ইচ্ছা না করিলে ভোজন করিব না, অতএব আমি ভোজনে স্বাধীন; কিন্তু ক্ষুধা-প্রেরিত হইয়া ভোজন করিতে বাধ্য। গৃহ নির্ম্মাণ করিতে হইলে উপকরণ সংগ্রহ ও তাহাদিগের যথাযথ সন্নিবেশ বিষয়ে আমি স্বাধীন,

কিন্তু উপকরণ সামগ্রীর মিশ্রণ কালে পরস্পর একীভূত হওয়ার গুণ বিষয়ে আমি অধীন। জন ষ্টুয়ার্ট মিল দ্রব্য উৎপন্ন করিতে হইলে কি কি আবশ্যক এই বিষয়ের আলোচনা করিয়া, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, উৎপন্ন দ্রব্যের উপকরণগুলি যথাস্থানে সন্নিবেশিত করা ভিন্ন মনুষ্য আর কিছুই করে না, অন্য সমস্তই স্বভাবের গুণে হয়। Labour then, in the physical world, is always and solely employed in putting objects in motion; the properties of matter, the laws of nature, do the rest.

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন, "প্রকৃতির গুণ সকলের দ্বারা সর্ব্বপ্রকার কর্ম্ম ক্রিয়মাণ। কিন্তু যাহার বুদ্ধি অহঙ্কারে বিমুগ্ধ সে আপনাকে কর্ত্তা মনে করে।" অতএব দেখা গেল যে, কার্য্য সম্বন্ধে মনুষ্য, প্রকৃতির সম্পূর্ণ অধীন কিন্তু সেই কার্য্য হউক বা না হউক, এই অভিপ্রায় বা সঙ্কল্প সম্বন্ধে মনুষ্য স্বাধীন এবং এই সকল সিদ্ধির জন্য মনুষ্য প্রকৃতির গুণ সকলের আশ্রয় গ্রহণ করে। এই সঙ্কল্প যদি কামনা, সুখেচ্ছা বা ইন্দ্রিয়াদির আসক্তলিপ্সা-প্রেরিত হইয়া উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে কার্য্য না করা সত্ত্বেও সঙ্কল্পকারীকে বদ্ধ হইতে হয়। শ্রীভগবান বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি কর্ম্মেন্দ্রিয় সংযত করিয়া মনে মনে ইন্দ্রিয়ের বিষয় সকল স্মরণ করিয়া থাকে, সেই বিমূঢ়াত্মাকে কপটাচার বলা যায়।" কিন্তু এই সঙ্কল্প যদি কর্ত্তব্যজ্ঞান-প্রণোদিত হইয়া, যথাযথ ভাবে চালিত হয়, তাহা হইলে কার্য্য ও তাহার স্বাভাবিক ফলস্বরূপ সুখাদি ভোগ করিয়াও জীব মুক্ত হইতে পারে। শ্রীভগবান বলিয়াছেন—"হে অর্জ্জুন! কিন্তু যিনি মন দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া কর্ম্মেন্দ্রিয়গণ দ্বারা কর্ম্মযোগ অনুষ্ঠান করেন, ফলকামনাহীন তিনি বিশিষ্ট অর্থাৎ প্রশংসাযোগ্য হন।"

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ দেব।

অভিভাষণ।*

"নানাবেদ-পুরাণদর্শনকথাবিজ্ঞান-
কাব্যস্মৃতি
ছন্দো ব্যাকরণাভিধানগণিতালঙ্কার-
পারং গতাঃ।
যস্যাস্তে তনয়া গুণৈকনিলয়া বাণী-
প্রিয়া সন্ততং
শ্রীমদ্ভারত মাতরং ভগবতীং তাং
রত্নগর্ভাং ভজে॥

যাঁহার কৃপাবিন্দুঃ—
"বাচালং বিকলং খলং শ্রিতমলং কামাকুলং
ব্যাকুলং
চণ্ডালং তরলং নিপীতগরলং দোষাবিলক্ষা-
খিলম্॥"

করে, তাঁহারই মঙ্গলময় ইচ্ছায় বঙ্গের বাণীপুত্রগণ বঙ্গসাহিত্যের চরণে ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ মানসে, বঙ্গের সুদূর প্রান্তস্থিত মানস-সরোবরোত্থিত পবিত্র ব্রহ্মপুত্র নদের তীরবর্ত্তী, এই ক্ষুদ্র ময়মনসিংহ নগরীতে আগ্রহান্বিত ও ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে সমবেত হইয়াছেন; ইঁহাদের সমাগমে এই নগরী

---

* ময়মনসিংহ-সাহিত্য-সম্মিলনীর অভ্যর্থনাসমিতির সভাপতি সুসঙ্গের অধিপতি শ্রীযুক্ত মহারাজা কুমুদচন্দ্র সিংহ বাহাদুর বি, এ, মহাশয়ের অভিভাষণ।

অদ্য পবিত্র তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। অদ্যকার এই মিলন ময়মনসিংহের ভবিষ্য ইতিহাসে একটী চিরস্মরণীয় দিবস বলিয়া প্রকীর্ত্তিত হইবে। ইতঃপূর্ব্বে ময়মনসিংহের পক্ষে এই প্রকার ভাগ্যোদয় আর কখনও হয় নাই।· মিলনক্ষেত্র মাত্রই চিরকাল ভারতে তীর্থক্ষেত্ররূপে ঘোষিত হইয়াছে। নৈমিষারণ্য প্রভৃতি ঋষিদিগের মিলনস্থান ভারতের পবিত্র তীর্থ। সমাগত ভদ্রমহোদয়গণের অনেকেই বহুক্লেশ ও অসুবিধা ভোগ করিয়াও, এক মহান উদ্দেশ্যে এখানে উপস্থিত হইয়াছেন, কিন্তু আমরা কি দিয়া আজ তাঁহাদের সমুচিত আদর অভ্যর্থনা করিব, কি উপকরণে অতিথি-সৎকার করিব, তাহা উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না; তবে এইমাত্র জানি যে "গঙ্গা-জলেই গঙ্গাপূজা হয়" সেই ভরসাতে হীনসম্বল হইয়াও, হৃদয়ের অকৃত্রিম ভক্তি উপহারসহ ভক্তবৃন্দের অভ্যর্থনা করিতে সাহসী হইয়াছি; ভরসা করি আমাদের এই উপহার উপেক্ষিত হইবে না। বহুতর যোগ্য ব্যক্তি থাকা সত্বেও আমার উপর অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতির পদ অর্পিত হওয়ায় আমি নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করিয়াছি; কিন্তু আমি এই বরণীয় পদোচিত কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে পারিব কি না, তাহা বলিতে পারি না। সমগ্র ময়মনসিংহবাসীর পক্ষ হইতে এবং ব্যক্তিগত ভাবে হৃদয়ের কবাট উন্মুক্ত করিয়া মহোদয়গণকে সাদরে অভ্যর্থনা করিতেছি, আপনারা অনুগ্রহপূর্ব্বক সম্মিলনীর শুভ উদ্দেশ্য মনে রাখিয়া আমাদের সর্ব্বপ্রকার ত্রুটি মার্জ্জনা করুন ইহাই একান্ত প্রার্থনীয়।

বঙ্গসাহিত্য-সম্মিলনী আজ চতুর্থ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে, আজ ইহার শৈশবাবস্থা। যাঁহার মঙ্গলময় ইচ্ছায় বিগত তিনবর্ষ ক্রমান্বয়ে বহরমপুরে, ভাগলপুরে ও রাজসাহীতে ইহার বাৎসরিক অধিবেশন কার্য্য নিরাপদে সম্পন্ন হইয়াছে, তাঁহারই অপার করুণাবলে বর্ত্তমান অধিবেশনের কার্য্যও সুসম্পন্ন হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই এবং সম্মিলনী ক্রমে যৌবন ও প্রৌঢ়াবস্থা অতিক্রম করতঃ পরিণত অবস্থায় উপনীত হইবেন। বাণীবিদ্যাবিধায়িনী, শ্বেতপদ্মাসনা, বীণাপুস্তক-রঞ্জিতহস্তা সর্ব্বশুক্লা বাগ্‌দেবী আমাদের কার্য্যের সহায় হউন।

যে বঙ্গভাষা বহুকাল উপেক্ষিতা হইয়া দীনহীনা বেশে বঙ্গগৃহে বিরাজমানা ছিলেন, তিনি সম্প্রতি কোন অদৃশ্য মন্ত্রশক্তিবলে উদ্বোধিতা হইয়াছেন; চারিদিক হইতে কি যেন একটা উৎসাহের প্রবল উদ্দীপনা আসিয়া নিদ্রিতা ভাষাকে জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছে। এখন আর তিনি দীনা, কৃশা ও উপেক্ষিতা নহেন, তিনি ক্রমে হৃষ্টাপুষ্টা লাবণ্যময়ী ও সর্ব্বাভরণভূষিতা হইয়া আমাদের সমক্ষে বরাভয়হস্ত লইয়া তাঁহার লাবণ্যছটায় দিগ্‌দিগন্ত উদ্ভাসিত করতঃ কল্যাণময়ী মূর্ত্তিতে দাঁড়াইয়াছেন। আসুন আমরা সকলে তাঁহার শ্রীচরণে ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করি এবং সাষ্টাঙ্গে প্রণত হই, তিনি আমাদের প্রতি কৃপানেত্রে চাহিবেন এবং আমাদের অশেষ কল্যাণবিধান করিবেন। ভাই বঙ্গবাসিগণ! তোমরা সকলে তাঁহার গলদেশে নানারত্নবিভূষিত কণ্ঠহার পরাইয়া দাও, তিনি জগতের সমক্ষে সাহিত্য-সম্রাজ্ঞীরূপে দণ্ডায়মানা হউন এবং আমরাও তাঁহাকে দেখিয়া দুর্লভ মানব জন্ম সফল করি।

বঙ্গভাষার ক্ষুদ্র ও বৃহৎ স্রোতস্বতী সমূহ, কোটী বা নির্ম্মল বারিরাশি বহন-

পূর্ণ পঙ্কিল জলরাশি ধারণ করিয়া মৃদুমন্দ গতিতে অথবা প্রবল তরঙ্গভঙ্গ বিস্তার করতঃ বঙ্গসাহিত্যরূপ বিশাল সাগরাভিমুখে প্রধাবিত হইতেছে; এইগুলির সমস্ত সুস্বাদুতোয়া নহে, তথাপি সকলেরই গতি সাগরাভিমুখী। সাহিত্যসাগরেও নানাবিধ রত্ন ও নক্র-কুম্ভীরাদি বর্ত্তমান কিন্তু সাহিত্যের অতলস্পর্শ জলধিগর্ভ হইতে নিপুণ-রত্নগ্রাহীর ন্যায় বহুমূল্য রত্নরাজি আহরণ করতঃ সুশোভন মাল্য গ্রথিত করিয়া বঙ্গভাষার গলদেশে অর্পণপূর্ব্বক তাঁহাকে অপূর্ব্বশ্রীসম্পন্ন ও মহিয়সী করিয়া তুলাই আমাদের কর্ত্তব্য; ইহা করিতে পারিলেই আমাদের জাতীয় গৌরব রক্ষিত হইবে এবং সম্মিলনীর জন্মগ্রহণেরও সার্থকতা হইবে।

বঙ্গসাহিত্য ও ভাষা কতকালের এবং তাহার মূল প্রস্রবণ কোথায়, এ সমস্ত তত্ত্বের অনুসন্ধান-প্রয়াস আমার অধিকার-বহির্ভূত, অতএব অদ্য এ বিষয়ের কোনও আলোচনা সমীচীন নহে। মহাকবি জয়দেবের মধুর কোমলকান্ত পদাবলী হইতেই যে চিরকোমলতাময়ী সুললিত বঙ্গভাষা ক্রমে উন্মেষিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে এবং বিদ্যাপতি, চণ্ডিদাস, জ্ঞানদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিগণের অপরিসীম প্রতিভাদ্বারা যে তাহা ক্রমে পুষ্টিলাভ করিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইতঃপর কৃত্তিবাস, কাশীরাম দাস, ভারতচন্দ্র, দাশরথী রায়, নিধুবাবু প্রভৃতি কবিগণ এবং রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মদনমোহন তর্কলঙ্কার, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, কালীপ্রসন্ন সিংহ, প্যারিচাঁদ সরকার, অক্ষয়কুমার দত্ত, রঙ্গলাল, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র দত্ত, কালীপ্রসন্ন ঘোষ, হেমচন্দ্র, রজনীকান্ত গুপ্ত, নবীনচন্দ্র, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, রবীন্দ্রনাথ, চন্দ্রনাথ বসু, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, দীনেশচন্দ্র সেন, প্রভৃতি মহামনস্বী বঙ্গসন্তানগণের অক্লান্ত পরিশ্রমে এবং প্রতিভাবলে বঙ্গভাষা আজ মোহনমূর্ত্তিতে আমাদের নয়নপথবর্ত্তিনী হইয়াছেন এবং তাঁহার এই মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিয়া জগৎবাসী বিমুগ্ধ হইয়াছে এবং আমাদের আশা হইতেছে, তিনি অচিরাৎ ভাষা-জগতে অতি বরণীয় স্থান অধিকার করিবেন।

ভাষার শ্রীবৃদ্ধিসাধন স্বদেশপ্রেমিক ব্যক্তিমাত্রেরই কর্ত্তব্য; বাঙ্গালী হইয়া যিনি বঙ্গভাষার আলোচনায় হতশ্রদ্ধ, তিনি নিতান্ত হতভাগ্য। এতাদৃশ ব্যক্তি অন্য বহুগুণান্বিত হইলেও তিনি প্রশংসার্হ নহেন। বর্ত্তমানকালে আমরা যে প্রবল পরাক্রান্ত, পরমবিদ্যোৎসাহী ও অশেষ জ্ঞানসম্পন্ন জাতির শাসনাধীনে বাস করিতেছি, তাঁহাদের কৃপায় পৃথিবীর নানাভাষার জ্ঞানভাণ্ডারের দ্বার আমাদের সম্মুখে উন্মুক্ত হইয়াছে, ইচ্ছা করিলেই আমরা ঐ সমস্ত ভাষার রত্নরাজি আহরণ করতঃ বঙ্গভাষার রত্নভাণ্ডার পূর্ণ করিতে পারি। এই সুযোগ অবহেলায় হারাণ আমাদের দূরদর্শিতা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক হইবে না। পক্ষান্তরে অমৃতনিস্যন্দিনী অনন্ত জ্ঞানের ভাণ্ডার, জগন্মোহিনী সংস্কৃত ভাষার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিলে আমাদিগকে পরিণামে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্থ হইতে হইবে। উক্ত ভাষার রত্নসমূহ সংগ্রহ করতঃ পৃথিবীর কত জাতি ধনী হইতেছেন, পক্ষান্তরে সে সমস্ত আমাদের গৃহকোণে ধূলিধূসরিত অবস্থায় হতাদরে ক্রমে বিলয়-দশা প্রাপ্ত হইতেছে, ইহা অপেক্ষা পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে? সময় থাকিতে সতর্কতাবলম্বন সর্ব্বথা বিধেয়। পৈতৃক সম্পত্তি রক্ষা করিয়া

তাহার বৃদ্ধিসাধন চেষ্টাই সুধীজন-সম্মত। পরধনে সমৃদ্ধ হওয়া তত সহজসাধ্য নহে।

বঙ্গভাষায় বহু কাব্য, নাটক, উপন্যাস, প্রহসন প্রভৃতি রচিত হইয়াছে এবং হইতেছে, কিন্তু নিতান্ত লজ্জা ও দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, তন্মধ্যে কতকগুলি গ্রন্থের রুচি এতই বিকৃত যে, তদ্দ্বারা ভাষার অঙ্গ পুষ্টি না হইয়া পক্ষান্তরে তাহার স্বাস্থ্য হানি হইতেছে এবং দেশেরও মহা অনিষ্ট হইতেছে। সময়োচিত ভেষজ প্রয়োগ দ্বারা স্বাস্থ্যোন্নতি সাধন করিতে না পারিলে ক্রমে ভাষার দুর্ব্বলতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে এবং তাহার দুরবস্থারও একশেষ হইবে। ভরসা করি সম্মিলনী উপযুক্ত ভেষজ প্রয়োগের চেষ্টা করিবেন। দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, ভৈষজ্যতত্ত্ব বিষয়ক ও গণিতাদি শাস্ত্রবিষক গ্রন্থ বঙ্গভাষায় বিরলপ্রচার। সুখের বিষয় অধুনা এবম্বিধ গ্রন্থাদি প্রচারের সময়োচিত প্রয়াস দেখা যাইতেছে, ইহা শুভ লক্ষণ বটে। ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব, উদ্ভিদতত্ত্ব, রত্নতত্ত্বাদি বিষয়ে কোনও গ্রন্থ অদ্যাপি বঙ্গভাষায় প্রচারিত হয় নাই, কিন্তু বঙ্গের কোনও কোনও সুসন্তান এসকল বিষয়ে গ্রন্থ প্রকাশেও মনোনিবেশ করিয়াছেন, ভরসা হয় অচিরে বঙ্গভাষার এ সমস্ত অভাব পূর্ণ হইবে। বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক গ্রন্থাদি প্রণয়ন করিতে হইলেই কতকগুলি পারিভাষিক শব্দ সঙ্কলন অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। "বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্" ও "সাহিত্য-সভা" প্রভৃতি বোধ হয় এবিষয়ে সমুচিত চেষ্টা করিবেন এবং করিতেছেন।

প্রাচ্য জ্ঞান (পারমার্থিক জ্ঞান) ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের (জড়বিজ্ঞান, গণিত ও শিল্প-শাস্ত্রাদির) সমন্বয় সাধন দ্বারাই সভ্যতার চরমোৎকর্ষ সাধিত হইবে এবং সভ্যতার বোধ হয় ইহাই প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত। ভারতবাসীর পক্ষে এই প্রকার চেষ্টা যত সত্বর ফলবতী হওয়া সম্ভবপর পৃথিবীর অপর কোন জাতির পক্ষে তাহা তত অনায়াসসাধ্য নহে। আমার মনে হয় বাঙ্গালীই এই সমন্বয়ের প্রথম পথ প্রদর্শক হইবেন এবং ভারতবর্ষে বঙ্গভাষাই এ সম্বন্ধে অগ্রগণ্য হইবে। অদ্য যে মহাত্মাকে আমরা সভাপতির পদে বরণ করিতে আহ্বান করিয়াছি এবং যাঁহার ছাত্রগণ মধ্যে আমি অন্যতম বলিয়া একটু গর্ব্ব করিতেও সাহসী হইতেছি, সেই স্বনামধন্য, বিশ্ববিশ্রুতকীর্ত্তি অধ্যাপক ডাক্তার শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় তাঁহার অভিনব আবিষ্ক্রিয়া দ্বারা স্বোদ্ভাবিত অপূর্ব্ব যন্ত্র সাহায্যে ইহাই প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে ভারতের সনাতন বেদবাক্য "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" অকাট্য বৈজ্ঞানিক যুক্তি ও সত্যের দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহাতে তিনি জগতের সমক্ষে ইহাও দেখাইয়াছেন যে, হিন্দুর প্রতিভা নির্ব্বাণোন্মুখ হইলেও অদ্যাপি তাহা একেবারে ভস্মীভূত হয় নাই, তাহাতে জ্ঞানের ঘৃতাহুতি প্রদান করিলে তাহা পূর্ব্ববৎ পুনঃ সমুজ্জ্বল হইবে এবং তাহার পবিত্র ও স্নিগ্ধ রশ্মিজালে দিগ্‌দিগন্ত আলোকিত করিতে পারে। "একং সৎবিপ্রাবহুধা বদন্তি" এই বৈদিক বাক্যের সত্যতা ক্রমেই পাশ্চাত্য জগতের বৈজ্ঞানিকগণ সপ্রমাণ করিতেছেন। শ্রীযুক্ত জগদীশ চন্দ্র বসু মহাশয়ের আবিষ্ক্রিয়া তাঁহাদিগকেও বিস্মিত করিয়াছে। বঙ্গের সুসন্তানের এই কীর্ত্তি তাঁহাকে অমর করিবে।

এইজন্যই বলিতে সাহসী হইয়াছি যে বঙ্গবাসীই সর্ব্বাদৌ জ্ঞানবিজ্ঞানের সমন্বয় প্রদর্শনের পন্থা দেখাইবেন। সেদিন বোধ

হয় বহুদূরবর্ত্তী নয়, যেদিন পৃথিবীর এক-প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এই গভীর বেদবাক্য মেঘমন্দ্র-স্বরে প্রতিধ্বনিত হইবে এবং ভারতবর্ষীয় আর্য্য ঋষিগণ যে এক সময়ে জ্ঞানের উচ্চ সীমায় উপনীত হইয়াছিলেন, তাহাও সর্ব্ববাদী-সম্মতরূপে স্বীকৃত হইবে এবং সমগ্র জগৎ বিস্ময়ে তাঁহাদের চরণে ভক্তিভাবে প্রণত হইবে।

আজিকার আনন্দের দিনে পূর্ব্ববঙ্গের সাহিত্য-সম্রাট ৺রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর যদিও নশ্বর দেহে আমাদের মধ্যে বর্ত্তমান নাই, তথাপি তাঁহার অমর আত্মা মানব চক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া যে আমাদের এই সম্মিলনীর উপর কৃপাদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন না এবং আমাদের উপর অমোঘ আশীর্ব্বাদরাশি বর্ষণ করিতেছেন না তাহা কে বলিতে পারে? চন্দ্রকান্তের প্রতিভার স্নিগ্ধোজ্জ্বল রশ্মিজাল চিরতরে তিরোহিত হইলেও, তাহার কিরণছটায় যে বঙ্গের প্রতিগৃহ আলোকিত হইয়াছে তাহা নিভিয়া যাইবে না। রজনীকান্তের বীণা নীরব হইলেও তাঁহার বাণী আজও আমাদের "কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া"—প্রাণ মন আকুল করিতেছে। চন্দ্রনাথের গভীর গবেষণার গম্ভীর ধ্বনি অদ্যাপি আমাদের কর্ণকুহরে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। ইঁহারা সকলেই শান্তিধামে চলিয়া গিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের যশোরাশি চিরকাল তাঁহাদিগকে অমর করিয়া রাখিবে; অতএব এই আনন্দের দিনে তাঁহাদের জন্য আর অশ্রুপাত করিয়া তাঁহাদের আত্মার অকল্যাণ সাধন করিতে ইচ্ছা করি না। "জাতস্য হি ধ্রুবং মৃত্যু-র্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য হি" ভগবদ্বাক্য মনে রাখিয়া শোক সম্বরণ করতঃ ভগবানের নিকট করজোড়ে প্রার্থনা করিতেছি যে, অচিরে ইঁহাদের স্থান ও অভাব পূর্ণ হউক, ভগবান আমাদের কাতর প্রার্থনা অবশ্য শুনিবেন।

আমি অনেক অপ্রাসঙ্গিক কথার অবতারণা করতঃ আপনাদের অমূল্য সময় নষ্ট করিয়াছি, এইজন্য সমবেত ভদ্রমহোদয়-গণের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

বঙ্গসাহিত্যের তরুমূলে সুশীতল বারি সেচন মানসে যে সমস্ত মহাজন সমবেত হইয়াছেন, তাঁহাদের ঐকান্তিক আগ্রহে এবং প্রযত্নে এই তরু শাখা-প্রশাখা বিস্তার করতঃ অচিরে মুকুলিত হউক এবং তাহা কালে সুদৃশ্য পুষ্পে বিশোভিত এবং সুমধুর ফলভরে অবনত হইয়া তাহার স্নিগ্ধছায়া দানে বঙ্গসন্তানগণকে অপার শান্তি প্রদান করুক, ইহাই ভগবানের নিকট প্রার্থনা। বাণীচরণাশ্রিত বাণী-পুত্রগণের মনোবাঞ্ছা অবশ্যই পূর্ণ হইবে। কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদনেই আমাদের অধিকারমাত্র ফলা-ফল তাঁহারই হাতে। আসন গ্রহণ করার পূর্ব্বে "অয়মারম্ভঃ শুভায় ভবতু" বলিয়া পুনরপি সমাগত ভদ্রমণ্ডলীকে সাদর অভ্যর্থনা জানাইতেছি, এবং উপসংহারে নিবেদন করিতেছি যে—

"যং শৈবাঃ সমুপাসতে শিব ইতি ব্রহ্মেতি
বেদান্তিনো,
বৌদ্ধা বুদ্ধ ইতি প্রমাণ পটবঃ কর্ত্তেতি
নৈয়ায়িকাঃ।
অর্হন্নিত্যথ জৈনশাসনরতাঃ কর্ম্মেতি
মীমাংসকাঃ,
সোঽয়ং বো বিদধাতু বাঞ্ছিত ফলং
ত্রৈলোক্যনাথো হরিঃ॥"

বিস্তারেনালমিতি—

শ্রীকুমুদচন্দ্র সিংহ শর্ম্মণঃ।

বংশের উন্নতি বিধান

জীবতত্ত্বের আধুনিক গ্রন্থাদিতে "Eugenics" নামক একটি নূতন কথা স্থান পাইয়াছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে "বংশের উন্নতি বিধান" কথাটাকে উহারি বাঙ্গালা পরিভাষারূপে ব্যবহার করা হইল। "মানব-বংশের উন্নতি বিধান" বলিলে বোধ হয় পরিভাষাটা আরো সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইত; কারণ উদ্ভিদ্ বা মানবেতর প্রাণীর উন্নতি বিধান Eugenicsএর গণ্ডীর ভিতর পড়ে না। আধুনিক সভ্যজাতির সামাজিক বিধিব্যবস্থাগুলিকে ভাঙিয়া চুরিয়া কি প্রকার করিয়া গড়িলে দুর্ব্বল, অকর্ম্ম ও অল্পবুদ্ধি সন্তানের জন্ম নিবারণ করা যাইতে পারে, তাহা বিজ্ঞানানুগত প্রথায় নির্ণয় করা ইহার প্রধান লক্ষ্য।

বিধিব্যবস্থা দ্বারা সমাজকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া কি প্রকারে বংশের উন্নতি ও বিশুদ্ধি বিধান করিতে হয়, আমাদের প্রাচীন পিতামহগণ তাহা খুব বুঝিতেন। ভারতের সমাজপদ্ধতি ও ধর্ম্মতত্ত্বের তলায় তলায় ব্যবস্থাকার ঋষিদিগের সেই অভিপ্রায় অন্তঃসলিলা নদীর স্রোতের ন্যায় আজও প্রবাহিত রহিয়াছে। সুতরাং বৈজ্ঞানিকের বক্তৃতা শুনিয়া হিন্দুসমাজপদ্ধতির পরিবর্ত্তন কল্পনা করা দুর্বুদ্ধির পরিচায়ক হইবে। প্রকৃতির লীলাতে যে মহান ঐক্যের আভাস পাইয়াই আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ অবাক্ হইয়া পড়িয়াছেন, আমাদের ঋষিগণ তাহা বহু শতাব্দী পূর্ব্বে প্রকারান্তরে প্রত্যক্ষ দেখিয়াছিলেন। একই বৃক্ষের পুষ্প-পরাগের আদানপ্রদান করিয়া যে ফল উৎপন্ন করে, তাহা ক্রমেই অবনতি প্রাপ্ত হয়। পরীক্ষাগারে নব্য বৈজ্ঞানিকগণ এই ব্যাপারটী প্রত্যক্ষ দেখিয়া এখন প্রচার করিতেছেন, শোণিত-সম্বন্ধযুক্ত একই পরিবারে পুত্রকন্যার বিবাহ দিলে, বংশের অবনতি অনিবার্য্য। আমাদের ব্যবস্থাকারগণ এই তত্ত্বটাই বহু শতাব্দী পূর্ব্বে বুঝিয়া বিবাহের যে নিয়ম বিধিবদ্ধ রাখিয়াছেন হিন্দুপাঠকের নিকট তাহার পরিচয় প্রদান নিষ্প্রয়োজন।

যাহা হউক সমাজের জটিল তত্ত্ব লইয়া আলোচনা করা লেখকের অধিকার-বহির্ভূত; বংশের উন্নতি-অবনতিকে আধুনিক পণ্ডিতগণ বিজ্ঞানের আলোকে কি প্রকারে দেখিতেছেন এখন তাহার আলোচনা করা যাউক। একই মাতাপিতার সন্তানগুলির আকৃতি পরীক্ষা করিলে দেখা যায়, জনকজননীর বিচিত্র সাদৃশ্য লইয়া তাহারা জন্মগ্রহণ করে। কোন সন্তানের হয় ত চুলগুলি ঠিক পিতার অনুরূপ হইল, কিন্তু চক্ষুর গঠন মাতার ন্যায় হইয়া পড়িল। সন্তানের চরিত্র ও মানসিক বৃত্তিগুলিতেও মাতাপিতার প্রকৃতির এই প্রকার বিচিত্র সম্মিলন দেখা যায়। তা ছাড়া যে পরিবারের সকলেই সুশ্রী বা সদ্গুণসম্পন্ন, তাহাতেও কখন কখন কুশ্রী বা দুর্বৃত্ত কুলাঙ্গারের জন্মও দুর্লভ নয়। জন্ম ব্যাপারে এই সকল বৈচিত্র্য পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বহুকাল ধরিয়া লক্ষ্য করিয়া আসিতেছিলেন। পুরুষানুক্রমিতা Heridity মানুষকে কি প্রকারে গঠন করে, এবং তারপর শিক্ষা ও ইচ্ছাশক্তি তাহার উপর কি প্রকার কার্য্য করে, এগুলিরই মূলতত্ত্ব আবিষ্কার করা ইঁহাদের অভিপ্রায় ছিল। বলা বাহুল্য প্রাচীন পণ্ডিতদিগের দ্বারা এই

গভীর প্রশ্নের মীমাংসা হয় নাই। আধুনিক জীবতত্ত্ববিদ্‌গণ আবার নূতন করিয়া ইহারি গবেষণায় লাগিয়াছেন।

আধুনিক জীব বিজ্ঞানে "Genetics" অর্থাৎ জন্মতত্ত্ব নামক এক শাখা-বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। যাঁহারা আধুনিক বিজ্ঞানের সংবাদ রাখেন তাঁহাদের নিকট ইহার বিশেষ বিবরণ প্রদান নিষ্প্রয়োজন। মাতাপিতার কোন্ কোন্ প্রকৃতি লইয়া জীবগণ সাধারণতঃ জন্মগ্রহণ করে, তাহা অনুসন্ধান করিয়া একটা ব্যাপক নিয়ম দাঁড় করানো এই বিজ্ঞানের চরম লক্ষ্য। বলা বাহুল্য শারীর-বিদ্যাই (Physiology) এই শাস্ত্রের প্রধান ভিত্তি। যাঁহারা ইহাকে অবলম্বন করিয়া আছেন, তাঁহারা দেশ বিদেশে প্রাণি-উদ্ভিদের জীবনের ইতিহাস অনুসন্ধানে যথেষ্ট শ্রম করিতেছেন, এবং কোন জীবে মাতাপিতার কোন্ কোন্ প্রকৃতি কি প্রকারে সংক্রমিত হইল, তাহা আলোচনা করিতেছেন। বংশের উন্নতি বিধান যাঁহাদের লক্ষ্য (Eugenists) তাঁহারা কেবল পুরুষপরম্পরাগত গুণগুলিকে রাখিয়া দোষগুলির উচ্ছেদ সাধনে ব্যস্ত। জন্মতত্ত্ব নির্ণয় যাঁহাদের উদ্দেশ্য (Genetics) তাঁহারা ঐ প্রকার বিশেষ লক্ষ্যের সন্ধানে চলেন না; জন্মতত্ত্বে যাহা কিছু সত্য ও চিরন্তন বস্তু আছে, তাহারি সন্ধান করিয়া জ্ঞানের ভাণ্ডার পূর্ণ করাই ইহাদের কাজ। ভালমন্দের দিকে ইহারা দৃক্‌পাত করেন না। যাঁহারা বংশের উন্নতি বিধানের জন্য বদ্ধপরিকর তাঁহারা এই জন্মতত্ত্ববিদ্‌দিগের নবাবিষ্কৃত সত্যগুলিকে অবলম্বন করিয়া সমাজ-সংস্কারের চেষ্টা করিতেছেন।

যে সকল বিকৃতবুদ্ধি আজন্ম ব্যাধিগ্রস্ত ভিক্ষুক রাজপথে ভিক্ষা করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করে, সে যদি কোন প্রকারে একটি পাত্রী সংগ্রহ করিয়া বিবাহের জন্য উপস্থিত হয়, তবে কোন পাদ্রি, মৌলবী বা পুরোহিত এই পরিণয়ে বাধা দিতে পারেন না। বরং অনুষ্ঠানের শেষে এই প্রকার বরকন্যার মিলনে তাঁহাকে শাস্ত্রানুসারে আশীর্ব্বাদ করিতে হয়। উন্নতিপন্থীর দল প্রথমেই এই প্রকার বিবাহে ঘোর আপত্তি করিতেছেন। শূন্যে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিলে তাহার পতন যেমন অবশ্যম্ভাবী, যাহাদের শরীর ও মন আজন্ম দুর্ব্বল তাহাদের সন্তানগণেরও দুর্ব্বল শরীর ও মন লইয়া জন্মগ্রহণ ঠিক সেই প্রকার অবশ্যম্ভাবী। যক্ষ্মা, কুষ্ঠ, এবং উন্মাদ প্রভৃতি বহু ব্যাধি মানুষকে একবার স্পর্শ করিলে জীবনান্তের সহিতও সেগুলি লোপ পায় না। পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে তাহাদের ধারা পুরুষ হইতে পুরুষান্তরে চলিতে থাকে। সম্প্রতি কয়েকজন বৈজ্ঞানিক নানা দেশের বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের শারীরিক ও মানসিক লক্ষণ লিপিবদ্ধ করিয়া সে গুলির সহিত তাহাদের মাতা পিতা প্রভৃতির কোন ঐক্য আছে কিনা অনুসন্ধান করিতেছিলেন। ইহাতে যে ফল পাওয়া গিয়াছে তাহা অদ্ভুত। কেবল ব্যাধিই সন্তানে সংক্রমিত হয় না, চক্ষুর বর্ণ, কেশ, মস্তকের গঠন, কার্য্যতৎপরতা, নিষ্ঠা এবং সূক্ষ্মদর্শন প্রভৃতি দেহ ও মনের অনেক লক্ষণই পিতামাতার অনুরূপ হইতে দেখা যায়। উন্নতপন্থীরা এই সকল পরীক্ষাসিদ্ধ প্রমাণ উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন, যাহাতে ব্যাধিগ্রস্ত বা দুর্ব্বল প্রকৃতির লোক বিবাহ করিয়া সমাজের ঘাড়ে সেই প্রকার সহস্র সহস্র দুর্ব্বল সন্তানের গুরুভার না চাপায়, তাহার প্রতি সর্ব্বপ্রথমে দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক হইয়াছে।

যাহাদের নীতিজ্ঞান এবং বুদ্ধি আজন্ম অল্প, য়ুরোপ ও আমেরিকায় বড় বড় সহরে রাজব্যয়ে বা জনসাধারণের অর্থে তাহাদিগকে পোষণ করা হইয়া থাকে। উন্নতিপন্থীরা, এই হিতকার্য্যেরও ঘোর বিরোধী হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। ইঁহারা বিজ্ঞানের সত্যের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিতেছেন, যখন মানুষের দেহ ও মনের স্বাস্থ্য পৈতৃক দান, তখন আশ্রম বিশেষে আবদ্ধ রাখিয়া শিক্ষা দিলে মানুষের প্রকৃতি কখনই পরিবর্ত্তিত হইতে পারে না। পলিতকেশ বৃদ্ধ, কেশে কলপ লাগাইয়া বাহিরের লোকের নিকট কিছুদিন যুবক বলিয়া পরিচিত হইতে পারে, কিন্তু ইহাতে তাহার বৃদ্ধত্ব ঘোচে না। যাহারা আজন্ম অক্ষম, অভ্যাস ও শিক্ষার জোরে তাহারা সেই প্রকার কিছুদিন মাত্র সমাজের চক্ষে ধূলি দিতে পারে। ইহারা যখন সন্তানের জনক জননী হইয়া দাঁড়ায় তখন সেই ফাঁকি ধরা পড়িয়া যায়। পৈতৃক শোণিতের দোষে যাহারা অক্ষম ও অল্পবুদ্ধি তাহাদের সন্তানগণ জনকজননীর কৃত্রিম শিক্ষা বা সংস্কারের ভাগ লইয়া ভূমিষ্ঠ হয় না, সহস্র কৃত্রিমতার আবরণ ছিন্ন করিয়া মাতা-পিতার প্রকৃতিগত অক্ষমতাটুকু লইয়াই জন্মগ্রহণ করে। এই যুক্তি দেখাইয়া উন্নতিপন্থীরা বলিতেছেন, হিতানুষ্ঠান বোধে যাঁহারা অক্ষমদিগকে সভ্য-ভব্য করিয়া আশ্রম হইতে বাহির করিতেছেন, তাঁহারা প্রকারান্তরে সমাজের অকল্যাণই করিতে-ছেন। যখন অক্ষম পোষণের ব্যবস্থা ছিল না, স্বাভাবিক দুর্ব্বল ও অকর্ম্মণ্য লোকগুলা যোগ্যব্যক্তিদিগের সহিত প্রতিযোগিতায় পরাভূত হইয়া লোপ পাইয়া যাইত। তখন কৃত্রিম শিক্ষার জোরে সুস্থ হইয়া তাহারা বহু দুর্ব্বল পুত্রকন্যার জনকজননী হইবার সুযোগ পাইত না। শস্যক্ষেত্রের দুর্ব্বল গাছগুলি যেমন পার্শ্বের সুস্থ গাছের চাপে আপনিও মরিয়া যায়, স্বয়ং প্রকৃতি দেবীই সেই প্রকারে অযোগ্যদিগকে যোগ্যতরের নিকট হার মানাইয়া তাহাদের বংশবৃদ্ধির মূলে কুঠারাঘাত করিতেন।

ভাল মন্দ লইয়াই সংসার। সৎ প্রবৃত্তির বীজ যেমন মানুষের দেহে আছে, অসৎপ্রবৃত্তির বীজও সেই প্রকার কোন কোন মানুষে সুপ্তাবস্থায় রহিয়াছে। কাজেই বংশপরম্পরায় উভয়ই সন্তানে সংক্রমিত হইয়া সৎ এবং অসৎ এই দুই শ্রেণীর লোকের উৎপত্তি করিবেই। এখন সমাজের এই অসুস্থ, দুর্ব্বল এবং স্বাভাবিক অল্পবুদ্ধি সম্প্রদায়কে লইয়া কি করা কর্ত্তব্য, তাহা একটা মহা সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইতর প্রাণীগণ এককালে বহু সন্তান উৎপন্ন করে। ইহাদের সন্তান-বাৎসল্য খুব প্রবল নয়; সদ্যজাত সন্তান-গুলিকে প্রকৃতির কোলে দিয়া ইহারা বেশ নিশ্চিন্ত থাকে। প্রকৃতি কখনই স্বাভাবিক দুর্ব্বল ও অক্ষমকে প্রশ্রয় দেন না। ইহারা কঠোর জীবন-সংগ্রামে যোগ দিবা মাত্র, প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরাভব মানিয়া মরিয়া যায়। যাহারা বলিষ্ঠ ও কর্ম্মপটু কেবল তাহারাই টিঁকিয়া থাকে। প্রাণিশ্রেষ্ঠ মানুষ যদি ইতর প্রাণীর ন্যায় এই প্রকারে দুর্ব্বল সন্তানগুলিকে নিঃসহায় অবস্থায় ছাড়িয়া দেয়, তবে তাহা কখনই মনুষ্যোচিত কার্য্য হয় না। উন্নতিপন্থীরা এই সমস্যার মীমাংসার জন্য এক নূতন পন্থা অবলম্বন করিতে পরামর্শ দিতেছেন। ইহারা বলিতেছেন, অক্ষম ও দুর্ব্বলবুদ্ধি লোক-দিগকে, কৃত্রিম শিক্ষা দিয়া সমাজে না ছাড়িয়া, তাহাদের কৌমার্য্য রক্ষা করিয়া বিশেষ আশ্রমে আবদ্ধ রাখা হউক। এই

চিরকুমারগুলিকে উপভোগের সামগ্রী হইতে বঞ্চিত করার আবশ্যক নাই। আশ্রমের চারিদিকে সুবিস্তৃত ক্রীড়াপ্রাঙ্গন ও বৃহৎ উদ্যান থাকুক এবং সঙ্গে সঙ্গে নৃত্য-গীতাদির ব্যবস্থা রাখা হউক। ইহাতে স্বল্পবুদ্ধি অক্ষম নরনারীগুলি সমাজের স্কন্ধে বহু আজন্ম নির্ব্বোধ অপত্যের ভার না চাপাইয়া বেশ স্বচ্ছন্দে জীবন কাটাইয়া যাইতে পারিবে। উন্নতপন্থীরা হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন অন্ততঃ দুই পুরুষ কাল যদি অল্পবুদ্ধি লোকগুলাকে এই প্রকারে আটকাইয়া রাখার ব্যবস্থা করা যায়, তাহা হইলে সমাজ হইতে এই শ্রেণীর আবর্জ্জনা-গুলি নির্ম্মূল হইয়া যাইবে। ইহাঁদের এই সকল আলোচনা আধুনিক সভ্য-সমাজের রাজা প্রজা উভয়েরই মন আকর্ষণ করিয়াছে। কয়েকজন বৈজ্ঞানিক আমেরিকার গত চল্লিশ বৎসরের জন-গণনার তালিকা হইতে তথ্য সংগ্রহ করিয়া দেখাইতেছেন, একদিকে অগাধ ধনসম্পদ্ যেমন দেশের কতক লোককে বিলাস-ব্যাধিতে পঙ্গু করিয়া তুলিতেছে, অপরদিকে সেইপ্রকার স্বাভাবিক অক্ষমের দল সাধারণের অন্নে পুষ্ট হইয়া পঙ্গপালের ন্যায় বংশবৃদ্ধি করিতেছে। এই দুই সম্প্রদায়কে প্রশ্রয় দিতে থাকিলে, অর্দ্ধশতাব্দীর মধ্যে কর্ম্মী পুরুষ দেশে দুর্লভ হইয়া পড়িবে। যাহা হউক উন্নতি-পন্থীদিগের এই প্রকার উক্তি য়ুরোপ ও আমেরিকার একদল লোককে খুব বিচলিত করিয়াছে। আমেরিকার কয়েকটি প্রাদেশিক বড় সহরে ইতিমধ্যেই কয়েকটি অক্ষম-নিবাসের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে।

অক্ষম ও দুর্ব্বলের ক্রমিক উচ্ছেদ সাধনের জন্য কেবল পূর্ব্বোক্ত উপায় অবলম্বন করিয়াই উন্নতিপন্থীরা ক্ষান্ত হইতেছেন না। বিশেষ বিশেষ গুণসম্পন্ন নরনারীর মিলনে কি প্রকারে ইচ্ছানুরূপ গুণবিশিষ্ট সন্তান পাওয়া যাইবে, সে সম্বন্ধেও পরীক্ষা চলিতেছে। পরীক্ষা অবশ্য এখন উদ্ভিদ ও ইতর প্রাণীর উপর করা হইতেছে। শুনা যাইতেছে ইহাতে পূর্ব্বানুক্রমিতা (Heredity) সম্বন্ধে যে সকল নূতন তথ্য সংগৃহীত হইতেছে, তাহা খুবই অদ্ভুত। প্রসিদ্ধ জীবতত্ত্ববিদ্ মেণ্ডেলের (Mendel) নাম হয় ত পাঠক শুনিয়া থাকিবেন। লোকটি একজন নগণ্য ধর্ম্মযাজক ছিলেন। তাঁহার ভজনালয়ের ক্ষুদ্র প্রাঙ্গনে যে একটি ছোট উদ্যান ছিল, তাহাতে তিনি নানা জাতীয় মটর কড়াইয়ের গাছ পালন করিতেন এবং গাছগুলি পুষ্পিত হইলে, একের পরাগ অপরের গর্ভকেশরে লাগাইয়া কি প্রকার শস্য উৎপন্ন হয় পরীক্ষা করিতেন। দীর্ঘকাল এই প্রকার পরীক্ষায় কেবল পরাগের আদান প্রদান সাহায্যে ইনি ছোট মটরকে বড় করিবার বা সবুজ মটরকে সাদা করিবার কতকগুলি মূল সূত্রের সন্ধান পাইয়াছিলেন। তারপর সেই সূত্র অনুসারে বিবিধ গুণসম্পন্ন গো-মেষাদি পশু এবং বিবিধবর্ণের কুক্কুট ও হংস প্রভৃতি পক্ষীর শাবক উৎপন্ন করিয়া উদ্ভিদের নিয়ম প্রাণীতেও খাটিতে দেখা গিয়াছিল। মেণ্ডেল সাহেব আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের ন্যায় পাণ্ডিত্যাভিমানী ছিলেন না, নীরবে কাজ করিয়া আজ কুড়ি বৎসর হইল তিনি দেহ ত্যাগ করিয়াছেন। ইহাঁর আবিষ্কারের কোন বিবরণই সংবাদ পত্র বা বৈজ্ঞানিক সাময়িক পত্রে প্রচারিত হয় নাই, নিজের হস্তলিখিত কয়েকখানি পুঁথির পাতায় সেগুলি দীর্ঘ পনের বৎসর অনাদৃত অবস্থায় পড়িয়াছিল। আধুনিক জীবতত্ত্ববিদ্‌গণ কোন গতিকে পুঁথির সন্ধান পাইয়া, এখন তাহাতে বর্ণিত

সকল ব্যাপারকেই অদ্ভুত দেখিতেছেন। Genetics অর্থাৎ জন্মতত্ব নামক যে নূতন শাস্ত্রের কথা আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, মেণ্ডেলের আবিষ্কৃত তত্বগুলির উপরই তাহা প্রতিষ্ঠিত। এই প্রথায় চলিয়া Genetics এর দল গো-জাতি এবং শস্যপ্রদ বহু উদ্ভিদের অশেষ উন্নতি বিধান করিতেছেন। মনে করা যাউক যেন ভারতবর্ষের গাভী অধিক দুগ্ধ দান করে, কিন্তু ইহারা অল্পজীবী এবং রুগ্ন। আষ্ট্রেলিয়ার গাভী খুব সুস্থ কিন্তু অল্প দুধ দেয়। বলা বাহুল্য এই দুই গো-বংশের সদ্‌গুণগুলিকে লইয়া যদি কোন নূতন গো-বংশের উৎপত্তি করা যায়, তবে সংসারে এক আদর্শ গো-বংশের সৃষ্টি করা হয়। Genetics এর দল এখন এই প্রকার সৃষ্টি কার্য্যে মন দিয়াছেন, এবং আংশিক কৃতকার্য্যও হইয়াছেন। মানব-বংশের উন্নতি বিধান যাঁহাদের জীবনব্রত হইয়াছে, তাঁহারা এই বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায়ের সহিত পরামর্শ করিয়া কাজ করিতেছেন। মেণ্ডেলের নিয়মানুসারে সভ্য মানুষকে স্বাস্থ্যে সৌভাগ্যে এবং বুদ্ধিতে আদর্শ মানুষ করিয়া গড়িয়া তোলাই ইঁহাদের চরম লক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

মার্কিন জাতির যতই সদ্‌গুণ থাকুক না কেন, হুজুকপ্রিয় বলিয়া তাহার একটা ঘোর অখ্যাতি আছে। মানব-বংশের উন্নতিবিধান যাঁহাদের জীবনের মূলমন্ত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাঁহাদের অনেকেই— আমেরিকাবাসী। স্বভাবতঃ অক্ষম এবং দুর্ব্বলবুদ্ধি নরনারীদিগকে অবরুদ্ধ রাখার প্রস্তাবটা ইঁহাদেরি কল্পনাপ্রসূত। খোঁয়াড়ে আবদ্ধ রাখিয়া ইতর প্রাণীগুলির বংশোন্নতি বিধান সম্ভব বলিয়া, মানুষেও তাহা সম্ভব এই কথাটা মনে করিয়া তাঁহারা বোধ হয় খুব একটা ভুল করিতেছেন। মানুষ কখনই একেবারে পশু নয়। ধর্ম্ম, জ্ঞান, বিবেকবুদ্ধি, ভালবাসা প্রভৃতি যে সকল বিশেষগুণ প্রকৃতি দেবী মানুষকে মুক্তহস্তে দান করিয়াছেন, তাহার মর্য্যাদা রক্ষা করা কি মানুষের কর্ত্তব্য নয়? এই সকলগুণ মানুষকে আশ্রয় করিয়া তাহার পশু-প্রবৃত্তিগুলিকে যে কি প্রকারে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে, তাহাও আমাদের জানা নাই। পশুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করা ছাড়া দাম্পত্য প্রেম নামক আর একটি পরম দান যখন প্রকৃতি দেবী মানুষকে দিয়াছেন, এবং নারীর হৃদয়কে কোমল ও স্নেহপ্রবণ করিয়া গড়িয়াছেন, তখন সেইগুলির ব্যবহার হইতে বঞ্চিত করিয়া নরনারীকে পশুবৎ পালন করিতে থাকিলে, একটা অনৈসর্গিক ব্যাপারকে প্রশ্রয় দেওয়া হইবে না কি? প্রকৃতি যাহাকে নিজের হাতে মূর্ত্তিমান্ করেন, বৈজ্ঞানিক শিল্পীর যন্ত্রের স্পর্শে তাহা কুশ্রী ও ভীষণ হইয়া দাঁড়ায়। বাঁধ দিয়া নদীর স্রোত রোধ করিতে গেলে, তাহাকে যে কেবল কুশ্রী করা হয় তাহা নয়, সেই মাতৃরূপিনীর বিমল স্তন্য-ধারা বিষে পরিণত হয় এবং কূলপ্লাবিনী বন্যা আসিয়া মৃত্যুর বিভীষিকা দেখায়। প্রকৃতির অভিপ্রায়কে ব্যর্থ করিতে গেলেই পদে পদে অকল্যাণ দেখা দিবে। আমেরিকার কল কারখানা ও কৃত্রিমতা-পূর্ণ জীবনের কথা শুনিয়া সেদিন একজন ঋষিকল্প প্রবীণ সাহিত্যিক তাহাকে দানবীয় সভ্যতা নামে আখ্যাত করিয়াছিলেন। বংশের উন্নতি বিধানের জন্য মার্কিনদিগের এই চেষ্টাকেও সত্যই দানবীয় সভ্যতার অঙ্গ বলিয়া মনে হইতেছে।

শ্রীজগদানন্দ রায়।

গীতোক্ত যোগ-সমন্বয়।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

সংক্ষেপতঃ কর্ম্মযোগ ব্যাখ্যাত হইল। সকাম কর্ম্ম যে বন্ধের হেতু তাহা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। ভগবান্ পূর্ব্বে বলিয়াছেন——

"কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি॥
৪৭॥গীতা॥২য়॥"

অর্থাৎ কর্ম্মেই তোমার অধিকার, কর্ম্মফলে তোমার কোন অধিকার নাই, কদাচ কর্ম্মের ফলার্থী হইও না এবং কর্ম্মত্যাগের প্রবৃত্তিও যেন তোমার মনে উদয় না হয়। যিনি ফললাভের আশায় কর্ম্মানুষ্ঠান করেন, তিনি কৃপার পাত্র। এই ফললাভের বাসনা বা কামনা মানবকে কিরূপ সর্ব্বনাশের পথে লইয়া যায় তাহা ভগবান্ পূর্ব্বেই সুন্দররূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন। ফলাভিলাষ বা কামনা বাধা প্রাপ্ত হইলে ক্রোধের উৎপত্তি হয়, ক্রোধ হইতে মোহ, মোহ হইতে স্মৃতিভ্রংশ, স্মৃতিলোপ হইতে বুদ্ধিনাশ এবং বুদ্ধির বিলোপ হইলেই সর্ব্বনাশ। (*) সেই সকল কথা স্মরণ করাইবার জন্য পুনশ্চ বলিতেছেন,—

"তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচার।
অসক্তোহ্যাচরন্কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পুরুষ॥
১৯॥

ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।
নিরাশীর্নির্ম্মমোভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ॥
৩০॥

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎস্বনুষ্ঠিতাৎ
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ॥
৩৫॥" গীতা, তৃতীয়॥

অর্থাৎ হে অর্জ্জুন! কামশূন্য হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান না করিলে চিত্ত শুদ্ধি হয় না, অশুদ্ধ চিত্তে কদাপি ব্রহ্মজ্ঞানের বিকাশ হয় না, ব্রহ্মজ্ঞান ভিন্ন মোক্ষলাভ অসম্ভব;— অতএব তুমি অনাসক্তভাবে, নিষ্কামচিত্তে স্বীয় বর্ণোচিত কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন কর। তুমি সমস্ত কর্ম্মফল আমাতে (পরমাত্মায়) সমর্পণ করতঃ আত্মনিষ্ঠচিত্তে কামনা, মমতা এবং সন্তাপশূন্য হইয়া তোমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম (যুদ্ধ) কর। (*) সুচারুরূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম হইতে নিজধর্ম্ম অঙ্গহীনভাবে নিষ্পন্ন হওয়াও শ্রেষ্ঠ। স্বধর্ম্মে মরণও মঙ্গল, কিন্তু পরধর্ম্ম ভয়াবহ।

যাঁহার চিত্তশুদ্ধি হয় নাই, তিনি যদি কর্ম্মত্যাগ করতঃ ভক্ত সন্ন্যাসী হইয়া বসেন, তাঁহার আধ্যাত্মিক সর্ব্বনাশ অবশ্যম্ভাবী।

কর্ম্মযোগীর কর্ম্ম কিভাবে আচরিত হয়, সেই কর্ম্ম তাঁহার পক্ষে বন্ধনের হেতু হইয়া কেন মোক্ষের কারণ হয়, প্রকৃত কর্ম্মযোগ কি, তাহা আরও বিশদরূপে বিবৃত করিবার জন্য ভগবান্ বলিতেছেন—

"ন মাং কর্ম্মাণি লিম্পন্তি ন মে
কর্ম্মফলে স্পৃহা।
ইতি মাং যোঽভিজানাতি কর্ম্মভির্ন
স বধ্যতে॥ ১৪॥

এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কর্ম্ম পূর্ব্বৈরপি মুমুক্ষুভিঃ।
কুরু কর্ম্মৈব তস্মাত্বং পূর্ব্বৈঃ
পূর্ব্বতরং কৃতম্॥ ১৫॥

(*) গীতা ২য়, ৬২ হইতে ৬৩তম শ্লোক।

(*) "ধর্ম্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োঽন্যৎক্ষত্রিয়স্য ন
বিদ্যতে॥ ২।৩১॥"

ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ধর্ম্মযুদ্ধ হইতে শ্রেয়স্কর কর্ম্ম আর কিছুই নাই।

কিং কর্ম্ম কিমকর্ম্মেতি কবয়োহপ্যত্র মোহিতাঃ।
তত্তে কর্ম্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্‌জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ॥ ১৬॥
কর্ম্মণো হ্যপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যঞ্চ বিকর্ম্মণঃ।
অকর্ম্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কর্ম্মণো গতিঃ॥ ১৭॥
কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদকর্ম্মণি চ কর্ম্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান্‌ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ॥ ১৮॥
যস্য সর্ব্বে সমরম্ভাঃ কামসংকল্পবর্জ্জিতাঃ।
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ॥ ১৯॥
ত্যক্ত্বা কর্ম্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ।
কর্ম্মণ্যভিপ্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ॥ ২০॥
নিরাশীর্যতচিত্তাত্মা ত্যক্তসর্ব্বপরিগ্রহঃ।
শারীরং কেবলং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্‌॥ ২১॥
যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টো দ্বন্দ্বাতীতো বিমৎসরঃ।
সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ কৃত্বাঽপি ন নিবধ্যতে॥ ২২॥

গীতা, ৪র্থ অধ্যায়।

কৃতকর্ম্ম সকল আমাকে (আত্মাকে) স্পর্শ করে না, আমার (আত্মার) কর্ম্মফলে অভিলাষ নাই, এই ভাবে যিনি আমাকে (আত্মাকে) জানেন, তিনি কর্ম্ম দ্বারা আবদ্ধ হন না। পুরাকালে জনকাদি মোক্ষপথের পথিকগণ এইরূপ জ্ঞান-সমন্বিত কর্ম্ম করিয়া গিয়াছেন, তুমিও তাঁহাদের ন্যায়, তাঁহাদের ভাবে অনুভাবিত হইয়া তাঁহাদিগের অনুষ্ঠিত কার্য্য-প্রণালীর অনুসরণ কর। কোন্‌টী কর্ম্ম এবং কোন্‌টী অকর্ম্ম এ সম্বন্ধে বিদ্বান্‌ ব্যক্তিদিগেরও ভ্রম হইয়া থাকে, অতএব যাহা জানিতে পারিলে তুমি অমঙ্গলজনক কর্ম্ম হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারিবে, সেই গূঢ় কর্ম্মতত্ত্ব তোমাকে বলিতেছি। কর্ম্ম, বিকর্ম্ম এবং অকর্ম্ম (১) এই ত্রিবিধ কর্ম্মের যথার্থ তত্ত্ব তোমার জানা অত্যাবশ্যক, যেহেতু কর্ম্মের গতি অতি দুর্জ্ঞেয়। যিনি কর্ম্মের মধ্যে অকর্ম্ম দর্শন করেন, এবং যিনি অকর্ম্মের মধ্যে কর্ম্ম দর্শন করেন, তিনি মনুষ্যগণের মধ্যে বুদ্ধিমান্‌, যোগী এবং সর্ব্বকর্ম্মক্ষম। ২) যিনি সমগ্র কর্ম্মের ফলতৃষ্ণা ও কর্ত্তৃত্বাভিমান বিসর্জ্জন দিয়া জ্ঞানানলে কর্ম্মফল দগ্ধ করিতে সক্ষম হইয়াছেন, বিদ্বান্‌ ব্যক্তিগণ তাঁহাকে “পণ্ডিত” বলিয়া থাকেন। যিনি কর্ম্মফলের আসক্তি পরিত্যাগ করিয়াছেন, সর্ব্বদা সন্তুষ্টচিত্ত, কাহারও আশ্রয় গ্রহণ করেন না, তিনি কর্ম্মে সম্যক্‌রূপে প্রবৃত্ত হইলেও প্রকৃতপক্ষে কিছুই করেন না। যিনি কামনাপরিশূন্য, যাঁহার মন ও শরীর সংযত, যিনি সর্ব্বপ্রকার ভোগোপকরণ পরিত্যাগ করিয়াছেন, তিনি শরীর রক্ষার্থ কর্ম্ম করিলেও তাঁহাকে কোন পাপ স্পর্শ করিতে পারে না। (৩) কর্ম্ম-

(১) কর্ম্ম—শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম। অকর্ম্ম—কর্ত্তব্য কর্ম্ম না করা। বিকর্ম্ম—শাস্ত্রনিষিদ্ধ কর্ম্ম।

(২) জ্ঞানীব্যক্তিগণ অবগত আছেন যে ইন্দ্রিয়গণই কর্ম্ম করে, আত্মা কিন্তু নিষ্ক্রিয়। সাধারণ লোক ইহার বিপরীত মনে করিয়া থাকে। অতএব যিনি দেহ ও ইন্দ্রিয়গণের কর্ম্মে আত্মার অকর্ম্ম দর্শন করেন, এবং যিনি আত্মার অকর্ম্মের মধ্যে দেহ ও ইন্দ্রিয়ের কর্ত্তৃত্ব অবলোকন করেন, তিনিই কর্ম্মতত্ত্বদর্শী। এই শ্লোকের (১৮) ব্যাখ্যা ভিন্ন ভিন্ন টীকাকারগণ ভিন্ন ভিন্ন রূপে করিয়াছেন, সে সকলের আলোচনায় স্থানাভাব।

(৩) যিনি অপ্রযত্নলব্ধ দ্রব্যে সর্ব্বদা সন্তুষ্টচিত্ত, শীত, উষ্ণ, মান, অপমান, সুখ, দুঃখ ইত্যাদি দ্বন্দ্বভাব-বর্জ্জিত, সমুদয় জীবের প্রতি শত্রুতাশূন্য, লাভে এবং

যোগের রহস্যই এই যে "ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্বিজেৎ প্রাপ্যচাপ্রিয়ম্।"

এইরূপ ব্যক্তির কর্ম্মই কর্ম্মযোগ। এই কর্ম্মযোগ জ্ঞানের কারণস্বরূপ এবং অতিশয় সংক্ষেপে এই কর্ম্মযোগের পরিচয় প্রদত্ত হইল। নিষ্কামভাবে শাস্ত্রবিহিত নিত্যকর্ম্মানুষ্ঠান অথবা কর্ম্মযোগ দ্বারাই মুমুক্ষু সাধক জ্ঞানমার্গে প্রবেশের অধিকারী হন। ভগবান্ বলিয়াছেন—

"সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরি-
সমাপ্যতে ॥" ৪।৩৩ ॥

এইবার সেই জ্ঞান সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। জ্ঞানই মোক্ষ-দ্বারের চাবি,—মোক্ষ সাধনের পথে জ্ঞানই একমাত্র পথপ্রদর্শক। জ্ঞান ব্যতিরেকে মুক্তির কোন উপায় নাই। জ্ঞানযোগের প্রশংসা সম্বন্ধে ভগবদুক্তি,—

অপি চেদসি পাপেভ্যঃ সর্ব্বেভ্যঃ
পাপকৃত্তমঃ।
সর্ব্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরি-
ষ্যসি ॥ ৩৬ ॥
যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ
কুরুতেঽর্জ্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ
কুরুতে তথা ॥ ৩৭ ॥
নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।
তৎস্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি
বিন্দতি ॥ ৩৮ ॥
যোগ সংন্যস্ত কর্ম্মণং জ্ঞানসঞ্ছিন্ন
সংসয়ম্।
আত্মবন্তং ন কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি
ধনঞ্জয় ॥ ৪১ ॥
গীতা ৪র্থ অধ্যায়।

যদি তুমি পৃথিবীর সকল পাপী হইতেও অতি নিকৃষ্ট পাপী হও, তথাপি জ্ঞানরূপ পোত-সহায়ে পাপরূপ সমুদ্র অনায়াসে পার হইতে পারিবে। প্রজ্বলিত অগ্নি যেমন কাষ্ঠরাশিকে ভস্মসাৎ করিয়া ফেলে, সেইরূপ জ্ঞানাগ্নিও সকল কর্ম্মকে ভস্মসাৎ করিয়া থাকে। জ্ঞানের অপেক্ষা পবিত্র বস্তু সংসারে আর দ্বিতীয় নাই,—জ্ঞান যোগ দ্বারাই আত্মজ্ঞান লাভ হয়। যে ব্যক্তির কর্ম্মরাশি কর্ম্মযোগ-সহায়ে পরমেশ্বরে সমর্পিত হইয়াছে, আত্মজ্ঞান দ্বারা যাহার সমুদয় সংশয় ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, কর্ম্ম কখনও সেই আত্মবান্ পুরুষকে আবদ্ধ করিতে সক্ষম হয় না।

জ্ঞান সকল কর্ম্মকে ভস্মসাৎ করে, সমুদয় সংশয়কে ছেদন করে এবং পাপ-পারাবার-বক্ষে পোতের কার্য্য করে। এই জ্ঞান কি? এই জ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞান। যখন শাস্ত্র-

অলাভে সমভাবাপন্ন, এতাদৃশ মহাত্মা সর্ব্বদা কর্ম্মানুষ্ঠানে রত থাকিলেও মুক্ত। রাজর্ষি জনক ইহার সুন্দর দৃষ্টান্ত। কথিত আছে কোন মুমুক্ষু সন্ন্যাসী গুরু কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া কর্ম্মযোগ শিক্ষার্থ জনক রাজার নিকট আগমন করিয়া দেখেন যে, জনক অন্যান্য রাজার মত মহা সমারোহে রাজকার্য্য সমাপন করিতেছেন। সাংসারিক কার্য্যে এইরূপ ঘোরতর আচ্ছন্ন জনককে দেখিয়া সন্ন্যাসীর হৃদয়ে সংশয়ের উদ্রেক হইল এবং তিনি ভাবিলেন যে, এরূপ সংসারী রাজার নিকট কি শিক্ষালাভ হইবে? জনক এই সন্ন্যাসীর মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া যথোচিত অতিথি-সৎকারের পর তাঁহাকে রাজবাটীতে রজনী যাপনের অনুরোধ করিয়া বলিলেন যে, আগামী কল্য প্রাতে শাস্ত্রালাপ ও যোগতত্ত্ব বিচার হইবে। সন্ন্যাসী প্রচুর সেবার পর গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত, হঠাৎ নিশীথ সময়ে রাজপ্রাসাদে অগ্নিকাণ্ড উপস্থিত হইল। নাগরিকদিগের হাহাকারে সন্ন্যাসীর নিদ্রাভঙ্গ হইলে তিনি নিজ কন্থা ও কমণ্ডলু লইয়া বাহির হইয়া পলায়ন করিবেন এমন সময় দেখিলেন রাজা এক বৃক্ষতলে ধ্যানস্থ। তিনি চীৎকার করিয়া রাজাকে প্রবুদ্ধ করতঃ সর্ব্বনাশকর অগ্নিকাণ্ডের কথা বলায় রাজা কিঞ্চিন্মাত্র বিচলিত না হইয়া মৃদুহাস্যের সহিত বলিলেন "মিথিলায়াং প্রদগ্ধায়াং ন মে দহ্যতে ন মে ক্ষতি।" সন্ন্যাসীর কর্ম্মযোগ শিক্ষা লাভ হইল।

বিহিত কর্ম্মযোগানুষ্ঠান দ্বারা চিত্তের মল, রাগ ও দ্বেষ দূরীভূত হইয়া যায় এবং চিত্তশুদ্ধি জন্মে, তখন সেই বিশুদ্ধ চিত্তে জ্ঞানের বিকাশ হইতে আরম্ভ হয়। এই জ্ঞানের বিকাশ হইলে প্রথমে জীব ব্রহ্ম হইতে তৃণগুল্ম পর্য্যন্ত যাবতীয় ভূতবৃন্দকে নিজ আত্মায় এবং তাহার পর সমুদয় বিশ্বসংসারকে পরমাত্মায় অভিন্নরূপে দর্শন করিতে থাকে এবং "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এই চরম জ্ঞানের স্ফূর্ত্তি হয়। সেই জ্ঞান লাভের উপায় সম্বন্ধে ভগবান্ বলিতেছেন—

"তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্ব-
দর্শিনঃ ॥৩৪॥
শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ-
সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানং লব্ধা পরাং শান্তিমচিরেণাধি-
গচ্ছতি ॥৩৯॥
গীতা ৪র্থ অধ্যায় ॥

গুরুর শ্রীচরণে শত শত প্রণাম এবং সেবা দ্বারা তাঁহাকে সন্তুষ্ট করতঃ সুপ্রশ্ন পরম্পরা যোগে সেই তত্ত্বজ্ঞান জানিতে চেষ্টা করিবে। তত্ত্বদর্শী জ্ঞানিগণ জ্ঞান সম্বন্ধে তোমাকে উপদেশ দিবেন। গুরুবাক্যে এবং সচ্ছাস্ত্রে যাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস, যিনি গুরুর প্রতি নিতান্ত অনুরক্ত এবং যিনি ইন্দ্রিয়বর্গকে সংযত করিতে পারিয়াছেন, তিনিই এই জ্ঞান লাভ করেন এবং এই জ্ঞান লাভ করিয়া অচিরেই পরমাশক্তি লাভ করিয়া থাকেন।

শাস্ত্রবিহিত এবং কর্ত্তব্যবোধে অনুষ্ঠিত কর্ম্ম যে সাধকের বন্ধনে পরিণত হয় না, পরন্তু তাহা মোক্ষপথের সোপান তুল্যই হইয়া থাকে, ইহা জ্ঞান দ্বারাই জানিতে পারা যায়। জ্ঞান উপস্থিত হইলেই জানিতে পারা যায় যে—

"যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা
জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে ॥৭॥
ন কর্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
ন কর্ম্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে ॥১৪॥
নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ।
অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি
জন্তবঃ" ॥১৫॥

যাঁহার দেহ ও ইন্দ্রিয়গ্রাম বশীভূত, যাঁহার অন্তঃকরণ পরিশুদ্ধ, যিনি ফলকামনাপরিশূন্য হইয়া কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, এবং যিনি সর্ব্বভূতে আত্মময় দর্শন করেন, তিনি নিরন্তর কর্ম্ম করিয়াও কর্ম্মপাশে আবদ্ধ হন না। পরম কারুণিক পরমেশ্বর আমাদের কাহাকেও কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত করেন না, কোন কর্ম্মফলের সৃষ্টিও তিনি করেন না; অথবা তিনি কাহাকেও কোন কর্ম্মফল প্রদান করেন না; আমাদের স্বভাবই (অজ্ঞানাত্মিকা প্রকৃতি অথবা পূর্ব্বকর্ম্মফলজনিত আত্মাভিমান রূপ বাসনা) আমাদিগকে এইরূপ প্রেরণা প্রদান করেন। ভগবান্ কাহাকেও পাপে অথবা পুণ্যে রত করেন না। মানব নিজ নিজ কর্ম্মফলে আবদ্ধ হইয়া সুখ দুঃখ অথবা পাপপুণ্য ভোগ করে। অজ্ঞান দ্বারা জ্ঞান আবৃত থাকায় মানব নিজের প্রকৃতিকে ঈশ্বর-শক্তি মনে করিয়া ভ্রমে পতিত হইয়া থাকে।

এই জ্ঞান লাভের মুখ্য উপায় যে কর্ম্মযোগ, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। কর্ম্মযোগ দ্বারা চিত্তশুদ্ধি লাভ হইলে পর ধ্যানযোগ অবলম্বন করিলে এই জ্ঞান লাভ অধিকতর সহজ হইয়া আসে। গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ে ধ্যানযোগের বিশেষ বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে,—তাহার বিস্তৃত বর্ণনা বর্ত্তমান প্রবন্ধে সেরূপ প্রাসঙ্গিক নহে, বিশেষতঃ

স্থানাভাব বশতঃ তাহা দেওয়া একান্তই অসম্ভব। অথচ জ্ঞানমার্গে ধ্যানযোগের আবশ্যকতা সর্ব্ববাদিসম্মত। অতএব অতি সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ উল্লেখ করা যাইতেছে ঃ—

"তং বিদ্যাদ্ দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগ-
সংজ্ঞিতম্।
স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোঽনির্বিন্ন-
চেতসা ॥২৩॥
সংকল্পপ্রভবান্ কামাংস্ত্যক্ত্বা সর্ব্বান
শেষতঃ।
মনসৈবেন্দ্রিয়গ্রামং বিনিয়ম্য সমন্ততঃ ॥২৪॥
শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্ বুদ্ধ্যা ধৃতি-গৃহীতয়া।
আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি
চিন্তয়েৎ ॥২৫॥
যতো যতো নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্।
ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং
নয়েৎ ॥২৬॥
প্রশান্তমনসং হ্যেনং যোগিনং সুখমুত্তমম্।
উপৈতি শান্তরজসং ব্রহ্মভূতমকল্মষম্ ॥২৭॥
গীতা ষষ্ঠ অধ্যায় ॥
যুঞ্জন্নেব সদাত্মানং যোগী বিগতকল্মষঃ।
সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে ॥২৮॥
সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ ॥২৯॥

ধ্যানযোগের কথা বলা হইতেছে। মুমুক্ষু সাধক দুঃখসংস্পর্শশূন্য এই ধ্যানযোগ (অথবা অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি-যোগ) বিকার-শূন্য হৃদয়ে বিষয়-ভোগ-বাসনাসঞ্জাত সর্ব্ব-প্রকার কামনা সম্যক্ প্রকারে পরিত্যাগ করতঃ সমস্ত ইন্দ্রিয়গণকে নিত্যানিত্য বিবেক বুদ্ধি দ্বারা সংযত করতঃ শাস্ত্র ও গুরুবাক্যে সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া প্রশান্তচিত্তে (এই যোগের) অনুষ্ঠান করিবে। ধৈর্য্য-শালিনী বুদ্ধি দ্বারা মনকে ব্রহ্মস্থ করতঃ ক্রমে ক্রমে সকল বিষয় হইতে তাহাকে নিবৃত্ত করিবে। এই যোগ সাধনকালে অন্য কোন বিষয়ে কিঞ্চিন্মাত্রও চিন্তা করিবে না। স্বাভাবিক চঞ্চল ও অস্থির মন যে যে বিষয়ে ধাবিত হয়, সেই সেই বিষয় হইতে তাহাকে প্রত্যাহৃত করিয়া আত্মাতেই স্থির করিবে। এইরূপ পুনঃ পুনঃ প্রত্যাহার দ্বারা বাহ্যজগৎ হইতে মনকে প্রতিনিবৃত্ত করতঃ পরমাত্মার চিন্তায় রত করিলে সাধকের মন হইতে রজস্তম প্রভৃতি গুণ তিরোহিত হইয়া সাত্ত্বিক গুণের প্রাধান্য হয় এবং তদ্ধেতু তাঁহার চিত্ত শান্ত হইয়া যায়। তখন তাঁহার ব্রহ্মজ্ঞান উপস্থিত হয় এবং সর্ব্ববিধ পাপ তাপ দূরীভূত হইয়া যায়। তখন তাঁহার নিষ্কাম নির্ম্মল ও প্রশান্ত মনে ব্রহ্ম-সংস্পর্শজনিত এক অনির্ব্বচনীয় অত্যুত্তম সুখের আবির্ভাব হয়। তিনি সর্ব্বত্র সমদর্শী হন, এবং নিজ আত্মাকে সকল ভূতগ্রামের মধ্যে এবং সমগ্র প্রাণীকে নিজ আত্মার ভিতর দর্শন করেন। এই উচ্চ জ্ঞানের অবস্থায় সাধকের মনে সর্ব্বত্র সমভাব জন্মে এবং এক অদ্বৈতভাবে তিনি সর্ব্বদা পূর্ণ থাকেন। এইরূপ জ্ঞানীর সম্বন্ধে ভগবান্ বলিতেছেন,—

"যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বং চ ময়ি
পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন
প্রণশ্যতি ॥৩০॥
সর্ব্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি স যোগী ময়ি
বর্ত্ততে ॥৩১॥
আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো
মতঃ ॥৩২॥ গীতা ষষ্ঠ অধ্যায়।

যিনি পরমাত্মাকে সকল স্থানে সকল বস্তুর মধ্যে দর্শন করেন এবং যিনি পরমাত্মার ভিতর চরাচর বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দেখিতে পান, পরমাত্মা কখনও তাঁহার অদৃশ্য হন না,

তিনিও কদাপি পরমাত্মার অদৃশ্য হন না। যিনি সর্ব্বত্র সর্ব্বভূতে বিদ্যমান অদ্বৈত পরমাত্মার ভজনা করেন, তিনি সর্ব্বপ্রকার অবস্থাতেই পরমাত্মায় বিদ্যমান থাকেন। যিনি নিখিল প্রাণীর সুখ দুঃখ নিজের সুখ দুঃখের ন্যায় অনুভব করেন, তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জ্ঞানযোগী।

কর্ম্মযোগ এবং ধ্যানযোগ সহায়ে সাধক কি প্রকারে অদ্বৈত ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করতঃ জীবন্মুক্তি লাভ করেন, তাহা সংক্ষেপতঃ বর্ণিত হইল। এই জ্ঞান লাভের জন্য মনঃসংযমই যে প্রধান উপায়, তাহাও কথিত হইল। ইন্দ্রিয়সংযম মনঃসংযমের প্রধান হেতু, তাহাও সংক্ষেপে বলা হইয়াছে। এই ইন্দ্রিয়সংযম অর্থে অস্বাভাবিক উপায়ে ইন্দ্রিয়-শক্তিসমূহের ধ্বংস বা খর্ব্বতা সম্পাদন নহে,—উহাদিগের যথাযথ ব্যবহার দ্বারা উহাদিগের উপর মনের কর্ত্তৃত্ব স্থাপনই ইন্দ্রিয়সংযমের প্রকৃত উদ্দেশ্য। যোগ শাস্ত্রে সাধনপাদে এই ইন্দ্রিয়সংযমের আবশ্যকতা ও উপায় প্রদর্শিত হইয়াছে। গীতাতেও সংক্ষেপে এই বিষয় উপদিষ্ট হইয়াছে। ইন্দ্রিয়গণ তাহাদের বিষয় পাইলেই কর্ম্ম করে, আত্মার সহিত উহাদের কোন নৈকট্য সম্বন্ধ নাই, এই জ্ঞান লাভ করতঃ ইন্দ্রিয়গণকে স্ব স্ব পথে পরিচালিত করিলেই ইন্দ্রিয়গণ সংযত হয়। প্রকৃত কথা কামনা বা বাসনা ত্যাগ করিলেই হইল। কর্ম্মযোগী বিবেচনা করেন,—

'নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তোমন্যেত তত্ত্ববিৎ।
পশ্যন্‌শৃণ্বন্‌স্পৃশন্ জিঘ্রন্নশ্নন্‌গচ্ছন্‌স্বপন্ শ্বসন্ ॥৮॥
প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্নন্নুন্মিষন্নিমিষন্নপি।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্ত্তন্ত ইতি ধারয়ন্ ॥৯॥

পরমার্থদর্শী কর্ম্মযোগী চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং হস্তাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়ের যত প্রকার ক্রিয়া আছে, তত্তৎসমুদয় নিজদেহে অনুষ্ঠিত দেখিয়া ঐ সমস্ত কার্য্য ইন্দ্রিয়ের—আত্মার নহে, এইরূপ অবধারণ করিয়া থাকেন। ইন্দ্রিয়গণের কার্য্যে নিজ কর্ত্তৃত্ব স্থাপন না করিলেই কামনা বা বাসনার অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। সংযতমনা ও সংযতবুদ্ধি সাধকের বর্ণনায় ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"প্রজহাতি যদা কামান্ সর্ব্বান্ পার্থ মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে ॥৫৫॥
দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে ॥৫৬॥
যঃ সর্ব্বত্রানভিস্নেহস্তত্তৎপ্রাপ্য শুভাশুভম্।
নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥৫৭॥"
গীতা ২য় অধ্যায়।

যে সাধকের হৃদয়ের সর্ব্বপ্রকার কামনার বিনাশ হইয়া যায় এবং তিনি নিজ আত্মা দ্বারা আত্মাতেই সন্তুষ্ট থাকেন, তাঁহাকে "স্থিতপ্রজ্ঞ" বলে। যাঁহার চিত্ত দুঃখে বিচলিত অথবা সুখ ভোগের জন্য লালায়িত নহে, যিনি আসক্তি, ভয় এবং ক্রোধকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাকে "স্থিতধী"মুনি বলিয়া থাকে। যিনি সমুদয় পার্থিব পদার্থের প্রতি মমতাশূন্য, যিনি প্রিয় বস্তু লাভে হৃষ্ট অথবা অপ্রিয় বস্তু লাভে বিষণ্ণ হন না, তাঁহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এইরূপ সংযতমনা সাধকই ধন্য।

মনের এরূপ "নিবাতনিষ্কম্পপ্রদীপবৎ" নিশ্চল এবং নির্ম্মল ভাব স্পৃহনীয় হইলেও এরূপ মনঃসংযম, এরূপ নিশ্চলতা সহজ-

নিতান্তই চঞ্চল, ইন্দ্রিয়পথদ্বারা সর্ব্বদাই বিভিন্ন বিভিন্ন পথে ধাবিত হইতেছে, সুতরাং আমাদের মত সাধারণ মানবের পক্ষে এরূপ মনঃসংযম এবং তদ্দ্বারা ধ্যান-যোগ ও জ্ঞানযোগের সাধনা সম্ভবপর কি না তদ্বিষয়ে সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক। এই সন্দেহে সন্দিহান হইয়া অর্জ্জুন ভগবান্‌কে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হে কৃষ্ণ! আমাদিগের মন সর্ব্বদাই চঞ্চল ও বিক্ষেপপূর্ণ, আমরা অতিশয় দুর্ব্বলচিত্ত,—আমাদিগের মনে কিরূপে এরূপ সংযম আসিবে, যাহাতে আমরা সুখ দুঃখ, শীত গ্রীষ্ম, পাপ পুণ্য, শত্রু মিত্র প্রভৃতি বিরুদ্ধলক্ষণাক্রান্ত বিষয় সম্বন্ধে সাম্যজ্ঞান লাভ করিব? সর্ব্বদা চঞ্চল মনকে নিরোধ করা সদাগতি বায়ুর নিরোধের ন্যায় নিতান্ত দুরূহ ব্যাপার; ইহার উপায় কি?" ভগবান তদুত্তরে বলিলেন. "অর্জ্জুন,—মন যে নিতান্ত চঞ্চল ও অজেয়, তাহাতে সন্দেহ নাই, তথাচ অভ্যাস এবং বৈরাগ্য এই উভয় উপায়ে উহাকে দমন করা যায় (১)।" পার্থিব পদার্থ সমূহের অনিত্যতা এবং ইন্দ্রিয় সংস্পর্শ জনিত সুখের নশ্বরতা প্রভৃতি চিন্তা করিতে করিতে মনে বৈরাগ্যের উদয় হয় এবং অভ্যাস দ্বারা ঐ বৈরাগ্যের পরিপুষ্টি ও স্থায়িত্ব সাধন করিতে পারা যায়। পুত্র কলত্র ধন সম্পত্তির ক্ষণস্থায়িত্ব এবং তাহাদের সংসর্গজ সুখের নশ্বরতার বিষয় নিয়মিত ভাবে শনৈঃ শনৈঃ চিন্তা করিতে করিতে বৈরাগ্য স্থায়িভাবে মনকে অধিকার করিয়া বসে এবং বৈরাগ্য একবার বদ্ধমূল ভাবে চিত্ত অধিকার করিতে পারিলে কামনা লোভ প্রভৃতিকে দূরীকৃত করিয়া মনোরাজ্যকে সুশান্ত করিয়া দেয়। বৈরাগ্য এবং অভ্যাস দ্বারা মনোরাজ্যে জ্ঞানের সিংহাসন সুদৃঢ়ভাবে স্থাপিত হয়। তখন বায়ুর ন্যায় চঞ্চলমনও নিগড়বদ্ধ হয়। অধ্যবসায় সহকারে অভ্যাস করিলেই এই আপাত' অসম্ভব ব্যাপার নিতান্তই সুসম্ভব হইয়া উঠে। পূর্ব্বকালে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের নিয়মাবলী যথারীতিরূপে প্রতিপালিত হইত এবং মনঃসংযমের উপায় স্বরূপ যম ও নিয়ম (১) সকলেই স্বীকার করিতেন। এখনও সেই অত্যুপাদেয় "যমনিয়ম" অবলম্বন করিয়া দৃঢ়তার সহিত সাধনপথে অগ্রসর হইলেই সিদ্ধি লাভ অবশ্যম্ভাবী; এখনও কত ভাগ্যবান্ পুরুষ এই পুরাতন পথ ধরিয়া মোক্ষ-প্রাসাদে আরোহণ করিতে সমর্থ হইতেছেন। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ পুরুষের পক্ষে অসাধ্য বা অসম্ভব কিছুই নাই।

এই যোগমার্গ অবলম্বন করিবার পক্ষে আর একটী গুরুতর সংশয়ের কথা অর্জ্জুনের মনে উঠিল। তিনি ভাবিলেন,—এই কর্ম্মযোগ সাধন নিতান্ত দুরূহ, এবং উহা বহুসময় ও আয়াস-সাপেক্ষ। যদি একবার আরম্ভ করিবার পর কোন কারণে সাধক এই যোগমার্গ হইতে বিচ্যুত হন, তাহা হইলে কি হইবে? বৈরাগ্য ও ইন্দ্রিয়-সংযম অভ্যাস করিতে গিয়া একদিকে প্রত্যক্ষ ইহলৌকিক বৈষয়িক ভোগসুখ বিসর্জ্জন দিতে হইবে অর্থাৎ সংসারের লোক যাহাকে সুখ বলে—পুত্রকলত্ররাজ্যৈশ্বর্য্যসুখ—তাহাও গেল, আবার ওদিকে যোগবিচ্যুতি জন্য যদি কোন প্রত্যবায় থাকে, তাহা হইলে পারলৌকিক সাধনের আশাও নষ্ট হইয়া গেল—সুতরাং উভয়ত্র সর্ব্বনাশ উপস্থিত

(১) অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণচ গৃহ্যতে ॥৩৫॥ গীতা ষষ্ঠ। "অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধঃ ॥১২॥" যোগদর্শন,—সমাধিপাদ।

(১) অহিংসাসত্যাস্তেয়ব্রহ্মচর্য্যাপরিগ্রহা যমাঃ ॥৩০॥ শৌচসন্তোষতপঃ স্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি নিয়মাঃ ॥৩২॥ যোগদর্শন-সাধনপাদ।

হইল ! তাহার উপায় কি ?

ভগবান্ অতি স্পষ্টভাষায় অর্জ্জুনের এই সংশয়ের নিরাকরণ করিয়া দিলেন,—

"পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্য বিদ্যতে।
নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্দুর্গতিং তাত গচ্ছতি
॥৪০॥৬ষ্ঠ॥

নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন
বিদ্যতে।
স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতোভয়াৎ
॥৪০॥২য়॥"

পার্থ,—কি ইহলোকে কি পরলোকে এইরূপ ব্যক্তির কখনও দুর্গতি লাভ হয় না। এই যোগ বিশুদ্ধ ভাবে আচরণ করিতে না পারিলেও কোন দোষ নাই ;—এই ধর্ম্মের অতি অল্পমাত্র অনুষ্ঠান করিতে পারিলেও সংসাররূপ মহাভয় হইতে পরিত্রাণ লাভ হয়। শ্রীভগবান্ শ্রীমুখে অভয় দিয়াছেন, জীবের পক্ষে এই ধর্ম্ম অতি উপাদেয়,—কর্ম্মযোগ এবং জ্ঞানযোগ মুমুক্ষু ব্যক্তির পক্ষে প্রধান ও প্রশস্ত রাজপথ; এই পথে কোন প্রকার বাধা বিপত্তি নাই। তাই ভগবান্ সকলকে এই পথে আহ্বান করিতেছেন।

জ্ঞানযোগের কথা অতি সংক্ষেপে ব্যক্ত করিয়া এইবার ভক্তিযোগ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। ভক্তির প্রাধান্য-পরিচায়ক আধুনিক অনেক গ্রন্থে জ্ঞান ও বৈরাগ্যকে ভক্তি অপেক্ষা অনেক নিম্নস্থান দেওয়া হইয়াছে,—এমন কি কোন কোন পুরাণে জ্ঞান ও বৈরাগ্য, ভক্তির অযোগ্য পুত্ররূপে এবং মুক্তি, ভক্তির দাসীরূপে চিত্রিত হইয়াছে। (১) জ্ঞান বৈরাগ্য হইতে পৃথক্ অথচ তাহাদের অপেক্ষা (মুক্তি অপেক্ষাও) শ্রেষ্ঠ ভক্তি থাকে থাকুক, কিন্তু গীতাশাস্ত্রে এরূপ ভক্তির অস্তিত্ব আছে বলিয়া আমাদের মনে হয় না। গীতোক্ত ভক্তিতত্ত্ব আলোচনা করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, অদ্বয় ব্রহ্মজ্ঞানেরই নামান্তর ভক্তি। ব্রহ্মজ্ঞান এবং ভক্তির মধ্যে পার্থক্য অথবা বিরোধ গীতার মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না। জ্ঞানী এবং ভক্তের মধ্যে কোনরূপ বিরোধ থাকা দূরে থাকুক, গীতার মতে জ্ঞানী ভিন্ন ভক্ত হওয়ার অথবা ভক্ত ভিন্ন জ্ঞানী হওয়ার সম্ভাবনাও দেখা যায় না। গীতার মতে এক মোক্ষ হর্ম্ম্যের একই সোপানের তিনটী পৈঁঠা—কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

যে মহাপুরুষ ইন্দ্রিয়গণকে স্ববশে আনিতে কৃতকার্য্য হইয়াছেন,—কামনা ও বাসনার ছায়া পর্য্যন্ত যাঁহার চিত্ত হইতে দূর হইয়া গিয়াছে,—যিনি সকল প্রাণীর মধ্যে নিজ আত্মাকে এবং নিজ আত্মায় সমস্ত ভূতগ্রাম সন্দর্শন করেন, যিনি নিখিল বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে এক অদ্বৈত ব্রহ্মসত্তা ভিন্ন আর কোন বস্তু বা ব্যক্তির পৃথক সত্তা অনুভবেও আনিতে পারেন না, যাঁহার নিকট পাপ পুণ্য, শীত গ্রীষ্ম, সুখ দুঃখ, শত্রু মিত্র প্রভৃতি দ্বন্দ্বভাবাপন্ন বিষয় একই

(১) পদ্মপুরাণ, উত্তরখণ্ড, ভাগবতমাহাত্ম্য। এই গ্রন্থে জ্ঞান ও বৈরাগ্যকে ভক্তির বৃদ্ধ ও মৃতকল্প পুত্ররূপে এবং মুক্তিকে ভক্তির দাসীরূপে চিত্রিত করা হইয়াছে। কলিযুগে জ্ঞান ও বৈরাগ্য বৃদ্ধ মৃতকল্প অকর্ম্মণ্য কিন্তু ভক্তি যুবতীরূপে বর্ণিত হইয়াছে। দেবর্ষি নারদ বলিতেছেন—

সত্যাদি ত্রিযুগে বোধ বৈরাগ্যৌ মুক্তি সাধকৌ।
কলৌতু কেবলা ভক্তি ব্রহ্মসাযুজ্যকারিণী ॥
* * * * * * *
অঙ্গীকৃতং ত্বয়া তদ্বৈ প্রসন্নোঽহরিস্তদা।
মুক্তিং দাসীং দদৌ তুভ্যং জ্ঞানবৈরাগ্যকা
বিমৌ ॥ ইত্যাদি।

এই পুস্তকেই বেদ বেদান্ত ও গীতা অপেক্ষা ভাগবতের অধিকতর মাহাত্ম্য ঘোষণা করা হইয়াছে।

সমভাবে উপস্থিত হয়,—যিনি নির্ম্মম নির্বৈরী ও উদাসীন, গীতাশাস্ত্র তাঁহাকেই "জ্ঞানী" এই আখ্যা দিয়াছেন। এখন সেই শাস্ত্র ভগবানের প্রিয় ভক্তের কি লক্ষণ নির্দ্দেশ করিতেছেন, দেখুন,—

"অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণএবচ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী ॥১৩॥
সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
ময্যর্পিত মনোবুদ্ধির্যো মে ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥১৪॥
যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চয়ঃ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ ॥১৫॥
অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ।
সর্ব্বারম্ভ পরিত্যাগী যো মদ্‌ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥১৬॥
যোন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্‌ক্ষতি।
শুভাশুভ পরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ ॥১৭॥
সমঃ শত্রৌচ মিত্রেচ তথা মানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ ॥১৮॥
তুল্যনিন্দাস্তুতিমৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়োনরঃ ॥১৯॥
যে তু ধর্ম্মামৃতমিদং যথোক্তং পর্য্যুপাসতে।
শ্রদ্দধানা মৎপরমা ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়াঃ ॥২০॥
গীতা, ১২শ অধ্যায় ॥

যিনি সর্ব্বভূতে বিদ্বেষবিহীন, সকলের প্রতি মিত্রভাবাপন্ন এবং করুণভাবযুক্ত অথচ মমতা ও অহংকারশূন্য, সুখ দুঃখে সমজ্ঞান, ক্ষমাশীল, সর্ব্বদা সন্তুষ্টচিত্ত, কর্ম্মধ্যান ও জ্ঞানযোগপরায়ণ, সংযতস্বভাব, আত্মতত্ত্বে শ্রদ্ধাবান্, মন ও বুদ্ধি পরমেশ্বরে সমর্পিত, এইরূপ ভক্ত ভগবানের প্রিয়। যিনি প্রকৃত অহিংসা সাধনে সিদ্ধ হইয়াছেন (অর্থাৎ যিনি কোন প্রাণী হইতে ভয় বা উদ্বেগ পান না কিম্বা নিজে কোন প্রাণীর ভয় বা উদ্বেগের কারণ হন না) যিনি আত্মোৎকর্ষে হৃষ্ট অথবা পরের শ্রীবৃদ্ধি দর্শনে বিষণ্ণ হন না, যিনি ব্যাঘ্রতস্কর অথবা আধিব্যাধি প্রভৃতি হইতে কখনও ভীত বা উদ্বিগ্ন হন না, এরূপ ভক্তই ভগবানের প্রিয়। যিনি অনায়াসলভ্য বস্তুতেও নিস্পৃহ, সর্ব্বদা শুচি (যাঁহার বাহ্যাভ্যন্তর শৌচ পূত) (১) আলস্যশূন্য, শত্রু মিত্রে সমভাব, ব্যথারহিত (২) এবং সর্ব্বপ্রকার সকামকর্ম্ম-পরিত্যাগী সেই ভক্তই ভগবানের প্রিয়। যিনি প্রিয় বস্তু লাভে হর্ষোৎফুল্ল এবং অপ্রিয় বস্তু লাভে বিষাদকাতর হন না, স্ত্রীপুত্রবিত্তাদি ক্ষয়ে যাঁহার মন শোকসন্তপ্ত হয় না, যিনি কামিনীকাঞ্চনাদিতে আকাঙ্ক্ষা রাখেন না, যিনি পাপের ন্যায় পুণ্যকেও (পুনর্জ্জন্মের কারণ জানিয়া) পরিহার করেন সেই ভক্ত ভগবানের প্রিয়। যিনি সংযতবাক্, শত্রু এবং মিত্রে যাঁহার সমবুদ্ধি, মান এবং অপমান, শীত এবং গ্রীষ্ম, সুখ এবং দুঃখ, নিন্দা এবং স্তুতি যাঁহার নিকটে সমান, সর্ব্ববিষয়েই যিনি আসক্তিবিরহিত, যিনি যদৃচ্ছাপ্রাপ্ত বস্তুতেই সন্তুষ্ট, গৃহসুখ-ত্যাগী, মুক্তিপথে দৃঢ় শ্রদ্ধাবান্, এরূপ ভক্তই ভগবানের প্রিয়। পরমাত্মার প্রতি যাঁহারা একান্ত নির্ভরশীল ও শ্রদ্ধাবান্, এবং মুক্তির উপায় বা অমৃতত্ব লাভের উপায় স্বরূপ ভগবদুক্ত ধর্ম্মের যাঁহারা বাস্তবিক

(১) যথাহ মনুঃ—অদ্ভির্গাত্রাণি শুধ্যতি মনঃ সত্যেন শুধ্যতি।
বিদ্যাতপোভ্যাং ভূতাত্মা বুদ্ধি- জ্ঞানেন শুধ্যতি।

(২) ব্যথাহীন।

অনুষ্ঠাতা, তাঁহারা ভগবানের নিতান্ত প্রিয়।

উল্লিখিত শ্লোকাবলীতে উৎকৃষ্ট ভক্তের লক্ষণ এবং ভক্তিমার্গ উভয়ই অতিশয় কৌশলে সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। নিষ্কাম ও নির্লিপ্তভাবে কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা চিত্ত শুদ্ধি লাভ হইবার পর ধ্যান যোগাদি দ্বারা হৃদয়ে বিশুদ্ধ এবং অদ্বৈত ব্রহ্মজ্ঞানের বিকাশ না হইলে সাধক প্রকৃত ভক্তির অধিকারী হইতে পারেন না। গীতার টীকাকারদিগের মধ্যে কেহ কেহ সগুণ এবং সাকার ব্রহ্মোপাসকদিগের পক্ষে ভক্তিমার্গ এবং নিরাকার ও নির্গুণ ব্রহ্মোপাসকদিগের নিমিত্ত জ্ঞানমার্গ উপদিষ্ট হইয়াছে মনে করিয়া, উভয় পথের মধ্যে একটী ভিন্নতা এবং তজ্জনিত সাকার ও নিরাকার-উপাসকদিগের মধ্যে একটী বিরোধের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু এরূপ ভিন্নতা বা বিরোধ গীতাশাস্ত্রের উদ্দেশ্য বা উপদেশ বলিয়া কিছুতেই মনে হয় না। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে গীতা সমন্বয়ের শাস্ত্র। গীতা প্রকাশিত হইবার বহু পূর্ব্ব হইতেই এদেশে কর্ম্মজ্ঞান এবং ভক্তিমার্গের প্রচলন ছিল এবং বেদেও কর্ম্মজ্ঞান ও উপাসনাকাণ্ড নামে এই যোগ ত্রিতয়ই ব্যাখ্যাত এবং উপদিষ্ট হইয়াছে। উহাদের পরস্পরের মধ্যে আপাত বিরোধ প্রতীয়মান হইল বলিয়া সেই বিরোধের নিরাকরণ এবং উহাদের মধ্যে সমন্বয় স্থাপনের জন্যই গীতার উৎপত্তি।

ধর্ম্মজগতে ভগবানের প্রকৃত ভক্তের স্থান যে অতি উচ্চ এবং তিনি যে সর্ব্বপ্রকারে নির্ভয়, তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। ভগবান্ বলিতেছেন,—

"অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্ ॥২২॥

যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্ ॥২৯॥
অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ ব্যবসিতো হি সঃ ॥৩০॥
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতি জানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ॥৩১॥
মাং হি পার্থ ব্যাপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ॥
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্ ॥৩২॥

গীতা নবম অধ্যায়।

"যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে ॥৬॥
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্ ॥৭॥ ১২ অধ্যায় ॥

যে আমাকে (ভগবান্‌কে) ভক্তি সহকারে ভজনা করে, যে সর্ব্বদা ভগবানে অবস্থিত, ভগবানও তাহার অন্তরে অবস্থান করিয়া থাকেন। কোন মহাপাপী ব্যক্তিও যদি অনন্যচিত্তে ভগবানকে ভজনা করে, সেও সাধু,—কারণ সে শুভকার্য্যে কৃতসংকল্প হইয়াছে। যাঁহারা একমন এক-প্রাণে কেবলমাত্র ভগবানের ভজনা করেন, ভগবান নিজে তাঁহাদের যোগক্ষেম (১) বহন করিয়া থাকেন। ভক্তিদ্বারা দুরাচার ব্যক্তিও শীঘ্র ধর্ম্মাত্মা হইয়া উঠে এবং

(১) যোগক্ষেম—যোগ = অলব্ধ বস্তুর লাভ। ক্ষেম—লব্ধ বস্তুর রক্ষা। ভগবান ভক্তের জন্য নিজে তাহার আবশ্যক দ্রব্যাদির সংগ্রহ ও রক্ষা করিয়া থাকেন।

নিত্যশক্তি লাভ করে। অর্জ্জুন,—তুমি নিশ্চয় জানিও, ভগবানের ভক্ত কখনও নষ্ট হয় না। যাহারা পাপযোনি-সম্ভূত, স্ত্রীজাতি, বৈশ্য—এমন কি নিতান্ত হীন শূদ্রও ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া পরমগতি লাভ করে। সমাহিতচিত্তে পরমশ্রদ্ধা সহকারে যে সকল ব্যক্তি ভগবানে মন সন্নিবেশিত করিয়া তাঁহার উপাসনা করেন, ভগবান তাঁহাদিগকে জন্মমৃত্যুসংকুল সংসার-সাগর হইতে উদ্ধার করিয়া থাকেন।

ভগবানের এই মধুর বাণী শ্রবণ করিলে আমাদের মত মহাপাপী তাপীর হৃদয় শীতল হয় সন্দেহ নাই, এবং আপাততঃ মনে হয়, বুঝি ভক্তিপথ বড় সহজ পথ। এইরূপ মনে করিয়া অনেকে ভক্তিকে কর্ম্ম ও জ্ঞান হইতে বিমুক্ত ও বিচ্যুত করিয়া তাহাকে ভিন্ন ভিন্ন আকার প্রদান করিয়াছেন এবং সেই মনঃ-কল্পিত ভক্তির নানা প্রকার সাধন-প্রণালীর আবিষ্কার করিয়াছেন। সেই সকল সাধন-প্রণালীমতে অনেক স্থলে কামনা, বাসনা, অহংকার, মমতা প্রভৃতি প্রবৃত্তিকে দমন করিবার পরিবর্ত্তে নানারূপে, নানাভাবে, তাহাদের অনুশীলন করিবার উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে (১)। সেই সকল সাধন প্রণালী ভাল কি মন্দ, তাহার বিচার করিবার অধিকার আমাদের নাই এবং বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহার কোন প্রাসঙ্গিকতাও নাই। তথাচ মধ্যে মধ্যে এরূপ কথা তুলিবার উদ্দেশ্য এই যে, এইরূপ নূতনতর ভক্তির ব্যাপকতা আধুনিক সময়ে অত্যন্ত অধিক হইয়াছে এবং তদ্ধেতু গীতোক্ত ভক্তিযোগ বুঝিতে ভ্রম প্রমাদ হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতিভাত হইবে যে, গীতোক্ত ভক্তিযোগ কর্ম্মজ্ঞান হইতে স্বতন্ত্র নহে। ভগবান যে বলিয়াছেন—"যাঁহারা পরমেশ্বরে সমস্ত কর্ম্ম সমর্পণ করতঃ তৎপর হইয়া কেবল তাঁহার ধ্যান ও উপাসনা করেন, ভগবান্ তাঁহাদিগকে মৃত্যুসমাকুল সংসার সাগর হইতে শীঘ্রই উদ্ধার করেন।" (৬।৭ শ্লোক, ১২শ অধ্যায়।) এই বাক্যে কর্ম্মযোগ, ধ্যানযোগ এবং জ্ঞানযোগ স্পষ্টই উপদিষ্ট হইয়াছে। এই ভক্তিযোগের সাধনা সম্বন্ধে শ্রীভগবান্ নিজের নিতান্ত প্রিয়ভক্ত অর্জ্জুনকে উপদেশ দিতেছেন,—

"ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্দ্ধং ন সংশয়ঃ ॥৮॥
অথচিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়ি স্থিরম্।
অভ্যাস-যোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং
ধনঞ্জয় ॥৯
অভ্যাসেঽপ্যসমর্থোঽসি মৎকর্ম্মপরমোভব।
মদর্থমপি কর্ম্মাণিকুর্বন্ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি ॥১০॥
অথৈতদপ্যশক্তোঽসি কর্ত্তুং মদ্‌যোগ-
মাশ্রিতঃ।
সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্ ॥১১॥
শ্রেয়োহি জ্ঞানমভ্যাসাজ্‌জ্ঞানাদ্ধ্যানং
বিশিষ্যতে।
ধ্যানাৎকর্ম্মফলত্যাগস্ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্
॥১২॥ দ্বাদশ।
যৎকরোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুষ্ব মদর্পণম্ ॥২৭॥
মন্মনাভব মদ্ভক্তেণ মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু ॥
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎ পরায়ণঃ ॥
৩৪। নবম ॥
মৎকর্ম্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ।
নির্বৈরঃ সর্ব্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব ॥
৫৫॥ একাদশ ॥

হে অর্জ্জুন, তুমি পরমেশ্বরে মন স্থির কর, তাঁহাতেই বুদ্ধি সন্নিবেশিত কর, তাহা

(১) দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, কান্ত, মধুর এবং আরও নানাবিধ প্রকার ভোগের সাধনা।

হইলে দেহান্তে পরমেশ্বরেই অবস্থান করিবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। যদি পরমেশ্বরে চিত্ত সমাধান করিতে না পার, তাহা হইলে অভ্যাস-যোগ দ্বারা তাঁহাকে লাভ করিবার ইচ্ছা কর (১)। যদি অভ্যাসেও অসমর্থ হও, তবে পরব্রহ্মোদ্দেশ্যে কর্ম্মানুষ্ঠান কর,—ব্রহ্মোদ্দেশ্যে কৃত কর্ম্মানুষ্ঠান হইতেও সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে। যদি এইরূপ কর্ম্ম করিতেও অশক্ত হও, তাহা হইলে পরব্রহ্মকে আশ্রয় করতঃ সংযতহৃদয়ে সমস্ত কর্ম্মের ফলত্যাগ কর। অভ্যাস হইতে জ্ঞান শ্রেয়ঃ, জ্ঞান হইতে ধ্যান উত্তম, এবং ধ্যান অপেক্ষা কর্ম্মফলত্যাগ উৎকৃষ্ট। হে কৌন্তেয়, তুমি যে সকল কর্ম্মানুষ্ঠান কর, যাহা ভোজন কর, যে হোমানুষ্ঠান কর, যা দান কর, অথবা তপস্যা কর, সেই সমস্তই পরব্রহ্মে অর্পণ কর। তুমি তদ্‌গতচিত্ত, তদ্ভক্ত, তাঁহার উপাসক হও এবং তাঁহাকেই নমস্কার কর। এই রূপে আত্মযুক্ত হইয়া ব্রহ্মের শরণাপন্ন হইলে তাঁহাকেই লাভ করিবে। হে পাণ্ডব যে ব্যক্তি ব্রহ্মের জন্যই কর্ম্ম করে, ব্রহ্মই যাহার পরম গতি, যে ব্রহ্মের একান্ত ভক্ত, বিষয়াদিতে মমতাশূন্য এবং ত্রিলোকের মধ্যে কাহারও সহিত শত্রুতা নাই, সেই ব্যক্তিই ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়।

প্রিয়ভক্ত অর্জ্জুনের প্রতি প্রদত্ত এই উপদেশ পাঠ করিলে স্পষ্টই অনুভূত হয় যে, ভগবান্ সেই কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ এবং ধ্যানযোগেরই উপদেশ দিতেছেন। সেই নিষ্কাম বা ব্রহ্মকাম, কর্ম্ম দ্বারা চিত্তের বিশুদ্ধি, তাহার পর বিশুদ্ধ হৃদয়ে সমাহিতমনে জ্ঞানের বিকাশ, ব্রহ্মধ্যান, ব্রহ্মসন্দর্শন, ব্রহ্মানন্দলাভ, সেই পূর্ব্বোচ্চারিত সমস্ত কথাই বিভিন্ন ভাষায় পুনরুক্ত করা হইয়াছে। নিষ্কাম অথবা ব্রহ্মকাম কর্ম্মানুষ্ঠানই যে, মোক্ষপথের প্রথম সোপান এবং পরে ধ্যানযোগে অদ্বৈতজ্ঞানলাভ যে সেই পথের দ্বিতীয় সোপান এবং অদ্বৈত ব্রহ্মানুভূতির পর নিজ সত্তা ব্রহ্মসত্তায় নিমজ্জিত অবস্থায় তদেকশরণতা এবং তদেক নির্ভরতার উদ্ভববশতঃ অত্যাশ্চর্য্য অনির্ব্বচনীয় ব্রহ্মানন্দলাভই যে সেই পথের চরম সোপান তাহা এই উপদেশে স্পষ্টরূপে বিবৃত হইয়াছে। গীতোক্ত জ্ঞান মার্গ ও ভক্তিমার্গ যে পরস্পর অবিরোধী এবং মূলতঃ একই বিষয়ের দুইটী মূর্ত্তি বিশেষ—সুতরাং অভেদ, তাহাতে কিছু মাত্র সংশয় নাই।

গীতার কোন কোন টীকাকার বা ব্যাখ্যাকার কর্ম্মী এবং জ্ঞানীদিগের মধ্যেও বিভিন্নতা এবং বিরোধের সৃষ্টি করিতে কুণ্ঠিত অথবা পশ্চাৎপদ হন নাই। দেশ বিদেশে এমন পণ্ডিত অনেক আছেন, যাঁহারা কর্ম্মমার্গ ও জ্ঞানমার্গের মধ্যে ঘোরতর প্রভেদের অস্তিত্ব দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন এবং তাঁহারা বলেন যে, জগদ্‌গুরু শঙ্করাবতার শ্রীশঙ্করাচার্য্য এই বিরোধের প্রধান নায়ক। এই সকল পণ্ডিত প্রচার করেন যে আচার্য্য দেব সকল প্রকার কর্ম্মানুষ্ঠানের ঘোরতর শত্রু ছিলেন। তিনি তাঁহার চাতুর্য্যময় অমোঘ যুক্তিরূপ কুঠারাঘাতে সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মের মূলোচ্ছেদ করিয়া গিয়াছেন। অধুনা ভারতে হিন্দুদিগের মধ্যে যে উৎসাহ ও কর্ম্মদক্ষতার অভাব এবং এক প্রকার তামসিক অবসন্ন জড়তা বর্ত্তমান,—শঙ্করাচার্য্যের দর্শনই নাকি তাহার জন্য মূলতঃ দায়ী! আচার্য্য দেবের প্রতি এই যে মহাগুরুতর অভিযোগ চলিতেছে—তাহার সদুত্তর দেওয়া সহজ নহে। শাঙ্কর-দর্শনে বিশেষ বুৎপন্ন পণ্ডিতবর্গই এরূপ উত্তর

(১) যোগদর্শন সমাধিপাদে অভ্যাস যোগের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে।

দিবার প্রকৃত অধিকারী। (১) তবে গীতোক্ত কর্ম্মযোগ এবং জ্ঞানযোগ সম্বন্ধে আমি নিঃশঙ্কহৃদয়ে ঘোষণা করিতে প্রস্তুত যে, জগদ্গুরু শ্রীমদাচার্য্য দেব এই উভয় যোগের মধ্যে কোন বিরোধের সৃষ্টি অথবা কর্ম্মযোগের বিরুদ্ধে কোনরূপ যুদ্ধ ঘোষণা করেন নাই। যে কর্ম্ম করিলে তাহার ফল পাপ অথবা পুণ্যরূপে জীবের জন্মান্তর লাভ অথবা সংসারবন্ধনের কারণ হয়, সেই কর্ম্মের বিরুদ্ধে—অর্থাৎ কাম্য বা সকাম কর্ম্মের বিরুদ্ধেই আচার্য্যদেব অস্ত্র ধারণ করিয়াছেন এবং গীতোক্ত কর্ম্মযোগও সেই রূপ কর্ম্মের বিরুদ্ধে ঘোরতর যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছেন। সকাম যাগযজ্ঞাদি কর্ম্ম, বেদোপদিষ্ট হইলেও গীতা তাহার পক্ষপাতী নহেন। অপর পক্ষে নিষ্কাম কর্ম্মের মাহাত্ম্য খ্যাপন এবং প্রচারই গীতার মুখ্য উদ্দেশ্য এবং তদ্ধেতু গীতা অনধিকারীর পক্ষে কর্ম্ম সন্ন্যাসের ঘোরতর নিন্দা করিয়াছেন। গীতা এবং শঙ্কর উভয়েই সকাম স্বার্থপর কর্ম্ম কাণ্ডের বিরোধী এবং নিষ্কাম কর্ম্মযোগের পক্ষপাতী। এই "নিষ্কাম" কর্ম্ম সাধনা বুঝিতে অনেকে Motiveশূন্য কর্ম্ম বুঝিয়া বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছেন এবং বিষয়টী বুঝিবার নিমিত্ত সদুপদেশক অথবা সচ্ছাস্ত্রের আশ্রয় গ্রহণের পরিবর্ত্তে বিদ্রূপ এবং উপহাস দ্বারা স্ব স্ব অজ্ঞানতার পরিচয় দিয়াছেন। প্রকৃত পক্ষে ইহাতে উপহাস বা বিদ্রূপের কথা কিছুই নাই। কামনা বা Motive ভিন্ন যে, কোন কর্ম্ম হইতে পারে না, এই সামান্য তত্ত্ব অধুনা অতি বালকেও বুঝিতে পারে অথচ গীতার উপদেষ্টা সর্ব্বজ্ঞ সে সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিলেন, এই অশ্রদ্ধেয় কথায় কে বিশ্বাস করিবে? প্রত্যেক বিশেষ বিশেষ শাস্ত্রেই বিশেষ বিশেষ পারিভাষিক শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে—এবং ঐ সকল শব্দের প্রকৃত পরিভাষা না জানিলে সেই সেই শাস্ত্র পাঠ নিষ্ফল হয়। গীতা শাস্ত্রে ব্যবহৃত "নিষ্কাম" শব্দও পারিভাষিক। ফলের আশা না রাখিয়া "ব্রহ্মোদ্দেশ্যে" আচরিত কর্ম্মের নাম "নিষ্কাম" কর্ম্ম এবং "ব্রহ্মকাম" শব্দ "নিষ্কামের" প্রতিশব্দ। গীতায় পুনঃ পুনঃ কথিত হইয়াছে যে, ফলের অভিলাষ না রাখিয়া, শাস্ত্রবিহিত, স্ব স্ব বর্ণাশ্রমোচিত, কর্ত্তব্য কর্ম্মকেই নিষ্কাম কর্ম্ম বলে এবং এরূপ কর্ম্ম দ্বারা কর্ম্মী বন্ধনগ্রস্ত হওয়ার পরিবর্ত্তে বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করে। এইরূপ কর্ম্ম করিতে করিতে সাধকের ইন্দ্রিয়গ্রাম সংযত এবং তদ্ধেতু মনও শুদ্ধ শান্ত হইয়া উঠে। মন শান্ত হইলেই চিন্তার একাগ্রতা ও ধ্যানের গভীরতা জন্মে। শান্ত ও শুদ্ধমনে একাগ্রতার সহিত ব্রহ্মের ধ্যান করিতে করিতে হৃদয়ে বিমল ব্রহ্মজ্ঞানের উদ্ভব হয় এবং এই জ্ঞান উৎপন্ন হইলেই সূর্য্যোদয়ে অন্ধকাররাশির ন্যায় শত শত জন্মান্তরীন অজ্ঞান ও কর্ম্মসংস্কারসমূহ একেবারে নষ্ট হইয়া যায় এবং সাধক ধন্য হইয়া যান। প্রত্যহ অভ্যাস যোগ দ্বারা এই ব্রহ্মজ্ঞান স্থায়িভাব ধারণ করিলেই ব্রহ্ম-সন্দর্শন ও ব্রহ্মানন্দ লাভ হইয়া থাকে। ব্রহ্মানন্দ প্রাপ্ত হইলেই জীবন্মুক্তি করতল-গত হইল। কর্ম্মযোগ-পথে এইরূপে মোক্ষ প্রাপ্তি ঘটে। কর্ম্ম এবং জ্ঞানের মধ্যে যে কোন প্রকার প্রভেদ নাই, তাহা ভগবান নিজে স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন,—

"সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্ বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ
একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োর্বিন্দতে ফলম্ ৷৷ ৪৷৷
যৎসাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্‌যোগৈরপি

গীতা ৫অঃ ॥

---

(১) পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কোকিলেশ্বর বিদ্যারত্ন এম্, এ মহাশয় তৎপ্রণীত "উপনিষদের উপদেশ" নামক বিখ্যাত গ্রন্থে শঙ্করের এই কলঙ্ক-মোচন করিয়াছেন।

একং সাংখ্যং চ যোগং চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ৫ ॥"

জ্ঞানযোগ ও কর্ম্মযোগের মধ্যে প্রকৃত কোন পার্থক্য নাই। বালক বা অজ্ঞ ব্যক্তিরাই উভয়কে পরস্পর পৃথক্ বলিয়া থাকে, পণ্ডিতেরা কখনই সেরূপ বলেন না। উভয় প্রকারের মধ্যে একটীকে সম্যক্ প্রকারে আশ্রয় করিলে উভয়ের যে ফল-তত্ত্বজ্ঞান বা মোক্ষ, তাহা পাওয়া যায়। জ্ঞানযোগ দ্বারা যে মুক্তি পাওয়া যায়, কর্ম্মযোগ দ্বারাও সেই মুক্তি লাভ হয়, অতএব উভয়কে যিনি এক ও অভিন্ন দৃষ্টিতে দেখেন, তিনিই প্রকৃত দ্রষ্টা। আর যিনি উভয়ের মধ্যে বিরোধ বা পার্থক্য অবলোকন করেন, তিনি ভ্রান্ত। কর্ম্ম যে জ্ঞান-পথে অগ্রসর হইবার প্রথম সোপান তাহার সম্বন্ধে ভগবান বলিতেছেন—

"আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম্মকারণমুচ্যতে। ৬।৩॥"

সাধনপথে আরোহণেচ্ছু মুনির পক্ষে কর্ম্মই উপায়। ফলতঃ কর্ম্মযোগ ব্যতীত ব্রহ্মজ্ঞান লাভের অন্য পথ গীতা নির্দ্দেশ করেন নাই। ফলতঃ কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি এই যোগত্রয়ের সাধন এবং অবলম্বন দ্বারাই সাধক মোক্ষলাভ করিয়া ধন্য হইবেন ইহাই গীতার উপদেশ।

সমগ্র গীতা গ্রন্থে অষ্টাদশ অধ্যায়ে অনেক প্রকার যোগের বিষয় ব্যাখ্যাত হইয়াছে, কিন্তু তন্মধ্যে কর্ম্মযোগ, ভক্তিযোগ ও জ্ঞানযোগই প্রধান। গীতার প্রথম ছয় অধ্যায়ে কর্ম্মযোগ, দ্বিতীয় ছয় অধ্যায়ে ভক্তিযোগ এবং তৃতীয় ছয় অধ্যায়ে জ্ঞানযোগের বিষয় কীর্ত্তিত হইয়াছে। পক্ষিগণ যেমন উভয় পক্ষ, সঞ্চালন এবং সঞ্চালনের শক্তি দ্বিবিধ উপায়ে নভস্তলের অত্যূর্দ্ধ প্রদেশেও সমুত্থিত হয়, তদ্রূপ জীব কর্ম্ম ও জ্ঞানরূপ পক্ষ এবং ভক্তিরূপ শক্তিদ্বারা ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হয়। ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের বিংশতি অধ্যায়ে ভগবান তাঁহার পরম ভক্ত উদ্ধবকে বলিতেছেন—

"যোগাস্ত্রয়ো ময়া প্রোক্তা নৃণাং শ্রেয়োবিধিৎসয়া।
জ্ঞানং কর্ম্ম চ ভক্তিশ্চ, নোপায়োঽন্যোঽস্তি কুত্রচিৎ ॥"

মনুষ্যের মঙ্গল-সাধনেচ্ছায় আমি কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ এবং ভক্তিযোগের বিধান করিয়াছি; এতদ্ভিন্ন কল্যাণ-সাধনের আর অন্য উপায় নাই। আমরাও ভগবদ্‌বাক্যের অনুসরণ করতঃ এই যোগত্রয়ের সংক্ষেপে বর্ণনা করিলাম। এক্ষণে প্রস্তাব শেষে সেই পরমপুরুষকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করতঃ অস্মদ্‌কার বক্তব্য সমাপ্ত করি—

"যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্ধরঃ।
তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতির্ধ্রুবা নীতির্মতির্মম ॥"

শ্রীসত্যবন্ধু দাস।

ভাষানুবাদ

সংস্কৃত গ্রন্থের ভাষানুবাদ দ্বারা সাধারণের উপকার কি অপকার হইতেছে, উপস্থিত প্রবন্ধে আমরা তাহারই আলোচনা করিব। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, ভাষানুবাদ দ্বারা আমাদের প্রভূত উপকার সংসাধিত হইতেছে; কেহ কেহ বলেন যে, ভাষানুবাদ দ্বারা আপাততঃ উপকার প্রতীয়মান হইলেও ভিতরে ভিতরে অবনতির পথই পরিষ্কৃত হইতেছে, সুতরাং ইহা উপকার নহে, উপকারাভাস মাত্র। কোন বিষয়ের এই

নিষ্কাশনে প্রয়াসী হইলে, প্রথমতঃ উভয় পক্ষের কথার তারতম্য বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। অতএব দেখা যাউক ভাষানুবাদ-প্রিয়গণ ভাষানুবাদের আধিক্য প্রদর্শনার্থ কীদৃশ যুক্তিনিবহের অবতারণা করেন এবং তৎপ্রতিপক্ষগণ তৎপ্রতিকূলেই বা কি বলিয়া স্বমত সংস্থাপন করেন। যাঁহারা ভাষানুবাদের প্রশংসা করেন তাঁহারা বলেন যে, পূর্ব্বকালে গৃহ পরিত্যাগ করিয়া গুরু-কু ক্লিষ্ট হইয়া এমন কি প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়াও জনসাধারণ যে যে গ্রন্থ সমূহের প্রকৃতরহস্য উদ্ঘাটন করিতে সমর্থ হইতেন না, ভাষানুবাদের সাহায্যে আজ তাহা হস্তা-মলকের ন্যায় সম্মুখে অবভাসমান হইতেছে। পুরাণাদির আলোচনা করিলে অবগত হওয়া যায়, অনেক সময়ে অনেক বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধৎসু হইয়া, ঋষিগণ অনা-হারে অনিদ্রায় অনন্যচিন্তায় অতিদীর্ঘ কাল তপস্যা করিতেন বটে, অবশেষে স্বীয় ভূত ও ইন্দ্রিয়গ্রামকে কষ্ট দেওয়াই শেষ ফল দাঁড়াইত। কিন্তু প্রকৃত তত্ত্বের কিছুই মীমাংসা হইত না। আজ কালও হইতে ছিল না। ভাষানুবাদ রূপ নব বিভাকর যে দিন হইতে বিজ্ঞান রূপ ময়ূখমালায় আমা-দের জন্মজন্মান্তরীণ আন্তরিক গাঢ় অন্ধকার-কে দূরাপসৃত করিয়াছে, সেই দিন হইতে জগৎ যে ক্রমশঃ উন্নততর পথে অগ্রসর হই-তেছে ইহা কে না বলিবে? আরও পূর্ব্বে যিনি কোন এক গ্রন্থের কোন একটি তত্ত্ব সংগ্রহ করিতে পারিতেন, তিনি তাহা প্রাণাপেক্ষা প্রিয় করিয়া এবং ধনাপেক্ষা নিভৃত স্থানে রাখিয়া, জনসাধারণের নিকট যাহা একটা মিথ্যা আড়ম্বর দেখাইতেন বা জনসাধারণকে তজ্জন্য যাহা দ্বারা উৎকণ্ঠিত করিতেন, ভাষানুবাদের সাহায্যে সেই স্বার্থ-পর আত্মম্ভরি ব্যক্তিনিচয়ের সেই বৃথা গর্ব্ব ও মিথ্যা আড়ম্বর একেবারেই চূর্ণ হইয়াছে। এবং তত্ত্বপিপাসু ধর্ম্মজিজ্ঞাসু ব্যক্তিগণকেও অনর্থক উৎকণ্ঠার অধীনতা স্বীকার করিতে হইতেছে না। আরও সুবিধা দেখুন, ইহঃপূর্ব্বে যদিও কেহ কেহ কথঞ্চিৎ কিছু কিছু শাস্ত্রমর্ম্ম সংগ্রহ করিতে পারিতেন, কালক্রমে একবার যদি তাহা বিস্মৃতিরূপ গভীর গুহায় বিসর্জ্জিত হইত, তাহা হইলে, তাহা আর প্রায়ই মিলিত না। যদিও কথঞ্চিৎ কিছু উদ্ধৃত হইত, তাহা আবার সন্দেহ-পাংশু-বিজড়িত হইয়া বিভিন্নাকারে পরিণত হইত। ভাষানুবাদ আজ আমাদের প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম সেই শাস্ত্রীয় তত্ত্ব গুলিকে বিস্মৃতি পিশাচীর করাল কবল হইতে চির রক্ষা করিতেছে। যখন যে বিষয়ের আবশ্যকতা উপলব্ধি হইতেছে, তখন তত্তৎ বিষয় স্মৃতিপথে উদিত না হইলেও লবমাত্র শারীরিক পরিশ্রম স্বীকার করিয়া ভাষানুবাদ পূত শাস্ত্র গ্রন্থ খুলিয়া দেখিলে অনায়াসে তত্তৎস্থল অবভাষিত হইতেছে ও অভূতপূর্ব্ব আনন্দ জন্মাইতেছে। তজ্জন্য লবমাত্র মান-সিক পরিশ্রম বা ইতরের তোষামোদের আদৌ আবশ্যকতা হয় না। অতএব দেখা যাইতেছে যে ভাষানুবাদের হিতকর আবি-র্ভাবে শাস্ত্রীয় সারনিচয় তাম্রফলক-খোদিত বর্ণাবলীর ন্যায় অক্ষুণ্ণভাবে প্রতি গৃহে সং-রক্ষিত হইল। আরও ভাবিয়া দেখুন, ভাষানু-বাদ হইবার পূর্ব্বে অধিকাংশ সংস্কৃত গ্রন্থের নামই অবিদিত ছিল। যদিও স্থানে স্থানে কতকগুলি সংস্কৃত গ্রন্থের অধ্যয়ন অধ্যাপনা-চলিত, তাহা সার্ব্বভৌম বা সার্ব্বজনীন নহে। ভাষানুবাদ আমাদের সে শোচনীয় অভাব অনেক দূর করিয়াছে। সম্প্রতি মহামহো-পাধ্যায় হইতে আরম্ভ করিয়া সামান্য একটী কর্ম্মচারী পর্যন্ত সকলেই সংস্কৃত শাস্ত্রের অল্লাধিক ভাবে আলোচনা করিতে উৎসা-

হিত হইতেছেন। এবং সংস্কৃত গ্রন্থ যে কি জিনিষ ও পূর্ব্বকালীন আর্য্যগণের যে কীদৃশী প্রতিভা ভাষানুবাদই তাহা জগৎকে জানাইয়া দিতেছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। পূর্ব্বে এই ভারত ছিল এবং এই ভগবদ্গীতাও ছিল, কিন্তু উপস্থিত সময়ের ন্যায় শ্রীভগবদ্গীতার ঈদৃশ সমধিক সমাদর দেখিয়াছেন বা শুনিয়াছেন কি? আজ ভাষানুবাদের প্রসাদেই আমাদের অমূল্য রত্ন আধ্যাত্মিক শাস্ত্রের অনন্যসার সেই "গীতা" প্রতিগৃহে বিরাজিত। পূর্ব্বে সংস্কৃত গ্রন্থের নাম শুনিলেই মনে যেন কি একটা ভয় আসিয়া অন্তঃকরণকে পশ্চাৎপদ করিয়া তুলিত। ভাষানুবাদ রূপ পরিষ্কৃত পথের পথিক হইতে পারিয়া অন্তঃকরণ আজ সে ভয়ে ভীত নহে। ভাষানুবাদকে সহচর করিয়া শাস্ত্র-বারিধির গভীরতম প্রদেশ হইতেও সার রত্ন সংগ্রহে সাহসী হইয়াছে। ভাষানুবাদ রূপ রসঃ সংঘর্ষণে চিত্তদর্পণের অজ্ঞান কালিমা আর নাই। এই রূপ ভাষানুবাদের কয়টী প্রশংসার কথা বলিব? জোর করিয়া বলিতে পারি জগৎ যদি তত্ত্বপিপাসু হইয়া থাকে তবে এই ভাষানুবাদেই। জগৎ যদি উন্নত হইয়া থাকে, তাহা ভাষানুবাদের অনন্ত পরিণাম মাত্র। কি কায়িক, কি বাচিক, কি মানসিক সমস্ত উন্নতির ভাষানুবাদই অঙ্কুর।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র প্রহরাজ।

সাহিত্য-সভার কার্য্য-বিবরণী।

১২শ বার্ষিক ১ম মাসিক অধিবেশন।

৩১শে বৈশাখ, ১৩১৮ সাল, রবিবার,—অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকা।

সভাস্থলে নিম্নলিখিত সভ্যগণ উপস্থিত ছিলেন।——

১। শ্রীযুক্ত মহারাজকুমার শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর।
২। „ রায় ডাক্তার চুনীলাল বসু বাহাদুর এম্. বি।
৩। „ রায় রাজেন্দ্র চন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর এম্ এ।
৪। „ কৃষ্ণলাল দাস।
৫। „ কবিরাজ অঘোরনাথ শাস্ত্রী।
৬। „ বি, দে, এম্, এ,।
৭। „ মৌলবী বেলায়েৎ হোসেন।
৮। „ পণ্ডিত ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যারত্ন।
৯। „ বঙ্কুলাল ধর।
১০। „ কবিরাজ গোবর্দ্ধন শর্ম্মা।
১১। „ কনীঅলাল দে।
১২। „ অম্বিকাচরণ দেব।
১৩। „ যতীন্দ্র নাথ দত্ত।
১৪। „ পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধি।
১৫। „ প্রমথভূষণ বসু।
১৬। „ ভাগবতকুমার গোস্বামী শাস্ত্রী এম্, এ।
১৭। „ গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

২। শ্রীযুক্ত মহারাজকুমার শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

৩। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণী পঠিত ও অনুমোদিত হইল।

৪। শ্রীযুক্ত রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর এম, এ, সংক্ষিপ্ত অথচ হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতায় সাহিত্য-সভার অন্যতম সভ্য পঞ্চানন সাহিত্যাচার্য্যের মৃত্যুতে শোক

প্রকাশ পূর্ব্বক নিম্নলিখিত প্রস্তাবটী উপস্থিত করেন—

"পণ্ডিত পঞ্চানন সাহিত্যাচার্য্যের মৃত্যুতে সাহিত্য-সভা গভীর শোক প্রকাশ করিতেছে। তাঁহার বিয়োগে সভা অতীব ক্ষতিগ্রস্ত হইল।

এই প্রস্তাবের অনুলিপি তাঁহার শোক-সন্তপ্ত পরিজনবর্গের নিকট প্রেরিত হউক।"

শ্রীযুক্ত রায় ডক্তার চুনীলাল বসু বাহাদুর এম, বি, উক্ত প্রস্তাব সমর্থন করিলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

৫। সভার নিয়মাবলীর ৫৬ ধারা অনুসারে কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির ৭টী শূন্য পদে নিম্নলিখিত ৭জন নূতন সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন,—

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর এম, এ।

সমর্থক—শ্রীযুক্ত ভাগবতকুমার গোস্বামী শাস্ত্রী এম, এ।

১। শ্রীযুক্ত ডাক্তার এম, বি, মিত্র এম, বি (লণ্ডন)।

২। শ্রীযুক্ত কুমার প্রফুল্লচন্দ্র দেব বাহাদুর বি, এ।

৩। শ্রীযুক্ত মৌলবী বেলায়েৎ হোসেন।

৪। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল।

৫। শ্রীযুক্ত শশধর গঙ্গোপাধ্যায়।

৬। দেবেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়।

৭। কবিরাজ অঘোরনাথ শাস্ত্রী।

৬। শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ মহাশয় "আর্য্যধর্ম্ম" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিবেন এইরূপ কথা ছিল, কিন্তু তিনি অনিবার্য্য কারণে উপস্থিত হইতে না পারায় স্থির হইল যে, অদ্য এই প্রবন্ধ পাঠ স্থগিত হউক, আগামী কোন দিন ঐ প্রবন্ধ পাঠার্থ অনুরোধ করিয়া শ্রীযুক্ত তর্কবাগীশ মহাশয়কে পত্র লেখা হউক। পত্রের উত্তর প্রাপ্ত হইলে, প্রবন্ধ পাঠ সম্বন্ধে দিন স্থির করা হইবে।

৭। শ্রীযুক্ত সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীরাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী। শ্রীচুনীলাল বসু।
সম্পাদক। সভাপতি।

২৮শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৮ সাল।

১২শ বার্ষিক ২য় মাসিক অধিবেশন।

২৮শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৮।

রবিবার অপরাহ্ণ ৫॥০ ঘটিকা।

১। সভাস্থলে নিম্নলিখিত সভ্যগণ উপস্থিত ছিলেন,—

১। শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর।

২। " রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর এম, এ।

৩। " রায় চুনীলাল বসু বাহাদুর এম, বি

৪। শ্রীযুক্ত রায় মতিলাল হালদার বাহাদুর।

৫। " শীতলপ্রসাদ ঘোষ বি, এল।

৬। " শশধর গঙ্গোপাধ্যায়।

৭। " গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

৮। " বিনোদবিহারী বসু।

৯। " কুমুদবিহারী বসু।

১০। শ্রীযুক্ত কুমার প্রমোদকৃষ্ণ দেব বাহাদুর।
১১। „ হরেশচন্দ্র সমাজপতি।
১২। „ নরেশচন্দ্র „
১৩। „ অশোকচন্দ্র „
১৪। „ মায়াশঙ্কর „
১৫। „ বিশ্বম্ভর মিত্র।
১৬। „ নরেন্দ্র চন্দ্র রায় চৌধুরী।
মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ।
১৮। „ পণ্ডিত রাজকৃষ্ণ শিরোমণি।
১৯। „ গৌরহরি সেন।
২০। „ মহামহোপাধ্যায় কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ।
২১। „ হেমচন্দ্র সেন গুপ্ত।
২২। „ অম্বিকাচরণ দেব।
২৩। „ কুঞ্জবিহারী বসু বি. এ।
২৪। „ কাননবিহারী বসু।
২৫। „ যতীন্দ্রনাথ দত্ত।
২৬। „ ত্রিপুরাচরণ ঘোষ।
২৭। „ সতীশচন্দ্র দে বি, এল।
২৮। „ মুণীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এম. এ. বি, এল।
২৯। „ মাননীয় কুমার শরদিন্দু নারায়ণ রায়।
৩০। „ সুরেশচন্দ্র বসু।
৩১। „ চারুচন্দ্র বসু মল্লিক।
৩২। „ মহারাজকুমার বনোয়ারি আনন্দ দেব বাহাদুর।
৩৩। „ মৌলবী বেলায়েৎ হোসেন।
৩৪। „ অনিল প্রকাশ বসু এম, এ।
৩৫। „ চন্দ্রনাথ বসু।
৩৬। „ কুমার প্রফুল্লকৃষ্ণ দেব বাহাদুর বি, এ।
৩৭। „ দেবেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
৩৮। „ ফণীন্দ্রলাল দে।
৩৯। শ্রীযুক্ত কালীপদ চন্দ্র।
৪০। „ প্রভাতচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
৪১। „ মহারাজ কুমার মহেন্দ্রচন্দ্র সিংহ বাহাদুর।
৪২। „ স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কেটি, এম এ ডি এল।
৪৩। „ রায় দেবেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ বাহাদুর।
৪৪। „ বঙ্কুবিহারী ধর।
৪৫। „ বিহারিলাল সরকার।
৪৬। „ রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ এম, এ, বি, এল।
৪৭। „ উমেশচন্দ্র গুপ্ত।
৪৮। „ কবিরাজ গোবর্দ্ধন শর্ম্মা।
৪৯। „ যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল।
৫০। „ ডাক্তার এস, বি, মিত্র, এম, বি (লণ্ডন)।
৫১। „ মহারাজকুমার শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর।
৫২। „ হেমচন্দ্র দে এম, এ।
৫৩। „ বীরেশ্বর পাঁড়ে।
৫৪। „ ডাক্তার বিপিনবিহারী ঘোষ এম, বি।

২। শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর এম, এ, মহাশয়ের সমর্থনে সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত রায় ডাক্তার চুনীলাল বসু বাহাদুর এম, বি, সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

৩। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণী পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।

৪। সভাপতি শ্রীযুক্ত রায় ডাক্তার চুনীলাল বসু বাহাদুর এম, বি মহাশয়ের আহ্বানমত শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর, সভার অষ্টম সভ্য আচার্য্য সভা-

ব্রত সামশ্রমীর মৃত্যুতে হৃদয়গ্রাহী সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় তাঁহার গুণগ্রাম প্রকাশ করিয়া প্রস্তাব করিলেন যে, "আচার্য্য স ব্রত সামশ্রমীর মৃত্যুতে সাহিত্য-সভা গভীর শোক প্রকাশ করিতেছেন এবং তাঁহার বিয়োগে সভা বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইলেন। এই প্রস্তাবের অনুলিপি তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিজনবর্গের নিকট প্রেরিত হউক।"

শ্রীযুক্ত রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর উক্ত প্রস্তাব সমর্থনসূত্রে সামশ্রমী মহাশয়ের নানাগুণের—বিশেষতঃ বেদশাস্ত্র সম্বন্ধে সবিশেষ অভিজ্ঞতার উল্লেখ করিয়া বলেন যে, সামশ্রমী মহাশয় ৺কাশীধামে যথারীতি ব্রহ্মচর্য্য পালন ও গুরুগৃহে বাসপূর্ব্বক বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। বাঙ্গালীদিগের মধ্যে তিনিই একমাত্র বেদজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার বেদবিদ্যা-খ্যাতি এতদূর বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল যে, ভারতবর্ষের নানা স্থান হইতে ছাত্রসমূহ তাঁহার নিকট বেদপাঠ করিতে আগমন করিত মৃত্যুর কয়েক দিবস পূর্ব্বেও তিনি কর্ণাট দেশ হইতে আগত কোন বেদজ্ঞ পণ্ডিতের সহিত বেদ সম্বন্ধীয় তত্ত্বের আলোচনা করেন ও পণ্ডিত মহাশয়ের সংশয়াপনোদন করেন এসিয়েটিক সোসাইটী হইতে এ পর্য্যন্ত যে সমস্ত বেদগ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার প্রায় অধিকাংশই তাঁহা কর্তৃক সম্পাদিত হইয়াছে। তাঁহার মৃত্যুতে কেবল সাহিত্য সভা কেন সমস্ত বঙ্গদেশ এমন কি সমগ্র ভারতবর্ষ বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইল। ঐ ক্ষতির যে আর পূরণ হইবে তাহার আশা অতি অল্প।

তৎপরে শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ মহাশয় বলিলেন যে, আচার্য সামশ্রমী মহাশয় মরিয়াও মরেন নাই তাঁহার মৃত্যুতে ভারতবর্ষ যে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, সে ক্ষতির পূরণ হওয়া একপ্রকার অসম্ভব।

পরে সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত রাজা বাহাদুরের প্রস্তাব গৃহীত ও অনুমোদিত হইল।

৫। তৎপরে শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর "সুখ ও দুঃখ" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

৬। প্রবন্ধ পাঠান্তে শ্রীযুক্ত স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কেটি, এম, এ, ডি, এল, পি এচ, ডি, মহাশয় বলিলেন, এই সুখ দুঃখময় জগতে রাজা বাহাদুরের রচিত প্রবন্ধ ও তৎসম্বন্ধে আলোচনা এই উভয়ই সুখকর। তাঁহার সুন্দর ও সুললিত প্রবন্ধের জন্ত তাঁহাকে ধন্তবাদ না দিয়া থাকা যায় না। ইহাতে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য যতগুলি বিশদরূপে বিবৃত হইয়াছে। কিসে দুঃখ যাইতে পারে, তাহাও আভাস দেওয়া হইয়াছে। আর একটী কথা—প্রবন্ধের ভাষা অতি সুন্দর—অতি বিশদ। এ দেশে যে পরিমাণে দর্শনশাস্ত্রের চর্চ্চা হইয়াছে, অন্ত কোন দেশে তত হয় নাই। বঙ্গভাষাতেও হয় নাই। তবে বঙ্গভাষাতেও যে এপ্রকার চর্চ্চা হইতে পারে, রাজা বাহাদুরের প্রবন্ধ হইতে তাহা প্রতিপন্ন হইতেছে, সেজন্ত তিনি ধন্তবাদার্হ। রাজা বাহাদুরকে তিনি সর্ব্বান্তঃকরণে ধন্তবাদ দিতেছেন। এই প্রবন্ধের আলোচনা অতি কঠিন। এ বিষয়ে তিনি আর অধিক কি বলিবেন, সমালোচনার ভার সভায় উপস্থিত দার্শনিকগণের উপরই ন্তস্ত করিলেন। প্রবন্ধের ঐতিহাসিক অংশের আলোচনা সংক্ষিপ্ত হইলেও অতীব সুন্দর হইয়াছে। সে সম্বন্ধে তিনি কোন মতামত প্রকাশ আবশুক বলিয়া বিবেচনা করেন না। মীমাংসা সম্বন্ধে চিরকালই মতভেদ থাকিবে। "সুখ ও দুঃখ চিরকালই আছে, তবে কোন্‌টা আমাদের সুখ কোন্‌টা আমাদের দুঃখ তাহা

আমরা জানি না। রাজা বাহাদুর, সুখ দুঃখের চিন্তা ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করিবার উপদেশ দিয়াছেন। এই উপদেশ সমীচীন। কর্ম্মদ্বারা সকল সময় সুখ হয় না বলিয়া কর্ম্মত্যাগও প্রশস্ত নহে ইত্যাদি।

৭। শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ মহাশয় বলিলেন, শ্রীযুক্ত রাজা বাহাদুর যে,প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে শ্রীযুক্ত গুরুদাস বাবু যাহা বলিয়াছেন তাহাই আমাকে বলিতে হইবে। রাজা বাহাদুরের প্রবন্ধ অতি সুখপাঠ্য হইয়াছে। তিনি প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সমন্বয় করিয়াছেন। সুখ ও দুঃখ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা যথেষ্ট হইয়াছে। দুরদৃষ্ট জন্য গুণাবশেষ দুঃখ ও শুভাদৃষ্ট বিষয়ক গুণ বিশেষ সুখ, ইহাই আমাদিগের শাস্ত্রের মত। সুখ দুঃখ আত্মার ধর্ম্ম বা চিত্তের ধর্ম্ম, ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রকারের এইরূপ মত। নিরবচ্ছিন্ন সুখই স্বর্গ আর নিরবচ্ছিন্ন দুঃখই নরক। বৈষয়িক, আভ্যাসিক প্রভৃতি ভেদে সুখ নানা প্রকার—এই সকল লৌকিক সুখ দুঃখমিশ্রিত সুতরাং অনিত্য বলিয়া শাস্ত্রকারেরা জ্ঞানপথ অবলম্বন করিয়া কর্ম্মের উপদেশ দিয়াছেন। বহির্জগত অবলম্বন করিয়া অন্তর্জগতে প্রবেশের চেষ্টা করাই উচিত। শ্রীযুক্ত রাজা বাহাদুর এ বিষয়ে বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন। বাস্তবিক মনই একমাত্র সুখ লাভের উপায়, মনকে সংযত করিতে পারিলে সকলই হইতে পারে।

৮। শ্রীযুক্ত রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর এম, এ, বলিলেন, শ্রীযুক্ত রাজা বাহাদুর অদ্য ও ইহার পূর্ব্বে যে কয়টী প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছেন তৎসমুদয়ের একটী বিশেষত্ব এই যে, উহাতে আলোচ্য বিষয়ের স্বাধীন চিন্তার অবকাশ হয়। এই চিন্তা দায়কতা বা Suggestivenessই রাজা বাহাদুরের মৌলিকতা। আর একটী বিশেষত্ব এই যে, রাজা বাহাদুর স্বীয় প্রবন্ধে অপ্রমাণ কোন কথা না বলিয়া সকল স্থানেই প্রমাণ উদ্ধার করিয়া থাকেন, তাহার ফলে পাঠকের মহান উপকার সাধিত হয়। প্রবন্ধে সমালোচনার বিশেষ অবকাশ নাই, কারণ রাজাবাহাদুর প্রাচীনদিগের মত উদ্ধার পূর্ব্বক আলোচ্য বিষয়ে চিন্তার উন্মেষ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কোন স্থলেই মুখ্যভাবে নিজের মত কি তাহা প্রকাশ করিবার নিমিত্ত ব্যগ্রতা প্রদর্শন করেন নাই। প্রবন্ধ অতি সুন্দর হইয়াছে; ইহাতে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য মত সমূহ যথাযথ স্থানে সুবিন্যস্ত হইয়াছে। সুখ ও দুঃখের উৎপত্তি, প্রকৃতি, বিস্তৃতি ও তন্মূলক নৈতিক ও সামাজিক তত্ত্ব প্রভৃতি অবশ্য জ্ঞেয় সকল কথাই প্রবন্ধে আলোচিত হইয়াছে। এসকল কথার সমালোচনা করা সহজ নহে, কারণ ঐ সকল বিষয়ে মতভেদ চিরকালই আছে ও থাকিবে। আমাদের শাস্ত্রকারদিগের মতও যথাস্থানে উল্লিখিত হইয়াছে। তবে ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের মতের উল্লেখ থাকিলে ভাল হইত। প্রবন্ধের ভাষা ভালই হইয়াছে ইহার যদি কিছু ত্রুটী বা অসম্পূর্ণতা থাকে তাহা বিষয়ের কাঠিন্য নিবন্ধন, প্রবন্ধকারের অশক্তি নিবন্ধন নহে। আমি প্রবন্ধকারকে ব্যক্তিগতভাবে ও সভার সম্পাদকরূপে বিশেষভাবে ধন্যবাদ দিতেছি।

৯। শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম, এ, পি এচ, ডি, বলিলেন, প্রবন্ধ অতি সুন্দর হইয়াছে তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তিনি অদ্যকার প্রবন্ধে যে গভীর গবেষণা করিয়াছেন তাহাতে আমি বিস্মিত হইয়াছি। তিনি প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দুই শাস্ত্রের সমন্বয় করিয়াছেন। প্রবন্ধে সুখ দুঃখ সম্বন্ধে যাহা বলিবার তৎসমস্তই বলিয়াছেন। আমি তাঁহাকে ধন্যবাদ দান করি।

ছেন। সুখ কি, দুঃখ কি, তাহা কেহই এপর্যন্ত স্থির করিতে পারেন নাই। সুখ ও দুঃখ সম্বন্ধে বুদ্ধ চারটী আর্য্য সত্য প্রকাশ করিয়াছেন। উহার পর বক্তা সংক্ষেপে বুদ্ধদেব ও মহর্ষি কপিলের মত প্রকাশ করিলেন। পরে উপসংহারে বলিলেন যে, দুঃখ সর্ব্বদা হেয় তাহা নহে, পরন্তু দুঃখের সত্ত্ব বড়ই প্রয়োজনীয়। দুঃখ না থাকিলে চিত্তের মালিন্য দূর হয় না। অপর পক্ষে সুখ অতি সমল পদার্থ ও হেয়—দুঃখ নির্ম্মল ও পবিত্র মানব-জীবনে ইহার বিলক্ষণ উপযোগিতা আছে ইত্যাদি।

১০। এই সময়ে সভাপতি মহাশয়, শ্রীযুক্ত বিনয়েন্দ্র নাথ সেন ও শ্রীযুক্ত সুরেশ চন্দ্র সমাজপতি মহাশয়ের সভাস্থলে অনিবার্য্য কারণ বশতঃ অনুপস্থিতির বিষয় জ্ঞাত করিলেন।

১১। শ্রীযুক্ত উমেশ চন্দ্র গুপ্ত বিদ্যারত্ন বলিলেন, প্রবন্ধ শ্রবণ করিয়া বড় আনন্দিত হইয়াছি। প্রবন্ধ কেবল প্রতীচ্য মনীষীগণের মত উদ্ধৃত হয় নাই, প্রাচ্য গ্রন্থকারগণও আদৃত হইয়াছেন। এই প্রবন্ধ যে, অতি গবেষণাপূর্ণ তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। সুখ দুঃখ সম্বন্ধে পণ্ডিত মহাশয়েরা যাহা বলিয়াছেন, তাহার বেশী আমার আর বলিবার ক্ষমতা নাই। এ জগতে সুখ পাইতে হইলেই দুঃখ পাইতে হইবে এ বিষয়ে বলিবার কিছুই নাই। ভাষা সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী মহাশয় যাহা বলিয়াছেন, তাহাই আমার মত।

১২। শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এম, এ, বি, এল মহাশয় বলিলেন, আমার পক্ষে বেশি বলিবার কিছুই নাই। যাহা জ্ঞাতব্য সবই বলা হইয়াছে। জগতের সুখের উন্নতি করিতে আমাদিগের সকলেরই চেষ্টা করা উচিত। আচার্য্য মহাশয় যে, সুখের নিন্দা করিয়াছেন, তাহা আমার সমীচীন বোধ হয় না। অতঃপর তিনি কবিবর নবীন চন্দ্র সেন মহাশয়ের গ্রন্থ হইতে কয়েকটী কবিতা পাঠ করিয়া নিজের মত স্থাপন করিলেন।

১৩। সর্ব্বশেষে সভাপতি শ্রীযুক্ত রায় চুণীলাল বসু বাহাদুর বলিলেন, আমার বলিবার কিছুই নাই। কেননা পূর্ব্ব বক্তাগণ এ বিষয়ে সমস্ত বক্তব্যই নিঃশেষ করিয়াছেন। তিনি সভাপতির আসন হইতে রাজা বাহাদুরকে ধন্যবাদ দিতেছেন। রাজা বাহাদুর সাহিত্য-সভার জন্মদাতা; আজ দার্শনিক গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ পাঠ করিয়া সাহিত্য-সভার মান বর্দ্ধন করিয়াছেন। এ জগতে কিছুই চিরস্থায়ী নহে; মানবজীবন সুখ-দুঃখ-বিজড়িত. সুতরাং এই প্রবন্ধের অবতারণা করিয়া, রাজা বাহাদুর বিশেষ উপকার করিয়াছেন। রাজা বাহাদুর এই বিষয়টী যেরূপ বিশদ, ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন—যেরূপ প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের যুক্তিপূর্ণ সমন্বয় করিয়াছেন তাহাতে কাহারও কিছু বলিবার নাই। এ প্রবন্ধের বিরোধী মত কেহ প্রকাশ করেন নাই। সুখ দুঃখের কোন একটী নির্দ্দিষ্ট মান নাই। যাহা একের দুঃখ অন্যের তাহা সুখ ইহা উদাহরণ দ্বারা দেখাইলেন। চৈতন্য মহাপ্রভুর সংসারত্যাগ ব্যক্তিগত দুঃখ, কিন্তু অন্য দিকে ইহা হইতে জনসাধারণের কত উপকার হইয়াছে। সভাপতি বাবু বলিয়াছেন যে দুঃখ আমাদের বন্ধু, তাহা স্বীকার করিতে পারি. কিন্তু সুখ একেবারে হেয় তাহা স্বীকার করিতে পারি না। প্রবন্ধের ভাষা সম্বন্ধে অধিক বক্তব্য নাই। ভাষা অতি সুললিত হইয়াছে।

শ্রীরাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী। শ্রীবিনয়কৃষ্ণ।
সম্পাদক। সভাপতি
১০ই আষাঢ়, ১৩১৮ সাল।

সাহিত্য-সংহিতা।

দ্বাদশ খণ্ড] ১৩১৮ সাল, আষাঢ়। [৩য় সংখ্যা।

বৌদ্ধ-দর্শন।*

বুদ্ধদেব ভগবানের অবতার বিশেষ। তিনি দশাবতারের অন্তর্গত নবমাবতার, ইহার প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধে তৃতীয় অধ্যায়ে উল্লিখিত আছে, প্রমাণ এই,—"ততঃ কলৌ সংপ্রবৃত্তে সংমোহায় সুরদ্বিষাং। বুদ্ধোনামাঞ্জনসুতঃ কীকটেষু ভবিষ্যতি॥" কলিযুগ সম্প্রবৃত্ত হইলে প্রবল পরাক্রান্ত অসুরগণের সম্মোহনের জন্য গয়া প্রদেশে ভগবান্ অঞ্জনের পুত্রস্বরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার পর্য্যায় নাম—সর্ব্বজ্ঞ, সুগত, ধর্ম্মরাজ, তথাগত, সমন্তভদ্র, ভগবান্, মারজিৎ, লোকজিৎ, জিনি, ষড়ভিজ্ঞ, দশবল, অদ্বয়বাদী, বিনায়ক, মুনীন্দ্র, শ্রীঘন, শাস্তা, এবং মুনি, এই কয়েকটী অমরসিংহোক্ত পর্য্যায় নাম। ধর্ম্ম, ত্রিকালজ্ঞ, ধাতু, বোধিসত্ত্ব, মহাবোধি ইত্যাদি অপর নামও কোষান্তরে উক্ত হইয়াছে। ঘোর তপোবলে প্রবল পরাক্রান্ত অসুরগণ দেবগণের অদম্য হইয়া তাঁহাদের অধিকার বিচ্যুতিতে প্রবৃত্ত হইবার সময়ে সৃষ্টিসংরক্ষণকর্ত্তা ভগবান্ অসুরগণের সম্মোহনার্থ বুদ্ধরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। প্রবল তপস্বী দুর্দ্দান্ত অসুরগণ দেবতাদিগের স্থান অধিকার করিলে অর্থাৎ ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব, সূর্য্যের সূর্য্যত্ব, বরুণের বরুণত্ব অধিকার করিলে, ইন্দ্র যথাসময়ে সুবৃষ্টি প্রদান করিবেন না, সূর্য্যও যথা সময়ে উপযুক্ত সন্তাপ দিবেন না, সুবৃষ্টি ও সূর্য্যসন্তাপের অভাবে উপযুক্ত শস্য উৎপন্ন হইবে না, উহার অভাবে সৃষ্টির বিপ্লব ঘটিবে, সুতরাং অসুরগণের সম্মোহন ব্যতিরেকে সৃষ্টি রক্ষার অন্য উপায় নাই। অসুরগণ সম্মুগ্ধ হইলে তাঁহাদের নাস্তিক্য ভাব আসিবে। নাস্তিক্যভাব আসিলে তাঁহাদের বেদে অবিশ্বাস হইবে, তন্মূলক তাঁহাদের বেদোক্ত কার্য্য কলাপের অনুষ্ঠানে নিবৃত্তি হইবে, ঐ নিবৃত্তিমূলক তাঁহাদের তপোবলের হ্রাস হইবে, তাহা হইলেই তাঁহারা অনায়াসে দেবগণের দম্য হইবেন, এইরূপ বিবেচনা করিয়া, স্বয়ং ভগবান্ বুদ্ধরূপে অবতীর্ণ হইয়া বেদের ও বেদোক্ত ক্রিয়া কলাপের ভূয়সী নিন্দা করিয়াছিলেন। ভগবান্ বুদ্ধদেব যে বেদের নিন্দা করিয়াছিলেন, ইহা সপ্রমাণ করিবার জন্য অধিক প্রয়াস করিতে হইবে না, জয়দেব-কৃত গীতগোবিন্দোক্ত "নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতং" ইত্যাদি বাক্য দ্বারাই উহা সপ্রমাণ হইবে।

শাক্যবংশাবতীর্ণ বুদ্ধ মুনিবিশেষ গৌতম বৌদ্ধশাস্ত্র-প্রণেতা ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের উপদেষ্টা। অশোকের রাজ্য-শাসনকালে ঐ বৌদ্ধধর্ম্মের বিপুল প্রচার ছিল; তৎকালে বৈদিকধর্ম্ম এক কালে অন্তর্হিত হইয়াছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাহার দীর্ঘকাল পরে শঙ্করাচার্য্যের সময় হইতে ক্রমশঃ বৌদ্ধধর্ম্ম হ্রাসমান হওয়ায় বৈদিক সনাতন ধর্ম্ম পুনরুজ্জীবিত হইয়া

* সাহিত্য-সভার ১২শ বার্ষিক ৩য় মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

ক্রমোন্নতি লাভে সামর্থ্যলাভ করিয়াছিল। বৌদ্ধ দার্শনিক মতে প্রমাণ দুই প্রকার, প্রত্যক্ষ ও অনুমান। চার্ব্বাক-মতাবলম্বিদিগের মতে কেবল প্রত্যক্ষই প্রমাণ, তাঁহারা অনুমানেরও প্রামাণ্য স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন অনুমান প্রমাণ অবিনাভাবসম্বন্ধ জ্ঞানমূলক, অবিনাভাবসম্বন্ধ অত্যন্ত দুর্ব্বোধ সুতরাং অনুমানের প্রামাণ্য সুদূরপরাহত। ইহাতে বৌদ্ধমতাবলম্বিগণ বলিল, চার্ব্বকেরা অবিনাভাব সম্বন্ধকে যে দুর্ব্বোধ বলেন, উহা অত্যন্ত অসাধু, কারণ কোনও স্থলে অন্বয় ব্যতিরেক দ্বারা, কোনও স্থলে বা তাদাত্ম্য দ্বারা অনায়াসে অবিনাভাবসম্বন্ধ নির্ণীত হইতে পারে। বহ্নি-ধূম-স্থলে অন্বয় ব্যতিরেক দ্বারা অর্থাৎ ধূমের সত্তাতে বহ্নির সত্তা, বহ্নির অসত্তাতে ধূমের অসত্তা, এইরূপ নিশ্চয়দ্বারা ধূমেতে বহ্নির অবিনাভাব সম্বন্ধ নির্ণয়ে কোনরূপ বাধা দেখিতে পাওয়া যায় না। এবং বৃক্ষ শিংশপা স্থলে অর্থাৎ এই বস্তু বৃক্ষ, যেহেতু ইহা শিংশপা, এই অনুমানে তাদাত্ম্য ভাবদ্বারাই অবিনাভাবসম্বন্ধ নির্ণীত হইয়া থাকে। শিংশপা যদি বৃক্ষত্বকে অতিক্রম করিয়া অবস্থান করিত, তাহা হইলে সে নিজের আত্মাকেও পরিত্যাগ করিত। যাঁহারা অনুমানের প্রামাণ্য স্বীকার করেন না, তাঁহারা "একাকিনী প্রতিজ্ঞাহি প্রতিজ্ঞাতং ন সাধয়েৎ"। কেবল অসহায় প্রতিজ্ঞাবাক্য, প্রতিজ্ঞাত বিষয়ের সাধন করিতে সমর্থ হয় না, এই ন্যায়বলে অনুমান প্রমাণ নহে, এই প্রতিজ্ঞা বাক্যমাত্র দ্বারা অনুমানের অপ্রমাণ্য সাধন করিতে সমর্থ হইতে পারেন না। সুতরাং ঐ অপ্রামাণ্য সাধনের জন্য অবশ্য কোনরূপ প্রমাণের উপন্যাস করিতে হইবে। অনুমান, প্রমাণ কি না ইহা প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা স্থিরীকৃত হইবার সম্ভাবনা নাই, শব্দেরও প্রামাণ্য চার্ব্বাক স্বীকার করেন না। শব্দ প্রমাণ হইলেও পরমতের ব্যতিরিক্ত পুরুষের "অনুমান প্রমাণ নহে" এই বাক্যে কোন্ ব্যক্তি বিশ্বাস করিবে? সুতরাং অনুমান দ্বারাই অনুমানের প্রমাণ্যাভাব সাধন করিতে হইবে, তাহা হইলেই অনুমান স্বীকার করা হইবে। অনুমান দ্বারা অনুমান প্রমাণ নহে, এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিলে, প্রযোক্তাকে "আমার মাতা বন্ধ্যা" এই রূপ বাক্যপ্রযোক্তৃ পুরুষের ন্যায় উপহাসাস্পদ হইতে হইবে। কোন্‌টী প্রমাণ, কোন্‌টী প্রমাণাভাস, ইহা স্থির করিতে হইলে, তাহাদের সজাতীয়ত্ব হেতু দ্বারাই স্থির করিতে হইবে, তাহা হইলে স্বভাবানুমান, ও শিষ্যের কোনও বিষয়ে অজ্ঞান আছে, ইহা গুরুকে স্থির করিতে হইলে, শিষ্যের বচনভঙ্গী দ্বারাই স্থির করিতে হইবে, তাহা হইলে কার্য্যলিঙ্গকানুমান এবং অনুপলব্ধিমূলক কোনও বস্তুর প্রতিষেধ করিতে হইলে তাহা অনুপলব্ধিরূপ হেতু দ্বারাই স্থির করিতে হইবে। তাহা হইলে অনুপলব্ধিহেতুক অনুমান স্বীকার করিতে হইবে, অনুমানের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার কোন উপায় নাই। ইহাই বৌদ্ধশাস্ত্রে কথিত হইয়াছে,—"প্রমাণান্তর সম্ভাবঃ প্রতিষেধাচ্চ কস্যচিৎ॥"

বৌদ্ধসম্প্রদায় মাধ্যমিক যোগাচার সৌত্রান্তিক-বৈভাষিক সংজ্ঞা দ্বারা প্রসিদ্ধ। তাঁহারা যথাক্রমে সর্ব্বশূন্যত্ব, বাহ্যশূন্যত্ব, বাহ্যার্থানুমেয়ত্ব, ও বাহ্যার্থপ্রত্যক্ষত্ব এই চতুষ্টয়বাদ অঙ্গীকার করেন। যদ্যপি ভগবান্ বুদ্ধদেব একাকী উপদেষ্টা গুরু, তথাপি উপদেষ্টব্য শিষ্যদিগের বুদ্ধিভেদে তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন মতে উপনীত হইয়াছেন। যেরূপ কোনও ব্যক্তি সূর্য্য অস্তগমন করিয়াছে এই কথা বলিলে, স্বীয় অভিলষিত বিষয়ানুসারে জার-চৌর-অনুচান ইহারা ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে উপনীত হইয়া থাকে। জার সঙ্কেতস্থান গমনের সময় উপস্থিত হইয়াছে, মনে করিয়া অভিলষিত স্থানে গমন করে, চৌর পর দ্রব্যা-

পহরণ-সময় উপস্থিত হইয়াছে মনে করিয়া সেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, অনুচান অর্থাৎ বৈদিক কার্য্যানুষ্ঠানতৎপর ব্যক্তি সন্ধ্যোপাসনার সময় উপস্থিত হইয়াছে মনে করিয়া তাহাতে প্রবৃত্ত হয়। বৌদ্ধগণের যদিও বৈদিকযজ্ঞাদির অনুষ্ঠানে বিদ্বেষ আছে, তথাপি তাঁহারা পরমপুরুষার্থ মুক্তি স্বীকার করিয়া থাকেন। তাঁহারা ভাবনাচতুষ্টয়দ্বারা পরমপুরুষার্থকে ভাবনা করেন। তাঁহাদের ভাবনাচতুষ্টয় এইরূপ —"সর্ব্বং ক্ষণিকং ক্ষণিকং, দুঃখং দুঃখং, স্বলক্ষণং স্বলক্ষণং, শূন্যং শূন্যং।" সংসারদুঃখানলসন্তপ্ত যে সকল জীব স্বভাবতঃ দ্বেষ্য আমি দুঃখী এইরূপ সার্ব্বজনীন অনুভবসিদ্ধ দুঃখহানেচ্ছু হইয়া দুঃখহানের উপায়ভূত তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্য বুদ্ধদেবের শরণাগত হওয়ায় তাঁহাদিগকে বুদ্ধদেব ঐ রূপ ভাবনাচতুষ্টয়ের উপদেশ দিয়াছিলেন। ঐ ভাবনাচতুষ্টয় দ্বারা জীবের সংসার-বৈরাগ্য হইবে, সংসার-বৈরাগ্য হইলে সংসার-বাসনা বিদূরিত হইবে, তাহা হইলেই মোক্ষার্থিজীবগণ মোক্ষপথে অগ্রসর হইতে পারিবে। আন্বীক্ষিকী-বিদ্যা-প্রণেতা গৌতমের উপদেশও এই জাতীয়। তিনি বলেন যে, মোক্ষার্থিজীব তত্ত্বজ্ঞানে যত্নবান্ হইবে, তত্ত্বজ্ঞান হইলে তদ্দ্বারা মিথ্যাজ্ঞান বিদূরিত হইবে, মিথ্যাজ্ঞান বিদূরিত হইলে তন্মূলক সংসার-বাসনা নষ্ট হইবে, বাসনার উচ্ছেদ হইলে বাসনামূলক প্রবৃত্তির অপায় হইবে, প্রবৃত্ত্যপায়ে প্রবৃত্তিমূলক জন্মাপায়, জন্মাপায় হইলে জন্মমূলক দুঃখের আত্যন্তিক অপায় হইবে, সেই আত্যন্তিক দুঃখাপায়ই মোক্ষ-পদে অভিহিত। আন্বীক্ষিকী-প্রণেতৃ গৌতমের মত এই—"দুঃখ-জন্ম-প্রবৃত্তি-দোষ-মিথ্যাজ্ঞানানামুত্তরোত্তরাপায়ে তদনন্তরাপায়াদপবর্গঃ"। তত্ত্বতো বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, সকল দর্শনকারাই এক মূলমন্ত্রে দীক্ষিত। কেবল পরস্পরের রীতিভেদ মাত্র। ঐ রীতিভেদ আমার ষড়্‌দর্শনসমন্বয়-বিষয়ক প্রবন্ধে বিশদ রূপে বর্ণিত হইয়াছে। তার্কিকাগ্রণী রঘুনাথ শিরোমণি ভট্টাচার্য্য বৌদ্ধাধিকার বিবৃতিতে বুদ্ধদেবোক্ত ভাবনা চতুষ্টয়ের বিশদরূপে অনুবাদ করিয়াছেন। তাঁহার সন্দর্ভ এই—"নৈরাত্ম্যদৃষ্টিং মোক্ষস্য হেতুং কেবল মন্যতে। আত্মতত্ত্বধিয়ংত্বন্যেন্যায়বেদানুসারিণঃ॥ ইতি। সর্ব্বএব ভোগভাজং স্থিরতরমাত্মানং মন্বানাঃ সুখাদিকং কাময়ন্তে। যদাহুঃ, সুখী ভবেয়ং দুঃখী বা মা ভুবমিতি তৃষ্যতঃ। যৈবাহমিতিধীঃ সৈব সহজং সত্ত্বদর্শনমিতি॥ সত্ত্বং আত্মা, কাময়মানাশ্চ সুখাদিকং বিহিতং নিষিদ্ধং বা সাধনমনুতিষ্ঠন্তঃ কর্ম্মাশয়ানা বিভ্রানাঃ জন্মাদিকমনুভবন্তি। যদি পুনরমী কিমপিনাহং নাহমাস্পদমস্তি কিঞ্চিদপি বস্তু স্থিরং বিশ্বমেব ক্ষণভঙ্গুরমলীকং চেত্যবধারয়েরন্ ন কিঞ্চিদপি কাময়েরলং ন বা কাময়মানাঃ কিঞ্চিদপি প্রবর্ত্তন্তে নবা প্রবর্ত্তমানাঃ অপি কর্ম্মাশয়েন সীব্যন্তে নবান্তরেণ কর্ম্মাশয়ং সম্ভবোভোগস্যেতি ভবতি নৈরাত্ম্যদর্শনং সাধনমপবর্গস্য"। বৌদ্ধগণ নৈরাত্ম্যজ্ঞান অর্থাৎ আত্মা নাই এই জ্ঞানকেই মোক্ষের উপায় বলিয়া স্বীকার করেন, অন্য ন্যায়বেদানুসারিগণ আত্মার দেহভিন্নত্ব জ্ঞানকেই মোক্ষের উপায় বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন। বৌদ্ধদিগের আশয় এই যে, আত্মা অনুষ্ঠিত শুভাশুভ কর্ম্মের ভোগ করিয়া থাকেন, সেই আত্মা স্থিরতর অর্থাৎ একজন্মে অনুষ্ঠিত কর্ম্মের ভোগ না হইলেও জন্মান্তরে সেই কর্ম্মের ভোগ আত্মা করিবেন, ইহা সকলই মনে করিয়া সুখ-কামনায় শাস্ত্রবিহিত যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করে, এবং ইহজন্মে সুখ ভোগলিপ্সায় শাস্ত্রনিষিদ্ধ পরদারগমনাদিরূপ অশুভ কর্ম্মেরও অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়। পরন্তু আবার সেই সকল জীব যদি আত্মা

নাই, থাকিলেও আত্মা স্থির নহে, ক্ষণিক, সমস্ত জগতই ক্ষণভঙ্গুর বা অলীক এইরূপে অবধারণ করিতে সমর্থ হয় অর্থাৎ পুর্ব্বোক্ত ভাবনা চতুষ্টয়ে উপনীত হইতে পারে, তাহা হইলে তাহারা নিষ্কাম ভাব ধারণ করিতে সমর্থ হয়। নিষ্কাম ব্যক্তির কোনরূপ কর্ম্মে প্রবৃত্তি হয় না, অপ্রবর্ত্তমান ব্যক্তিরা কর্ম্মাশয়ে লিপ্ত হয় না, কর্ম্মাশয় ব্যতিরেকেও ভোগের সম্ভাবনা নাই, সুতরাং নৈরাত্ম্যদর্শনই অপবর্গের প্রধানতম সাধন। পুর্ব্বোক্ত ভাবনা চতুষ্টয়ের প্রথম ভাবনা "সর্ব্বং ক্ষণিকং ক্ষণিকং"। সকল বস্তুই ক্ষণিক, অর্থাৎ অচিরকালস্থায়ী। এই ভাবনার রঘুনাথ শিরোমণিকৃত অনুবাদ, "বিশ্বমপি ক্ষণভঙ্গুরং"। সমস্ত জগতই ক্ষণভঙ্গুর, এইরূপ ভাবনা করিতে পারিলে জীবের অন্তঃকরণে বৈরাগ্যভাবের আবির্ভাব হইয়া থাকে। ইহার কারণ এই যে, যদি সকল বস্তুই ক্ষণিক হয়, তাহা হইলে আত্মাও ক্ষণিক, আত্মা ক্ষণিক হইলে যে আমি এক্ষণে বহ্বায়াসাধ্য কর্ম্ম করিতেছি, সেই আমি এই কর্ম্মের ফলভোগ-কালে বিদ্যমান থাকিব না, তৎকালে আমার স্থলাভিষিক্ত অপরে এই কর্ম্মের ফল ভোগ করিবে, তাহাতে আমার কিছুই হইবে না। একের ভোগের জন্য অন্যের বহুবিত্ত বহ্বায়াসসাধ্য কর্ম্মে প্রবৃত্তি হওয়া অসম্ভব সুতরাং এই ভাবনা বৈরাগ্য লাভের অন্যতম উপায়। দ্বিতীয় ভাবনা "সর্ব্বং দুঃখং দুঃখং"। এই ভাবনার শিরোমণিকৃত অনুবাদ "কিমপি নাহং।" অহং পদের অর্থাৎ আমি এই পদের প্রতিপাদ্য বস্তু কিছুই নাই, অর্থাৎ যদি আত্মা না থাকে, তাহা হইলে ভোক্তাও নাই। ভোক্তা না থাকিলে সমস্ত ভোগ্য বস্তুর সত্তা কেবল দুঃখের কারণ, যেরূপ কোন মহাত্মার ভোগ-সামর্থ্য নাই কিন্তু অতুল ঐশ্বর্য্য আছে, সেই মহাত্মার অতুল ঐশ্বর্য্য দুঃখের কারণ ভিন্ন আর কিছুই নহে। এইরূপ ভাবনাতে উপনীত জীবের অন্তঃকরণে ভোগ্য বস্তুর উপরে অনুরাগের কথা দূরে থাকুক বরং দিন দিন বিরাগ বৃদ্ধি হইবারই অধিকতর সম্ভাবনা, সুতরাং দ্বিতীয় ভাবনাও জীবের বৈরাগ্য সঞ্চয়ের অন্যতম উপায়। তৃতীয় ভাবনা—"সর্ব্বং স্বলক্ষণং স্বলক্ষণং"। সকল বস্তুই আত্মস্বরূপ, আত্ম ব্যতিরিক্ত বস্তু নাই। এই ভাবনার শিরোমণি-কৃত অনুবাদ "নাহমাস্পদমস্তি কিঞ্চিদপি বস্তু স্থিরং।" অহং পদের প্রতিপাদ্য কোন স্থির বস্তু নাই, অর্থাৎ যদি আত্মা থাকে তাহা হইলে এই পরিদৃশ্যমান নশ্বর জগৎ আত্মস্বরূপ। এই রূপ ভাবনাসম্পন্ন জীবের নিবৃত্তি-মার্গেই অন্তঃকরণের গতি হইয়া থাকে, যেহেতু আত্মার স্থৈর্য্য জ্ঞানই প্রবৃত্তির প্রতিকারণ। স্থৈর্য্যজ্ঞানরূপ কারণাভাবে যে প্রবৃত্তিরূপ কার্য্যের অভাব অবশ্যম্ভাবী সে বিষয়ে আর সংশয় কি, সুতরাং তৃতীয় ভাবনাও অপবর্গের অন্যতম উপায়। চতুর্থ ভাবনা "সর্ব্বং শূন্যং শূন্যং।" এই ভাবনার শিরোমণিকৃত অনুবাদ,—"বিশ্বমপি অলীকং।" সমস্ত জগৎ শূন্য অর্থাৎ অলীক, এই ভাবনা দ্বারাও জীবের সাংসারিক সুখবাসনা বিদূরিত হইয়া থাকে, সকল জীবই সাংসারিক সুখ ও তৎসাধনকে সত্য মনে করিয়াই তল্লিপ্সায় দুষ্কর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। পরন্তু সেই সকল জীব যদি সমস্ত জগৎই মরুমরীচিকার ন্যায় অলীক এইরূপ অবধারণ করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে কোন বিষয়েই তাহাদের আর কামনা থাকে না, সুতরাং কামনার অভাবে তাহারা অপবর্গ পথের পথিক হইয়া সংসারদুঃখানল-সন্তাপের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে সমর্থ হইতে পারে। এই জন্যই তার্কিকাগ্রণী রঘুনাথ শিরোমণি ভট্টাচার্য্য বৌদ্ধাধিকারবিবৃতিতে

লিখিয়াছেন—"যদি পুনরমী ইত্যবধারয়েয়ন্ ন কিঞ্চিদপি কাময়েরন্।" বৌদ্ধ-মতে বস্তুমাত্রেই ক্ষণিক। তাঁহারা বলেন, যে বস্তু সৎ, সেই বস্তুই ক্ষণিক, যেরূপ জলধরপটল, অর্থাৎ যে সময়ে আকাশ-পথে মেঘরাশি সঞ্চিত হইয়া ভূভাগে বর্ষণ হয়, সেই সময়ে ভূভাগস্থ লোক মনে করে যে, একটী স্থায়ী মেঘ হইতেই ভূভাগে বর্ষণ হইতেছে, পরন্তু সেই সময়ে তত্ত্বতো বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইহাই স্থির হইবে যে, আকাশে প্রতিক্ষণে বিভিন্ন বিভিন্ন মেঘ রাশি সঞ্চিত হইয়াই ভূভাগে বর্ষণ হইতেছে। ঐ স্থলে তাত্ত্বিক বিবেকের অভাবে ক্ষণিক মেঘে যেরূপ লোকের স্থায়িত্বাবধারণ হয় সেই-রূপ জগতে যে সকল বস্তু আছে,তাহারা ক্ষণিক হইলেও লোকের তাত্ত্বিক বিবেকের অভাবে তাহাতে স্থায়িত্বের নির্ণয় হইয়া থাকে। পরন্তু ঐ নির্ণয় ভ্রান্তিবিজৃম্ভিত, তত্ত্বতঃ সকল পদার্থই ক্ষণিক, কোন পদার্থেরই স্থায়িত্ব নাই। ক্ষণি-কত্ব পক্ষে অপর যুক্তি এই, বস্তুর ইহাই স্বভাব কোথাও ক্রমে অর্থ ক্রিয়া নির্ব্বাহ করে। কোথাও বা যুগপৎ অর্থ ক্রিয়া নির্ব্বাহ করে, পরন্তু বস্তুর স্থায়িত্ব পক্ষে এই উভয়ই অসম্ভব, ইহার কারণ এই যে, বস্তু স্থায়ী হইলে সেই বস্তু পূর্ব্বেও অর্থ ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিয়াছে এবং উত্তরকালেও অর্থ ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিবে, সুতরাং স্থায়ী বস্তুতে ভাবি-ভূত অর্থ ক্রিয়া নির্ব্বাহ সামর্থ্য আছে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। একবার সামর্থ্য থাকিলে সেই সামর্থ্যের অন্যথা কেহই করিতে পারে না। যেরূপ সামগ্রী সমবধান অর্থাৎ কারণ কলা-পের সম্মিলন হইলে সেই সামগ্রী অর্থাৎ সেই কারণকলাপ অবশ্যই স্বকার্য্য সম্পাদন করিবে, কিছুতেই ইহার অন্যথা হইবে না। যদি সামর্থ্য স্বীকার করা না হয়, তাহা হইলে স্থায়ীভাব কোনও কালেও কার্য্য নির্ব্বাহযোগ্য হইতে পারে না, যেহেতু সামার্থ্য নিবন্ধনই ক্রিয়াকলাপ নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। যে বস্তু যে কালে যাহা না করে, সেই বস্তু সেই কালে তাহাতে অসমর্থ হয়, যেরূপ শিলাখণ্ড অঙ্কুরোৎপাদনে অসমর্থ, ঐ শিলাখণ্ড হইতে কোনও কালেই অঙ্কুরোৎপাদনের সম্ভাবনা নাই। কোন স্থায়ী বস্তু বর্ত্তমান কোনরূপ কার্য্য নির্ব্বাহ কালে যখন ভাবি-ভূত কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হয় না, তখন কোনও কালেই উহাদ্বারা কোনও রূপ কার্য্য নির্ব্বাহ হইবে না। এই স্থলে যদি এইরূপ সিদ্ধান্ত করা যায় যে, স্থায়ী বস্তুতে কার্য্যনির্ব্বাহ-সামর্থ্য সর্ব্বদাই আছে, পরন্তু সহকারী কারণের সাহায্যে ঐ স্থায়ী বস্তু ফলপোধায়ক হইয়া থাকে, যেরূপ বীজরূপ কারণ সলিল সেকাদি সহকারি কারণের সাহায্যেই অঙ্কুরোৎপাদনে সমর্থ হইয়া থাকে, ইহাতে বক্তব্য এই যে, সহকারি কারণ স্থায়ী বস্তুর কোনরূপ উপ-কার করে কি না, যদি কোন রূপ উপকার না করে তাহা হইলে সহকারির কোন অপেক্ষাই থাকে না, যদ্দ্বারা কোনরূপ উপ-কারের সম্ভাবনা নাই, সেই বস্তুর অপেক্ষা নিষ্প্রয়োজন। উপকারকত্ব পক্ষে সেই উপকার ঐ স্থায়ী বস্তু হইতে ভিন্ন কি অভিন্ন, ভেদ পক্ষে আগন্তুক সেই উপকারকে কার্য্য নির্ব্বা-হের কারণ বলিলেই যথেষ্ট হয়। সেই স্থায়ী বস্তুকে কার্য্য নির্ব্বাহের কারণ বলিবার কোন অপেক্ষা দেখা যায় না। যেহেতু ঐ উপকারের সত্বাসত্ব দ্বারাই কার্য্যের সত্বাসত্ব স্থিরীকৃত হইয়া থাকে। যদি সেই স্থায়ী বস্তু সেই সকল সহকারির সহিত মিলিত হইয়া কার্য্যনির্ব্বাহ করে ইহাই স্থায়িবস্তুর স্বভাব, তাহাতে জিজ্ঞাস্য এই যে, তাহা হইলে সেই স্থায়িবস্তু কখনই সহকারিকে পরিত্যাগ না করুক, পরন্তু সহকারি পলায়মান হইলেও তাহাকে পাশদ্বারা বদ্ধ করিয়া স্থায়িবস্তু সর্ব্বদা কার্য্য সম্পাদন না

করিবার কারণ কি, যেহেতু স্বভাব চিরকালই সমভাবে বিদ্যমান আছে। আরও বক্তব্য এই যে, অঙ্কুরোৎপাদক বীজে সহকারি সলিলাদি সম্পর্ক নিবন্ধন শক্তিবিশেষ উৎপন্ন হয় ইহাই বলিতে হইবে, পরন্তু ঐ শক্তিবিশেষের উৎপাদনের জন্য অপর শক্তিবিশেষের কল্পনা করিতে হইবে, এইরূপ কল্পনা না করিলে বীজে শক্তিবিশেষের সর্ব্বদা উৎপাদনকে কে নিবারণ করিবে? আবার ঐ শক্তিবিশেষের উৎপাদনের জন্য শক্ত্যন্তরের কল্পনা করিতে হইবে সুতরাং এইরূপে অনবস্থাদোষও অনিবার্য্য হইবে। আরও জিজ্ঞাসা এই যে সলিলাদি সংসর্গনিবন্ধন শক্তিবিশেষ অঙ্কুরোৎপাদনার্থ অপেক্ষ্যমাণ হইয়া কি বীজাদি নিরপেক্ষভাবে অঙ্কুর-কার্য্য সম্পাদন করে, কি বীজাদি সাপেক্ষ হইয়া কার্য্য সম্পাদন করে। প্রথম পক্ষে বীজাদির অহেতুত্ব প্রসক্তি হইবে। দ্বিতীয় পক্ষে অপেক্ষ্যমান বীজাদির দ্বারা শক্তিবিশেষে অপর শক্তিবিশেষের কল্পনা করিতে হইবে, তাহা না করিলে শক্তি বিশেষের কার্য্য সম্পাদন যোগ্যত্বে বীজাদির অপেক্ষাও অনপেক্ষা তুল্য হইবে, যদি ঐরূপ কল্পনা করা হয় তাহা হইলে দ্বিতীয় শক্তি বিশেষের কার্য্যকারিতা নির্ব্বাহার্থ অপর শক্তি বিশেষ স্বীকার করিতে হইবে, তাহা হইলেও অনবস্থা দোষ অনিবার্য্য হইবে। যদি স্থায়ি ভাব হইতে অভিন্ন শক্তি বিশেষ সহকারিগণ দ্বারা উত্তেজিত হয় ইহা স্বীকার করা হয় তাহা হইলে শক্তি বিশেষনাত্মক প্রাচীন ভাবের নিবৃত্তি হইল, শক্তি বিশেষাত্মক নূতন ভাবের আবির্ভাব হইল ইহাই প্রকারান্তরে স্বীকার করা হইল, তাহা হইলেই আমাদের মনোরথ মহীরুহ ফলবান্ হইল, অর্থাৎ ক্ষণিকত্ববাদ সিদ্ধ হইল। যেহেতু স্থায়িভাব হইতে আবির্ভূত শক্তিবিশেষাত্মক নূতন ভাবকে অবশ্য ক্ষণিক বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে, ঐ নূতন ভাবের স্থায়িত্ব স্বীকার করিলে পূর্ব্বোক্ত দোষরাশি অযাচিতভাবে সম্মুখে দণ্ডায়মান হইবে। সুতরাং স্থায়ি ভাবের কার্য্য সম্পাদন যোগ্যত্ব দুর্ঘট হইবে। স্থায়ি ভাব অক্রমে অর্থাৎ যুগপৎ সকল কার্য্য করণ সমর্থ ইহাও বলা যায় না; তাহাতে জিজ্ঞাস্য এই যে, যুগপৎ সকল কার্য্য করণ সমর্থ সেই স্থায়িভাব উত্তরকালে অনুবর্ত্তনশীল কি না। প্রথম পক্ষে অর্থাৎ উত্তরকালে অনুবর্ত্তনশীল হইলে তৎকালের ন্যায় উত্তর কালেও তাবৎ কার্য্য সম্পাদন না করে কেন? যে যে কার্য্যে সমর্থ সে সেই কার্য্য নির্ব্বাহ অবশ্যই করিয়া থাকে, যেরূপ সামগ্রী অর্থাৎ কারণকলাপ নিয়তই স্বকার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে। দ্বিতীয় পক্ষে অর্থাৎ স্থায়িভাব যদি উত্তরকালে অনুবর্ত্তন না করে, তাহা হইলে বস্তুর স্থায়িত্ব প্রত্যাশা মূষিক-ভক্ষিত বীজ হইতে অঙ্কুর প্রত্যাশার ন্যায় বিফল হইবে সুতরাং ক্ষণিকত্ব পক্ষেই সকল সমঞ্জস হইয়া থাকে। এই জন্য বৌদ্ধমতাবলম্বিগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, "যৎ সৎ তৎ ক্ষণিকং যথা জলধরঃ সন্তশ্চ ভাবা অমী।" যেরূপ বৃ সম্পাদনকারি জলধরপটল ক্ষণিক সেইরূপ কার্য্য-সম্পাদন-সামর্থ্যশীল বস্তু মাত্রই ক্ষণিক। বুদ্ধদেবের উপদিষ্ট বিষয়ে উত্তম প্রজ্ঞাসম্পন্ন মাধ্যমিকগণ ক্ষণভঙ্গাদ্যভিধান-মুখে সর্ব্বশূন্যতাবাদের ব্যবস্থাপন করিয়াছেন যে, বস্তু সৎ, বা অসৎ, বা সদসদুভয়াত্মক, অথবা সদসদুভয়ানাত্মক, কিছুই বলা যায় না; যেহেতু, ঘটাদি বস্তুকে সৎ বলিলে কারণ ব্যাপারের বৈফল্য ঘটে অর্থাৎ ঘটাদি বস্তু যদি সৎই হয়, তাহা হইলে তাহার উৎপাদনের জন্য কারণানুসন্ধানের কোন প্রয়োজনই দৃষ্ট হয় না। বস্তু অসৎ হইলে তাহার দ্বারা কোন কার্য্যের নির্ব্বাহ হইতে পারে না। সদসদুভয়াত্মকও বলা যায় না,

যেহেতু সত্ত্ব ও অসত্ত্ব এই দুইটী বিরুদ্ধ-ধর্ম্ম, যেরূপ গোত্ব অশ্বত্ব এই দুইটী বিরুদ্ধ-ধর্ম্মের একত্র সমাবেশ হয় না, সেইরূপ সত্ত্ব ও অসত্ত্ব এই দুইটী বিরুদ্ধ-ধর্ম্মেরও একত্র সমাবেশ হইতে পারে না। বস্তু সদসদুভয়ানাত্মক অর্থাৎ সদাত্মকও নহে অসদাত্মকও নহে ইহাও বলা যায় না, কারণ, দেখা যাইতেছে যে, এই জগতে কতিপয় বস্তু সৎ বলিয়া ব্যবহৃত হইতেছে—যেরূপ ঘটপটাদি। কতিপয় বস্তু অসৎ বলিয়া ব্যবহৃত হইতেছে, যেরূপ আকাশ-কুসুমাদি। সদসতের বাহিরে কোন বস্তুকেই ব্যবহৃত হইতে দেখা যায় না সুতরাং সত্ত্ব অসত্ত্ব সদসদুভয়াত্মকত্ব সদসদনুভয়ানাত্মকত্ব এই চতুষ্কোটি বিনির্ম্মুক্ত জগৎ শূন্যতাতেই পর্য্যবসন্ন হইল। ইহাই মাধ্যমিকদিগের সিদ্ধান্ত যথা, "ন সতঃ কারণাপেক্ষা ব্যোমাদেরিব যুজ্যতে। কার্য্যস্যাসম্ভবো হেতুঃ খপুষ্পাদেরিবাসতঃ"॥ আকাশাদির ন্যায় সতের কারণাপেক্ষা নাই, আকাশ কুসুমাদির ন্যায় অসতের কার্য্য নির্ব্বাহকত্বেরও সম্ভাবনা নাই। পূর্ব্বোক্ত ভাবনাচতুষ্টয় দ্বারা নিখিল বাসনার নিবৃত্তি হইলে, মাধ্যমিকদিগের শূন্যতারূপ নির্ব্বাণ সিদ্ধ হইবে, তাহা হইলেই মাধ্যমিকগণ কৃতার্থ হইবেন, তাঁহাদিগের অপর উপদেশ্য আর কিছুই নাই।

বুদ্ধদেবের শিষ্যগণের যোগ ও আচার এই উভয়ই অবশ্য কর্ত্তব্য, তন্মধ্যে অপ্রাপ্ত বস্তু প্রাপ্তির নিমিত্ত যে পর্য্যনুযোগ অর্থাৎ পরপক্ষ দূষণার্থ প্রশ্ন উহার নাম যোগ, এবং গুরুপদিষ্ট অর্থের যে অঙ্গীকার উহার নাম আচার। মাধ্যমিকগণ গুরুপদিষ্ট অর্থের অঙ্গীকার করেন, এই জন্য তাঁহারা উত্তমত্বলাভ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা পর্য্যনুযোগ অর্থাৎ পরপক্ষ দূষণার্থ প্রশ্ন করেন নাই, এই জন্য অধমত্ব লাভ করিয়াছেন, এই জন্য তাঁহাদের মাধ্যমিক এই নামে প্রসিদ্ধি হইয়াছে, অর্থাৎ তাঁহারা অত্যুত্তমও নহেন, অত্যন্তাধমও নহেন সুতরাং মধ্যম, মাধ্যমিক সংজ্ঞার ইহাই তাৎপর্য্য। বুদ্ধশিষ্যগণের মধ্যে যাঁহারা যোগাচার নামে প্রসিদ্ধ, তাঁহারা গুরুপদিষ্ট ভাবনাচতুষ্টয়েরও অঙ্গীকার করিয়া থাকেন এবং বাহ্যবস্তু-শূন্যতার অঙ্গীকার করিয়া বাহ্য ও আভ্যন্তরিক এই সর্ব্বশূন্যতাবাদি মাধ্যমিক-গণের উপরে পর্য্যনুযোগও করিয়া থাকেন। পর্য্যনুযোগ এইরূপ,— মাধ্যমিকগণ যে বাহ্যার্থ শূন্যতাঙ্গীকার করেন, ইহা যুক্তিযুক্ত কিন্তু আভ্যন্তরিক বস্তুর শূন্যতা কিরূপে অঙ্গীকার করেন, অতএব যোগ ও আচার এই উভয়ের অনুষ্ঠান করেন বলিয়া ঐ বুদ্ধশিষ্যগণ যোগাচার নামে নামিত হইয়াছেন। যোগাচার নামে নামিত যে সকল বুদ্ধশিষ্য, তাঁহাদের রীতি এইরূপ,—তাঁহারা বলেন যে, জগতে যে কিছু বস্তু দেখা যায় সকলই বিজ্ঞান স্বরূপ, বিজ্ঞান ব্যতিরিক্ত বস্তু নাই, অর্থাৎ বিজ্ঞানের বাহিরে কোনও বস্তুরই সত্তা নাই, বিজ্ঞান না থাকিলে জগৎ অন্ধ হইয়া পড়ে, এই বিষয় তাঁহারা একজন প্রামাণিক পুরুষ ধর্ম্মকীর্ত্তির বাক্যদ্বারা সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ধর্ম্মকীর্ত্তির বাক্য এই, "অপ্রত্যক্ষোপলম্ভস্য নার্থদৃষ্টিঃ প্রসিদ্ধ্যতি"। প্রত্যক্ষোপলব্ধিশূন্য পুরুষের অর্থদৃষ্টির প্রসিদ্ধি সম্ভাবনা নাই। যোগাচার বাহ্যবস্তুর সম্বন্ধে একটী বিকল্পের উত্থাপন করিবে, বিকল্প এই,—জ্ঞানগ্রাহ্য বাহ্যবস্তু ভাব হইতে উৎপন্ন বা অনুৎপন্ন। উৎপন্ন বলা যায় না, যেহেতু, উৎপন্ন বস্তুই ক্ষণিক ইহা পূর্ব্বেই সিদ্ধ হইয়াছে, সুতরাং বস্তু উৎপন্ন হইলে তাহার স্থিতির সম্ভাবনা নাই। অনুৎপন্নও বলা যায় না, যে হেতু অনুৎপন্নের

সত্তা থাকিতে পারে না। যদি বলা হয় যে অতীত বস্তুই জ্ঞানগ্রাহ্য, তাহাতে আমরা বলিব যে, উহা বালভাষিতের ন্যায় নিতান্ত অসঙ্গত, কারণ বর্ত্তমান স্বরূপে সার্ব্বজনীন প্রতীতিকে ভ্রান্তি বলিয়া অঙ্গীকার করিতে হয়, এবং অগ্রাহ্য বস্তুর জ্ঞানগ্রাহ্যতা স্বীকার করিলে অগ্রাহ্য ইন্দ্রায়াদির ও জ্ঞান-গ্রাহ্যতা স্বীকার করিতে হয়। অপর জিজ্ঞাস্য এই যে, গ্রাহ্যবস্তু কি পরমাণুস্বরূপ, বা অবয়বস্বরূপ? অবয়বস্বরূপ বলা যায় না, তাহাতে কৃৎস্নৈকদেশ বিকল্পের সম্ভাবনা আছে। কৃতস্নৈকদেশ বিকল্প এইরূপ,—প্রত্যেক অবয়বে অবয়বী সাকল্যে অবস্থান করে কি এক দেশে অবস্থান করে? প্রথম পক্ষ অসমীচীন, যেহেতু অবয়বাপেক্ষা অবয়বীর বিষম পরিমাণত্ব, অর্থাৎ অবয়ব পরিমাণাপেক্ষা অবয়বীর পরিমাণের আধিক্য সার্ব্বজনীন অনুভবসিদ্ধ। চরমপক্ষে অর্থাৎ অবয়বী নিজের একদেশে অবয়বে অবস্থান করে এই পক্ষেও বিকল্পের সম্ভাবনা আছে, বিকল্পটী এই, অবয়বী কি সেই অবয়বদ্বারা সেই অবয়বে অবস্থান করে, কি অন্য অবয়বদ্বারা অন্য অন্য অবয়বে অবস্থান করে? ইহারও প্রথমপক্ষ অসঙ্গত, যেহেতু স্বয়ং নিজের আধার হইতে পারে না। চরম পক্ষও বলা যায় না, কারণ অবয়বান্তরের সত্তা অবয়বান্তরে অসম্ভব। অবয়বীর আধারাধেয় ভাব স্বীকার করিলে পূর্ব্বোক্ত বিকল্প দোষের সম্ভাবনা দেখিয়া যদি অবয়বীকে অবৃত্তি বলা হয় তাহাও বাতুলের উক্তি, কারণ অবয়বী হইলে অবৃত্তি ও অবৃত্তি আকাশাদির ন্যায় অবয়বীকেও নিত্য বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, পরন্তু অবয়বীর নিত্যত্ব সার্ব্বজনীন অনুভব-বিরুদ্ধ। অবয়ব ও অবয়বীর তাদাত্ম্য সম্বন্ধ অর্থাৎ অভেদই সম্বন্ধ ইহাও বলিবার উপায় নাই, তাহা হইলে অবয়ব ও অবয়বীর পৃথক্ ভাব থাকিতে পারে না, পৃথক ভাব না থাকিলে তন্তু, পট, স্তম্ভ, গৃহ এইরূপ ব্যবহারের প্রামাণ্য স্বীকার না করিয়া থাকা যায় না। গ্রাহ্য বস্তু পরমাণুস্বরূপ ইহা বলিবারও উপায় নাই, তাহা হইলে পরমাণুর অতীন্দ্রিয়ত্বনিবন্ধন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য-স্বরূপে অনুভূয়মান বস্তু মাত্রকেই অতীন্দ্রিয় বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। এবং পরমাণুষট্কের যুগপদ্ যোগদ্বারা এক রেণুর উৎপত্তি সম্ভবপর হয় না, ইহাই বৌদ্ধশাস্ত্রে কথিত হইয়াছে যথা—"ষট্কেন যুগপদ্ যোগাৎ পরমাণোঃ ষড়ংশতা। তেষামপ্যেকদেশত্বে পিণ্ডঃ স্যাদণুমাত্রকঃ"। পরমাণুষট্কের যুগপদ্ যোগদ্বারা ত্রসরেণুর উৎপত্তি স্বীকার করিলে পরমাণুকে অংশষট্কসম্পন্ন বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, অর্থাৎ প্রত্যেক পরমাণুর এক এক অংশের সহিত পরমাণ্বন্তরের অংশবিশেষের যোগ হইয়া ত্রসরেণুর উৎপত্তি হয় ইহাই বলিতে হয়, তাহা হইলেই ত্রসরেণুর স্থূলত্বের সম্ভাবনা, যে স্থূলত্বদ্বারা গবাক্ষজালাবচ্ছিন্নরবিকিরণ মধ্যে ত্রসরেণু অস্মদাদির দৃষ্টিপথের গোচর হইয়া থাকে। পরমাণুর অংশ বিশেষে পরমাণ্বন্তরের যোগ স্বীকার না করিয়া এক পরমাণুতে দ্বিতীয় পরমাণুর যে ভাবে যোগ হয় তৃতীয় পর-মাণুর যোগও সেই ভাবে স্বীকার করিলে ত্রসরেণুর স্থূলত্বের সম্ভাবনা থাকে না, ত্রসরেণুকেও অণু পরিমাণে পর্য্যবসন্ন হইতে হয়, তাহা হইলে ত্রসরেণু অস্মদাদির দৃষ্টি-পথের গোচর হইতে পারে না, অতএব পরমাণু অংশষট্কসম্পন্ন হইলে সাবয়ব হইবে, সাবয়ব হইলেই তাহার নিত্যতা ব্যাঘাত হইবে, সুতরাং পরমাণুর নিত্যতা বাদকে অবলম্বন করিয়া নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকগণের সৃষ্টিক্রিয়া নির্ব্বাহ যে সুদূর-পরাহত সেই বিষয়ে অধিক বলিবার আর

অপেক্ষা নাই। যাহাহউক বৌদ্ধদিগের এই যুক্তি যে নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক দিগের অখণ্ডনীয় ইহা আমরা মনে করি নাই, যেহেতু সংযোগের অব্যাপ্যবৃত্তিতানিয়ামক অংশবিশেষ স্বীকার করিলেই যে, বস্তু সাবয়ব হয় এবং সেই সাবয়বত্ব দ্বারা বস্তুর নিত্যতা-ব্যাঘাত হয় ইহা বলা যায় না, কারণ দেখা যাইতেছে যে, আকাশের সহিত মূর্ত্তের যে সংযোগ হইয়া থাকে উহাও আকাশের সর্ব্বত্র নহে, ঐ সংযোগও প্রাদেশিক, প্রাদেশিক হইলেই ঐ স্থলেও অংশ বিশেষ স্বীকার করিতে হইবে। ঐ অংশ বিশেষ স্বীকার দ্বারা যেরূপ আকাশের সাবয়বত্ব সিদ্ধি হয় না এবং সাবয়বত্ব দ্বারা আকাশের নিত্যতারও ব্যাঘাত হয় না, সেইরূপ এক পরমাণুর সহিত পরমাণ্বন্তরের সংযোগস্থলেও সংযোগের প্রাদেশিকত্ব নির্ব্বাহের জন্য অংশবিশেষ স্বীকার করিলেও পরমাণুর সাবয়বত্বসিদ্ধি বা সাবয়বত্বসিদ্ধি দ্বারা পরমাণুর নিত্যতা ব্যাঘাতের অণুমাত্রও সম্ভাবনা নাই। দিগ্‌বিভাগই ঐ অংশবিশেষ, অবয়ব নহে। দিগ্‌বিভাগের বিভিন্নতা দ্বারাই সংযোগের বিভিন্নতা নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। এইস্থলে নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকদিগের নিকট পরমাণুর স্বরূপ কি ইহা জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা উত্তর দিয়া থাকেন যে, ত্রুটির পর অর্থাৎ ত্রসরেণুর পর যে অতি সূক্ষ্ম বস্তু উহাই পরমাণু, অথবা ত্রুটির যে অবয়ব তদবয়বই পরমাণু, মতভেদে ত্রুটিতেই বিশ্রাম। বৌদ্ধগণ পরমাণুর সম্বন্ধে আর এক প্রশ্ন উত্থাপন করেন যে, পরমাণুকে অবশ্যই সাবয়ব বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। পরমাণু নিরবয়ব হইলে আকাশের অন্তর্ব্বহিঃ সমাবেশের সম্ভাবনা থাকে না, সর্ব্বত্র আকাশের অন্তর্ব্বহিঃ সমাবেশ স্বীকার না করিলে, আকাশকে অসর্ব্বগত বলিতে হয় অর্থাৎ আকাশের সর্ব্বগতত্বের ব্যাঘাত হয়। ইহাতে নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকমতাবলম্বিগণ উত্তর দিয়া থাকেন যে, অন্তর্ব্বহিঃ শব্দ কার্য্য-দ্রব্যের অবয়ববাচী, অকার্য্যস্থলে অবয়বসত্তার সম্ভাবনা নাই। পরমাণু অকার্য্য-দ্রব্য সুতরাং উহার অন্তর্ব্বহিঃ সমাবেশ না করিলেও আকাশের সর্ব্বগতত্বের ব্যাঘাতের সম্ভাবনা নাই। আকাশকে যদি অকার্য্য-দ্রব্যের অন্তর্ব্বহিঃ সমাবেশ করিতে হয়, তাহা হইলে অন্তর্ব্বহিঃ সমাবেশের জন্য আত্মাকেও সাবয়ব বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। আমাদের বিশ্বাস যে, আত্মার সাবয়বত্ব বৌদ্ধদিগেরও অসম্মত। এক্ষণে অপ্রস্তুত বিষয়ের অধিক পর্য্যালোচনা পরিত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার প্রকৃত বিষয়েরই অনুসরণ করিতেছি।

যোগাচার নামক বৌদ্ধ উপসংহারে ইহাই বলিয়াছেন যে, বিজ্ঞান-ব্যতিরিক্ত গ্রাহ্য বস্তু নাই। গ্রাহ্য বস্তুস্বরূপ বিজ্ঞান ব্যক্তিই নিজরূপের প্রকাশিকা, বৌদ্ধ শাস্ত্রে ইহাই উক্ত হইয়াছে। "নান্যোঽনুভাব্যো বুদ্ধ্যাস্তি তস্যানানুভবোঽপরঃ। গ্রাহ্যগ্রাহকবৈধুর্য্যাৎ স্বয়ং সৈব প্রকাশতে"॥ বুদ্ধি দ্বারা বুদ্ধি-ব্যতিরিক্ত অনুভবনীয় কোন বস্তু নাই। বুদ্ধিরও অপর অনুভব নাই। গ্রাহ্য-গ্রাহকভাব-বৈধুর্য্য নিবন্ধন বুদ্ধি স্বয়ং প্রকাশিত হয়। গ্রাহ্য-গ্রাহকের যে অভেদ ইহা অনুমান দ্বারা সাধনীয়। অনুমান এই,—যে জ্ঞান দ্বারা যে বস্তু বেদনীয় হয়, সে জ্ঞান হইতে সেই বস্তু বিভিন্ন নহে, যেরূপ—যে জ্ঞান দ্বারা আত্মা বেদনীয় হয়, সেই জ্ঞানস্বরূপই আত্মা, পৃথক নহে। অতএব যে সকল জ্ঞান দ্বারা নীলাদি বিষয় বেদনীয় হয়, সেই সকল জ্ঞান হইতে নীলাদি বিষয় পৃথক নহে। তবে যে গ্রাহ্য-গ্রাহক ভাবরূপে জ্ঞান ও বস্তুর পৃথগবভাস হয়, উহা এক চন্দ্রমাতে দ্বিত্বাভাসের ন্যায় ভ্রান্তিরূপ, ইহাই শা[illegible] উক্ত হইয়াছে। শাস্ত্র এই,—

"সহোপলম্ভনিয়মাদভেদোনীল তদ্ধিয়োঃ।
ভেদশ্চ ভ্রান্তিবিজ্ঞানৈর্দৃশ্যেতান্দাবিবাদ্বয়ে॥"
গ্রাহ্য-গ্রাহক সংবিত্তির যুগপদুপলব্ধিনিয়ম হেতু নীলাদি বিষয় ও তদ্‌জ্ঞানের অভেদ, তবে ভ্রান্ত ব্যক্তির নিকট অদ্বয় চন্দ্রে দ্বিত্বের ন্যায় পৃথগ্‌ভাবে উহারা প্রতীয়মান হইয়া থাকে। বিজ্ঞানাত্মবাদি-যোগোচারের মতে বিজ্ঞানই আত্মা, জ্ঞান-সুখাদি উহারই আকার বিশেষ, ভাবত্বনিবন্ধন উহারা ক্ষণিক। তন্মতে বিজ্ঞান দুই প্রকার-প্রবৃত্তিবিজ্ঞান ও আলয়বিজ্ঞান। এই ঘট, এই পট ঐরূপ বিজ্ঞান প্রবৃত্তিবিজ্ঞান, আমি জানি এই বিজ্ঞান আলয়বিজ্ঞান—এই বিজ্ঞানই আত্মা। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিজ্ঞান উত্তরোত্তর বিজ্ঞানের হেতু। সুষুপ্তাবস্থাতে প্রবৃত্তিবিজ্ঞান না থাকিলেও আলয়বিজ্ঞান ধারার সত্তাতে কোনও বাধা নাই। মৃগমদবাসবাসিত বসনে যেরূপ গন্ধ সংক্রমিত হয়, সেইরূপ পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিজ্ঞানজনিত সংস্কার উত্তরোত্তর বিজ্ঞানে সংক্রমিত হওয়ায় এককালে অনুভূত বিষয়ের কালান্তরে স্মরণের কোনরূপ বাধা হইতেই পারে না। পূর্ব্বোক্ত ভাবনা চতুষ্টয়-বলে নিখিল বাসনার উচ্ছেদ হইলে, তন্মূলক বিবিধ বিষয়াকারের উপদ্রব প্রশমিত হয়, তাহা হইলেই জীব বিশুদ্ধজ্ঞানসম্পন্ন হইয়া শান্তিধাম-সোপানে সমারূঢ় হইতে সমর্থ হয়। ইহাই যোগাচারের অভিপ্রেত। সৌত্রান্তিক বলেন যে, যোগাচার-মতে বাহ্য বস্তু সমূহ নাই ইহা অযুক্ত, যেহেতু উহাতে কোনরূপ বিশিষ্ট প্রমাণ নাই, বরং প্রতিকূলে যুক্তি দেখা যাইতেছে, যুক্তি এই,—যদি সকল বস্তুই জ্ঞানস্বরূপ অর্থাৎ আত্মার স্বরূপ হইত, তাহা হইলে সর্ব্বত্র অহং অর্থাৎ আমি এই রূপই প্রত্যয় হইত, ইদং অর্থাৎ এই বস্তু এইরূপ প্রত্যয় হইত না। ইহাতে যদি বলা হয় যে, নীলাকার বস্তু সকল জ্ঞান স্বরূপ হইলেও ভ্রান্তিমূলক বাহ্য বস্তুর ন্যায় অবভাসিত হইয়া থাকে, শাস্ত্রে ইহাই কথিত আছে, শাস্ত্র এই,—"যদন্তর্জ্ঞের তত্ত্বং তদ্ বহির্বদবভাসতে"। অভ্যন্তরে যে সকল জ্ঞেয় তত্ত্ব তাহারাই বাহ্যবস্তুর ন্যায় অবভাসিত হইয়া থাকে। ইহাও নিতান্ত অযুক্ত, কারণ যদি বাহ্যবস্তুই না থাকে, তাহা হইলে "বহির্বৎ" এই উপমানোক্তি বসুমিত্র বন্ধ্যাপুত্রের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে,—এই বাক্যের ন্যায় সাধারণের উপহাসাস্পদ হইয়া পড়ে। এবং অভেদ প্রত্যয়ের প্রামাণ্যে ভেদ প্রত্যয়ের ভ্রান্তত্ব অপেক্ষণীয় হয়, আবার ভেদপ্রত্যয়ের ভ্রান্তত্বে অভেদপ্রত্যয়ের প্রামাণ্য অপেক্ষণীয় হয়, এইরূপে পরস্পরা-শ্রয়দোষ অর্থাৎ পরস্পর সাপেক্ষত্ব দোষ বজ্রলেপায়মান হয়। আরও অবিসংবাদে নীলাদিবিষয়ক বিজ্ঞানসম্পন্ন হইয়া লোক সকল বাহ্য বস্তুরই উপাদান করে, জগতে আভ্যন্তরিক বস্তুর উপেক্ষা করিতেও বাধা আছে মনে করে না। সৌত্রান্তিক-মতে বাহ্যবস্তুসাধনে যুক্তি এইরূপ,—বিবাদ-বিষয়ীভূত প্রবৃত্তিবিজ্ঞান, আলয়বিজ্ঞানের বিদ্যমানতাবস্থাতেও কোনও সময়ে নীলাদি বিষয়োল্লেখি হইয়া থাকে। ঐ স্থলে যে বিজ্ঞান অহমাস্পদ অর্থাৎ আমি এই বিষয়কে জানি এইরূপ বিজ্ঞান, উহাই আলয়-বিজ্ঞান, এবং বিষয়োল্লেখি বিজ্ঞানই অর্থাৎ এই ঘট এই পট এইরূপ বিজ্ঞানই প্রবৃত্তিবিজ্ঞান, বৌদ্ধশাস্ত্রে ইহাই উল্লিখিত হইয়াছে। যথা,—"তৎস্যাদালয়বিজ্ঞানং যদ্ ভবেদহ-মাস্পদং। তৎ স্যাৎ প্রবৃত্তিবিজ্ঞানং যৎ নীলাদিকমুল্লিখেৎ"॥ সেই হেতু আলয়-বিজ্ঞান সন্তানি ব্যতিরিক্ত প্রবৃত্তি-বিজ্ঞানের হেতুভূত কদাচিদুৎপন্ন কদাচিদ্বিনষ্ট বাহ্যবস্তু অবশ্য স্বীকার্য্য। এই বাহ্যবস্তু

বাসনার পারণতি ফলস্বরূপ নহে, ঐ বাহ্য বস্তু কাদাচিৎকত্ব নিবন্ধন কদাচিদুৎপন্ন। কাদাচিৎকত্ব নির্ব্বাহের জন্য শব্দ-স্পর্শ রূপ-রস-গন্ধবিষয়ক ও সুখাদিবিষয়ক প্রত্যয় সকল চতুর্ব্বিধ কারণসাপেক্ষ হইয়া উৎপন্ন হইয়া থাকে, ইহা ইচ্ছা না থাকিলেও নির্ম্মলমতি ও চাতুর্য্যসম্পন্ন মহাত্মদিগের অবশ্য নির্ণেতব্য। সেই চতুর্ব্বিধ কারণ—অবলম্বন, সমনন্তর, সহকারি, অধিপতিরূপ। অবলম্বনরূপ কারণ হইতে জ্ঞানপদ বেদনীয় চিত্তের নীল-পীতাদি বিষয়াকারতা নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। সমনন্তর প্রত্যয়রূপ কারণ হইতে চিত্তের বোধরূপতা নির্ব্বাহ হইয়া থাকে অর্থাৎ চক্ষুরাদি কারণ কলাপ সমবধানেও চিত্ত একবার যে বস্তুকে প্রকাশ করে, উত্তরকালে চক্ষুরাদি কারণ কলাপের অসমধানে চিত্তদ্বারা সেই বস্তু পুনঃ প্রকাশিত হয় অর্থাৎ সেই বস্তুর স্মৃতি হয় সুতরাং প্রথম প্রকাশের সময়েই চিত্ত সেই বস্তুর সম্বন্ধে সপ্রকাশতারূপ ধারণ করিয়া থাকে, ইহা না হইলে চক্ষুরাদি কারণ কলাপ ব্যতিরেকে কিরূপে সেই বস্তুর পুনঃ প্রকাশে চিত্ত সমর্থ হইবে। আলোকসংযোগাদি সহকারিরূপ কারণ, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ অধিপতিরূপ কারণ, এইরূপ চিত্তচৈত্তাত্মক সুখাদির চারি প্রকার কারণ। এবং রূপ-বিজ্ঞান-বেদনা-সংজ্ঞা-সংস্কার এই পঞ্চবিধ চিত্তচৈত্তাত্মক স্কন্ধ। সবিষয় ইন্দ্রিয়গণ রূপস্কন্ধ, আলয়-বিজ্ঞান প্রবৃত্তি-বিজ্ঞান প্রবাহ-বিজ্ঞান স্কন্ধ। সুখ দুঃখাদি প্রত্যয় প্রবাহ বেদনা স্কন্ধ। গোমহিষ ইত্যাদি শব্দোল্লেখি বিজ্ঞান-প্রবাহ সংজ্ঞাস্কন্ধ, এবং রাগদ্বেষ মদমানাদি ধর্ম্মাধর্ম্ম সংস্কারস্কন্ধ। এই সকলই দুঃখাত্মক ও দুঃখ সাধন এইরূপ ভাবিয়া ইহাদের নিরোধের উপায়স্বরূপ তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্য সকল জীবেরই সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করা বিধেয়। আরও তাঁহারা বলেন যে, বীজের হেতু যে অঙ্কুর, উহা পৃথিব্যাদি ষড়বিধ ধাতুর সমবায় হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। পৃথিবী ধাতু হইতে অঙ্কুরের কাঠিন্য ও গন্ধ উৎপন্ন হয়। জল ধাতু হইতে উহার স্নেহ ও রস জন্মে। তেজোধাতু হইতে উহার রূপ ও উষ্ণতা সম্পাদিত হয়। বায়ু ধাতু হইতে উহার স্পর্শ ক্রিয়া, আকাশ ধাতু হইতে অবকাশ ও শব্দ নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। এই সকল সংসারতত্ত্বের পর্য্যালোচন দ্বারা জীবের বিমলজ্ঞানের উদয় হয়, যে বিমলজ্ঞান দ্বারা জীব চিরশান্তি ভোগে সমর্থ হইতে পারে। ইহাই সৌত্রান্তিক বৌদ্ধবিশেষদিগের রহস্য। যে সকল বৌদ্ধগণ বুদ্ধদেবের নিকট বৌদ্ধসূত্রের অন্তকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাঁহারাই সৌত্রান্তিক নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন।

সৌত্রান্তিক-মতে বাহ্যবস্তু ও আন্তরিক বস্তু উভয়ই সত্য, পরন্তু ঐ সকল বস্তু অনুমেয়, উহারা প্রত্যক্ষগোচর নহে। এইরূপ পরিভাষাকে বিরুদ্ধচারি ভাষা বলিয়া বর্ণন করিয়া যে সকল বৌদ্ধ বাহ্য বস্তু ও আন্তরিক বস্তুর প্রত্যক্ষ ও অনুমান এই উভয় গোচরতা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাঁহারাই বৈভাষিক নামে প্রসিদ্ধ। সৌত্রান্তিকদিগের পরিভাষা যে বিরুদ্ধ পরিভাষা এই বিষয়ে বৈভাষিকদিগের যুক্তি এইরূপ—তাঁহারা বলেন যে, অনুমান দ্বারা বস্তু স্থির করিতে হইলে তৎ পূর্ব্বে সাধ্য হেতুর অবিনাভাবসম্বন্ধ স্থির করিতে হয়। উহা স্থির করিতে হইলে বহু স্থানে সাধ্য হেতুর সহচার দর্শন অর্থাৎ একত্র সমাবেশ দর্শন আবশ্যক, যেরূপ পাকশালাদি নানা স্থানে বহ্নিধূমের একত্র সমাবেশ গৃহীত হইয়াই ধূমেতে বহ্নির অবিনাভাবসম্বন্ধ গৃহীত হইয়া থাকে। ঐ সহচার দর্শন প্রত্যক্ষ-

রূপ সুতরাং প্রত্যক্ষ অপ্রমাণ হইলে অনুমানও যে অপ্রমাণ হইবে ইহাতে অণুমাত্র সংশয় নাই, ইহাই বৈভাষিকগণের সিদ্ধান্ত।

শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যতে যে বৌদ্ধমতের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়াছেন তাহা এইরূপ,—বৈশেষিকগণ অর্দ্ধবৈনাশিক সুতরাং তাঁহারাও বৌদ্ধ তুল্য। বৌদ্ধগণ সর্ব্ব বিনাশবাদী অর্থাৎ তাঁহাদের মতে কোন পদার্থই নিত্য নহে, কাল, দিক, আত্মা, মন, পরমাণু সকলই অনিত্য। কোন পদার্থেরই স্থায়িত্ব নাই। বৈশেষিক-মতে ঐ সকল পদার্থ নিত্য, উহাদের বিনাশ নাই, সুতরাং বৈশেষিকগণ অর্দ্ধবৈনাশিক। বৌদ্ধদিগের মধ্যে তিন প্রকার বাদী দেখা যায়, কোন কোনও সম্প্রদায় সর্ব্বাস্তিত্ববাদী, কোন কোনও সম্প্রদায় বিজ্ঞানাস্তিত্ববাদী, আবার আর এক সম্প্রদায় সর্ব্বশূন্যতাবাদী। যাঁহারা সর্ব্বাস্তিত্ববাদী তাঁহারা বলেন সকলই আছে, ঘট পটাদি বাহ্যবস্তুও আছে, জ্ঞানাদি আভ্যন্তরিক বস্তুও আছে, বাহিরে ভূত ও ভৌতিক, অন্তরে চিত্ত-চৈত্ত। দ্বিতীয় দল বলেন, বাহিরে কিছুই নাই, সমস্তই অন্তরে। অন্তরে বিজ্ঞান আছে তাহাই বাহিরের ন্যায় প্রতিভাসমান হয়। তৃতীয় দল বলেন, অন্তরের বিজ্ঞানও বস্তুসৎ নহে। যাঁহারা সর্ব্বাস্তিত্ববাদী তাঁহারা বলেন, পৃথিব্যাদি পদার্থ ভূত নামে প্রসিদ্ধ, রূপাদি ও রূপাদি-গ্রাহক চক্ষুরাদি ভৌতিক নামে প্রসিদ্ধ। তাঁহাদের মতে পার্থিব, জলীয়, তৈজস ও বায়বীয় এই চারি প্রকার পরমাণু আছে, উহারা যথাক্রমে খর, স্নেহ, উষ্ণ ও চলনস্বভাবান্বিত। এই সকল পরমাণু পরস্পর সংঘাত প্রাপ্ত হইয়া পরিদৃশ্যমান পৃথিব্যাদির উৎপাদন করে। এবং তাঁহারা পাঁচ প্রকার স্কন্ধ স্বীকার করিয়া থাকেন,—যথা রূপস্কন্ধ, বিজ্ঞানস্কন্ধ, বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ, ও সংস্কারস্কন্ধ, ইহারাই অধ্যাত্ম অর্থাৎ আন্তর। ইহারা পরস্পর সংহত হইয়া আন্তরিক ব্যবহার নির্ব্বাহ করে। তন্মধ্যে সবিষয় ইন্দ্রিয়গ্রাম রূপস্কন্ধ। বিষয় সকলের মধ্যে যদিও বাহিরের বস্তু সত্য, তথাপি ঐ সকল বস্তু দেহস্থ ইন্দ্রিয় দ্বারা পরিগৃহীত হয়, এই কারণে ঐ সকল বাহ্য বস্তুও আধ্যাত্মিক বস্তু মধ্যে পরিগণিত। অহং অহং অর্থাৎ আমি আমি এই রূপ অবিচ্ছিন্ন বিজ্ঞান-প্রবাহই বিজ্ঞান স্কন্ধ, যাহার অপর নাম আলয় বিজ্ঞান। সুখাদির অনুভবই বেদনাস্কন্ধ। গো, অশ্ব, মানুষ এই রূপ নামাঙ্কিত জ্ঞানবিশেষই সংজ্ঞাস্কন্ধ। রাগ, দ্বেষ, মোহ, ধর্ম্মাধর্ম্ম এই সকল সংস্কারস্কন্ধ। এই স্কন্ধপঞ্চকের মধ্যে যে বিজ্ঞান স্কন্ধ উহাই এই মতে চিত্ত ও আত্মা। অপর চারিটী স্কন্ধ চৈত্ত নামে প্রসিদ্ধ। ইহারা মিলিত হইয়া সৃষ্টি ও লোকযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। বৈনাশিক অর্থাৎ বুদ্ধশিষ্যগণ কোনরূপ ভোক্তা, শাস্তা, নিয়ন্তা, সংঘাতকর্ত্তা, স্থিরচেতন, নিত্যাত্মা পরমেশ্বর মানেন না সত্য, পরন্তু তাহা না মানিলেও তাঁহাদের মতে অবিদ্যাদি দ্বারা লোকযাত্রা নির্ব্বাহে বাধা হয় না, সমস্তই উপপন্ন হয়। অবিদ্যাদি এই-আদিপদ দ্বারা অবিদ্যা, সংস্কার, বিজ্ঞান, নামরূপ, ষড়ায়তন, স্পর্শ, বেদনা, তৃষ্ণা, উপাদান, ভব, জাতি, জরা, মরণ, শোক, পরিদেবন, দুঃখ, দুর্ম্মনস্তা এই সকল সংগৃহীত হইয়াছে। যাহা ক্ষণিক স্থিরত্বরূপে তাহার যে জ্ঞান ইহাই অবিদ্যা, ইহা হইতে সংস্কার রাগ, দ্বেষ, মোহ উৎপন্ন হয়। সংস্কার-প্রভাবে গর্ভস্থ পদার্থবিশেষের আদ্য বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়। সেই আদ্যবিজ্ঞান বা আলয়বিজ্ঞান অর্থাৎ অহং এতদ্রূপ জ্ঞান হইতে নাম অর্থাৎ পার্থিবাদি পদার্থের যে সমবায় হয়, তাহা হইতে রূপের অর্থাৎ শ্বেতরক্তাত্মক শুক্র শোণিতের নিষ্পত্তি হয়। গর্ভস্থ মিলিত শুক্রশোণিতের সকল বুদ্‌বুদাদি অবস্থাই এই স্থলে নাম-রূপশব্দের

বাচ্য। বিজ্ঞান, পৃথিব্যাদি চতুষ্টয় ও রূপ এই সম্বলিত ষট্কের নাম ষড়ায়তন, অর্থাৎ সেন্দ্রিয় দেহই ষড়ায়তন পদবাচ্য। নাম, রূপ এই ইন্দ্রিয়ের পরস্পর সম্বন্ধের নাম স্পর্শ। স্পর্শ হইতে বেদনা, অর্থাৎ সুখাদির অনুভব হয়। সেই বেদনা হইতে তৃষ্ণা অর্থাৎ ভোগ-লালসা জন্মে, তাহা হইতে যে প্রবৃত্তি বা চেষ্টা হয়, তাহার নাম উপাদান। এই উপাদান হইতে ভব অর্থাৎ পুনঃ পুনরুৎপত্তি হইয়া থাকে। ইহাকেই আন্বীক্ষিকী প্রণেতা গৌতমমুনি প্রেত্যভাব পদ দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই প্রেত্যভাব শব্দেরও অর্থ পুনরুৎপত্তি। ইহা "পুনরুৎপত্তি প্রেত্যভাবঃ" এই সূত্র দ্বারাই প্রতিপাদিত হইয়াছে। এই উৎপত্তিমূলক ধর্ম্মাধর্ম্ম, ইহা হইতে জাতি অর্থাৎ দেহ বিশেষের পরিপ্রাপ্তি, দেহ হইতেই জরা, জরা হইতে মরণ, মরণ হইতে শোক, শোক হইতে পরিদেবন অর্থাৎ শোকজনিত দুঃখ, ইহা হইতে মনোব্যথা, মান, অপমান প্রভৃতি অন্যবিধ ক্লেশও ইহার অন্তর্গত। এই সকল পরস্পর পরস্পর দ্বারা উৎপন্ন হয়, সুতরাং পরস্পর পরস্পরের কারণ। কোন কোন বৌদ্ধ গ্রন্থে এই সকল সংক্ষেপে ও কোন কোন বৌদ্ধতন্ত্রে এই সকল বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এই অবিদ্যাদি পদার্থ সকলেরই স্বীকার্য্য, কাহারও প্রত্যাখ্যেয় নহে। সেই অবিদ্যাদি পদার্থ পরস্পর নিমিত্ত নৈমিত্তিক ভাবে ঘটীযন্ত্রের ন্যায় নিরন্তর আবর্ত্তিত হইতে থাকায় সংঘাত সিদ্ধি হইয়া থাকে। বৌদ্ধ-মতে তিনটী ব্যতিরিক্ত সমস্তই উৎপাদ্য, ক্ষণিক অর্থাৎ ক্ষণকালস্থায়ী, প্রমেয় অর্থাৎ বুদ্ধি প্রকাশ্য। সেই তিনটী এই প্রকার—প্রতিসংখ্যানিরোধ, অপ্রতিসংখ্যানিরোধ, ও আকাশ। এই তিনটীকে তাঁহারা রূপ নামক শূন্য তুচ্ছ ও অভাব মধ্যে বিবেচনা করেন। বুদ্ধি পূর্ব্বক বিনাশের নাম প্রতিসংখ্যানিরোধ, অবুদ্ধি পূর্ব্বক বিনাশের নাম অপ্রতিসংখ্যা নিরোধ, এবং আবরণাভাবের নাম আকাশ। নিরোধ, অভাব বা না থাকা ইহারই অন্য নাম বিনাশ। কতিপয় বস্তু বুদ্ধি পূর্ব্বক নিরুদ্ধ বা বিনষ্ট হয়, কতিপয় বস্তু আপনা আপনি নিরুদ্ধ বা বিনষ্ট হয়, ইহার তাৎপর্য্য এই যে, কতিপয় বস্তু "বিনষ্টকরি" এই প্রকার বুদ্ধির পরে বোদ্ধার ব্যাপারে বিনষ্ট হয়, কতিপয় বস্তু স্বতো বিনষ্ট হয়। আকাশও নিরোধ মধ্যে গণ্য। নিরোধ না থাকা, সুতরাং আকাশ নিত্যই নিরুদ্ধ অর্থাৎ চিরকালই অভাবগ্রস্ত। আরও ক্ষণিকত্ববাদী বৌদ্ধগণ বলেন যে, এই জগৎ কারণ কার্য্য প্রবাহরূপ। যেরূপ একটী তরঙ্গ অন্য তরঙ্গ জন্মাইয়া নষ্ট হয়, সেইটী আবার অপর তরঙ্গ জন্মাইয়া নষ্ট হয়, সেইরূপ একটী ভাব অন্য ভাবকে জন্মাইয়া নষ্ট হয়, এবং সেইটী নষ্ট না হইতে অপর একটী জন্মে। এইরূপে চিরকাল জন্ম বিনাশের স্রোত বহিতেছে। অবিদ্যা সংস্কার জন্মাইয়া নষ্ট হয়, সংস্কার বিজ্ঞান জন্মাইয়া বিনষ্ট হয়, সুতরাং সেগুলিও কার্য্য কারণ স্রোতের অন্তর্গত ইহাই বৌদ্ধ দর্শনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

বৌদ্ধদর্শনের পঠনপাঠনা প্রচলন প্রথা এ দেশে অনেক কাল হইতেই রহিত হওয়ায় ঐ দর্শনের প্রসিদ্ধ পুস্তক এই প্রদেশে দুর্লভ। যাহা যৎ কিঞ্চিৎ পাওয়া যায় তাহাও অপরিশুদ্ধ, এবং ঐ দর্শনের প্রতিপাদ্য বিষয়ও দুর্জ্ঞেয়। উদয়নাচার্য্য কৃত আত্মতত্ত্ববিবেকে বৌদ্ধদর্শনের প্রতিবাদ্য বিষয় অনেক বর্ণিত আছে সত্য, কিন্তু ঐ গ্রন্থ অত্যন্ত দুর্জ্ঞেয়। ঐ আত্মতত্ত্ব-বিবেকের রঘুনাথ শিরোমণি কৃত যে, দীধিতি টীকা উহা মূল হইতেও অধিকতর

দুর্জ্ঞেয়। ঐ দীধিতির গদাধর ভট্টাচার্য্য-কৃত সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা পুস্তকও এতদ্দেশে দুষ্প্রাপ্য সুতরাং যে কয়েকখানি বৌদ্ধদর্শনের পুস্তক আমার হস্তগত হইয়াছে এবং সেই সকল পুস্তকের যে যে অংশ আমি বুঝিয়াছি, বলিতে কি আমি সকল অংশ বুঝিতে পারি নাই, বুঝিতে পারিয়াছি বলিয়া আমার অভিমানও নাই—সেই সকল পরিজ্ঞাত অংশ হইতে সার সংগ্রহ করিয়া এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ রচনা করিয়াছি, ও ঐ ক্ষুদ্র প্রবন্ধ পাঠ করিবার জন্য আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছি। আমার এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ শ্রবণ করিয়া যদি দুর্জ্ঞেয় বৌদ্ধদর্শনের প্রতিপাদ্য কিয়দংশও অনেকের পরিজ্ঞাত হয়, তাহা হইলে আমি শ্রম সফল মনে করিব।

শ্রীকামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ।

বাদরায়ণ ও শঙ্করের জীবতত্ত্ব-বিচার

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর ।)

ভগবান্ বাদরায়ণ ও শঙ্কর পূর্ব্বাধিকরণে জীব যে জন্ম-মরণরূপ সংসৃতি-আবর্ত্তে পতিত না হইয়া, স্বপ্রকাশ নিত্যচৈতন্যরূপে সর্ব্বদাই বর্ত্তমান থাকেন, তাহা অমোঘ যুক্তি ও প্রমাণ দ্বারা বুঝাইয়াছেন। এই ১৩ অধিকরণে জীব-পরিমাণ বিচারণা। তাহার মধ্যে আবার ২৮ সূত্র পর্য্যন্ত জীবের অণুত্ব প্রতিপাদন এবং ২৯ সূত্র হইতে ৩৩ সূত্র পর্য্যন্ত তাহার খণ্ডন ও প্রকৃত তত্ত্ব নিরূপণ।

১৩ অধিকরণ।

"উৎক্রান্তি গত্যাগতীনাং।" ২ অ। ৩ পা। ১৯ পূর্ব্বপক্ষসূত্র।

"জীবের উৎক্রমণ অর্থাৎ মৃত্যুর পরে দেহ হইতে বহির্গমন, স্বর্গ-নরক-প্রাপ্তি এবং পুণ্য-পাপ ভোগ করিয়া, পুনর্ব্বার মর্ত্ত্যলোকে আগমন বেদে বিহিত হইয়াছে বলিয়া তিনি অণুপরিমাণবিশিষ্টই বটেন।"

ভাষ্য—

এক্ষণে জীবের পরিমাণ কি, সেই বিষয়ে আলোচনা করা যাইতেছে। জীব অণু, মধ্যম বা বৃহৎপরিমাণবিশিষ্ট। এই স্থলে যদি আপত্তি উঠে যে, যখন আত্মাকে অজন্ম ও নিত্য চৈতন্যশালী পূর্ব্বে বলা গিয়াছে, তখন জীব যে ব্রহ্মাত্মা ইহাই প্রমাণিত হইল। আর ব্রহ্মাত্মা যে অনন্ত, ইহা বেদে অভিহিত হইয়াছে, সুতরাং কি প্রকারে জীবের পরিমাণ সম্বন্ধে আলোচনা যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে? ইহার উত্তরে বলা যাইতেছে যে, শ্রুতিতে যে, জীবের উৎক্রান্তি প্রভৃতি নিরূপিত হইয়াছে, তাহা দ্বারা তিনি যে, এক পরিচ্ছিন্ন বস্তু ইহাই প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। আর শ্রুতি স্বয়ং জীবের অণু পরিমাণ স্থল বিশেষে কীর্ত্তন করিয়াছেন। সুতরাং এই বেদ-বচনগুলির অসঙ্গতি দূর করিবার জন্য অণু-পরিমাণ সম্বন্ধে আলোচনার অবতারণা। জীবের উৎক্রান্তি, স্বর্গ-নরক-প্রাপ্তি ও তদ্ভোগানন্তর মর্ত্ত্যলোকে পুনরাগমন বেদে বিহিত হওয়ায় পাওয়া গেল যে, জীব পরিচ্ছিন্ন সুতরাং অণু-পরিমাণবিশিষ্ট। উৎক্রান্তি বিষয়ে কৌষীতকী শ্রুতির প্রমাণ এই যে, "ঐ জীব এই শরীর হইতে বুদ্ধি প্রভৃতি উপকরণের সহিত উৎক্রমণ করেন"। গতি বিষয়ে—"যে কোন ব্যক্তিরা মৃত্যুর পরে ইহলোক হইতে প্রয়াণ করেন, তাঁহারা চন্দ্রলোকে যান।" বৃহদারণ্যকের প্রমাণ— "ঐ

চন্দ্রলোক হইতে জীব স্বকীয় শুভাশুভ কর্ম্ম সম্পাদন করিবার জন্য মর্ত্ত্যলোকে পুনর্ব্বার আগমন করে"। এই উৎক্রান্তি প্রভৃতি বেদে অভিহিত হওয়ায়, প্রাপ্ত হওয়া গেল যে, জীব পরিচ্ছিন্ন। আর সর্ব্বব্যাপক বস্তুর গমন ক্রিয়া কল্পনা করা যাইতে পারে না বলিয়া, জীবকে বিভু বলা যুক্তিসঙ্গত হয় না। সুতরাং জীবের পরিচ্ছিন্নতা প্রমাণিত হওয়ার আর্হত-মত-নিরাকরণ প্রসঙ্গে মধ্যম পরিমাণ (শরীরাণুরূপ পরিমাণ) যুক্তিবিরুদ্ধ প্রতিপন্ন হইয়াছে, এই জন্য অবশেষে তাঁহার অণু পরিমাণ সিদ্ধ হইতে পারে।

স্বাত্মনা চোত্তরয়োঃ। ঐ, ঐ, ২০ পূর্ব্ব পক্ষ সূত্র।

"উৎক্রান্তির পরবর্ত্তী যে গতি এবং অগতি অর্থাৎ স্বর্গ-নরক-প্রাপ্তি ও পাপ-পুণ্য ভোগানন্তর পুনর্ব্বার মর্ত্ত্যলোকে আগমন, এই দুই স্বয়ং জীবের সহিত সংশ্লিষ্ট হওয়ায় তাঁহার অণু-পরিমাণ প্রতিপন্ন হইতেছে"।

ভাষ্য—

যেরূপ কোন গ্রামের ভূস্বামী গ্রাম হইতে না যাইয়াও কথন না কথন ঐভূস্বামিত্ব ছাড়িয়া দিতে পারেন, সেইরূপ দেহ হইতে না চলিয়াও দেহাধিপতির কর্ম্মোপরমজনিত যে দেহাধিপত্যের অবসান তাহাকেও কোন প্রকারে উৎক্রান্তি শব্দের প্রবৃত্তি নিমিত্ত বলিয়া কল্পনা করা যাইতে পারে। কিন্তু উৎক্রান্তির পরে কথিত যে গতি আগতি তাহা কখন আগতিশীলের পক্ষে সম্ভবপর নহে। ঐ গতি ও আগতির সম্বন্ধ আত্মার সহিতই বটে, কেন না গম ধাতু প্রতিপাদ্য ক্রিয়া কর্ত্তৃস্থ। আর মধ্যম পরিমাণ শূন্য বস্তুর গমন ও আগমন ক্রিয়া তাহার অণু-পরিমাণ হইলেই সম্ভবপর। সুতরাং এইরূপে জীবাত্মার গমনাগমন প্রতিপন্ন হওয়ায় তাঁহার উৎক্রান্তিকেও দেহ হইতে অপসৃতি বলিতে হইবে। ইহার কারণ এই যে, যে দেহ হইতে যায় না, তাহার পক্ষে গমন ও আগমন অসম্ভব। আর দেহের অংশ সমূহকেই উৎক্রান্তির অপাদান বলা হইয়াছে। যথা বৃহদারণ্যক—"এই আত্মা চক্ষু, মস্তক ও মুখ হইতে নিষ্ক্রমণ করেন"।

ভাষ্য—

এই জন্যও আত্মার অণুপরিমাণ প্রতিপন্ন হয় যে, "এই অণু আত্মাকে বিশুদ্ধচিত্ত দ্বারা জানা যায়। ইহার আশ্রয়ে একই প্রাণবায়ু পাঁচ প্রকার বৃত্তিভেদে প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে।" মুণ্ডক উপনিষদ প্রাণ-সংশ্লিষ্ট জীবাত্মারই অণুপরিমাণ বিধান করিয়াছে। এইরূপে "একগাছি চুলের এক শত ভাগ করিয়া আবার ঐ বিভক্ত অংশগুলিকে এক এক করিয়া একশ ভাগ করিলে এক অংশের যে পরিমাণ দাঁড়ায়, জীবের সেই পরিমাণ জানিবে।" এবং "তোত্র প্রোত অয়ঃ শলাকার অগ্রভাগ হইতে উদ্ধৃত যে পরিমাণ তদ্বিশিষ্ট অপর জীবও দৃষ্ট হইয়া থাকে এই দুই শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্‌ও জীবের অত্যন্ত সূক্ষ্ম পরিমাণ বিধান করিয়া অণুপরিমাণ বুঝাইতেছে।

জীবের অণুপরিমাণ সম্বন্ধে আপত্তি উঠিতেছে যে, যখন জীব অণু, তখন তাহাকে একদেশস্থই বলিতে হইবে, সুতরাং নিখিল শরীর ব্যাপিয়া কোন বিষয়ের উপলব্ধি হইতে পারে না। আর দেখা যায় যে, জাহ্নবী-জলে নিমগ্ন ব্যক্তির সর্ব্বাঙ্গে শৈত্য উপলব্ধি এবং নিদাঘসন্তপ্ত ব্যক্তির সমস্ত শরীর ব্যাপিয়া পরিতাপ উপলব্ধি হয়। এই জন্য ইহার সমাধানে সূত্রকার বলিতেছেন—

অবিরোধশ্চন্দনবৎ"। ঐ ঐ ২৩ পূঃ সূ।

"জীব অণুপরিমাণবিশিষ্ট হইলেও সকল শরীরব্যাপী সুখ দুঃখাদির উপলব্ধি করিতে পারেন। এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত যেরূপ

চন্দন-বিন্দু শরীরের একদেশস্থ হইয়াও সমস্ত শরীরব্যাপী শৈত্যোপলব্ধির কারণ হয়।

ভাষ্য—

যেরূপ হরিচন্দনবিন্দু শরীরের একাংশে লাগাইলেও সমস্ত শরীরে শৈত্য সঞ্চার করিয়া থাকে, সেইরূপ আত্মাও দেহের এক অংশে থাকিয়া সমস্ত শরীরে সুখদুঃখাদির উপলব্ধি করে। অণু আত্মার সহিত ত্বগিন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ হওয়ায় সকল শরীরব্যাপী উপলব্ধি বিরুদ্ধ হয় না। আর আত্মা ও মনের সম্বন্ধ নিখিল ত্বগিন্দ্রিয়েই রহিয়াছে (কেন না সম্বন্ধ অন্বয়ী বৃত্তি আর ত্বগিন্দ্রিয়রূপ অন্বয়ী এক)। কাজেই ত্বগিন্দ্রিয় যে সমস্ত শরীর ব্যাপী ইহা বলিবার কোন প্রয়োজন রহিল না। এই ত গেল দেহ হইতে বহির্গমনের বৃত্তান্ত, আবার জীব যে শরীরের অভ্যন্তরেই গমনাগমন করেন এই বিষয়েও ঐ বৃহদারণ্যক উপনিষদের প্রমাণ রহিয়াছে। যথা :—

"ঐ জীব ইন্দ্রিয় সমূহকে সম্যক্‌রূপে স্বায়ত্ত করিয়া সুষুপ্তিতে হৃদয় প্রদেশে গমন করেন"। "বিষয়রাশির প্রকাশক ইন্দ্রিয় সমূহকে সমভিব্যাহারে করিয়া পুনর্ব্বার জাগ্রৎ অবস্থার বাস স্থানে আগমন করেন"।

"নাণুরতচ্ছ্রুতেরিতি চেন্নেতরাধিকারাৎ"। ঐ ঐ ২১ পুঃ সূঃ।

"বেদে অণুপরিমাণের বিপরীত মহৎ পরিমাণ শ্রুত হয় বলিয়া যে, আত্মা অণুপরিমাণবিশিষ্ট নহে, এইরূপ সিদ্ধান্ত করিবে তাহাও ঠিক নহে; কেন না ঐ মহৎ পরিমাণ পরমাত্মাকে অধিকার করিয়া বলা হইয়াছে, কিন্তু জীবাত্মাকে অধিকার করিয়া নহে"।

ভাষ্য—

এই জন্য ও আত্মা (জীব) অণু নহে যে, তৎসম্বন্ধে অনণুত্ব শ্রুত হওয়া যায় অর্থাৎ অণুত্বের বিপরীত মহত্ত্ব-পরিমাণ শ্রুত হওয়া যায়। আর "অন্তর্জগতে যে জ্যোতিরিক্ত বিজ্ঞানময় পুরুষ তিনি অজন্মা এবং মহান্"। এই বৃহদারণ্যক শ্রুতি ও "আকাশের ন্যায় সর্ব্বত্র ব্যাপক এবং নিত্য" "সত্য, জ্ঞান, অনন্ত এই তৈত্তিরীয় শ্রুতি আত্মার অণুত্ব নিষেধ করিতেছে। সুতরাং দোষ হইল, না, ইহা দোষের মধ্যেই নহে; কেন না উক্ত শ্রুতি গুলি জীব হইতে ভিন্ন পরমাত্মা অধিকার করিয়া প্রবর্ত্তিত হইয়াছে অর্থাৎ পরমাত্মা প্রকরণেই এই মহৎ পরিমাণ বিধায়ক শ্রুতি সমূহ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ইহার মর্ম্ম এই যে, বেদান্ত শাস্ত্রের প্রথম বেদনীয় বিষয় যে পরমাত্মা ইহাই প্রস্তাবিত হইয়াছে, সুতরাং (এক প্রকরণে অপর প্রকরণের কথা এই রূপ আপত্তিও উঠিতে পারে না)। কেবল উৎসর্গ বিধিসিদ্ধ পরমাত্মার প্রকরণ নহে, কিন্তু "আকাশ-পদবাচ্য অব্যক্ত হইতেও ব্যাপক সর্ব্বপ্রকার দোষবিনির্মুক্ত আত্মা" এই বৃহদারণ্যক শ্রুতি দ্বারা ঐ জীব প্রকরণে পরমাত্মাই বিশিষ্টরূপে গৃহীত হইয়াছেন। এইরূপ আপত্তিও উঠিতে পারে না যে, শরীরাভিমানী জীবই মহৎপরিমাণবিশিষ্ট বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। কেন না যেরূপ "শাস্ত্র-দৃষ্ট্যাতূপদেশো বামদেববৎ" স্থলে বেদোক্ত যে জীবের স্বরূপ ব্রহ্ম তাহা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সেইরূপ এই স্থলেও জানিবে। সুতরাং মহৎ পরিমাণ ব্রহ্ম সম্পর্কিত হওয়ায় জীবের অণুত্ব অব্যাহতরই রহিল।

"স্বশব্দোন্মানাভ্যাঞ্চ"। ঐ ঐ পূর্ব্বপক্ষ সূত্র।

"জীবাত্মার সাক্ষাৎভাবে অণুত্ব এবং অত্যন্ত সূক্ষ্ম পরিমাণ প্রতিপাদক বেদ-প্রমাণ আছে বলিয়া তিনি অণুপরিমাণবিশিষ্টই বটেন।"

অবস্থিতি বৈশেষ্যাদিতি চেন্নাভ্যুপগমাদ্ হৃদিহি ঐঐ ২৪ পুঃ সূঃ।

"এইরূপ আপত্তিও হইতেও পারে না যে, অবস্থিতি বৈলক্ষণ্য অর্থাৎ চন্দন একদেশস্থ

এবং আত্মা ব্যাপক হওয়ায় উহা বিষম দৃষ্টান্ত, কেন না শাস্ত্রে জীবাত্মার অবস্থিতি-স্থান হৃদয়ই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

ভাষ্য—

এই স্থলে আপত্তি হইতেছে যে, দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্টান্তিকের বৈষম্য হওয়ায় চন্দনবৎ এই রূপ বলা যুক্তিবিরুদ্ধ, কেন না আত্মার একদেশবর্ত্তিত্ব সিদ্ধ হইলেই চন্দনকে দৃষ্টান্ত বলা যাইতে পারে। আর চন্দনের একদেশবর্ত্তিত্ব ঘটিত অবস্থিতি বৈলক্ষণ্য এবং নিখিল দেহে শৈত্য সঞ্চার হেতুত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। বিপক্ষে আত্মার সমস্ত শরীর সম্পর্কিত উপলব্ধি মাত্র দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু একদেশবর্ত্তিত্ব নহে। যদি বল যে, একদেশবর্ত্তিত্বের অনুমান হউক, তাহাও সম্ভবপর নহে, কেন না আত্মার সমস্ত দেহ ঘটিত উপলব্ধি কি সকল শরীরব্যাপী ত্বগিন্দ্রিয়ের ন্যায়, বা সর্ব্বব্যাপী আকাশের ন্যায় অথবা পরিচ্ছিন্ন, ক্ষুদ্রায়তন, একদেশবর্ত্তী হরিচন্দন-বিন্দুর ন্যায়? এই প্রকার সংশয় অনুমান দ্বারা দূর হইতে পারে না। (ইহার মর্ম্ম এই যে, আত্মা পরিচ্ছিন্ন যেহেতু তিনি দেশ ব্যাপিয়া কার্য্য করেন; উদাহরণ—চন্দন-বিন্দু, এইরূপ অনুমিতিতে ত্বগিন্দ্রিয় ও আকাশে হেতুটা ব্যভিচারী হইয়া পড়ে।) এইরূপ সমস্যায় বলা যাইতেছে যে, ইহা দোষের মধ্যেই নহে, কেন না শাস্ত্রে চন্দনের ন্যায় আত্মারও একদেশবর্ত্তিত্ব রূপ অবস্থিতি বৈশেষ্য স্বীকৃত হইয়াছে। বেদান্তে দেখিতে পাওয়া যায়—"আত্মা হৃদয় দেশে বর্ত্তমান"। (প্রশ্ন-উঃ)। "সেই এই আত্মা হৃদয়ে" (ছাং উঃ) "যিনি বিজ্ঞানময় অর্থাৎ বিজ্ঞানময় কোষ দ্বারা উপলক্ষিত, প্রাণাতিরিক্ত, হৃদয়াভ্যন্তরে প্রকাশমান পুরুষ, তিনি কিরূপ আত্মা" (বৃং উঃ)। অতএব দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্টান্তিক বৈষম্যদোষ হইতে নির্ম্মুক্ত হওয়ায়—"অবিরোধশ্চন্দনবৎ" এইরূপ যে বলা হইয়াছে, তাহা যুক্তিযুক্তই বটে।

"গুণাদ্বালোকবৎ"। ঐঐ পূর্ব্বপক্ষ সূত্র ২৫।

"যেরূপ লোকসমাজে দেখিতে পাওয়া যায় যে, মণি-প্রদীপ প্রভৃতি গৃহের একদেশবর্ত্তী হইলেও তাহার প্রভা সমস্ত গৃহ প্রকাশ করিয়া থাকে, সেইরূপ অণু-আত্মাও চৈতন্য গুণের ব্যাপ্তি দ্বারা সকল দেহে উপলব্ধি প্রভৃতি কার্য্য করিতে পারেন।"

ভাষ্য—

চৈতন্যগুণের ব্যাপ্তি দ্বারা বা অণুজীবের সকল দেহব্যাপী কার্য্যে কোন বিরোধ দেখিতে পাওয়া যায় না। এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত—যেরূপ মণিপ্রদীপ প্রভৃতি গৃহের একদেশবর্ত্তী হইয়াও সকল গৃহ প্রকাশ করিয়া থাকে। (চন্দন দৃষ্টান্তে যে বা শব্দ দ্বারা অপরিতোষ সূচিত হইয়াছে তাহা খুলিয়া বলা হইতেছে।) যদিও কদাচিৎ সাবয়ব চন্দনের সূক্ষ্ম অবয়ব বিসর্পণ দ্বারা সমস্ত শরীর ব্যাপিয়া শৈত্য-সঞ্চার সম্ভবপর, তথাপি অণুজীবের অবয়ব না থাকায়, সমস্ত শরীরে তাহার বিসর্পণ কি প্রকারে হইতে পারে এইরূপ আশঙ্কায় এই সূত্র উক্ত হইয়াছে।

কি প্রকারে গুণ গুণী ব্যতিরেকে স্থানান্তরে বর্ত্তমান হইতে পারে? আর পটের শুক্লগুণ পট ব্যতিরেকে অন্যত্র বর্ত্তমান দেখিতে পাওয়া যায় না। এইরূপ সমস্যায় যদি বলা যায় যে, প্রদীপ-প্রভাবৎ ঐরূপ হইতে পারে, তাহাও ঠিক নহে, কেন না প্রভাকে পণ্ডিতেরা দ্রব্য বলিয়াই স্বীকার করিয়াছেন কিন্তু গুণ বলিয়া নহে। আর ইহাও অসত্য নহে যে, দৃঢ়সন্নিবিষ্ট তেজোময় দ্রব্যই প্রদীপপদের অর্থ এবং প্রবিরল অর্থাৎ শিথিল-অবয়ববিশিষ্ট তেজোদ্রব্যই প্রভা। অতএব উত্তরে বলা যাইতেছে—

"ব্যতিরেকো গন্ধবৎ"।

ঐঐ ২৬ পূর্ব্বপক্ষসূত্র।

"যেরূপ গন্ধ গুণ হইয়াও আশ্রয়দ্রব্য ব্যতিরেকে স্থানান্তরে সঞ্চারিত হয়, তদ্রূপ অণু আত্মা ব্যতিরেকেও চৈতন্যগুণ নিখিল শরীরে প্রতিফলিত হয়

ভাষ্য—

যে স্থানে সুরভি পুষ্প নাই, সেই স্থানেও পুষ্পসৌরভ উপলব্ধি হওয়াতে যেরূপ গন্ধ-গুণের আশ্রয়দ্রব্য ব্যতিরেকেও স্থানান্তরে উপসর্পণ স্বীকৃত হইয়াছে, সেইরূপ অণু আত্মারও তদ্ব্যতিরেকে দেহের অপর অপর সকল প্রদেশে চৈতন্যগুণ ব্যাপ্ত হইতে পারে। অতএব চৈতন্য গুণিব্যতিরিক্ত দেশব্যাপী নহে, যেহেতু গুণ দৃষ্টান্ত রূপাদি এইরূপ অনুমান দ্বারা গুণের আশ্রয় বিশ্লেষানুপপত্তিও প্রতিপন্ন হইতে পারে না এইজন্য যে, গুণ হেতুটা গন্ধের স্থানান্তরোপসর্পণ স্থলে ব্যভিচারী হইয়া পড়ে। আর প্রত্যক্ষত একমাত্র গন্ধ গুণেরই আশ্রয় বিশ্লেষ দেখিতে পাওয়া যায়। এই স্থলে এইরূপও বলিতে পারা যায় না যে, আশ্রয়ের সহিতই গন্ধের বিশ্লেষ ব্যাপার সংঘটিত হয়, কেন না তাহা হইলে যে মূল দ্রব্য হইতে আশ্রয়বিশিষ্ট গন্ধ বিশ্লিষ্ট হয়, তাহার অপচয় হইতে পারে কিন্তু পরীক্ষাতে বুঝিতে পারা যায় যে, পুষ্প হইতে গন্ধোপসর্পণের পরেও পূর্ব্বাবস্থার ন্যায়ই উহা উপচীয়মান থাকে, তাহার পূর্ব্বগুরুত্বের কিছুই হ্রাস হয় না। ইহার উপরেও যদি আপত্তি কর যে, গন্ধের আশ্রয়ভূত অবয়বগুলি অতি সূক্ষ্ম বলিয়া অপচয় ব্যাপারটা করিতে পারা যায় না; আর ইহা প্রসিদ্ধই আছে যে, গন্ধ-বিশিষ্ট পরমাণু সমূহ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হওয়ায় নাসিকাপুটে যাইয়া গন্ধ-বোধ জন্মায়, তাহাও ঠিক নহে। কারণ এই যে, পরমাণু সমূহ অতীন্দ্রিয় বলিয়া তদীয় গন্ধ কখন উদ্ভূত গন্ধে অর্থাৎ উৎকট গন্ধে পরিণত হইতে পারে না। আর নাগরকেসরাদির উৎকট গন্ধ তাহা হইতে কিঞ্চিদ্দূরবর্ত্তী ব্যক্তিরও উপলব্ধি হইতে দেখা যায়। পক্ষান্তরে লোকসমাজে আমি গন্ধবিশিষ্ট দ্রব্যের আঘ্রাণ করিয়াছি, এরূপ কাহাকেও বলিতে দেখা যায় না, কিন্তু আমি একমাত্র গন্ধ আঘ্রাণ করিয়াছি এই রূপই লোকে বলিয়া থাকে। এই স্থলে আবার এইরূপ আপত্তি যদি তোল যে, রূপ প্রভৃতি স্থলে আশ্রয় ব্যতীত উপলব্ধি না ঘটায় গন্ধেরও আশ্রয় ব্যতীত উপলব্ধি যুক্তিবিরুদ্ধ, তাহাও অনুচিত; কেন না আমি একমাত্র গন্ধ আঘ্রাণ করিতেছি, এই প্রত্যক্ষ গন্ধ গুণবিশ্লিষ্ট নহে, যেহেতু উহা গুণ দৃষ্টান্তরূপ এই প্রকার অনুমানের বাধক। অতএব লোক-নীতিতে যে বস্তু যেরূপ দৃষ্ট হয়, তাহাকে সেই রূপই অনুমান করা পরীক্ষকের পক্ষে উচিত। আর রসের উপলব্ধি রসনা দ্বারা হয় বলিয়া রূপাদিও যে রাসন-প্রত্যক্ষের বিষয় হইবে এইরূপ নিয়মের সৃষ্টি করিতে পারা যায় না (আর কোনরূপে করিতে পারিলেও উহা কুসৃষ্টিতে পরিণত না হইয়া থাকিবে না)।

"তথাচ দর্শয়তি"। ঐ ঐ ২৭ পূর্ব্বপক্ষসূত্র।

"শ্রুতি প্রদর্শন করিতেছে যে আত্মা চৈতন্য গুণ দ্বারা নিখিল শরীরে ব্যাপ্ত হইয়া থাকেন।"

ভাষ্য—

ছান্দোগ্যশ্রুতি জীব হৃদয়ায়তন ও অণুপরিমাণবিশিষ্ট ইহা প্রতিপাদন করিয়া, "আলোমভ্য আনখাগ্রেভ্যঃ" এই অংশ দ্বারা জীবের চৈতন্য গুণের সমস্ত দেহে ব্যাপ্তি প্রদর্শন করিতেছে।

"পৃথগুপদেশাৎ।"

ঐ ঐ ২৮ পূঃ পঃ সূঃ।

"প্রজ্ঞয়া শরীরং সমারুহ্য।"—কৌষীতকী শ্রুতিতে চৈতন্যগুণ ও আত্মার কর্ত্তা ও করণ রূপে পৃথক্ ভাবে উপদেশ হওয়ায়, তিনি যে চৈতন্যগুণ দ্বারা সমস্ত দেহে ব্যাপ্ত হইয়া থাকেন, ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে।

ভাষ্য—

"প্রজ্ঞয়া শরীরং সমারুহ্য" এই কৌষীতকী শ্রুতিতে আত্মা ও চৈতন্যগুণের কর্ত্তৃকরণভাবে পৃথক উপদেশ হওয়ায়, চৈতন্য গুণ দ্বারাই আত্মার শরীর ব্যাপ্তি হইয়া থাকে ইহা বুঝিতে পারা যায়। "সেই আত্মা ইন্দ্রিয় সমূহের জ্ঞান-শক্তিকে চৈতন্যগুণ দ্বারা গ্রহণ করিয়া শয়ন করেন"। এই বৃহদারণ্যক-শ্রুতি কর্ত্তার স্বরূপ হইতে চৈতন্যকে পৃথক উপদেশ করায় সূচিত হইতেছে যে, আত্মা চৈতন্যগুণ দ্বারাই নিখিলদেহে ব্যাপ্ত হইয়া থাকেন। অতএব আত্মা অণুপরিমাণবিশিষ্টই সিদ্ধ হইতেছে।

পাঠক, পূর্ব্বপক্ষব্যপদেশে কুশাগ্রবুদ্ধি শঙ্কর যে যুক্তি রাশির অবতারণা করিলেন তাহা বুঝিতে পারিলেন। কিন্তু এক সঙ্গে পূর্ব্বপক্ষ ও উত্তরপক্ষ লিখিলে বিস্তীর্ণ হইয়া পড়িবে এবং ইহা জটিল দার্শনিক বিষয় বলিয়া পড়িবার রুচিও শিথিলতার পরিণত না হইয়া থাকিবে না, সুতরাং এই দ্বিতীয় খণ্ডকে আমরা পূর্ব্বার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধ দুই ভাগে বিভক্ত করিতে বাধ্য হইলাম। অবশ্যই এই জীবতত্ত্ব-বিচার "তব কথামৃতং তপ্ত জীবনং"বৎ শ্রুতিমধুর ও লৌকিক রসের উদ্বমনকারী নহে, কিন্তু ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, যদি কোন ভাগ্যবান্ ব্যক্তি নিজ সুকৃতির প্রভাবে জীবের প্রকৃত তত্ত্ব বুঝিয়া লইতে পারেন, তবে তৎকালেই তিনি সংসার-সন্তাপ হইতে মুক্ত হইবেন। এই স্বয়ম্ভু-জ্যোতি পুরুষকে ধরিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই আর্য্য মহর্ষিদিগের গৌরব অক্ষয় মূর্ত্তিতে পরিণত হইয়াছে। পক্ষপাত ও কু-সংস্কারকে কর্ম্মনাশার জলে ভাসাইয়া দিয়া, অন্তর্মুখ হইয়া একান্তে বিচার করিতে করিতে কালক্রমে আত্মার চিদভিন্ন সদানন্দজ্যোতি জিজ্ঞাসুর হৃদয় উজ্জ্বল করিবেই করিবে।

শ্রীঅচ্যুতানন্দ সরস্বতী।

ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর বঙ্গীয় হিন্দু-সমাজ।*

প্রকৃত বাঙ্গালার ইতিহাসের এখনও অভাব রহিয়াছে। বাঙ্গালীকে লইয়া বাঙ্গালা দেশ; সেই বাঙ্গালীর ইতিহাস বড় দেখিতে পাই না। বাঙ্গালা দেশে কোন্ কোন্ রাজা বা রাজবংশ রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সময়ে কতগুলি যুদ্ধ বিগ্রহ বা কোন্ কোন্ রাজনীতিক ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল, সে সকলের ধারাবাহিক ইতিহাস দিবার চেষ্টা করা হয় বটে, কিন্তু প্রাচীন বঙ্গীয় হিন্দু-সমাজের ইতিহাস, বাঙ্গালী হিন্দুদিগের আচার ব্যবহার প্রভৃতির কথা বড় দেখিতে পাওয়া যায় না; অথচ বাঙ্গালার ইতিহাস বুঝিতে হইলে অগ্রে এই বাঙ্গালী হিন্দুজাতিকে বুঝিবার প্রয়োজন। বাঙ্গালী-চরিত্র বাদ দিয়া, বাঙ্গালার ইতিহাস লিখিত হইয়া থাকে; সুতরাং শকুন্তলা-চরিত্র পরিত্যাগ করিয়া কালিদাস অভিজ্ঞানশকু-ন্তলা লিখিলে যেরূপ নাটক রচিত হইত, বাঙ্গালার ইতিহাসও সেইরূপ রচিত হইয়াছে। শিক্ষিত বাঙ্গালীর ঔদাসিন্যই ইহার একমাত্র কারণ। সুখের বিষয় সম্প্রতি কয়েক জন

*সাহিত্যসভার মাসিক অধিবেশন পঠিত।

শিক্ষিত বাঙ্গালী এই দিকে অগ্রসর হইয়াছেন।

অতএব সে কালের বাঙ্গালী হিন্দুসমাজের বিষয় জানিতে হইলে, প্রচলিত বাঙ্গালার ইতিহাসের সাহায্যের বড় আশা করা যায় না। এ বিষয়ে আমাদের প্রধান অবলম্বন দুইটি; প্রথম তদানীন্তন বাঙ্গালা সাহিত্য, দ্বিতীয় বর্ত্তমান বঙ্গীয় হিন্দুসমাজ।

হিন্দু ধর্ম্মপ্রাণ জাতি। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত হিন্দুর সমস্ত কার্য্যেরই এক লক্ষ্য—ধর্ম্ম। সে কালের হিন্দু, দেবতার নামে পুত্রদের নাম রাখিতেন, কারণ আসন্ন মৃত্যুকালে পুত্রস্নেহবশতঃ পুত্রকে ডাকিলেও দেবতাকে ডাকা হইবে; পরিশ্রম করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতেন, কিন্তু সেই অর্থের অধিকাংশই দেবসেবায়, অতিথি-সৎকারে, দোল-দুর্গোৎসবে ব্যয় করিয়া স্বর্গের সোপান প্রস্তুত করিতেন; অজস্র অর্থব্যয় ও প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া শত শত ক্রোশ দুর্গম ও বিপৎসঙ্কুল পথ পদব্রজে অতিক্রম করিয়া তীর্থদর্শনে যাইতেন; হাঁচিতে, হাই তুলিতেও দেবতা স্মরণ করিতেন। ফলকথা, সেকালের হিন্দুর জীবনের অতি সামান্য কার্য্যও ধর্ম্মের সহিত সংসৃষ্ট ছিল। সেই হিন্দু কোন গ্রন্থ রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলে, তাঁহাকে যে কেবল ইহজীবনের পার্থিব, নশ্বর বিষয় সকলের বর্ণনা করিয়া সময়ের অপব্যয় করিবেন, ইহা আশা করা যাইতে পারে না। জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতচন্দ্র পর্য্যন্ত প্রায় প্রত্যেক বাঙ্গালী কবির গ্রন্থের নায়ক নায়িকা হয় দেবদেবী, নতুবা কোনও দেব বা দেবীর বরপুত্র ও বরকন্যা। অলৌকিক ঘটনাবলী বর্ণনায় এই সকল গ্রন্থ পূর্ণ সৌন্দর্য্য বা আদর্শ চরিত্র সৃষ্টি করা এই সকল কবির লক্ষ্য ছিল না; দেবদেবীর চরিত্র বর্ণনা দ্বারা আপনাদের পুণ্য সঞ্চয় ও তাঁহাদের অনুগ্রাহকগণের মঙ্গল বিধানই তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল। গায়কেরা সেই সকল কাব্য সভায় গান করিয়া কৃতার্থ হইতেন, এবং শ্রোতৃবর্গও একাগ্রমনে শ্রবণ করিয়া আপনাদিগকে অক্ষয় স্বর্গলাভের অধিকারী বলিয়া বিবেচনা করিতেন।

কিন্তু মানুষ যাহাই লিখুন না কেন, তাহাতে অলক্ষিতে মানব-চরিত্রের ছায়া আসিয়া পড়িবেই। মানুষের দেবতারাও মানুষ, কেবল মানুষ নহেন, তাঁহাদের জাতি ও ধর্ম্মগত পার্থক্যও আছে। হিন্দুর দেবতা হিন্দু, মুসলমানের দেবতা মুসলমান, খৃষ্টানের দেবতা খৃষ্টান; শাক্তের দেবতা শাক্ত, বৈষ্ণবের দেবতা বৈষ্ণব, Protestant এর দেবতা Protestant, Roman Catholic এর দেবতা Roman Catholic, আবার বাঙ্গালীর দেবতা বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানীর দেবতা হিন্দুস্থানী ইত্যাদি। আমাদের প্রাচীন কবিগণের বর্ণিত দেবতাদের মধ্যেও স্ত্রী-পুরুষের দ্বন্দ্ব আছে, ঘরজামাইয়ের লাঞ্ছনা আছে, বহুবিবাহ আছে; অমর-রমণীরা দরিদ্র, বৃদ্ধ, অন্ধ, খঞ্জ, বধির, দুর্ম্মুখ পতিগণের যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া স্ব স্ব ভাগ্যের নিন্দা করেন; দেবগণও কেহ কেহ অর্থোপার্জ্জনে অক্ষম হওয়ায় স্ত্রীর তাড়নায় জমিদারের নিকট মৌরসী স্বত্বে জমি লইয়া চাষবাসের চেষ্টা করেন, জিনিষ পত্র বাঁধা দিয়া আহার্য্য সংগ্রহ করেন; কেহ এমন দরিদ্র যে স্ত্রীকে এক জোড়া শাঁখা কিনিয়া দিতে পারেন না, স্ত্রী সেই খেদে রাগ করিয়া ছেলে দুটিকে সঙ্গে লইয়া বাপের বাড়ী চলিয়া যান; দেবতাদেরও ধোপা নাপিত আছে, তবে জাত হারাইলে তাঁহাদের ধোপা নাপিত বন্ধ হইত কি না তাহা জানা যায় নাই; তাঁহারাও নিমঝোল, শুক্তা, পলতা ও ফুলবড়ি ভাজা, কুল ও কাসুন্দির অম্বল খাইতে ভাল বাসিতেন, ক্রমে

সভ্য হইয়া "সম্বৃত পলান্ন" পর্য্যন্ত ভক্ষণ করিয়া রসনার তৃপ্তিসাধন ও দেব-জন্ম সার্থক করিতেন।

এতদ্ব্যতিরিক্ত কবিকঙ্কণের ন্যায় দুই এক জন কবি তদানীন্তন সমাজের কয়েকটি খাঁটি বাঙ্গালী-চরিত্র আঁকিয়া গিয়াছেন। ভাঁড়ু দত্ত,মুরারি শীল, দুর্ব্বলা দাসী ও হীরা মালিনী প্রাচীন হিন্দুসমাজের কয়খানি সুন্দর সজীব চিত্র। এখনও আমরা অনেক ভাঁড়ু দত্ত মুরারি শীল, দুর্ব্বলা ও হীরা মালিনী দেখিতে পাই।

প্রাচীন বাঙ্গালী হিন্দুসমাজ কিরূপ ছিল, বর্ত্তমান সামাজিক অবস্থা হইতেও আমরা অনেকটা আভাস পাইতে পারি। হিন্দু বড়ই স্থিতিশীল। হিন্দু সহজে তাঁহার সামাজিক ও ধর্ম্মজীবনে কোন পরিবর্ত্তন করিতে চাহেন না। শতাব্দীর পর শতাব্দী অতীত হইয়াছে, কত রাজবংশ এই হিন্দুস্থানে রাজত্ব করিয়া অনন্ত কালসাগরে বিলীন হইয়া গিয়াছে, হিন্দুর কত ভাগ্য-বিপর্য্যয় হইয়াছে, কত অত্যাচার উৎপীড়নের ঝঞ্ঝাবাত তাঁহার উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে পঞ্চনদের কূলে তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষগণ যে গম্ভীর বেদমন্ত্র গান করিয়া গিয়াছেন, হিন্দুর গৃহে এখনও তাহা নিত্য গীত হইতেছে; সেই অতিপ্রাচীন সমাজনিয়ন্তা মহর্ষিগণ যে ধর্ম্ম ও সমাজের পথ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, হিন্দু এখনও সেই পথ হইতে রেখামাত্র বিচলিত হইতে কুণ্ঠিত হন। পূর্ব্বপুরুষগণের নির্দ্দিষ্ট পথ হিন্দু পরিত্যাগ করিতে চাহেন না। কাজেই দেখা যায় যে, সময়ের পরিবর্ত্তনে হিন্দুর রাজনীতিক বা অন্য অবস্থার যেরূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছে, সামাজিক রীতিনীতির সেরূপ পরিবর্ত্তন হয় নাই। তবে এই সকল রীতিনীতি যে পূর্ব্বে যেরূপ ছিল ঠিক সেইরূপই আছে,তাহাও নহে। তথাপি ইহাদের সহিত প্রাচীন সমাজের এতটা সৌসাদৃশ্য আছে যে, প্রাচীন বাঙ্গালী হিন্দু-সমাজের ইতিহাস-লেখক বর্ত্তমান বাঙ্গালী হিন্দুসমাজ হইতেও অনেক সাহায্য লাভ করিতে পারেন।

প্রধানতঃ ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর বাঙ্গালা সাহিত্য হইতে এই প্রবন্ধের উপকরণ সংগৃহীত হইয়াছে। বাঙ্গালার ইতিহাস ও বর্ত্তমান বঙ্গীয় হিন্দুসমাজ হইতেও যতটা সাহায্য পাইতে পারা যায়, তাহা গ্রহণ করা হইয়াছে।

যে সময়ের কথা লিখিত হইতেছে, তাহার বহুপূর্ব্ব হইতে বাঙ্গালা দেশ মুসলমানদিগের শাসনাধীন ছিল। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে বাঙ্গালা দেশে যে সকল রাজনীতিক পরিবর্ত্তন ও বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছিল, তাহা ইতিহাস-পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। কিন্তু তদ্দ্বারা বঙ্গীয় হিন্দুসমাজের কোন ক্ষতি হয় নাই। তখনও মুসলমান নবাবদিগের অধীনে বাঙ্গালার স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হিন্দু নরপতিগণ অর্দ্ধস্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতেন। তাঁহাদের মন্ত্রী ছিল, সৈন্য ছিল, ও তাঁহাদের অধিকারের মধ্যে তাঁহারা দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা ছিলেন। নবাব তাঁহাদের নিকট হইতে নিয়মিত ভাবে নির্দ্দিষ্ট রাজস্ব পাইলেই সন্তুষ্ট থাকিতেন। সমাজ এই সকল নৃপতির শাসন মানিয়া চলিত। তাঁহাদের অধীনে হিন্দু ও মুসলমান উভয় জাতীয় প্রজারাই থাকিতেন। মুসলমানেরা রাজার জাতি, এইজন্য তাঁহারা মুসলমানের ধর্ম্মে বা সমাজে হস্তক্ষেপ করিতে সাহস করিতেন না। কিন্তু তাই বলিয়া হিন্দু রাজার রাজত্বে হিন্দু প্রজাগণ যে সকল সময়ে পরম সুখে থাকিত তাহা নহে। এই ক্ষুদ্র রাজা বা ভূম্যধিকারিগণের অনেকেই রাজকার্য্য অপেক্ষা ভাগবতাদি পুরাণ শ্রবণ, বয়স্যগণের সহিত পাশক্রীড়া, ও রাণীদিগের

মনস্তুষ্টি সাধনেই নিরত থাকিতেন। রাজ-কার্য্যের ভার মন্ত্রী ও অন্যান্য কর্ম্মচারীদের উপর ন্যস্ত থাকিত। এরূপ স্থলে সচরাচর যাহা হইয়া থাকে, তাহাই হইত। প্রজারা রাজকর্ম্মচারীদের দ্বারা নানারূপ উৎপীড়িত হইত।

"উজির হইলা রায়জাদা, বেপারিলে দেয় খেদা,
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবের হ'ল অরি।
কোণে কোণে দিয়া দড়া, পনর কাটায় কুড়া,
নাহি শুনে প্রজার গোহারি॥
সরকার হইলা কাল, খিল ভূমি লেখে লাল,
বিনা উপকারে খায় ধুতি।
পোদ্দার হইল যম, টাকা আড়াই আনা কম,
পাই লভ্য লয় দিন প্রতি॥
জমিদার প্রতীত আছে, প্রজারা পলায় পাছে,
দুয়ার চাপিয়া দেয় থানা।
প্রজা হইল ব্যাকুলি, বেচে ঘরের কুড়ালি,
টাকার দ্রব্য বেচে দশ আনা॥"

কবি—৫ পৃঃ।

শুধু তাহাই নহে। দরিদ্র প্রজারা প্রাণপণ করিয়া জমিতে যদি ভাল শস্য উৎপাদন করিত, তাহা হইলে—

"গরীবের ভাগ্যে যদি শস্য হয় তাজা।
বাব করে সকল বেচিয়া লয় রাজা॥
ক্ষেতে দেখে খন্দ যদি খেতে নাহি পায়।
কুতকাতে কায়েত কি ক্ষতি করে তায়॥
কাদা পানি খেয়ে খেটে ক'রে চাষিপণা।
নরোত্তম ছাড়ি নরাধম উপাসনা॥"

শিবা—পৃঃ ৬৮।

রাজকর্ম্মচারীদের অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া অনেক সময় প্রজারা এক রাজার দেশ হইতে অন্য রাজার দেশে পলাইয়া যাইত।

ইহার উপর চোর ডাকাতেরও বিলক্ষণ ভয় ছিল, বিশেষতঃ মগ ও ফিরিঙ্গী অর্থাৎ পর্টুগীজ জলদস্যুগণের উপদ্রবে দক্ষিণ বঙ্গের অধিবাসিগণ সর্ব্বদা সন্ত্রস্ত থাকিত। এই নরপিশাচগণ অনেক সময় অতর্কিত ভাবে আসিয়া লোকের ঘর বাড়ী লুঠ করিত, ও নিরীহ হিন্দু নরনারীগণকে বন্দী করিয়া লইয়া গিয়া তাহাদের উপর নানারূপ অত্যাচার করিত। তাহাদের অত্যাচারে অনেক সমৃদ্ধ গ্রাম ও নগর জনশূন্য হইয়া ক্রমশঃ হিংস্রজন্তুদিগের আবাসভূমিতে পরিণত হইয়াছিল। কবি কঙ্কণ এই পোর্টুগীজ জলদস্যুদের কথা উল্লেখ করিয়াছেন :—

"ফিরিঙ্গির দেশ খান বাহে কর্ণধারে।
রাত্রিতে বাহিয়া যায় হরমাদের ভয়ে॥

কবি—পৃঃ ২০০।

এই সকল অসুবিধা ও অত্যাচার সত্ত্বেও অদৃষ্টবাদী হিন্দুগণ তখন নিজের অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিতেন। আধুনিক কালের ন্যায় তখন বাঙ্গালীকে ভীষণ জীবন-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হয় নাই। বাঙ্গালী হিন্দুর তখন এত অভাব সৃষ্ট হয় নাই, কাজেই এখনকার মত তখন তাঁহাকে অভাব পূরণার্থ চতুর্দ্দিকে ছুটিয়া বেড়াইতে হয় নাই ও তাঁহার জীবনও এত জটিল হইয়া পড়ে নাই। তখনকার বাঙ্গালী প্রাণ খুলিয়া সকলের সঙ্গে মিশিতে ও আনন্দ করিতে পারিতেন। জীবনে কপটতা ও বাহ্য আড়ম্বরের বাহুল্য ছিল না। এখন একজন সামান্য জমিদার যে-রূপ আড়ম্বরে থাকেন, তখনকার কালের অর্দ্ধস্বাধীন নৃপতিরাও সেরূপ থাকিতেন না। যে কোন ব্যক্তি ইচ্ছা করিলে কিছু কাঁচকলা, শাক, বেগুণ, মূলা বা এইরূপ কোন সামান্য দ্রব্য ভেট লইয়া রাজদর্শনে যাইত ও রাজার দর্শন পাইত। তজ্জন্য রাজকর্ম্মচারীদের উপাসনা করিতে হইত না। প্রজারা রাজার সম্মুখে বসিয়া স্বচ্ছন্দে

কথাবার্ত্তা কহিতে পারিত। আর সকল রাজাই যে রাজকার্য্যে অমনোযোগী থাকিতেন, তাহা নহে। অকর্ম্মণ্য বা উৎপীড়ক রাজার রাজ্যে বাস করিয়া প্রজাদের যেরূপ কষ্ট হইত, প্রজারঞ্জক রাজার রাজ্যে তাহারা সেইরূপ সুখে থাকিত। নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতে ভাল রাজার রাজ্যে প্রজার সুখের আভাস পাওয়া যাইবে :—

"আইস আমার পুর, সন্তাপ করিব দূর,
কাণে দিব সোণার কুণ্ডল ॥
আমার নগরে বৈস, যত তুমি চাব চষ,
তিন সন বহি দিও কর।
হাল পিছে এক তঙ্কা, কারে না করিও শঙ্কা,
পাট্টায় নিশান মোর ধর ॥
নাহি দিব দাবরি, র'য়ে ব'সে দিও কড়ি,
ডিহিদার নাহি দিব দেশে।
সেলামী বাঁশগাড়ী, নানা বাবে যত কড়ি,
না লইব গুজরাট বাসে ॥
যত প্রজা বৈসে ঘর তার না লইব কর
চাষ ভূমি, করি দিব ধান ॥
হইয়া ব্রাহ্মণের দাস পূরাব সবার আশ
জনে জনে সাধিব সম্মান

কবি, পৃঃ ৭৮।

এ সকল যে কেবল প্রজা ভুলাইয়া আনিবার জন্য স্তোক-বাক্য তাহা নহে। ইদানীং ইংরাজ-রাজত্বে প্রজাদিগের অবস্থার অনেক উন্নতি হইয়াছে; তথাপি যদি কলিকাতা-নিবাসী জমিদারগণ, তাঁহাদের অজ্ঞাতসারে মফস্বলের প্রজাদিগের নিকট হইতে নায়েব গোমস্তারা দাবরি দিয়া নানা বাবে কত কড়ি আদায় করিয়া থাকেন, তাহার অনুসন্ধান করেন, তাহা হইলে দামুন্যার চাষী কবির অনেক কথার যাথার্থ্য উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

আমরা এবার সেকালের একটি ক্ষুদ্র হিন্দুনগরী বর্ণনা করিবার চেষ্টা করিব।

নগরীর একপ্রান্তে—সচরাচর পশ্চিম প্রান্তে, মুসলমানগণ বাস করিতেন। এই মুসলমানদিগের মধ্যে সেখ, সৈয়দ, মোগল, পাঠান সকল শ্রেণীর মুসলমানই থাকিতেন; মুসলমানদিগের সমরকুশলতা, স্বজাতি-প্রেম ও স্বধর্ম্মানুরাগের বিষয় তদানীন্তন বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রায় উল্লিখিত হইতে দেখা যায়।

"সমরকুশল বসিল মোগল
সেখজাদা যত জনা।
পেলে এক রুটি, সবে খায় বাঁটি
রণে পাশরে আপনা।"

ধর্ম্মমঙ্গল, পৃঃ ১৩।

তাঁহারা—

"ফজর সময়ে উঠি বিছায়া লোহিত পাটি
পাঁচ বেরি করয়ে নমাজ।
ছিলিমিলি মালা ধরে জপে পীর পগম্বরে
পীরের মোকামে দেয় সাঁজ ॥
দশ বিশ বেরাদরে বসিয়া বিচার করে
অনুদিন কেতাব কোরাণ।
বেসাইয়া কেহ হাটে পীরের সিরিণি বাঁটে
সাঁজে বাজে দগড় নিশান ॥
বড়ই দানিসবন্দ কাহাকে না কয় ছন্দ
প্রাণ গেলে রোজা নাহি ছাড়ি।
ধরয়ে কাম্বোজ বেশ মাথে নাহি রাখে কেশ
বুক আচ্ছাদিয়া রাখে দাড়ি ॥
না ছাড়ে আপন পথে দশরেখা টুপি মো
ইজার পরয়ে দৃঢ় করি।
যার দেখে খালি মাথা তা সনে না কহে কথা
সারিয়া ঢেলার মারে বারি ॥

কবি পৃঃ ৭৭

মোল্লারা নিকা পড়াইয়া সিকি দান পাইতেন, ও প্রত্যেক "কুঁকুড়া" জবাই করিয়া দশ গণ্ডা কড়ি পাইতেন। আর বকরি জবাই হইলে কালীঘাটের পাণ্ডাদের মত মুড়ি ও ছয় বুড়ি কড়ি পাইতেন।

এবার হিন্দু অধিবাসীদের কথা। তাঁহাদের বাসের জন্য নগরের অন্য তিন দিক নির্দ্ধারিত ছিল। প্রথম ব্রাহ্মণ। কবিকঙ্কণ নানা উপাধিধারী ব্রাহ্মণের কথা বলিয়াছেন। ইঁহারা সম্ভবতঃ রাজবাটীর নিকটেই বাস করিতেন। ইঁহাদের মধ্যে যাঁহারা শাস্ত্রজ্ঞ তাঁহারা প্রত্যহ রাজসভায় গমন করিতেন, ও শাস্ত্রের বিচার ও রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া "ভূষণ-চন্দন" প্রাপ্ত হইতেন। ইঁহাদের

"কোন দ্বিজ অধিষ্ঠাতা কোন দ্বিজ কহে কথা
কেহ পড়ে ভারত পুরাণ।"

নানা দেশ হইতে বিদ্যার্থী ছাত্রগণ আসিতেন, ও রাজা তাঁহাদিগকে বিশেষ সম্মান করিতেন এমন কি হস্তী, অশ্ব পর্য্যন্ত দান করিতেন।

তখন বঙ্গীয় অধ্যাপকগণের খ্যাতি, গৌরবের মধ্যাহ্ন-গগন স্পর্শ করিয়াছিল। অতি দূর দেশ সকল হইতে—এমন কি দ্রাবিড়, কাশী হইতে ছাত্রগণ বঙ্গদেশের চতুষ্পাঠীতে বিদ্যাশিক্ষা করিতে আসিতেন:—

"চৌদিকে চৌপাড়িময় পাঠ করে পড়ুয়াচয়
দ্রাবিড়-উৎকল-কাশীবাসী।
কারও বা ত্রিহোত বাড়ী বিদেশ স্বদেশ ছাড়ি
আগমন বিদ্যা-অভিলাষী॥"

প্রসাদ-পদাবলী ১৩৭।

তখন বিদ্যার্থী ছাত্রেরা সাধারণতঃ অতি সংযত ও সচ্চরিত্র ছিলেন এজন্য সকলের নিকটই বিশেষ সমাদর প্রাপ্ত হইতেন। "পড়ুয়ার" সর্ব্বত্র অবারিত গতি ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতেও যখন, বর্দ্ধমানে সুন্দরের যোদ্ধাবেশ দর্শনে দ্বারী তাঁহাকে "চোর", কিংবা "হরকরা" সন্দেহ করিয়া পুরীপ্রবেশে বাধা দিতে উদ্যত হইল, তখন সুন্দর আপনার খুঙ্গী পুঁথি দেখাইবামাত্র দ্বারী মস্তক অবনত করিয়া দ্বার ছাড়িয়া দিল।

"দ্বারী ছেড়ে দিল দ্বার, থানায় হইয়া পার,
প্রবেশিলা নগরে কুমার॥"

অন্নদামঙ্গল পৃঃ ২৫৩।

সুন্দর, "বাম কক্ষে খুসি পুঁথি জানি করে শুক" লইয়া পুরীর ভিন্ন ভিন্ন গড়ে ভিন্ন ভিন্ন দৃশ্য দেখিতে দেখিতে চলিয়াছেন, কেহ তাঁহাকে একটি কথাও জিজ্ঞাসা করিতেছে না। ক্রমে তিনি ষষ্ঠ গড়ে আসিলেন:—

"ষষ্ঠ গড়ে দেখে যত বোঁদেলের থানা।
আঁটা আঁটি সেই গড়ে থাকে মালখানা॥
সেই গড়ে নানা জাতি বৈসে মহাজন।
লক্ষ কোটি পদ্ম শঙ্খে সংখ্যা করে ধন॥
পড়ুয়া জানিয়া কিছু না কহে সুন্দরে।
অবধান হৌক বলি নমস্কার করে॥"

অন্ন—পৃঃ ২৫৫।

তখন জীর্ণ "খুঙ্গী পুঁথি" যেরূপ passport ছিল, এখনকার calf বা morocco leatherএ বাঁধা সোণার জলে লেখা পুস্তকও সেরূপ নহে কেন, তাহা ভাবিবার বিষয় নহে কি?

ব্রাহ্মণ অধিবাসীদের মধ্যে ঘটক ব্রাহ্মণরাও থাকিতেন। যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন হিন্দুসমাজে এই ঘটক ব্রাহ্মণদিগের বড়ই প্রাধান্য ছিল। বাঙ্গালী হিন্দুর জীবনের প্রধান কার্য্য যে বিবাহ তাহা ঘটকের সাহায্য ব্যতিরেকে এক পদও অগ্রসর হইত না। কন্যা বা বরের পিতা ঘটকের মুখ চাহিয়া বসিয়া থাকিতেন। লোকের জাতি মর্য্যাদা অমর্য্যাদা এই ঘটক মহাশয়গণের উপরেই নির্ভর করিত। তাঁহারা অসন্তুষ্ট হইলে রক্ষা থাকিত না।

"গালি দিয়া লণ্ড ভণ্ডে ঘটক ব্রাহ্মণ দণ্ডে
কুল পাঁজি করিয়া বিচার।
যে বা না গৌরব করে সভায় বিড়ম্বে তারে
যাবৎ না পায় পুরস্কার

কবি পৃঃ ৮১।

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় ঘটকদিগের এই গৌরব একেবারে খর্ব্ব করিয়াছে।

ব্রাহ্মণদিগের পর ক্ষত্রিয়। ক্ষত্রিয়েরা-

"পুরাণ শ্রবণ আশে বসিল বিপ্রের পাশে
অনুদিন দ্বিজে দেয় ধন।"

কবি।৮১।

ক্ষত্রিয়দের পরে রাজপুতদিগের বাস। ইহারা মল্লযুদ্ধ ও শিকার করিয়া কাল কাটাইতেন, এবং বোধ হয় ইহারাই তদানীন্তন হিন্দু রাজাদের সৈনিক বিভাগে কার্য্য করিতেন।

ক্ষত্রিয়ের পর বৈশ্য। ইহারা কৃষি কর্ম্ম ও ব্যবসা বাণিজ্য করিতেন। কবিকঙ্কণের এই স্মৃতিশাস্ত্রানুযায়ী জাতিবিভাগ দেখিয়া মনে হয় যে, তাঁহার সময়ে বঙ্গীয় বৈশ্যেরা সকলেই শূদ্রশ্রেণীর অন্তর্গত হন নাই। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগেও বাঙ্গালা সাহিত্যে জাতিগণনায় বৈশ্যদিগের স্বতন্ত্র উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না।

ইহাদের পর বৈদ্য। তথনকার বৈদ্যেরা—

"উঠিয়া প্রভাত কালে ঊর্দ্ধরেখা দেয় ভালে
বসন মণ্ডিত করি শিরে।
পরিয়া উজ্জ্বল ধূতি কাঁথে করি নানা পুঁথি
গুজরাটে বৈদ্যগণ ফিরে॥

কবি।৮২।

এই বর্ণনা হইতে দৃষ্ট হয় যে, তথনকার বৈদ্যগণ বাড়ী বাড়ী রোগীর সন্ধান করিয়া বেড়াইতেন। লোকে বৈদ্য ডাকিতে যাউক আর না যাউক বৈদ্য, পাড়ায় পাড়ায় রোগী খুঁজিতে আসিতেন। এ বিষয়ে সেকালে ও একালে অনেক পার্থক্য ঘটিয়াছে। কিন্তু কবি সেকালের বৈদ্যগণের চিকিৎসা-নৈপুণ্যের যে পরিচয় দিয়াছেন তাহা এখনকার কোন কোন বৈদ্যের প্রতি প্রযোজ্য হইতে পারে কি না, তাহা উপস্থিত সুধীমণ্ডলী বিচার করিয়া দেখিবেন :—

"কায়(ও)দেখি সাধ্য রোগ ঔষধ করয়ে যোগ
বুকে ঘা মারিয়া অর্থ চায়।
অসাধ্য দেখিয়া রোগ পলাইতে করে যোগ
নানা ছলে হয় যে বিদায়॥
কর্পূর পাচন করি তবে জিয়াইতে পারি
কর্পূরের করহ সন্ধান।
রোগী সবিনয় বলে কর্পূর আনিতে ছলে
সেই পথে বৈদ্যের প্রয়াণ॥"

কবি।৮২।

কবি যে এখানে নিকৃষ্ট বৈদ্যগণকে উপহাস করিয়াছেন, ইহা সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন। তখন উৎকৃষ্ট বৈদ্যের অভাব ছিল না। এবং এখনকার মত তখনও তাঁহারা চিকিৎসা-নৈপুণ্যের জন্য বিশেষ সম্মান প্রাপ্ত হইতেন।

প্রাচীন পণ্ডিত বৈদ্য, ঔষধ প্রয়োগে সদ্য,
ব্যাধিমুক্ত কালেতে বিয়োগ
ভূপতির আস্থা আছে, যাতায়াত নিত্য কাছে,
চিরবৃত্তি সুখে করে ভোগ।

প্রসাদ পদা—১৩৭।

আরও কৌতুকের বিষয় এই যে কবিকঙ্কণ বৈদ্যের পার্শ্বেই অগ্রদানীদিগকে বসাইয়াছেন :—

"বৈদ্যজনের পাশে অগ্রদানী-জন বৈসে
নিত্য করে রোগীর সন্ধান।
রাজ-কর নাহি দেয় বৈতরণী ধেনু লয়
হেম রজত তিল লয় দান॥"

বোধ হয় অগ্রদানীদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, তাহাদের প্রতিবেশী কৃতান্তানুচরগণ যে বাড়ীতে রোগী দেখিতে যাইবেন, সেই বাড়ীতে শীঘ্রই অগ্রদানীর প্রয়োজন অবশ্যম্ভাবী।

সেকালেও কায়স্থদিগের বিদ্যার সুখ্যাতি ছিল, ও তাঁহারা ধনবান ও চরিত্রবান ছিলেন। পূর্ব্বেই রাজসংসারে তাঁহাদের প্রতিপত্তির কথা উল্লিখিত হইয়াছে।

"কোন জন দ্বিজকুল সাধ্য কেহ ধর্ম্ম মূল
দোষহীন কায়স্থের সভা।

প্রসন্ন সবারে বাণী লেখা পড়া সবে জানি
সর্ব্বজন নগরের শোভা ॥"
কবি—৮২।

নৃপতি কর্ণসেনের রাজ্যে—
"করি বন্দোবস্ত বসিল সমস্ত
কুলীন কায়স্থ যত।
পবিত্র চরিত্র ঘোষ বসু মিত্র
মার্জ্জিত মৌলিক যত॥" ধর্ম্ম—১২।

ভারতচন্দ্রও বলিয়াছেন—
"কায়স্থ বিবিধ জাতি দেখে রোজাগরী।"
অন্ন।২৫৭।

এই সকল জাতি ভিন্ন গোপ, তেলী, কামার, কুমার, মালী, বারুই, নাপিত, মোদক, শাঁখারি, কাঁসারি, স্বর্ণকার, ছুতার, এমন কি হাড়ি, শুঁড়ি, চামার প্রভৃতি সকল জাতিই নাগরীতে থাকিত। কবিকঙ্কণ মহারাটা জাতির কথাও লিখিয়াছেন :-

"একদিকে বাস মহারাটা।
ফিরে তারা গুজরাটে, শোলাঙ্গ পিলিহা কাটে
ছানি কাটে দিয়া চক্ষে কাঁটা
কবি।৮৩।

সর্ব্বশেষে—
"লম্পট পুরুষ আশে, বারবধূজন বৈসে,
এক ভিতে তার অধিষ্ঠান।"
কবি—৮৪।

'পুরীর প্রান্তরে, বেশ্যা থরে থরে,
অন্ত্যজ জাতি অপার।"
ধর্ম্ম—১৩।

এক্ষণে অনেকে কলিকাতার ভদ্রপল্লী ও বিদ্যালয়ে সমূহের নিকট হইতে যাহাতে বারনারীগণকে স্থানান্তরিত করিয়া নগরীর একপ্রান্তে তাহাদের বাসস্থান নির্দ্ধারিত হয়, তজ্জন্য চেষ্টা করিতেছেন। এবিষয়ে ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর হিন্দুরাজগণের নীতি আমাদের বর্ত্তমান সুসভ্য গভর্ণমেণ্টেরও অনুকরণীয়।

এ সকল ভিন্ন অনাথ, অতিথি ও প্রবাসী লোকের বাসের জন্য রাজার খরচে নগরে বাসস্থান সকল নির্ম্মিত হইত।
"নগর চত্বর মাঝে, শিবের মণ্ডপ সাজে,
অনাথ-মণ্ডপ, অতিথি-শালা।
বাসাড়ে জনের তরে, দীঘল মন্দির করে,
প্রবাসী জনের তথি মেলা॥
কবি—৭৩।

সম্প্রতি কলিকাতার উন্নতিবিধায়ক আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে। এই আইনের কল্যাণে অনেক মধ্যবিত্ত গৃহস্থকে "বাসাড়ে" হইয়া থাকিতে হইবে। এই বাসাড়েদিগকে বিনামূল্যে বাসস্থান দিবার বিধান এই নূতন আইনে থাকিলে ভাল হইত।

নগরের একস্থানে হাট বসিত। এই হাটে নাগরিকগণের প্রয়োজনীয় নানাবিধ দ্রব্য বিক্রয় হইত। তন্মধ্যে খাদ্য দ্রব্যই অধিক। তখনকার হাটে কতকগুলি উপদ্রব ছিল। "হাটুয়া" গণের নিকট হইতে নানা লোক নানা ছলে তোলা লইত, ও তাহা না পাইলে তাহাদিগকে উৎপীড়ন করিত। গ্রামের মণ্ডল প্রভৃতির তোলা ত ছিলই, তাহার উপর ভাঁড়ু দত্তের ন্যায় দুষ্ট লোকেরাও তোলার জন্য নানা প্রকার অত্যাচার করিত। এই তোলার ভয়ে বিক্রেতারা কিরূপ সন্ত্রস্ত থাকিত ও তাহারা কিরূপ উৎপীড়িত হইত তাহা নিম্নে লিখিত হইতেছে। বেশ হাট বসিয়াছে,—

"এমন সময়ে ভাঁড়ু দত্ত হাটে আইসে।
পসারী পসার লুকায় ভাঁড়ুর তরাসে॥
পসার লুটিয়া ভাঁড়ু ভরয়ে চুপড়ি।
যত দ্রব্য লয় ভাঁড়ু নাহি দেয় কড়ি॥

কেহ ইহাতে আপত্তি করিলে ভাঁড়ু চোখ রাঙ্গাইয়া, হাত নাড়িয়া বলিত—

"আমি মহামণ্ডল আমার আগে তোলা।"

তাহাতেও বিক্রেতা তোলা দিতে অসম্মত হইলে—

"লণ্ডভণ্ড করি গালি দেয় এলোমেলা॥
টানাটানি করে ভাঁড়, ছাটুয়া নাহি ছাড়ে।
জটে ধরি কিল লাথি মারে তার ঘাড়ে॥"

কবি ।৮৪।

সময়ে সময়ে এই অত্যাচার এরূপ অসহ্য হইয়া উঠিত যে, পসারীরা "পীঠে চুণ মাখিয়া" রাজসভায় নালিশ করিতে যাইত।

ক্রেতাদিগের তোলার ভয় ছিল না বটে, কিন্তু হাটে প্রবেশের সময় দৈবজ্ঞ, কুশারী, ভাট, ফকির প্রভৃতিরা তাহাদিগকে ছাঁকিয়া ধরিত। তাহাদিগের প্রত্যেকে দুই এক পণ কড়ি না দিয়া হাটে প্রবেশ করা অসাধ্য হইত। কাহাকে হাটে আসিতে দেখিলেই দৈবজ্ঞ ছুটিয়া গিয়া তাহাকে নূতন পঞ্জিকা শুনাইত ও তাহার মঙ্গল গণণা করিয়া বলিত।

'প্রবেশিতে হাট মাঝে আমি হরি মহারাজে
ডাকে মীণরাশির কল্যাণ।
আসিয়া আমারে গঞ্জি, শ্রবণ করাল
বুড়ী কয় দশপণ দান॥"

কবি—১৫৪।

দৈবজ্ঞের হাত এড়াইলেই কুশারী আসিয়া ধরিত। তাহার—

"কান্ধে কুশের বোঝা, নগরে কুশাই ওঝা,
বেদ পড়ি করিল আশীষ।
ইচ্ছিয়া তোমার যশ, দিনু তারে পণ দশ,
দক্ষিণা আছিল বহু দিন

তার পর—

"প্রবেশ করিতে হাটে, তথা মিলে রাজভাটে
কয়বার পড়ে উভ হাত।
ইজিয়া তোমার যশ, তারে দিনু পণ দশ,
কাণা কড়ি পড়িল পণ সাত॥

আর—

হাটে ফিরে অনুদিন, সেখ ফকির উদাসীন,
তার ব্যয় ত্রয়োদশ বুড়ি॥"

কবি—১৫৪।

কিন্তু এই সকল আপদের হাত এড়াইয়া একবার হাটের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিলে প্রাণ ঠাণ্ডা হইত। বাজারে মায় খাসী খাদ্য দ্রব্য সকল প্রচুর পরিমাণে সাজান রহিয়াছে, তাহাও আবার এত সুলভ যে দু চারিপণ কড়ির বদলে একটি সংসারে খরচ স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাইত। অষ্ট কাহন কড়িতে একটা বড় খাসী মিলিত, দশ বুড়িতে ১ সের খাঁটি সরিশার তৈল পাওয়া যাইত। ধনপতির দাসী দুর্ব্বলা পঞ্চাশ কাহন কড়ি লইয়া বাজার করিতে গেল, তাহার সঙ্গে বাজার বহিয়া আনিবার জন্য দশ জন ভারী চলিল। আর আজকাল পাঁচ টাকার বাজার এক খানা গামছায় বাঁধিয়া হাতে ঝুলাইয়া আনা যায়

ভারতচন্দ্রের আমলে আহার্য্য দ্রব্যাদির মূল্য ইহাপেক্ষা অনেক মহার্ঘ হইয়াছে; এবং বোধ হয় তখনও সময়ে সময়ে লোকে ঘৃত দুগ্ধাদির অভাব অনুভব করিত। কারণ এমন যে হীরা মালিনী তাহাকেও সারা হাট ফিরিয়া অতিকষ্টে দু'টাকায় দুই সের ঘি কিনিতে হইয়াছিল, এবং ঘৃতবিক্রেতা—

"যেটি কয় সেটি, লয় নাহি লয় কিরা।"

আর দুগ্ধের জন্য—

"দুঃখেতে আনিনু দুগ্ধ গিয়া নদী পারে।
আমা বিনা কার সাধ্য আনিবারে পারে

অন্ন—২৬৮।

অবশ্য দুর্ব্বলা ও হীরা মালিনীদের কথা বিশেষ সাবধানে গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু তাহা হইলেও কিছু সত্য না থাকিলে

তাহার উপর অতিরঞ্জন বলিতে পারে না।

এক্ষণে আমাদের সদাশয় গভর্ণমেণ্ট আহার্য্য দ্রব্যের মহার্ঘতার কারণানুসন্ধানে নিযুক্ত আছেন। দেখা যাউক এই অনুসন্ধানের ফলে আবার অষ্ট কাহনে খাসী ও দশ বুড়ীতে একসের সরিসার তৈল পাওয়া যাইতে পারে কি না।

আমরা এখানে অষ্টাদশ শতাব্দীর বাজার সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিব। অষ্টাদশ শতাব্দীর বাজারে প্রধানতঃ আহার্য্য সামগ্রীই বিক্রীত হইত না। তখন বিদেশী বেপারীও বিদেশী পণ্যে বাজার ছাইয়া ফেলিতে আরম্ভ করিয়াছে, কিন্তু তখনও দ্রব্যাদি দুর্ম্মূল্য হয় নাই। রামপ্রসাদ তাঁহার সময়ের রাজার বাজারের এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন :—

"তার আগে দেখে কবি রাজার বাজার।
বিদেশী বেপারি বৈসে হাজারে হাজার॥
বনিজি দোকান কত শত শত ঠাঁই।
মণিমুক্তা প্রবাল আদির সীমা নাই॥
বনাত মখমল পট্টু ভুবনাই খাসা।
বুটাদার ঢাকাইয়া দেখিতে তামাসা॥
মালদই নকটি চিকণ সরবন্দ।
আর আর কত কব আমির পছন্দ॥
বিলাতি বহুত চিজ বেশ কিম্মতের।
খরিদ্দার নাহি পড়্যা পড়্যা আছে ঢের॥
সুলভ সকল দ্রব্য যা চাই তা পাই।
বাজারে বেসাতি নাই রাজার দোহাই॥"

প্রসাদ-পদা। ১৩৯।

"সুলভ সকল দ্রব্য" কথা কয়টি বাদ দিলে উপরোদ্ধৃত বর্ণনার সঙ্গে আধুনিক কলিকাতার বড়বাজারের সৌসাদৃশ্য দেখিয়া চমৎকৃত হইতে হয়।

উপরে হাটে দৈবজ্ঞদিগের অত্যাচারের কথা বলা হইয়াছে। হিন্দুসমাজে তখন দৈবজ্ঞ দিগের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব ছিল। দৈবজ্ঞ শুভাশুভ দিন বা ক্ষণ না দেখিয়া দিলে, হিন্দুর কোন কার্য্যই হইত না। দৈবজ্ঞদিগের প্রতি লোকের বড় বিশ্বাস ছিল। দিল্লীর বাদশাহেরা পর্য্যন্ত তাহাদিগের গণনা দ্বারা পরিচালিত হইতেন, কাজেই এই ব্যবসা লাভজনক ছিল। হিন্দু ও মুসলমান উভয় জাতীয় দৈবজ্ঞই বাদশাহ ও রাজাদের সভায় দেখিতে পাওয়া যাইত। এই শ্রেণীর নিকৃষ্ট লোকেরা হাটে বাজারে বেড়াইত। ইহাদের দেখাদেখি সে সময়কার নীচ Portuguiseরাও এ ব্যবসা ধরিয়াছিল। প্রসিদ্ধ ফরাসী পর্য্যটক Bernier এই দৈবজ্ঞাদিগের অতি সুন্দর বর্ণনা করিয়াছেন। এখানে তাহা উদ্ধৃত করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। তিনি বলেন—

"These men are the oracles, but rather the affronters of the vulgar, to whom they pretend to give, for one paysa, that is, a penny, good luck; and they are they, that looking upon the hands and the face, turning over their books, and making a show of calculation, determine the fortunate moment when a business is to be begun to make it successful. The mean women, wrapt up in a white sheet from head to foot, come to find them out, telling them in their ear their most secret concerns, as if they were their confessors, and (which smells very strongly of stupidity and folly) entreat them to render the stars propitious to them suitable to their designs; as if

they could absolutely dispose of their influences.

The most ridiculous of all these astrologers, in my opinion, was that mongrel Portuguese, Fugitive from Goa, who sat in the market place with much gravity upon his piece of tapestry, like the rest, and had a great deal of custom, though he could neither write nor read, and as for instruments and books, was furnished with nothing else but an old sea-compas and an old Romish Prayer-Book in the Portuguese language, of which he showed the pictures for figures of the Zodiac. "For such beasts such astrologyer," said he to the Rev. Father Buze, a Jesuit, who met him in that place.

I here speak only of the pitiful astrologers of the Bazar; for there are others in these parts. that are in the courts of the grandees, and are considered as great clerks, and are very rich, whole Asia being overspread with this superstition. The kings and the great lords, who would not undertake the least things without consulting them, allow them great salaries, that they may read to them what is written in the heavens, (for so they speak here) and take out for them that fortunate moment, I was lately speaking of or find out, at the opening of the Alcoran the decision of all their doubts."

(Bernier—pp. 226-227.)

এই সকল বর্ণনা হইতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, এখনও কলিকাতার রাস্তার ধারে যে সকল দৈবজ্ঞ, লোকের ভাগ্য গণনা দ্বারা আপনাদের ভাগ্য ফিরাইবার চেষ্টায় বসিয়া থাকে, তাহাদের সহিত সে কালের দৈবজ্ঞগণের বড় বিশেষ প্রভেদ ছিল না। শক্ত লোকের হাতে পড়িলে সময়ে সময়ে এই দৈবজ্ঞ প্রভৃতিগকে অনেক লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইত। ধনপতি সদাগর রাজাজ্ঞায় সিংহলে যাইবেন। অতএবঃ—

"দৈবজ্ঞ রচিল পাঁজি রাশি চক্র পাতি।
যাত্রা গণিবারে তারে দিল ধনপতি॥"

দৈবজ্ঞ গণনা করিয়া বলিলেনঃ—

"নহে যাত্রা ভাল সাধু দেখি বিপরীত।
জীবন সংশয় দেখি হারাবে বুহিত॥
এমন যাত্রায় গেলে লোক হয় বন্দী।
কহিনু পুরাণ সার ভ ণ সাধু সন্ধি॥"

কবি—১৯০।

যাত্রা নাইণ উজ্জয়িনীপতির আজ্ঞায় বণিক্‌রাজ ধনপতি সিংহলে যাইবেন; এমন স্পর্দ্ধা যে দৈবজ্ঞ যাত্রা নাই বলে!

"এমন শুনিয়া সাধু মুখ কৈল বাঁকা।
নফরে হুকুম দিল মারে তারে ধাক্কা॥
অভিশাপ দিয়া ওঝা চলিল নিলয়।
যাত্রা করে ধনপতি গোধুলি সময়"॥

কবি—১৯০।

গোধূলি সময় যাত্রা করিবার কারণ শাস্ত্রে আছে। শুভকাল না থাকিলে বা উত্তীর্ণ হইয়া গেলে গোধূলি লগ্নে যাত্রা করিতে হয়।

"নক্ষত্রতিথির্বারা নাস্তি প্রাপ্তকালেষু বর্ত্ততে।
অবিশোষণ বর্ণানাং তদা গোধূলিরীষ্যতে॥"

ব্যাসঃ।

বোধ হয় এই ধাক্কা খাইবার ভয়েই দৈবজ্ঞেরা সহজে লোককে মন্দ কথা শুনায় না। (ক্রমশঃ)

শ্রীসরোজচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ।

সের শার যৌবন-জীবন।*

সভাপতি এবং ভদ্র মহাশয়গণ—আমি অদ্য অপরাহ্ণে সের শার যৌবন-জীবন সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠের ভার গ্রহণ করিয়াছি। আপনাদিগের মধ্যে অনেকেই অবগত আছেন যে, সের শা সকল বিষয়েই একজন সবিশেষ খ্যাতাপন্ন লোক ছিলেন। তাঁহার পিতা জৌনপুরের শাসনকর্ত্তার অধীনে একজন সামন্ত বা জায়গীরদার ছিলেন। সের শা এই অতি সামান্য অবস্থা হইতে দিল্লীর সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়াছিলেন—তিনি সম্রাট হুমায়ুনের হস্ত হইতে উক্ত সিংহাসন আচ্ছিন্ন করিয়া লয়েন। যদিও তাঁহার রাজ্য-শাসনকালের পরিমাণ অতি অল্প, তথাপি তাঁহার শাসনকালের ঘটনাবলীর অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ এস্থলে প্রদান করা আমার পক্ষে সম্ভবপর নহে—তাহা এই প্রবন্ধের প্রসঙ্গাধীনও নহে। তাঁহার ৫ বর্ষ পরিমিত রাজ্য শাসনকালের মধ্যে তিনি যে বিবিধ সংস্কার সমূহ সাধন করিয়া গিয়াছেন, তাহার অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণীর এস্থলে উল্লেখ করিতে ইচ্ছা করি। তিনি রাজ্যের সাধারণ পূর্ত্ত কার্য্য সম্বন্ধে কি করিয়াছিলেন, আমি সর্ব্বাদৌ তাহার উল্লেখ করিব। তিনি পঞ্জাব প্রদেশে রোটাস নামক স্থানে যে বৃহৎ দুর্গ নির্ম্মাণ করেন, তথা হইতে বঙ্গদেশের সোণারগাঁও পর্য্যন্ত একটি রাজপথ প্রস্তুত করেন; আগ্রা সহর হইতে ঢাকার সীমান্তর্ব্বর্ত্তী বুরহানপুর পর্য্যন্ত আর একটী পথ তাঁহার দ্বারা নির্ম্মিত হয়। আগ্রা হইতে যোধপুর এবং চিতোর পর্য্যন্ত আর একটী এবং লাহোর হইতে মুলতান পর্য্যন্ত অন্য একটী রাজপথ তাঁহার দ্বারা নির্ম্মিত হয়। উক্ত প্রত্যেক রাজপথের দুই ক্রোশ অন্তর তিনি দরিদ্র পথিকদিগের সুবিধার জন্য এক একটী সরাই নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন; উক্ত বিভিন্ন রাজপথগুলিতে সর্ব্বসমেত ১৭০০টী সরাই নির্ম্মিত হইয়াছিল। তিনি হিন্দু ও মুসলমানদিগের জন্য উক্ত প্রত্যেক সরাইতে বিভিন্ন বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন; তিনি প্রত্যেক সরাইয়ের প্রবেশ-দ্বারে জলপূর্ণ পাত্র রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন; তিনি প্রত্যেক সরাইতে হিন্দু অতিথিদিগের সৎকার জন্য উষ্ণ বা শীতল জল প্রদান, শয্যা ও খাদ্য দান এবং তাঁহাদিগের অশ্বাদি পশুর আহার্য্য দান জন্য ব্রাহ্মণ কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়াছিলেন; এবং উক্ত সরাই সমূহে এমন নিয়ম প্রচলিত ছিল যে যেকোন ব্যক্তি উক্ত সরাইতে আশ্রয় গ্রহণ করিত, রাজসরকারের ব্যয়ে তাঁহার পদোচিত খাদ্য ও অশ্বাদি পশুর জন্য শস্যাদি প্রদত্ত হইত। উক্ত সরাই সমূহের চতুস্পার্শ্বে গ্রাম সকল স্থাপিত হইয়াছিল। প্রত্যেক সরাইয়ের মধ্যস্থলে একটী করিয়া কূপ এবং পাকা ইষ্টকনির্ম্মিত মস্‌জিদ ছিল। এবং একজন করিয়া ইমাম (পুরোহিত) এবং মুয়াজিম (প্রত্যেক মসজিদে উপাসনার জন্য লোকদিগকে আহ্বান করা যাহার কার্য্য)

---

* সাহিত্য-সভার মাসিক অধিবেশনে ভূতপূর্ব্ব সিবিলিয়ান শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ দে কর্ত্তৃক পঠিত ইংরাজি প্রবন্ধের বঙ্গানুবাদ

এবং একজন রক্ষক ও প্রহরী নিযুক্ত থাকিত। এই সকল সরাইসংশ্লিষ্ট ভূমি হইতে উক্ত সকল বিষয়ের ব্যয় সমাধা হইত। শীঘ্র শীঘ্র সংবাদ প্রেরণ জন্য প্রত্যেক সরাইতে দুটী করিয়া অশ্ব রক্ষিত হইত। উক্ত রাজপথ সমূহের উভয় দিকে এরূপ বৃক্ষ সকল রোপিত হইয়াছিল, যে গুলিতে এক পক্ষে যেমন সুমিষ্ট ফল উৎপন্ন হইত, অন্য পক্ষে সেইমত যথেষ্ট ছায়া প্রদান করিত, এমতে গ্রীষ্মকালে পথিকগণ অক্লান্তভাবে সেই সুশীতল ছায়াতল দিয়া গমনাগমন করিতে পারিত। রোটাস দুর্গ—যাহার বিষয় আমি পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি—এবং যাহা কাশ্মীর ও গাক্কারদিগের দেশ শাসনাধীনে রাখিবার জন্য সের শা কর্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল, সেই দুর্গ ব্যতীত তিনি দিল্লীর নিকট যমুনার সান্নিধ্যে একটী নূতন নগর স্থাপন এবং তৎরক্ষার জন্য দুটী দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন এবং আরও কনৌজ ও পাটনায় দুটী দুর্গ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। চৌর এবং রাজপথস্থ দস্যুদিগের হস্ত হইতে প্রজাপুঞ্জকে বিশেষতঃ পথিক এবং বণিকদিগকে রক্ষা করিবার জন্য তিনি কতকগুলি নিয়ম সৃষ্টি করিয়াছিলেন—যদিও সেগুলি বর্ত্তমানকালে অনুমোদনীয় নহে এবং সময়ে সময়ে সেগুলির দ্বারা অতিশয় অবিচার হইত, কিন্তু সেগুলি সেসময়ে কার্য্যকর হইয়াছিল। তিনি তাঁহার অধীনস্থ শাসনকর্ত্তাদিগকে বিশেষরূপে উপদেশ দিয়াছিলেন যে, যদি তাঁহার শাসনাধীন প্রদেশের সীমার মধ্যে চুরি, দস্যুতা, নরহত্যা, বা অন্য কোন গুরুতর অপরাধজনক ঘটনা ঘটে এবং যাহারা সেই গুরুতর অপরাধ করিয়াছে, তাহারা ধৃত না হয়, তাহা হইলে তাঁহারা পার্শ্ববর্ত্তী স্থান সমূহের প্রধান প্রধান মণ্ডলদিগকে বন্দী করিবেন এবং তাহাদিগকে ক্ষতি পূরণে বাধ্য করিবেন; কিন্তু মণ্ডলগণ যদি পরে অপরাধীকে উপস্থিত করে বা তাহাদিগের আশ্রয়স্থান দেখাইয়া দেয়, তাহা হইলে যে সকল গ্রামের মধ্যে সেই অপরাধী আশ্রয় লইয়াছিল, সেই সকল গ্রামের মণ্ডলগণই তাহাদিগকে (যাহারা ক্ষতি পূরণ করিয়া দিয়াছে) সেই ক্ষতি পূরণ করিয়া দিবে। অপরাধীগণ আইনমত দণ্ড প্রাপ্ত হইত, এবং বিচার জন্য উপযুক্ত স্থানে ফৌজদারী আদালত স্থাপিত হইয়াছিল। সের শা তাঁহার অধীনস্থ শাসনকর্ত্তাদিগকে এমন আজ্ঞাও দিয়াছিলেন যে, বণিক এবং পথিকদিগের প্রতি প্রজাপুঞ্জ যেন সদ্ব্যবহার করে এবং কোন রকমে যেন তাহাদিগের কোন ক্ষতি না করে এবং যদি পথিমধ্যে কোন বণিক প্রাণত্যাগ করে, তাহা হইলে কেহ যেন অত্যাচারীকে গোপনে রক্ষা না করে এবং বাণিজ্য দ্রব্যে হস্তার্পণ না করে। সের শা তাঁহার সমগ্র সাম্রাজ্যের মধ্যে কেবল দুইটী স্থানে—রাজ্যের পশ্চিম সীমান্তে এবং বঙ্গদেশের সাকরিগলি নামক স্থানে বাণিজ্য দ্রব্যের উপর শুল্ক স্থাপন করিয়াছিলেন।

রাজস্ব আদায় জন্য তিনি প্রত্যেক পরগণায় আবশ্যক মত কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়াছিলেন এবং শাসনকর্ত্তাদিগকে আজ্ঞা দিয়াছিলেন যে, তাঁহারা যেন প্রতি শস্য কর্ত্তনকালে কর্ষিত জমি সকল জরিপ করেন এবং জমির পরিমাণ এবং উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ অনুসারে কৃষককে এক অংশ এবং গ্রামের মণ্ডলকে দুই অংশ দিয়া রাজস্ব আদায় করেন এবং শস্য যে শ্রেণীর তদনুসারে যেন রাজস্বের হার নির্দ্দেশ করা হয়। এবং তিনি কর্ম্মচারীগণের কার্য্যের সুবিধার

জন্য এবিষয়ে এরূপ বিশেষ নিয়মাবলী সৃষ্টি করিয়াছিলেন যে, যাহাতে তাঁহারা তাঁহার রাজ্যের উন্নতির পরিপোষকস্বরূপ কৃষকদিগের উপর কোন প্রকার অত্যাচার করিতে না পারে। তাঁহার শাসনকালের পূর্ব্বে জমি জরিপ করিবার প্রথা প্রচলিত ছিল না। এখানে বলা যাইতে পারে যে, তিনি রাজস্ব আদায় জন্য যে সকল নিয়ম প্রণালীর সৃষ্টি করেন, সম্রাট আকবর তাহার অধিকাংশই গ্রহণ করিয়া তাহার উন্নতি ও নানা প্রকারে পূর্ণতা সাধন করেন।

মহাশয়গণ! সের শা যে সমস্ত সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য আপনাদিগের কতকটা সময় আমি গ্রহণ করিয়াছি, কিন্তু সেরূপ পরীক্ষা ব্যতীত লোকটী কিরূপ তাহা কল্পনা করা আপনাদিগের মধ্যে হয়ত কতকগুলির পক্ষে অসম্ভব হইত। এক্ষণে আমি তাঁহার যৌবন-জীবন সম্বন্ধীয় কতিপয় তথ্য আপনাদিগের নিকট উপস্থিত করিব এবং দেখাইব সেই তথ্যগুলি তাঁহার ভবিষ্য জীবনের সজীবতা এবং কার্য্যকারিতা কিরূপ পূর্ব্বাভাস প্রকাশ করিয়াছিল। শৌর্য্য, অসমসাহসিক কার্য্যতৎপরতা, উদ্যমশীলতা, ন্যায়-বিচার-প্রিয়তা, এবং উদারতা, এই প্রবন্ধের নায়কের শৈশব এবং যৌবন-জীবনে যাহা দৃষ্ট হইয়াছিল, তাহাতে তাঁহার মহান সংগুণরাজির পূর্ব্বাভাসই বিশেষরূপে পরিলক্ষিত হইয়াছিল এবং তিনি ভবিষ্যতে মহোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত এবং মহানকার্য্যসমূহ সাধন করিয়া তাহা প্রকাশও করিয়াছিলেন।

আমি এইস্থলে বলিয়া রাখি, এই প্রবন্ধে যে সকল তথ্যের উল্লেখ করা হইয়াছে, তৎসমস্ত প্রথমতঃ তারিখ-ই-সেরসাহি নামক গ্রন্থ যাহা তুহফত আকবরসাহি নামেও কথিত—হইতে গৃহীত। সেখ আলি সারওয়ানির পুত্র আকবর খাঁ এই গ্রন্থের প্রণেতা; সের শার বংশের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ বন্ধনে তিনি আবদ্ধ ছিলেন এবং তিনি কিছুকাল সম্রাট আকবরের অধীনে অল্পপরিমিত সৈন্যের নেতৃত্বও করিয়াছিলেন; এবং দ্বিতীয়তঃ তবকৃত-ই-আকবরি নামক গ্রন্থ হইতেও গৃহীত। নিজামদ্দীন আহম্মদ বাখসাহি এই দ্বিতীয় গ্রন্থের প্রণেতা; তিনি গুজরাটের শাসনকর্ত্তার অধীনে বেতনাধ্যক্ষ-পদে নিযুক্ত ছিলেন এবং উক্ত সম্রাটের অধীনে আরও অন্যান্য সমুচ্চপদেও নিযুক্ত ছিলেন। অতএব দেখা যাইতেছে যে, যে দুইখানি গ্রন্থ হইতে তথ্যগুলি গৃহীত হইয়াছে, সেই গ্রন্থদ্বয় সের শার মৃত্যুর বহুবর্ষ পরে লিখিত নহে, বরং সে দুইখানিকে সমসাময়িক ঘটনার বিবরণীপূর্ণ গ্রন্থ বলা যাইতে পারে। এস্থলে ইহা আরও বলা যাইতে পারে যে, উভয় গ্রন্থই একপক্ষে কুসংস্কারবিহীন এবং অন্যপক্ষে পক্ষপাত-শূন্য। তারিখ-ই-আকবরি গ্রন্থে সের শা সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা বিশেষ সততা, সরলতা এবং সহজভাবে বিবৃত, অন্যপক্ষে দ্বিতীয় গ্রন্থের বর্ণনা কতকটা অতিরিক্ত প্রশংসাসূচক।

আমার বিশ্বাস সাধারণের এমত ধারণা যে, সের শা আমাদিগের স্বদেশবাসী ছিলেন; এবং যদিও তিনি বাঙ্গালী নহেন, কিন্তু তিনি বঙ্গের পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশ বেহার হইতে আসিয়াছিলেন। বেহার প্রদেশের সাহাবাদ জেলার অন্তর্গত সাসিরাম সহরের সহিত তাঁহার বংশের বিশেষ সম্বন্ধ ছিল, এই তথ্যই উক্ত ধারণার উৎপত্তির কারণ। ইহা তাঁহার পিতার জাইগিরের মধ্যে একটি

প্রাদেশিক সহর ছিল; এবং তথায় এখনও একটী কৃত্রিম হ্রদের মধ্যে তাঁহার সমাধি-মন্দির দৃষ্ট হইয়া থাকে এবং আরও তাঁহার পুত্র এবং উত্তরাধিকারী ইসলাম শা বা সলিম শার সমাধিমন্দির অসম্পূর্ণ অবস্থায় উক্ত সহরের সান্নিধ্যে দৃষ্ট হইয়া থাকে। যাহা হউক প্রকৃত তথ্য এই যে, তিনি পঞ্জাবের অন্তর্গত হিসার ফিরোজা নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁহার পিতামহ ইব্রাহিম খাঁ সুর এবং তাঁহার পিতা হাসান খাঁ সুর, কান্দাহারের নিকটবর্ত্তী রোণ প্রদেশ হইতে আগমন করেন। তারিখ-ই-সেরশাহি গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে যে, সুলতান বেলোলি লোদি সিংহাসনা-রোহণের অব্যবহিত পরে রাজধানী হইতে বিতাড়িত ইয়ুসুফকে ধৃত করিবার জন্য যে সময়ে মুলতানে গমন করেন, সেই সময়ে জৌনপুরের রাজা সুলতান মামুদ সসৈন্যে দিল্লীতে গমন করিয়া উক্ত নগর অবরোধ করেন। এই একটী মাত্র তথ্য বিশেষরূপে প্রকাশ করিয়া দিতেছে যে, সে সময়ে কিরূপ অরাজকতা, বিগ্রহ এবং আভ্যন্তরিক যুদ্ধ-ব্যাপার চলিতে-ছিল। সুলতান বিলোল লোদি এ সময়ে কাহার নিকট সাহায্য পাইবেন, তাহা স্থির করিতে না পারিয়া ভাবিলেন যে, তাঁহার স্বদেশবাসীগণকে এই সময়ে আহ্বান করাই যুক্তিসিদ্ধ। এমতে তিনি রোণ প্রদেশের বিভিন্ন জাতীয় নেতাদিগের নিকট ফারমান বা অনুমতি পত্র পাঠাইয়া জানাইলেন যে, যদি তাঁহারা ভারতবর্ষে আসিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে এই দেশের উৎকৃষ্ট এবং বিস্তৃত ভূমি তাঁহা-দিগকে আত্মপালনের যথেষ্ট সুবিধা করিয়া দিবে এবং তাঁহারা তাঁহার সিংহাসনকে সবল এবং রক্ষা করিবার দুর্গস্বরূপ হইতে পারিবেন। ইতিবেত্তা আমাদিগকে জ্ঞাত করেন যে, এই ফারমান বা আজ্ঞাপত্র প্রাপ্ত হইয়া পিপীলিকা বা পঙ্গপালের ন্যায় আসিয়া আফগানগণ সুলতানের অধীনে নিযুক্ত হইলেন।

এই সময়ে যে সকল আফগাণ আসিয়া-ছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে এই প্রবন্ধের লক্ষ্য ব্যক্তির পিতামহ এবং পিতা ছিলেন। তাঁহারা সুলেমান পর্ব্বতের গোমাল নদীর তীরস্থ একটী গ্রাম হইতে আগমন করেন। পিতামহ ইব্রাহিম খাঁ, প্রথমে মহাব্বৎ খাঁ সুর এবং পরে জামাল খাঁ সারঙ্গখানি এবং হাসন খাঁ, ওমর খাঁর অধীনে নিযুক্ত হন। ওমর খাঁর উপাধি ছিল—খাঁ-ই-আজম অর্থাৎ মহান প্রভু এবং সুলতান বেলোলীর একজন পারিষদ এবং মন্ত্রী ছিলেন এবং পরে তিনি লাহোরের শাসনকর্ত্তা হইয়াছিলেন। যখন ইব্রাহিম খাঁ প্রাণত্যাগ করেন, তখন হাসন খাঁ ওমর খাঁর নিকট এই বলিয়া অবকাশ প্রার্থনা করেন যে, তিনি তাঁহার মৃত পিতার পরিবারবর্গ ও অধীনস্থ ব্যক্তিবর্গকে সান্ত্বনা প্রদান করিবার জন্য যাইতে অভিলাষী এবং তিনি তাঁহাকে ইহাও জ্ঞাত করেন যে, তিনি তাঁহাদিগকে লইয়া শীঘ্রই প্রত্যাগমন করিবেন, কারণ তিনি ওমর খাঁর অধীনতা ত্যাগ করিয়া এজগতে কখনই স্বীয় বৈষয়িক উন্নতি সাধন করিতে অভিলাষী নহেন! কিন্তু ওমর খাঁ তাঁহাকে সেরূপ কার্য্য করিতে দৃঢ়রূপে নিষেধ করেন, এবং জামাল খাঁ যাহাকে তাঁহার প্রতি সদয় ব্যবহার করেন তজ্জন্য তিনি তাঁহাকে দৃঢ়রূপ অনুরোধ করিয়া পত্র লিখেন। জামাল খাঁ তদনুসারে তাঁহাকে তাঁহার পিতার জাইগির এবং আরও কতিপয় অতিরিক্ত গ্রাম প্রদান

করেন। সুলতান বেলোলির মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র সুলতান সেকন্দর তদীয় সিংহাসনাধিকার করেন এবং যখন তিনি তাঁহার ভ্রাতা বৈটকের নিকট হইতে জৌনপুর অধিকার করিয়া লয়েন, তখন তিনি জামাল খাঁকে সুবা জৌনপুর প্রদান করেন। জামাল খাঁ, হাসন খাঁর কার্য্যে অতীব তুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে স্বীয় সমভি-ব্যাহারে জৌনপুরে লইয়া যান এবং তিনি যাহাতে ৫০০ শত অশ্বারোহী সৈন্য রক্ষা করিতে পারেন, তজ্জন্য তাঁহাকে সাসিরাম, হাজিপুর এবং কাশীর নিকট-বর্ত্তী টাণ্ডা নামক তিনটী পরগণা জাইগীর স্বরূপ প্রদান করেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ দে।

বৈশেষিক দর্শন

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)।

বৈশেষিকে পরমানুবাদ।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে ন্যায় ও বৈশেষিক একই শ্রেণীর দর্শন। ন্যায়ে পঞ্চাবয়ব ন্যায় (Syllogism) এবং বৈশেষিকে পরমাণুবাদ বিশেষরূপে প্রতি-পাদিত হইয়াছে। কণাদের মতে পরমাণু নিত্য পদার্থ। এই পরিদৃশ্যমান জগতকে বিশ্লেষণ করিতে গিয়া কণাদ পরমাণুতে গিয়া উপনীত হইয়াছিলেন। তাঁহার মতে পরমাণুর আর বিশ্লেষণ হয় না সুতরাং পরমাণুকে নিত্য বলিয়া মানিতে তিনি বাধ্য হইয়াছেন। পরমাণুকেই তিনি স্থূল জগতের উপাদান কারণ বলিয়া খাড়া করিয়া-ছেন।

মহর্ষি কণাদই সর্ব্বপ্রথমে পরমাণুবাদ (Atomic theory) প্রচার করেন। কিন্তু কবে তিনি উহা প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা সঠিক বলা দুরূহ। পাশ্চাত্যগণের মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে Democritus গ্রীক দেশে পরমাণু বাদ প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহার পর Epicurus এবং Lucretius পরমাণুবাদকে বিশেষ পুষ্ট করিয়াছিলেন। Lucretius বলিয়াছেন যে,পরমাণু হইতে জগতের উৎপত্তি হইয়াছে (Lucracia, chap. II.) Democritus খৃঃ পূঃ ৪০০ বৎসরের লোক। তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য যে কে সর্ব্ব প্রথমে পরমাণুবাদ প্রচার করেন —Democritus না কণাদ? আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, প্রচলিত বিশ্বাস এই রূপ যে কণাদ চার পাঁচ হাজার বৎসরের ব্যক্তি। সুতরাং তিনি Democritusএর বহু পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। কিন্তু সে বিশ্বাস ছাড়িয়া দিলেও আমরা Democritusএর জীবনী পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিতে পাই যে, তিনি ভারতবর্ষে আসিয়া সাধু সন্ন্যাসীদের নিকট অনেক উপদেশ লাভ করিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি যে পরমাণুবাদ ভারতবর্ষ হইতে পাইয়াছিলেন, তাহা অসম্ভব নহে

এতদ্‌সম্বন্ধে পণ্ডিত ম্যাক্‌সমূলার বলিয়াছেন যে,—

"It is, no doubt, very tempting to ascribe a great origin to Kanad's theory of atoms. But suppose that the atomic theory

had really been borrowed from a Greek source, would it not be strange that Kanad's atoms are supposed never to assume visible dimensions till there is a combination of three double (Tryanuka), nither the simple nor the double atoms being supposed to be visible by themselves. I do not remember anything like this in Epicurean authors, and it seems to me to give quite an independent character to Kanad's view of the nature of an atom"—Indian Philosophy—440.

সুতরাং ম্যাকস্মূলারের মতে কণাদ পরমাণু সম্বন্ধে স্বাধীনমত প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার মত সম্বন্ধে কাহারও নিকট ঋণী ছিলেন না। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে Democritus ভারতবর্ষে আসিয়া সন্ন্যাসীদের সংসর্গে আসিয়াছিলেন। আমাদের ধারণা যে তিনি ভারতবর্ষ হইতে পরমাণুবাদ শিখিয়া গিয়া পাশ্চাত্য জগতে সর্ব্বপ্রথম প্রচার করিয়াছিলেন।

মহর্ষি কণাদ বলিয়াছেন যে একমাত্র পরমাণু সংস্বরূপ নিত্য পদার্থ, তাহার আর কারণ নাই,—"সদকারণবন্নিত্যম্" (৪।১।১)—সৎপদার্থের মধ্যে যাহা কারণ বৎ নহে, অর্থাৎ যাহার কারণ নাই, তাহা নিত্য। জগতের উপাদান কারণ পরমাণু সকলই কণাদের মতে নিত্য। এইজন্য ভাষা পরিচ্ছেদে উল্লিখিত হইয়াছে যে, "নিত্যানিত্যা চ সা দ্বেধা নিত্যা স্যাদণুলক্ষণা। অনিত্যা তু তদন্যা স্যাৎ সৈবাবয়বযোগিনী॥"

কণাদের মতে আমরা যে যাবতীয় জড় পদার্থ প্রত্যক্ষ করি, সমুদয় পরমাণুর সংযোগে উৎপন্ন হইয়াছে। ভাগ করিতে করিতে যাহা আর বিভাগ করা যায় না তাহাই পরমাণু। উহা স্থূলজগতের বিশ্লেষণের চরম সীমা। পরমাণুর প্রত্যক্ষ হয় না; পরমাণুদ্বয় সংযুক্ত হইয়া দ্ব্যণুক ও ত্রসরেণু হইলে তখন প্রত্যক্ষ হয়। এই জন্য তর্কামৃত গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে যে:—

"জালান্তর গতে ভানৌ
যৎসূক্ষ্মং দৃশ্যতে রজঃ।
ভাগস্তস্য চ ষষ্ঠো যঃ
পরমাণুঃ স উচ্যতে

কপাট কিম্বা জানলার ক্ষুদ্র ছিদ্র দিয়া সূর্য্যরশ্মি গৃহে প্রবেশ করিলে সেই রশ্মিতে যে সকল কণা ভাসমান দেখিতে পাওয়া যায় তাহার ছয় ভাগের এক ভাগকে পরমাণু বলে। পরমাণুকে দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু দ্ব্যণুক ও ত্রসরেণুকে দেখিতে পাওয়া যায়। সাবয়ব দ্রব্যের অবয়ব সকল বিভাগ করিতে করিতে যে স্থলে বিভাগের শেষ হইবে, যাহাকে আর বিভাগ করা যাইবে না, অথবা যে আর বিভক্ত হইবে না তাহার নাম পরমাণু।

পরমাণু অনুমেয় পদার্থ। উহার অনুমান এই প্রকার,—স্থূলবস্তু মাত্রেই বিভাজ্য। যাহা বিভাজ্য তাহার অংশ হইয়া থাকে। কিন্তু বিভক্ত হইলে তাহাকে পৃথক পৃথক অংশে ব্যবস্থিত হইতে দেখা যায়। আরও দেখা যায় প্রত্যেক বিভক্ত অংশ, প্রত্যেক বিভাজ্য অপেক্ষা সূক্ষ্ম ধারণ করে। এইরূপে যে স্থলে ক্ষুদ্রতার শেষ হইবে, সেই অবিভাজ্য ও অবয়বশূন্য বস্তুই পরমাণু। পরমাণুকে নিরবয়ব বলিয়া কল্পনা করিলে পরমাণুর অবয়ব ধারা অনন্ত হইবে। কারণ নিরবয়ব বস্তু স্বীকার না করিলে বিভাজ্যমান অবয়ব যত কেন সূক্ষ্ম হউক না তাহারও অবয়ব আছে,

ঐ অবয়বেরও অবয়ব আছে, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। তাহা হইলে সকল বস্তু অনন্তাবয়ব হইয়া পড়ে। এই জন্য পরমাণুকে নিরবয়ব বলা হইয়াছে। যে বস্তু নিরবয়ব তাহার উৎপত্তি নাই, এবং উৎপত্তি না থাকিলে বিনাশও থাকে না। এই জন্য পরমাণুকে নিত্য বলা হইয়াছে।

বৈশেষিক-মতে দুইটী পরমাণুর সংযোগে দ্ব্যণুক এবং তিনটী দ্ব্যণুকের সংযোগে ত্রসরেণু, ইত্যাদি প্রকারে ও ক্রমে মহাবয়বী পর্য্যন্ত উৎপন্ন হইয়াছে। পরমাণুর অবয়ব নাই কিন্তু দ্ব্যণুক, ত্রসরেণু প্রভৃতির অবয়ব আছে। সুতরাং অবয়ব সংযোগে যাহাদের উৎপত্তি অবয়ব বিভাগে তাহাদের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী।

বৈশেষিকেরা বলেন যে পরমাণু দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু তাহা হইলে জিজ্ঞাসা যে পরমাণু যখন চক্ষুরিন্দ্রিয়ের বিষয় নহে, তখন দ্ব্যণুক হইতে আরম্ভ করিয়া ঘটাদি পর্য্যন্ত—যাহাদিগকে পরমাণুপুঞ্জ বলা হয় —কেমন করিয়া দেখিতে পাওয়া যাইবে? ইহার উত্তরে তাঁহারা বলেন যে পরমাণুর অতিরিক্ত অবয়বারব্ধ অর্থাৎ পরমাণু দ্বারা সমারব্ধ অবয়বী, এই দর্শনে অঙ্গীকৃত হইয়াছে। এই জন্য পরমাণুকে দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু পরমাণুপুঞ্জ দ্বারা গঠিত বস্তন্তরের—যাহাকে 'অবয়বী' বলা হয়—দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকেরাও পরমাণুকে নিত্য বলিয়াছেন। তাঁহাদের মতে দ্ব্যণুক হইতে মহাবয়বীর অবয়ব পর্য্যন্ত অবয়ব সকলের সাধারণ নাম Molecule. Molecule আবার atoms এর দ্বারা গঠিত হয়। দুইটীর কম atoms এ Molecule গঠিত হইতে পারে না অর্থাৎ Molecule অন্ততঃ ভাগদ্বয়ে বিভাজ্য। প্রাচ্যদের ন্যায় পাশ্চাত্যেরাও দ্ব্যণুক স্বীকার করিয়াছেন। Atoms এর নিত্যতা সম্বন্ধে Encycloppeadia Britanica য় এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে :—

"The formation of the Molecule is therefore an event not belonging to that order of nature under which we live. It is an operation of a kind which is not, so far as we are aware, going on on earth or in the sun or the stars either new or since these bodies began to be formed. It must be refined to the epoch, not of the formation of the earth or of the solar system, but of the establishment of the existing order of nature, and till not only these worlds and systems, but the very order of nature itself is dissolved, we have no reason to expect the occurence of any operation of a similar kind. In the present state of science, therefore, we have strong reasons for believing that in a molecule, or if not in a molecule, is one of its component atoms, we have something which has existed either from eternity or at least from times anterior to the existing order of nature."

Atoms.

বৈশেষিক-মতে চার প্রকার পরমাণুর অস্তিত্ব স্বীকার করা হইয়াছে, যথা পৃথিবী-পরমাণু, জলপরমাণু, তেজঃপরমাণু এবং বায়ুপরমাণু। * ক্ষিতি, অপ, বায়ু, তেজ ও আকাশ এই পাঁচটি দ্রব্যের সাধারণ সংজ্ঞা 'ভূত'। বৈশেষিক-মতে 'ভূতের' লক্ষণ

(definition) এই প্রকার—যাহাতে বহিরিন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিশেষগুণ থাকে তাহাকেই 'ভূত' বলা যায়। পৃথিবীর গন্ধ, জলের রস, তেজের রূপ, বায়ুর স্পর্শ ও আকাশের শব্দ বিশেষ বিশেষ গুণ। এই সকল গুণ গুলি বহিরিন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বলিয়া পৃথিবী, অপ্ তেজ, বায়ু ও আকাশ 'ভূত' বলিয়া কথিত হইয়াছে। প্রাচ্য বৈজ্ঞানিক ঋষিগণ এই প্রকারে 'ভূত' গুলিকে ভাগ করিয়াছেন।

পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ 'ভূত' সকলকে সত্তর ভাগে ভাগ করিয়াছেন। তাঁহাদের 'ভূতের' লক্ষণ এই প্রকার,—কোন প্রকার প্রক্রিয়া অনুসারেও যে সকল পদার্থের বিশ্লেষণ হয় না, তাহাদিগকে পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকেরা 'ভূত' বলিয়াছেন। তাঁহাদের মতে অবিশ্লেষণীয় পদার্থকেই ভূত বলে। কিন্তু 'ভূত' বা মৌলিক পদার্থ সম্বন্ধে পাশ্চাত্যদের এই প্রকার লক্ষণ যে সঠিক নহে, তাহা পাশ্চাত্যেরা বুঝিতে পারিতেছেন। কিছু দিন পূর্ব্বে পাশ্চত্যেরা Radium ও Hillium নামক দুইটী মৌলিক পদার্থ আবিষ্কার করিয়াছিলেন। কিন্তু পরে দেখা গেল যে, Hillium, Radiumএ পরিণত হইয়া গিয়াছে। বিলাতের Lancet নামক পত্রিকা বলিয়ছেন যে, "The discovery of radium has introduced the doctrine of degradation and with it the suggestion that stability can only be a relative term.

অবিশ্লেষণীয় পদার্থকেই উহারা 'ভূত' বা মৌলিক পদার্থ আখ্যা প্রদান করিতেন। অবিশ্লেষণীয় পদার্থ তাঁহাদের মতে নিত্য (stable) পদার্থ। কিন্তু এখন তাঁহাদের সে ধারণা দূর হইয়াছে। বিজ্ঞানের উন্নতি ক্রমে তাঁহাদের অবিভাজ্য ৭০টী মূল পদার্থ যে পরে বিভাজ্য হইয়া আরও অল্পসংখ্যক পদার্থে পরিণত হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি আছে?

পরমাণু সম্বন্ধে কণাদের বিভাগ প্রাকৃতিক এবং ব্যবহারিক। পাশ্চাত্য মতে লৌহ, রজত, সুবর্ণ, রাঙ, সীসা, তাম্র প্রভৃতি কঠিন পদার্থগুলি এক একটি মূল পদার্থ; কিন্তু কণাদের মতে ঐ কঠিন পদার্থগুলি এক শ্রেণীর অন্তর্গত উহারা পৃথিবীর অন্তর্গত। ঐ প্রকার অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন প্রভৃতি বায়বীয় পদার্থগুলি এক একটি মূল পদার্থ বলিয়া পাশ্চাত্যেরা উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু কণাদের মতে উহারা বায়ু পদার্থের অন্তর্গত। জলীয় পারাকে কণাদ অপ্ পদার্থের অন্তর্গত করিয়াছেন। সুতরাং কণাদের বিভাগগুলি প্রাকৃতিক বিভাগ। এ বিভাগের আর পরিবর্ত্তন হইবে না; কিন্তু পাশ্চাত্যদের বিভাগ অনুযায়ী 'ভূত' গুলি যে নিত্য (stable) নহে তাহা বৈজ্ঞানিকেরা বুঝিতে পারিতেছেন।

কিন্তু আমাদের জিজ্ঞাস্য যে পাশ্চাত্যরা কি পদার্থ সকলের প্রাকৃতিক বিভাগ করেন নাই? তাঁহারাও ত পদার্থ সকলের solid, liquid ও gaseous অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন। এবং আধুনিক কালে radiant matter ও etherএর সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। সুতরাং পদার্থের এই পাঁচ প্রকার বিভাগ যে কণাদ-মত-সম্মত নহে তাহা কে বলিতে পারে?

পাশ্চাত্যগণ যাহাতে কঠিন, ঘন, দৃঢ় প্রভৃতি গুণ আছে তাহাকেই solid বলিয়াছেন। বৈশেষিকদেরও মতে কঠিন স্পর্শ ক্ষিতি ভিন্ন অপর পদার্থের ধর্ম্ম নহে। পাশ্চাত্যদের Liquid চলনশীল, তরল ও দ্রব; বৈশেষিকদের অপ্ পদার্থও ঐ প্রকারের। পাশ্চাত্যদের Gas তির্য্যক গমনশীল কণাদের বায়ু পদার্থও তির্য্যক

গমনশীল। পাশ্চাত্যদের radiant matter এর সহিত বৈশেষিকের তেজ পদার্থের এবং পাশ্চাত্যদের ইথরের সহিত বৈশেষিকের আকাশ পদার্থের অনেকটা মিল দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং পাশ্চাত্যরাও যে প্রাকৃতিক বিভাগ মানিয়াছেন তাহা বুঝিতে পারা গেল। ভূত সম্বন্ধে প্রাকৃতিক বিভাগ যে পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক বিভাগ অপেক্ষাও যুক্তিসঙ্গত তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম। এখন বৈশেষিকোক্ত পঞ্চভূতের কথা শুনিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করা উচিত কি না তাহা সুধীগণের বিবেচ্য। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক মতে যত প্রকার 'ভূত' বা অবিভাজ্য পদার্থ হউক না কেন উহারা কণাদের অভিপ্রেত পঞ্চভূতের অন্তর্গত।

বৈশেষিকেরা বলেন যে, দ্বাণুক হইতে আরম্ভ করিয়া ঘটাদি পর্য্যন্ত সমস্ত সাবয়ব দ্রব্যের পরস্পর ভেদ স্ব স্ব অবয়ব ভেদ দ্বারা সিদ্ধ হয়। কিন্তু নিরবয়ব এক জাতীয় পরমাণুদ্বয় পরস্পর ভিন্ন কিসে? যে ধর্ম্মদ্বারা তাহাদের পরস্পর ভেদ সিদ্ধ হয়, তাহাই বিশেষ। মুদ্গ ও মাষের যথাক্রমে আরম্ভক মুদ্গ পরমাণু ও মাষ পরমাণু অবশ্যই ভিন্ন ভিন্ন। বৈশেষিকেরা বলেন যে মুদ্গের আরম্ভক পরমাণু ও মাষের আরম্ভক পরমাণু সমানরূপ হইলেও উভয় পরমাণুতে ভিন্ন ভিন্ন অসাধারণ ধর্ম্ম আছে। সেই অসাধারণ ধর্ম্মই বিশেষ পদার্থ। বিশেষ পদার্থ সাবয়ব দ্রব্যবৃত্তি নহে। উহা নিরবয়ব দ্রব্যবৃত্তি মাত্র। কতগুলি পরমাণু মুদ্গমাত্রের আরম্ভক বলিয়া মাষে থাকে না এবং কতকগুলি পরমাণু মাষমাত্রের আরম্ভক বলিয়া মুদ্গে থাকে না। আবার কতকগুলি পরমাণু মুদ্গ ও মাষ উভয়েরই আরম্ভক, উহারা মুদ্গ ও মাষ উভয়েই থাকে। এই জন্য মুদ্গ ও মাষ সমান হইলেও সমান আকার।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে বৈশেষিক মতে যাহাতে বহিরিন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিশেষ গুণ থাকে, তাহাকেই ভূত বলে। পৃথিবীর গন্ধ, জলের রস, তেজের রূপ, বায়ুর স্পর্শ ও আকাশের শব্দ বিশেষ বিশেষ গুণ। প্রাচ্য বৈজ্ঞানিকদের মতে শব্দ আকাশের ধর্ম্ম। কিন্তু পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকেরা বলেন যে, শব্দ বায়ুর ধর্ম্ম, বায়ুতেই শব্দ উৎপন্ন হয়, সুতরাং শব্দের জন্য আকাশ স্বীকার করিবার কোন যুক্তি নাই। এই প্রকার সন্দেহের দূরীকরণার্থ সিদ্ধান্তমুক্তাবলীতে বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন বলিয়াছেন যে,—"ন চ বায়বয়বেষু সূক্ষ্মশব্দক্রমেণ বায়ৌ কারণগুণপূর্ব্বকঃ শব্দ উৎপাদ্যতামিতি বাচ্যং অথাবৎ দ্রব্যভাবিত্বেন বায়োর্বিশেষ গুণত্বাভাবৎ"। প্রথমতঃ বায়ুর অবয়বে সূক্ষ্ম শব্দ উৎপন্ন হয়, পরে সেই শব্দ হইতে স্থূল বায়ুতে স্থূল শব্দ উৎপন্ন হয়—এইরূপ বলা যাইতে পারে না, যেহেতু আশ্রয় নাশ, যাহার নাশের কারণ নয়, তাহা বায়ুর বিশেষ গুণ হইতে পারে না। আশ্রয় বিদ্যমান থাকিলেও যখন শব্দের বিনাশ অনুভূত হয়, তখন আশ্রয় নাশকে শব্দ নাশের কারণ বলা কোনমতেই সম্মত হইতে পারে না এক মাত্র শব্দই আকাশ সিদ্ধির হেতু। *

* "শব্দের আশ্রয় দ্রব্যের নাম আকাশ। শব্দের অবশ্যই একটী অধিকরণ বা আশ্রয় আছে, তাহাই আকাশ। শব্দের উৎপত্তির জন্য বায়ুর অপেক্ষা থাকিলেও বায়ু আশ্রয় নহে। কারণ বায়ুর একটী বিশেষগুণ স্পর্শ। তাহা যাবদ্দ্রব্যভাবী অর্থাৎ বায়ু যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ তাহা স্পর্শগুণও থাকে। শব্দ কিন্তু তেমন নহে। বায়ু থাকিতেও শব্দ নষ্ট হইয়া যায়। বায়ুর বিশেষগুণ স্পর্শের সহিত এইরূপ বৈলক্ষণ্য থাকায় শব্দ বায়ুর বিশেষ গুণ নহে। শব্দ বায়ুর বিশেষগুণ হইলে স্পর্শের ন্যায় উহাও যাবদ্দ্রব্যভাবী হইত। কোন

আমরা সাংখ্যদর্শনে পরমাণুর উল্লেখ দেখিতে পাই। তাহা হইলে সাংখ্যের পরমাণুও বৈশেষিকের পরমাণু এক কি? ইহার উত্তরে বিজ্ঞানভিক্ষু বলিয়াছেন যে, "বৈশেষিকোক্ত পরমাণবোঽপ্যস্মাভিরভ্যুপগম্যন্তে, তে চাস্মদর্শনেঃ গুণশব্দ বাচ্যাঃ ইত্যেব বিশেষ" —যোগবার্ত্তিক। অর্থাৎ, বৈশেষিক-দর্শনের পরমাণুও আমরা স্বীকার করি, তবে আমাদের দর্শনে উহা 'গুণ'-পদবাচ্য এই মাত্র বিশেষ। সুতরাং পাতঞ্জল-দর্শনের পরমাণু ও বৈশেষিকের পরমাণু এক পদার্থ নহে। বিজ্ঞানভিক্ষু বলিয়াছেন যে, "অয়ং চ পরমাণুর্বৈশেষিকৈস্ত্রসরেণু শব্দে নোচ্যতে। অস্মাভিশ্চ প্রত্যক্ষপৃথিব্যাঃ পরমসূক্ষ্মত্বাৎ পৃথিবী পরমাণুরিতি"—যোগবার্ত্তিক। অর্থাৎ, বৈশেষিকদর্শনে ত্রসরেণু শব্দ দ্বারা যৎপদার্থ লক্ষিত হইয়াছে, আমরা তাহাকেই পরমাণু বলিয়াছি। ∴ সুতরাং বৈশেষিকের পরমাণু নিত্য পদার্থ কিন্তু সাংখ্যাদির পরমাণু অনিত্য।

বৈশেষিক-মতে পৃথিবী ভিন্ন ভূত সকল শরীরে উপাদান নহে, তবে পৃথিবী ভিন্ন ভূতচতুষ্টয়ের শরীরোৎপত্তিতে নিমিত্তত্ব আছে। পার্থিব শরীর গঠনে জলীয়, তৈজস ও বায়বীয় অণু সমূহেরও যে পার্থিব অণু সকলের সহিত সংযুক্ত হয় ইহারা তাহা স্বীকার করিয়াছেন। বেদান্ত-মত অন্য প্রকার—বেদান্ত-মতে শরীর পাঞ্চভৌতিক। মহর্ষি কণাদ বলিয়াছেন যে,—"গুণান্তর প্রাদুর্ভাবাচ্চ ন ত্র্যাত্মকম্" (৪.২।৩)—অর্থাৎ শরীরে যখন ঘটকাবয়ব দ্রব্যের (components) বিলক্ষণ গুণের প্রাদুর্ভাব হয় না, তখন স্বীকার করিতে হইবে, পার্থিব অণু সমূহই শরীরের উপাদান বা সমবায়ি কারণ এবং অন্যান্য ভৌতিক অণুসমূহ নিমিত্ত কারণ। ন্যায় এবং সাংখ্য এই প্রকারই বলিয়াছেন।

শঙ্কর পরমাণুবাদের দোষ দিয়াছেন যথা, —"যদি কাৎস্নেন সংযুজ্যেত ততঃ প্রথিমাণুপপত্তেরণুমাত্রত্ব প্রসঙ্গঃ। অথৈকদেশেন সংযুজ্যেত তথাপি নিরবয়বত্বাভ্যুপগমব্যারোপঃ—অর্থাৎ, পরমাণুদ্বয়ের যদি সর্ব্বতোভাবে সংযোগ স্বীকার কর, তাহা হইলে দ্ব্যণুকে পৃথুত্বের উৎপত্তি হয় না বলিয়া পূর্ব্ববৎ পরমাণুই থাকিয়া যায়; আর যদি এক দেশ সংযোগ স্বীকার কর, তবে পরমাণুতে যে নিরবয়বত্ব স্বীকার করা হইয়াছে সে সিদ্ধান্তের বিনাশ হয়। সুতরাং বেদান্ত-মতে পরমাণুবাদ অস্বীকৃত।

(ক্রমশঃ)

শ্রীআশুতোষ দেব, এম্ এ।

কোন বৈজ্ঞানিকের মতে নির্ব্বাত প্রদেশেও শব্দ হইতে পারে। সুতরাং শব্দ বায়ুর গুণ নহে। সমস্ত শব্দ আকাশে বিলীন হয় ইহা বিজ্ঞান শাস্ত্রের অনুমত। দার্শনিকেরা বলেন যে পদার্থ যাহাতে বিনাশ হয়, তাহাতেই সেই পদার্থের উৎপত্তি হয়। উপাদান বা সমবায়ি কারণ ভিন্ন অন্যত্র পদার্থের লয় হয় না।"

হিন্দুদর্শন, প্রথমবর্ষ, ১০৮।

'রাজা প্রকৃতিরঞ্জনাৎ।'

উপরে উক্ত মহাবাক্যটীর লক্ষ্য যে মহাপুরুষ; তিনি ও তদীয় ধর্ম্ম ও কর্ম্ম (Duty) অদ্য আমাদিগের প্রস্তাব্য। সম্প্রতি অস্মদ্দেশে উচ্ছৃঙ্খল কয়েকটী লোক রাজপুরুষনির্যাতনে ষড়যন্ত্র করিয়া ভারতের চিরাগত গৌরব খর্ব্ব করিতেছেন এবং আর্য-শাসনের (ভগবদ্গীতাদির) দোহাই দিয়া দেশ মাতাইতেছেন। সেই সনাতন শাস্ত্রে রাজস্বরূপ

নির্ব্বাচনে প্রজা ও রাজধর্ম্ম যাহা নিরূপিত হইয়াছে, তাহাই প্রদর্শনার্থ এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের অবতারণা। অনাদি শাস্ত্রের বিধান ও সমাধান দূরে থাকুক্, ভারতের কাব্য ও নাটকের অধিকাংশে রাজার গুণগীতি মূর্ত্তিমতী হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। এহেন রাজা ভারতের শিক্ষা দীক্ষায় সাজা পাইবার পাত্র নহেন। যাহা কিছু প্রয়াস পাইতেছেন, তাহা কেবল বৈদেশিক বিদ্যা-বিকৃতির ফলে। সর্ব্বপূজ্য প্রাচীনতম ব্যবস্থাবিদ্যার শিরোমণি মানবধর্ম্মশাস্ত্র রাজরূপী কর্ম্ম ও ধর্ম্মবীরের যাদৃশভাবে জগতে অবতারণা করিয়াছেন, তাহাতে দৃষ্টিদান করিলে রাজার অহিতাচরণ দূরে থাকুক্ তদীয় অনিষ্ট চিন্তা প্রজাশরীরে প্রবেশাবসর পাইতে পারে না। আদৌ তাহাই আলোচ্য।

"রাজধর্ম্মান্ প্রবক্ষ্যামি যথাবৃত্তো ভবেন্নৃপঃ।
সম্ভবশ্চ যথা তস্য সিদ্ধিশ্চ পরমা যথা॥ ১।
ব্রাহ্মং প্রাপ্তেন সংস্কারং ক্ষত্রিয়েন যথাবিধি।
সর্ব্বস্যাস্য যথান্যায়ং কর্ত্তব্যং পরিরক্ষণম্॥ ২।
অরাজকে হি লোকেঽস্মিন্ সর্ব্বতো বিদ্রুতে ভয়াৎ।
রক্ষার্থমস্য সর্ব্বস্য রাজানমসৃজৎ প্রভুঃ॥ ৩।
————যস্মাদেষাং সুরেন্দ্রানাং মাত্রাভ্যো নির্ম্মিতো নৃপঃ।
তস্মাদভিভবত্যেষ সর্ব্বভূতানি তেজসা॥ ৫।
সোঽগ্নির্ভবতিবায়ুশ্চ সোঽর্কঃ সোমঃ স ধর্ম্মরাট্।
স কুবেরঃ স বরুণঃ স মহেন্দ্রঃ প্রভাবতঃ॥ ৫।
৭ম অধ্যাঃ, মনু।

দেশের জনসাধারণের ধারণা দেখা যায় যে, শাস্ত্রে "রাজা" ক্ষত্রিয়কেই বলিয়াছেন, ক্ষত্রিয় ব্যতীত শক্তিসম্পন্ন শাসক (নিগ্রহানুগ্রহক্ষমব্যক্তি) পুরুষ বাস্তবিক রাজপদবাচ্য নহে; তিনি ফরাসি দেশাদির President এর ন্যায় লৌকিক রাজা; পরলৌকিক নহেন। সুতরাং তাঁহার রোষ তোষ ও ইষ্টানিষ্টাচরণের এই জগতে পর্য্যাপ্তি; লোকান্তরে নহে। বস্তুতঃ তাহা নহে। যিনি সন্ধি প্রভৃতি ষড়্গুণের পরিচালক ও ন্যায়ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালক, সেই দণ্ডধারী বলি (করাদি) হারা যে কোন জাতীয় ব্যক্তিই আর্য্যশাস্ত্রের রাজা এবং দেবাধিদেবের ন্যায় পূজ্য, তাঁহার অপ্রিয় ও অকার্য্য করিলে ইহ ও পরলোকে (ভগবদ্‌বিচারে) দণ্ডনীয়।

এক্ষণ দেখা যাউক, শাস্ত্রার্থ কি? মনু-সংহিতার ৭ম অধ্যায়ের উপরে উক্ত ১ম শ্লোকে "রাজধর্ম্মান্ প্রবক্ষ্যামি" ইত্যাদির ব্যাখ্যায় প্রামাণিক টীকাকার কুল্লূকভট্ট বলেন—"ধর্ম্মশব্দোঽত্র দৃষ্টাদৃষ্টার্থানুষ্ঠেয়পরঃ ষাড়্গুণ্যাদেরপি বক্ষ্যমাণত্বাৎ রাজশব্দোঽপিনাত্র ক্ষত্রিয়জাতি বচনঃ কিন্তু অভিষিক্তজনপদপুরপালয়িতৃপুরুষবচনঃ। অতএবাহ যথাবৃত্তোভবেন্নৃপ ইতি।"

সারার্থ—ধর্ম্মশব্দার্থ—কেবল পারলৌকিকফলপ্রদ পুণ্য নহে, আচরণীয় কর্ম্মও (Duty) বটে। রাজশব্দ কেবল ক্ষত্রিয় নহে, কিন্তু অভিষিক্ত রাষ্ট্র ও দুর্গাদি ও প্রজা পরিরক্ষক পুরুষ বটে। ৭ম অধ্যায়ের ২য় শ্লোকস্থ—'ক্ষত্রিয়েন যথাবিধি' ইত্যাদির ব্যাখ্যায় ক্ষত্রিয়রাজ মুখ্য, অপর জাতীয় রাজা গৌণ ইহা ব্যক্ত করিয়াছেন। স্মৃত্যন্তরের প্রমাণ দ্বারা তাহা সমর্থন করিয়াছেন। সুতরাং তাদৃশ গুণসম্পন্ন বর্ণধর্ম্মনির্ব্বিশেষে ভারতের রাজপদবাচ্য, তিনি দেবাধিদেববৎ মান্য, এ বিষয়ে কোন বৈষম্য নাই। এক্ষণে সে রাজা কি, তাহাই নির্ণেয়।

অরাজক দেশ দস্যুদুর্জ্জনাদির দ্বারা অত্যাচরিত হয়, এজন্য সমস্ত চরাচর রক্ষার জন্য বিধাতার রাজা সৃষ্টি। সেই রাজা স্বীয় প্রভাব বলে অনল, অনিল, তপন, চন্দ্র,

যম, কুবের, বরুণ ও মহেন্দ্ররূপে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া তেজঃপুঞ্জ প্রসারে সর্ব্ব প্রাণিগণকে অভিভূত করিয়া বিরাজমান। ইহা কি রাজার গুণগীতি বা স্তুতিবাদ না স্বরূপোক্তি? বাস্তবিক স্বরূপাখ্যান। যিনি সর্ব্বাতিগশক্তিসম্পন্ন হইয়া ভূমণ্ডলে অশেষ সুখ সম্পত্তির অধিকারী, ইহলোকের পরমেশ্বর ও মুণ্ডদণ্ডের বিধাতা, তাঁহাতে কোন প্রাক্তন অনির্ব্বচনীয়ত্ব না থাকিলে এরূপ হইবে কেন? হিন্দু প্রাক্তনবাদী ও শক্তিতে ভক্তিমান। যেখানে অনন্যসামান্য শক্তি, সেই খানেই দেবত্ব বা ঈশ্বরত্ব। এজন্য পরম পণ্ডিত কালিদাসের উক্তি—"মহীতলস্পর্শনমাত্রভিন্নমৃদ্ধং হি রাজ্যং পদমৈন্দ্রমাহুঃ।" রাজা দ্যুতলেরই ইন্দ্র, কেবল ভূতলস্পর্শ মাত্র বিশেষ, ইহা উক্ত মহাবাক্যের সারার্থ। সেই সেই লোকপালের শক্তি পৃথিবীপতি যে যে প্রকারে প্রয়োগ করিবেন, তাহা মহাত্মা মনু ৯ম অধ্যায়ে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা—

"ইন্দ্রস্যার্কস্য বায়োশ্চ যমস্য বরুণস্য চ।
চন্দ্রস্যাগ্নেঃ প্রাথিব্যাশ্চ তেজোবৃত্তং নৃপশ্চরেৎ॥
বার্ষিকাংশ্চতুরো মাসান্ যথেন্দ্রোঽভিপ্রবর্ষতি।
তথাভিবর্ষেৎ স্বং রাষ্ট্রং কামৈরিন্দ্রব্রতং চরন্॥২
অষ্টৌমাসান্ যথাদিত্যস্তোয়ং হরতি রশ্মিভিঃ।
তথা হরেৎ করং রাষ্ট্রান্নিত্যমর্কব্রতং হি তৎ॥
প্রবিশ্য সর্ব্বভূতানি যথা চরতি মারুতঃ।
তথা চারৈঃ প্রবেষ্টব্যং ব্রতমেতদ্ধি মারুতম্॥৪।
যথা যমঃ প্রিয়দ্বেষ্যৌ প্রাপ্তে কালে নিযচ্ছতি।
তথা রাজ্ঞা নিয়ন্তব্যাঃ প্রজাস্তদ্ধি যমব্রতম্॥৫।
বরুণেন যথা পাশৈর্ব্বদ্ধ এবাভিদৃশ্যতে।
তথা পাপান্নিগৃহ্নীয়াদ্‌ব্রতমেতদ্ধি বারুণম্॥৬।
পরিপূর্ণং যথা চন্দ্রং দৃষ্ট্বা হৃষ্যন্তি মানবাঃ।
তথা প্রকৃতয়ো যস্মিন্ স চান্দ্রব্রতিকো নৃপঃ॥৭
প্রতাপযুক্ত স্তেজস্বী নিত্যং স্যাৎ পাপকর্ম্মসু।
দুষ্টসামন্তহিংস্রশ্চ তদাগ্নেয়ং ব্রতং স্মৃতম্॥৮।
যথা সর্ব্বাণি ভূতানি ধরা ধারয়তে সমম্।
তথা সর্ব্বাণি ভূতানি বিভ্রতঃ পার্থিবং ব্রতম্॥৯।

উপরে উক্ত শ্লোক গুলিতে কুবের-শক্তি পরিপ্রয়োগের উল্লেখ নাই। তাহা বসুন্ধরা ব্যপদেশে বলা হইয়াছে। কুবেরের আধিপত্য বসু বা ধন; তাহা বসুন্ধরাতে নিহিত। পার্থিব শক্তি প্রয়োগ কৌবের ব্রত। ইন্দ্রাদি-শক্তি রাজ ব্যক্তির শরীর-সম্বন্ধ, কিন্তু সুবর্ণরত্নাদি ধন রাজার শরীর-সংযোগী নহে, তাহা ধরা ধারণ করিয়াছেন। এজন্য সুধীগণ বলিয়াছেন,—'যন্নিভিঃ সুষু ব রত্নং ক্ষেত্রৈঃ শস্যং বনৈর্গজান্। দিদেশ চেতনং তস্মৈ রক্ষাসদৃশমেবভূঃ॥

শ্লোকার্থঃ (২) যেরূপ বর্ষাকালে ইন্দ্র চারিমাস অভিবর্ষণ করিয়া পৃথিবীকে শস্য-স্বর্ণ সমৃদ্ধিশালিনী করিয়া সজীব করেন, তদ্রূপ ইন্দ্ররূপী রাজা ইন্দ্রশক্তি প্রয়োগে প্রজাপুঞ্জকে অন্ন, পান, দান মানাদি সৎকারে পরিপুষ্ট ও তুষ্ট করিবেন।

(৩) সূর্য্য যদ্রূপ কিরণমালা দ্বারা অবশিষ্ট আট মাস কাল ধরিত্রীর রস আহরণ করেন, প্রতাপাদিত্য নরেন্দ্র তদ্রূপ ন্যায়-প্রাপ্য কর রাষ্ট্র হইতে আহরণ করিবেন। সেই ন্যায়-নির্দ্দিষ্ট আহৃত কর জনসাধারণের বর। তাহার আদান প্রদান রাজ্যের প্রভূত বিভূতির নিদান। এজন্য লোকজগতের ব্যাপার বৈচিত্র্যদর্শী সরস্বতীসুত কালিদাসের উক্তি—"সহস্রগুণমুৎস্রষ্টুমাদত্তেহি রসং রবিঃ।"

(৪) সমীরণ যেমন অলক্ষিতাকারে সর্ব্ব প্রাণীর মর্ম্ম চর্ম্মে প্রবেশ করত সমস্ত অবস্থাভিজ্ঞ হয়েন, রাজাও চরসমূহ দ্বারা অতর্কিত ভাবে স্বীয় ও পররাষ্ট্রের অভ্যন্তর ভাগে অগ্রসর হইয়া যথাযথ বৃত্তান্ত গ্রহণ করিবেন। বায়ুর অবিকল সার গ্রহণ হইয়া থাকে,—রাজারও Spy বা Detective দ্বারা সত্য বৃত্ত গ্রহণ না [illegible] শক্তি-বৈকল্য ঘটে; তাহা

উভয় পক্ষের অশুভের হেতু।

(৫) যমের নিয়মে যেমন যথাকালে শত্রুমিত্রের তারতম্য নাই, রাজারও নিয়মনে কার্য্যকালে বর্ণ, ধর্ম্ম ও ব্যক্তি বিভেদ থাকিবে না, ইহাই যমব্রত। পূর্ব্বে আর্য্যরাজগণ তাহাই করিয়াছেন (গুরুপদিষ্টে রিপৌসুতেঽপিবা, নিহন্তি দণ্ডেন স ধর্ম্মবিপ্লবম্)।" কার্য্যের গুণদোষানুসারে নিরপেক্ষ-নয়নে রাজার দৃষ্টিদান শিষ্টের পোষক ও দুষ্টের নিয়ামক হয়। মহাকবির মহারাজ-চরিত্র-চিত্রে তাহাই অভিব্যক্তি—"দ্বেষ্যোপি সম্মতঃ শিষ্ট স্তস্যার্ত্তস্যযথৌষধম্। ত্যাজ্যো দুষ্টঃ প্রিয়োপ্যাসী-দঙ্গুলীবোরগক্ষতা।"

(৬) বরুণ যদ্রূপ অপরাধীকে রজ্জুদ্বারা বন্ধন করিয়া লোকচক্ষে শিক্ষা দান দেখান, রাজা তদ্রূপ পাপীদিগকে শাসন-শঙ্কা প্রদর্শনে সংযত করিবেন। ইহার তাৎপর্য্য কেবল বহিঃ-শাসন নহে, আভ্যন্তরিক সংযম প্রয়োগও রাজার কর্ত্তব্য। এজন্য কবিগণ রাজ-শাসন-শক্তি বর্ণনায় বলিয়াছেন—"অকাল চিন্তা সমকালমেব প্রাদুর্ভবং শ্চাপধরঃ পুরস্তাৎ। অন্তঃ শরীরেষ্বপি যঃ প্রজানাং প্রত্যাদিদেশা-বিনয়ং বিনেতা॥"

(৭) যেমন পূর্ণচন্দ্র দর্শনে লোককুল অতুল আনন্দ উপভোগ করে, তদ্রূপ প্রসন্ন নরচন্দ্র ভূপতিকে দেখিয়া প্রজাপুঞ্জ অশেষ আশ্বাস ও বিশ্বাসভাগী হইবে। এজন্য রাজ-চরিত্র-চিত্রে মহাকবির লেখনী-নিঃসৃত নির্য্যাস—"প্রসাদসুমুখে তস্মিন্ চন্দ্রেচ বিশদপ্রভে। তদা চক্ষুষ্মতাং প্রীতিরাসীৎ সমরসাদ্বয়ো"। এবং "প্রসন্ন মুখরাগং তং সম্মত পূর্ব্বাভিভাষিণম্। মূর্ত্তিমন্ত যমন্যস্ত বিশ্বাসমনুজীবিনঃ"। বস্তুতঃ লোক-জগতে যদি কেহ জনসাধারণের আশ্বাস এবং বিশ্বাস-ভূমি থাকেন, তবে সেই রাজাই। মহাত্মা মনুরই উক্তি—

"সরাজা পুরুষোদণ্ড সনেতা শাসিতাচ সঃ। চতুর্ণামাশ্রমানাঞ্চ ধর্ম্মস্য প্রতিভূঃ স্মৃতঃ॥"

পিতা যেমন পুত্রসাধারণের সকল বিষয়ের প্রতিভূ; তদ্রূপ রাজাই প্রজাপুত্রগণের পক্ষে।

৮। অগ্নিশক্তি রাজশরীরে নিহিত; সেই সপ্রতাপ ও সতেজস্ক শক্তির শঙ্কায় পাপিকুল ও দুর্ব্বিনীত এবং অবাধ্য সামন্ত রাজগণ সর্ব্বদা ত্রস্ত ও বিধ্বস্ত হইয়া থাকে।

মনু স্থানান্তরে স্পষ্টই বলিয়াছেন :—

"তস্যার্থে সর্ব্বভূতানাং গোপ্তারং ধর্ম্মমাত্মজম
ব্রহ্মতেজোময়ং দণ্ডমসৃজৎ পূর্ব্বমীশ্বরঃ॥"

এই ধর্ম্ম বা সত্যরূপী দণ্ড ভগবানের অঙ্গ বা শক্তিবিশেষ, তাহা ন্যায়পথে সর্ব্বদা পরি-ভ্রমণ করিতেছে। দুষ্কৃতকারী উক্ত দণ্ডের দম্য। এই দণ্ডের ভয়ে চরাচর ব্যতিব্যস্ত। শ্রুতি বলিতেছেন—

"ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ ভয়াদি-ন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥"

ভগবান্ উক্ত শক্তিসম্পন্ন দণ্ড রাজশরীরে ন্যস্ত করিয়াছেন। দণ্ডের মহিমা মহাত্মা মনু বহুবার উদ্ঘোষণ করিতেছেন—

"দণ্ডঃ শাস্তি প্রজাঃ সর্ব্বা দণ্ডএবাভি রক্ষতি।
দণ্ডঃ সুপ্তেষু জাগর্ত্তি দণ্ডং ধর্ম্মং বিদুর্ব্বুধাঃ॥
সমীক্ষ্য সধৃতঃ সম্যক্ সর্ব্বা রঞ্জয়তি প্রজাঃ।
অসমীক্ষ্য প্রণীতস্তু বিনাশয়তি সর্ব্বতঃ॥
তং রাজা প্রণয়ন সম্যক ত্রিবর্ণেণাভি বর্দ্ধতে।
কামাত্মা বিষমঃ ক্ষুদ্রো দণ্ডেনৈব নিহন্যতে॥

দণ্ডই স্থিতি স্থাপনের মূল; ভ্রমক্রমে সেই দণ্ডের অযথা পরিচালনে রাজাই সাজা পাইবেন। দণ্ডধারী ধর্ম্মবিজয়ী (নধর্মৌ নচ ভূয়সা মৃদুঃ) ও দেবাধিদেবরূপী মহীপতির মহাত্ম্য কীর্ত্তনে মন্বাদি মৌলিক ও পুরাণাদি লৌকিক শাস্ত্র শতমুখ হইয়াছেন। যে দিকে দৃষ্টিদান করি, সেই দিকেই লোক-

জগতের মূল পুরুষ রাজার অলৌকিক গুণ-গীতি। ফলকথা—ভারতের ভক্তি-ভূমির দেবতা বেদবেত্তা শীলবান্ ব্রাহ্মণ এবং শক্তি-জগতের পরম প্রভু স্যায়বান্ প্রজারঞ্জক রাজা, উভয়ই ভক্তিভাজন ও শিক্ষাদায়ক। একের শিক্ষা সৌম্য অপরের শিক্ষা রৌদ্র এই মাত্র প্রভেদ। উভয়ই পিতার ন্যায় মঙ্গলবিধাতা; বিশেষতঃ রাজপক্ষে—"প্রজানাং বিনয়াধাদ্ রক্ষণাদ্ ভরণাদপি। সপিতা পিতরস্তাসাং কেবলং জন্মহেতবঃ।"

রাজা বর্ণ-ধর্ম্ম-বয়ো-নির্ব্বিশেষে দেবতা ইহাই আর্য-শাসন। মনু—"বালোঽপি নাবমন্তব্যো মনুষ্য ইতি ভূমিপঃ। মহতী দেবতাহ্যেষানররূপেণ তিষ্ঠতি॥"

"যস্য প্রসাদে পদ্মাশ্রীর্ব্বিজয়শ্চ পরাক্রমে।
মৃত্যুশ্চ বসতি ক্রোধে সর্ব্বতেজোময়োহি সঃ॥"

হিন্দুর নিত্য কৃত্যের মধ্যে রাজার দর্শন, নমস্কার, পূজা ও প্রদক্ষিণ ইহা ধর্ম্মশাস্ত্রের বিধি।

———"আপোরাজা তথাষ্টমঃ। এতানি সততং পশ্যেৎ নবস্যেদর্চ্চয়েচ্চ যঃ। প্রদক্ষিণঞ্চ কুরুতে তস্যাচায়ুর্নহীয়তে॥"

ধর্ম্মশাস্ত্রের কথা দূরে থাকুক্, আর্যগণের শব্দশাস্ত্রে Regicide (রাজহত্যা) শব্দের তুল্য কোন শব্দের নাম গন্ধ নাই। সুতরাং উক্তরূপ রাজা বা রাজপুরুষ পুণ্যক্ষেত্র ভারতের হিন্দুজাতির মনে প্রাণে অলৌকিকরূপে দেদীপ্যমান। তাঁহার অবশ্যতা নরকের উপকরণ—অনিষ্ট-চিন্তা পৈষাচিকতার পরিচয়—তাহা বাস্তবিক হিন্দুর কল্পনা ও জল্পনার বহির্ভূত। অদ্য সংক্ষেপে রাজস্বরূপ প্রদর্শিত হইল। বারান্তরে রাজধর্ম্ম বক্তব্য।

(ক্রমশঃ)

শ্রীরামচরণ বিদ্যাবিনোদ।

জীবন-সংগ্রাম

অনন্ত সৌন্দর্য্যমণ্ডিত ব্রহ্মাণ্ড,
আনন্দ-কল্লোল তাহার মাঝে।
জীবন্ত নিরাশা কেন গো দাঁড়ায়ে?
বল কি বেদনা হৃদয়ে বাজে?
হতাশ নিশ্বাস—সদা হাহাকার,
উদাসনয়নে পলক নাই!
কি যেন হারায়ে গিয়াছে রতন,
বিশাল ব্রহ্মাণ্ডে অন্বেষ তাই।
বিষাদ নিরাশা জমাট বাঁধিয়া,
ছাইয়ে ফেলেছে হৃদি-গগণ।
আশার চন্দ্রমা গিয়াছে ডুবিয়া,
স্তরে স্তরে ছুটে আঁধার ঘন।
জাল আশাবাতি, আঁধার সরিয়ে,
হউক জীবন পুলকে দীপ্ত।
রবি-কর সম প্রচণ্ড তেজেতে,
উঠ গো জাগিয়ে রয়োনা সুপ্ত।
সম্মুখে বিশাল হের কর্ম্ম ক্ষেত্র,
রয়েছে পড়িয়ে কর্ত্তব্য শত—
তা'সবে ভুলিয়ে নীরব নিশ্চল,
দাঁড়ায়ে রয়েছ পাষাণমত!
ঐশ্বরী শক্তিতে হয়ে বলীয়ান,
আশায় বাঁধিয়ে জীবন, মন।
সাধনার মন্ত্র হৃদয়ে জপিয়ে
সংসার-সংগ্রামে করহ পণ।
এইত সময়—সময় বহিলে,
কবে বা সাধিবে কর্ত্তব্য কাজ?
কেমনে দেখা[illegible]গতে বদন?
পাবে না হৃদয়ে বিষম লাজ?

আর্য্য রক্ত বহে প্রতি ধমনীতে,
আশা, উদ্দীপনা হৃদয়ে কত।
বিষম ভ্রান্তিতে রয়েছ ডুবিয়ে,
উদাস পরাণ বাতুলমত।
আশায় আনন্দে হৃদয় মাতায়ে,
সাধিতে কর্ত্তব্য হইবে রত।
তা না হয়ে হায়! রয়েছ আঁধারে,
দাঁড়ায়ে ভগ্ন নাট্যশালা মত।
মানব জীবন জলবিম্ব সম,
উঠিছে, ডুবিছে, হতেছে লয়।
যশের প্রতিভা রয় চিরদিন,
কালের কবলে কভু না ক্ষয়।
সে যশঃ লভিতে জীবন-সংগ্রামে,
হৃদয়ে বাঁধিয়ে অপূর্ব্ব বল।
নাম কার্য্যক্ষেত্রে অতুল সাহসে
হৃদয়ে ফুটায়ে আশাকমল।

শ্রীমতী সরলাসুন্দরী মিত্র।

সমুদ্রের প্রতি।

হে বারিধি! শত কম্বু উদরে তোমার
ভ্রমিছে তরঙ্গ সনে ভয়শূন্য মনে,
সিংহীর বদনে শির রাখিয়া শাবক
সুখে নিদ্রা যায় যেন, ভীতি ভ্রান্তি নাই।
তব ওই সুবিশাল নীল বক্ষঃস্থলে
থরে থরে তরঙ্গের শ্বেত ফেনমালা
দুলিতেছে বিষ্ণুকণ্ঠে—নিশ্বাস প্রশ্বাসে
দীপ্তিমান শুক্লোজ্জ্বল যেন মুক্তাহার।
হিমাদ্রির তুঙ্গশৃঙ্গে ভ্রূভঙ্গি করিয়া
উঠিছে তরঙ্গমালা বেলা আপ্লাবিতে
ছুটিছে মাতঙ্গ সম শুণ্ড ঊর্দ্ধে করি,
পুনঃ ফিরি লুকাতেছে তোমার ক্রোড়েতে
বিপুল সলিলময় তোমার উরসে
কত চিত্র চিত্রিতেছে নিপুণ ভাস্কর
নিপুণ সহস্র করে। জলধি, জড়ধী,
কি বুঝিবে মহৈশ্বর্য্য কি আছে তোমায়?
ইন্দ্রনীলমণিময় উঠাও প্রাচীর—
মুহূর্ত্তে তরঙ্গভঙ্গে ভাঙ্গিয়া আবার
ছুটাও অসংখ্য স্বচ্ছ মুক্তা রাশি রাশি।
বিপুল বিস্তৃত বক্ষে শত শত
ইন্দ্রনীল, পদ্মরাগ, পুষ্পরাগ মণি
সূর্য্যকান্ত, নীলকান্ত, সহস্র হীরক
অজস্র উথলে মুক্তা মুহূর্ত্তে ফুটিয়া
মুহূর্ত্তে মিশিয়া যায় ধনীরে নেহারি।
অখণ্ড ভূখণ্ড মণ্ডলের মহীপতি
ছিল রাজা যুধিষ্ঠির, ছিল তার কভু
এত রত্নরাশি প্রভু, প্রভূত সম্পৎ?
ব্যোমকেশ মূর্ত্তিব্যোম তোমার দ্বারেতে
ভিক্ষুকের বেশে সদা থাকে অলক্ষিতে।
তব কৃপা-বারিবিন্দু করিয়া গ্রহণ
ক্ষণেকে জলদে সৃষ্টি করি ক্ষণপ্রভা
চমকায়, নীলকায় ইন্দ্রধনু ধরি।
শত শত ইন্দ্রধনু বিজলীর সহ
রজত ধবল সুবিপুল তব দেহে
মুহুর্মুহু ফুটিতেছে, মুহূর্ত্তে মিশিছে।

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

ভারতীমঙ্গল কাব্য।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

পয়ার।

ভদ্রকালী নানা অস্ত্র করে বরিষণ।
দৈত্য নিবারয় তাকে করি প্রাণপণ॥
ইহা দেখি ভগবতী অত্যন্ত কুপিয়া।
নিক্ষেপে অমোঘ অস্ত্র আকর্ণ পূরিয়া॥
তজ্জাতীয় অস্ত্রে দৈত্য নিবারণ করি।
হানয়ে অসংখ্য বাণ সিংহনাদ পূরি॥
শরজাল করি দিনমণি আচ্ছাদিল।
দ্বিতীয় প্রহরে ঘোর অন্ধকার হৈল॥
ভগবতী সংহারিয়া সেই সব বাণ।
হানয়ে দৈত্যের বুকে পূরিয়া সন্ধান॥
যত সব অস্ত্র দেবী করেন প্রহার।
নিবারে আয়ুধে তাহা দানব দুর্ব্বার॥
ধনুর্ব্বেদে সুপণ্ডিত দানবকে জানি।
ইষুশরাসন ভূমে রাখিলা ভবানী॥
হয়াছে অধৈর্য্য কোপ নহে সম্বরণ।
বদন ভ্রুকুটি অতি আরক্তলোচন॥
কোপে কাঁপে তনু ক্ষিতি কম্পে পদভরে।
অতি বেগে চলি গেলা দনুজ-গোচরে॥
ইহা দেখি ধনুর্ব্বাণ রাখি শীঘ্রগতি।
রথ হৈতে নামিলেক শঙ্খ দৈত্যপতি॥
দণ্ডসম ভূমে পড়ে প্রণাম করিয়া।
যোড় করি কহে বাণী গলবস্ত্র হৈয়া॥
দেবের ঈশ্বরী তুমি জগত-জননী।
ক্ষম মম অপরাধ বলি নারায়ণী॥
বিধি বিষ্ণু বিশ্বনাথে তোমাকে না জানে
এ তিনে না বুঝে লীলা কি জানিবে আনে॥
অতি জ্ঞানহীন মূঢ় দিতিসুত আমি।
নিজ গুণে কৃপাকরি ত্রাণ কর তুমি॥
কুপুত্র হইলে রুষ্টা নাহি হয় মাতা।
হেন বাক্য ভগবতী না কর অন্যথা॥
মাতৃ সঙ্গে বাহুযুদ্ধ না হয় যুকতি।
ইহা জানি ক্ষমা কর শুনগো পার্ব্বতী॥
ত্রৈলোক্যতারিণী তুমি দেবী মহামায়া।
আমি হীন ভৃত্যজনে দেহ পদছায়া॥
তুমি কর্ত্তা তুমি হর্ত্তা ত্রিগুণধারিণী।
নিজ দাস জানি যুদ্ধ ক্ষম নারায়ণী॥
বৎসর অয়ণ ঋতু তুমি দিবানিশি।
মাস পক্ষ ঋক্ষ গ্রহ তুমি রবি শশী॥
পাতাল কানন স্বর্গ নদী জল মহী।
দেবতা অসুর নর পতঙ্গম অহি॥
সকল হয়াছে মাতা তোমাতে উৎপত্তি।
তব কোপে নাশ পুন শুন ভগবতী॥
চারি বেদ আগম নিগম শাস্ত্র তন্ত্রে
ধ্যানে নাহি পায় মুনি জপি মহামন্ত্রে॥
তাতে মূর্খ দৈত্য আমি না জানি ভকতি।
পুনঃ পুনঃ করি স্তুতি ক্ষম ভগবতী॥
অত্যন্ত কুপিতচিত্ত না শুনিলা বাণী।
ধায়া যায় দানবকে ধরে নারায়ণী॥
ফেলিলা ভূমিতে বলে দুই হস্তে ধরি।
প্রাণপণে রহে দৈত্য আপনা সম্বরি॥
ধরিয়া চিকুরে শূন্যপথে ভ্রমাইয়া।
ফেলিলা ধরণীপরে সপ্ত পাক দিয়া॥
প্রাণ বাঁচাইয়া দৈত্য তিষ্ঠিলেক পুনি।
দেখি কুপি পুনি তাকে ধরে নারায়ণী॥
চারি হাত পায়ে ধরি মারিল পাছার।
নৈল চূর্ণ দৃঢ় অতি অসুরের হাড়॥
শূন্যপথে পুনরপি অতি দূরে তুলি।
কুপি বলে তথা হতে ভূমে দিলা ফেলি॥
নাহি মৈল শঙ্খচূড় বিষম প্রহারে।
প্রাণ রাখি তিষ্ঠে পুনঃ প্রবল অসুরে॥
অতি কোপযুত মাতা দেখিয়া ইহাকে।
নয়নে নিকলে বহ্নি ঝলকে ঝলকে॥
আরক্ত লোচন দন্তে চাপয় অধর।
ঘন শ্বাস বহে অঙ্গ কাঁপে থর থর॥
কীটোপম দৈত্য আমি জিনিতে না পারি।
বুঝি [illegible]কাজে নাম ধরি মহেশ্বরী॥

ইবলিয়া হস্তে লৈয়া দিবা শরাসনে।
সন্ধান পুরিলা মাতা পাশুপৎ বাণে॥
সপ্তসিন্ধু কম্পবান সহিতে মেদিনী।
ইহা জানি অন্তরীক্ষে কহে অজযোনি॥
শুন মাতা নারায়ণী বচন আমার।
এই দিতিসুত বধ্য না হয় তোমার॥
কোপ ক্ষম নারায়ণী শুনহ বচন।
সম্বর অমোঘ ইষু ত্যজ শরাসন॥
ব্রহ্মার এমত বাণী শুনি ভদ্রকালী।
আয়ুধ কার্ম্মুক দিলা ভূমি পরে ফেলি॥
দেখে ষড়ানন আছে পড়ি রণস্থলে।
স্নেহক্রমে মহেশ্বরী তুলি নিলা কোলে॥
মৃত সম আছে বীর নাহিক সম্বিত।
দেখি ভদ্রকালী মনে হইলা বিস্মিত॥
অপত্যের স্নেহে ব্যস্ত হৈয়া ভগবতী।
কার্ত্তিককে লৈয়া গেলা যথা পশুপতি॥
শুন মাতা সরস্বতী মোর নিবেদন।
পুর মনস্কাম বর মাগিছে চরণ॥
কুলেতে বারেন্দ্র মোরা শ্রোত্রিয়ত বটি।
আছয়ে আশ্রয় মোর ত্রিবেণীর পটী॥
দ্বিজ রাজসিংহ নাম ভূপতি অনুজে।
নূতন সঙ্গীত ভণে বাণী পদাম্বুজে॥

ত্রিপদী।

ষড়াননে কোলে করি লৈয়া গেলা মহেশ্বরী
যথা বসিয়াছে পঞ্চানন॥
মৃত সম ভূমি পরে, থৈলা শিব সগোচরে,
অন্তরে তাপিত অনুক্ষণ॥
বলে বাণী নারায়ণী, শুন প্রভু শূলপাণি,
কার্ত্তিকের হইল বিনাশ।
যেইরূপে ষড়ানন, রক্ষা পায় এইক্ষণ,
সেই কর্ম্ম কর কৃত্তিবাস॥
ইহা শুনি ত্রিপুরারি, যৎকিঞ্চিৎ হাস্য করি,
বলিলেন ভদ্রকালী স্থানে।
শুনহ বচন মোর, না মরিবে শক্তিধর,
হেন কথা না ভাবিও মনে॥
এত বাক্য বলি পরে, বৃষ হৈতে নামি হরে,
কার্ত্তিকের শিরে দিলা হাত।
করিয়া বিশেষ ধ্যান, মুদিলেন ত্রিনয়ন,
মহামন্ত্র জপে বিশ্বনাথ॥
মহেশের মন্ত্র চোটে; মোহ ভাঙ্গি গুহ উঠে,
দেখি তুষ্টা হৈলা ভগবতী।
যতেক দেবতাগণ, সবে আনন্দিত মন,
হর হর্ষ হইলেন অতি॥
আসি দেবগণে বলে, মহেশের পদতলে,
তুমি বিনা গতি নাই আর।
শুন প্রভু পঞ্চানন, তুমি যায়া কর রণ,
শঙ্খ সিন্ধু হতে কর পার॥
কার্ত্তিকেয় যার সাথে, হারিলেন সমরেতে,
অন্যে তাকে কি করিতে পারে।
দেবতার উপকার, কে আর করিবে আর,
কর প্রভু যেন মনে ধরে॥
নির্জ্জরের হেন বাণী, শুনি কহে শূলপাণি,
এই আমি চলিলাম রণে।
শঙ্খচূড় হবে নাশ, পূর্ণ হবে অভিলাস,
সন্দ কিছু না ভাবিও মনে॥
ইহা বলি মহেশ্বর, চড়িয়া বৃষভোপর,
উজ্জ্বল ত্রিশূল লয়া করে।
অতি কোপে মহেশ্বরে, ঘন ঘন শিঙ্গাপূরে
গেলা তূর্ণ দানব গোচরে॥
শিবকে সম্মুখে দেখি, সারথিকে দৈত্য ডাকি
বলিলেন রাখহ স্যন্দন।
এত বলি রথ হৈতে, ভূমে নামি আস্তেব্যস্তে,
পদব্রজে করিল গমন॥
আইল যথা মহেশ্বর, যুড়িয়া উভয় কর,
দণ্ড সম পড়িল ভূমিতে।
শঙ্করকে প্রণমিয়া, তিষ্ঠে গলবস্ত্র হৈয়া,
নম্র হৈয়া হরের সাক্ষাতে॥
বলি বাণী শুন হর, কাকুতি বচন মোর,
আসিয়াছ যুদ্ধ ইচ্ছা করি।
দেবের দেবতা তুমি, অধম দানব আমি,
যুদ্ধ ক্ষমা কর ত্রিপুরারি॥
মোর প্রতি হৈয়া বক্র, সমরে রাখিলা শক্র,

অতি বড় হৈল অনুচিত।
তোমার সকল সৃষ্টি, সকলেতে সমদৃষ্টি,
হেন চাহি কর্ত্তার চরিত ॥
শিব বলে দিতিসুত, বাক্য বল অদভুত,
পূর্ব্বে মোর না রাখিলে বাণী।
দেবতার ধনজন, নাহি দিলা কি কারণ,
হেন কার্য্য কৈলা কিবা জানি ॥
সে কথা এমন আর, কৈলে কিবা উপকার,
রথে যায়া চড় শীঘ্রগতি।
নিস্কর্ব সমর হবে, বুঝি পরে অনুভবে,
রথে তূর্ণ চড়ে দৈত্যপতি ॥
ভারতী চরণোপরে, ভণে মুখ ধরাময়ে,
রাজসিংহ অভিধান তার।
বলি আমি এই বাণী, মোকে নিজ দাস জানি
তনু অন্তে করিবা উদ্ধার ॥

পয়ার।

নিশ্চয় হইবে রণ জানি শঙ্খাসুরে।
অতি তূর্ণ চড়ে যায়া রথের উপরে ॥
বৃষভেতে চড়ি হর হৈলা আগুসার।
পিণাক ত্রিশূল হাতে বলে মারমার ॥
শঙ্খচূড়ে শিব কাছে আনিল স্যন্দন।
দেখি অতি কুপিত হইলা ত্রিলোচন ॥
প্রথমে প্রমথপতি পঞ্চ প্রহরণে।
আকর্ণ পূরিয়া কুপি দৈত্য হৃদে হানে ॥
দণ্ডবৎ করি দৈত্য দিব্য দুই শরে।
মহেশের চরণেতে হানিল নির্ভরে ॥
নব বাণে শঙ্করের বক্ষেতে হানিয়া।
বৃষভকে দশে হানে অতি মর্ম্ম চাইয়া ॥
সিংহনাদ করি হানে নাহি অবসর।
মহেশের তনু দৈত্য করিল জর্জ্জর ॥
হাস্ত করি মহাদেব পূরিয়া সন্ধান।
দানবের অস্ত্র কাটি করে খান খান ॥
অতি তীক্ষ্ণ বাণ দিল বিশিষ্ট বেলকে।
হানিল মহেশ পুন দনুজের বুকে ॥
উত্তম নারাচে চাপ বিনাশি তাহার।
হৃদে সপ্তদশ শরে হানে পুনর্ব্বার ॥
অন্তরে পশিয়া ইষু প্রবেশে পাতালে।
বাণাঘাতে শঙ্খচূড় কোপে অগ্নিজ্বলে ॥
পঞ্চশত ইষু নিক্ষেপিল একেবারে।
অনায়াসে অম্বরেতে কাটিলা শঙ্করে ॥
বাণব্যর্থ দেখিয়া কুপিত দৈত্যপতি।
অসংখ্য আয়ুধ ক্ষেপে নাহিক বিরতি ॥
অজস্র বরিষে বাণ যেন ধারাধর।
কুপিয়া দানব তেন নিক্ষেপয় শর ॥
মধ্যাহ্ন সময়ে হৈল ঘোর অন্ধকার।
দেখিয়া দেবতা সব করে হাহাকার ॥
বলকে না বুঝি যেন ধরে ভুজঙ্গম।
মরিতে কারণে কেবা ধরে শুখেরম ॥
তেনই দৈত্যের বাণে কুপিয়া শঙ্কর।
কার্ম্মুকে সন্ধান কৈলা দিব্য দুই শর ॥
কনকে রচিত পুঙ্খ আয়ুধ লোহার।
আকর্ণ পূরিয়া হর করিলা প্রহার ॥
দৈত্যরায় মৃতপ্রায় পড়িলেক রথে।
অরুণ দৈত্যের তনু তিতিয়া শোণিতে ॥
চৈতন্য পাইয়া উঠে ধরি শরাসন।
পুনি পূর্ব্বমত শঙ্খ আরম্ভিল রণ ॥
শঙ্করকে শত শরে সন্ধান পূরিয়া।
হানিলেক দৃঢ় করি অতি মর্ম্ম চায়া ॥
মহেশকে হানি হানে সকল দেবেকে।
জর্জ্জর নির্জ্জর সব করিল ক্ষণেকে ॥
অসুরের বাণাগ্নি যে দহে সর্ব্ব অঙ্গ।
রণ ত্যাগি অমরবাহিনী দিল ভঙ্গ ॥
আপনার বিদ্যমানে ভাঙ্গিল বাহিনী।
দেখিয়া লজ্জিত অতি হৈলা শূলপাণি ॥
নববাণ লৈয়া তূর্ণ যুড়ে শরাসনে।
শঙ্খের হৃদয়ে অতি দৃঢ় করি হানে ॥
সংহারে সৈন্ধব শিব শতাঙ্গ সহিতে।
শত শরে শরাসন ছেদে অলক্ষিতে ॥
সারথির মুণ্ড খণ্ড চণ্ড শরে করি।
বিনাশে অসুর সেনা দেব ত্রিপুরারি ॥
শুখান কাননে যেন প্রবেশে অনল।
তেমত বিনাশে হরে দিতিসুত দল ॥

খরস্রোতে নদী হৈয়া চলিল রুধির।
সিতাংশু সমান ভূমে লোটে কত শির॥
পলায়া অসুর সব গেল অতি দূরে।
শঙ্খ শম্ভু দুই মাত্র রহিল সমরে॥
বিরথি হইয়া যুঝে দিতিসুত নাথে।
ইহা দেখি মহেশ হানয়ে কোপচিত্তে॥
পুনর্ব্বার শরাসন কাটিলা শঙ্করে।
শঙ্খকে জর্জ্জর কৈল্লা অতি তীক্ষ্ণশরে॥
মোহ পায়া দৈত্যনাথ পড়িল ভুমেতে।
ইহা দেখি হরে ধনু থৈলা হাত হৈতে॥
কিছু কাল অভ্যন্তরে পাইয়া চেতন।
ধনুক ধরিয়া উঠে দম্ভের নন্দন॥
সারথিয়ে হেনকালে রথ আনি দিল।
লম্ফ দিয়া শঙ্খচূড় সে রথে চড়িল॥
পুনর্ব্বার পূর্ব্বমত আরম্ভিল রণ।
নানাবিধ অস্ত্র দৈত্যে করে বরিষণ॥
ত্রিভুবন চমৎকার সিংহনাদ পূরে।
হরেকে হানিয়া শঙ্খে জর্জ্জরিত করে॥
পঞ্চশত দিব্য অস্ত্র লৈয়া দিতিসুতে।
মহেশের হৃদয়েতে হানিল নির্ঘাতে॥
স্থকিত প্রমথনাথ বাণের প্রহারে।
মুদ্রিত লোচনে রহে ঋষভ উপরে॥
ক্ষণমাত্র ব্যাথা সম্বরিয়া পঞ্চানন।
কোপে বাহু কম্পবান লোহিত লোচন॥
হৈল বিশ্বম্ভর মূর্ত্তি অন্তরে কুপিত।
পদভরে ক্ষিতি কাঁপে পর্ব্বত সহিত॥
বিস্তর তনুনপাৎ উঠয়ে নয়নে।
দশনে অধর চাপে ভ্রুকুটি বদনে॥
সপ্তবাণ শরাসনে যুড়ি মহেশ্বরে।
দৈত্যের ধনুক কাটে মুষ্টির ভিতরে॥
সারথি তুরঙ্গ কাটি পড়ে ধ্বজ দণ্ড।
সোণার স্যন্দন কাটি কৈল খণ্ডখণ্ড॥
ত্রয়োদশ তীক্ষ্ণ অস্ত্র আকর্ণ পূরিয়া।
দনুজের হৃদে হর হানিলা কুপিয়া॥
মোহ পাইয়া দৈত্যরাজ পড়িল ভূমিতে।
ধারা স্রোতে শোণিতে প্রব[illegible] হৈতে॥
ভারতী চরণে করি শত নমস্কার।
দ্বিজ রাজসিংহে ভণে নূতন পয়ার॥

ত্রিপদী।

চৈতন্য পাইয়া, উঠিল গর্জ্জিয়া,
পুন মত্ত দৈত্যনাথ।
আরক্ত লোচনে, চাহে শিবপানে,
কার্ম্মুক ধরিয়া হাত॥
অত্যন্ত দুর্দ্ধর, দনুজ-ঈশ্বর,
ভঙ্গ নাহি তার রণে।
করি প্রাণপণে, যুঝে শিবসনে,
অজস্র আয়ুধ হানে॥
ইহা দেখি হরে, কুপিয়া অন্তরে,
হানয়ে উত্তম শরে।
নাহিক বিশ্রাম, হইছে সংগ্রাম,
জয় ইচ্ছা পরস্পরে॥
ধন্য দিতিসুত, করিল অদ্ভুত,
হেন যুদ্ধ শিব সাথে।
কিবা যোগ্য তার, সমরে ইহার,
তিষ্ঠে হেন ত্রিজগতে॥
এক বর্ষ দিন, দানব প্রবীন,
যুদ্ধ কৈল হর সনে।
দৈত্য বিশ্বনাথ, হৈল সুধা হাত,
দুই ক্ষান্ত হৈলা রণে॥
ইহা জানি হরি, বিপ্ররূপ ধরি,
আসিলা দানব কাছে।
শুক্ল কেশ মাথে, দণ্ড লৈয়া হাতে,
শঙ্খ স্থানে ভিক্ষা যাচে॥
শুন শঙ্খাসুর, থাকি অতি দূর
ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ জাতি।
দৈন্য সিন্ধুপারে, পার কর মোরে,
দান দিয়া দৈত্যপতি॥
বলে দিতিসুতে, আসিছি রণেতে,
এথা কোথা পাব ধন।
শুন দ্বিজবর, জিনিলে সমর,
পূর্ণ হবে তব মন॥

(ক্রমশঃ)

সাহিত্য-সংহিতা।

দ্বাদশ খণ্ড] ১৩১৮ সাল, শ্রাবণ। [৪র্থ সংখ্যা।

গায়ত্রী।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

ঈশ্বরের অসংখ্য নামের মধ্যে ওঁকারই শ্রেষ্ঠ এবং অন্য নাম এই একমাত্র ওঁকার হইতেই জাত। ঈশ্বর যেমন এক, তাঁহার "ওঁ" এই নামটীও এক অক্ষরযুক্ত। ঈশ্বর যেরূপ অব্যয়, "ওঁ" এই শব্দটীও সেইরূপ অব্যয়। জগতে যে কিছু শব্দ আছে তাহা এই "ওঁ"-কার-জাত। ওঁকার হইতেই বেদ উৎপন্ন। বিশ্বের সমগ্র শব্দ মিলিয়া সর্ব্বদা "ওঁ" এই শব্দ উৎপন্ন হইতেছে। মনুষ্য মাত্রেরই এই নাম উচ্চারণ ও স্মরণ করিবার অধিকার আছে, কারণ ঈশ্বর বা তাঁহার নাম কাহারও পৈত্রিক সম্পত্তি নহে; "ঈশ্বর" এই শব্দটী যেমন মানব মাত্রেরই উচ্চারণের অধিকার আছে, ওঁকার উচ্চারণেও তদ্রূপ সর্ব্বসাধারণের সমান অধিকার আছে।

ভূঃ = প্রাণঃ—যিনি সর্ব্বজগতের জীবনের হেতু ও প্রাণ হইতেও প্রিয়।

ভুবঃ = অপানঃ—যিনি মুক্ত ও নিজ সেবক ধর্ম্মাত্মাকে সমস্ত দুঃখ হইতে পৃথক করিয়া সুখে স্থাপন করেন।

স্বঃ = ব্যানঃ—যিনি সর্ব্বজগৎ-ব্যাপক, সকলের নিয়মকর্ত্তা, ও সকলের আধার এবং সুখস্বরূপ।

পদচ্ছেদঃ—তৎ। সবিতুঃ। বরেণ্যম্। ভর্গঃ। দেবস্য। ধীমহি। ধিয়ঃ। যঃ। নঃ। প্রচোদয়াৎ।

অন্বয়ঃ—(হে মনুষ্যাঃ সর্ব্বে বয়ং) যো নো ধিয়ঃ প্রচোদয়াৎ (তস্য) সবিতুর্দেবস্য তৎ বরেণ্যং ভর্গো ধীমহি।

অর্থঃ—হে মনুষ্য আমরা সকলে, (যঃ) যিনি (নঃ) আমাদিগের (ধিয়ঃ) ধারণাবতী বুদ্ধিকে (প্রচোদয়াৎ) উত্তম গুণকর্ম্ম-স্বভাবে প্রেরণ ও অধম হইতে নিবারণ করেন, (তস্য) সেই (সবিতুঃ) সম্পূর্ণ জগতের উৎপাদক ও সকল ঐশ্বর্য্যের স্বামী এবং (দেবস্য) পূর্ণ ঐশ্বর্য্যদাতা প্রকাশমান্ সর্ব্বপ্রকাশক সর্ব্বব্যাপক অন্তর্য্যামীর (তৎ) সেই (বরেণ্যম্) সর্ব্বোত্তম গ্রহণযোগ্য (ভর্গঃ) পাপরূপ দুঃখ মূলনাশক প্রভাব (ধীমহি) ধারণা করি।

সম্পূর্ণ অর্থ—যিনি বিবিধ জগৎ প্রকাশক, জ্ঞানস্বরূপ, সর্ব্বপ্রাপ্ত, সর্ব্বাধার, সর্ব্বব্যাপক, জ্যোতির্ম্ময়, অনন্তগুণবান্, সর্ব্বধাতা, স্বপ্রকাশ, সর্ব্বস্রষ্টা, সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বস্বামী, দয়ালু, জন্মবৃদ্ধি-নাশরহিত, একরস, নিত্য, সর্ব্বজ্ঞ, জ্ঞানদাতা, যিনি সমগ্র সংসারের জীবকুলের জীবন-নিদান,

দুঃখ হইতে পৃথক করিয়া সুখে স্থাপন করেন, যিনি বিশ্বব্যাপী, বিশ্বনিয়ন্তা, বিশ্বাধার, ও সুখস্বরূপ এবং যিনি আমাদিগের বুদ্ধিকে বিশুদ্ধ ও ধারণাবতী করিয়া পবিত্র গুণকর্ম্ম-স্বভাবে প্রেরণ ও অপবিত্র হইতে নিবারণ করেন, আমরা সেই বিশ্বস্রষ্টা, সর্ব্বৈশ্বর্য্যস্বামী, পূর্ণঐশ্বর্য্যদাতা, অন্তর্য্যামী ঈশ্বরের সর্ব্বোত্তম গ্রহণযোগ্য যে পাপরূপ দুঃখের মূলনাশক প্রভাব তাহাই ধারণা করি।

এই গায়ত্রী মন্ত্র প্রতিদিন উপাসনা কালে মনন করা উচিত; একমাত্র গায়ত্রী জপেই সমস্ত ফল লাভ করা যায়। তবে কেবলমাত্র পাখীর মত কণ্ঠস্থ করিলে বিশেষ ফল লাভ হয় না। এই মন্ত্রে ঈশ্বরের যে সকল গুণ কথিত হইয়াছে, নিজকে সেই সকল গুণান্বিত করিলেই গায়ত্রী জপ করা হয় ও তাহার ফল লাভ ঘটে।

ওঙ্কার উচ্চারণ—ব্রাহ্মণঃ প্রণবং কুর্য্যাদাদাবন্তে চ সর্ব্বদা। স্রবত্যনোঙ্কৃতং পূর্ব্বং পরস্তাচ্চ বিশীর্য্যতি ॥ মনু ২অ, ৭৪ শ্লো।

শব্দব্রহ্ম বেদ-মন্ত্র পড়িবার আদি ও অন্তে সর্ব্বদাই "ওঁ" উচ্চারণ করিতে হইবে। কেহ বলেন, গায়ত্রী পাঠের আদিতে মাত্র প্রণব উচ্চার্য্য, তাহা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক; আবার একশ্রেণীর মত যে আদি, মধ্য ও অন্তে ওঁকার উচ্চার্য্য, তাহাও মিথ্যা বলিতে হইবে।

ব্যাহৃতি—ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ। বেদত্রয়ান্নিরদুহদ্ভূর্ভুবঃ স্বরিতীতি চ ॥ মনু ২।৭৬ ॥ ব্রহ্মা ঋক্, যজুঃ ও সামবেদ হইতে যথাক্রমে ঐ ৩টী ব্যাহৃতি সারসংগ্রহ করিয়াছেন।

গায়ত্রী বা সাবিত্রী—ত্রিভ্য এব তু বেদেভ্যঃ পাদং পাদমদূদুহৎ [illegible] তদিত্যৃচোঽস্যাঃ সাবিত্র্যাঃ পরমেষ্ঠী প্রজাপতিঃ ॥ ৭৭ ॥ এতদক্ষরমেতাং চ জপন্ ব্যাহৃতিপূর্ব্বিকাম্। সন্ধ্যয়োর্বেদবিদ্বিপ্রো বেদপুণ্যেন যুজ্যতে ॥৭৮

প্রজাপতি ব্রহ্মা ত্রয়ী বিদ্যার আধার ঋগাদি চারি বেদ হইতে এই সাবিত্রী ঋক্‌টীর এক এক পাদ দোহন করিয়াছেন। যে বেদবিদ্ বিপ্র (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য) এই ওঙ্কাররূপ অক্ষর ও ত্রিপাদযুক্ত গায়ত্রী তিনটী ব্যাহৃতি পূর্ব্বে লাগাইয়া দুই সন্ধ্যায় জপ করেন, তিনি বেদপাঠ-ফল প্রাপ্ত হন।

সহস্রকৃত্বস্ত্বভ্যস্য বহিরেতত্ত্রিকং দ্বিজঃ। মহতোঽপ্যেনসো মাসাত্ত্বচেবাহির্বিমুচ্যতে ॥৭৯ এতয়র্চা বিসংযুক্তঃ কালে চ ক্রিয়য়া স্বয়া। ব্রহ্মক্ষত্রিয়বিড্‌যোনির্গর্হণাং যাতি সাধুষু ॥ ৮০ ॥

অর্থ—দ্বিজঃ (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য) এই ত্রিক অর্থাৎ প্রণব, ব্যাহৃতি, ও ত্রিপাদযুক্ত গায়ত্রী গ্রামের বাহিরে (নদীতীরে বা অরণ্যে) সহস্রবার করিয়া ক্রমাগত এক মাস কাল জপ করিলে মহাপাপ হইতেও ত্রাণ পান; সর্প যেরূপ কঞ্চুকী (খোলস) হইতে পৃথক হয় তদ্রূপ। এই গায়ত্রী জপ-রহিত এবং সায়ং প্রাতে প্রাণায়াম ও অগ্নিহোত্রাদি কার্য্যশূন্য ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যবর্গ সজ্জন মধ্যে নিন্দা প্রাপ্ত হন। ওঙ্কারপূর্ব্বিকাস্তিস্রো মহাব্যাহৃতয়োঽব্যয়াঃ। ত্রিপদা চৈব সাবিত্রী বিজ্ঞেয়ং ব্রহ্মণো মুখম্ ॥ ৮১।২ অ। যোঽধীতেঽহন্যহন্যেতাং ত্রীণিবর্ষাণ্যতন্দ্রিতঃ। স ব্রহ্ম পরমভ্যেতি বায়ুভূতঃ খমূর্ত্তিমান্ ৮২।২ অ, মনু।

ওঙ্কারযুক্ত তিন অবিনাশী মহাব্যাহৃতি ও ত্রিপদা গায়ত্রীকে বেদে মুখস্বরূপ জানিবে ॥ ৮১ ॥ যিনি প্রতি দিন নিরলস হইয়া তিন বর্ষ পর্য্যন্ত ওঁকার ব্যাহৃতি ও গায়ত্রী জপ করেন, তিনি পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন এবং বায়ুর মত অব্যাহতগতি ও শরীর বন্ধনরহিত হইয়া লোকলোকান্তরে ভ্রমণ করিতে সমর্থ হন।

জপেনৈব তু সংসিধ্যেদ্ব্রাহ্মণো নাত্র-সংশয়ঃ ॥ ৮৭ ॥

ব্রাহ্মণ জপদ্বারা সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন।

পূর্ব্বাং সন্ধ্যাং জপংস্তিষ্ঠেৎ সাবিত্রী মার্কদর্শনাৎ।

পশ্চিমাং তু সমাসীনঃ সম্যগৃক্ষ বিভাবনাৎ ॥ ১০১।

পূর্ব্বাং সংধ্যাং জপংস্তিষ্ঠন্নৈশমেনো-ব্যপোহতি।

পশ্চিমাং তু সমাসীনো মলং হন্তি দিবা-কৃতম্ ॥ ১০২ ॥

প্রাতে সূর্য্যদর্শন হওয়া পর্য্যন্ত গায়ত্রী জপ করিবে, এবং সায়ংকালে নক্ষত্রদর্শনা-বধি উপবেশন পূর্ব্বক গায়ত্রী জপ করিবে। প্রাতঃ সন্ধ্যা জপে রাত্রির এবং সায়ংসন্ধ্যা জপে দিবার চিত্তমল দূরীভূত হয়।

নতিষ্ঠ ত তু যঃ পূর্ব্বাং
নোপাস্তে যশ্চ পশ্চিমাম্।
স শূদ্রবদ্বহিষ্কার্য্যঃ
সর্ব্বস্মাদ্ দ্বিজকর্ম্মণঃ ॥ ১০৩।

যে প্রাতঃ সন্ধ্যা ও সায়ংসন্ধ্যা না করে, সে দ্বিজ-কর্ম্ম হইতে সর্ব্বথা শূদ্রবৎ বহিষ্করণের যোগ্য। অর্থাৎ উভয় সন্ধ্যা গায়ত্রী জপাদি না করিলেই শূদ্রত্ব প্রাপ্তি হয়।

অপাং সমীপে নিয়তো
নৈত্যকং বিধিমাস্থিতঃ।
সাবিত্রীমপ্যধীয়ীত
গত্বারণ্যং সমাহিতঃ ॥ ১০৪।২ মনু।

জলাশয় সমীপস্থ বনে একান্তে সংযতচিত্ত হইয়া সন্ধ্যাদি নিত্যকর্ম্ম ও গায়ত্রী জপ করিবে।

নৈত্যকে নাস্ত্যনধ্যায়ো
ব্রহ্মসত্রং হি তৎস্মৃতম্ ॥ ১০৬।

সন্ধ্যাবন্দনা ও গায়ত্রী জপাদি নিত্য কর্ম্মসাধ্য গণ্য বলিয়া, উহাতে অনধ্যায় নাই, কারণ নিত্যকর্ম্মই "ব্রহ্মযজ্ঞ" অর্থাৎ উপাসনা বিষয়ে কালাকাল—শৌচাশৌচ নাই, উহা নিত্যই অনুষ্ঠেয়।

স বিত্রীমাত্র সারোপি
বরং বিপ্র সুযন্ত্রিতঃ।
নাযন্ত্রিতস্ত্রিবেদোঽপি
সর্ব্বাশী সর্ব্ববিক্রয়ী ॥ ১১৮।২ মনু।

গায়ত্রীমাত্রজ্ঞাতা অথচ জিতেন্দ্রিয় হইলে, তিনিই শিষ্ট মধ্যে মান্য হন কিন্তু অনাচারী ত্রিবেদবেত্তা হইলেও সেই অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি কদাপি শিষ্টগণের নিকট সম্মানিত হ'ন না। সর্ব্বাশী—যাহার ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিচার নাই, সর্ব্ববিক্রয়ী যে মাংস, লাক্ষা, লবণাদি বর্ণ-ধর্ম্মের বৈপরীত্য-কারক দ্রব্যাদি বিক্রয় করে।

"তত্রাস্য মাতা সাবিত্রী" ॥ ১৭০।

ব্রহ্মজন্মে অর্থাৎ উপনয়ন ও বেদারম্ভ সংস্কার হইলে সাবিত্রী সেই বালকের মাতৃস্বরূপিনী হয়।

নৈনং গ্রামেঽভিনিম্লোচেৎ,
সূর্য্যো নাভ্যুদিয়াৎ কচিৎ ॥ ২১৯। ২অ।

ব্রহ্মচারী কদাপি যেন গ্রামে থাকিয়া সূর্য্যাস্ত বা সূর্য্যোদয় দর্শন না করে। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই গাত্রোত্থান ও শৌচাদি শেষ করিয়া, গ্রামের বাহিরে একান্তে সন্ধ্যা বন্দনা করিবে। এবং সায়ংকালেও সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে গ্রামের বাহিরে একান্তে উপাসনা করিবে। উহা সূর্য্যোদয় এবং নক্ষত্রোদয়ের সহিত শেষ হইবে।

ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে বুধ্যেত ॥ ৪অ, ৯২।

ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত অর্থাৎ ২ ঘণ্টা রাত্রি থাকিতে নিদ্রা হইতে উঠিবে।

উত্থায়াবশ্যকং কৃত্বা
কৃতশৌচঃ সমাহিতঃ।
পূর্ব্বাং সন্ধ্যাং জপংস্তিষ্ঠেৎ
স্বকালে চাপরাং চিরম্ ॥ ৯৩

গাত্রোত্থান পূর্ব্বক শৌচাদি করিয়া, গ্রামের বহির্ভাগে জলাশয়-নিকটস্থ বনে বা একান্তে পবিত্রভাবে সংযতমনে প্রাতঃসন্ধ্যা বহুক্ষণ পর্য্যন্ত জপাদি করিবে এবং সায়ংসন্ধ্যাও ঐরূপ দীর্ঘকাল ধরিয়া করিবে। কারণ—

ঋষয়ো দীর্ঘসংধ্যাত্বাৎ
দীর্ঘমায়ুরবাপ্নুয়ুঃ।
প্রজ্ঞাং যশশ্চ কীর্ত্তিং চ
ব্রহ্মবর্চসমেব চ ॥ ৯৪ ॥

ঋষিগণ দীর্ঘ সন্ধ্যার অনুষ্ঠানহেতু দীর্ঘ আয়ু, প্রজ্ঞা, যশঃ, কীর্ত্তি, তথা ব্রহ্মতেজও পাইয়াছেন।

প্রচ্ছন্নপাপা জপ্যেন ॥ ৫ অ, ১০৭ ॥

গায়ত্রী জপ দ্বারা গুপ্ত পাপজনিত মানসিক মল দূরীভূত হয়।

যদ্‌গর্হিতেনার্জয়ন্তি
কর্ম্মণাব্রাহ্মণাধনম্।
তস্যোৎসর্গেণ শুদ্ধ্যন্তি
জপেন তপসৈব চ ॥ ১৯৩

জপিত্বা ত্রীনিসাবিত্র্যাঃ
সহস্রাণি সমাহিতঃ।
মাসং গোষ্ঠে পয়ঃ পিত্বা
মুচ্যতেঽসৎপ্রতিগ্রহাৎ ॥ ১৯৪।

যে ব্রাহ্মণ নিন্দিত কর্ম্ম করিয়া (দাসত্বাদি ব্রাহ্মণের অযোগ্য বৃত্তি) ধনোপার্জ্জন করে, সে তাহা পরিত্যাগ ক গায়ত্রী জপ, এবং বেদ-বেদান্তাদি পাঠরূপ ব্রাহ্মণের তপঃ দ্বারা শুদ্ধ হইয়া থাকে। অসৎপ্রতিগ্রাহী একাগ্রচিত্ত হইয়া ৩ হাজার গায়ত্রী জপ পূর্ব্বক গোষ্ঠে একমাস দুগ্ধাহার করিয়া বাস করিলে, পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে।

সাবিত্রীং চ জপেন্নিত্যং
পবিত্রাণি চ শক্তিতঃ ॥ ১১৮। ২২৫ ॥

যথাশক্তি নিত্যই গায়ত্রী ও অন্য পবিত্র [illegible]

তং যেদভ্যুদিয়াৎ সূর্য্যঃ
শয়ানং কামচারতঃ।
নিম্রোচেদ্বাপ্যবিজ্ঞানাৎ
জপন্নুপবসেদ্দিনম্ ॥ ২২০

যদি জ্ঞান পূর্ব্বক শয়ান অবস্থায় সূর্য্যোদয় বা অস্ত হইয়া যায়, তবে সম্পূর্ণ এক দিবাভাগ গায়ত্রী জপ করিয়া উপবাসী থাকিবে।

সূর্য্যেণ হ্যভিনির্মুক্তঃ
শয়ানোঽভ্যুদিতশ্চ যঃ।
প্রায়শ্চিত্তমকুর্ব্বাণো
যুক্তঃ স্যান্মহতৈনসা ॥ ২২১।

যদি কেহ সূর্য্যোদয় ও অস্তকালে শয়ন করিয়া থাকে এবং প্রায়শ্চিত্ত না করে, তবে সে মহাপাপযুক্ত হইয়া থাকে।

আচম্য প্রযতো নিত্যম্
উভে সন্ধ্যে সমাহিতঃ।
শুচৌ দেশে জপঞ্জপ্যম্
উপাসীত যথাবিধিঃ ॥ ২২২।

প্রথাম আচমন করিয়া প্রতিদিন একাগ্রচিত্তে উভয় সন্ধ্যায় যথাবিধি গায়ত্রী জপ করিয়া ঈশ্বর উপাসনা করিবে।

সাবিত্র্যাস্তু পরং নাস্তি" ॥ মনুঃ ২।৮৩ ॥

সাবিত্রী হইতে শ্রেষ্ঠ মন্ত্র আর নাই। ঈশ্বর অপেক্ষা যেমন পর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ কিছুই নাই, এবং বিশ্বই যেমন ঈশ্বরে অবস্থিত, তাহার পর আর বিশ্ব নাই, তিনিই বিশ্বের পরেও স্থিত, এই গায়ত্রী মন্ত্রটীও তদ্রূপ। প্রণব, ব্যাহৃতি ও গায়ত্রী এই তিনটী পরম রমণীয়। যিনি ইহাদের পাইয়াছেন, তাঁহার মত শ্রেষ্ঠ ভাগ্যবান ও তৃপ্ত পুরুষ কেহই নাই। যতই এই গুলির বিষয় চিন্তা করা যায়, মন ততই ভাবময় ও আনন্দরসে আপ্লুত হইতে থাকে।

জপ—বিধিযজ্ঞাজ্জপযজ্ঞো বিশিষ্টো দশভির্গুণৈঃ। উপাংশু স্যাচ্ছতগুণঃ সহস্রো [illegible] ॥ ৮৫ ॥

মাতা পিতৃ আচার্য্য অতিথি-সেবা রূপ যজ্ঞ হইতে ১০ গুণ উত্তম। আর ঐ জপ কার্য্যটী এরূপে সাধিত হইবে যে, তাহা উচ্চারণ করা হইতেছে অথচ কেহ শুনিতে পাইতেছে না, তবে তাহা ১ম শ্রেণীর যজ্ঞ হইতে ১০০ গুণ শ্রেষ্ঠ আর যদি জিহ্বাদির সাহায্যে উচ্চারণ না করিয়া কেবলমাত্র মনে মনে জপ করা হয়, তবে তাহা ১ম শ্রেণীর জপ হইতে (অতিথি-সেবাদি) ১০০০ গুণ শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত হয়; সুতরাং মানস জপই শ্রেষ্ঠতম। অতএব গায়ত্রী মনে মনে জপ করিতে হইবে ও তাহার অর্থ চিন্তা করিতে হইবে। অর্থ না জানিয়া এ মন্ত্রটী জপিলে কোনও সিদ্ধই হইবে না। যেমন "অন্নে ক্ষুধা দূর হয়" কথাটী জানিয়া তাহার অর্থ চিন্তা করিলে অর্থাৎ অন্ন ভক্ষণ করিলে তবে ক্ষুধা দূর হয়, আর সহস্রবার অন্নে ক্ষুধা দূর হয়, অন্নে ক্ষুধা দূর হয় বলিলে ক্ষুধা দূর হয় না, তদ্রূপ গায়ত্রীর অর্থ জ্ঞান হইলে তবে জপ সিদ্ধ হয় নতুবা কণ্ঠস্থ করা নিষ্ফল। শুকাদি পক্ষিকে শিখাইলে তাহারাও গায়ত্রী উচ্চারণ করিতে পারে, তাহার অর্থও কণ্ঠস্থ করিতে পারে, কিন্তু কার্য্যে-প্রয়োগ করিতে পারে না, তদ্দ্বারা কার্য্য সাধন করিতে পারে না, সুতরাং শুকের গায়ত্রী পাঠ নিষ্ফল; সেইরূপ অর্থ ব্যতীত গায়ত্রী স্মরণ নিষ্ফল বলিতে হইবে।

হে পরমপিতা পরমেশ্বর! জগতের কল্যাণ হউক; জীবকুল অজ্ঞান ত্যাগ করিয়া জ্ঞানের পথে চালিত হউক; মিথ্যা ও দুঃখ তাহাদের হইতে পৃথক হইয়া যাক। গায়ত্রী জীবকুলের হৃদয়ধন হউক— জগত গায়ত্রীরসে আপ্লুত হউক।

শ্রীসিদ্ধেশ্বর বাৎস্য বেদার্ণী।

ভাষানুবাদ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

পাঠক! ভাষানুবাদপ্রিয়গণের ভাষানুবাদ-প্রশস্তি শুনিলেন, প্রতিকূলবাদিগণ কি বলেন শুনুন। ভাষানুবাদ-দ্বেষীগণ বলেন, ভাষানুবাদ সম্বন্ধে যে কয়েকটি প্রসংসার কথা বলা হইয়াছে, সব কয়টীই ভ্রান্তের প্রলাপ বা অপরিণামদর্শিতার অমৃত ফল। আর্য্যগণের মতে তাহাই অনিন্দিত ও আশ্রয়ণীয় যাহা বলবৎ অনিষ্টের অননুবন্ধী হইয়া ইষ্ট ফল প্রদান করে। অর্থাৎ যাহার আপাতমধুর ভাবে বিমুগ্ধ হইলে পরিণামে ভয়ঙ্কর অনিষ্টের আশঙ্কা অনিবার্য্য তাদৃশ কার্য্য পরিত্যাগ করা উচিৎ। যেমন শ্যেন-যাগ আপাততঃ শত্রুমারণরূপ ইষ্ট ফল প্রদান করিতে সমর্থ হইলেও পরিণামে প্রাণিহিংসারূপ অনিষ্টের অনুবন্ধী বলিয়া, তাহা প্রশস্ত বা শিষ্টগণের আচরণীয় নহে। সহজ কথায় পাণ্ডুরোগী তাৎকালিক সুখপ্রদ অম্লরস সেবন করিতে একান্ত ইচ্ছুক হইলেও তাহার প্রতি তিন্তিড়াদি ব্যবস্থা কি বিধেয়? কখনই নহে। তদ্রূপ ভাষানুবাদ আপাততঃ উপকারের আভাস মাত্র দর্শাইয়া উন্নতি-মার্গকে কণ্টকাকীর্ণ করিতেছে ও ভয়ানক অনিষ্টের সূত্রপাত করিতেছে বলিয়া একান্ত পরিত্যাজ্য। পূর্ব্বে প্রথা ছিল উপনয়নান্তর ব্রহ্মচর্য্য [illegible]ন করতঃ যাবৎ দ্বাদশ বৎসর গুরুগৃহে বাস করিয়া বেদাধ্যয়ন করিবে, এবং গুরুর নিদেশে গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া

দার গ্রহণ করতঃ গৃহস্থ হইবে। যাঁহারা ভাষানুবাদের দ্বারা কৃতার্থম্মন্য হইয়াছেন, বেদান্ত প্রতিপালন করাত দূরের কথা তাঁহারা ঈদৃশ নির্দেশ নিচয়ে অশ্রদ্ধা করিতে--দোষ দেখাইতে—অসভ্যতা প্রতিপাদন করিতে খুবই উৎসাহিত হন। একেত বেদান্তের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করাই মহাপাপ। অধিকন্তু যথেচ্ছাচারী হইয়া ইহকাল ও পরকাল নষ্ট করিতে অণুমাত্র ভীত নহেন। যে হেতু শ্রীমদ্‌ভাগবৎ গীতায় ভগবান স্বয়ং বলিয়াছেন,—

যো শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামচারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিং॥

মহানুভব ঋষিগণ কর্ত্তৃক যাহা পূর্ব্বে মীমাংসিত হয় নাই, আজ শত সহস্র যত্নেও যে তাহা অণুমাত্র মীমাংসার পথে আরূঢ় হইবে ইহা ভাবাই ভ্রান্তি। তবে যাহা কিছু সম্প্রতি পরিস্কৃত বা নূতন বলিয়া প্রতীতি গোচর হয়, তাহা আর্য্য শাস্ত্রের আমূল আলোচনার অভাব মাত্র। এখনও আমাদের শাস্ত্রীয় গ্রন্থ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিলে, যে সমস্ত সারনিচয় দৃষ্টিপথে আইসে, তাহার শতাংশের একাংশও আধুনিক কেহই আবিষ্কৃত করিতে পারেন নাই বা পারিবেন না। ইহা একান্ত সত্য যে, যাহা ছিল না, তাহা আজও নাই; যাহা নাই, ভবিষ্যতেও তাহা হইবে না। স্বয়ং ভগবান স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন—"না সতো বিদ্যতে ভাবো না ভাবো বিদ্যতে সতঃ।"

মনে করিবেন না যে, আধুনিক বিজ্ঞানের উন্নতি হইয়াছে। দেখাইতে গেলে প্রবন্ধটীর কলেবর বৃদ্ধি হয় তাই বিরত হইলাম। এক কথায় বিজ্ঞান এখনও আমাদের শাস্ত্রান্তর্গত বহুতর বিষয়ের ছায়াস্পর্শ করিতে সমর্থ হয় নাই। তবে যে টু একটী বলিয়া মনে হয়, তাহা যে ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণের অবিদিত ছিল ইহা নহে। আর্য্য ঋষিগণ তত্তৎ বিষয়ের কর্ত্তব্যতা মাত্র প্রকটিত করিতে উদ্যত হইয়া উপকারিতাকে গৌণভাবে রাখিয়া গিয়াছেন। উদ্দেশ্য—পাপাঙ্কুর সকামধর্ম্মের প্রাবল্য দূরীভূত করিয়া, নিষ্কাম ধর্ম্মেরই জয়পতাকা উড্ডীন করা। তবে সংপ্রতি যুগমাহাত্ম্যে পাপ সকাম ধর্ম্মের অনন্ত আধিপত্যে অধঃপাতের পথ পরিস্কৃত হইবে বলিয়া গৌণ পক্ষই মুখ্য ও মুখ্য পক্ষ গৌণ এবং অনাদরণীয় হইতে বসিয়াছে। তাহা না হইলে ইদানীন্তন একজন মাত্র বৈজ্ঞানিক আমেরিকান সাহেবের নিকট গঙ্গাজলের লঘুতা ও পাচকতা ইত্যাদি উপকারের কথা একবার মাত্র শুনিয়া, আমাদিগের নব্য সমাজ তাহার পক্ষপাতে বদ্ধপরিকর হইলেন কেন? আর আবহমান কাল ত্রিকালজ্ঞ আর্য্যঋষিমণ্ডলী যে, এই পবিত্র গঙ্গাজলের পবিত্র স্পর্শে ইহকাল ও পরকাল পবিত্র করিতে ভূরি ভূরি উপদেশ প্রদান করিয়া আসিতেছিলেন, তাহাতেই বা সমাজ সন্দিহান ছিলেন কেন? ফল একই হইল, কেবল গঙ্গাজলের মুখ্য পবিত্রতা দূরে গিয়া গৌণ উপকারিতাই এ ক্ষেত্রে জয়শ্রী লাভ করিল। তাই বলিতেছিলাম, বিজ্ঞান আপাতঃমধুর গৌণ পক্ষকে স্বতন্ত্র ভাবে দেখাইয়া পাপ সকাম ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিতে উদ্যত হইয়াছে। নিষ্কাম ধর্ম্মের একান্ত পক্ষপাতী সেই প্রভু ঋষিগণ অনায়াসে সমস্ত অবগত হইয়া থাকিলেও এ পক্ষকে গৌণ রাখিয়া মুখ্যপক্ষ নিত্যকর্ত্তব্যতাকেই বিশেষরূপে দেখাইয়া গিয়া ছেন। অতএব বুঝিবার দোষে ভাষানুবাদের উপকারাভাসেই অনেকেই মুগ্ধ হইতেছেন। ফলতঃ তাহাতে অনুপকার

যে, পূর্ব্বে নাকি যাঁহারা কিছু জানিতেন তাহা প্রকাশ না করিয়া অনেককে উৎকণ্ঠিত করিতেন। ভাষানুবাদের প্রভাবে আজ তাহা নাই। ইহা সত্য হইলেও পূর্ব্ব প্রথা মন্দ ছিল না। তদ্দ্বারা শাস্ত্রের মর্য্যাদা ছিল, এবং যথাপাত্রেই তাহা অর্পিত হইত। সম্প্রতি আব্রহ্মচণ্ডাল সকলেই বেদে অধিকারী; সকলেই বেদতত্ত্ববিদ্। পারিজাত মঞ্জরীতে আজ একা ইন্দ্রাণীর অধিকার নাই। শুনী, শুকরী, বানরী সকলেরই অধিকৃত হইয়া পদদলিত হইতেছে। বৈজয়ন্তী আজি ভগবানের কণ্ঠচ্যুত হইয়া বানরের হস্তে খণ্ড খণ্ড হইতেছে। ইহাই যদি সদ্বস্তুর সদ্ব্যবহার, তাহা হইলে স্বীকার করিলাম ভাষানুবাদ আমাদের প্রভূত উপকারী। হায়! বলিতেও দুঃখ হয়, বেদের নাম আজ হইয়াছে 'চাষার গান।' শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা হইতে কৃষ্ণ, অর্জ্জুন উঠিয়া গিয়া আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায় জীব ও ব্রহ্ম আর ধৃতরাষ্ট্র ও সঞ্জয় উঠিয়া গিয়া মন ও বুদ্ধি হইলেন। দুর্য্যোধন প্রভৃতি হইলেন আশা। এইরূপ অভিধান ছাড়া অভূতপূর্ব্ব অচিন্তনীয় অর্থের অবতারণা করিয়া ভাষানুবাদ যদি আমাদের উপকার করিয়া থাকে, তাহা হইলে বলিবার কিছুই নাই। তাহা না হইলে ভাষানুবাদ যে, প্রকারান্তরে ভয়ঙ্কর অনিষ্টের সূত্রপাত করিতেছে ইহা কে না বলিবে? অনেকের বিশ্বাস, পূর্ব্বে যাহা আমাদের একটা বিস্মৃতির ভয় ছিল ভাষানুবাদের দ্বারা আজ তাহা নাই। বিস্মৃতির ভয় নাই সত্য, পরন্তু ভাষানুবাদে নিশ্চিন্ত হইয়া মানসিক উন্নতির অনন্ত নিদান সেই গবেষণাই আমাদের উঠিয়া যাইতেছে। ভবিষ্যতে আর যে কোন বিষয় চিন্তাপথে আসিয়া প্রতিভার বিকাশ সাধন করিবে ইহার আশা নাই। বোধ হয় কিছু দিন পরে প্রত্যেক কথাতেই পুস্তক খুলিতে হইবে। পূর্ব্বে কোনও এক বিষয়ের চিন্তা করিতে বসিলে তদানুষঙ্গিক কত বিষয়ই জানিতে সক্ষম হওয়া যাইত। সম্প্রতি ভাষানুবাদে নিশ্চিন্ত হইয়া আমাদের ধীশক্তি এতই সঙ্কুচিত হইয়া গিয়াছে যে, নিগূঢ় বিষয় ভাবা ত দূরের কথা, সামান্য একটী বিধি ব্যবস্থা দিতে হইলে বা যৎসামান্য একটী শব্দার্থ জানিতে হইলে পুস্তকের পাতা না উল্টাইয়া আর রক্ষা নাই। পূর্ব্বে পণ্ডিত্য ছিল অন্তরে, সম্প্রতি পাণ্ডিত্যের নিবাসভূমি পুস্তক। যখন পরহস্তগত ধন ধনই নয়, পুস্তকস্থা বিদ্যা বিদ্যাই নয়, তখন কি করিয়া বলিব যে, ভাষানুবাদের দ্বারা বিদ্যার উন্নতি হইতেছে? পুস্তকের সদ্ভাবে পাণ্ডিত্য— পুস্তকাভাবে মূর্খতা ইহাই হইল ভাষানুবাদের পরিণাম। জানি না ভাষানুবাদের দ্বারা সার নিচয় তাম্রফলকে খোদিত হইতেছে কি জলে মিশিত হইতেছে।

উপসংহারে ইহাই বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, ভাষানুবাদে যাঁহাদের পাণ্ডিত্য, তাঁহারা যদি পণ্ডিত বলিয়া পরিগণিত হন, তাহা হইলে দরিদ্রগণের "ভূমিখাত নিধানেন ধনেন ধনিনো বয়ং" এই উক্তিরই বা দোষ কি? সহৃদয় পাঠকগণের নিকটে উভয় পক্ষের বক্তব্য সমূহ উপস্থাপিত করিলাম, একবার চিন্তরূপ তুলাদণ্ডে ফেলিয়া দেখুন কোন পক্ষ গুরু, ও কোন পক্ষ লঘু হয়। যদি আমাদিগকে মীমাংসা করিতে বলেন, তাহা হইলে আমরা এইমাত্র বলিতে পারি যে—

"স্বগন্তু গুর্ব্বীমতিধেয় সম্পদং
বিশুদ্ধি মুক্তেরপরে বিপশ্চিতঃ॥
ইতিস্থিতায়াং প্রতি পুরুষং রুচৌ
সুদু[illegible] সর্ব্বমনোরমাগিরঃ॥

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র প্রহরাজ।

বরিশালের গ্র ভাষা।

ক্রম	বরিশালের শব্দ	অর্থ
১।	বলান	বাড়ান
২।	এবিলে	এইরকমে বা এই দিকে
৩।	ইসে	ইয়ে
৪।	ঠিকে দেওয়া	বাড়ি দেওয়া বা ঘা দেওয়া
৫।	হাস পায়	হাসি পায়
৬।	খাড়া	আঁকা
৭।	চুকা	টক বা অম্বল
৮।	আছিল	ছিল
৯।	হালা	শালা
১০।	বিছরান	খোঁজ, উটকান বা তল্লাস করা
১১।	একছার	একদম বা বরাবর
১২।	ফিঁকে দেওয়া	ছুঁড়ে দেওয়া
১৩।	কৈ যাও	কোথা যাও
১৪।	অকন	এখন
১৫।	মুল	মূল্য, মাগ্‌গি বা আক্রা
১৬।	হ্যাহেন	হ্যাখেন
১৭।	ডাবায়ে দেওয়া	ডুবায়ে দেওয়া
১৮।	কালিগলান	কালিগেলা
১৯।	ছত্তি ওজন	খাঁটী ওজন
২০।	হঅ, হঃ	হাঁ
২১।	তোগাসাৎ	তোর সঙ্গে
২২।	আগলি	আগের
২৩।	বয়	বসে
২৪।	চুপি দেওয়া	আরি পাজ, গাঁটা দেওয়া
২৫।	দুয়োটা	দুইটা, দুটো
২৬।	নয়া	নূতন, নতুন
২৭।	ঠগা	ঠকা
২৮।	নিচ্চয়	নিশ্চয়
২৯।	চিপা	গলি
৩০।	চিপারাস্তা	ছোট সরু রাস্তা
৩১।	পতন দেওয়া	আড়ি পাতা
৩২।	বসা ছিলাম	বসে ছিলাম
৩৩।	বাঁটা	ভাগ করা
৩৪।	উহাল	বমি করা
৩৫।	বিছানা লাচা	বিছানা করা
৩৬।	লগে	সঙ্গে
৩৭।	বকা দিয়েছে	বকেছে
৩৮।	গেলেছে	গাল দিয়েছে
৩৯।	পিট্টি দেওয়া	মার দেওয়া
৪০।	চোকা	ছুচাল (ধারাল)
৪১।	চাকা	ঢিল
৪২।	চিকির দেওয়া	চ্যাচান (চিৎকার করা
৪৩।	হবি জাবি	যা তা
৪৪।	গরু পালা	গরু পোষা
৪৫।	চাবান	চিবান
৪৬।	হাঁদান	হাঁপান
৪৭।	কণা	কাঁকর
৪৮।	এত্তিবার	এখনি
৪৯।	ঠোশ	ফোস্কা
৫০।	গাবর	বেয়ারা
৫১।	উষ্টা	উছোট বা উচ্ছিষ্ট
৫২।	খোষ্টা	খোঁচা
৫৩।	টোকান	কুড়ান
৫৪।	আছান হয়	সাশ্রয় হয় (অল্পে হয়)
৫৫।	বুড় দেওয়া	জয় করা
৫৬।	আহাল	আকাল
৫৭।	ম্যালামারা	ছুড়ে মারা
৫৮।	হান্দায়ে দেওয়া	ঢুকিয়ে দেওয়া
৫৯।	টাহা	টাকা
৬০	কেনে আঙুল	কড়ে আঙুল
৬১।	ক্যাড়া	ভাড়া
৬২।	কাপড়ের পানা	কাপড়ের প্রস্থ বা পাশ বা ওসার
৬৩।	তস	শিশির
৬৪।	দিয়াসেলাই আজান	দিয়াসেলাই জালান

৬৫। নাচার	গরীব
৬৬। মিস্তি	মুটে ভাড়া
৬৭। লাহক	ঘোর, নেশা বা ভির্ম্মি
৬৮। ম্যালা করা	রওনা হওয়া, যাত্রা করা
৬৯। তালিমালি করা	ছুতা করা
৭০। উৎলা	আঢাকা
৭১। কদু	লাউ
৭২। কাঁকোর	কাঁকরোল
৭৩। বড়ুই (বদরিকা)	কুল
৭৪। জাম্বুরা (জম্বু) বা ছলং	বাতাবী লেবু
৭৫। হাতিয়া	গোঁড়া লেবু
৭৬। পোম্বা	পেঁপে
৭৭। গোইয়া বা সপরি আম	পেয়ারা
৭৮। বকুই বা বুকুই	ডুমুর
৭৯। হুরুম	মুড়ি
৮০। রেখা	চিংড়ি
৮১। হরুয়া	সরিসা
৮২। ফুট	ফুটি
৮৩। নারিকেলের আচা	নারিলের মালা
৮৪। পাতিল	হাঁড়ি
৮৫। গাছা	ডেল্‌কো
৮৬। ডাক	ছোট পাতিল
৮৭। আছারি	বাঁট
৮৮। পিছা—ঝাটা,	বারুণ ইত্যাদি
৮৯। বাতি	প্রদীপ
৯০। সরতা	জাঁতি
৯১। খরি	সরু কাঠ
৯২। চঙ্গ	মৈ
৯৩। কোটা	আংশি, লগা
৯৪। পাহা	পাখা
৯৫। টুনি	কল্কি
৯৬। ঝিংলা	কঞ্চি
৯৭। গাঁড়া	নারিকেলের বাগ্‌রো

৯৮। সাতির	কড়ি বা থাড়া
৯৯। ঝাড়ি	গাড়ু
১০০। তাতুয়া	ঝুড়ি
১০১। ভিটি	পোতা
১০২। পাকের ঘর	রান্না ঘর
১০৩। ফোকা	ছিদ্র, ফুটো
১০৪। খত	গর্ত্ত
১০৫। ছায়াল	ছেলে
১০৬। ছেমরী	
১০৭। ছ্যামরা	
১০৮। পোলাপান	ছোট ছোট ছেলে ও মেয়ে অর্থাৎ পোলাপান
১০৯। ঠাকুর ভাই	বড় দাদা
বেয়াই	ছেলে ও মেয়ের শ্বশুর, ভাইয়ের শ্যালা, বোনের দেবর বা ভাসুর
	শালা
	বর বা ভাতার, কন্যার বর
১১৩। চোট্টা	চোর
১১৪। জায়াল	(স্বামীর ভ্রাতার স্ত্রী) জা
১১৫। ভাস্তা জামাই	ভাইঝি জামাই
১১৬। কোড়াল মাছ	ভেট্‌কি মাছ
১১৭। পোমা বা পোয়া মাছ	ভোলা মাছ
১১৮। চাপ্‌লি মাছ	খয়রা মাছ
১১৯। সাঁচা মাছ	চুনা মাছ
১২০। মিরগি মাছ	মিরগেল মাছ
১২১। শেয়াল	বাঘ
১২২। পাতি শেয়াল	শেয়াল
১২৩। মেকুর	বিড়াল
১২৪। বিলৈই	বিড়াল
১২৫। গুই	গো সাপ
১২৬। উলি	উই
১২৭। টিক্রোস	ছারপোকা

১২৮। বিছা	শুঁয়ো পোকা	১৩৩। মার্ত্তুলা	ত্রিজুত (screw divider)
১২৯। চ্যালা	বিছা	১৩৪। বোর	তুরপুন
১৩০। ত্যালাচোরা	আরশলা, ত্যালাপোকা	১৩৫। র‍্যাত	উকো (file)
১৩১। ডিম সুতা	গুটির বা গুলির সুতা	১৩৬। জিগা গাছ	জিউলি গাছ
১৩২। দসি	সলিতা	১৩৭। কাফলা	জিউলি গাছ

শ্রীএম. সি, ভট্টাচার্য্য।

বৈশেষিক দর্শন

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

(ট) বৈশেষিক সৃষ্টিবাদ।

মহর্ষি কণাদ সৃষ্টি ও লয়ের বর্ণনা সবিশেষ কিছু করেন নাই। কিন্তু প্রশস্তপাদ প্রভৃতি আচার্য্যগণ ইহাদের সবিশেষ বর্ণনা করিয়াছেন। পরমাণুসমূহের পরস্পর সম্মিলন সৃষ্টির এবং উহাদের বিভাগ লয়ের কারণ। প্রশস্তপাদ বলিয়াছেন যে,—

"ব্রাহ্মেণ মানেন বর্ষশতান্তে বর্ত্তমানস্য ব্রহ্মণোঽপবর্গকালে সংসার-খিন্নানাং সর্ব্বপ্রাণিনাং নিশি বিশ্রামার্থং সকলভুবনপতের্মহেশ্বরস্য সংজিহীর্ষা সমকালং শরীরেন্দ্রিয়মহাভূতোপনিবন্ধকানাং সর্ব্বাত্মগতানামদৃষ্টানাং বৃত্তিনিরোধে সতি মহেশ্বরেচ্ছাত্মাণুসংযোগনিবৃত্তৌ তেষমাপরমাণন্তো বিনাশঃ।"

অর্থাৎ ব্রাহ্মমানে শত বৎসরান্তে বর্ত্তমান ব্রহ্মার অপবর্গ বা মুক্তিকালে. সংসারক্লিষ্ট সকল প্রাণিদিগের বিশ্রামার্থ সকল ভুবনপতি পরমেশ্বরের জগৎ সংহারের ইচ্ছা হইয়া থাকে। তদনন্তর স্থূলশরীর, ইন্দ্রিয় ও স্থূলভূতের আরম্ভক সর্ব্বাত্মাতে সমবেত অদৃষ্টের নিরোধ হইয়া থাকে। এই কালে অণুসকলের সংযোগের নিবৃত্তি ও পরমাণু পর্য্যন্ত বিভাগ হয়।

কর্ম্মশেষ হউক আর নাই হউক, রাত্রিকালে সকলেই যেমন নিদ্রিত হয় অর্থাৎ রাত্রি যেমন স্বাভাবিকী বিশ্রামকাল, সেইরূপ প্রলয়কাল স্বাভাবিক বিশ্রামকাল। বৈশেষিক দর্শনের উপদেশ, প্রলয়কালে পরমাণুসমূহ প্রবিভক্ত হইয়া অবস্থান করে। প্রলয়াবসানে প্রাণীদিগের ভোগসম্পাদনের জন্য মহেশ্বরের আবার সৃষ্টি ইচ্ছা হয়। তখন অদৃষ্টের প্রেরণায় প্রথমতঃ বায়ু-পরমাণুতে স্পন্দন উৎপন্ন হয় এবং পরে ক্রমে বায়ু-পরমাণু সমূহের পরস্পর সংযোগে দ্ব্যণুকাদিক্রমে মহান্ বায়ু উৎপন্ন হইয়া আকাশে প্রবাহিত হয়। পরে ঐ প্রকার তৈজস-পরমাণু হইতে বৃহৎ তেজঃ এবং জলীয়-পরমাণু হইতে মহান্ সলিলরাশি উৎপন্ন হয় এবং পার্থিব-পরমাণুর সংযোগে বিপুল পৃথিবীর উৎপত্তি হয়। পরমেশ্বর অতঃপর সকল ভুবন সহিত সর্ব্বলোকপিতামহ চতুর্মুখ ব্রহ্মাকে উৎপাদনপূর্ব্বক প্রজাসৃষ্টি করিতে বিনিয়োগ করেন। সৃষ্ট প্রজাগণের মধ্যে যাহার যেরূপ পূর্ব্বকর্ম্মসংস্কার, তাহাকে তদনুরূপ জ্ঞানাদিই প্রদান করিয়া থাকেন।

নিম্নে বৈশেষিক সৃষ্টিবাদের অনুমান উক্ত হইতেছে। "পৃথিবীতে প্রত্যেক

অবান্তর জীবজাতি পৃথক পৃথক বা বিশেষ জীবজাতি হইতে প্রাকৃতিক নিয়মে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে; কুকুর হইতে কুকুর জন্মলাভ করিয়াছে, ভেক হইতে ভেক উৎপন্ন হইয়াছে, অশ্ব হইতে অশ্ব প্রসূত হইয়াছে, মানুষ হইতে মানুষ আবির্ভূত হইয়াছে। এক জাতীয় জীব যে, অন্য জাতীয় জীব হইতে ক্রমশঃ বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে বৈশেষিক সৃষ্টিবাদ তাহা স্বীকার করেন না।"*

এই স্থলেই প্রাচ্য বৈশেষিক সৃষ্টিবাদের সহিত পাশ্চাত্য ক্রমবিকাশবাদের পার্থক্য লক্ষিত হয়। পাশ্চাত্য ক্রমবিকাশবাদীদের মতে একজাতীয় জীব হইতে নানাজাতীয় জীবের ক্রমশঃ অভিব্যক্তি হইয়াছে; কোন জীবই অন্যান্য সম্বন্ধ নহে, অর্থাৎ কোন জীবই বিশেষতঃ সৃষ্ট হয় নাই। এই মতের বিরুদ্ধে বৈশেষিকগণ বলিয়া থাকেন যে, কুকুর হইতে কুকুর, বানর হইতে বানর, মানুষ হইতে মানুষ জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে ইহাইত আমরা সাধারণ জ্ঞানে জানিতে পারি,—বানর হইতে মানুষের অবতরণ কি কোন ব্যক্তির প্রত্যক্ষীভূত হইয়াছে? ক্রমবিকাশবাদিগণ কি ব্যাঘ্রজাতি হইতে কুকুর জাতি, অথবা সরীসৃপ হইতে শৃগাল ও পক্ষীর অবতরণ ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়াছেন?

শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, কর্ম্মের বিচিত্রতা সৃষ্টিবৈচিত্র্যের হেতু। যখন প্রলয় হয় তখন জীবের কর্ম্মসমূহ সূক্ষ্মাবস্থায় গমন করে, কিন্তু ইহাদের নাশ হয় না, ইহারা অদৃষ্ট বা সংস্কাররূপে বিদ্যমান থাকে। প্রশস্তপাদ বলিয়াছেন যে,—"প্রাণিদিগের অতীত কল্পে কৃত, অন্তঃকরণ সংবেত কর্ম্ম সমূহই ভাবিপ্রপঞ্চের বীজ স্বরূপ। এই সকল কর্ম্মবাসনা যখন ফলোন্মুখ হয়, তখন সর্ব্বকর্ম্মফলপ্রদ, সর্ব্বসাক্ষী, কর্ম্মাধ্যক্ষ পরমেশ্বরের মনে জগৎ সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা হয়।" অতএব পূর্ব্ব কর্ম্মবশতই যে সৃষ্টি-বৈচিত্র্য হয় তাহা বৈশেষিকগণের মত। ছান্দোগ্যোপনিষদে উল্লিখিত হইয়াছে যে,—"ত ইহ ব্যাঘ্রো বা সিংহো বা বৃকো বা বরাহো বা কীটো বা পতঙ্গো বা দংশো বা মশকো বা যদ্যদ্ভবন্তি তদা ভবন্তি"—অর্থাৎ, ইহলোকে জীবগণ যে যে কর্ম্মনিবন্ধন, ব্যাঘ্র, সিংহ, বৃষ, বরাহ, কীট, পতঙ্গ, দংশ, মশক ইত্যাদি যে যে জাতি প্রাপ্ত হয়, সেই সেইরূপ কর্ম্ম-জ্ঞান-বাসনাঙ্কিত হইয়া প্রলয়ের পর পুনঃ সৃষ্টিকালে উহারা তত্তদ্ভাবেই আবির্ভূত হইয়া থাকে। শাস্ত্রোক্ত বৈশেষিক সৃষ্টিবাদের ইহাই তাৎপর্য্য।

পাশ্চাত্য ক্রমবিকাশবাদিগণের মতে মনুষ্য ক্রমশঃ উন্নত হইতে হইতে মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হয় এবং মনুষ্যযোনি প্রাপ্তি হইবার পর, আর ইতর-যোনিতে জন্ম হইতে পারে না। এই মত যে বৈশেষিকের অনুমোদিত নহে তাহা আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। সাংখ্যমতেও পাশ্চাত্য ক্রম-বিকাশবাদিগণের উক্ত আশয় আদপে টিঁকে না। "সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই গুণত্রয়কে যদি নিত্য বলিয়া স্বীকার করা যায়, ইহারাই সর্ব্বপ্রকার শরীরের উপাদান কারণ, ইহা যদি অভ্যুপগম করা হয়, প্রকৃতি অনাদি কর্ম্ম-সংস্কারবতী, ইহা যদি মানা যায়, তাহা হইলে মানুষের দেহ বানরের দেহের অভিব্যক্তির পূর্ব্বে অভিব্যক্ত হইতে পারে না, তাহা কোন্ প্রমাণে প্রতিপন্ন হইবে?"* পুনশ্চ, মনুষ্যের ইতর-জীব-জাতিতে অবরোহণ যে বেদসম্মত

তাহা আমরা ছান্দোগ্যাদি উপনিষদে পাইয়া থাকি। কর্ম্মফলে মনুষ্য শ্বযোনি, শূকর-যোনি, চণ্ডালযোনি প্রভৃতি পাইয়া থাকে। যাবৎ মুক্তিসাধন জ্ঞানের উদয় না হয়, তাবৎ জীবকে কর্ম্মানুসারে উচ্চ বা পরিণাম-স্রোতে ভাসিতে হয়।

পাশ্চাত্য ক্রমবিকাশ যে সৃষ্টির যথার্থরূপ দেখিতে পান নাই, তাহা আমরা বৈশেষিক সৃষ্টিবাদের আলোচনায় অবগত হইলাম

(ঠ) বৈশেষিকে ঈশ্বরবাদ।

তার্কিকগণ অনুমান প্রমাণ দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব সপ্রমাণ করিয়াছেন। তত্ত্বচিন্তা-মণিতে উল্লিখিত হইয়াছে যে,—"এবই-সনুমানে নিরূপিতে তস্মাজ্জগন্নির্ম্মাতৃপুরুষ-ধৌরের সিদ্ধিঃ ক্ষিত্যাদৌ কার্য্যত্বেন ঘটবৎ সকর্ত্তৃকত্বানুমানাৎ"—অর্থাৎ যাহা সাবয়ব তাহা কার্য্য, যাহা কার্য্য তাহা চেতনকর্ত্তৃক, ক্ষিত্যাদি জগৎ কার্য্য পদার্থ, অতএব ইহা চেতনকর্ত্তৃক। নৈয়ায়িকগণ এইরূপ যুক্তি দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। এরূপ তর্কে যদি কাহারও ঈশ্বরে বিশ্বাস হয়, তবে ভাল, কিন্তু জিজ্ঞাস্য যে তর্কের দ্বারা কি ঈশ্বরকে জানা যায়? "একজন তার্কিক স্বীয় প্রতিভানুসারে যেরূপ সিদ্ধান্ত করেন তাঁহা হইতে অন্যতর তর্ক-বুদ্ধিসম্পন্ন অন্য একজন তাঁহার সেই সিদ্ধান্তের দোষ প্রদর্শন পূর্ব্বক তৎপরিবর্ত্তে ভিন্নরূপ সিদ্ধান্তের স্থাপন করিয়া থাকেন, আবার অপর এক পুরুষ স্বীয় প্রখর তর্ক বুদ্ধি দ্বারা এই দ্বিতীয় প্রকার সিদ্ধান্তও কাটিয়া দেন; অতএব শুষ্ক স্ব স্ব উৎ-প্রেক্ষামূলক তর্কদ্বারা স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া দুঃসাধ্য।" *

সুতরাং অধ্যাত্ম তত্ত্ব যথাযথভাবে অবগত হইতে হইলে, চিত্তকে অন্তর্মুখ করা, একাগ্র করা এবং চিত্তের বৃত্তি সমূহকে নিরোধ করা আবশ্যক। চিত্ত নির্ম্মল না হইলে তত্ত্বজ্ঞানের সাধনভূত মনন হইতে পারে না। কেবল প্রত্যক্ষ বা অনুমান-প্রমাণের শরণ গ্রহণ করিলে ইষ্ট সিদ্ধি হয় না। বাগ্‌যুদ্ধ করা ও সত্যোপলব্ধি করা, নিশ্চয়ই পৃথক সামগ্রী। জলচর জন্তুর স্থলের জ্ঞানার্জ্জন যেমন অসাধ্য ব্যাপার, ভ্রান্তসংস্কারসঙ্কলিত দূষিত ব্যক্তিজ্ঞান-সাগরে নিমগ্ন ব্যক্তির ঐশ্বরিক জ্ঞানার্জ্জনও সেইরূপ অসাধ্য ব্যাপার। এই পরিচ্ছিন্ন দূষিত জ্ঞান আমাদের মজ্জায় মজ্জায় প্রবিষ্ট হইয়া আছে, এ দূষিত জ্ঞানরূপ সংস্কারকে উৎপাটিত করিতে না পারিলে, অধ্যাত্ম তত্ত্বের বিমলপ্রভা বুদ্ধিদর্পণে প্রতিফলিত হইতে পারে না। এই জন্য শ্রুতি বলিয়াছেন যে তর্কের দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয় না। কিন্তু নব্য নৈয়ায়িকেরা কেবল তর্কের আড়ম্বরেই ব্যস্ততা প্রদর্শন করিয়াছেন। "আত্মতত্ত্ব, দেহতত্ত্ব, মুক্তিতত্ত্ব ইত্যাদি প্রাচীন ন্যায়ের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল, কিন্তু তর্কের আড়ম্বরই নব্য ন্যায়ের প্রধান আলোচ্য বিষয় হইয়া পড়িল। নব্য নৈয়ায়িকগণ কেবল বাক্য লইয়া বিচার, উহার লক্ষণ ও পরীক্ষা, তাহার সমর্থন ও খণ্ডন ইত্যাদি বিষয়ে কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা তর্কমার্গের আশ্রয় লইয়া ধীশক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহারা আধ্যাত্মিক বিষয়ের আলোচনা একেবারেই বিস্মৃত হইয়াছেন"*

তার্কিকাগ্রণী মহামহোপাধ্যায় কামাখ্যা-নাথ তর্কবাগীশ মহাশয় স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন

* পরলোক, ১৭৬ পৃঃ।

* সাহিত্য-সংহিতা, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২১।২২।

যে "আমরা মুক্তিকাম হইয়া সেই আন্বীক্ষিকী বিদ্যার পঠন পাঠনায় প্রবৃত্ত হই নাই। তাহা হইলে কেবল আমরা ঋষি-প্রণীত শাস্ত্রেরই অনুশীলনে যত্নবান্ হইতাম প্রকরণ গ্রন্থের অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইতাম না। যাহাতে বিচার-শক্তি বৃদ্ধি পায় ও মীমাংসা-শক্তি ক্রমে ক্রমে এবং অনায়াসে সকল শাস্ত্র বোধগম্য হয়, সেই উপায় পরিপ্রাপ্তির জন্যই আমরা তর্কবিদ্যার অনুশীলন করিয়া থাকি।"* যোগাদির অনুষ্ঠানজনিত তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা মুক্তিলাভ করা বহ্বায়াসসাধ্য বলিয়া, মহর্ষি গোতম অল্পায়াসে মুক্তি লাভের উপায়-স্বরূপ যে ন্যায়শাস্ত্র প্রণয়ণ করিয়াছেন, সেই ন্যায়শাস্ত্রের উপযোগিতা এখন বিচার শক্তির বর্দ্ধনে এবং মীমাংসা-শক্তির পরিপুষ্টিতে পর্য্যবেশিত হইয়াছে! ন্যায়-দর্শনের যদি কিছু উপযোগিতা থাকে তাহা হইলে তাহা যে কেবলমাত্র মুক্তি-কামীর পথপ্রদর্শক এবং ত্রিবিধ তাপে জর্জ্জরিত সংসার খিন্নদের অল্পায়াসে মুক্তি লাভের উপায়স্বরূপ, তাহা আমরা ভুলিয়া গিয়া, তর্কের আবর্ত্তে পড়িয়া লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া থাকি। সেই জন্য আমাদের মনে হয় যে ঈশ্বরকে তর্কের বিষয়ীভূত না করাই ভাল। অনেক নৈয়ায়িকও এই কথা বলিয়া থাকেন। ন্যায়দর্শনের ৪।১।২১ সূত্রের ভাষ্যে বাৎস্যায়ন বলিয়াছেন যে, "আগমাচ্চ দ্রষ্টা বোদ্ধা সর্ব্বজ্ঞাতেশ্বর ইতি। বুদ্ধ্যাদিভিশ্চাত্মলিঙ্গৈর্নিরুপাখ্যম্ ঈশ্বরং প্রত্যক্ষানুমানাগমবিষয়াতীতং কঃ শক্ত উপপাদয়িতুম্।" ঈশ্বরকে তর্কের বিষয় করা যে বাৎস্যায়নেরও মত ছিল না, তাহা বুঝিতে পারা যাইতেছে।

বৈশেষিক সূত্রে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকৃত না হইলেও ইঙ্গিতে তাঁহার প্রসঙ্গ করা হইয়াছে। যেমন বেদের প্রামাণ্য সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে,—

"তদ্বচনাদাম্নায়স্য প্রামাণ্যমিতি" (১।১।৩ ও ১০।২।৯).

অর্থাৎ সেই যে তৎপদবাচ্য ঈশ্বর, বেদ তাঁহার বাক্য; এই জন্য তাহার প্রামাণ্য আছে। অন্যত্র,—

"বুদ্ধিপূর্ব্বা বাক্যকৃতির্বেদে" (৬।১।১),

অর্থাৎ বেদবাক্যরচনা বুদ্ধিপূর্ব্বক হইয়াছে, কারণ বেদ ঈশ্বরকৃত, ঈশ্বর যাহা বলিয়াছেন তাহা অভ্রান্ত। অথবা যেমন বায়ুর বিচার সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে,—

(১) "সংজ্ঞা—কর্ম্ম ত্বস্মদ্বিশিষ্টানাং লিঙ্গম্ (২।১।১৮),

(২) "প্রত্যক্ষপ্রবৃত্তত্বাৎ সংজ্ঞা কর্ম্মণঃ" (২।১।১৯),

অর্থাৎ, সংজ্ঞা অর্থাৎ নাম, এবং কর্ম্ম অর্থাৎ ক্ষিত্যাদি কার্য্য, এই দুইটী আমাদিগের হইতে বিশিষ্ট ঈশ্বর, মহর্ষি প্রভৃতির অস্তিত্ব প্রমাণিত করে। ঘট, পট ইত্যাদি নাম দ্বারা সেই সেই পদার্থ বুঝায় কিরূপে? না ঈশ্বরের সঙ্কেত দ্বারা; ক্ষিতি, অপ্, ইহারা যখন কার্য্য, তখন অবশ্যই ইহাদের কর্ত্তা আছেন, তিনিই ঈশ্বর।

ইহা ভিন্ন বৈশেষিক-দর্শনের মূল সূত্রে আর কোথাও ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আভাসও পাওয়া যায় না। "বৈশেষিক দর্শনকার নিঃশ্রেয়স প্রাপ্তির যে প্রণালীর আবিষ্কার করিয়াছেন তাহার সহিত ঈশ্বরের সম্বন্ধ অল্পই। ঈশ্বর থাকুন বা থাকুন, জীবের সহিত তাঁহার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হউক কিংবা না হউক, বৈশেষিকের তাহাতে কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। সপ্ত পদার্থ (ঈশ্বর তাহার অন্তর্গত [illegible]) ও তাহাদের সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্য জ্ঞান অক্ষুণ্ণ থাকুক, তিনি সেই

* সাহিত্য-সংহিতা ১০ খণ্ড পৃঃ ৩।

তত্ত্বজ্ঞানের বলে দুঃখের গণ্ডী ছাড়াইয়া নিঃশ্রেয়স লাভ করিবেন।"*

বৈশেষিকের মূলসূত্রে নিঃশ্রেয়স প্রাপ্তির সহিত ঈশ্বরের কোন সম্বন্ধের উল্লেখ না থাকিলেও ভগবান্ যে কারুণ্যবশতঃ জগতের সৃষ্টি ও সংহার করিয়া থাকেন তাহা প্রশস্তপাদ প্রভৃতি বৈশেষিক আচার্য্যগণ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন।

কণাদ বলিয়াছেন যে "আত্মকর্ম্মসু মোক্ষো ব্যাখ্যাতঃ" (৬।২।১৬)—অর্থাৎ আত্মকর্ম্ম হইলে মোক্ষ হয়, ইহা কথিত হইয়াছে। এই সূত্রের টীকায় শঙ্কর মিশ্র বলিয়াছেন যে, "শ্রবণং মননং যোগাভ্যাসো নিদিধ্যাসনমাসনং প্রাণায়ামঃ সমদমসম্পত্তিঃ" ইত্যাদিকে আত্মকর্ম্ম বলা যায়। ইহাদের মধ্যে "ষট্পদার্থীয় তত্ত্বজ্ঞানমাদ্যমাত্মকর্ম্ম"—অর্থাৎ ষটপদার্থের তত্ত্বজ্ঞান আদ্য আত্মকর্ম্ম। ইহাদের সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্যের জ্ঞান মননের অন্তর্গত; সুতরাং মননের উপযোগী বলিয়া দ্রব্যাদি পদার্থ জ্ঞান প্রথম প্রয়োজনীয়। যোগাভ্যাস না করিলে যে মানবের দুঃখ নিবৃত্তি হয় না তাহা কণাদ স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন; যথা,—"তদনারম্ভ আত্মস্থে মনসি শরীরস্য দুঃখাভাবঃ স যোগঃ" (৫—২—১)—ইন্দ্রিয়-সংযোগ-হীন আত্মনিষ্ঠ চিত্তের স্থিরাবস্থাই যোগ, এই যোগ মানবের দুঃখনিবৃত্তির উপায়। এইজন্য যোগাভ্যাসকে আত্মকর্ম্মের ভিতর ন্যস্ত করা হইয়াছে। যে মোক্ষ আত্মকর্ম্মের দ্বারা লভ্য হয়, কণাদের মতে সেই মোক্ষের লক্ষণ এই প্রকার কথিত হইয়াছে; যথা—

"তদভাবে সংযোগাভাবোঽপ্রাদুর্ভাবশ্চ মোক্ষঃ"—(৫।২।১৮) অর্থাৎ যখন ধর্ম্মাধর্ম্ম—অভাবে শরীর সংযোগের অভাব হয় এবং পুনরুৎপত্তি অর্থাৎ পুনর্জন্ম হয় না, তখন সেই অবস্থাকে মোক্ষ বলে। এই অবস্থা চরম দুঃখ নিবৃত্তির অবস্থা। এই অবস্থা প্রাপ্ত হইতে হইলে যে সকল আত্মকর্ম্ম করিতে হয়, তাহাদের মধ্যে ষট্পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান আদ্য আত্মকর্ম্ম। কেবলমাত্র ষট্পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা মোক্ষ লাভ হয় না। মোক্ষলাভের জন্য অন্যান্য আত্মকর্ম্ম আছে, যথা, যোগাভ্যাস, নিদিধ্যাসন, প্রাণায়াম, সমদম সম্পত্তি ইত্যাদি।

বৈশেষিক ও ন্যায়ানুমোদিত মোক্ষ এক প্রকার মূর্চ্ছা মাত্র। মূর্চ্ছাবস্থায় যেরূপ লোকের সুখদুঃখানুভব হয় না, সেইরূপ ন্যায় ও বৈশেষিকানুমোদিত মোক্ষাবস্থায় জড় ও অচেতনবদবস্থিত আত্মারও ঐকান্তিক দুঃখাভাবের অনুভব হয় না। ন্যায় বৈশেষিকের মতে সুখ দুঃখ নিত্য নহে, জন্য। শরীরাদির সংযোগবশতঃই আত্মার সুখ দুঃখ উৎপন্ন হয়। সুতরাং মুক্তির পর শরীরাদির সংযোগ নাশ হওয়াতে, আত্মার সুখ দুঃখ থাকে না—আত্মা তখন আকাশাদির ন্যায় অচেতন অবস্থায় থাকে। সুতরাং এই প্রকার মুক্তির অবস্থাকে মূর্চ্ছা ভিন্ন আর কি বলিতে পারা যায়? বৈশেষিক সূত্রে সেই মূর্চ্ছা অবস্থায় জীবের সহিত ঈশ্বরের কোন সম্পর্ক দৃষ্ট হয় না।

মহর্ষি গোতম অথবা মহর্ষি কণাদ মূল সূত্রে ঈশ্বর-প্রতিপাদন সম্বন্ধে কোন কথাই বলেন নাই। বৈশেষিকেরা ও নৈয়ায়িকেরা এই অভাব বিশেষ অনুভব করিয়াছিলেন। সেই অভাব দূর করিবার জন্য গঙ্গেশোপাধ্যায় ঈশ্বরানুমান প্রবন্ধ দ্বারা ও উদয়নাচার্য্য কুসুমাঞ্জলি নামক প্রবন্ধ দ্বারা ঈশ্বরের জগৎ কর্তৃত্বরূপে অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বৈশেষিকোক্ত নব দ্রব্যের অন্যতম আত্মার

* গীতার সমন্বয়বাদ পৃঃ ১৭।১৮।

বিচারস্থলে, নৈয়ায়িকেরা ঈশ্বরের প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিয়াছেন। তাঁহারা আত্মাকে জীবাত্মা ও পরমাত্মা ভেদে দ্বিবিধ বলিয়াছেন। ভব-পরিচ্ছেদে জীব ও ঈশ্বর সম্বন্ধে বিচার দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু বৈশেষিকের মূল সূত্রে যেখানে আত্মার নিরূপণ করা হইয়াছে, সেখানে ঈশ্বরের কোনই প্রসঙ্গ দৃষ্টিগোচর হয় না। নব্য বৈশেষিকগণ কেবল ঈশ্বরের প্রসঙ্গ করিয়া ক্ষান্ত হন নাই, মহর্ষি কণাদ যাহা বলেন নাই, তাঁহারা তাহাও বলিয়াছেন; তাঁহারা ঈশ্বরে জ্ঞান, ইচ্ছা প্রযত্ন, সংখ্যা প্রভৃতি আটটী গুণ প্রয়োগ করিয়া "মহেশ্বরেঽষ্টৌ" বলিয়াছেন।

প্রশস্তপাদও তাঁহার ভাষ্যে পূর্ব্বোক্ত অভাব পূরণ করিবার জন্য ঈশ্বরের প্রসঙ্গ করিতে ছাড়েন নাই। পদার্থ সমূহের তত্ত্বজ্ঞানই মোক্ষের কারণ, এই প্রসঙ্গে "তচ্চ ঈশ্বরনোদনাভিব্যক্তাৎ ধর্ম্মাদেব", অর্থাৎ সেই তত্ত্বজ্ঞান ঈশ্বর-প্রেরণাজনিত ধর্ম্ম হইতে উৎপন্ন হয় এইরূপ বলিয়াছেন। মূলসূত্রে কিন্তু কেবলমাত্র "ধর্ম্মবিশেষ-প্রসূত" বলা হইয়াছে। পরমাণুবাদের প্রসঙ্গেও প্রশস্তপাদ ঈশ্বরের অবতারণা করিয়াছেন? পরমাণু হইতে কি প্রকারে বিশ্বের সৃষ্টি হয় এবং কি প্রকারে উহারা লয় হয় তাহা তিনি বিশদ করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু মূল সূত্রে ঈশ্বরের কর্তৃত্ব বিষয়ে স্পষ্ট কিছু পাওয়া যায় না।

মহর্ষি কণাদের ন্যায়, মহর্ষি গোতমও স্পষ্টাক্ষরে কোন স্থানে ঈশ্বর-প্রতিপাদন করেন নাই। গোতম যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন, তাহা ইঙ্গিতের দ্বারা বুঝিতে পারা যায়। "(১) ঈশ্বর কারণং পুরুষ কর্ম্মাফলাদর্শনাৎ" (২) "ন, পুরুষ "তৎকারিতত্বাদ্ হেতুঃ" এই তিন সূত্রের দ্বারা বুঝিতে পারা যায় যে তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন। "গোতম স্পষ্টাক্ষরে ঈশ্বর প্রতিপাদন করেন নাই বলিয়াই গোতমসূত্রের ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন মুনি লক্ষণদ্বারা ঈশ্বর প্রতিপাদন করিয়াছেন— "গুণবিশিষ্টমাত্মান্তরমীশ্বরঃ" অর্থাৎ নিত্যজ্ঞানেচ্ছাসম্পন্ন জীবাতিরিক্ত জগদাধারা, বেদ দ্বারা হিতোপদেশক জগৎপিতা, পরমেশ্বর পদবাচ্য।"*

(ড) ষড়দর্শনে বৈশেষিকের স্থান।

আমরা পূর্ব্বে বিভিন্নবাদের সংবাদ জ্ঞাপন করিয়াছি। ঋষিরা কেন বিভিন্ন প্রকার মতের প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন তৎসম্বন্ধে অদ্বৈতব্রহ্মসিদ্ধিতে এই প্রকার উল্লিখিত হইয়াছে;—"নহিতে মুনয়ো ভ্রান্তাঃ। তেষাং সর্ব্বজ্ঞত্বাৎ। ভ্রান্তত্বে বা বিনিগমনাবিরহাৎ। কিন্তু বহির্ম্মুখপ্রবণানাং আপাততঃ পরম পুরুষার্থেঽদ্বৈতমার্গে প্রবেশো ন সম্ভবতীতি নাস্তিক্যনিরাকরণায় তৈঃ প্রস্থানভেদাঃ প্রদর্শিতাঃ। ন তু তাৎপর্য্যেণ।"

"ঋষি ও আচার্য্যগণ বেদোপদিষ্ট অদ্বৈত বাদ অনায়াসবোধ্য নহে, বহির্ম্মুখপ্রবণ ব্যক্তিদিগের আপাততঃ পরমপুরুষার্থ অদ্বৈতমার্গে প্রবেশ সম্ভব নহে, ইহা বুঝিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহারা অদ্বৈতমার্গে প্রবেশ করিবার দ্বার স্বরূপ দ্বৈতবাদ সমর্থক শাস্ত্রসমূহের প্রচার করিয়াছিলেন, প্রথমতঃ নাস্তিকের নিরাকরণের চেষ্টা করিয়াছেন। শ্রুতিবোধিত অদ্বৈতমার্গ সাধারণের প্রবেশার্হ নহে, সাধারণে অদ্বৈতবাদের প্রকৃত অভিপ্রায় কি, যথাযথভাবে তাহা ধারণা করিতে পারিবে না, মহর্ষি

গৌতম ও কণাদ সেই জন্যই ঈশ্বরাধিষ্ঠিত পরমাণুপুঞ্জকে বিশ্বের মূল উপাদান এবং ঈশ্বর ও অদৃষ্টাদিকে নিমিত্ত কারণ বলিয়াছেন, নিরীশ্বর সাংখ্যদর্শন সেই জন্য সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণাত্মক প্রধান বা প্রকৃতিকে, এবং সেশ্বর সাংখ্য, তাই সেশ্বর প্রধানকে বিশ্বের কারণরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, পূর্ব্বমীমাংসা দর্শন বেদকে ঈশ্বর-স্থানীয় করিয়াছেন, ধর্ম্মকেই বিশ্ব জগতের নিমিত্ত কারণ বলিয়াছেন। আরম্ভবাদ, পরিণামবাদ ও বিবর্ত্তবাদ বা অসৎকার্য্যবাদ, সৎকার্য্যবাদ ও সৎকারণবাদ ইহারা অধিকারানুসারে তত্ত্বোপদেশ প্রদানার্থ আবির্ভূত হইয়াছে।"*

"শ্রুতি পাঠ করিলে বিদিত হওয়া যায়, শ্রুতি দ্বৈতবাদকেও আদর করিয়াছেন, দ্বৈতবাদেরও যে প্রয়োজন আছে, তাহা বুঝাইয়াছেন। ফলতঃ অদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ, সৎকার্য্যবাদ, অসৎকার্য্যবাদ, সৎকারণবাদ, অসৎকারণবাদ, আরম্ভবাদ, পরিণামবাদ, বিবর্ত্তবাদ, শ্রুতিই এই সকল বাদের প্রসূতি। 'এক ব্রহ্ম ভিন্ন দ্বিতীয় পদার্থ নাই', এই শ্রুত্যুপদেশের তাৎপর্য্য যথাযথভাবে পরিগ্রহ করিতে হইলে, ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, পাতঞ্জল ও পূর্ব্বমীমাংসা, এই পঞ্চবিধ আস্তিক দর্শনের চরণসেবা অবশ্য কর্ত্তব্য ইঁহারা অদ্বৈতমার্গের দ্বারস্বরূপ।"†

ঋগ্বেদে উল্লিখিত হইয়াছে যে,— "যদা মাগন্ প্রথমজা ঋতস্যাদিদ্বাসো অমৃতে ভাগমস্যাঃ"—(ঋগ্বেদ সংহিতা, ২।৩২৬ ২২)। ঐন্দ্রিয়ক জ্ঞানকে বিস্মৃতি-সাগরে বিলীন না করিলে, বৃত্ত্যধীন জ্ঞানের নিরোধ না হইলে, ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞানের উৎপত্তির পূর্ব্বে বিদ্যমান, ঋত বা পরব্রহ্মের প্রথমজ —প্রথমোৎপন্ন —আদিভূতজ্ঞানের পূর্ণভাবে বিকাশ না হইলে অদ্বৈতবাদের স্বরূপ দর্শন হইতে পারেন না। "পরিচ্ছিন্ন বুদ্ধিতে কখন অদ্বৈতজ্ঞান প্রতিভাত হইতে পারে না। অদ্বৈতভাব ভাবিত হইতে না পারিলে, বীতরাগ ও বীতদ্বেষ না হইলে, চিত্তবৃত্তি সমূহের নিরোধ না করিলে কি, অখণ্ড সচ্চিদানন্দকে দেখিতে পাওয়া যায়? দ্বৈতরাজ্যের প্রজা কি, বিমল অদ্বৈত-রাজ্যের যথার্থ সংবাদ জানিতে পারেন? সত্যস্থ সমদর্শী ঋষিগণ এই নিমিত্ত দ্বৈতবাদের উপদেশ করিয়াছেন। শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র ইত্যাদি শাস্ত্রসমূহ এই নিমিত্ত পরস্পরবিরুদ্ধ, নানাবিধ মতের উপন্যাস করিয়াছেন। গৌড়পাদ স্বপ্রণীত কারিকাতে বলিয়াছেন, শ্রুতি-স্মৃত্যাদি শাস্ত্রসমূহে সৃষ্টি বিষয়ক যে পরস্পর-বিরুদ্ধ নানাবিধ মত উপন্যস্ত হইয়াছে, তৎসমুদায়েরই উপযোগিতা আছে, ইহারা অদ্বৈতমার্গে উপনীত হইবার উপায় স্বরূপ,—

"মৃল্লোহবিস্ফুলিঙ্গাদ্যৈঃ সৃষ্টির্যা চোদিতান্যথা।
উপায়ঃ সোঽবতারায় নাস্তি ভেদঃ কথঞ্চন।"
—গৌড়পাদীয় কারিকা"*

অতএব দ্বৈতপ্রতিপাদনপর শাস্ত্র সমূহ শ্রুতিবিরোধী নহেন। উদয়নাচার্য্যও বলিয়াছেন, অদ্বৈতবাদ পরমার্থতঃ সত্য হইলেও পারমার্থিক দৃষ্টিতে জগৎ অবিদ্যা-কল্পিত বা অবয়ব বিজৃম্ভণ হইলেও আর্দ্র বণিকের বহিত্র বিস্তার (আহার ব্যাপারীর জাহাজের ভাবনার) প্রয়োজন কি? 'কিমার্দ্রবণিজো বহিত্র চিন্তয়া'? অদ্বৈত প্রতিপাদক বেদান্ত দর্শনকে ন্যায়াচার্য্যগণ "তত্ত্বং বাদরায়ণি" ইত্যাদি বাক্য দ্বারা বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন।

* পরলোক, পৃঃ ৬০৩।৬০৪।

† পরলোক, পৃঃ ২২০।

* পরলোক পৃঃ ২২৩।২২৪।

অদ্বৈতবাদ যে, মুখ্যবাদ, দ্বৈতবাদী আস্তিক দার্শনিকগণ তাহা স্বীকার করিয়াছেন, তবে লোক-ব্যবহার দ্বৈতজ্ঞান দ্বারাই নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে, অদ্বৈতজ্ঞান স্বরূপতঃ সত্য হইলেও সংসারী তাহা যথাযথ ভাবে উপলব্ধি করিবার যোগ্য নহে, একেবারে অদ্বৈতমার্গে প্রবেশ অবিদ্যাদ্বারা সম্যগ্রূপে বদ্ধ, সংস্কারাত্মক মনের বলে বিচারশীল, বৃত্ত্যধীন পুরুষের কোনরূপেই সাধ্য নহে, সর্ব্বজ্ঞ ঋষিগণ এইজন্য দ্বৈতবাদের সমর্থন করিয়াছেন, দ্বৈতবাদের স্বরূপ প্রদর্শন করিয়াছেন।"*

ঋষিদের মতভেদের কারণ বুঝাইবার সময় সংক্ষেপ-শারীরক-প্রণেতা শ্রীসর্ব্বজ্ঞ মুনি বলিয়াছেন যে—"বিবর্ত্তবাদস্য হি পূর্ব্বভূমির্বেদান্তবাদে পরিণামবাদঃ। ব্যবস্থিতেঽস্মিন্ পরিণামবাদে স্বয়ং সমায়াতি বিবর্ত্তবাদঃ"—অর্থাৎ পরিণামবাদ ব্যবস্থিত (established) হইলে বিবর্ত্তবাদ স্বয়ং আগমন করে।

"পারমার্থিক সত্যজ্ঞানের বিকাশ না হইলে, জ্ঞান-পিপাসা শান্ত হইবার নহে, পরমার্থিক জ্ঞানের বিকাশ না হইলে, মানব কখনও কৃতকৃত্য হইতে পারে না, করুণার্দ্রহৃদয় মহর্ষিরা এইজন্য প্রথমতঃ প্রাধানিক মিথ্যাজ্ঞানের অপনোদনের উপর নির্দ্দেশ করিয়া, পরে তাত্ত্বিক মিথ্যা জ্ঞানকে মিথ্যাজ্ঞান বলিয়া বুঝিবার পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। আস্তিক ষড়দর্শন দ্রষ্টব্য পদার্থাবলোকন বা আত্মদর্শনের চক্ষুঃ। ষড়দর্শন বলিতে আমরা সাধারণতঃ যাহা বুঝিয়া থাকি, ষড়দর্শন বস্তুতঃ তাহা নহে; ইহারা পরস্পর বিরুদ্ধ ছয়টী চক্ষুঃ নয়, দর্শন এক, তবে অন্তর বাহ্য বা স্থূল সূক্ষ্ম অবস্থাভেদে ইহারা ছয়টী বিভাগ—ষট্‌সংখ্যক স্তর আছে মাত্র। আরম্ভবাদ, পরিণামবাদ ও বিবর্ত্তবাদ, অথবা অসৎ কার্য্যবাদ, সৎকার্য্যবাদ ও সৎকরণবাদ, ইহারা ধারাবাহিক ভাবে সম্বদ্ধ অধোঽধো ভাবে স্থাপিত সত্য প্রাসাদে আরোহণোপায় সোপানপর্ব্ব ভিন্ন অন্য কিছু নহে। সোপানপর্ব্বসমূহের কোনটীই যেমন নিষ্প্রয়োজন নহে, সকলেরই যেমন কার্য্যকারিতা আছে, অধস্তন সোপানপর্ব্ব তদুপরিতন সোপান পর্ব্ব হইতে ভিন্ন হইয়াও যেমন পরস্পর সংশ্লিষ্ট, অধস্তন সোপানপর্ব্বে অগ্রে আরোহণ না করিলে, যেরূপ উপরিতন সোপানপর্ব্বে আরোহণ করা যায় না, সেইরূপ আরম্ভবাদ, পরিণামবাদ ও বিবর্ত্তবাদ ইহাদের কোনটীই নিষ্প্রয়োজন নহে, ইহাদের সকলেরই কার্য্যকারিতা আছে, আপাতদৃষ্টিতে ইহারা পরস্পর ভিন্ন হইলেও প্রকৃত পক্ষে অসম্বদ্ধ নহে, আরম্ভবাদ সোপানপর্ব্বে আরোহণ না করিলে, পরিণামবাদ সোপানপর্ব্বে আরোহণ করা কোনমতেই সম্ভব নহে, এবং পরিণাম বাদ সোপানপর্ব্বে আরোহণ না করিলে, বিবর্ত্তবাদ সোপানপর্ব্বে আরোহণ অসাধ্য ব্যাপার।"*

পূর্ব্বোক্ত আলোচনা হইতে আমরা অবগত হইলাম যে ঋষিরা সর্ব্বজ্ঞ হইলেও অধিকারী অনুসারে তত্ত্বোপদেশ করিয়াছেন, কোন মতই ঋষিদের স্ব-কপোলকল্পিত নহে। দ্বৈতবাদাদি যতপ্রকার বাদ বিদ্যমান আছে, সকলেই সনাতনী শ্রুতি হইতে জন্মলাভ করিয়াছে। যিনি যেরূপ প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তিনি সেইরূপ মতাবলম্বী হইবেন, সংসারে চিরদিনই মতভেদ আছে, চিরদিনই মতভেদ থাকিবে। তবে ঋষিদিগের মতভেদ প্রকৃত সাধকের ক্ষতিকর নহে, যে উপায় অবলম্বন করিলে

* ঐ পৃঃ, ১১৫।

* ঐ, পৃঃ ১১৩।১১৪

মতভেদের সমন্বয় হয়, পারমার্থিক জ্ঞানের বিকাশ হয়, সেই উপায় সম্বন্ধে ঋষিদিগের মধ্যে মতভেদ নাই, সাধনা বিষয়ে ঋষিরা একমত। চিত্তশুদ্ধি না হইলে, প্রকৃত জ্ঞানের উদয় হয় না, এই বিষয়ে ঋষিদিগের মতভেদ নাই। শুদ্ধ কণ্ঠে রাখিবার জন্য শাস্ত্রকর্ত্তারা শাস্ত্র রচনা করেন নাই, শাস্ত্রোপদেশ সকলকে হৃদয়ে রাখিবার, শাস্ত্রোপদেশানুসারে কর্ম্ম করিয়া চিত্তের মল-শোধনার্থ, শাস্ত্রকর্ত্তারা শাস্ত্র রচনা করিয়াছেন। যিনি শাস্ত্রোপদেশ পালনপূর্ব্বক শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন, তাঁহাকে কদাচ বিপন্ন হইতেই হয় না, তিনি নিশ্চয়ই কৃতার্থ হইতে পারগ হয়েন। অভিমানগ্রস্ত হৃদয়ে শাস্ত্রের প্রকৃতরূপ পতিত হয় না, সাধনা-বিহীনের মুখে শাস্ত্রব্যাখ্যা শুনিয়া, কখন কাহারও অভীষ্ট সিদ্ধি হয় না। * * * সংসারে খ্যাতি, অর্থ ও সম্মান-প্রাপ্তিই যদি শাস্ত্রাধ্যয়নের প্রয়োজন হয়, তবে স্বতন্ত্র কথা, আর যদি মোক্ষসাধন জ্ঞানপিপাসা মিটাইবার জন্য, ভবসন্তাপ নিবারণের নিমিত্ত শাস্ত্রসিন্ধুতে অবগাহনের প্রয়োজন বোধ হইয়া থাকে, তবে বিগলিতাভিমান হইতে হইবে, সাধক শাস্ত্রজ্ঞ গুরুর চরণ-সেবা করিতে হইবে, চিত্তমল বিধৌত করিতে হইবে। যিনি এইরূপে শাস্ত্রচরণ সেবা করিবেন, ঋষিদিগের মধ্যে যে, বস্তুতঃ মতভেদ নাই, তাহা তাঁহার উপলব্ধি হইবে।"*

পূর্ব্বে আমরা দেখিয়াছি যে বিভিন্নবাদের মতে কারণ এক কিন্তু কার্য্য ভিন্ন। কিন্তু কারণ এক হইলেও, কার্য্যকে সকলে সমান-রূপে ব্যক্ত করেন নাই। তাহার কারণ এই যে, সেই কার্য্য, সকলের নিকট সমান-রূপে অভিব্যক্ত নহে। যাহার নিকট সেই কার্য্য যেরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে, তাহার কাছে তাহাকে তদ্রূপ বিবৃত করিয়া তত্ত্বজ্ঞান প্রতিপন্ন করাই প্রকৃত উদ্দেশ্য, তখন সেই কার্য্যবাদ যাহাই হউক না কেন, তাহাতে কিছু ক্ষতি নাই। এই জন্য পূর্ব্বাচার্য্যগণ বলিয়াছেন যে, মনুষ্যের এক কালে সূক্ষ্ম আত্মতত্ত্বে প্রবেশ সম্ভবপর নহে। বিজ্ঞান-ভিক্ষু বলিয়াছেন যে, "ন্যায়বৈশেষিকাভ্যাং হি সুখদুঃখাদ্যনুবাদতো দেহাদিমাত্রবিবেকেনাত্মা প্রথম-ভূমিকায়ামনুমাপিতঃ, একদা পরম সূক্ষ্মে প্রবেশাসম্ভবাৎ"—অর্থাৎ, আত্মার সুখদুঃখিত্বাদি খণ্ডন করিয়া লোকসিদ্ধ সুখদুঃখাদির অনুবাদ পূর্ব্বক ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনে কেবল দেহাদি হইতে পৃথকভাবে আত্মার অনুমান করা হইয়াছে, অর্থাৎ আত্মা, দেহ ও ইন্দ্রিয় হইতে পৃথক এই মাত্র বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। যিনি আত্মতত্ত্ব অবগত নহেন, নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক আচার্য্যগণ তাহাকে বুঝাইয়া দিলেন যে, আত্মা দেহভেদে ভিন্ন ভিন্ন, আত্মা জ্ঞান সুখাদির আশ্রয়, আত্মা কর্ত্তা ও ভোক্তা। আত্মা দেহাদি হইতে ভিন্ন ইহা বুঝিতে পারিলে, বোদ্ধা কিয়ৎ পরিমাণে সূক্ষ্ম আত্মতত্ত্ব অবগত হন। ইহা আত্মতত্ত্ব অবগতির প্রথম ভূমি বা অবস্থা। এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলে সাংখ্য ও পাতঞ্জল আচার্য্যগণ বুঝাইয়া দিলেন যে, আত্মা দেহাদি হইতে অতিরিক্ত এবং দেহ ভেদে ভিন্ন ভিন্ন ও ভোক্তা বটে, পরন্তু আত্মা কর্ত্তা নহে, আত্মা জ্ঞানসুখাদির আশ্রয় নহে, আত্মা নিত্যজ্ঞান স্বরূপ। ইহাই দ্বিতীয় ভূমি। এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলে বেদান্ত বুঝাইয়া দিলেন যে, আত্মা দেহ ভেদে ভিন্ন ভিন্ন নহে, আত্মা এক ও অদ্বিতীয়, আত্মা ভোক্তা নহে, আত্মা ভোগ সাক্ষী নহে, ইত্যাদি। ঋষিরা লোকের অবস্থার প্রতি

* পরলোক, প্রস্তাবনা।

লক্ষ্য করিয়া সোপানারোহণের রীতিতে বোধব্যদিগকে ক্রমে ক্রমে পারমার্থিক আত্মতত্ত্বে উপনীত করিয়াছেন। এই পারমার্থিক আত্মতত্ত্ব অদ্বৈতজ্ঞানে পর্য্যবেসিত হইয়া থাকে। সাধারণ প্রতিভা কখন এই অদ্বৈতজ্ঞানকে ধারণ করিতে পারে না।" ঋগ্বেদ-সংহিতা এই জন্যই বলিয়াছেন, যাহারা অবিদ্যাদ্বারা সম্যক্‌রূপে বদ্ধ, যাহারা মনের বশে বিচরণশীল, ইন্দ্রিয়াধীন হইয়া যাহারা অবিরাম বিবিধ সুখদুঃখ ভোগ করে, যাহারা রাগদ্বেষের বশবর্ত্তী, তাহারা কখন 'এক ব্রহ্ম ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তু নাই,' এই বেদোদ্ভাসিত তত্ত্ব জ্ঞানকে যথাযথ ভাবে হৃদয়ে ধারণ করিবার যোগ্য হইতে পারে না। ঋত বা পরব্রহ্মের প্রথমজ—প্রথমোৎপন্ন—আদিভূত জ্ঞানের যখন বিকাশ হইবে, ঐন্দ্রিয়ক জ্ঞান ভুলিয়া গিয়া, মানব যখন অতীন্দ্রিয় সনাতন জ্ঞানে জ্ঞানী হইতে পারিবে, বহির্মুখ চিত্তকে যখন যোগ শাস্ত্রোক্ত নিয়মানুসারে অন্তর্মুখ করিতে ক্ষমবান্ হইবে, তখনই সর্ব্ব সংশয় বিদূরিত হইবে, তখনই স্বয়ং প্রকাশ অদ্বৈত-জ্ঞান-রবি অবিদ্যা মেঘ-বিনির্ম্মুক্ত হইয়া প্রকাশিত হইবেন। অদ্বৈতবাদ জগতের জিনিস নহে, অদ্বৈতবাদ সংসার-সাগর পার হইবার তরণি, যাঁহাদের সংসার সাগর পার হইবার প্রয়োজন হইয়াছে, অদ্বৈতবাদ তাঁহাদেরই পরম উপকারক বন্ধু।"*

শ্রীআশুতোষ দেব।

ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর বঙ্গীয় হিন্দুসমাজ

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

আমরা এতক্ষণ নগরের নানাস্থানে ও হাটে বাজারে ঘুরিয়া বেড়াইলাম, সেকালের কোন বাঙ্গালী হিন্দুর অন্তঃপুরে প্রবেশ করি নাই। হিন্দুর অন্তঃপুরে প্রবেশ বড় সহজ কার্য্য নহে। একেবারে অতদূর সাহস না করিয়া, আসুন, আমরা ঐ দীর্ঘিকার তটে বকুল বৃক্ষের সুশীতল ছায়ায় কিয়ৎকাল অপেক্ষা করি। কি সুন্দর সরোবর। ইহার চারিটী প্রশস্ত ঘাট প্রস্তরে বিনির্ম্মিত। প্রত্যেক ঘাটে একটি করিয়া দেবমন্দির ও বকুল বৃক্ষ শোভা সম্পাদন করিতেছে। জলে নীল, পীত, শ্বেত লোহিত, বিবিধ বর্ণের পদ্ম ফুটিয়াছে, ভ্রমরেরা গুঞ্জন করিতেছে। নানা জলচর পক্ষী জলে ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতেছে। আবার ধোপা একধারে পাটে কাপড় কাচিতেছে।

এই ধোপার পাট তখনকার বড় বড় পুষ্করিণীর একটি প্রধান অঙ্গ ছিল। এখনও পল্লিগ্রামে দীর্ঘিকা প্রভৃতি বৃহৎ জলাশয়ে সমূহে ধোপারা কাপড় কাচিয়া থাকে। কৃত্তিবাস লিখিয়াছেন—

"নিদাঘ সময়ে অতি রবি ঘোরতর।
সরোবর স্নান হেতু যান রঘুবর॥
একেশ্বর যান কেহ নাহিক সহিত।
সরোবর-কূলে গিয়া হইল উপনীত॥
পর্ব্বত জিনিয়া সেই পুষ্করিণীর পাড়।
চারিধারে শোভিছে বিচিত্র ফুলঝাড়॥
দক্ষিণে রজক বস্ত্র কাচে স্বর্ণপাটে।
স্নান হেতু যান রাম উত্তরের ঘাটে॥"

রামা—উত্তরা—৩১২।

মঙ্গলেও দেখিতে পাই—

* পরলোক, পৃঃ ৬০৫।৬০৬

"দীঘির দক্ষিণে ঘাটে, দেখিয়া রজক-নাটে
প্রাণ কাঁপে ভাবিয়া কুম্ভীর।"
শ্রীধর্ম্ম। ৮৯।

মধ্যাহ্ন আগতপ্রায়, কলসীকক্ষে কুল-কামিনীরা দলে দলে স্নানার্থ আগমন করিতেছেন। ধনী, মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, হাড়ি, বাগ্‌দী সকল শ্রেণীর স্ত্রীলোকেরই ঘাটে সমাগম হইয়াছে। সকলেই যে একঘাটে স্নান করিতেছেন তাহা নহে; নীচজাতিয়দিগের জন্য স্বতন্ত্র ঘাট নির্দ্দিষ্ট আছে।

আমরা এখন ইঁহাদের বেশভূষার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া অন্তরালে বসিয়া বিশ্রম্ভালাপ শ্রবণ করিব। নারীগণের কথাবার্ত্তা শুনিয়া আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে ইঁহাদের অনেকেরই দাম্পত্যজীবন সুখের নহে। বল্লালসেনের কল্যাণে তখনকার প্রায় কোন রমণীই সপত্নীসুখে বঞ্চিতা ছিলেন না। এখনকার মত তখনও জননীরা প্রাণান্তে কন্যাকে "দারুণ সতীনে" বিবাহ দিতে স্বীকৃতা হইতেন না; কিন্তু তাঁহারা কি করিবেন? কন্যার জনকেরা কোথাও বা অর্থলোভে, কোথাও বা কৌলিন্যের মোহে, সতীনে কন্যাদান করিতেন; শুধু তাহাই নহে, দরিদ্র, বৃদ্ধ, অন্ধ, খঞ্জ কোন বরই বাছিতেন না।

বণিক্ লক্ষপতির কন্যা খুল্লনা দ্বাদশবর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। লক্ষপতি তখনও কন্যার জন্য পাত্রের অনুসন্ধান করিতেছেন না। এমন সময় একদিন ঘটক-চূড়ামণি জনার্দ্দন ওঝা তাঁহার ভবনে আগমন করিলেন। ঘটক বলিলেন—

"শুনহে অবোধ লক্ষপতি।
দ্বাদশ বৎসরের সুতা তোর ঘরে অবিবাহিতা
কেমতে আছহ সুস্থমতি॥
সপ্তম বৎসরে কন্যা বিভা দিলে হয় ধন্যা
তার পুত্র কুলের পাবন।
আহরিয়া বর আনি কহিয়া মধুর বাণী
পণ দিয়া করে সমর্পণ॥
নবম বৎসর যদি বর আনি যথাবিধি
তনয়া কয়রে সম্প্রদান।
তার পুত্র দিলে জল সুরপুরে পায় স্থল
পিতৃলোকে পায় বহুমান॥
কেহ না বুঝালে তোমা গত হইল দশ সীমা
তথাচ না কৈলে কন্যাদান।
প্রবেশিলে একাদশে মদন হৃদয়ে বৈসে
নব রস হয় এক স্থান॥
না করিলে কর্ম্ম ভাল এগার বৎসর গেল
অপযশ করিলে সঞ্চয়।
দ্বাদশ বৎসর বেলা হয় কন্যা রজস্বলা
পুরুষের নাহি করে ভয়॥
তাবত পুরুষে ভয় যাবত পুষ্পক নয়
নাহি রহে তাবত কামনা।
নর দেখি অনুপম যদি কন্যা করে কাম
পায় পিতা নরকযন্ত্রণা॥"

লক্ষপতি Hindu Marriage Reform League এর সভ্য ছিলেন না। ঘটক ঠাকুরের কথায় তাঁহার নরক-ভয় উপস্থিত হইল। তিনি বলিলেন, "ঠাকুর, যেরূপ উচিত বিধান হয়, করুন।" জনার্দ্দন বলিলেন, "বণিক জাতির মধ্যে পরম কুলীন ধনপতি সদাগর; তাহার যেমন রূপ তেমনি গুণ; সে দেব-দ্বিজ গুরুভক্ত, ও শুদ্ধ সদাচার এবং নাটক নাটিকা-কাব্য অভ্যাস করিয়াছে। ইন্দ্রের সহিত শচীর ও মদনের সহিত রতির মিলন যেরূপ, ধনপতির সহিত খুল্লনার মিলনও সেইরূপ সুন্দর।" লক্ষপতি ধনপতিকে জানিতেন, লক্ষপতির ভ্রাতুষ্কন্যা লহনার সহিত ধনপতির বিবাহ হইয়াছে। লহনা এখনও জীবিতা। কিন্তু লক্ষপতি বোধ হয়

"একো হি দোষো গুণসন্নিপাতে
নিমজ্জতীন্দোঃ কিরণেষ্বিবাঙ্কঃ।"

এই মহাকবি-বাক্য স্মরণ করিয়া, সম্বন্ধ "দোজবরে" ধনপতির একমাত্র "দোজবরে" দোষ গ্রাহ্য না করিয়া সায় দিলেন। এখনও কোন কোন রাজা মহারাজা দোজবরে কন্যাদান করিতে ইতস্ততঃ করেন না। খুল্লনার মাতা রম্ভাবতী কপাটের আড়ালে থাকিয়া ঘটক-লক্ষপতি সংবাদ সমস্তই শ্রবণ করিয়াছিলেন। ঘটক বিদায় গ্রহণ করিলে তিনি দারুণ অভিমান-ভরে স্বামীকে বলিলেন—

"কেন দিলে হেন অনুমতি।
হিতাহিত নাহি গণ না নিব কন্যার পণ
কেন ঝিয়ে করাব দুর্গতি॥
পড়ি শুনি হৈলে পশু ব্যয় করি নিজ বসু
কন্যা দিবে দারুণ সতীনে।
লহনারে নাহি জান হেন কথা মুখে আন
করুণা নাহিক তব মনে॥
ধন জন যার ঘরে আনিয়া প্রথম বরে
বিনয়ে করিব কন্যাদান।
কন্যা পাবে কুতূহল তুমি পাবে দান ফল
লোকে গাবে অতুল সম্মান॥"

কিন্তু লক্ষপতি যখন বলিলেন যে "পূর্ব্বে—

গণক কহিল মোরে দিবে দোরজীয়া বরে
বিচারিয়া বিধবা লক্ষণ।"

কবি—১১২—১১৩।

তখন এক কথায় রম্ভাবতী জল হইয়া গেলেন ও বিবাহে আর আপত্তি করিলেন না।

ইহার পর সতীন হইতে খুল্লনার যে দুর্গতি হইয়াছিল, তাহা চণ্ডীপাঠকমাত্রেই অবগত আছেন।

এই সতীনের ভয়েই তখনকার গৃহিণীরা কন্যাকে স্বামী-সোহাগিনী করিবার জন্য নানাবিধ ঔষধির প্রয়োগ করিতেন। এই ঔষধ করার প্রথা এখনও যে একেবারে উঠিয়া গিয়াছে তাহা নহে। এখনও হিন্দুর বিবাহে স্ত্রীআচারের সময় পুরন্ধ্রীরা "ঔষধ" করিয়া থাকেন, তবে ইহা এখন আচারমাত্রে পরিণত হইয়াছে। পূর্ব্বে ইহার যে একটা অশু-প্রয়োজনীয়তা ছিল, তাহা এক্ষণে দেখিতে পাওয়া যায় না। তবে দূর পল্লী-গ্রামে এমন কি এই কলিকাতা নগরীতেও এখনও মধ্যে মধ্যে লীলাবতী ও বিদ্ব ব্রাহ্মণীর ন্যায় স্ত্রীলোকগণের ঔষধ ও বশীকরণ মন্ত্রের প্রভাবে লোককে পাগল হইতে, এমন কি জীবন পর্য্যন্ত হারাইতে শুনা গিয়া থাকে। সেকালে এই ঔষধকরণ প্রথা কিরূপ ছিল, তাহা নিম্নে বর্ণিত হইতেছে :—

"শ্মশানের ক্ষীরা আর কবর-বিছাতি
বসন ত্যজিয়া আনিবে শেষ রাতি॥
ইহা বাটি দিবে সাধু খুল্লনা বসনে।
যেন খুল্লনা পড়ে সাধুর বিষ-নয়নে॥"

কবি-পৃঃ ১৩১।

আবার—

"আনিবে আঠুনি কীট ফণিফণা হৈতে।
বিজ গড়াইয়া রাখিবে বাম হাতে॥
বসুদেব-সুতা দেবী কৃষ্ণের ভগিনী।
দ্রৌপদী হইল তার প্রবল সতিনী॥
এই ঔষধের গুণ দেখিল সাক্ষাতে।
পতি ছাড়ি গেল যথা ভাই জগন্নাথে॥"

এ সকলে না হইলে তখন নিম্নের এই চরম ঔষধঃ—

"ছিনা জোঁকের শ্বেতকাকের
আনিবে শোণিত।
কাল কুকুর মারিয়া আনিবে
তার পিত্ত॥
কচ্ছপের নখ আন কুম্ভীরের দাঁত।
কোঠরের পেঁচা আম গোধিকার আঁত॥
বাদুড়ের পাখা আন শজারুর কাঁটা।
তেমাথার পোড়ায়ে ললাটে দিহ ফোঁটা॥

শংখের মুড়াটী আন জেটী মিথুনের মুণ্ড।
যোমা গাড়রের শিং চাতকের তুণ্ড ॥
দিগম্বর হৈয়া কামরূপ মুখে বাটে।
অলক্ষিতে পায় স্বামী শয়নের খাটে ॥"

সেক্ষপীয়র-পাঠক এই শেষোক্ত বর্ণনার সহিত Macbeth এর ডাইনিরা ঔষধের যে উপকরণ সংগ্রহ করিতেন তাহা মিলাইয়া দেখিলে দেখিতে পাইবেন যে, প্রকৃত সকল দেশে সকল সময়ে এক।

এই সকল বীভৎস রসোদ্দীপক উপকরণ আধুনিক বঙ্গমহিলাগণের প্রীতিকর হইবে না। এই হেতু আমরা তাঁহাদিগের জন্য নিম্নলিখিত উপকরণগুলি লিখিয়া দিলাম:—

"মালীর মালঞ্চে ফুল আনিবে গুলাল।
শিরীষ কুসুম কুন্দ পদ্মের মৃণাল ॥
পঞ্চফুল সমতুল করিয়া আধান।
মন্ত্র পড়ি স্বামীরে হানিবে পঞ্চবাণ ॥"

কবি ১৩২।

ইহা যে সে ঔষধ নহে, খুব বড় ঘরে ইহার পরীক্ষা হইয়া ইহা অব্যর্থ ফলপ্রদ বলিয়া স্থির হইয়াছে; কারণ—

"পঞ্চপতি এক নারী দ্রুপদ-নন্দিনী।
ইহাতে বঞ্চিত কৈল সকল সতিনী ॥
স্বামীর সম্ভোগ চান্দ রাখিবে যতনে।
বাঘ তেল সনে রামা রাখিহঁ নির্জ্জনে ॥"

এই "বাঘ তেলের" পরিবর্ত্তে তাঁহারা "কুন্তলীন" বা "জবাকুসুম" বা "কেশরঞ্জন" ব্যবহার করিতে পারেন, তাহাতে কোন ক্ষতি হইবে না।

নারীগণ কেবল যে স্বামী বশ করিবার জন্যই ঔষধের ব্যবহার করিতেন তাহা নহে। শ্রীধর্ম্মমঙ্গলেও আছে, কুমার লাউসেন যখন গৌড়দেশ গমনের জন্য মাতা-পিতার অনুমতি চাহিলেন, তখন তাঁহারা নানাকথায় তাঁহাকে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য না হইয়া অবশেষে রাণী—

"দাসী-সনে যুকতি কেমনে রয় গো।
প্রবোধিছে মাধিকী নয়নে মুছে লো ॥
ঔষধ করিয়া রাখ আপন নন্দন।
রাণী বলে কে আছে এমন গুণীজন ॥
দাসী বলে গোলাহাটে সুরিক্ষা-বেড়ী।
গুয়াপানে মিশাইয় ঔষধের গুঁড়ি ॥
রেতে করে মানুষ দিবসে করে অজা।"

শ্রীধর্ম্ম—৬৬।

এ ঔষধ রাণীর ভাল লাগিল না। "রেতে করে মানুষ দিবসে করে অজা"—ঔষধের এই গুণ শুনিয়া তাঁহার ভয় হইল, কি জানি জীবনসর্ব্বস্ব পুত্রধনের যদি কোন অনিষ্ট হয়। এ সতীনের ভয় নহে, সতীনকে জব্দ করিবার জন্য বিধবা হইবারও ইচ্ছা হয়, কিন্তু পুত্র যে অজা হইয়া থাকিবে, ইহা অসহ্য।

"রাণী বলে দূর কর হেন ছার ওঝা।
বরঞ্চ এমন কেহ মহামল্ল থাকে।
বিক্রমে বাছারে মোর খোঁড়া করি রাখে ॥
চরণ ভাঙ্গিলে ঘুচে গমনের আশ।
ঘরে বসে চাঁদ মুখ দেখি বার মাস ॥" ঐ

বাঙ্গালী হিন্দু জননীর কথাই বটে। ইহা অপেক্ষা ভালবাসার অত্যাচার আর কি হইতে পারে?

এই সতীনের যন্ত্রণার উপর আবার "শাশুড়ী সাপিনী, ননদী বাঘিনীরা" ছিলেন। স্বামী-সুখ অনেক রমণীর ভাগ্যেই ঘটিত না। কিরূপে ঘটিবে? একে ত সতীনের জ্বালা। তাহার উপর জনকেরা অধিক পণের লোভে বা কৌলীন্যের অনুরোধে ঘাটের মড়াকেও কন্যাদান করিতেন। কোন রমণীকে গোদা পতির জন্য প্রত্যহ কোমা অংর:ঔষধ অন্বেষণ করিতে হয়। গোদে তৈল মাখাইতে মাখাইতে ভাদ্রমাসের

"দুর্ব্বার পাঁকই" এর গন্ধে তিনি অতি কষ্টে ক্রন্দার সম্বরণ করেন। এক এক গোয়ের চিকিৎসায়—

"ঘটি বাটি থালা বন্ধকে বিকিলা
কলুর কড়ির শোধে।" শ্রীধর্ম্ম ৯২।

কাহারও পতি বৃদ্ধ, দন্তহীন। তিনি কি বলেন বুঝিতে পারা যায় না। কিন্তু একেবারে অধিক দুইবার জিজ্ঞাসা করিবার উপায় নাই, তাহা হইলেই গালাগালি খাইতে হইবে। ভোজন করিবার সময় গলা সাঁই সাঁই করে, তরল দ্রব্য ভিন্ন আগার করিতে পারেন না; বুড়ার আরও গুণ আছে,—

"দৃঢ় ব্যঞ্জন আমি যেই দিন রাঁধি।
মারয়ে পীঁড়ার বাড়ি কোণে বসি কাঁদি॥"

কাহারও পতি একাধারে কাণা ও খোঁড়া। খোঁড়া এক পা চলিতে পারে না, রাত্রি দিন পীঁড়ায় বসিয়া থাকে। গুণের মধ্যে অবিরত কটু বলা। সেকালের বাঙ্গালা সাহিত্যে নারীদের পতিনিন্দা ও বারমাসের দুঃখবর্ণনের এত বাহুল্য পরিলক্ষিত হয় যে তাহা হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে তখনকার স্ত্রীলোকদের অনেকেই দাম্পত্য সুখে বঞ্চিতা ছিলেন।

উপরে আমরা জনার্দ্দন ওঝা ও রম্ভাবতীর কথায় কন্যাবিক্রয়ের প্রথা দেখিতে পাই। মনসার ভাষাণেও দেখি আর এক জনার্দ্দন ওঝা, চাঁদ সদাগরকে বলিতেছেন—

"পণাপণ নাহি লয় দানে কন্যা দিতে যায়
তোমার ছাওয়াল লখিন্দরে।" মনসা ১৪।

শুক্রবিক্রয় শাস্ত্রনিষিদ্ধ হইলেও আমাদের সমাজে উহা বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। নিকৃষ্ট ব্রাহ্মণদিগকেও পণ দিয়া বিবাহ করিতে হইত, এবং এখনও হইয়া থাকে। কিন্তু পণ না লইয়া কন্যাদান করার যে পুণ্য ও যশ উভয়ই ছিল তাহা উপরি উদ্ধৃত বাক্যাংশ হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায়।

বর্ত্তমান সময়ে কন্যাবিক্রয় কিছু কমিয়াছে বটে, কিন্তু পুত্রবিক্রয় অধিকতর তেজে চলিতেছে। এ প্রথা রহিত করণের উদ্যোগ শুক্রবিক্রয়-নিবারিণী বা এইরূপ কোন সভার Resolation এ পর্য্যবসিত হইয়াছে।

যে সকল কন্যা শ্বশুর-ঘর করিত না, অর্থাৎ যাহাদের স্বামীরা শ্বশুর-বাড়ীতে ঘর-জামাই হইয়া থাকিত, তাহাদিগকে সপত্নী বা শাশুড়ী ননদের যন্ত্রণা ভোগ করিতে না হইলেও, অন্য নানাপ্রকার লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইত। দেবতাদিগের মধ্যে শিবই চিরদুঃখী। গৌরীর সহিত বিবাহের পর মহাদেব শ্বশুরালয়েই বাস করিতে লাগিলেন। সেইখানেই গুহ ও গজাননের জন্ম হইল। শিব মনে করিলেন, এবার তাঁহার কপাল ফিরিয়াছে, আর ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা জীবন ধারণ করিতে ও ছাই ভস্ম মাখিয়া শ্মশানে মশানে রাত্রিযাপন করিতে হইবে না। শ্বশুরের পয়সায় সিদ্ধি ভাঙ্গ খাইয়া বেশ দিন কাটিবে। তিনি গৌরীর সঙ্গে পাশা খেলিয়া বেশ সুখে কাটাইতে লাগিলেন। তবে ঘর-জামাই হইয়া থাকায় সময়ে সময়ে তাঁহার মনে যে লজ্জার উদয় হইত না এমন নহে। তাঁহার—

"সকলি আনন্দময় সবে মাত্র এক ভয়
শ্বশুরান্নে সদাই ভোজন।
ঘরজামাতার ভাত, ঘোর দুঃখে বিশ্বনাথ,
ঘুচাইলা লজ্জার বসন॥
করিয়া শ্যালক সেবা, শ্বশুরান্নে রহে যেবা
তাহার জীবনে শত ধিক্।"
শিবা—২৯।

ইহার উপরে শাশুড়ী মেনকাঠাকুরাণী বড় বাড়াইয়া [illegible]লেন। আর তিনিই বা কি করিবেন। গিরিরাজ গৃহস্থ মানুষ,

নিজের সংসার লইয়াই ব্যতিব্যস্ত, তাহার উপর আর একটী সংসারের ভার কত দিন বহন করিবেন ? এ দিকে গৌরী এক মেয়ে, বড়ই আদরের সংসারের কোন কাজই করেন না, দুগ্ধ উত্‌লাইয়া পড়িলে তাহাতে একটু জল দিয়াও উপকার করেন না। এক দিন মেনকা দেখিলেন, গৌরী সখীর সঙ্গে পাশা খেলায় মত্ত রহিয়াছেন, তাঁহার অসহ্য হইল, তিনি রাগ করিয়া তিরস্কার করিতে লাগিলেন—

"তোমা ঝিয়ে হৈতে গৌরী মজিল গিরিরাজ।
ঘরে জামাই রাখি পুষিব কতকাল ॥
প্রভাতে খাবার মাঙ্গে কার্ত্তিক গণাই।
চারি কড়ার সম্ভাবনা তোর ঘরে নাই ॥
দরিদ্র তোমার পতি গায় বাঘছাল।
সবে ধন বুড়া বৃষ গলে হাড়মাল ॥
প্রেত পিশাচ ভূত নিরবধি সঙ্গ।
শাশুড়ী হ'য়ে কত কিনে দিব ভাঙ্গ ॥
অভাগ্যেতে ঘটিছে সদাই উৎপাত।
রান্ধিয়া বাড়িয়া কাঁকালে হৈল বাত ॥
যদি দুগ্ধ উথলায় নাহি দেও পানি।
পাশা খেল সবে মিলি দিবস রজনী ॥
মিথ্যা কাজে ফিরে স্বামী নাহি চাষ বাস ॥
ভাত কাপড় কত যোগাব বারমাস ॥
দুই পুত্র তিন দাসী স্বামী শূলপাণি।
প্রেত ভূত পিশাচের নাম নাহি জানি ॥
লোক লাজে স্বামী মোর কিছু নাহি কয়।
জামাতার পাকে মরে হৈল সর্প ভয় ॥"

কবি—২৬।

মেনকার তিরস্কার গৌরীর বড়ই প্রাণে বাজিল। তিনি বলিলেন—

"রান্ধিয়া বাড়িয়া মাগো, কত দেহ খোঁটা।
আজি হৈতে তোমার ঘরে পুতিলাম কাঁটা ॥
মৈনাক তনয় লৈয়া সুখে থাক ঘর।
কভু না সহিব খোঁটা যাব অন্তরে ॥" ঐ

সেই দিন হইতে শিবের পোড়া কপাল আবার পুড়িল। গৌরী বাপের বাড়ী পরিত্যাগ করিলেন।

"এই হেতু মহেশ্বর কৈলাসে করিয়া ঘর
নগরে মাগিয়া খায় ভিক্ষা।" শিবা—২৯।

ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে ঘরজামাইয়ের এই লাঞ্ছনা এখানকার মত, তখনও হিন্দুর ঘরে হইত।

এবার আমরা সে কালের রমণীদের কয়টি গুণের কথা বলিব। যাঁহারা ভাবেন যে তখন বালিকাবিদ্যালয়ে সকল স্থাপিত হইয়া বঙ্গদেশে স্ত্রীশিক্ষা আরম্ভ হইয়াছে, সে কালে স্ত্রী শিক্ষা প্রচলিত ছিল না, তাঁহাদের এই ধারণা ভ্রান্ত বলিয়া আমার মনে হয়। কারণ তদানীন্তন বাঙ্গালা সাহিত্যে অবস্থাপন্ন উচ্চশ্রেণীর হিন্দু পরিবারের রমণীগণের শিক্ষার কথা দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহারা এমন কি নৃত্যগীতেও কুশলা হইতেন। এখনকার হিন্দুসমাজে স্ত্রীলোকদের মধ্যে এই নৃত্যগীতাদি কলা বিদ্যার বড়ই অনাদর হইয়াছে। আমরা দেখিতে পাই লহনা ও তাঁহার সখী লীলাবতী খুল্লনার রূপনাশ করিবার জন্য—

"দুই জনে এক স্থানে করিয়া যুকতি।
কপট প্রবন্ধে পত্র লেখে নানা ভাতি ॥"

কবি—১৩৩।

শুধু লেখা নহে, স্বামী স্ত্রীকে পত্র লিখিলে যেখানে যে পাঠ লিখিতে হয়, তাহাও তাঁহারা জানেন। নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতে লহনা ও লীলাবতীর "পত্র লিখিবার ধারা" জ্ঞানের পরিচয় ও সেকালের স্ত্রীর প্রতি স্বামীর পত্রের একটি নমুনা পাওয়া যাইবে :—

"স্বস্তি আগে লিখিয়া লিখিল ধনপতি।
অশেষ মঙ্গলধমি লহনা যুবতী ॥
তোরে আশীর্ব্বাদ দিয়ে পরম পিরীতি।
আমার বচনে তুমি কর অবগতি ॥

মোর সমাচার দূত-বচনে শুনিবে।
আপন কুশল প্রিয়ে, লিখিয়া পাঠাবে॥
দুঃখে পাইনু আমি রাজার আরতি।
গৌড়ে অনেক দিন হবে মোর স্থিতি॥
নিজ বার্ত্তা দিয়া কর দুঃখ নিবারণ।
পিঞ্জরের তরে কিছু পাঠাবে কাঞ্চন॥
* * * *
অবশ্য অবশ্য করি লিখিলেন পাতি।
শ্রীমুখখান করি করিলেন ইতি॥" ঐ

এই কৃত্রিম পত্র যখন খুল্লনার হস্তে দেওয়া হইল, তখন খুল্লনা—

"লহনার বোলে পড়িল পাতি।
হাসে ছন্দ দেখি ভিন্ন ভাতি॥
বলে—দিদি ইবে নাহিক ত্রাস।
কেনে লিখি পত্র কর উপহাস॥
মোর প্রভুর অক্ষর ভিন্ন ছন্দ।
কেনে লিখি পত্র কপট প্রবন্ধ॥"

কবি। ১৩৪।

"পদকল্পতরুতে" দুই এক স্ত্রী কবির রচিত কবিতা দেখা যায়।

যখন শ্রীমন্ত সিংহলরাজের কন্যাকে বিবাহ করিয়া কয়েকমাস সিংহলে বাস করিবার পর দেশে ফিরিবার জন্য ব্যাকুল হইলেন, তখন সিংহল-রাজকন্যা সুশীলা স্বামীকে নানা সুখের প্রলোভন দেখাইয়া তাঁহাকে নিবৃত্তি করিবার চেষ্টা করিতেছেন। সেই সকল প্রলোভনের মধ্যে একটি এই যে, সুশীলা ও তাঁহার সখীগণ নৃত্যগীতের দ্বারা শ্রীমন্তের চিত্তবিনোদ করিবেন।

"আষাঢ়ে ডাকয়ে মেঘ নাচয়ে ময়ূর।
নব জলধরে মত্ত ডাকয়ে দাদুর॥
সব সখীগণ মিলি গাইব গীত।
আষাঢ়ে বিবিধ সুখে নিবারিব চিত॥"

কবি—২৯১।

আবার—

"আশ্বিনে অম্বিকা পূজা করিবে হরিষে।
ষোল উপচার দিয়া ছাগল মহিষে॥
নানা বেশ করিব সকল সহচরী।
নাট্য গীতে গোঙাইব দিন বিভাবরী॥" ঐ

মৃতপতিকে পুনর্জ্জীবিত করিবার জন্য বেহুলা যখন নেত ধোপানীর সহিত সুরপুরে দেবতাদিগের নিকট বর প্রার্থনা করিতে যাইতেছেন, তখন ধোপানীর উপদেশে—

"দেবতার সভায় নৃত্য করিতে সুন্দরী।
মধুর মৃদঙ্গ তবে নিল কক্ষে করি॥
সুরপুরে নৃত্য করে বড়ই রসাল।
দেখিয়া সকল দেব বলে ভাল ভাল॥
বেহুলার নৃত্যগীতে দেবগণ মোহে।"

মনসা—৫৬।

এই সকল কলাবিদ্যা ব্যতীত তখনকার ভদ্রঘরের স্ত্রীলোকেরা পাশা ক্রীড়ায়ও বিলক্ষণ কুশলা ছিলেন। এখন তাস পাশার স্থান অধিকার করিয়াছে।

নীচজাতীয় স্ত্রীলোকগণ এরূপ লেখাপড়া বা নৃত্যগীত জানিত না বটে, কিন্তু তাহারা পুরাণ ও ভাগবত শ্রবণ করিয়া যে শিক্ষা প্রাপ্ত হইত তাহা কম মূল্যবান্ নহে। এই পুরাণ বা ভাগবতের পাঠনা তখন প্রায় প্রত্যেক সম্ভ্রান্ত হিন্দুর গৃহেই হইত। এবং জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সকলেই তাহা শুনিতে আসিত। ব্যাধ প্রভৃতি নীচজাতীয় স্ত্রীগণেরও পুরাণের অনেক অমূল্য উপদেশ কণ্ঠস্থ ছিল ও তাহারা তদনুসারে আপনাদের চরিত্র গঠিত করিবার চেষ্টা করিত।

এই লেখাপড়া শিক্ষা ছাড়া তখনকার স্ত্রীলোকেরা আর একটি অতি প্রয়োজনীয় বিষয় শিক্ষা করিতেন যাহার প্রতি অনুরাগের অভাব আধুনিক বঙ্গীয় রমণীগণের মধ্যে বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। আমি রন্ধন-শিক্ষার কথা বলিতেছি। সে কালের স্ত্রীলোকেরা স্বয়ং রন্ধন করিয়া লোকজনকে খাওয়াইতে ভাল বাসিতেন।

ভাল রাঁধুনি হইতে পারা তখন একটা অত্যন্ত গৌরবের কথা ছিল। তখন লোকে যার তার হাতে খাইতে চাহিতেন না। স্বজাতীয় হইলেও সচ্চরিত্রা না হইলে সে স্ত্রীলোকের হস্তে অন্নগ্রহণ করিলে পাপস্পর্শ হইবে ইহা লোকের ধারণা ছিল। যে রমণী ভাল রাঁধিতে পারিতেন, ও তাঁহার হস্তে সকলেই অন্নগ্রহণ করিত, সমাজে তাঁহার যেরূপ সম্মান ছিল, এখন দশ হাজার টাকার বহুমূল্য অলঙ্কারপরিধানা কোন রমণীও সে সম্মান প্রাপ্ত হন না। কাহারও বাটীতে ক্রিয়া কর্ম্ম উপস্থিত হইলে, এই সকল স্ত্রীলোককে বিশেষ সম্মানের সহিত হস্তে পান গুপারি দিয়া রন্ধনার্থ আহ্বান করা হইত। এখন রন্ধন একটা অপমানের কার্য্য বলিয়া গণ্য হইয়াছে ও সহরে, এমন কি সুদূর মফস্বলেও মধ্যবিত্ত গৃহস্থের বাটীতে "ঠাকুরের" আবির্ভাব হইয়াছে। গলায় একগাছি সূত্র থাকিলেই হইল, লোকে ঠাকুরের পরিচয় লইতে সাহস করে না. পাছে পরিচয়ে জাতির কোন গোল বাহির হইয়া পড়িলে সে ঠাকুরকে বিদায় করিতে হয়। যাঁহাদের রাঁধুনি বামুন রাখিবার ক্ষমতা নাই, তাঁহারা দরিদ্র কুটুম্বিনীদিগের দ্বারা সেই কার্য্য করাইয়া থাকেন। কিন্তু তখন রাজরাণীরাও রন্ধন করিতেন। রাঁধিয়া রাঁধিয়া গিরিরাজ-মহিষী মেনকারও কোমরে বাত ধরিয়াছিল, ইহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। হরধনুর্ভঙ্গের পর যখন জনক-রাজসভায় রামাদি চারি ভ্রাতার বিবাহ হইয়া গেল, তখন—

"বলেন জনক রাজা শুন নিবেদন।
সকলে আমার ঘরে করিবে ভোজন॥
ভাল ভাল বলিয়া দিলেন অনুমতি।
আয়োজন করিলেন জন
রাজরাণী ঘরে গিয়া করেন রন্ধন।
এক অন্ন হইল আর পঞ্চাশ ব্যঞ্জন॥"

রামা—৮৬।

চাঁদসদাগর যখন বেহুলার সহিত লখিন্দরের সম্বন্ধ স্থির করিতে গেলেন, তখন অগ্রে রন্ধন বিষয়ে তাঁহার পরীক্ষা লইলেন।

ধনপতি সদাগর পিতৃ শ্রাদ্ধ করিয়া নানা দেশ হইতে স্বজাতিগণকে নিমন্ত্রিত করিয়া আনিলেন। ধনপতি তাঁহাদিগের আহারের সমস্ত বন্দোবস্ত করিলেন। কিন্তু তাঁহারা বলিলেন—দেখ ধনপতি তোমার বাড়ীতে আমরা অন্নগ্রহণ করিব না। তুমি যখন বিদেশে ছিলে তোমার যুবতী ভার্য্যা খুল্লনা বনে বনে ছাগল চরাইয়া বেড়াইয়াছে।

"যেই বনে আছে কতশত মাতোয়াল।
সেই বনে জায়া তোমার ছেলির রাখাল॥
খুল্লনা পরীক্ষা দেখ যদি বটে সতী।
তবে নিমন্ত্রণ সবে দিব অনুমতি॥
দোষ গুণ তার না করিয়া বিচারণ।
খুল্লনা রান্ধিলে দেখি কে করে ভোজন॥"

কবি—১৭৭।

ধনপতির শিরে বজ্রাঘাত হইল। খুল্লনা সকল শুনিলেন। পতিব্রতা খুল্লনা কাতর স্বামীর নিষেধ সত্ত্বেও পরীক্ষা দিলেন। যখন অগ্নিপরীক্ষা পর্য্যন্ত হইয়া খুল্লনা সমাজের সমক্ষে নিষ্কলঙ্কা বলিয়া প্রমাণিত হইলেন, তখন—

"পরীক্ষাতে জয়ী রামা অভয়ার বরে।
রন্ধন করিতে আজ্ঞা দিল সদাগরে॥
স্মরিয়া অভয়া রামা বসিলা রন্ধনে।
দুর্ব্বলা যোগায় দ্রব্য যে চায় যখনে॥"

কবি—১৮৬

খুল্লনা কি কি রন্ধন করিলেন শুনুন—

"শাক সূপ রাঁধিল ভাজিল ফুলবড়ি।
ঘৃত দিয়া ভাজিল করলা পলা কড়ি॥

কটু তৈলে কৈ মৎস্য ভাজে পণ দশ।
মুড়া নিচোড়িয়া তাহে দিল আদার রস ॥
খণ্ডে মুগের সূপ খানি ট্টভারে ভারয়ে।
আচ্ছাদন থালা খানি তাহার উপরে ॥
পঞ্চাশ ব্যঞ্জন অন্ন করিল রন্ধনে।
দুর্ব্বলা জানাল গিয়া সাধু সন্নিধানে ॥" ঐ

তখন—

"প্রাঙ্গণে বসিল যত জ্ঞাতি বন্ধুজন।
খুল্লনা কনক-থালে যে গায় ওদন ॥
সুবর্ণের বাটীতে লহনা দেন ঘি।
হাসিয়া পরশে রামা বণিকের ঝি ॥
প্রথমে শুক্তার ঝোল দিল ঘণ্টশাক।
প্রশংসা করেন তারে রন্ধনের পাক ॥
ভাজা মীন মাংস দিল ঝোলের ব্যঞ্জন।
গন্ধে আমোদিত হইল ভোজন-ভবন ॥
মিঠা দধি খাইল বেণে মধুর পায়স।
ভোজন করিয়া সবে হইল লজ্জাবশ ॥
সমাধি ভোজন সবে কৈল আচমন।
কর্পূর তাম্বূল কৈল মুখের শোধন ॥" ঐ

তাহার পর যাহার যেরূপ প্রাপ্য সম্মান গ্রহণ করিয়া বণিকের বিদায় হইল।

এ রন্ধন অপেক্ষা খুল্লনা গৃহে স্বামীর তৃপ্তির জন্য যে রন্ধন করিতেন তাহা আরও পরিপাটি। উপরি-উদ্ধৃত রন্ধনে মৎস্য মাংসের বিশেষ আড়ম্বর নাই, কিন্তু নিম্ন-লিখিত রন্ধন আমিষাশীর বড়ই প্রীতিকর হইবে। এখানেও পণ দশ কৈ মাছ ভাজা, তাহাতে মরিচ গুঁড়া ও আদার রস।

"মুগ সূপে ইক্ষু-রস, কৈ ভাজে পণ দশ
মরিচ গুঁড়িয়া আদারসে ॥
মহুরি মিশ্রিত মাস সূপ রান্ধে রসবাস
হিঙ্গু জীরা বাসে সুবাসিত
ভাজে চিতলের কোল রোহিত মৎস্যের
ঝোল
মান বড়ি মরিচে ভূষিত
বোয়ালি হেনকা শাক কাঠি দিয়া কৈল পাক
ঘন বেসায় সন্তলন তৈলে।
কিছু ভাজে রাই খড় চিঙ্গড়ির তোলে বড়া
খরশোলা পুঁজী দশ তোলে ॥
করিয়া কণ্টকহীন আম্রে শকুল মীন
খর লোন দিয়া ঘন কাটি।
রান্ধিল পাঁকাল রস দিয়া তেঁতুলের রস
ক্ষীর রান্ধে জ্বাল করি ভাঁটি ॥" ঐ

হায়! এই "মগুরে কৈ" ও "ঘুষা চিংড়ি' প্লাবিত দেশে রাঢ় কবি মুকুন্দরামের দিন কি ফিরিয়া আসিবে না? ইহার উত্তর Government fisheries commissionই দিতে পারেন।

ইহার পর অষ্টাদশ শতাব্দীতে পদার্পণ করিলে আমরা আমাদের চিরপ্রিয় লুচি ও পলান্নের দর্শন পাই। গৌরী অন্নপূর্ণা মূর্ত্তি ধারণ করিয়া,

"ঘৃত পলান্নে পূরিয়া হাতা।
পরশেন হরে হরিষ মাতা।
পঞ্চমুখে শিব খাবেন কত।
পূরেন উদর সাধের মত ॥" অন্ন—১৩১।

সুন্দর বিদ্যার মন্দিরে—

"অপূর্ব্ব সন্দেশ নামে এলাইচ দানা।
ফুল চিনি লুচি দধি দুগ্ধ ক্ষীর ছানা ॥"
প্রসাদ—১৪৯।

আহার করিয়া তৃপ্ত হইতেছেন।

লুচি পলান্ন আহারের পর নিরামিষাশী বৈষ্ণব কবিগণের "পটোল কুষ্মাণ্ড বড়ি মান-কচু" আর "দশবিধ শাক নিম তিক্ত শুক্তার ঝোল' খাইয়া মুখ খারাপ করিবার প্রয়োজন নাই। তবে তাঁহাদের—

"কাঞ্জী বড়া দুগ্ধ চিড়া দুগ্ধ লকলকী।
আর যত পিঠা তাহা কহিতে না শকি
ঘৃতসিক্ত পরমান্ন মৃৎকুণ্ডিকা ভরি।
চাঁপা কলা ঘন দুগ্ধ আম্র তার পরি।
রসালা[illegible] দধি সন্দেশ অপার ॥'
গৌড়ে উৎকলে যত ভক্ষ্যের প্রকার ॥"
চৈতন্ত চরি

এই মিষ্ট মুখ করিয়া আমরা সে কালের বঙ্গীয় হিন্দুর পাকশালা হইতে বিদায় হইতে পারি।

পূর্ব্বেকার লোকেরা আমাদের মত অসামাজিক ছিলেন না। এখন যেমন নিমন্ত্রণ রক্ষা করা একটা অতি অপ্রীতিকর ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তখন সেরূপ ছিল না। এখন প্রায়ই দেখিতে পাই, গৃহস্বামী ধনী হইলে, তাঁহার বাটীতে দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত অবস্থার অভ্যাগতগণের অভ্যর্থনার ভার সামান্য কর্ম্মচারীদের উপর পড়িয়া থাকে গৃহস্বামী স্বয়ং কোন সংবাদই লয়েন না; এইজন্য অনেকেই আজকাল এ নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে একান্ত নারাজ। কিন্তু তখনকার নিয়ম ছিল, যে অভ্যাগত যতক্ষণ অভুক্ত থাকিতেন, গৃহস্বামী ও কর্ত্রী ততক্ষণ জলগ্রহণ করিতেন না। অতিথি সৎকারেরও এইরূপ নিয়ম ছিল। কর্ত্রী স্বহস্তে রন্ধন করিয়া অতিথিকে আহার করাইতেন। অতিথি কাহারও বাটী হইতে বিমুখ হইয়া ফিরিয়া গেলে, গৃহস্থ বড়ই ক্লেশ পাইতেন ও অমঙ্গলের আশঙ্কা করিতেন। যাঁহারা দাতাকর্ণের গল্প পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন, সেকালের হিন্দুসমাজে অতিথির সম্মান কিরূপ ছিল। এখন অতিথি দূরের কথা, অসময়ে অর্থাৎ হাঁড়ি উঠিয়া গেলে, আত্মীয় স্বজনও বাটীতে আসিলে গৃহলক্ষ্মীগণ যৎপরোনাস্তি বিরক্ত হন, ও অনেক সময়ে দোকানের খাবারে অভ্যাগতদিগের সৎকার করা হয়। এই অতিথি-সৎকারে যেরূপ পরসেবা ও পরার্থপরতার শিক্ষা হইয়া থাকে, এরূপ অন্য কার্য্যের দ্বারা হয় না। অতিথি-সৎকারের লোপের সহিত আমাদের মধ্য হইতে এই দুইটী গুণ অন্তর্হিত হইয়াছে।

এখানে একটি কথা বলা [illegible] প্রয়োজন করিতেছি। বোধ হয় কবিকঙ্কণের সময়ে ব্যাধপত্নীরা হাটে ও পথে মাংস বেচিয়া বেড়াইত, ও সেই মাংস ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়েরা না হউক, অন্য শ্রেণীর হিন্দুরা আহারার্থ ক্রয় করিতেন। তাহা না হইলে ফুল্লরার—

"আশ্বিনে অম্বিকা পূজা করে জগজনে।
ছাগ মহিষ মেষ দিয়া বলিদানে॥
উত্তম বসনে বেশ করয়ে বনিতা।
অভাগী ফুল্লরা করে উদরের চিন্তা॥
মাংস না লয় কেহ করিয়া আদরে।
দেবীর প্রসাদ মাংস সবাকার ঘরে॥"

কবি—৮৩।

এই খেদের কারণ কি?

এ বার বেশভূষা ও অলঙ্কারের কথা। অলঙ্কারপ্রিয়তা স্ত্রীলোকদের স্বভাব। এ বিষয়ে সেকালে ও একালে বড় প্রভেদ দৃষ্ট হয় না। তবে কালভেদে অলঙ্কারের প্রভেদ দৃষ্ট হইয়া থাকে। তখন সধবা স্ত্রীলোকদের নিকট শাঁখার বড় আদর ছিল। শাঁখারীরা সেই শাঁখার উপর আপনাদের শিল্পনৈপুণ্য প্রকাশ করিত, বিশেষতঃ কৃষ্ণলীলার ছবিই তাহাতে অঙ্কিত হইত।

"কোথাও পূতনাবধ শকটভঞ্জন।
কোনখানে কৈল কৃষ্ণ মৃত্তিকা ভক্ষণ॥
কোনস্থানে উদূখলে বদ্ধ দামোদর।
যমল অর্জ্জুন ভঙ্গ রঙ্গ তারপর॥"

ইত্যাদি। শিবা—৯৭।

শাঁখারিরা কাপড়ে শাঁখা বাঁধিয়া ও "বাঁ হাতে সাঁড়াশি ডাঁড়ি নড়ি সব্য হাতে" লইয়া লোকের বাড়ী বাড়ী যাইত, মেয়েরা তাহাকে ঘেরিয়া বসিত, ও যাহার যেরূপ ক্ষমতা সেইরূপ দরের শাঁখা লইয়া পরিত। শাঁখার দর কষাকষি করিতে করিতে তাহারা সময়ে সময়ে বণিকের সহিত অতি নির্লজ্জ ব্যবহার করিত। যিনি লজ্জা

পরিধান করিবেন তিনি সুন্দর বেশবিন্যাস করিয়া শাঁখারির নিকটে বসিতেন ও অন্যান্য স্ত্রীলোকেরা তাঁহাকে ঘেরিয়া বসিত। তারপর শাঁখারি তাঁহার হাত দুইটি ও শঙ্খ গঙ্গাজলে ধৌত করিয়া প্রথমে বাম জোড়াটী হস্তে পরাইতেন। পরে দক্ষিণ হস্তে পরান হইত। দক্ষিণ হস্তে শাঁখা পরানই বড় কষ্টকর। এইজন্য—

"উরুতের উপর উমার হস্ত রাখি।
সহলে সহলে মলে তেলে জলে মাখি॥
একগাছি অনেক যতনে হইল পার।
তিন গাছি আছে ত্রিভুবন অন্ধকার॥
দলে মলে টিপাটিপি করে দণ্ডময়।
এক গাছি গেল আর দুটিগাছি রয়॥
সেই দুটি গাছি শঙ্খ পরিবার কালে।
ভাসিলেন ভগবতী লোচনের জলে॥
* * *
মাংস চুরি করিয়া বাঁধব ঠেলে শাঁখা।
কড় কড় করে কর যত যায় জাঁকা॥
ব্যস্ত হয়ে বিধুমুখী হস্ত লন টেনে।
হাঁটু দুটী আঁটিয়া আটক করে বেগে॥
কোলে করি কন্যার জননী রয় বসে।
মাসী পিসি দুপাশে দুজন বসে ঠেসে॥
কোমলাঙ্গী কান্দেন করিয়া কাকুর্ব্বাদ।
কাতর হইয়া কত করেন বিষাদ।
দুর্গার দেখিয়া দুঃখ দহে যত দারা।
দারুণকে দূর ক'রে দিতে বলে তারা॥
সহরে শাঁখারী ডাকি শীঘ্র আন ধেয়ে।
হায় হায় হায় হেদে হত্যা হৈল মেয়ে॥"

শিবা—১০৫

অবশেষে যখন অতিকষ্টে শাঁখা যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইল, তখন কন্যার মুখে হাসি দেখা দিল ও সকলে হুলাহুলি করিয়া হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন।

তখনকার স্ত্রীলোকদের মধ্যে কাঁচুলির ব্যবহার খুব ছিল দেখিতে পাওয়া যায়। কর্ণাটী কাঁচুলীর বিশেষ আদর ছিল। সেই কাঁচুলীও নানা শিল্প কার্য্যে চিত্রিত হইত।

তখন বঙ্গের গৃহলক্ষ্মীরা সাবানের ব্যবহার জানিতেন না। হরিদ্রা কুঙ্কুম তৈল দিয়া অঙ্গের মলা দূর করিতেন, ও আমলকী দিয়া কেশমার্জ্জন করিতেন। এখন আমাদের জীবনে কেমন একটা অসুখ ও ঔদাসীন্যের ছায়া আসিয়া পড়িয়াছে। তাহার ফলে দেখিতে পাই যে আজকাল আমাদের স্ত্রীলোকেরা আপনাদের শরীরের প্রসাধনে পূর্ব্বের ন্যায় যত্নবতী নহেন। দুই একটী সন্তান হইলে তাঁহারা এবিষয়ে একেবারে উদাসীন হইয়া পড়েন। সে সময়ের এক ধনীর গৃহের গৃহিণীর প্রসাধনের বর্ণনা করিয়া আমরা প্রবন্ধের এ অংশের উপসংহার করিব।

"অবধানে আলুয়ায় বন্ধনের দড়ি।
দোছটি করিয়া পরে বার হাত শাড়ী॥
দাসীতে মার্জ্জনা করে লয়ে প্রসাধনী॥
বাম করে হেম দণ্ড কনক দর্পণী॥
আঁচড়িল কেশ-পাশ নানা পরবন্ধে।
তৈলযুত হয়ে পড়ে লহনার স্কন্ধে॥
কবরী বাঁধিল রামা নাম গুয়ামুটি।
দর্পণে নেহালি দেখে যেন গুয়াগুটী॥
মাছিতা দেখিয়া মারে দর্পণে চাপড়।
বাছিয়া পরয়ে মেঘ ডুম্বুরু কাপড়॥
দোয়ালি কাকালি বান্ধি হৈল খঞ্জু কায়।
মণিময় হার কুচযুগলে লোটায়॥
যতনে তুলিয়া রামা বান্ধে পয়োধর।
বিনোদ কাঁচুলি পরে তাহার উপর॥
যতনে পরয়ে রামা কজ্জল সিন্দুর।
মার্জ্জনা করিয়া পরে মণি কর্ণপূর॥"

কবি—১৫২।

প্রধান, গজমতি হার, ঘোস্তুতি তেস্তুতি, হিঙ্গুল হেম কণ্ঠমালা, নাসার বেশর,

করেতে কঙ্কণ ত্রিশঙ্খ বাজুবন্দ ছড়া, টাড়, বাউটি, কটিতে কিঙ্কিণী, পদাগ্রে পাসুলি, ঝাঁপাঝুরি প্রভৃতি অলঙ্কার এখন আর বড় দেখতে পাওয়া যায় না।

আমরা এতক্ষণ সেকালের বঙ্গীয় গৃহলক্ষ্মীগণের বিষয়ই আলোচনা করিলাম, পুরুষদিগের কথা বেশী বলা হয় নাই। এবার আমরা বালকদিগের শিক্ষা হইতে আরম্ভ করিব। পঞ্চম বর্ষে হাতে খড়ি হইবার পর বালকেরা পাঠশালায় প্রেরিত হইত। পাঠশালার পাঠ সমাপন করিয়া উচ্চবর্ণের বালকেরা টোলে চতুষ্পাঠীতে বিদ্যাভ্যাস করিতে যাইত। অন্য বালকেরা স্বস্ব জাতীয় ব্যবসা অবলম্বন করিত। তখন সংস্কৃত বিদ্যারই আদর ছিল। ব্রাহ্মণেতর জাতির বালকেরাও পাঠশালে সংস্কৃত কাব্যাদি পাঠ করিত। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে জনার্দ্দন ওঝা ধনপতি সদাগরের বিদ্যার পরিচয়ে বলিতেছেন—

"নাটক নাটিকা কাব্য করেছে অভ্যাস।"

নৃপতি কর্ণসেনের পুত্র লাউসেন গুরুর নিকটে—

"অকারাদি ককারান্ত জানা হইল সব।
ককারাদি ক্ষকারান্ত হ'ল বর্ণ পার॥
অভিধানে শব্দ আর ফলা দি বানান।
তিন দিনে দুই ভেয়ে যতনে শিখান॥
অষ্টধাতু অষ্টসিদ্ধি সুবন্ত অবর।
পড়িল অঙ্কের ভেদ বুদ্ধে করি ভর॥
ধাতু নাম শব্দ ভেদ পড়িল অপর।
পরম সুবেশ দোঁহে সুশীল সুন্দর॥
বেদবাণী জানিতে পাণিনি পড়ে রায়॥
কাব্য অলঙ্কার কোষ আগম নিগম।
ভক্তি যোগ সার যার ঘুচে মন ভ্রম॥"

তবে কবিকঙ্কণ সেকালের গুরুমহাশয়ের যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে বোধ হয় যে তখন ব্রাহ্মণেতর জাতির সংস্কৃত শিক্ষা বড় বেশি অগ্রসর হইত না। মূর্খতা সকল কালের ও সকল দেশের গুরুমহাশয়দিগেরই একচেটীয়া। শ্রীমন্ত মাসে পঞ্চাশ কাহন কড়ি বেতন দিয়া পাঠশালে পড়িত। সে বড় বুদ্ধিমান্ বালক। গুরুমহাশয়কে এই রূপ প্রশ্ন করিত,—অজামিল চিরকাল দুশ্চরিত্র থাকিয়া মৃত্যুকালে নারায়ণ নামক পুত্রকে নাম ধরিয়া ডাকিয়া স্বর্গে গেল। যশোদা দৈবকী যে গতি পাইল, পুতনা কৃষ্ণকে বিষস্তন পান করাইয়াও সেই গতি লাভ করিল। এ সকল কেমন কথা? প্রশ্ন শুনিয়া গুরুমহাশয়ের চক্ষু স্থির। তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, "এ বেণের ছেলেটা একদিন আমাকে সভার সমক্ষে অপমান করিবে দেখিতেছি।" প্রকাশ্যে ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "বাপুহে, এ সব বুঝলে না? সকলই কৃষ্ণের ইচ্ছা।" শ্রীমন্ত ছাড়িবার পাত্র নহে, সে বলিল—

"গুরু টীকার বিচার কর, না বল ঝটিত।
কেন বা প্রভুর ইচ্ছা হবে অনুচিত॥"

কবি—২১৭।

গুরু ক্রোধে অন্ধ হইলেন। বলিলেন, এত বড় স্পর্দ্ধা!

"পঁচাশী বৎসর হইল আমার বয়েস।
নিরন্তর অধ্যয়ন টীকা নাহি শেষ॥
শিশু বুঝাবারে মোর টীকার বিকার।
ইহার অধিক অপমান নাহি আর॥
বুঝিনু বচন নাহি প্রবেশিল পেট।
উচিত বলিতে তোর মাথা হবে হেঁট॥"

তেজস্বী শ্রীমন্ত বলিল, "উচিত কথা বলিতে আপনি রাগ করিতেছেন কেন? আপনি শাস্ত্রার্থ অবগত নহেন।" তখন ব্রাহ্মণের ক্রোধানলে ঘৃতাহুতি দেওয়া হইল!—

"পিতা দীর্ঘ প্রবাসে তোমার জনম।
নাহি জান আপনার জাতির মরম॥

মরি গেল ধনপতি শুনি বহু দিশ।
মায়ের আরতি হাতে, ভোজন আমিষ॥
যেহারা এমন জনে শুনাই পুরাণ।
এই হেতু আমার এতেক অপমান॥
অবিলম্বে যাও বেটা পাঠশাল ছাড়ি।
মাথা ভাঙ্গিব পাছে মারিয়া পাবড়ি॥"

গুরু মহাশয় এইরূপে শ্রীমন্তের প্রশ্নোত্তর দিলেন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে পুরাণাদি ধর্ম্মগ্রন্থ শ্রবণের দ্বারা তখনকার ইতর লোকেরাও জ্ঞানলাভ করিত ও চরিত্রবান্ হইত। এখনও আমাদের দেশের ইতর লোকেরা যেরূপ ধর্ম্মভীরু, অন্য কোন দেশের ইতর লোকেরা সেরূপ নহে। চণ্ডী যখন ভুবনমোহিনীরূপে কালকেতুকে ছলনা করিতে আসিলেন, বলিলেন আমি তোমার বাটীতে, তোমার নিকট থাকিব, তখন নীচজাতি ব্যাধ কালকেতু বলিল—

"ব্যাধ হিংসক রাড় চৌদিকে পশুর হাড়
শ্মশান সমান এই ভূমি।
কহি আমি সত্যবাণী ঘরে চল ঠাকুরাণী
দেবের সমান মূর্ত্তি তুমি॥
ত্যজিয়া ব্যাধের বাস চল বন্ধুজন পাশ,
যাবৎ থাকয়ে তপনে।
যদি হবে কাল নিশা লোকে ঘোষিবে দুর্ভাষা
রজনী বঞ্চিলে কার সনে॥
আইস পথের ভ্রমে কিবা পথ পরিশ্রমে
আয়াস ছাড়িতে এই ঘর।
চল বন্ধুজন পাশে ফুল্লরা চলুক সাথে
আমি যাই লয়ে ধনুঃশর॥
সীতা যে পরম সতী তার শুন দুর্গতি
দৈবে ছিল রাবণ ভবনে।
ভালমতে মনে গণি লোকবাদে রঘুমণি
পুনর্ব্বার পাঠাল কাননে॥"

কবি—৬৪।

আজকাল পূর্ব্বাপেক্ষা শিক্ষা অনেক বাড়িয়াছে সত্য কিন্তু শিক্ষা ধর্ম্মভিত্তিহীন হওয়ায় অনেক অমঙ্গল ঘটাইতেছে।

শিক্ষা সমাপনান্তে লোকে স্ব স্ব জাতীয় ব্যবসা অবলম্বন করিত। এই জাতীয় ব্যবসায় মধ্যে চাষবাস ও বাণিজ্য প্রধান ছিল। সেকালের ও একালের চাষের প্রণালী একই প্রকার। তবে বাণিজ্যের অনেক প্রভেদ হইয়াছে। এই বাণিজ্য সম্বন্ধে বিস্তার করিতে গেলে একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধ হইয়া পড়িবে, এইজন্য আমি সে বিষয়ে প্রয়াস না পাইয়া সংক্ষেপে দুই একটি মাত্র কথা বলিব। তখন বাঙ্গালীরা ডিঙ্গা করিয়া বঙ্গদেশের একস্থান হইতে অন্যস্থানে ব্যবসা বাণিজ্য করিতে যাইত। পূর্ব্ববঙ্গবাসীরাই সচরাচর ডিঙ্গার মাঝি ও দাঁড়ির কার্য্য করিত। মাঝি ও দাঁড়ি ভিন্ন প্রতি ডিঙ্গায় এক একজন সাবর থাকিত, তাহারা কর্ণধারদিগকে খাটাইয়া লইত। জলপথে যাইবার অনেক বিপদ্ ছিল। জলদস্যুদের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ইহার উপর তখন প্রায়ই ঝড় জল হইত। অকস্মাৎ ঈশানে মেঘ উঠিয়া আকাশ আচ্ছন্ন করিত ঘন বজ্রধ্বনি হইত ও হাতীর শুঁড়ের ন্যায় জলধারা বর্ষিত হইত। দেখিতে দেখিতে ঝড় আসিয়া যোগ দিত, ও ঝড়ে জলে বজ্রধ্বনিতে—

"পরিচ্ছেদ নাহি সন্ধ্যা দিবস রজনী।
নায়ের সকল লোক করে কানাকানি॥"

১৯৭ কবি।

এইরূপে এক বৎসরে কত নৌকা যে ডুবিত, তাহার স্থিরতা নাই। জলপথের এই অবস্থা, স্থলপথে গমনও এইরূপ বিপৎসঙ্কুল ছিল।

কবি কেতকাদাস প্রভৃতির গ্রন্থে দেখিতে পাই যে বণিকেরা নৌকা করে

বাণিজ্যার্থ সমুদ্রযাত্রা করিতেছে। কিন্তু সেই সকল নৌকা যেরূপ ছিল ও চিংড়ি কাঁকড়াদহ প্রভৃতি সমুদ্রের যেরূপ বর্ণনা দেখিতে পাই, তাহাতে মনে হয় যে দক্ষিণবঙ্গের কোন নদীর কোন বিস্তৃত অংশেরই বর্ণনা করা হইয়াছে। ধনপতি যখন সিংহল যাত্রা করিবেন, তখন তিনি ডুবারি ডাকিয়া ভ্রমরার জল হইতে ডিঙ্গা সকল তুলাইলেন। পল্লীগ্রামের পুষ্করিণী সমূহেও লোকে এখন ডোঙ্গা ও শালতি ডুবাইয় রাখে, প্রয়োজন হইলে তাহাদিগকে জল হইতে তোলা হয়। এখনও পল্লীগ্রামে বর্ষাকালে এই ডোঙ্গা ও শালতির সাহায্যে একগ্রাম হইতে অন্য গ্রামে গমনাগমন করা হয় ও দ্রব্যাদি বহন করা হয়। ধনপতির ঐরূপ ডিঙ্গা যদি সমুদ্রে যাইতে পারে, তাহা হইলে আমাদের ডোঙ্গা শালতি কি অপরাধ করিল?

কবিকঙ্কণের সময় বোধ হয় দ্রব্যের বিনিময়ে বাণিজ্য চলিত। কারণ তাঁহার গ্রন্থে এই বিনিময় বাণিজ্যের আমরা অনেক বর্ণন দেখিতে পাই :—

"সিন্দুর বদলে হিঙ্গুল দিবে
গুগুরার বদলে পলা।
পাট শণ বদলে ধবল চামর দিবে
কাচের বদলে নীলা॥
লবণ বদলে সৈন্ধব দিবে
জোয়ানি বদলে জিরা।
আকন্দ বদলে মাকন্দ দিবে
হরিতাল বদলে হীরা॥
চুয়ার বদলে চন্দন দিবে
পাগের বদলে গড়া।
শুকুতার বদলে মুকুতা দিবে
ভেড়ার বদলে ঘোড়া॥"

ইত্যাদি। কবি ২৫১।

ইহা সিংহলে বাণিজ্য করিতে যাইবার ফর্দ্দ। লঙ্কায় সোণা সস্তা, ইহাই আমরা জানিতাম, কিন্তু সেখানে হীরা এত সস্তা যে তাহা হরিতালের বদলে মিলিত, তাহা আমরা জানিতাম না। বোধ হয়, আকন্দ মাকন্দ, শুক্তা মুকুতার ন্যায় হীরা ও হরিতাল এই অনুপ্রাসেই সব গোল বাধাইয়াছে।

আর এই খানেই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। দুইশত বৎসরের যবানিকা উত্তোলন করিয়া আমরা বঙ্গরঙ্গমঞ্চের তদানীন্তন অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণকে দেখিলাম। তাঁহাদের অভিনয় বহুকাল শেষ হইয়া গিয়াছে। তাঁহাদের পর আর কত অভিনেতা আসিল ও আপনাপন অংশের অভিনয় করিয়া অনন্ত কাল সাগরে জলবুদ্বুদের ন্যায় মিশিয়া গেল। এখন আমরা রঙ্গমঞ্চ অধিকার করিয়াছি। তুলনায় সমালোচনা করিয়া দেখিলাম আমরাই যে সকল বিষয়ে জিতিয়াছি, তাহা নহে। এই অনন্ত জীবন নাট্যের কোন কোন অংশের অভিনয়ে তাঁহারা কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, কোন কোন অংশে আমরা কৃতিত্ব দেখাইতেছি। তথাপি কি জানি কেন মনে হয়, তাঁহাদের জীবন নাট্যের প্রতি অঙ্কে এখনকার মত বিপদ ও নৈরাশ্যের গভীর মর্ম্মভেদী দীর্ঘশ্বাস ছিল না। মনে হয়, তাঁহারা আমাদের অপেক্ষা প্রাণ খুলিয়া ভালবাসিতে পারিতেন; আর আমাদের হাসিতে বিপদের ছায়া ভালবাসায় স্বার্থের কোলাহল।

শ্রীসরোজরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভারতীমঙ্গল কাব্য

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর ।)

দ্বিজে হেন শুনি, কুপি বলল বাণী
শুনায় অ বাধ শঙ্খ ।
দ্বিজে দিলে দান, সর্ব্বত্র কল্যাণ
ইথে না হইবে বন্ধ ॥
বলে দৈত্যনাথ, ধন নাহি সাথ.
ধন নাহি মোর সঙ্গে ।
বলে গিরিধরে, যদি দেহ মোরে,
আছে স্বর্ণশাণা অঙ্গে ।
ধর্ম্মে দৃঢ় মন, করিয়া তখন,
শাণা খুলি দৈত্যনাথে ।
এ ঘোর সময়ে, ছলিলা আমারে,
বলি দিল বিজ হাতে ॥
কবচ পাইয়া, অতি হর্ষ হৈয়া,
দৈত্যকে আশীষ করি ।
দণ্ড ধরি করে, অতি ধীরে ধীরে,
অন্য স্থানে গেলা হরি ।
শঙ্খের মুরতি ধরি যদুপতি,
গেলেন তুলসী স্থানে ।
পতি দেখে সতী, হৈয়া হর্ষমতি,
পুছে কিবা হৈল রণে ॥
যিনি নাশে জীব, আপনে সে শিব,
আইলা রণ করিবারে ।
হেন রণে যাইয়া, আসিলা ফিরিয়া,
কহ কোন পরকারে ॥
কহে দৈত্যসুতে, নিজ রমণীতে,
শু। বলি বিবরণ ।
বুঝি হর সাথে, পুনশ্চ বরেতে,
বাঁচি আইলা যে কারণ ॥
দেবের লাগিয়া, অত্যন্ত কুপিয়া,
রণে আইলা মহেশ্বর ।
দেবতা অসুরে দোহে পরস্পরে,
হৈল যুদ্ধ ঘোরতর ॥
পার্ব্বতীনন্দনে, আসি মোর সনে,
বিস্তর সমর কৈল ।
আমিও তাহারে, হানি বহু শরে,
ক্ষণ মাত্রে পরাজিল ॥
ইহাকে দেখিয়া, অত্যন্ত কুপিয়া,
রণে আইলা ভদ্রকালী ।
আমি তার সন, না করিল রণ,
ক্ষমা দিল মাতা বলি ॥
শুন গো ভারতী, করি শত নতি,
তব পদ ভাবি মনে ।
নিজ কার্য্য জানি, কৃপা কর বাণী,
ছন্দে ভূপাত্মজে ভণে ॥

পয়ার ।

ইহা দেখি মহেশ্বর, অতি কোপমনে ।
ধনু হস্তে লৈয়া রণে আসিলা আপনে ॥
মোর সঙ্গে মহা কোপে হইল সমর ।
হেনমতে হৈল যুদ্ধ সহস্র বৎসর ॥
পরে শ্রান্তশস্ত্র হইলাম দুই জন ।
রণস্থলে বিশ্রামার্থ বৈসে পঞ্চানন ॥
সহসা সমরে মোরে নারি পরাজিতে ।
ডাকিয়া আমার স্থানে কহে বিশ্বনাথে ॥
শুন দৈত্য শঙ্খচূড় আমার বচন ।
মিছা কাজে মোর সনে কেন কর রণ ॥
দেবের বিষয় সব অন্যায় করিয়া ।
লৈয়াছ সকল তুমি সমরে জিনিয়া ॥
যুদ্ধে যত সুখ আছে জানিছ এখনে ।
মোর বাক্য দেও তাহা যদি লয় মনে ॥
পুনঃ পুনঃ বলি আমি নাহি ধর চিতে ।
ভাবিছ জিনিয়া রণ তুমি মোর সাথে ॥
এই আজ্ঞা [illegible] আমি হৈয়া যোড়কর ।
নতি করি হর স্থানে দিলাম উত্তর ॥

এ তিন ভুবন সৃষ্টি সকলি তোমার।
লঙ্ঘিতে তোমার বাক্য কি শক্তি আমার॥
সেই ধন দিলে যদি অবিরোধ হয়।
তব বাক্যে দিব আমি কহিল নিশ্চয়॥
এই দৃঢ় পণ কৈল তোমার গোচরে।
কি কার্য্য এথাতে আর চলি যাও ঘরে॥
ইহা শুনি কৈলাসেতে গেলা পঞ্চানন।
বিদায় হইয়া আমি আসিছি ভবন॥
তুলসী এমত শুনি হরিষ অপার।
পতিকে প্রশংসা সতী করে বার বার॥
শঙ্খ বলে শুন প্রিয়ে আমার বচন।
ভক্ষ্য দ্রব্য আন কিছু করিতে ভোজন॥
রণের সময়ে তনু হয়াছে জর্জ্জর।
বিশেষ ক্ষুধায় তাতে করিছে কাতর॥
ইহা শুনি তুলসী যে ত্বরিত করিয়া।
বিশিষ্ট ব্যঞ্জন অন্ন দিলেক আনিয়া॥
মৎস্য মাংস নানা মত পলান্ন বিশেষ।
পায়স পিষ্টক আদি অপূর্ব্ব সন্দেশ॥
দধি দুগ্ধ ঘৃত ঘোল ক্ষীর সর চিনি।
উত্তম কাঞ্চন পাত্রে ভরিয়া বারুণী॥
ভৃঙ্গারে সুগন্ধি বারি পরিপূর্ণ করি।
শঙ্খের গোচরে দিল তুলসী সুন্দরী॥
কনক ডাবরে দৈত্য পাখালি চরণ।
হরি স্মরি বসিলেক করি আচমন॥
মদ্য পান প্রথমতঃ করি হিতিস্তুতে।
পরে আরম্ভন হর্ষে করে ভোজনেতে॥
হর্ষচিত্তে পরিপূর্ণ করিয়া অশন।
কনক পর্য্যঙ্কে যাইয়া করিল শয়ন॥
ভক্তি ভাবে নতি ধনী করি যোড় হাতে।
চরণ মার্জ্জন অর্থে বসিল শয্যাতে॥
কাটক ফাটকে দ্বার আটক করিলা।
অনুচরীগণ সনে গেল বাহির হৈয়া॥
দেবতার উপকার ভাবি জগন্নাথে।
হাস্য করি ধরিলেন তুলসীর হাতে॥
চতুরের চূড়ামণি রসিকসে
তুলসীকে আকর্ষণ কৈলা গদাধর॥
ত্রিজগৎ-নাথ হরি বলবান অত।
সন্দিগ্ধ হইল বামা বুঝি বিপরীতি॥
যেই সব অনুষ্ঠান দানবের ছিল।
সে সব সন্ধান বামা কিছু না দেখিল॥
সকলের অন্তরাত্মা হরি হইলে কি হয়।
ঘটে ঘটে বুদ্ধি ভিন্ন জানিবা নিশ্চয়॥
উঠিয়া বসিল ধনী সম্বরি বসন।
হরিকে জিজ্ঞাসে তুমি হও কোন জন॥
নহে তুমি শঙ্খচূড় বুঝিয়াছি আমি।
দেহ সত্য পরিচয় কেবা বট তুমি॥
নতু আমি করি ভস্ম বচন অনলে।
এত বলি বিধুমুখী কোপে অগ্নি জ্বলে।
সতী-শাপ শঙ্কা করি প্রভু নারায়ণ।
আপনার মূর্ত্তি ধরি দিলা দরশন॥
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম করে বিরাজিত।
বনমালা দোলে ঘন গলায় লম্বিত॥
মস্তকে শোভিত চূড়া শিখীপুচ্ছ সনে।
স্বর্ণ রুচি সম পীতাম্বর পরিধানে॥
কনক মঞ্জির শোভে চরণ উপর।
শ্যামল সুন্দর তনু অতি মনোহর॥
হেন বেশে সম্মুখে রহিলা চক্রপাণি।
ইহা দেখি তুলসী কহিতে লাগে বাণী॥
শুন প্রভু নারায়ণ আমার বচন।
হেন অপকর্ম্ম প্রভু কৈলা কি কারণ॥
ত্রিভুবনে যত সব আছে চরাচর।
সকলের কর্ত্তা তুমি জগৎ ঈশ্বর॥
ছলে সর্ব্বনাশ প্রভু করিলা আমার।
শঙ্খচূড় কোন ক্ষতি করিছে তোমার॥
কর্ত্তা হৈয়া পাষাণ সমান কর্ম্ম কৈলা।
দিল শাপ হরি তুমি হও যায়া শিলা॥
ইহা শুনি তুলসীতে বলে নারায়ণে।
শুন বামা মোকে শাপ দিলা অকারণে॥
বট তুমি কমলার অংশ এক কলা।
শাপ মতে হইয়াছ সুযজ্ঞের বালা॥
বিষ্ণু অংশ গোপাল শ্রীদাম শঙ্খ সুর।
না ভাবিও শুন ধনী সন্দ করি দূর॥

বৃন্দাবনে তুলসীর বৃক্ষ হবে তুমি।
শালগ্রাম শিলা মূর্ত্তি হব বারা আমি॥
প্রথমত কৃষ্ণে অর্চ্চা করিবেন তোরে।
আজি হৈতে হরি প্রিয়া হৈলা মোর বরে॥
শালগ্রাম পূজা যেই করে তুলসীতে।
অবশ্য হইবে তার গতি মুক্তি পথে॥
বিনা তুলসীতে যেই শালগ্রাম রাখে।
অধোগতি পাবে সেই পড়িবে নরকে॥
তুলসীতে এত বাক্য বলি ভগবান।
অন্তরীক্ষে চলি গেলা আপনার স্থান॥
সুনঙ্গ নগর নাম মনোহর পুরী।
ভূপতি কিশোর সিংহ তথা অধিকারী॥
রাজসিংহ নাম দ্বিজ তাহার অনুজে।
ভণয়ে নূতন পদ বাণী পদাম্বুজে॥

ত্রিপদী।

অন্তর্য্যামি শূলপাণি, সকল বারতা জানি,
তুলসীর সতীত্ব বিনাশ।
অপার হরিষ মনে, পুনি চড়ি বৃষ যানে,
দৈত্য স্থানে বলে কৃত্তিবাস॥
হৈল তনু সুশীতল, বিলম্বে নাহিক ফল,
পুনশ্চ সমরে দেহ মতি।
শুনিয়া এমত বাণী, অন্য এক রথ আনি,
তাতে শীঘ্র চড়ে দৈত্যপতি॥
যাতে মৃত্যুঞ্জয় অরি, জীবনে বিধাতা বৈরি,
বুঝি এবে ঘটিল আমার।
এবে পলাইলে রণে, অপযশ ত্রিভুবনে,
শিব হস্তে সার্থক সংহার॥
এত বলি দৈত্যনাথে, কার্ম্মুক লইতে হাতে,
অমঙ্গল দেখে নানা জাতি।
শর্কর বর্ষিবে শিরে, রণ ছাড়ি অশ্ব ফিরে,
ঘন কাঁপে ধ্বজ দণ্ড ছাতি॥
তথাপিও শঙ্খাসুরে, ঘোর শঙ্খনাদ করে,
শরাসন টানি দুই হাতে।
নিক্ষেপে অসংখ্য বাণ, দিবাকালে তমোমান
তা দেখি কুপিলা বিশ্বনাথে॥

অতি ঘন বহে শ্বাস, খসিল অজিন বাস,
মুক্ত হৈয়া লোটে জটাভার।
কৃশানু লোচনে জলে, শ্রমে ঘর্ম্মবিন্দু টলে,
ত্রিভুবন হৈল চমৎকার॥
তাতে বীর শঙ্খাসুরে, অসম সাহস করে,
ভঙ্গ নাহি দিল সমরেতে।
যেন নির্ব্বাপণ কালে, উজ্জ্বল প্রদীপ জলে,
তেমত যুঝয় দৈত্যনাথে॥
অতি তীক্ষ্ণধর বাণে, মহেশের হৃদি হানে,
কুটি হর হৈলা কম্পবান
সুস্থির হইয়া পরে, মহাশূল লৈলা করে,
উজ্জ্বল পাবক পরমাণ॥
দৈত্যারি কমলাসন, আদি যত দেবগণ,
সকলের অধিষ্ঠান শূলে।
দৃঢ় মুষ্টি করি ধরি, অতি কোপে ত্রিপুরারি,
সেই শূল ছাড়ে ভুজবলে॥
তেজে শত সূর্য্যসম, যিনি গতি পতঙ্গম,
বেগে আইসে চলিয়া অম্বরে।
সহস্র সহস্র বাণে, অতি তূর্ণ ইষু হানে,
সঙ্কোচিত হৈয়া শঙ্খাসুরে॥
সে সব আয়ুধ হেনে, সংহারি চলিল শূনে,
সত্য মৃত্যু জানি দৈত্যনাথে।
ফেলি ইষু শরাসনে, সমাধি করিয়া ধ্যানে,
স্থির হৈয়া বসিলেক রথে॥
হেনকালে অতি চোটে, বক্ষে আসি শূল ফুটে,
ভস্ম হৈল দানব-ঈশ্বর।
মৈল দৈত্য দুষ্ট রণে, সকল বাহিনী সনে,
অপার হরিষ মহেশ্বর॥
সুস্থির হৈল ক্ষিতি, রসাতলে ব্যাস পতি,
স্বর্গপুরী হইলেক স্থির।
ত্রিভুবন হর্ষ অতি, নদী হৈল শুদ্ধগতি,
পূর্ব্বমত বহেত সমীর॥
দূরে ছিল দেবগণ, হৈয়া মহা হর্ষমন,
আসি মিলে মহেশ্বর কাছে।
অপ্সরী সঙ্গে, দুন্দুভি বাজায়ে রঙ্গে,
তুলি ইন্দ্র নাচে॥

দ্বিজ রাজসিংহ নাম, পুত্র তার মনস্কাম,
ভূপতি-অনুজ হীনমতি।
নিবেদি চরণে তোর, শুন এই বাক্য মোর,
দীন হীনে তার পশুপতি॥
দিবা নিশি জপি বাণী, কৃপা কর ঠাকুরাণী
নিরমিল তোমার চরিত।
শঙ্খ দৈত্যপতি নাশ, সম্পূর্ণ হইল ভাষ,
পুণ্য কথা ভারতী সঙ্গীত॥

পয়ার।

পিতামহ প্রভৃতি করি যতেক অমর।
মহেশকে স্তুতি করে যুড়ি দুই কর॥
অনাদি পুরুষ তুমি দেবের দেবতা।
সৃজক পালক বট সংহারকরতা॥
চারি বেদে নাহি জানে তোমার মহিমা।
অন্যে কিবা বুঝে নাহি জানে হরি ব্রহ্মা॥
মহারুদ্র মহাকাল মহাদেব তুমি।
আশুতোষ দয়াময় কি বর্ণিব আমি॥
সর্ব্বকাল বট প্রভু দেবতার গতি।
দাস জ্ঞানে কৃপা কর না জানি ভকতি॥
উঠিল গরল যবে জলধিমথনে।
তাতে কৃপা করি সৃষ্টি রাখিলা আপনে॥
ত্রিপুরারি রিপুসবে করি পরাজয়।
ভৃত্য জানি কৈলা হর নির্জ্জর নির্ভয়॥
হীনজ্ঞান ক্ষুদ্র আমি, কিবা জানি স্তুতি।
করি নতি তার দাসে প্রভু পশুপতি॥
অমৃতান্ধসের নাথ ত্রিলোকের গতি।
করি নতি তার দাসে প্রভু পশুপতি॥
যথা শক্তি প্রাণপণে করিছে ভকতি।
করি নতি তার দাসে প্রভু পশুপতি॥
তুমি সর্ব্ব জীব গতি, আমি হীনমতি।
করি নতি তার দাসে প্রভু পশুপতি॥
তুমি বহ্নি বারি স্বর্গ রসাতল ক্ষিতি।
করি নতি তার দাসে প্রভু পশুপতি॥
শ্রীহরি চতুরানন তোমার ।
করি নতি তার দাসে প্রভু পশুপতি॥
চরাচর সকলের অন্তরেতে স্থিতি।
করি নতি তার দাসে প্রভু পশুপতি॥
নিজ গুণে কৃপা প্রভু কর মোর প্রতি।
করি নতি তার দাসে প্রভু পশুপতি॥
বলি তব শ্রীচরণে যে আছে শকতি।
করি নতি তার দাসে প্রভু পশুপতি॥
যোগেন্দ্র না পায় সীমা জপি দিবারাতি।
করি নতি তার দাসে প্রভু পশুপতি॥
সদায় তোমার পদ ভাবেন পার্ব্বতী।
করি নতি তার দাসে প্রভু পশুপতি॥
শুন বাণী চন্দ্রচূড় আমি দীন অতি।
করি নতি তার দাসে প্রভু পশুপতি॥
হেনমতে নানা স্তব কৈল পুরন্দর।
তুষ্ট হৈয়া ইন্দ্রকে বলিলা মহেশ্বর॥
আছিল পরম রিপু মৈল নিজ দোষে।
এবে যাইয়া সুখে বঞ্চ আপনার বাসে॥
কিন্তু এক নিগূঢ় বচন শুন মোর।
বাণাঘাতে ভস্ম হৈয়া আছে দৈত্যবর॥
সেই ভস্ম তুমি নিয়া ফেল সাগরেতে।
শঙ্খ নামে এক দ্রব্য জন্মিবে ইহাতে॥
সেই শঙ্খোদকে দেব অর্চ্চা যেই করে।
সর্ব্বতীর্থ জল সম ফল সেই নীরে॥
দেবালয়ে শঙ্খ বাজে বহু ফল হয়।
ইহাতে সংশয় নাই জানিবা নিশ্চয়॥
মোর সঙ্গে বৈরী ভাব আছিল উহার।
এই হেতু শঙ্খ কাজ নাহিক আমার॥
ইহা শুনি ভস্ম লৈয়া দেবতা সকলে।
রত্নাকর জলে নিয়া তূর্ণ গতি ফেলে॥
উপজিল শঙ্খ তাতে সলিল পরশে।
বিশ্বনাথ রঙ্গমনে চলিলা কৈলাসে॥
শিব সাথ শক্র চলে সংহতি বাহিনী।
নানা জাতি নৃত্য গীত করি বাদ্য ধ্বনি॥
ত্রিদশে বেষ্টিত হয়ে হৃষ্টমনে হরে।
বেগে উত্তরিলা আসি কৈলাস শিখরে॥
কনকের বৃষাসন নন্দী দিল আনি।
ব্যাঘ্রাজিন পাতি [illegible]

হেনকালে পুরন্দর হৈয়া যোড়কর।
গলবস্ত্র হৈয়া কহে হরের গোচর॥
যদি আজ্ঞা কর প্রভু যাই নিজ বাসে।
অনুগ্রহ সতত রাখিবা নিজ দাসে॥
ভূমি গতে মহেশকে করি প্রণিপাত।
বিদায় হইয়া চলে ত্রিদশের নাথ॥
ঐরাবত দন্তাবলে করি আরোহণ।
অমরাপুরীতে শক্র করিলা গমন॥
চারিদিকে বেড়ি চলে দেবতা সকলে।
ঢাক ঢোল কাড়া পড়া বাজে কুতুহলে॥
গন্ধর্ব্বে করয়ে গান সুমধুর স্বরে।
সাবধানে বিদ্যাধরীগণে নৃত্য করে॥
হেনমতে হৃষ্টমনে দেব বলারাতি।
আসি নিজ পুরে ইন্দ্র হৈল উপনীত॥
মহানন্দ জয় হৈল দেবতা-সমাজে।
পূর্ব্বমত সুখে বাস করে দেবরাজে॥
শুন কালিদাস দ্বিজ শুনহ উত্তর।
যে সব করিলা প্রশ্ন আমার গোচর॥
কহিল তোমাতে যেন আছে সংজ্ঞান।
সাধু সাধু দ্বিজ তুমি বট পুণ্যবান॥
সুসঙ্গ আখ্যান দেশ দুর্গাপুর গ্রাম।
ভূপাত্মজ ভণে পদ তথা নিজ ধাম॥

ত্রিপদী।

কহিলা সনক মুনি, কালিদাস স্থানে বাণী,
শুনহ ব্রাহ্মণ পুণ্যবান।
যেকথা পুছিলা মোকে, ক্রমেক্রমে সব তোকে,
যথাশক্তি কৈল সমাধান॥
আর কিবা ইচ্ছা মনে, বলহ আমার স্থানে,
যাহা জানি কহিব তোমাতে।
ইহা শুনি কালিদাসে, অতি সুমধুর ভাষে,
মুনিতে জিজ্ঞাসে যোড়হাতে॥
পূর্ব্বে আজ্ঞা কৈলা মুনি, ভারতী পূজার বাণী,
লিখিয়া কহ সব মোকে।
আদি পূজা কে করিল, কিমতে প্রচার হৈল,
কহ কৃপা করি অধমেকে॥
কিবা ধ্যান মন্ত্র স্তব, কবচ ভজন সব,
একে একে কহ বিস্তারিয়া।
তোমার প্রসাদে মুনি, অপূর্ব্ব ভারতী শুনি,
কহ বলি চরণ ধরিয়া॥
শুনি বাক্য মুনিবরে, অনুগ্রহ করি তারে,
কহিতে লাগিলা ধর্ম্মভাব।
নারদেত নারায়ণে, আজ্ঞা কৈলা ক্রমমনে,
সেই কথা শুন কালিদাস॥
তোমাতে কহিছি আগে, ঈশ্বরীর অংশভাগ
এ পঞ্চ প্রকৃতি উপজিলা।
তাতে এক সরস্বতী, সবের প্রধান শক্তি,
ত্রিজগতে বর্ণময়ী হৈলা॥
যত আছে চরাচর, অমর অসুর নর,
সকলের কর্ত্তা সরস্বতী।
তিনি যদি কৃপা করে, তবে কণ্ঠে বাক্য সরে,
ত্রিভুবনে নাহি অন্যগতি॥
প্রধানা প্রকৃতি বাণী, দেবতা সকলে জানি,
ভারতী নিকট আসি মিলে।
গদাধর বিশ্বনাথে, প্রজাপতি করি সাথে,
এই তিন গেলেন সকালে॥
ভারতীকে তিনজনে, বসাইলা হেমাসনে,
তীর্থ জলে স্নান করাইয়া।
ধূপদীপ নৈবেদ্যাদি, গন্ধ পুষ্প যথাবিধি,
পাদ্য অর্ঘ্য আচমনী দিয়া॥
ষোড়শোপচার মতে, তিন দেবে যোড় হাতে,
আদি পূজা কৈলা ভক্ত ভাবে।
শুনি বাক্য তদন্তরে, আসি মিলে পুরন্দরে,
সংহতি আনিল সব দেবে॥
নানাজাতি আয়োজন, লৈয়া অনুচরগণ,
শক্রের সম্মুখে দিল আনি।
শুচি হৈয়া সুরপতি, পরি পট্ট শুক্ল ধুতি,
সাবধানে অর্চ্চা করে বাণী॥
ধবল কমল লৈয়া, অঞ্জলি ভরিয়া দিয়া,
ধূপ দীপ করি নির্ম্মঞ্ছন।
নানাবিধ [illegible]র, দেবরাজ পূজা করে,
নতি ভক্তি করিয়া স্তবন॥

দেবগণ যত ছিল, একে একে পূজা কৈল
ভারতীকে মহাভক্তি করি।
হর্ষ হৈয়া সরস্বতী, বলে দেবগণ প্রতি,
লহ বর দিব বাঞ্ছা পূরি॥
ইন্দ্র আদি দেবগণে, কহে ভারতীর স্থানে,
কৃপা করি দেহ তুমি বর।
আর কিছু নাহি জানি, শুন বাণী ঠাকুরাণী,
তব পদে মন রৌক মোর॥
বাঞ্ছামত বর পায়া, দেবগণ হর্ষ হৈয়া,
বাণী বন্দি গেল নিজ বাস।
শেষে পূজা দেবে কৈল, এরূপ প্রচার হৈল,
যার কথা শুন কালিদাস॥
সুনন্দ নগরে ঘর, ধর্ম্মবন্ত নৃপবর,
কিশোর কেশরী অভিধান।
ভারতী চরণ অজে, ভণে তার অবরজে,
রাজ সিংহ যাহার আখ্যান॥

পয়ার।

ধর্ম্ম পরায়ণ দ্বিজ শুন কালিদাস।
ব্রহ্মবৈবর্ত্তের ভাষা পুণ্য ইতিহাস॥
করিল দ্বিতীয় পূজা শক্রাদি নির্জ্জরে।
হেন বার্ত্তা শুনি আইল সর্ব্ব মুনিবরে॥
ভারতীর কৈল অর্চ্চ বেদবিধি মতে।
অবশেষে প্রণাম করিল যোড় হাতে॥
তুষ্ট হৈয়া বর বাণী দিলা মুনিগণে।
তুষ্ট হৈয়া গেল সবে নিজ নিজ স্থানে॥
তদবধি হৈল দ্বিজ সংসারে প্রচার।
যেই পূজে কার্য্য সিদ্ধি ঘটয়ে তাহার॥
তদপরে শক্রধ্বজ নামে নরপতি।
শুনিলা অগ্রেতা দেবী বটে সরস্বতী॥
যুক্তি স্থির কৈল দৃঢ় নৃপের নন্দনে।
পূজিব ভারতী যথাশক্তি পার্থ্যমানে॥
মন্ত্রীগণে ডাকি ভূপে দিলা আজ্ঞাভার।
ভারতী পূজার হেতু করহ সুস্তার॥
ইহা শুনি মন্ত্রী সবে করে [illegible]।
লক্ষে লক্ষে আনিলেক অনুচরগণ॥
করিল নবীন এক মনোহর পুরী।
রত্নান্তর গৃহ সব শোভে সারি সারি॥
মধ্য প্রকোষ্ঠেতে কৈল পূজা যোগ্য স্থান।
বিশেষিয়া কত কব তাহার নির্ম্মাণ॥
স্ফটিকের স্তম্ভ ঘরে দর্পণ উজ্জ্বল।
কাঞ্চন মাণিক্যে গড়া করে ঝলমল॥
গৃহশিরে শোভে বহু সোণার কলস।
আশ্চর্য্য পত্তন তার দেখিতে রূপস॥
ধবল পতাকা উড়ে চঞ্চল পবনে।
স্বর্ণ ঘণ্টা ধবল চামর স্থানে স্থানে॥
অমরা সমান পুরী নির্ম্মাণ করিয়া।
ভূপ কাছে পাত্র সবে নিবেদিল গিয়া॥
আনাইল ভূপে পুরোহিত বিপ্রগণ।
নতি করি সকলেতে বলিল বচন॥
শুনহ ঠাকুর সব বচন আমার।
কর শুভক্ষণে লগ্ন ভারতী পূজার॥
ইহা শুনি বিপ্র সবে পঞ্জী বিচারিয়া।
করিল দিবস স্থির সকলে মিলিয়া॥
মকর পঞ্চমী শুক্লা উক্ত অতিশয়।
নৃপেতে কহিল দ্বিজ জানিয়া নিশ্চয়॥
ইহা শুনি নৃপমণি করিয়া সত্বর।
ভক্ষ্য দ্রব্য আনাইল করি আড়ম্বর॥
তড়াগ বাপিকা পূর্ণ কৈল মধু দধি।
ঘৃত দুগ্ধ হৈল যেন মহাজলনিধি॥
আমান্ন শর্করা আদি নানা উপহার।
রাখিলেন স্তরে স্তরে পর্ব্বত আকার॥
মৃন্ময়ী দিব্যমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া।
বৈসাইল আসনেতে মণ্ডপে আনিয়া॥
পুরোহিত দ্বিজ আইল স্নান সন্ধ্যা করি।
চরণ পাখালি বৈসে আসন উপরি॥
বিচিত্র মণ্ডপ শুভ্র বস্ত্রে আচ্ছাদিয়া।
শুক্লবারে পরিপূর্ণ ঘট বসাইয়া॥
আচমন করিকৈল শরীর শোধন।
স্বস্তিবাচন আদি কৈল হর্ষমন॥
ভূত শুদ্ধি ন্যাস আদি করে দ্বিজবরে।
যোল উপাচারে পূজে বৃহৎ সম্ভারে॥

বিস্তর শর্ক রা পূর্ণ করিয়া চন্দনে।
মন্ত্র পড়ি দ্বিজ ঢালে ভারতী চরণে॥
শুভ্র শতদল বহু অঞ্জলি ভরিয়া।
ঘটোপরি দেন বিপ্রে চন্দনে মাখিয়া॥
নৈবিদ্য পৃথুক লাজা সন্দেশ প্রচুর।
মধুপর্ক পূর্ণ ঘট তাম্বুল কর্পূর॥
ধূপদীপে আমোদিত কৈল পুরীখান।
কি কব অপূর্ব্ব শোভা অমরা সমান॥
নৃপে আসি নিজহস্তে কনক কমলে।
অঞ্জলি ভরিয়া দেন বাণী পদতলে॥
রাজার ভকতি দেখি দেবী সরস্বতী।
বর লহ বলি কহে হয়া হর্ষমতি॥
ভূপ বলে অন্য বরে নাহি প্রয়োজন।
তোমার চরণে চিত্ত রৌক অনুক্ষণ॥
তথাস্তু বলিয়া বাণী তাকে দিয়া বর।
অর্চ্চা সমাপনে গেলা আপন বাসর॥
সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ হইল নৃপতি।
অসংখ্য হইল ধন সুসার সম্পত্তি॥
মুক্ত হৈয়া স্বর্গে রাজা গেলা অন্তকালে।
শুন দ্বিজ হৈল মাত্র বাণী-পূজা-ফলে॥
মহাদেবী বটে ইনি জানিবা নিশ্চয়।
যেই জনে ভজে তার কার্য্য সিদ্ধি হয়॥
লোকেতে প্রচার তদবধি পৃথিবীতে।
অঘনাশ পায় যেই শুনে ভক্তিচিতে॥
যবে বালকের হয় কঠিনী প্রদান।
তাহাতে করিবে বাণী প্রতিমা নির্ম্মাণ॥
ভক্তি যুক্তে শুচি হৈয়া নিজ সাধ্যমতে।
পূজিলে ভুবনজয়ী হইবে ইহাতে॥
সর্ব্বকাল সুখ ভোগ করে সেই জনে।
অন্তকালে মুক্ত হৈয়া যায় স্বর্গস্থানে॥
মাঘ মাসে শুক্লাপঞ্চমীতে যেই নরে।
ভক্তিযুক্ত হৈয়া যেই বাণী পূজা করে॥
অবশ্য তাহার বিদ্যা নাহিক সংশয়।
শুন দ্বিজ কালিদাস কহিল নিশ্চয়॥
ইহকালে নানা জাতি সুখ ভোগ করি।
পরকালে বিমানে চড়ি যায় স্বর্গপুরী॥
যে জন পণ্ডিত যার জ্ঞান থাকে চিতে।
করিবে অবশ্য পূজা এসব পর্ব্বেতে॥
যত দেখ শাস্ত্র বেদ সংসার ভিতরে।
সকলের কর্ত্তা বাণী কহিল তোমারে॥
বর্ণময়ী বেদমাতা বিখ্যাত জগতে।
মূক হলে বাক্য সরে যার কৃপামতে॥
গন্ধর্ব্ব কিন্নর নর ভূত চরাচর।
পন্নগ দানব আদি যতেক অমর॥
সবের প্রধান বটে দেবী সরস্বতী।
স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতলে সকলের গতি॥
একভাবে দৃঢ়মনে কর তুমি পূজা।
ধরণী মণ্ডলে হবে পণ্ডিতের রাজা॥
শুনহ ভারতী মাত বলি এই বাণী।
শঙ্কটেতে কৃপা করি তার ঠাকুরাণী॥
ত্রিযামা দিবসে সদা ভাবি মনে মনে।
নূতন পাঁচালী গীত ভূপাসুতে ভণে॥

ত্রিপদী।

শুন দ্বিজ কালিদাস, মহাপুণ্য ইতিহাস,
ব্রহ্মবৈবর্ত্তের উপাখ্যান।
যেই শুনে ভক্তিমনে, বাস তার স্বর্গস্থানে,
ঘটে তার সর্ব্বত্র কল্যাণ॥
সাবধানে শুন তুমি, সর্ব্বতত্ত্ব বলি আমি,
ভারতী অর্চ্চার বিবরণ।
সংযমিতে শুচি হৈয়া, শুভক্ষণে জয় দিয়া
প্রথমতঃ প্রতিমা গঠন॥
ধবল বরণ তনু, শিরোরুহ ভ্রূরধনু,
এই দুই বরণ অসিত।
সুললিত দুইহাতে, বীণা যন্ত্র দিবে তাতে,
এইরূপে করিবে নির্ম্মিত॥
সর্ব্ব অলঙ্কার অঙ্গে, বসন ধবল রঙ্গে,
শ্বেত পদ্ম দিবে পদতলে।
মৃণময়ী মূর্ত্তি করি, মুকুট মস্তকোপরি,
মণিময় হার দিবে গলে।
শুন দ্বিজ [illegible]হিতে, মূর্ত্তি গঠি হেনমতে,
সযত্নে রাখিবে একস্থানে।

চতুর্থীতে নিয়মিতে স্নান করি ভক্তি চিত্তে,
ধৌত বস্ত্র বরি পরিধান॥
চরণ পাখালি আসি, কুশের আসনে বসি,
ঘট বসাইয়া শুভকালে।
আদ্যে পূজি গণেশ্বর, পঞ্চদেব তদন্তর,
নবগ্রহ দশদিকপালে॥
গৌর্য্যাদি মাতৃকাগণ, লৈয়া সবাহিত মন,
পূজিবেক বহুল সম্ভারে।
গন্ধ তৈল লৈয়া করে, কৌটা দিয়া ঘটোপরে
তবে দিবে প্রতিমার শিরে॥
নানাবিধ ঢাক ঢোল, বাদ্য গীত মহ রোল
অধিবাস করি হর্ষমনে।
সংযমিতে বিভাবরী, থাকিবে শয়ন করি,
প্রভাতে উঠিবে পরদিনে॥
নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম, যেন থাকে কুলধর্ম্ম,
সে সকল করি বিধিমতে।
পরে স্নান অর্চ্চা করি, শুভ্র ধৌত বস্ত্র পরি,
আসি উত্তরীবে মণ্ডপেতে॥
কনক আসনোপরি, প্রতিমা স্থাপন করি,
বসিবেক উত্তম আসনে।
আচমন আদি সারি, শরীর পবিত্র করি,
স্বস্তি বাক্য শ্রীবিষ্ণু স্মরণে॥

(ক্রমশঃ)

বিরহবিধুরা

অলকায় কমকায় ফুল্ল সরোজিনী—
বিরহ-আতপে তপ্ত আহা! হিয়া খানি
নলিন নয়ন দুটী দিবস যামিনী,
ঢালে মুক্তা অশ্রুধারা যক্ষ-হৃদিরাণী,
একাকিনী নিরজনে বিরহ শয্যায়—
হতাশ্বাস দীর্ঘশ্বাস ধরি তপ্তবুকে,
বিষম বিষাদে তার দিন গুলি যায়।
সরম মণ্ডিত সেই রাগরক্ত মুখে,
খেলে না হাসির ছটা! শীর্ণ বাহুলতা—
যে মৃণাল ভুজে বাঁধি প্রাণেশ যতনে
গেছে সুখে কত দিন, কত প্রেম কথা—
নিভৃত নিলয়ে বসি, অতৃপ্ত লোচনে,
দোঁহে দোঁহা মুখ হেরি হত আত্মহারা,
প্রভু শাপে আজি সেই বিরহবিধুরা!

শ্রীমতী সরলাসুন্দরী মিত্র।

কোকিল ও কাক

বসি নব-পল্লবিত চুত তরু-শাখে
কহে পিক একি জ্বালা, বায়সে জ্বালায়—
কঠিন কুলিশ কণ্ঠে বধির শ্রবণ
রাগে ক্ষোভে মনে হয় ছাড়ি বৃক্ষ ছায়!
কাক কহে বাসা দিয়া পালিয়াছি যবে
উচ্ছিষ্ট আহার দিছি হয় নাই রাগ;
এত দিনে খুঁটে খেতে শিখিয়াছ তাই-
কুলিশ কর্কশ কণ্ঠ হয়ে গেল কাক!
কাক-ভাগ্য-উপজীবি পিককুল বলি—
বায়স দেখিলে বুঝি অঙ্গ যায় জ্বলি।

শ্রীজগৎপ্রসন্ন রায়।

২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সাহিত্য-সংহিতা।

দ্বাদশ খণ্ড] ১৩১৮ সাল, ভাদ্র। [৫ম সংখ্যা।

শ্রীহর্ষের অন্বয় বর্ণন।

অদ্য যে প্রসঙ্গ—শ্রীহর্ষের অন্বয় বর্ণনে প্রবৃত্ত হওয়া গেল, সে প্রসঙ্গ সাহিত্যসেবীর পক্ষে জ্ঞাতব্য বিষয় বলিয়া অনুভূত হয়। কারণ ইঁহারই বংশপরম্পরায় বঙ্গ দেশের ব্রাহ্মণ সমাজের বিশেষ অভ্যুদয় হইয়াছে। সেই বংশের মহাত্মা ব্যক্তিবর্গের মধ্যে অনেকেই কবি, পণ্ডিত, বুদ্ধিমান্, সহৃদয়, সামাজিক, তেজস্বী এবং অশেষগুণসম্পন্ন। সুতরাং তাদৃশ ব্যক্তি সমূহের গুণকীর্ত্তন শুনিতে পাঠকবর্গের অরুচির সম্ভাবনা অল্প। তন্নিবন্ধন ভরদ্বাজের নাম পুরঃসর তদীয় ধারার শ্রীহর্ষের বংশাবলী বলিতে প্রবৃত্ত হইলাম। লেখার পারিপাট্য না থাকিলেও তাঁহাদিগের বিষয় পাঠ করিলে, অনর্থক সময় নষ্ট হইবে বলিয়া বোধ হয় না। শ্রীহর্ষের পিতার নাম মেধাতিথি মুকুটালঙ্কার শ্রীহীর। মেধাতিথি মানব-স্মৃতির প্রধান টীকাকর্ত্তা এবং অদ্বিতীয় পণ্ডিত। সুতরাং শ্রীহর্ষ পরমপণ্ডিত-তনয় বলিয়া লোকসমাজে প্রসিদ্ধ। শ্রীহর্ষের বুদ্ধিবৃত্তি অতি তেজস্বী ছিল। তিনি শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতের পুত্র বলিয়া পরিচিত হইতে অভিলাষ না করিয়া, স্বকীয় বিদ্যাবত্তায় জগতে ধন্য হইতে ইচ্ছা করেন—তাহাই হইয়াছিল। তাঁহার নিজের কৃতিত্ব বর্ণন করিতে হইলে, তাঁহাকে কবিকুলচূড়ামণি বলায় কোন দোষ স্পর্শ করে না। পাণ্ডিত্যে তাঁহাকে কুশাগ্রবুদ্ধি বৃহস্পতির অনূনকল্প মনে করিতে হয়। কেবল কবিত্বে ও পাণ্ডিত্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন এমন নহে; ঈশ্বরোপাসনার প্রশস্ত পদ্ধতিক্রমে পরাৎপর পরমাত্মার সঙ্গে সর্ব্বদা পরিচিত ছিলেন। অবাঙ্মানসগোচর পরমেশ্বরের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইত, নচেৎ কিরূপে বাক্‌সিদ্ধ হইলেন? যাহার কথায় নীরস পরিশুষ্ক মল্লকাষ্ঠ মন্ত্রপূত জলবিন্দু স্পর্শে তৎক্ষণাৎ কাণ্ড পল্লব ও ফলপুষ্পে পরিশোভিত হইয়াছিল, তাঁহার বিষয় বর্ণন করা অতীব অদ্ভুত ব্যাপার। তথাপি তদ্বিষয়ে একটা কথা এখানে উল্লেখ না করিয়া মৌনাবলম্বন করা যায় না।

কেহ কেহ বলেন, তাঁহাদিগের সঙ্গে যে পাঁচজন কায়স্থ দাসভাবে বঙ্গে আগমন করেন, তাঁহারা সেরূপ ভৃত্য নহেন; তাঁহাদিগের শরীররক্ষক ক্ষত্রিয়কুলপ্রসূত বীরপুরুষ। এখানে সেই কথার প্রতিবাদ করিবার জন্য অবশ্যই কহিতে হইবে যে, যাঁহাদিগের কথায় সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয় হয়, তাঁহাদিগের শরীর-রক্ষার জন্য আবার পাঁচজন ক্ষত্রিয়ের সঙ্গ আবশ্যক হইয়াছিল!—কি আশ্চর্য্য কথা!—যে পাঁচ জন মহর্ষি আদিশূরের যজ্ঞে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই সিদ্ধ পুরুষ ও পরমেশ্বর-সাক্ষাৎকারে সদাতৎপর। তাঁহাদিগের কি শত্রু থাকায় সম্ভব? বিশ্বামিত্র যখন পরমপুরুষ রামকে সঙ্গে লইয়া জনক রাজার ভবনে যান, তখন রাম লক্ষণ আত্মরক্ষা ও সর্ব্বপ্রকার পরিত্রাণ-ক্ষমতা কাহার নিকট শিক্ষা করেন? বিশ্বামিত্রের নিকট, ইহা

অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণ্য লাভ করিয়াই বশিষ্ঠাদি মহর্ষির নিকট সর্ব্বপ্রকার রক্ষা-মন্ত্র ও কবচাদি শিক্ষা করিয়া বাচস্পতি হয়েন।

এখানে আর একটী কথার উল্লেখ না করিয়া, ঐ পঞ্চ মহর্ষি যে ধনুর্বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন সে কথা বলিব না।

যাঁহারা কায়স্থদিগকে ক্ষত্রিয় বলেন, তাঁহারা কহেন, কায়স্থগণ হস্তীপৃষ্ঠে এবং মহর্ষিপঞ্চক গোযানে আগমন করেন। কথা সত্য হইলেও বিচার করিতে গেলে হস্তী অথবা অশ্বপৃষ্ঠে অতিদূর পথে ভৃত্যের আগমনে প্রভুর মর্য্যাদার ন্যূনতা হয় না। বিশেষতঃ তাঁহারা সভার্য্য এদেশে আগমন করেন। আর্য্য জাতীয় মহিলাবর্গের কেহই হস্তী অথবা অশ্বারোহণ করে না। সুতরাং মহর্ষি পঞ্চককে সস্ত্রীক গোযানে আগমন করিতে হয়। বিশেষতঃ অতি দূরপথে ও দীর্ঘকালের জন্য প্রবাসী হইতে হইলে, গৃহস্থলীর উপকরণ সামগ্রীর প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলি সঙ্গে না আনিলে প্রতিদিনের শয়নোপবেশন ও ভোজনাদির নিতান্ত অসুবিধা জন্মে। তাহাঁরই পরিহার জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যজাত হস্তীপৃষ্ঠে ও অশ্বপৃষ্ঠে সংস্থাপনপূর্ব্বক ভৃত্যপঞ্চককে শ্রান্তিহরণমানসে তাহাদিগকে হস্তী বা অশ্বের পৃষ্ঠে আরোহণ পুরঃসর সঙ্গে আগমন করিতে অনুমতি করেন। কেবল তাহাই নহে, কাণ্যকুব্জেশ্বর আড়ম্বর প্রদর্শন জন্য মহর্ষি পঞ্চকের সঙ্গে হস্ত্যশ্ব প্রেরণ করেন। ফল কথা মহর্ষিপঞ্চক ধনুর্বিদ্যাতেও পারদর্শী ছিলেন।

এখানে শ্রীহর্ষ ও ভট্টনারায়ণের ধনুর্বিদ্যার শ্লোকদ্বয় কুলশাস্ত্রদীপিকা হইতে পাঠকগণের দৃষ্টি জন্য উদ্ধৃত করা গেল। যথা :—

"বেদান্তসিদ্ধান্ত সুনিশ্চয়ার্থো [illegible]াক্রমাদয়ার্দ্রচিত্ত।
পরাস্ত্রবিদ্যার্ণবকর্ণধার শ্রীহর্ষ নামা ভুবনং তুতোষ॥
নাম্নাহং শ্রীলহর্ষঃ, ক্ষিতিপবরভরদ্বাজগোত্রঃ পবিত্রো।
নিত্যং গোবিন্দপাদাম্বুজযুগহৃদয়ঃ সর্ব্বতীর্থাবগাহী।
চত্বার সাঙ্গবেদা মম মুখপুরতঃ পশ্যপাণৌ ধনুর্ম্মে
সর্ব্বং কর্ত্তুং ক্ষমোঽস্মি প্রকটয় নৃপতে ত্বন্মনোভীষ্টমাশু।" ১।
"বেণীসংহারনামা পরমরসযুতো গ্রন্থ একঃ প্রসিদ্ধো
ভোরাজন্ মৎকৃতোসৌ রসিকগুণবতা যত্নতে গৃহ্যতে যঃ।
নাম্নাহং ভট্টনারায়ণ ইতি বিদিতশ্চারু শাণ্ডিল্যগোত্রো
বেদেশাস্ত্রে পুরাণে ধনুষিচ নিপুণঃ স্বস্তিতে স্যাৎ কিমন্যৎ॥২।"

অন্য মহর্ষি ত্রয়ের ধনুর্বিদ্যার পরিচয় শ্লোক তাঁহাদিগের বংশবর্ণন প্রস্তাবে প্রদর্শিত হইবে।

শ্রীহর্ষ-কৃত নৈষধীয় কাব্য লোকমণ্ডলীতে প্রসিদ্ধ, সুতরাং তদ্বিষয়বর্ণন এক কথায় হয় না। নৈষধ কাব্য বর্ণন প্রস্তাবেই তাহার প্রসঙ্গ করাই যুক্তিযুক্ত। তদীয় তর্কশাস্ত্র গ্রন্থের নাম খণ্ডন খণ্ড খাদ্য। তদীয় ব্যবহার শাস্ত্রের নাম যুক্তিরহস্য। তাহার এবং ধর্ম্ম শাস্ত্রের মীমাংসার নাম মুক্তিমার্গ। এই দুই গ্রন্থই সুদুষ্প্রাপ্য—নাম মাত্রেই আছে। সে যাহা হউক তাঁহার পুত্র চতুষ্টয় পিতৃগুণের কিঞ্চিন্মাত্র অধিকারী হইয়াছিলেন কি না তাহাই এখানে বিচার্য্য বিষয়। পুত্র চতুষ্টয় বেদপ্রচার জন্য মহারাজ আদিশূরের নিকট হইতে চারিখানি শাসন গ্রাম পাইয়াছিলেন। শাসন শব্দের অর্থ এখনকার পরগণা। কেহ কেহ কহিবেন এমন কি হয়?

তাঁহাদিগের ভ্রান্তি নিরাস জন্য কহিব যে, দ্বারভাঙ্গার রাজা ব্রাহ্মণ, তদীয় শিষ্য ক্ষত্রিয়ের নিকট গুরুদক্ষিণাস্বরূপ সমস্ত দ্বারভঙ্গ রাজ্য পাইয়াছিলেন। ঐ রাজ্য অতি বিস্তীর্ণ ইহা সকলেরই বিদিত আছে। আদিশূরের পক্ষেও তদ্রূপ হইয়াছিল। রাজ্য মধ্যে বিদ্যাও ব্রাহ্মণ্য প্রচার করাই মূল উদ্দেশ্য ছিল। দেখ—

বলিরাজা একটী মূর্খ লইয়া স্বর্গে যাইতেও সম্মত হয়েন নাই। তিনি পাঁচজন পণ্ডিত লইয়া পাতালগমনেও সুখী হইয়াছিলেন। মূর্খ পুত্র যমসম। প্রজা ও সন্ততিতে কিঞ্চিন্মাত্র বিশেষ নাই। সুতরাং রাজার পক্ষে প্রজাকে শিক্ষিত ও ধার্ম্মিক করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। তন্নিমিত্তই আদিশূর কাণ্যকুব্জ-ব্রাহ্মণদিগকে এদেশে রাজ্য দিয়া বাস করান। উঁহারাও কাণ্যকুব্জে নিঃস্ব ছিলেন না। পুত্র চতুষ্টয়ের পরিচয় —

"ধাঁধুকো মুকুটৌ গ্রামে জনো দিণ্ডীচ শাসনে।
রামশ্চ রায়িশাস্যাখ্যে নানো সাহরিসঙ্গকে।
এতে বিদ্যাপ্রচারায় তথা ব্রাহ্মণ্যশ্রাবণে।
নিযুক্তা রাঢ়কেদেশে রাজ্ঞাসুপূজিতাঃ সদা॥"
কুলদীপিকা।

সুতরাং এই শ্লোক দ্বারা ইঁহাদিগকে বিদ্যাবন্ত বলিয়া বিশেষ অনুমান করা যায়।

এই চারিজনের সন্তানপরম্পরার মধ্যে ধাঁধু বা সাধু মুকুটী (মুখুথী) গ্রামবাসী। ইঁহার প্রকৃত নাম শ্রীগর্ভ। ইনি মৃতবৎসা মাতার পুত্র ছিলেন বলিয়া ইঁহার প্রথম কালের নাম ধাঁধু অর্থাৎ ইহার জীবন সম্বন্ধে ধাঁধা আছে অর্থাৎ নিশ্চয়তা নাই। যখন যৌবন-সীমায় উপস্থিত হয়েন, তৎকালে চরিত্রাদির পবিত্রতায় সাধু সংজ্ঞায় অভিহিত হয়েন। বিদ্যা ব্রাহ্মণ্যে পারদর্শী হইলে, তাঁহার শ্রীগর্ভ এই আখ্যা হয়।

শ্রীহর্ষের ভ্রাতার নাম গৌতম। তিনি আদিশূরের যজ্ঞান্তে আদিশূরের প্রার্থনানুসারে কাণ্যকুব্জ হইতে পরবর্ত্তী কালে আনীত হইয়া বরেন্দ্রদেশে অধিষ্ঠাপিত হয়েন। বারেন্দ্র বংশীয়দিগের ভরদ্বাজগোত্রীয় বংশাবলীর তিনিই (গৌতম) আদিপুরুষ। শ্রীগর্ভের পুত্রের একতমের নাম শ্রীনিবাস (৩)। শ্রীনিবাসের পুত্রের নাম মেধাতিথি (৪)। শ্রীহর্ষ হইতে অধস্তন পঞ্চম পুরুষ আরব (৫)। ষষ্ঠ ত্রিবিক্রম। ৭ম কাক। অষ্টম ধাঁধু। ৯ম জলাশয়। ১০ম বাণেশ্বর বা সুরেশ্বর। ১১শ গুহ অথবা গুঞি। এই সময়েই বিদ্যা ব্রাহ্মণ্যের হ্রাস হইতে আরম্ভ। তৎপুত্র মাধবাচার্য্য (১২শ)। ইনি রামায়ণ ও মহাভারতের টীকাকার বলিয়া প্রসিদ্ধ। কিন্তু আমরা এখন সে টীকা দেখিতে পাই না। তৎপুত্র কোলাহল (১৩শ)। ইনি বিষয়বাসনাপরিশূন্য ছিলেন বলিয়া ইঁহার নাম কোলাই সন্ন্যাসী হয়। এই ত্রয়োদশ পুরুষ পর্য্যন্ত সকলেরই সন্ততিবর্গ শ্রোত্রিয় সংজ্ঞায় অভিহিত অর্থাৎ বেদান্তপারগ এবং সকলেই সমমর্য্যাদাপন্ন। কিন্তু এই সময়েই সকলেরই সন্ততি মধ্যে বিলাসিতা দেখা দেয়। বিদ্যাব্রাহ্মণ্য হ্রাস হইয়া আসিতেছিল দেখিয়া, মহারাজ বল্লালসেন কৌলীন্য-মর্য্যাদা সংস্থাপন করেন।

কোলাহলের পুত্র উৎসাহ ও গরুড় কৌলীন্য-মর্য্যাদা প্রাপ্ত হয়েন। বল্লালসেন যাঁহাদিগকে নবগুণসম্পন্ন দেখিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকেই কৌলীন্য-মর্য্যাদা প্রদান করেন। সমায়াতিপাতের অগ্রপশ্চাৎ ব্রহ্মানুষ্ঠানরূপ নিত্যক্রিয়ায় যথাযথ নিষ্পত্তি ও পরিসমাপ্তিহেতু সুব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণ স্থির করিয়া কৌলীন্য প্রদান করেন নাই।

যে নিয়মে ব্রাহ্মণগণ মধ্যে কৌলীন্য প্রদান তাহা ব্রাহ্মণ-সন্তান সকলেরই

লিখিত থাকিলেও সাধারণ পাঠকের পরিজ্ঞান জন্য এস্থলে পিষ্টপেষণ করা হইল। যথা—
"আচারো বিনয়োবিদ্যা প্রতিষ্ঠাতীর্থদর্শনং।
নিষ্ঠাবৃত্তিস্তপোদানং নবধা কুললক্ষণং॥"

এই সূত্রানুসারেই বল্লালের সময়াবধি লক্ষ্মণসেনের সময় পর্য্যন্ত সকলকেই সাধু ব্যবহারে চলিতে হইয়াছিল। মহারাজ দ্বিতীয় লক্ষণ অর্থাৎ লক্ষণ নারায়ণ, কুলীনগণের মধ্যে বিদ্যাব্রাহ্মণ্য সুস্থির রাখিবার জন্য কৌলীন্য সমীকরণ করেন। উঁহাদ্বারা পঞ্চগোত্রীয় কুলীন মধ্যে বিদ্যা-ব্রাহ্মণ্য সুরক্ষিত হয়। শ্রোত্রীয়গণও বিদ্যাব্রাহ্মণ্য রক্ষায় নিতান্ত অগ্রসর হয়েন।

উৎসাহের পুত্রের নাম আহিত, অভ্যাগত ও মহাদেব (১৫শ)। এই তিন ভ্রাতার মধ্যে আহিত ফুলিয়া মেলের মুখুটীগণের আদিপুরুষ। মহাদেব খড়দা মেলের মূল পুরুষ বলিয়া প্রসিদ্ধ। ফুলিয়া মেলের আদি পুরুষ আহিতের দুই পুত্র—উদ্ধব (অপভ্রষ্ট নাম উধ) সেই নামেই অভিহিত এবং লৌকিক (১৬)।

উধের সন্তান শিরঃ ও বিকর্ত্তন (১৭)। শিরঃ-সুত রাম, নৃসিংহ ও দ্যাকর (১৮শ)। রাম হইতে রামফুলিয়া মেলের উৎপত্তি হয়। ঐ মেলের অনেক ধারা আছে। নৃসিংহ হইতে প্রকৃত পরিশুদ্ধ ফুলিয়া মেলের সৃষ্টি হয়। ইনিই প্রকৃত ফুলিয়াগ্রামবাসী। ঐ গ্রামটী কুলীনপ্রধান পঞ্চ গ্রামের মধ্যবর্ত্তী বড় ফুলিয়া বলিয়া প্রসিদ্ধ। অন্য গ্রামচতুষ্টয়ের নাম যথা—

নবলা (নবপল্লী) ইহা হইতে বন্দ্যোপাধ্যায়গণের নপড়ীর নাম প্রখ্যাত হয়। মালিপোঁতা ব্রাহ্মণ ঠাকুরগণের পূজার পুষ্প যোগাইবার জন্য এই গ্রামে পূর্ব্বে অনেক মালীজাতির বাস ছিল, তজ্জন্যই এই গ্রামের নাম মালিপোঁতা। ফুলিয়ার উত্তরবর্ত্তী গ্রামের নাম বেলগড়িয়া। ইহাতেই যথেষ্ট কুলীনের বাস্তু নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর বিদ্যমান দেখা যায়। ইহার পশ্চিমাংশ গ্রামের নাম রামফুলিয়া অথবা ছোট ফুলিয়া। রাম শব্দে একটী অর্থ ক্ষুদ্র। তদনুসারে ঐ গ্রামের নাম ছোট ফুলিয়া হয়। এই গ্রামে চৈতন্যের স্নেহাস্পদ মুসলমান হরিদাসের আশ্রম আছে। উহা বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ভক্তবৃন্দের দর্শন-স্থান বলিয়া উল্লিখিত আছে। অনেকে হরিদাসের পাঠ বলিয়া দর্শন করিয়া যান। এই সকল গ্রাম শান্তিপুরের দুই ক্রোশ পূর্ব্ববর্ত্তী। উৎসাহের সহোদর গরুড়ও (১৪) কৌলীন্য-মর্য্যাদাপ্রাপ্ত হয়েন। তাঁহার অধস্তন সন্তানের মধ্যে অনেক মেলের প্রকৃতির আদিপুরুষ বিরাজিত হইয়াছিলেন। তাহাও মেলমালা গ্রন্থে নির্দ্দিষ্ট আছে। (সম্বন্ধ-নির্ণয় গ্রন্থ দেখ।) নৃসিংহ (১৮শ), তদীয় পুত্র গর্ভেশ্বর (১৯শ), তৎপুত্র মুরারি, গোবিন্দ ও সূর্য্য (২০শ)। মুরারি উপাধ্যায় নামে প্রখ্যাত। (উপাধ্যায়ের অপভ্রংশে ওঝা, তাহাতেই মুরারি ওঝা নামে প্রসিদ্ধ।) মুরারির পুত্র ভৈরব, বনমালী এবং অনিরুদ্ধ (২১শ)। বনমালীর পুত্র কৃত্তিবাস পণ্ডিত। ইনিই ভাষা রামায়ণ রচনা করেন। তদীয় গ্রন্থ বাঙ্গালা পয়ারছন্দের সুপরিশুদ্ধ সরল রচনার আদর্শস্বরূপ। মধ্যে মধ্যে ঐ গ্রন্থের রচনার মনোহারিত্ব আছে। উহার কীর্ত্তন দ্বারা বঙ্গসমাজের আবাল বৃদ্ধ হিন্দু মাত্রের মুখে রামায়ণ গ্রন্থের সারভূত সুরীতি, সুনীতি, সুজ্ঞান ও আত্মতত্ত্ববিদ্যার মর্ম্ম দেদীপ্যমান আছে। ইহা হইতে কবির পক্ষে আর কি অধিক প্রত্যাশা করা যাইতে পারে? তিনি লোকমণ্ডলীতে জীবিতরূপে বিরাজিত আছেন। অনিরুদ্ধ (২১শ)। তদীয় পুত্রের নাম লক্ষ্মীধর হালদার (২২শ)।

লক্ষীধর "হালদার" নামে বিশেষ পরিচিত। তৎকালে সেনাধ্যক্ষদিগের "হালদার" এই উপাধি ছিল। সুতরাং তিনি তাৎকালিক রাজাদিগের নিকট বীর পুরুষ বলিয়া বিশেষ পরিচিত না হইলে হালদার এই উপাধি পাইতেন না। লক্ষীধর হালদারের পুত্রত্রয়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠের নাম দুর্গাবর, মধ্যম কিন অথবা তিনু ও কনিষ্ঠের নাম মনোহর। জ্যেষ্ঠ ও বলিষ্ঠ পরম পণ্ডিত ও বিশেষ বিজ্ঞ ছিলেন। মধ্যম তিনু বা কিনু বিদ্বান ছিলেন না, সুতরাং অপ্রসিদ্ধ। দুর্গাবর পণ্ডিত বল্লভী মেলের নায়ক ও আদি প্রকৃতি (২৩ক)। ইনি শান্তিপুরনিবাসী। ইঁহার বাস্তভবনে অদ্যাপি অতি সমারোহের সঙ্গে তদীয় বংশাবলীর কৃতীপুরুষগণ ৺শ্যামাপূজা নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছেন। তেমন পূজা প্রায় কোনখানেই দেখা যায় না। দুর্গাবর পণ্ডিতের চতুষ্পাঠী ও আবাস ভবনের স্থানের নাম এক্ষণে বল্লভীপাড়ার শ্যামা চাঁদনী।

(২৩ক) মনোহর পণ্ডিত হইতে পরিশুদ্ধ ফুলিয়া সম্প্রদায়ের আধিপত্য সর্ব্বত্র সুবিস্তৃত হয়। ইঁহাদিগের বাসস্থান ফুলিয়াগ্রাম—বেল গাড়িয়া।

দুর্গাবর ও মনোহরের স্মৃতি ও ন্যায় শাস্ত্রের টীকা ছিল, এই কথা কোন কোন কুলগ্রন্থে লিখিত আছে। কিন্তু কি ছিল তাহার নাম নির্দ্দেশ নাই। যথা—

"দুর্গাবর-মনোহরৌ বিদ্যাব্রাহ্মণ্যবিশ্রুতৌ।
ন্যায়স্মৃতিসদাচারে টীপণ্যা লিখিতৌ পুরা।
তস্মাত্তয়োরভিধানং পণ্ডিতমিতি বর্ণিতং॥
বিদ্যান্নদানে সুকৃতী শুক্লরিতিতু কথ্যতে॥
জ্ঞানব্রাহ্মণ্যসম্পন্নে পাণ্ডিত্যং দীয়তে তপৈঃ॥"

মনোহরের পুত্রের নাম সুসেন, জগদানন্দ এবং গঙ্গানন্দ (২৪)। ইঁহারা তিনজনে পরম পণ্ডিত ও সর্ব্বগুণসম্পন্ন ছিলেন। গঙ্গানন্দ তৎকালে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত হওয়ায় তাঁহার উপাধি ভট্টাচার্য্য হয়।

আচার্য্যো যাজ্ঞিকোখ্যাত-বিদ্যয়া ভট্ট এবচ।
সর্ব্বগুণসুসম্পন্নে ভট্টাচার্য্যো বিধীয়তে॥

মেলচন্দ্রিকা।

সুসেন, জগদানন্দ ও গঙ্গানন্দ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মেলবন্ধন সময়ে কৌলীন্য রক্ষা হয়। তজ্জন্য কুলগ্রন্থে তাঁহাদিগকে নিম্নলিখিত রূপে প্রশংসা করে। যথা—

"সুসেনো জগদানন্দো গঙ্গানন্দো কুলেকৃতী।

(২৪) সুসেনের উপাধি পণ্ডিত। তদীয় পুত্রত্রয়ের নাম শিবাচার্য্য, ভবানী ও কানাই। শেষ দুই ভাই ঠাকুর নামে অভিহিত হইতেন। কানাই সর্ব্বকনিষ্ঠ বলিয়া ইঁহাকে ছোট ঠাকুর বলিয়া লোকে সম্বোধন করিত সেইহেতু বশতঃ ইনি ছোট ঠাকুর নামে বিশেষ খ্যাত। ইঁহার বংশধরগণ অনেক স্থলেই বিরাজিত আছেন। তন্মধ্যে উলাগ্রামই ইঁহাদিগের প্রধান আশ্রয়স্থান। ইঁহাদিগের বংশে অনেক পণ্ডিতের জন্ম হইয়াছে। অনেকেই বিদ্বান, সদ্‌গুণসম্পন্ন, দাতা ও কবি ছিলেন। অধুনাতন সময়ের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে উলানিবাসী দুর্গাদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের দুর্গাভক্তি চিন্তামণি কাব্য কবিত্বরসমাধুর্য্যগুণসম্পন্ন বলিয়া পরিগণিত করা যায়। পণ্ডিতবর রামগতি ন্যায়রত্নের বাঙ্গালা সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব দেখুন, অলীক বোধ হইবে না।

"কৃত্তিবাস পণ্ডিত মুরারি ওঝার নাতি।
(নপ্তা) পৌত্র।
যার কণ্ঠে সদা বিরাজ করেন ভারতী॥

ভাষা রামায়ণ।

কৃত্তিবাসের পিতার নাম বনমালী, পিতামহ মুরারি ওঝা। মহাকবি ভারতচন্দ্র রায় শ্রীহর্ষাম্বয়সম্ভূত। তদীয়

কাব্য অন্নদামঙ্গল ও বিদ্যাসুন্দরাদির বিষয় এ প্রবন্ধে বর্ণিত হইবার বিষয় নহে। উহা পৃথক প্রবন্ধে প্রদর্শন না করিলে কাহারও মনঃক্ষোভ বিনিবৃত্ত হইবে না, সুতরাং এখানে উহা পরিত্যক্ত হইল। এই প্রবন্ধে শ্রীহর্ষের অন্বয়ে অর্থাৎ অধস্তন সন্তান পরম্পরার মধ্যে বিদ্যা ব্রাহ্মণ্য সদাচার ও কবিত্ব অদ্যাপি যে বিশেষরূপে স্ফূর্ত্তি পাইতেছে তাহা দেখান উদ্দেশ্য। তদনুসারে দেখা যায়—

"বিষ্ণুদ্বয় বলরাম উদায় রমণ।
বাঘাওায় রঘুবিশু সম ছয়জন ॥
দোসর সোসর নাহি মুরহর একা।
কি জানি কাহার সঙ্গে কবে হয় দেখা ॥

মেলমালা।

বিষ্ণুদ্বয়ের একজন নীলকণ্ঠ ঠাকুর-সন্তান। গোবিন্দ ঠাকুর-সুত বলরাম। শিবাচার্য্য-সুত রমণ ও রাজবল্লভ। রঘু ঠাকুর ও বিশ্বেশ্বর ঠাকুর যখন কুলীনগণের নবগুণের হ্রাস হইতে লাগিল, তখনই ইঁহারা ঠাকুর নামে প্রসিদ্ধ হইলেন, তন্মধ্যে যাঁহারা বিশেষ বিদ্যাবিনয়াদি সম্পন্ন হইলেন, তাঁহাদিগের উপাধিও পৃথক হইল। যথা মুরহর, "তর্কবাগীশ" নামে বিশেষ বিখ্যাত। মধুসূদন "তর্কলঙ্কার" নামে সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ হইয়া আছে। খড়দা মেলের প্রধান প্রকৃতি যোগেশ্বর, কামদেব ও দিগম্বর "পণ্ডিত" নামেই সর্ব্বত্র সর্ব্বসময়ে অভিহিত হইয়া আসিতেছেন। ইঁহারা তৎকালে বিশেষ পণ্ডিত ছিলেন বলিয়া ঐরূপ উপাধির অধিকারী হয়েন। যাহাদিগের তাদৃশ বিদ্যা-ব্রাহ্মণ্য ছিলনা, তাঁহারাই কেবল মুখোপাধ্যায় সংজ্ঞায় পরিতুষ্ট হইয়া আসিতেছেন।

(১৮শ) ত্যাকর-বংশীয় কাচনার মুখুটী সারঙ্গসুত অর্জ্জুন মুখোপাধ্যায়ের উপাধি মিশ্র। বেদান্ত শাস্ত্রের পূর্ব্বমীমাংসা ও উত্তর মীমাংসায় যে ব্যক্তি পারদর্শিতা লাভ করিতেন, তাঁহারই মিশ্র এই উপাধি গ্রহণের অধিকার থাকিত। যথা—"পূর্ব্বোত্তরমীমাংসেজানন্ মিশ্র উদাহৃতঃ" এই অর্জ্জুন মিশ্রের বেদান্তাদি গ্রন্থের ও মহাভারতের টীকা অদ্যাপি বিদ্যমান আছে।

শ্রীহর্ষ হইতে দৈবকীনন্দন মুখোপাধ্যায় ২৪শ পুরুষ অধস্তন। বিদ্যাব্রাহ্মণ্যে অগ্রগণ্য বলিয়া তাঁহাকে সুধীগণ "পণ্ডিত" বলিয়া সমাহ্বান করিতেন। ইনি পণ্ডিতরত্নী মেলের নায়ক। ইনিও স্মৃতি গ্রন্থের টীকা লেখেন কুলগ্রন্থে তাহার উল্লেখ মাত্র দেখা যায়। কিন্তু সে পুস্তক পাওয়া নিতান্ত দুরূহ ব্যাপার। শ্রীহর্ষের অধস্তন অন্বয়ে নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ স্বীয় স্বীয় বিদ্যাবত্তায় নিম্নলিখিত মেলের অধিনায়ক হইয়াছিলেন। অশেষ গুণ, কার্য্যকারিতা, সহিষ্ণুতা, দয়া, মমতা এবং আত্মত্যাগ স্বীকারের ক্ষমতা না থাকিলে কেহই নায়কতা অর্থাৎ সমাজের উপরিভাগে আধিপত্য করিতে সমর্থ হয়েন না। ইঁহাদিগের সে সকল গুণাবলী ছিল বলিয়া, সমাজের নেতৃত্বভার পাইয়াছিলেন।

৬ ভৈরব মুখোপাধ্যায়—শ্রীহর্ষ হইতে অধস্তন ২২শ ভৈরবঘটকী মেল।

৭ মালাধর	মুখোপাধ্যায়	খাঁ	২৪শ মালাধর খানী মেল
৮ শুভানন্দ	ঐ	খাঁ।	২৬শ শুভানন্দ খানী
৯ চন্দ্রপতি	ঐ	বিদ্যালঙ্কার	২৪শ চন্দ্রপতি মেলের
১০ চক্রপাণি	ঐ	তর্কালঙ্কার	২৩শ আচম্বিতা মেলের
১১ গোপাল	ঐ	ঘটক	২৩শ গোপাল ঘটকী
১২ দশরথ	ঐ	ঘটক	২৩শ দশরথ ঘটকী
১৩ জিতামিত্র		মিশ্র	২৪শ প্রমোদনী
১৪ বাণীনাথ		মিশ্র পণ্ডিত	২৫শ শুদ্ধে সর্ব্বানন্দী।

১ ফুলে, ২ খড়দা, ৩ বল্লভী, ৪ সর্ব্বানন্দী, ৫ সুরাই, এই পাঁচ মেল সর্ব্বাগ্রগণ্য। এই পাঁচের মেল-নায়কও যে শ্রীহর্ষের অধস্তন সন্তানবর্গ, তাহাও পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। সর্ব্বানন্দী মেলের নায়ক মহাদেবের অধস্তন মহেশ্বর প্রমুখ বাসুদেব মুখোপাধ্যায়, ইনি শ্রীহর্ষ হইতে ২১শ পুরুষ।

সুরাই মেলের অধিনায়ক কাঁচনার রত্নাকর-বংশীয় রঘুদেব। ইঁহার অপরনাম বাণ মুখোপাধ্যায়। ইনি শ্রীহর্ষ হইতে অধস্তন ২৭শ পুরুষ।

এখন দেখা গেল যে, কুলীনগণের ৩৬ মেলের মধ্যে ১৭টী মেল মুখোপাধ্যায় গণের কৃতিত্বের লীলা-খেলার আধারস্থান, অবশিষ্ট ২২টী মেলের মধ্যে বন্দ্য, চট্ট, গঙ্গ, পূতিতুণ্ড ও ঘোষাল মহোদয়গণের আংশিক ক্রীড়ার স্থল মাত্র। সর্ব্বত্রই মুখোপাধ্যায়গণের বিশ্রামস্থান দেখা যায়। যে কুলে মুখোপাধ্যায়গণের বিশ্রামস্থান নাই, সে কুল পবিত্র নহে। এইটী মেল-মালার বিশেষ উক্তি। সেই জন্য ঘটকেরাও প্রস্তাবনায় সর্ব্বাগ্রে মুখুটী বংশের প্রশংসা করিয়া, কুল-প্রশংসার গান করিয়া থাকেন।

শ্রীহর্ষের পুত্র নান সাহরিগ্রামী। তদীয় অধস্তন অষ্টাদশ পুরুষে শূলপাণি মহোদয়ের আবির্ভাব হয়। ইনি যে সকল স্মৃতি গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া আচার, ব্যবহার দায়াদি গ্রন্থ লেখেন, তন্মধ্যে সম্বন্ধবিবেক ও প্রায়শ্চিত্ত-বিবেক দৃষ্টি করিলে তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ কবি ও কুশাগ্রধী বলিয়া অনুমিত হয়। তদীয় মীমাংসা দৃষ্টে স্মার্ত্ত-শিরোমণি বন্দ্যঘটীয় হরিহরাত্মজ মহামহোপাধ্যায় রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য মহোদয় নিজকৃত স্মৃতিশাস্ত্রের অষ্টাবিংশতি তত্ত্বের দৃঢ়তা সম্পাদনে কৃতনিশ্চয় হইয়াছিলেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিত বর্গ সংগ্রহ গ্রন্থের কত দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন, কিন্তু শূলপাণি মহোদয়ের লেখার চাতুর্য্যে মাধুর্য্যে এবং ঔদার্য্যে দোষ দেখাইতে সমর্থ হয়েন নাই।

অনেকে কহেন মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য দেবের শিক্ষাগুরু বাসুদেব সর্ব্বভৌম শ্রীহর্ষান্বয়-সম্ভূত। কিন্তু যে সকল বৈষ্ণব গ্রন্থ বিদ্যমান আছে, তাহার কোনস্থলে তদীয় পিতৃপুরুষের নামোল্লেখ না থাকায় আমাদিগকে মৌনাবলম্বন করিতে হইল। বস্তুতঃ তিনি যে প্রকার বিদ্যাব্রাহ্মণ্য সদাচারসম্পন্ন পরম পণ্ডিত ছিলেন, তাহাতে তাঁহাকে কুশাগ্রবুদ্ধি শ্রীহর্ষের বংশের কুল-তিলক বলিয়া অনেকের বিশেষ প্রতীতি আছে। উহা বিপর্য্যয় করা আমাদিগের অপ্রামাণিক কথায় শোভা পায় না।

কবিবর জয়ানন্দও মুখোপাধ্যায়-কুল-সম্ভূত। তিনি বাঙ্গালা পয়ারছন্দে অনেক রচনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে শ্রীচৈতন্য বিষয়ে তাহার কৃতিত্ব বিশেষ প্রতিভাত হইয়াছে।

শ্রীলালমোহন বিদ্যানিধি।

আসাম ও আসামবাসী।

যদিও আসামীয় ভাষায় আসামীয়া-সমাজে বলা আমার কতক দূর অভ্যাস আছে, তথাপি বিষয়গুলীর সমক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া বঙ্গভাষায় বলিতে অগ্রসর হওয়া এই আমার প্রথম উদ্যম। ইহাতে যে আমার তদ্রূ ধৃষ্টতা ও অক্ষমতা

প্রকাশ পাইতেছে তাহা বলা বাহুল্য। তথাপি কর্ত্তব্যের অনুরোধে আমাদিগকে অনেক সময়ে অনেক অসমসাহসের কার্য্য করিতে হয়, ইহা মহোদয়গণের অবিদিত নাই। এই মনে করিয়া আমি এই রচনা লিখিতে স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়াছি এবং সুধীমহোদয়গণ রচনার অশেষ দোষ উপেক্ষা করিয়া যথার্থ মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিলেই আমি কৃতার্থ হইব, কারণ ভাষা আমাদের মনের ভাব প্রকাশের উপকরণ মাত্র।

প্রথমতঃ দেখিতে হইবে আসাম কাহাকে বলে? এবং আসামীয়াই বা কাহারা?

মহাভারতে কি রামায়ণে কি রঘুবংশে কি অন্য কোন পুরাতন গ্রন্থে "আসাম" নামের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। কেবল ঐ সকল পুস্তকে "কামরূপ বা কামতা পুর বা প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর" শব্দ প্রয়োগ দেখা যায়। অধুনা "কামরূপ" বলিলে "গৌহাটী ও বড়পেটা" এই উভয়কে বুঝায়। "প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর" শব্দও সেই অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। প্রাগ্‌জ্যোতিষ পুর" অর্থ কেহ কেহ—"a country of departed glory" করিয়া থাকে; আমার বিবেচনায় "a country of ancient glory" স্বচ্ছন্দে বলা যাইতে পারে। যাহা হউক এই দুইটী শব্দের কোনটিই সমস্ত আসাম-বাচক নহে, ইহা সকলেরই মনে রাখা উচিত। কোন কোন গ্রন্থকার এমনও বলিয়াছেন যে, করতোয়া নদী হইতে ডিক্রাই পর্য্যন্ত স্থানের নাম "কামরূপ" আর অবশিষ্টাংশের নাম "নামরূপ"। এই সকল বিষয় মীমাংসা করা সহজ ব্যাপার নহে, এবং আমার মত লোকের দ্বারা এই স্থলে স্থিরীকৃতও হইতে পারে না। এই স্থলে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, "আসাম" শব্দ প্রাচীন নাম নহে, ইহা আধুনিক অর্থাৎ আহোম রাজার রাজত্ব কাল হইতে প্রচলিত। আসাম এক সময়ে এমন দুর্গম ছিল যে, এই অঞ্চলের অর্থাৎ নিম্ন বঙ্গের কোন লোক সাহস করিয়া সেখানে গেলে আর প্রায় ফিরিয়া আসিত না। এজন্য "কামরূপ" যাদুবিদ্যার জন্য সমস্ত ভারতে বিখ্যাত; কিন্তু এক্ষণে বাষ্পীয় পোত ও বাষ্পীয় শকটের দিনে এইরূপ ভাবোদয় শিক্ষিতশ্রেণীর ভিতর হওয়া অতি আশ্চর্য্যের বিষয় বলিতে হইবে; কারণ পূর্ব্বে যেস্থানে যাইতে জল-পথ কি স্থলপথ নানা বিপদসঙ্কুল ছিল ও মাসাধিক কাল লাগিত, আজ সেই কামরূপে যাইতে বাষ্পীয় শকটে ২৪ ঘণ্টা লাগে এবং অধিক কি, আসামের পূর্ব্ব সীমাস্থিত ডিব্রুগড় সহরে ৫৭ ঘণ্টায় পহুঁছিতে পারা যায়। বহুদিবসাবধি আসা-মের সহিত বঙ্গদেশের সম্পর্ক হইয়াছে। অনেক বাঙ্গালী ভদ্রলোক চাকরী কি ব্যবসায় উপলক্ষে যাইয়া, স্ত্রী পুত্র পরিবার লইয়া তথায় মহাসুখে পরমানন্দে বসবাস করিতেছেন উভয় সম্প্রদায়ের প্রবীন বৃদ্ধদিগের মধ্যে পরস্পর যেরূপ প্রীতি ও সদ্ভাব পরিলক্ষিত হইত, অদ্যকার শিক্ষিত যুবকবৃন্দের মধ্যে ক্রমে তাহার অভাব দেখিতে পাওয়া যায়। প্রতিদ্বন্দিতাই এই অসদ্ভাবের অন্যতম কারণ বলিয়া অনুমিত হয়। ইহাকে কখনও শুভলক্ষণ বলা যাইতে পারে না।

আসামীয়া বলিলে সাধারণতঃ আসাম-বাসী বুঝায় সত্য, কিন্তু আমি এই প্রবন্ধে যাহাদের মাতৃভাষা আসামীয়া তাহাদিগকেই লক্ষ্য করিতেছি; কারণ আসামের কোন কোন নদীর ধারে, জঙ্গলে, পাহাড়ে ও সীমান্তভাগে অনেকগুলি আদিম অধিবাসী ও অসভ্য বর্ব্বর জাতি বাস করে। তাহা-দের প্রত্যেকেরই পৃথক পৃথক কথিত

ভাষা আছে; লিখিত কোন চিহ্ন কি পুস্তক নাই। আসামীয়াদিগের নিকট তাহাদিগকে প্রায় সকল সময় আসিতে হয়, এজন্য তাহাদের অনেকে আসামীয়া ভাষা বলিতে পারে। তত্রাচ দেশাচারমতে উহাদিগকে আসামীয়া না বলিয়া সাম্প্রদায়িক নামে অভিহিত করিলাম যথা—নাগা, খাসীয়া, কুকি, কাচারি, মিরি, মিকির, আবর, ডফ্‌লা, খাম্‌তি, চিংকৌ ইত্যাদি। উহাদের ধর্ম্মজ্ঞান, রীতিনীতি, আচারব্যবহার, ঘরবাড়ী সমস্তই আসামীয়া হইতে বিভিন্ন। উহাদিগকেও আসামীয়া নাম দিয়া, অনেকে স্বর্গীয় আনন্দরাম বড়ুয়ার জন্মভূমিকে অসভ্য দেশ বলিতে কুণ্ঠিত কি লজ্জিত হয় না। পরিতাপের বিষয় এই যে, অনেক শিক্ষিত লোকের পক্ষে—

"বিদ্যাবিবাদায়, ধনং মদায়,
শক্তিঃ পরেষাং পরিপীড়নায়।
খলস্য সাধোর্বিপরীতমেতৎ,
জ্ঞানায় দানায় চ রক্ষণায়॥"

কিন্তু আমাদের সকলেরই স্মরণ রাখা উচিত যে:—

"গুণৈরুত্তমতাং যান্তি নোচ্চৈরাসনসংস্থিতাঃ।
প্রাসাদশিখরস্থোঽপি কাকঃ কিং গরুড়ায়তে॥"

আসাম এক প্রাচীন দেশ। উহাতে অনেক জাতির বাস বলিয়া ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। এই সকল জাতির ভিতরে এক একজন রাজা বা অধিপতি ছিলেন এবং এখনও কোন কোন জাতির মধ্যে এই নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা অকারণে বা অতি সামান্য কারণে সতত রণ বিগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়া নিরীহ প্রজাদিগকে নানা প্রকার নির্য্যাতন করিত। এমন সময়ে ১২২৮ খৃষ্টাব্দে পূর্ব্বদিক হইতে পাহাড় অতিক্রম করিয়া শ্যামবংশীয় আহোম জাতি আসামের প্রান্তভাগে উপস্থিত হইয়াছিল এবং কিছুকাল নিশ্চেষ্টভাবে থাকিয়া আসামের আভ্যন্তরিক অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিল। ইহারা বলিষ্ঠ, কষ্টসহিষ্ণু এবং সমরকুশল ছিল এবং সকল বিষয় অবগত হইয়া আপনাদের প্রভুত্ব স্থাপন করিতে অগ্রসর হইল। প্রথম যুদ্ধে জয়ী হইয়া জয়পুর নগর স্থাপন করিয়া কিছুকাল অবস্থিতি করিল। পরে অভয়পুরে পহুছিয়া ভয়ের কোন কারণ না দেখিয়া ক্রমে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিল এবং প্রতিবন্ধকদাতা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া সমস্ত আসামের একছত্র রাজা হইয়াছিল। যদিও বা ইহাদের পরেও ফাঁকিয়াল, তুরুং আদি শ্যামজাতীয় লোক আসামে আসিয়া বসতি করিয়াছে, তথাপি আহোমেরা প্রজাদিগের সহিত বিবাহাদি সম্বন্ধ করিয়া আসামের বাসিন্দা হইল এবং তাহাদের অধিকৃত দেশ "আসাম" নামে অভিহিত হইল। ইহাদের ভাষা পৃথক এবং ইহারা যাজক সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিল। এই যাজক সকলকে দেওধাই বাইলুং বলিত এবং ইহাদের সাহায্যে আহোম রাজারা অনেককাল শ্যামদেশীয় ধর্ম্মাচরণ করিয়াছিল। ইহারা ভূত প্রেতাদি অপদেবতাতে বিশ্বাস করিত এবং "কেঁচাইখাতি" নামক মন্দিরে নরবলি দেওয়া প্রথা ছিল বলিয়া প্রবাদ আছে। অপরাধীদিগকে অপরাধ অনুসারে দণ্ড প্রদান করিতে নানাপ্রকার যন্ত্রণা-বিধান ছিল এবং এই সকল নৃশংস ব্যাপার শ্রবণ করিলেও শরীর রোমাঞ্চ হয় আর গাত্রের রক্ত শুকাইয়া যায়। যদিও বা আহোমেরা সম্পূর্ণরূপে আসামবাসী হইয়া ক্রমে হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল, তথাপি উচ্চ রাজপদে স্বজাতি ভিন্ন অন্য কাহাকেও নিযুক্ত করা হইত না। [illegible]শাল ছিল, যাহাতে রাজার নামাঙ্কিত বিভিন্ন সোণার ও রূপার মোহর

প্রস্তুত হইয়াছিল। সেই সকল মোহর অদ্যাপি অনেক স্থানে পাওয়া যায়। রাজ সরকারে চাকরী করিতে ও রাজদত্ত উপাধি দ্বারা ভূষিত হইতে সকলশ্রেণীর লোকের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা ছিল। কোন সম্ভ্রান্ত লোক ব্যবসায় বাণিজ্য করিত না; কারণ ব্যবসায়কে ঘৃণাচক্ষে দেখিত। কর্ম্মচারী-দিগের নির্দ্দিষ্ট বেতন ছিল না; কেবল জমিজমা আর খাটনির জন্য লোক জন দেওয়া হইত। দাসবিক্রয়-প্রথা ছিল বলিয়া সকল সম্ভ্রান্ত লোকের অনেকগুলি দাসদাসী ছিল। প্রজাদিগকে জমির জন্য খাজানা দিতে হইত না। কেবল প্রত্যেক পরিবারের পূর্ণবয়স্ক লোককে রাজার নির্দ্দেশমত সরকারি কাজ ছয় মাসের জন্য করিতে হইত। এজন্য আসামের অনেক স্থানে প্রকাণ্ড পুষ্করিণী, অনেক দেউলদেবালয় এবং সুন্দর রাস্তা ঘাট সহজে নির্ম্মিত হইয়াছিল। সৈনিক বিভাগ ও বন্দুক কামানের ব্যবহার ছিল। অদ্যাবধি অনেক ছোট বড় কামান শিবসাগর সহরে দেখিতে পাওয়া যাইবে। আসামের শাসন প্রণালী এমন সুন্দর ছিল যে স্বদেশ-হিতৈষী বিচক্ষণ লোকের হাতে ইহা দেশের অশেষ মঙ্গল সাধন ও প্রজার সুখবর্দ্ধন করিতে পারিত; কিন্তু ক্ষমতাপ্রিয়, অলস অশিক্ষিত কর্ম্মচারীর হাতে পড়িয়া দেশের নানা দুর্গতি হইয়াছিল। মুসলমানেরা অনেক বার আসাম আক্রমণ করিয়া দেশে হুলস্থূল লাগাইয়াছিল; প্রত্যেকবারেই আসামীয়ার হস্তে পরাস্ত হইয়া ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছিল। তাহাদের আক্রমণের চিহ্ন নিম্ন আসামে অনেক দৃষ্ট হইবে এবং তাহার ফলস্বরূপ অনেক মুসলমান আসামে রহিয়া গেল। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, আসামে মুসলমানের প্রাদুর্ভাব হইতে পারে নাই।

আহোম নাম কি [illegible]রে হইয়াছে, তাহার কোন বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায় না; কিন্তু ক্রমে হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া আহোমেরা ব্রাহ্মণদিগের বশীভূত হইয়া পড়িল। ব্রাহ্মণেরা সুসময় পাইয়া নিজ স্বার্থ বজায় রাখিয়া রাজাকে পরামর্শ দিতে ও কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ জন্য তান্ত্রিক উপাসনার প্রভৃত বিস্তার করিতে লাগিল। এমনঃ সময়ে ১৪৪৯ খৃষ্টাব্দে আসাম নগাঁও জেলায় বট-দ্রবা গ্রামে শঙ্করদেবের জন্ম হয়। ইনি কুসুম্বর ভূঞার পুত্র--জাতিতে কায়স্থ। দেশের শোচনীয় ধর্ম্মাবস্থা দেখিয়া মহাত্মা সক্রেটিশের মত শিশু শঙ্করের মন বিচলিত হইল। শৈশবকাল হইতেই তিনি অতি চিন্তাশীল ছিলেন এবং সংস্কৃত শাস্ত্রালোচনায় বিশেষ অনুরাগ থাকায় ধর্ম্মভাবে মাতিয়া উঠিয়াছিলেন। আপনাকে এই মহৎ কার্য্যের জন্য সম্পূর্ণ উপযোগী করিতে কৃতসংকল্প হইয়া দ্বাদশ বর্ষকাল তিনি বারজন অনুগত লোক সঙ্গে লইয়া ভারতবর্ষের সমস্ত তীর্থ পর্য্যটন করিয়াছিলেন; এবং স্বদেশে প্রত্যা-গমন করিয়া ভাগবতী অর্থাৎ বৈষ্ণব ধর্ম্ম চারিদিকে প্রচার করিলেন। ইতিপূর্ব্বে আসামীয়া ভাষা কথিত ভাষারূপে ছিল বলিয়া বোধ হয়; শঙ্কর ও তাঁহার প্রিয় শিষ্য মাধব উভয়ে অনেক ধর্ম্মপুস্তক মূল সংস্কৃত হইতে নিজ মাতৃভাষায় অনুবাদ করিয়া আসামীয়া ভাষার যেরূপ ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন, সেইরূপ তাঁহার উদ্ভাবিত বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচারের পথ সুপ্রশস্ত করিয়া ছিলেন। তাঁহাদের লিখিত ঘোষা ও কীর্ত্তন আজিও আসামবাসী গৃহে গৃহে রাখিয়া অতি আদরে ও ভক্তিসহকারে পাঠ করিতেছে। শঙ্কর ১২০ বৎসর জীবিত ছিলেন। তাঁহার জীবদ্দশায় চৈতন্যের জন্ম ও মৃত্যু হয়। অনেকের মুখে এমন কথাও শুনিতে পাওয়া যায় যে শঙ্কর, চৈতন্য হইতে বৈষ্ণব ধর্ম্ম শিক্ষা

করিয়াছিলেন; কিন্তু শঙ্করের জীবনচরিতে এমন কথার বিন্দুবিসর্গও উল্লেখ নাই। শঙ্করের প্রচারিত বৈষ্ণব ধর্ম্মে সাকার উপাসনা একেবারে নিষিদ্ধ—হরিনাম একমাত্র সার। সেই সম্পর্কে নিম্নলিখিত পদ উদ্ধৃত হইল—

"অন্য দেবী দেউ, নকরিবা সেউ,
গৃহকো নাষাইবা, প্রসাদো নাখাইবা,
ভক্তি হৈবে ব্যাভিচার।"
"হরিনাম হরিনাম এমূল মন্ত্র।
কলিত নাহি তপ যজ্ঞ যন্ত্র॥"

শঙ্কর স্পষ্টই বলিয়াছিলেন যে, তিনি ব্রাহ্মণ আর স্ত্রীলোকের গুরু হইবেন না; কারণ তিনি বিশেষরূপে বুঝিয়াছিলেন যে, এই দুই শ্রেণীর লোকের দ্বারা তাঁহার প্রচারিত বৈষ্ণব ধর্ম্মে গোল বাধিবে। কিন্তু কি আশ্চর্য্যের বিষয় তিনি যাহা ভয় করিয়াছিলেন শেষে তাহাই ঘটিল। ব্রাহ্মণেরা ক্রমে হস্তক্ষেপ করিয়া শঙ্করের ধর্ম্মেও অনেক প্রমাদ ঘটাইয়াছে এবং উপসনাগৃহে প্রতিমাদি প্রতিষ্ঠিত করিতে দেখা গিয়াছে।

শঙ্কর নিজে গৃহস্থাশ্রমী ছিলেন, এবং সেই দৃষ্টান্তদ্বারা দেখাইয়া গিয়াছেন যে, গৃহী হইয়া সহজে বিশুদ্ধ ধর্ম্মাচরণ করিতে পারা যায়। প্রত্যেক গ্রামে বড় বড় নাম ঘর অর্থাৎ হরিমন্দির আছে। সেই নাম ঘরে অনেক উৎসবোপলক্ষে গ্রামবাসীরা একত্রিত হইয়া হরিনাম লইয়া থাকে। উহাতে কোন দেবদেবীর মূর্ত্তি রাখা হয় না; কেবল একখানি ভাগবত বা ঘোষা বা কীর্ত্তন পুঁথি কোন উচ্চাসনে রাখিয়া সকলেই নাম কীর্ত্তন করে। শঙ্কর-প্রচারিত ধর্ম্মদ্বারা ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদিগের ক্ষমতার হ্রাস হওয়া উপলব্ধি করিয়া আহোম রাজাকে পরামর্শ দিয়া অনেক প্রকার অত্যাচার আরম্ভ করিলে, শঙ্কর প্রাণভয়ে কোঁচবেহারের রাজার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং তথায় ভেলা নামক সত্র স্থাপন করিয়া অনেক শিষ্য রাখিয়া মানবলীলা সম্বরণ করেন।

আসামের আপামর প্রায় সকলেই শঙ্কর দেবের বাৎসরিক উৎসব সমারোহে করিয়া আসিতেছে; অধিক কি, সকল শ্রেণীর নব্য শিক্ষিত যুবকেরাও সেই দিনে আধুনিক নিয়মানুসারে একত্রিত হইয়া সেই মহাপুরুষের গুণানুকীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এইস্থলে বলা আবশ্যক যে, পূর্ব্বকালে আসামের সঙ্গে কোঁচবেহারের বিশেষ সম্বন্ধ ছিল এবং এখনও কোঁচজাতি আসামের সর্ব্বত্রই পাওয়া যায়। এমন অনেক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যে, কোঁচবেহারের রাজারা অতি গুণগ্রাহী ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, আজকাল রেল আর জাহাজের দিনে কালের কুটীল গতিতে আসাম আর কোঁচবেহার অতি দূর দেশ হইয়া পড়িয়াছে।

John Bull and his Island পুস্তকে ইংরেজদিগের ধর্ম্মভাব সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে :—"The grotesque state of things is the natural result of that constant splitting up into sects that the Reformed Church has undergone ever since the days of Cromwell. Many dissenting churches have set the example by vulgarising their services. They tried to make religion attractive, and they made it ludicrous. Ministers, transformed into actors, have been idolised, nay, almost worshipped, by congregations, who saw in them a Saviour instead of lifting their eyes to Heaven." আমাদের দেশেও প্রায় তথৈবচ; পাদরীরা যে প্রণালী অবলম্বন করিয়া ভ্রাতৃবর্গ আকর্ষণ করে, আমাদের দে[illegible] অপরূপ সন্ন্যাসী বাহ্যিক

সাধুবেশ, গাম্ভীর্য্যশালী গুরুব্রাহ্মণ সকল শ্রেণীর সম্মানের ও সেবার পাত্র হইয়া থাকে।

আসামে ব্রাহ্মণ, গণক, কায়স্থ, কলিতা, কেওঁট, কোঁচ, ছুটীয়া আদি অনেক জাতীয় লোক আছে। বঙ্গদেশের মত আসামে ব্রাহ্মণদিগের শ্রেণী বিভাগ নাই। ব্রাহ্মণ বলিলেই নামের শেষে "শর্ম্মা" লিখিবে; কেবল পদ ও কার্য্যকলাপ অনুসারে তাহাদের ইতর বিশেষ আছে। গণক অর্থাৎ গ্রহবিপ্রেরাও অবাধে "শর্ম্মা" শব্দ ব্যবহার করিতেছে। তাহাদের ব্যবসা হইতেছে করকোষ্ঠি গণনা আর তজ্জন্য ও গ্রহাদির উদ্দেশে দান দক্ষিণাদি গ্রহণ। বিবাহ শ্রাদ্ধাদি কোন ধর্ম্মকার্য্য করাইবার তাহাদের ক্ষমতা নাই। আসামে কেবল এই দুই শ্রেণীর ভিতর বাল্য বিবাহ প্রচলিত আছে। কিন্তু বালিকা রজস্বলা না হওয়া পর্য্যন্ত স্বামীর মুখ দেখিতে পায় না আর শ্বশুরবাড়ীও যাইতে পারে না। এই সতর্কতাপূর্ণ নিয়ম থাকায় আসামে "Age of consent Act" চালাইবার আবশ্যক হয় না; এই দুই শ্রেণীর ভিতর কোন বিধবা পত্যন্তর গ্রহণ করিতে পারে না।

আসামের কায়স্থরাও বঙ্গদেশের কায়স্থদিগের মত নানাশ্রেণীতে বিভক্ত নহে। তাহারা উত্তরীয় গ্রহণ করে এবং ধর্ম্মগুরু হইয়া অনেকে ধর্ম্ম প্রচার কার্য্যও করিতেছে। অধিকাংশ কায়স্থ কলমপেশা কাজ করে বলিয়া তাহাদিগকে "কাকতী"ও বলা যায়। "কাকত" হিন্দুস্থানী শব্দ = কাগজ। কলিতাদিগের সঙ্গে ইহাদের বিবাহাদি চলিতেছে। কায়স্থ, কলিতা, কোঁচ, কেওট আদির ভিতর বাল্যবিবাহ প্রচলিত নাই। কন্যার ১৫।১৬ কি ততোধিক আর বরের ২০।২৫ কি ততোধিক বয়সে বিবাহ হইয়া থাকে। ইতর লোকের ভিতর বরপক্ষ হইতে নগদ টাকা ও বিবাহের খরচাদি লওয়া নিয়ম আছে; এজন্য শাস্ত্রসম্মত বিবাহ তাহাদের ভিতর শতকরা দশজনার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে। দেশাচারমতে স্ত্রী পুরুষ ভাবে থাকিয়া কত লোক মরিয়া যাইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু শাস্ত্রমতে বিবাহ না হইলে শরীর শুদ্ধ হয় না এই সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া অনেক স্ত্রীলোককে কলাগাছ, শিলনোড়াদির সহিত বিবাহ করিতে দেখা শুনা গিয়াছে। যোত্রবান, মান্য কি পদস্থ হইলে সকল শ্রেণীর ভিতর শাস্ত্রসম্মত বিবাহ হইয়া থাকে আর বর কি কন্যা পক্ষ কেহই নগদ টাকা কি অন্য কোন খরচা লয় না। উপযুক্ত শিক্ষিত পাত্র পাইলে কন্যাপক্ষ সর্ব্বপ্রকার সাহায্য করিতে স্বতঃ প্রবৃত্ত হয়; তথাপি দূরদেশে বিবাহ কার্য্য করিতে হইলে বরপক্ষ অনিচ্ছা স্বত্বেও কোন কোন বিষয়ে সাহায্য লইতে বাধ্য হয়। কন্যাকর্ত্তা হইতে টাকা লইয়া বিবাহ করা আসামীয় ভদ্রশ্রেণীর ভিতর অতি নিন্দনীয় ও অপমানজনক। "বর" বলিয়া থাকে—"স্ত্রীর টাকা লইয়া বড় মানুষ হইতে চাইনা, পুরুষ জন্ম লইয়াছি পুরুষার্থ করিয়া পরিবারের ভরণ পোষণ করিব।" কন্যাকর্ত্তার অবস্থামত যেরূপ চলে কন্যার সঙ্গে তাহাই দেয়; বরপক্ষ তাহাতে কোন কথা উত্থাপন করে না। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, আজকাল কোন কোন শিক্ষিত যুবক আসামের এই উন্নত নিয়ম পরিহার করিয়া বঙ্গদেশের জঘন্য বৈবাহিক প্রথার অনুকরণ করিতেছে। শাস্ত্রসম্মত অষ্টবিধ বিবাহের মধ্যে আসামে ভদ্রশ্রেণীর ভিতর প্রাজাপাত্য আর জনসাধারণের ভিতর পৈশাচ অর্থাৎ বলপ্রয়োগ পূর্ব্বক ধরিয়া লইয়া যাওয়া প্রথা প্রচলিত আছে।

যখন বালকের উচ্চ শিক্ষা বিষয়ে আসামের অভিভাবকগণ অতি উদাসীন, তখন বালিকা-

শিক্ষা কি প্রকার হইবে তাহা সহজে অনুমান করা যাইতে পারে। এখনও অনেকের এমন ধারণা আছে যে, লেখা- পড়া শিখিলে স্ত্রীলোক দুষ্টা ও ভ্রষ্টা হয়; আর লেখাপড়া শিখিয়াই বা তাহারা কি চাকরী করিতে যাইবে? যে শিক্ষায় স্ত্রী কি পুরুষের রুচি বিকায়, আর অনীতি-অধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্তি জন্মায়, সে শিক্ষাকে প্রকৃত শিক্ষা বলা যাইতে পারে না। সাধু সুশিক্ষিত চরিত্রবান লোক শিক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত হইলে, শিক্ষার দুর্নাম ঘুচিয়া যাইবে ও সকল শ্রেণীর লোকে বালক বালিকাকে লেখা পড়া ও ব্যবহারিক শিক্ষা দিতে উৎসুক্য প্রকাশ করিবে।

আসামের লোকের আজ এত হীনাবস্থা কেন? আহোম রাজার রাজত্বকালে একদিকে নিষ্পেষিত দুঃখী প্রজা আর অন্যদিকে অলস অত্যাচারী, কর্ম্মচারীগণকে দেখিতে পাওয়া যাইত। সেই উচ্চশ্রেণীস্থ লোকগণ কোথায়? আর আসামের অবস্থাই বা কি? তাহার উত্তর আসামের কমিশনর জেনেরেল জেনকিন্স সাহেব এইভাবে দিতেছেন—"Notwithstanding its greatly impoverished and depopulated state, and the disadvantage of being beyond all trade, having no connexion with any other Province of the empire, and only savages as its neighbours, Assam has greatly recovered its cultivation and much of its internal prosperity. It has had to labour, however, under other difficulties in its progress, the greatest perhaps of which has been the impoverishment of every man of rank in the country, first by the sequestration of their pykes and next by the emancipation of their slaves. These formed the estates of the native gentry, who were not generally land-proprietors, and though they had in many instances small patrimonial forms, that is, estates which they had originally cleared from jungle, called *khats*, they were unable to cultivate these when their slaves were librated, and they have with small exception either thrown them up or allowed them to be sold for arrears of revenue and debts."

ব্রহ্মদেশবাসীগণ আসাম তিনবার আক্রমণ করিয়া দেশ ছারখার করিয়া গিয়াছে। তাহাদের অমানুষিক কার্য্য ও উপদ্রবের কথা শুনিলে আজিও প্রাণ চমকিয়া উঠে এবং চক্ষে জল আইসে। আজিকার দিনেও কোন বিশেষ অন্যায় অবিচার বা উপদ্রব হওয়া দেখিলেই প্রজারা বলিয়া উঠে "মানের দিন কি ফিরিয়া আসিয়াছে?" আসামীয়েরা ব্রহ্মদেশবাসীগণকে মান বলে। নবাব সিরাজ উদ্দৌলার দিনে বাঙ্গালা দেশে যেরূপ অত্যাচার ও নৃশংস কার্য্যের কথা ইতিহাসে পাওয়া যায়, তাহাও ব্রহ্মদেশবাসীগণের অমানুষিক কার্য্যের তুলনায় অতি সামান্য বলিতে হইবে। পূর্ব্বকার লোকাংশ্য আসাম শ্মশান-ভূমিতে পরিণত হইল। এই পামরদিগের হস্ত হইতে পরম সদাশয় ইংরাজরাজ আসামীয়াদিগকে রক্ষা করিলেন এবং তাঁহাদের সুশাসনে আসাম দিন দিন উন্নতি-পথে অগ্রসর হইতেছে। জেনকিন্স সাহেবের নির্দ্দেশিত কারণে আসামে উচ্চ শ্রেণীর ধনী লোকের সম্পূর্ণ অভাব দেখা যাইবে এবং একারণে তাহাদের বংশধরেরাই গবর্ণমেন্টে [illegible]রীর নিমিত্ত লালায়িত

আসামে রাজার রাজত্বকালে আফিমের চাষ হইত; তাহাতে লোকেরা অধিক আফিমসেবী হইয়া অলস ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছিল। এই দুর্নীতি নিবারণের নিমিত্ত ইংরেজরাজ আফিমের চাষ উঠাইয়া দিলেন বটে কিন্তু স্বহস্তে সেই ব্যবসায় করিতে আরম্ভ করিয়া কি কুদৃষ্টান্তই দেখাইতেছেন তাহা এক বার মনে ভাবিলেও অতি কষ্ট হয়। কারণ আফিমখোরেরা বলে যে, যদি আফিম খাওয়া অনিষ্টজনক হয়, তাহা হইলে এমন সুসভ্য ইংরাজ রাজা এই ব্যবসায় করিবেন কেন? এই প্রশ্নের উত্তর—রাজস্বের জন্য। সংস্কৃতে আফিমকে "অহিফেন" বলে এবং অহিফেন=সর্পের ফেনা, ইহার দ্বারা জানা যায় যে আফিম কি জিনিষ। ইহাকে ঔষধ রূপে প্রয়োগ করা যাইতে পারে কিন্তু প্রত্যহ সেবন করা অভ্যাস করিয়া ইহার বিষম ফল বিস্তর লোকে ভোগ করিতেছে।

বঙ্গদেশে দুর্গোৎসব যেমন,আসামে তিনটি বিহু তেমন। এই তিনটি উৎসব তিন সংক্রান্তিতে হইয়া থাকে। (১) জলবিষুব সংক্রান্তি; (২) মকর সংক্রান্তি; (৩) মহাবিষুব সংক্রান্তি। এই তিনটির ভিতর শেষেরটীতে নিম্নশ্রেণীর ভিতর ১০।১৫ দিন পর্য্যন্ত আনন্দোৎসব হইয়া থাকে।

উপসংহারে বলিতে হইবে—ভারতবর্ষের উত্তরপূর্ব্ব প্রান্তে এক সময়ে অতি দুর্গম স্থানে অবস্থিত হইলেও আসাম অতি প্রাচীন এবং নানাপ্রকার ঐতিহাসিক ঘটনাপূর্ণ প্রদেশ। বশিষ্ট, অগস্ত্যাদি আর্য্যশ্রেষ্ঠ মহর্ষিগণের আশ্রম বা তপোবন যেস্থানে বর্ত্তমান, জামদগ্নিসুত রাম যে স্থানে মাতৃবধরূপ মহাপাতক হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন; কৃষ্ণ, ভীম, অর্জ্জুন আদি ক্ষত্রিয় মহাবীর সকলের যেস্থান ক্রীড়াভূমি বলিয়া প্রাচীন গ্রন্থাবলিতে [illegible]ে রহিয়াছে, সুরম্য অট্টালিকা, কারুকার্য্যখচিত প্রস্তরনির্ম্মিত প্রকাণ্ড দেবদৌর মন্দির ও সুপ্রতিষ্ঠিত নগরের ভগ্নাবশেষ অটব্য অরণ্যের মধ্যে যেস্থানে অদ্যপরিমিত দৃষ্টিগোচর হয়—এমন আসাম অসভ্য—এমন আসামের কোন ইতিহাস নাই বলিতে যাঁহারা সাহস করেন, তাঁহারা কেবল নিজের অজ্ঞতা, অসারতা অলসতা ও অনবধানতা প্রকাশ করেন বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। উহাদিগকে চীন পরিব্রাজক হিউয়েন শাঙ্গের লিখিত আসাম ভ্রমণ বৃত্তান্ত ও মাননীয় গেইট সাহেব মহোদয়-সংগৃহীত "আসাম-ইতিহাস" পাঠ করিতে অনুরোধ করি। অতি পূর্ব্বকালেই আসামে আর্য্যজাতির প্রবেশের ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। আসামীয়েরা নানা অসভ্য বর্ব্বর ও অর্দ্ধ সভ্য জাতির দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকায় অনেক সময় লাঞ্ছিত ও নিগৃহীত হইতে হইয়াছে বটে, কিন্তু বৃটিসসিংহের সুশাসনে ইহারাও স্বভাবিক অলসতা পরিত্যাগ করিয়া উন্নতিপথে ক্রমে অগ্রসর হইতেছে। আসামের সেই দুর্দ্দিন কাটিয়া গিয়াছে। শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে আসামেও যুগান্তর উপস্থিত হইতে চলিল। শারীরিক, মানসিক, আর্থিক, নৈতিক সকলদিকেই পরিবর্ত্তন দেখিতে পাওয়া যাইবে। যেরূপ পিঞ্জরাবদ্ধ কোন পাখী পিঞ্জর হইতে মুক্তিলাভ করিলে, চারিদিকে ছুটাছুটি আরম্ভ করিয়া মহৎ আনন্দ প্রকাশ করে, সেইরূপ ইংরেজ রাজপুরুষের অনুগ্রহে ইংরেজীধরণে শিক্ষালাভ করিয়া এবং ইংলণ্ডের সাহিত্য, বিজ্ঞান ও রাজনীতিতত্ত্ব কতক পরিমাণে অবগত হইয়া, অনেকের স্বাধীনতা লিপ্সা এত প্রবল হইয়া উঠিয়াছে যে, তাহারা আত্মহারা হইয়া ভারতের উন্নতি করে অন্তরায় হইতে বসিয়াছে। অতএব মহোদয়গণ, স্বদেশের অবস্থা বিষয়ে একবার স্থিরচিত্তে অনুধাবন করিয়া অন্তরাত্মাকে

পরীক্ষা করিয়া দেখুন; তাহা হইলেই অতি নিরীহ আসামবাসীদিগকে ঘৃণাচক্ষে না দেখিয়া ভ্রাতৃভাবে আলিঙ্গন করিতে পারিবেন।

শ্রীউপেন্দ্র নাথ বড়ুয়া।

ভারতী-মঙ্গল কাব্য।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

ত্রিপদী

যেন আছে বেদে লেখা, বিচারিয়া কল্প-শাখা,
জীবন প্রতিষ্ঠা করি পরে।
তাম্র পাত্রে পূর্ণ করি, তিল কণা তদুপরি,
লয়া বসি আনন উত্তরে॥
ব্রাহ্মণের আজ্ঞা ধরি, এমতে সঙ্কল্প করি,
সামান্যার্ঘ্য করিবে স্থাপনে।
বিচিত্র মণ্ডলোপরে, অচ্ছাদিয়া শ্বেতাম্বরে,
ঘট স্থাপিবেক শুভক্ষণে॥
হয়া অতি ভক্তিমতি, অর্চ্চা করি গণপতি,
পঞ্চদেব পূজি শিব আদি।
আদিত্যাদি গ্রহগণে, অর্চ্চা করি হর্ষমনে,
দিকপাল পূজি যথাবিধি॥
গৌর্য্যাদি মাতৃকাসব, অর্চ্চা নতি পঠি স্তব,
এ সকল করি সমাধান।
পুনঃ করি আচমন, ভক্তিযুক্ত করি মন,
অত্যন্ত হইয়া সাবধান॥
শুন মাতা নারায়ণী, বলি হে তোমারে বাণী,
নিজ দাসে না ছাড়িও দয়া।
অতি মূর্খ নর আমি, পতিতপাবনী তুমি,
ইহা জানি তারগো অভয়া॥
দুর্গাপুরে নিজ ধাম, দ্বিজ রাজসিংহ নাম,
তব পদ ভাবি চিত্ত মাঝে।
ভারতী মঙ্গল পুথি, নিজ সাধ্য যথা শক্তি,
ভণে পদ ভূপতি-অনুজে॥

পয়ার।

ভারতী পদ্ধতি উক্ত ন্যাস আদি সারি।
তৎপরে বিশিষ্ট মতে ভূত শুদ্ধি করি॥
কল্পশাখা উক্ত মত ধ্যান করি পরে।
করিবে মানস পূজা পুষ্প দিয়া শিরে।
তদন্তরে দিব্য শঙ্খ স্ববামে রাখিয়া।
স্থাপিবে বিশেষ অর্ঘ্য সলিলে পূরিয়া॥
পীঠ দেবতাকে পূজা করি শুদ্ধ মনে।
হস্তে তুলি লবে পুষ্প মণ্ডিত চন্দনে॥
কূর্ম্ম মুদ্রা করি ধ্যান লয়া সাবহিতে।
ঘটের উপরে দিবে কিবা প্রতিমাতে॥
তবে পুনঃ মন্ত্র মতে করি আবাহনে।
ষোল উপচারে পূজা করিবে বিধানে॥
আসন স্বাগত পাদ্য অর্ঘ্য আচমনী
মধুপর্ক দিবে আর আচমনী পুনি
স্নানীয় বসন দিবে স্বর্ণ অলঙ্কার।
গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ বিস্তর প্রকার॥
নৈবেদ্য নানান মত যথা শক্তি দিবে।
অবশেষে ভূমিগতে প্রণাম করিবে॥
শুক্ল পুষ্প দিবে বহু অঞ্জলি ভরিয়া।
শর্করা সন্দেশ দিবে ভক্তিযুক্ত হৈয়া॥
নানামতে দধি দুগ্ধ গর্গরীতে ভরি।
সম্মুখে সাজায়ে দিবে করি সারিসারি॥
শুক্ল ছাগ ধবল বরণ পারাবতে।
বিনাবধে বলি দিবে দেবীর অগ্রেতে॥
জপ হোম নমস্কার করিবে তৎপরে।
স্তব পঠিবেক কল্পশাখা অনুসারে॥
যথা শক্তি [illegible]বতী পরে অর্চ্চা করি।

অপরে করিবে অর্চ্চা পুস্তক উপরি ॥
মস্তাধার লেখনীকে আগর চন্দনে।
পাদ্য অর্ঘ্য পুষ্পে পূজা করিবে বিধানে ॥
যন্ত্র আদি সকল আনিয়া তদন্তরে।
করিবে উত্তম পূজা পঞ্চ উপচারে ॥
পুণ্য ইতিহাস বাণী শুন দ্বিজবর।
হেন মতে পূজা করি হবে অবসর ॥
নানা জাতি বাদ্য নৃত্য গীত মহোৎসবে।
অধিক আনন্দচিত্তে সে দিন থাকিবে ॥
এইরূপে সেই ক্ষপা প্রভাত হইলে।
স্নান অর্চ্চা সারিয়া আসিবে পূজাশালে ॥
দক্ষিণা করিবে মন্ত্র পড়ি বিধিমতে।
রজত কাঞ্চন কিবা তুলসীর পাতে ॥
সম্পূর্ণ করিবে পূজা শ্রীবিষ্ণু স্মরণে।
সন্ধি ক্রিয়া এরূপে করিবে ষষ্ঠীদিনে ॥
অপরে প্রতিমা লয়া গীত বাদ্য নাটে।
কান্ধে তুলি লয়া যাবে সলিল নিকটে।
সুসব্যস্তে জল মধ্যে বিসর্জ্জন করি।
হরিধ্বনি করি পরে আসিবেক ফিরি ॥
শুন দ্বিজ কালিদাস হয়া সাবধান।
কহিল তোমাতে সব পূজার বিধান ॥
সকলের মূল দেবী জানিবা ইঁহাকে।
ত্রিভুবনে সেই জয়ী কৃপা করে যাকে ॥
ইনি রুষ্টা হন যাকে তার নাই গতি।
কি করিবে অন্ত কাজ না সরে ভারতী ॥
অতএব বলি দ্বিজ শুন সাবহিতে।
ভজহ ইঁহাকে যায়া ভক্তি করি চিত্তে ॥
বিদ্যা হেতু মৃত্যু ইচ্ছা করি আইলে বনে।
তপস্যা করিলে জয়ী হবে ত্রিভুবনে ॥
শুন রাপু থাক আজি নিয়মিত হয়া।
করাইব উপাসনা প্রভাতে উঠিয়া ॥
ইহা শুনি কালিদাস স্নান অর্চ্চা করি।
ভোজন করিল ফল সম্বলিতে বারি ॥
কুশ-শয্যা করি সেই ত্রিযামা বঞ্চিল।
ভারতী স্মরিয়া অতি প্রভাতে উঠিল।
প্রাতঃক্রিয়া আদি ক্রিয়া করি সমাপন।
আসি উত্তরিল শীঘ্র মুনির সদন ॥
করিল প্রণতি দ্বিজে যুড়ি দুই কর।
গলবস্ত্র করি তিষ্ঠে মুনির গোচর ॥
মুনি বলে বৈস দ্বিজ বাম ভাগে মোর।
বুঝি আজি ভাগ্যোদয় হৈল আসি তোর ॥
ইহা শুনি কালিদাস মহা ভক্তিমনে।
বসিলেক নতি করি মুনির চরণে ॥
দ্বিজের দক্ষিণ কর্ণে মুনি কৃপা করি।
কহিলেন তাকে বাণী মন্ত্র অষ্টাক্ষরী ॥
মন্ত্র পায়া কালিদাস হরষিত হৈল।
সর্ব্ব পাপে তাকে ছাড়ি অতিদূরে গেল ॥
শরত শশাঙ্ক সম সুতেজ শরীর।
চপলতা খণ্ডি দ্বিজ হইল সুস্থির ॥
এই ভাষা যেই জনে ভক্তি করি শুনে।
বিদ্যা যশঃ পুণ্য তার বাড়ে দিনে দিনে ॥
শুন নিবেদন বাণী মাতা সরস্বতী।
অধম জানিয়া কৃপা কর মোর প্রতি ॥
নিজ মন মজাইয়া তব পদাম্বুজে।
ভারতী-মঙ্গল গীত ভণে ভূপাম্বুজে ॥

ত্রিপদী।

মন্ত্র পায়া দ্বিজে, মুনি পদাম্বুজে,
প্রণতি করিয়া বলে।
শুন মুনিবর, নিবেদন মোর,
বলি তব পদতলে ॥
কিবা আজ্ঞা হয়, আনিয়ে নিশ্চয়,
সে কার্য্য করিতে পারি।
কি হয় বিধানে, কহ বিদ্যমানে,
মোকে অনুগ্রহ করি ॥
ইহা শুনে মুনি, কহে প্রিয় বাণী,
শুন দ্বিজ কালিদাস।
সত্বর করিয়া, যাহত চলিয়া,
ভারতী সরিত পাশ ॥
যায়া সেই স্থানে, মন্ত্র জপ মনে,
তপস্যা করহ তুমি।
চল তথা তূর্ণ হবে বাঞ্ছাপূর্ণ,
এই বর দিল আমি।

শুনিয়া ব্রাহ্মণে, মুনির চরণে,
প্রণতি করিয়া চলে।
মন কুতূহলে, লঙ্ঘি বন জলে
অতি তূর্ণ তথা মিলে॥
বাণীনদীকুলে, বটবৃক্ষমূলে,
নিরমিল এক স্থান।
তথা দিবা রাতি, একাগ্রে ভারতী,
ভাবে মনে নাহি আন॥
ভারতী সাধিতে, অতি হরষিতে,
স্নান করি প্রাতঃকালে।
একপদে দ্বিজে, দিবা রাত্রি ভজে,
অশ্বত্থ পাদপমূলে॥
দিবা অবসানে, করয় ভক্ষণে
ফল মূল যাহা পায়।
অতি তৃষ্ণাকালে, করিয়া অঞ্জলে,
সলিল তুলিয়া খায়॥
এমত প্রকারে, ঘোর তপ করে,
ভারতী ভাবিয়া মনে।
হস্ত উর্দ্ধে তুলি, জপে বাণী বলি,
আরাধে রজনী দিনে॥
কত কাল পরে, ত্যজিল আহারে,
শুষ্ক হৈল তনু অতি।
অঙ্গুষ্ঠের ভরে, মন্ত্র জপ করে,
বৃক্ষ সম করি স্থিতি॥
শরীর পিষিত, নাহিক কিঞ্চিত,
অস্থি মাত্র হৈল সার।
জপে দিবা রাতি, ভাবিয়া ভারতী
মনে নাহি কিছু আর॥
শিশির সময়, যথা বারিচয়,
তাহে তনু মজাইয়া।
সকল যামিনী, দ্বিজ জপে বাণী
অত্যন্ত আরদ্র হৈয়া॥
গ্রীষ্মে দিবাকালে, মার্ত্তণ্ডের জালে,
জ্বালি বহু হুতাসন।
তার মধ্যে আসি, মন্ত্র জপে বসি,
ইষ্টে মগ্ন করি মন॥

হেনমতে দ্বিজে, সদা বাণী ভজে,
অত্যন্ত কঠোর মতে।
মন্ত্র অষ্টাক্ষরী, দিবা বিভাবরী,
জপেন একাগ্র চিতে॥
দ্বিজের ভকতি, দেখি সরস্বতী,
প্রসন্ন হৈলা মনে।
অতি তূর্ণ করি, দিব্য মূর্ত্তি ধরি,
আইলা দ্বিজ বিদ্যমানে॥
ভারতী সম্পাশে, দেখি কালিদাসে,
নতি কৈল ভূমিগতে।
ইহা দেখি বাণী, দিয়া এক পাণি,
স্পর্শ কৈলা দ্বিজ মাথে॥
উঠহ ব্রাহ্মণ, শুনহ বচন,
চাহ তুমি কিবা বর।
বল মোর স্থানে, দিব এইক্ষণে
বাঞ্ছা পূর্ণ করি তোর॥
শুনি-দ্বিজ সুতে, হৈয়া যোড় হাতে,
বাণীতে বলেন বাণী।
হীন ভৃত্যজনে, তারহ আপনে,
কৃপা করি ঠাকুরাণী॥
দুর্গাপুরে বাস, ভবানীর দাস,
রাজসিংহ নাম দ্বিজে।
নবীন সঙ্গীত, করিয়া রচিত,
ভণে বাণী-পদাম্বুজে॥

পয়ার।

দ্বিজ বলে শুন মাতা দেবী সরস্বতী।
কি বর চাহিব আমি কিবা মোর মতি॥
মোরে যদি দিবে বর ইচ্ছা থাকে মনে।
সতত রহুক মন তোমার চরণে॥
চরমে যখন ধরি নেয় রবিসুতে।
দাস জানি কৃপা করি তরাইবা তাতে॥
অন্য বরে মোর কিছু নাই প্রয়োজন।
কর তেন যেন ইচ্ছা লয় তব মন॥
ইহা শুনি তুষ্ট হৈয়া বলিলা ভারতী।
মোর বাক্য ক[illegible]াস কর অবগতি॥
বিদ্যা হেতু মৃত্যু ইচ্ছা করিয়া অন্তরে।

দুষ্কর করিয়া বহু তপ কৈলা মোরে ॥
আমি তোকে দিল বর হরষিত চিত্তে।
প্রধান পণ্ডিত হবে এ তিন্ জগতে॥
ক্ষিতিতলে বহুকাল সুখ ভোগ করি।
অন্তকালে প্রাপ্তি তব হবে সুরপুরী ॥
এই নদীজলে স্নান কর যায়া তুমি।
রাখিবে বচন কিছু যাহা বলি আমি ॥
না বর্ণিবে কদাচিত আমার অবস্থা।
আর যেই ইচ্ছা তব করিও কবিতা ॥
যে আজ্ঞা বলিয়া দ্বিজ প্রবেশিল জলে।
ডুবে কালিদাস গেল গভীর সলিলে ॥
ক্ষণমাত্র তিষ্ঠি দ্বিজ কীলাল ভিতরে।
উঠে তূর্ণগতি অতি পায়ের উপরে ॥
সর্ব্বশাস্ত্র অধিষ্ঠান কণ্ঠে হৈল আসি।
রাহুগ্রাস হৈতে যেন মুক্ত হৈল শশী ॥
কৃশানু মূর্চ্ছিত যেন থাকে ভস্ম মেলে।
আধার সংযোগ হৈলে প্রজ্জলিতে জ্বলে ॥
তেন দ্বিজ কালিদাস ভারতীর বরে।
স্নানে মহাকবি হৈয়া উঠিল সত্বরে ॥
দৈবের নির্ব্বন্ধ কর্ম্ম না যায় খণ্ডন।
ভারতীকে কাছে দ্বিজ দেখিয়া তখন ॥
নানা ছন্দে আরম্ভিল বর্ণনা তাঁহার।
তাহা শুনি সরস্বতী, কুপিত অপার ॥
শুন দ্বিজ পূর্ব্বে তোকে করিছিল মানা।
তথাপিও কৈলা মোর শরীর বর্ণনা ॥
হবে তোর অধোগতি বাক্য শুন মোর।
বারবধূ গৃহে প্রাণ ত্যাগ হবে তোর ॥
এ বচন বলি মাতা নিজ স্থানে গেলা।
অন্তরে তাপিত দ্বিজ কিঞ্চিত হইলা ॥
মনে মনে যুক্তি স্থির করি কালিদাস।
কি কারণে আমি আর করি বনবাস ॥
সেই নদী জলে ঘট পরিপূর্ণ করি।
গমন করিল দ্বিজ হস্তে লৈয়া বারি ॥
নিতান্ত দুর্ব্বল পথে নদী গিরি জল।
মহাক্লেশে ছাড়াইয়া আইল [illegible] সকল ॥
ক্ষুধাকালে কর্ণ খায় তৃষ্ণাকালে বারি।
চলে তূর্ণগতি অতি দিবা বিভাবরী ॥
বহুদূর হাটি পাইল মনুষ্য আশ্রয়।
সেখানে ত্যজিল দ্বিজে মরণ সংশয় ॥
ক্ষুধায় আকুল তনু ওদন বিহনে।
কি করিলে কি হইবে ভাবে মনে মনে ॥
শূদ্র বৈশ্য বৈশ্য দ্বিজ বিচারে নগরে।
দৈবযোগে মিলে এক কুলালের ঘরে ॥
কুলাল বলয়ে দ্বিজ কিসের কারণে।
বহুশ্রমে আইলে কেন আমার ভবনে ॥
দ্বিজ বলে উপবাস বহুকাল করি।
ক্ষুধায় আকুল হয়া যথা তথা ফিরি ॥
কালিদাস বলে তুমি হও কোন জাতি।
শুনি সেই বলে আমি কুলাল পদ্ধতি ॥
এথা যদি আইলে করি অনুগ্রহ মোরে।
স্নান করি আইস দ্বিজ এই সরোবরে ॥
মৃণময় বাটী তৈলে পরিপূর্ণ করি।
বসিতে আসন দিল পাদ্যহেতু বারি ॥
চরণ পাখালি দ্বিজ তৈল দিয়া অঙ্গে।
সরোবরে স্নান হেতু চলে মনোরঙ্গে ॥
এথাতে গৃহস্থে গৃহ পরিষ্কার করি।
প্রাণপণে আনি দিল রন্ধন সামগ্রী ॥
অতি তূর্ণ কালিদাস স্নান করি আইল।
তক্ষণ সামগ্রী দেখি হরষিত হৈল ॥
রন্ধন করিয়া হর্ষে করিল ভোজন।
কুলালে দিলেক শয্যা করিতে শয়ন॥
সুষুপ্তিতে সুখে সেই সর্ব্বরী বঞ্চিল।
শ্রীরাম স্মরিয়া অতি প্রভাতে উঠিল ॥
প্রাতঃক্রিয়া সকল করিয়া সমাপন।
গৃহস্থকে ডাকি দ্বিজ কহিল তখন ॥
শুনহ কুলাল তুমি বচন আমার।
করিবে অবশ্য মোর এক উপকার ॥
এই ঘট স্থাপ্য তোতে রাখিলাম আমি।
মাহর সম্পূর্ণ ইথে না ছুইও তুমি ॥
এতবলি ঘট থৈয়া চলে দ্বিজবরে।
কুলালে সযত্নে তাকে থৈল নিয়া ঘরে ॥
দুই চারি দিন রইয়া গেল এই মতে।

অন্ত দিন দ্বন্দ্ব তার হৈল ভার্য্যা সাথে ॥
ধরিল পতিকে কুপি যাইয়া তার নারী।
হৃদে পদাঘাত কৈল অতি দৃঢ় করি ॥
মরণ সমান লজ্জা পাইয়া কুলালে।
বিষ আনি আনি ঘট পান করে জলে ॥
মৃত্যু ইচ্ছা করি মনে কৈল জল পান।
বাণী কৃপামতে হৈল পণ্ডিতপ্রধান ॥
কে বুঝিতে পারে ভাই বাণীর চরিত।
কুলালে কীলাল খাইয়া হইল পণ্ডিত ॥
সেইক্ষণে কুলাল চলিল রাজপুরে।
প্রশংসা বিস্তর মত করিয়া ভার্য্যারে ॥
তোমার প্রসাদে মোকে কৃপা কৈলা বাণী।
প্রকারে হইলে গুরু শুন নিতম্বিনী ॥
শুন ভাই যাকে বাণী হয় হর্ষমন।
সাফল্য জীবন তার সেই মহাজন ॥
সরস্বতী মাতা শুন নিবেদন মোর।
অনুক্ষণ রৌক মতি পদযুগে তোর ॥
দ্বিজ রাজসিংহ নাম ভূপাল অনুজে।
নূতন সঙ্গীত ভণে তব পদাম্বুজে ॥

ত্রিপদী।

কালিদাস তথা হনে, ভ্রময়ে নানান স্থানে,
শুনে কাছে নৃপতির ধাম।
পণ্ডিত অনেক আছে, সেই ভূপতির কাছে,
বিক্রম আদিত্য তার নাম ॥
শুনি বলে কালিদাস, যাব ভূপতির পাশ,
দেখি কোন করে ব্যবহার।
যোগ্যমত করে মান, রহিব তাহার স্থান,
নতু পরে চেষ্টা পাব আর ॥
এই দৃঢ় যুক্তি করি, চলে ভূপতির পুরী,
তূর্ণ যাইয়া তথা উত্তরিল।
নগরের এক পাশে, রৈল দ্বিজ গুপ্তবেশে,
পরস্পর বারতা জানিল ॥
নৃপের কেমত মন, কত আছে বিপ্রগণ,
কেন মত দ্বিজে সমাদর।
শুনিল লোকের মুখে, পণ্ডিতকে যত্নে রাখে,
ইহা শুনি হর্ষ দ্বিজবর ॥
বিচারিয়া শুভ তিথি, স্নান করি যত্নে অতি,
উত্তরিলা রাজা বিদ্যমানে।
দ্বারের নিকটে আসি, মধুর বচনে তোষি
নিজ কথা কহে দ্বারী স্থানে ॥
দ্বিজ জাতি বটি আমি, রাজাতে জানাও তুমি
যাইতে চাই নৃপ সন্নিধানে।
কেন মত আজ্ঞা করে, জানিয়া আসিবা তারে
হবে তব অবশ্য কল্যাণ ॥
দ্বারী চলে ইহা শুনি, ভূপে যাইয়া বলে বাণী,
এক বিপ্র আসিয়াছে দ্বারে।
বলে তার আছে কাজ, কিবা আজ্ঞা মহারাজ,
বুঝিলে কহিতে পারি তারে ॥
দ্বারীর এমত বাণী, শুনি কহে নৃপমণি,
কহ দ্বিজ আসিতে এথাতে।
ইহাকে শুনিয়া দ্বারী, গেল অতি তূর্ণ করি,
নৃপ আজ্ঞা কহিতে দ্বিজেতে ॥
হেন বাক্য শুনি দ্বিজে, প্রবেশিল পুরী মাঝে
রাজসভা দেখিয়া বিস্মিত।
নিন্দিয়া ইন্দ্রের পুরী, ইহার প্রসংশা করি,
কিবা বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মিত ॥
হেমময় হর্ম্ম্য সব, তেজে চন্দ্র পরাভব,
অপরূপ অধিক উজ্জ্বল।
কি কব নির্ম্মাণ তার, অতি পরিস্কার দ্বার,
দর্পণে করয়ে ঝলমল ॥
রত্নময় অট্টালিকে, ভূপতি বসিছে দেখে,
ইন্দ্র সম স্বর্ণ সিংহাসনে ॥
শিরোপরে শোভে ছত্র, মণিময় বাতপত্র,
দোলাইছে অনুচরগণে ॥
পাত্র মিত্র মন্ত্রীগণ, সম্মুখেতে অনুক্ষণ,
দাড়াইয়া আছে যোড় করে।
বাহিনী বরুথ-পতি, যোদ্ধাগণ মহারথী,
সদা আছে ভূপের গোচরে ॥
কালিদাস ইহা দেখি, মনে বড় হৈল সুখী,
নৃপ আগ্রে তিষ্ঠে যোড় হাতে

বিস্তর বর্ণনা করে, যেন মত বুদ্ধি ধরে,
ছন্দে বন্দে ভূপের সাক্ষাতে ॥
দেখি কাছে দ্বিজবর, নৃপতি যুড়িয়া কর,
ভক্তিভাবে কৈল নমস্কার।
বিজ্ঞ সকলে জানি, স্বর্ণাসন দিল আনি,
কালিদাস দ্বিজ বসিবার ॥
শুন বাণী ঠাকুরাণী, অন্য কিছু নাহি জানি,
তব নাম জপি মাত্র মনে।
আমি জ্ঞানহীন অতি, তুমি দেবী সরস্বতী,
ত্রাণ কর আপনার গুণে ॥
সুসঙ্গ নগরে ঘর, হীনমতি ধরাধর,
রাজসিংহ শর্ম্মা বটে নাম।
নূতন পয়ার ভণে, রাখ মাতা শ্রীচরণে,
কৃপা করি পূর মনস্কাম ॥

পয়ার।

মহীপাল সভা যত্নে পুছে দ্বিজ স্থানে।
কোথা ধাম কিবা নাম কিবা অধ্যয়নে ॥
দ্বিজ বলে কালিদাস অভিধান মোর।
সর্ব্বশাস্ত্রে অধ্যয়ন মিথিলাতে ঘর ॥
ভূপ শুনি বলে বাণী এ বড় বিস্মত।
সর্ব্বশাস্ত্রে একজন না হয় পণ্ডিত ॥
অনন্ত অপার সৃষ্টি কেবা জানে অন্ত।
মনুজ ভিতরে হেন নাহি গুণবন্ত ॥
কতকাল বাঁচে নর কি পঠিবে ইতে।
ইহার বৃত্তান্ত দ্বিজ বলহ আমাতে ॥
বিপ্রে বলে সত্য বলিয়াছি ধরাপতি।
যে রূপে হইল বিদ্যা শুনহ ভারতী ॥
পৃথিবীতে দিব্য স্থান মিথিলা নগর।
তথা বৈসে শক্রজিত নামে নরেশ্বর ॥
তাঁর এক কন্যা অতি গুণযুক্তা জানি।
করিল উৎকট পণ সেই নৃপমণি ॥
যেই জিনে বিদ্যাবলে সেই হবে পতি।
ই শুনি পণ্ডিত বহু হৈল উপস্থিতি ॥
সকলি হারিল পরে জায়ে জায় সনে।
যুক্তি স্থির কৈল বিহা দিব স্থানে ॥
অতি মূর্খ জানি সবে লয়া গেল মোরে।
সবে ছাত্র হয়া জিনে কপট প্রকারে ॥
নৃপে কন্যা বিহা দিল জ্ঞানী জানি মোকে।
প্রকোট প্রকার জান কতদিন থাকে ॥
নিশ্চয় জানিল রামা আমি মূর্খ অতি।
হৃদে মোর পদাঘাত করিল যুবতী ॥
অপমানে মৃত্যু বাঞ্ছি গেলাম কাননে।
তথাতে হইল দেখা শনকের সনে ॥
তাঁর কাছে নিজ দুঃখ কৈল সগোচর।
শুনি মোকে বাণী মন্ত্র দিল মুনিবর ॥
গুরুর আদেশে বাণী-নদী তীরে আসি।
নিজ সাধ্যমত তপ কৈল দিবানিশি ॥
দাস জ্ঞানে কৃপা করি মোর ভাগ্যফলে।
সাক্ষাৎ হইয়া মাতা সরস্বতী বলে ॥
সর্ব্বশাস্ত্রে বিদ্যা দ্বিজ হইবেক তোর।
এ সরিতে কর স্নান বাক্য শুন মোর।
হেন শুনি স্নান আসি কৈল সেই নীরে।
সর্ব্বশাস্ত্রে হৈল বিদ্যা ভারতীর বরে ॥
তথা হৈতে নিজ কার্য্য করিয়া সাধন।
আসি উত্তরিল আজি তোমার সদন ॥
আশ্চর্য্য শুনিয়া ভূপ জিজ্ঞাসিলা তুমি।
ইহার কারণ এই নিবেদিল আমি ॥
হেন জানি ভূপ বহুমান কৈল তারে।
সবের প্রধান হৈল সভার ভিতরে ॥
আশ্চর্য্য শুনিয়া ভূপ পুছে দ্বিজ স্থানে।
কহ ভারতীর অর্চ্চা কি তার বিধানে ॥
দ্বিজ বলে শুন রাজা নিবেদন মোর।
সতত থাকিব আমি বিদ্যমানে তোর ॥
উন্মনস্ক আছি আজি ক্ষুধা শ্রম মতে।
কল্য আসি সব কথা কহিব তোমাতে ॥
অনুচর ভূপ ডাকি বলে বিদ্যমান।
তিষ্ঠিবার এই দ্বিজে দেহ দিব্যস্থান ॥
যোগ্যমত ভক্ষ্যদ্রব্য দেহ নানা জাতি।
কোন হেতু ত্রুটি যেন নহে কদাচিতি ॥
নৃপাজ্ঞায় অনুচর লয়া দ্বিজবরে।
বাসা দিয়া দিল দিব্য হর্ম্ম্যের উপরে ॥

দধি দুগ্ধ ঘৃত মধু খণ্ড গুড় চিনি।
তণ্ডুল লবণ তৈল সব দিল আনি॥
নানা জাতি ভক্ষ্য দ্রব্য কত কব নাম।
নৃপের ভাণ্ডারে যত আছে অনুপম॥
দাসগণে আনি দিল দ্বিজের সাক্ষাতে।
রন্ধন ভোজন দ্বিজে কৈল হর্ষচিতে॥
উত্তম শয্যাতে দ্বিজ রজনী বঞ্চিল।
হরি স্মরি কালিদাস প্রভাতে উঠিল॥
প্রাতঃক্রিয়া সারি গেল ভূপের গোচরে।
আশীর্ব্বাদ করি বৈসে আসন উপরে॥
প্রণতি করিয়া রাজা পুছে তার স্থানে
ভারতী পূজার বিধি কহ কৃপামনে।
শুনি দ্বিজ বলে ভূপ শুন সাবহিতে।
বাণী পূজা প্রচার হইল যেন মতে॥
আদি পূজা কৈল প্রজাপতি আদি দেবে।
দ্বিতীয় করিল পূজা যত মুনি সবে॥
মহারাজা শক্রধ্বজ মহাপুণ্যমতি।
তৃতীয় করিল পূজা করিয়া ভকতি॥
তদবধি পৃথিবীতে হইল প্রচার।
শুন মহামতি ভূপ পুরাণের সার॥
শুক্লা পঞ্চমীতে পূজা উক্ত হয় অতি
বিশেষ মকর মাসে শুনহ নৃপতি॥
মৃন্ময়ী বাণী মূর্ত্তি গঠন করিয়া।
চতুর্থীতে থাকিবেক নিয়মিত হৈয়া॥
ঘট স্থাপি পঞ্চদেব করিয়া অর্চ্চন।
নিরামিষ সেই দিনে করিবে অশন॥
পঞ্চমীতে প্রাতে উঠি স্নান আদি করি।
প্রতিমা স্থাপিবে আনি আসন উপরি॥
মণ্ডল অঙ্কিত করি বিবিধ প্রকারে।
স্বর্ণ ঘট বসাইবে ঢাকি শ্বেতাম্বরে॥
ষোল উপচারে কণ্ব-শাখা উক্ত মতে।
করিবেক অর্চ্চা স্তব অতি ভক্তিচিতে॥
শ্বেতবর্ণ পারাবত ধবল ছাগল।
বিনা বধে দিবে বলি উৎসর্গ কেবল॥
দধি দুগ্ধ ঘৃত মধু নানা উপহারে।
সকল সাজায়া দিবে দেবীর গোচরে॥

হেনমতে সেই নিশা প্রভাত করিয়া।
পরদিনে দক্ষিণা করিবে স্বর্ণ দিয়া॥
অপার সলিল মাঝে বিসর্জ্জন করি।
করিয়া মঙ্গল ধ্বনি আসিবেক ফিরি॥
বিক্রম আদিত্য ভূপ শুন ভক্তি মনে।
যেই পূজে বিদ্যাধন বাড়ে দিনে দিনে॥
ইহ লোকে নানা জাতি সুখ ভোগ করি
তনু অন্তে সেই নরে পায় স্বর্গপুরী॥
ব্রহ্মবৈবর্ত্তের ভাষা শুনিতে মধুর।
শ্রবণে অবশ্য তার পাপ যায় দূর॥
ভারতী চরণে মোর শত নমস্কার।
নিজ ভৃত্য জানি মাতা করিবে নিস্তার॥
যেন মত বুদ্ধি ধরে যত মত জানি।
ভূপানুজে ভণে পদ শিরে বন্দি বাণী॥

ত্রিপদী।

শুনি হেন বাণী, নৃপ-শিরোমণি,
ডাকি কহে মন্ত্রীগণে।
পূজিব ভারতী করি তূর্ণ অতি,
সবে কর আয়োজনে॥
শুনি মন্ত্রীগণে, অতি প্রাণপণে,
সর্ব্বত্র প্রেষিলা চর।
পুরীর পত্তন, করিল তখন,
শতে শতে কৈল ঘর॥
কনক রচিত, অতি সুশোভিত,
কি কব নির্ম্মাণ তার।
জিনি সৌদামিনী, তেজেতে বাখানি,
চারিভিতে শোভে দ্বার॥
আনে লঘুচরে, করি বোঝা ভারে,
ভক্ষ্যদ্রব্য নানা জাতি।
দেখি মন্ত্রীগণে, কহে ভূপ স্থানে,
শুনি হর্ষ নরপতি॥
আনি বিপ্রগণ, করি শুভক্ষণ,
বাণী পূজা অভিলাষে।
কৈল স্থির [illegible], শুক্লপক্ষ ভাল,
প[illegible] মকর মাসে॥

ডাকি কারিকর, কহে নৃপবর,
গঠহ প্রতিমা চারু।
নির্ম্মিবা মূরতি, শুভ্রবর্ণ অতি,
কৃষ্ণবর্ণ দিবা ভুরু।।
দিবে দুই কর, গ্রীবা মনোহর,
বীণা যন্ত্র দিবা হাতে।
কেয়ূর কঙ্কন, নানা আভরণ
অসিত চিকুর মাথে।।
উত্তম কিরীটি, করি পরিপাটি,
জড়ি নানা রত্ন মণি।
কনক রচিত, করিয়া ত্বরিত,
শিরোপর দিবে আনি।।
শ্রবণ যুগলে, পরাবে কুণ্ডলে,
গলে দিবে দিব্যহার।
পদক কাঞ্চনে, নির্ম্মিয়া যতনে,
মণি মধ্যে দিবে তার।।
পীন পয়োধর, কাঁচলি তৎপর,
দিবে করি মণিময়।
ধবল বরণ, পরাবে বসন,
কটিতে কিঙ্কিনীচয়।।
যুগল চরণ, অতি সুলক্ষণ,
গড়িবে সব্যস্ত হৈয়া।
কাঞ্চনে জড়িত, মাণিক্যে শোভিত
সাজাবে মঞ্জির দিয়া।।
শ্বেত শতদল, দিবে পদতল,
সব্যস্তে নির্ম্মাণ করি।
হয়া সাবধান, মূরতি নির্ম্মাণ,
করিবা বচন ধরি।।
ভূপতির বাণী, কারিকরে শুনি,
অত্যন্ত সব্যস্ত হৈয়া।
জপিয়া ভারতী, মনে দিবা রাতি
গঠেন মৃত্তিকা লয়া।
গড়ি অবসর, হৈয়া কারিকর,
অবশেষে চিত্র কৈল।
সপ্ত দিবা রাত্তি, করি তূর্ণ অতি,
গড়ি নৃপতিকে দিল।
পায়া বহুধন, পঠনিয়াগণ,
বিদায় হইয়া চলে।
হরিষ অন্তরে, আপন বাসরে
অতি দ্রুত আসি মিলে।।
ডাকি কালিদাস, কহে তার পাশ,
ভূপতি যুড়িয়া কর।
বলি তব পায়, শুন দ্বিজ রায়,
পুরোহিত হবে মোর।।
শুন গো ভারতী করি শত নতি,
রাখিও চরণ তলে।
আর গতি নাই, পদে দিও ঠাঁই,
শরীর পতন কালে।।
যুড়ি যুগ্ম পাণি, কৃপা কর বাণী,
মাতা আপনার গুণে।
পুর মনস্কাম, রাজসিংহ নাম,
জ্ঞানহীন দ্বিজ ভণে।।

পয়ার।

ভূপতির হেন বাক্য শুনি দ্বিজবরে।
সবিনয়ে বলে বাণী নৃপের গোচরে।।
আমাকে বলিলা পূজা করিতে ভারতী।
তব আজ্ঞামত আমি কৈল অনুমতি।।
এত বলি কালিদাস গেল পূজাশালে।
স্নান করি শুচি হৈয়া আসি সন্ধ্যাকালে।
গেলা অধিবাস স্থানে আপনে ভূপতি।
পাত্র মিত্র মন্ত্রীগণ বাহিনী সংহতি।।
পঞ্চ শব্দি বাদ্যেতে হইল মহা রোল।
দমক মৃদঙ্গ কাড়া বাজে ডাক ঢোল।।
নৃত্য গীত নানা স্থানে হরষিত মনে।
মহামহোৎসব পুরে না শুনি শ্রবণে।।
স্বর্ণ ঘট পূর্ণ বারি আনি দ্বিজবরে।।
বসাইল সাবধানে ধান্তের উপরে।।
রসাল পল্লব তার উপরে রাখিয়া।
সিন্দুর চন্দন বিন্দু ঘটোপরে দিয়া।।
স্বস্তিক আসনে দ্বিজ বসিয়া কদর্লে।
বিষ্ণু স্মরি আচমন কৈল গঙ্গাজলে।।

চৌদিকে পণ্ডিত ঘটা বসিছে অপার ॥
স্বস্তি বাক্য সবে মিলি লাগে পড়িবার।
উচ্চৈঃস্বরে বেদধ্বনি করে বিপ্রগণে।
নিকটেতে কারো ভাষা কেহ নাহি শুনে॥
শঙ্খ ঘণ্টা নানা বাদ্য বাজে সে সময়।
চারিদিকে ঘোর শব্দ হৈল জয় জয় ॥
গনাধিপ প্রথমত করিয়া অর্চ্চন।
তদন্তরে কৈল পূজা পঞ্চ দেবগণ ॥
নবগ্রহ দিকপাল পূজিল তৎপরে।
তবে ভারতীকে পূজে বিবিধ প্রকারে ॥
হেন মতে শুভক্ষণে অধিবাস করি।
গন্ধ তৈল আনি ফোঁটা দিল ঘটোপরি ॥
মন্ত্র পড়ি তৈল দিল প্রতিমার শিরে।
নৃপ-শিরোপরি ফোঁটা দিল দ্বিজবরে ॥
হেন মতে অধিবাস করি সমাপন।
আপন ভবনে চলি গেলেন ব্রাহ্মণ ॥
হবিষ্যান্ন শুচিমতে ভোজন করিয়া।
কুশ শয্যাপরে রৈল নিয়মিত হৈয়া ॥
ভূপতি গেলেন চলি আপনার ধামে।
সংযমিতে নরেশ্বর রৈলা ভক্তি ক্রমে।
প্রভাতে উঠিয়া সবে কৈল আয়োজন।
হেল কালে তথা আসি উত্তরে ব্রাহ্মণ ॥
স্নান অর্চ্চা করি তথা আসিল ভূপতি।
দ্বিজগণে দেখি নৃপ করিলা প্রণতি ॥
আশীর্ব্বাদ কৈল সবে করি যোড় হাতে।
কনক আসনে বৈসে নৃপাদেশ মতে ॥
হেন কালে ভূপতিকে কহে কালিদাসে।
প্রতিমা মণ্ডপে আন ব্যাজ কর কিসে ॥
দ্বিজের বচন শুনি নৃপ শিরোমণি।
অতি তূর্ণ ডাকি বলে অনুচর আনি ॥
সকলে সব্যস্ত হৈয়া আনহ প্রতিমা।
হেন কালে কাড়া পড়া বাজয়ে দামামা ॥
মণ্ডপে প্রতিমা লৈয়া আইল শুভক্ষণে।
জয় দিয়া বসাইল কনক আসনে ॥
গোময় সলিলে গৃহ করি পরিষ্কার।
শূদ্র আদি করি সব হইল বাহার ॥

গুণ্ডিকাতে কৈল দ্বিজ মণ্ডল অঙ্কিত ॥
তদুপরে স্থাপে ঘট কাঞ্চনে নির্ম্মিত ॥
ঘট আচ্ছাদিল দিব্য ধবল অম্বরে।
বসিলেন কালিদাস আসন উপরে ॥
হেম পাত্রে দূর্ব্বাক্ষত শুভ্র পুষ্পসনে।
সুসর্জ্জ করিয়া তূর্ণ দিলেক ব্রাহ্মণে ॥
চন্দনে সম্পূর্ণ করি চন্দনের বাটি।
পূজকের কাছে দিল করি পরিপাটি ॥
গঙ্গাজলে কালিদাস করি আচমনে।
শরীর পবিত্র কৈল শ্রীবিষ্ণু স্মরণে ॥
নানা জাতি মিষ্ট দ্রব্য বহু উপহার।
দধি দুগ্ধ পূরি ঘট দিলেক অপার ॥
যত দিল ভক্ষ্য বস্তু কত কব নাম।
পৃথিবীতে যত দ্রব্য আছে অনুপাম।
ভারতী অর্চ্চায় ভূপে অতুল সম্ভারে।
হেন কেহ না করিছে মরুতের পরে ॥
পাদ্য আদি ষোল উপচারমতে দ্বিজে।
ভক্তি করি করে অর্চ্চা বাণী-পদযুজে ॥
ধূপ দীপ পুরীখান কৈল আমোদিত।
গলবস্ত্রে আছে রাজা অমাত্য সহিত ॥
অষ্টোত্তর শত সংখ্য কনক-কমলে।
নিজ হস্তে নৃপ দিল বাণী পদতলে ॥
শুভ্র ছাগ শতে শতে করাইল স্নান।
কিঙ্কর সকলে আনে পূজা বিদ্যমান ॥
শ্বেতবর্ণ পারাবত পিঞ্জরেতে ভরি।
দেবীর সম্মুখে থৈল সারি সারি করি ॥
উৎসর্গ করিয়া দ্বিজ বেদমন্ত্র মতে।
বিনা বধে দিল বলি দেবীর অগ্রেতে ॥
হোম স্তব করিলেন নানান প্রকারে।
ভূমিগতে যোড় হাতে কৈল নমস্কার ॥
রক্ষক ব্রাহ্মণরাখি পূজা মণ্ডপেতে।
কালিদাস চলি গেলা আপন বাসাতে ॥
নৃপতি প্রণতি করি অতি ভক্তি মতে।
অন্তঃপুরে চলি গেলা ভোজন করিতে ॥
সন্ধ্যাকালে রাজাশালে আইলা কালিদাস।
পরিধেয় বস্ত্র ত্যাগি পরে শুদ্ধ বাস ॥

নৃপতি এমত কালে আসিলা তথাতে।
ভারতীকে নমস্কার কৈলা ভূমিগতে॥
চরণ পাখালি দ্বিজ করে আচমন।
ধূপ দীপ প্রতিমাকে করে নির্ম্মঞ্ছন।
দ্বিজ রাজহরি নাম ভূপতি অনুজে।
রচিল নূতন পদ বাণী পদাম্বুজে॥

ত্রিপদী।

মহা মহোৎসব করি, রৈল সেই বিভাবরী,
নৃত্য গীত বাদ্য কুতূহলে।
হেন রূপে সেই দিনে, রৈলা সবে রঙ্গমনে,
দ্বিজ উঠি আইলা প্রাতঃকালে॥
নিত্য নৈমিত্তিক সারি, অতি তূর্ণ স্নান করি,
উত্তম অম্বর পরিধানে।
আসিয়া মণ্ডপ ঘরে, চরণ পাখালি পরে,
বসিলেন কুশের আসনে॥
সাঙ্গ ক্রিয়া যত ছিল, একে একে সব হৈল,
দক্ষিণা করিল তদন্তরে।
ভূপতি এমত শুনি, শত স্বর্ণ দিল আনি
ভক্তি ভাবে ব্রাহ্মণের করে॥
তুলসীর পত্র সাথে, দ্বিজ লৈয়া স্বর্ণ হাতে
মন্ত্র পড়ি করিল দক্ষিণা।
ডাক ঢোল নানা বিধি, রাজ্য বাদ্য পঞ্চশব্দি,
হইল ভারতী পূজা পূর্ণা॥
ঘট নিয়া দ্বিজবরে, থৈল নিয়া অন্য ঘরে,
ভূপতিকে আশীর্ব্বাদ করি।
ব্রাহ্মণকে করি নতি, ভূমিগতে নরপতি,
ভক্তি ভাবে চরণেতে ধরি॥
যত সব দ্বিজগণে, গেলা নিজ নিজ স্থানে,
নৃপতি আনায়া অনুচর।
বিসর্জ্জন করিবার, ব্যাজ না করি বা আর,
সবে মিলি করহ সত্বর॥
এত শুনি দাসগণে, প্রতিমা প্রাঙ্গনে আনে
বান্ধি ছান্দি কান্ধে করি গেল।
সঙ্গে চলে নৃপমণি, করি সঙ্গে হরি ধ্বনি,
রঙ্গমনে গমন করিল॥
নৃত্য গীত বাদ্য রোল, তুরী ভেরী ডাক ঢোল
হৈল শব্দ ঘোর কোলাহলে।
কান্ধেতে প্রতিমা লৈয়া, হর্ষে জয় ধ্বনি দিয়া
উত্তরিল সরিতের কূলে॥
হরিদ্রা মিশায়া জলে, কেহ কার অঙ্গে ফেলে
কেহ কারে দেয় পঙ্ক দধি।
হরষিতে সবে মিলি, করে পঙ্কোৎসব খেলি,
বাদ্য গীত হৈল যথাবিধি॥
প্রতিমা সলিলোপরে, লৈয়া বিসর্জ্জন করে,
অতিশয় সাবহিত মতে।
যথা ছিল বহুজল, মূর্ত্তি তথা করি তল,
সবে ফিরি চলিল ঘরেতে॥
ভূপতি আসিলা পুরে, মন্ত্রীগণ গেল ঘরে,
অন্য সব যার যেই স্থানে।
বিক্রম আদিত্য রাজা, সাঙ্গ করি বাণী পূজা,
রহিলেন হরষিত মনে॥
দ্বিজ রাজসিংহ নাম, সুসঙ্গ নগর ধাম,
ভাবি মনে বাণী পদাম্বুজে।
নিজ বুদ্ধি যেন ধরে, তেন মত পরকারে,
নরপদ ভণে ভূপানুজে॥

পয়ার।

বিক্রম আদিত্য রাজা ভারতীর বরে।
অতর্ক ঐশ্বর্য্য আসি হৈল তার ঘরে॥
নানা শাস্ত্রে বিদ্যা তার হইল অপার।
ধরণীমণ্ডলে বৈরি না রহিল তার॥
প্রত্যক্ষ দেবতা হেন জানিয়া ভূপতি।
পাত্র মিত্র ডাকি রাজা বলিল ভারতী॥
দূত ডাকি প্রেষ তূর্ণ দেশে সর্ব্বস্থানে।
বাণী-পূজা বার্ত্তা দিতে প্রতি জনে জনে॥
অবশ্য করিবা পূজা তোমরা সকলে।
হবে মহাজন সব পৃথিবী মণ্ডলে॥
সর্ব্ব স্থানে দূত বাছিয়া প্রেষ এইক্ষণে।
এত শুনি তূর্ণ করি গেলা মন্ত্রীগণে॥
দূত ডাকি দেশে দেশে পাঠাইয়া সত্বরে।
বিদায় হইয়া সব চলে নিজ ঘরে॥

ধ্যান অনুসারে করি প্রতিমা গঠন।
যথা শক্তি মতে কৈল ভারতী অর্চ্চন॥
হেন মতে সর্ব্ব স্থানে হইল প্রচার।
করে বাণী পুজা সবে যেই সাধ্য যার॥
ক্রমে ক্রমে দেশে দেশে হইল ঘোষণা।
তদবধি বাণী পুজা করে সর্ব্বজনা॥
বিক্রম ভূপের কাছে কৈলা কালিদাস।
সর্ব্ব স্থানে হৈল এই ভাবতী প্রকাশ।
শক্রজিত-সুতা শুনি স্বামীর বাখান।
লাজে অপমানে হৈল মৃতের সমান॥
হেন জনে অপমান কৈল না বুঝিয়া।
কি কাজ এখনে হেন পরাণি রাখিয়া॥
এই যুক্তি স্থির রামা করি নিজ মনে।
খনিল প্রচণ্ড এক কুণ্ড সেইক্ষণে॥
অগুরু চন্দন কাষ্ঠে জালি হুতাশন।
স্নান করি কুণ্ড তটে আসিল তখন॥
অনলে প্রবেশি প্রাণত্যাগ কৈল নারী।
বিমানে চড়িয়া বামা গেল স্বর্গপুরী॥
নবরত্ন মধ্যে শ্রেষ্ঠ হৈয়া কালিদাস।
অতি প্রতিপন্ন হৈয়া রহে ভূপপাশ॥
বিদ্যায় অতুল কেহ না পারে বিচারে।
নিরবধি থাকে দ্বিজ নৃপ সগোচরে॥
হেনরূপে বহুকাল গেল নানা সুখে।
কে খণ্ডিতে পারে যেই অদৃষ্টেতে থাকে॥
ইতিমধ্যে একদিন নৃপ মহাশয়।
গেলেন উদ্যান বনে বসন্ত সময়॥
তার মধ্যে কত আছে রম্য সরোবর।
প্রস্তরে নির্ম্মিত বেশ্ম পারের উপর॥
বসিলা ভূপতি মণিময় সিংহাসনে।
চামরে বাতাস করে অনুচরগণে॥
বিস্তর নর্ত্তকীগণ সেইখানে আছে।
সতত করয় নৃত্য ভূপতির কাছে॥
হেন কালে রবি অস্ত সন্ধ্যাকাল হৈল।
সে কালে নৃপতি এক আশ্চর্য্য দেখিল॥
সূর্য্য অদর্শনে হয় কমল মুদিত।
বিনা বায়ুযোগে কম্পে এ বড় বিস্মিত॥
হেন দেখি ভূপে পুছে নৃত্যকরী স্থানে।
অনাহেতু দেখ পুষ্প কাঁপে কি কারণে॥
সমীরের ক্ষীণগতি সুস্থির কীলাল।
কেন কাঁপে অরবিন্দ সংহতি মৃণাল॥
বল এই ক্ষণে বেশ্যা ইহার কারণ।
নতু হবে এইক্ষণে তোমার মরণ॥
ইহা শুনি বারবধূ চিন্তিত অন্তরে।
মহীধর টুটি যেন পৈল শিরোপরে॥
যোড় হাতে ভূপ কাছে নিবেদয় বাণী।
দিব প্রত্যুত্তর রাজা ব্যাজ কর জানি॥
এত বলি বেশ্যা গেল আপন ভবনে।
কালিদাস পলাইয়া আছে সেই খানে॥
তার স্থানে কহে রামা সব বিবরণ।
শুনি হাস্য করি দ্বিজ বলিল বচন॥
শুন বলি নিতম্বিনী কারণ ইহার।
সরসিজে আইল অলি মধু খাইবার॥
হেন কালে অস্তাচলে লুকাল মিহির।
মুদিত সরোজ দেখি ষটপদ অস্থির॥
স্নেহ ভাবি দল ভেদি নির্গত না হয়।
এই হেতু কাঁপে পদ্ম জানিবা নিশ্চয়॥
কহ যাইয়া ভূপতিকে এই সমাচার।
তবে প্রাণ রক্ষা আজি হইবে তোমার॥
এত শুনি বারবধূ চলে রঙ্গমনে।
কহিতে লাগিল যাইয়া নৃপ বিদ্যমানে॥
যেই মত শ্লোক দ্বিজ কহিছিল তাতে।
সেই শ্লোক কহে রামা নৃপের সভাতে
কান্তা সম্বোধন করি দ্বিজে বলি ছিল।
না বুঝি রমণী আসি সেমত কহিল॥
কান্তা সম্বোধন রাজা শুনি বেশ্যা মুখে।
হইয়া বিস্ময় অতি পুছিলা তাহাকে॥
কে কৈল কবিতা এই সত্য বল মোরে।
পুরুষ আনিয়া বুঝি রাখিছ বাসরে॥
এত বলি দূত প্রেরি দিল নৃপমণি।
কে আছে ইহার ঘরে তুর্ণ আইস জানি॥
দূতে দ্রুত গৃহ মধ্য প্রবেশ করিয়া।
দেখে দ্বিজ কা... সে তথাতে বসিয়া॥

ধরি লৈয়া আইল তারা রাজার গোচরে।
তাকে দেখি নৃপবর কুপিত অন্তরে॥
উত্তম পণ্ডিত পূর্ব্বে জানি ছিল তক।
এবে জানিলাম তুমি লম্পট নায়ক॥
রাজসভা যোগ্য মত নহেত ব্রাহ্মণ।
ইহার মস্তক নিয়া কাট এইক্ষণ॥
পদাতি সকলে হেন শুনি ধরে তারে।
তখনি কাটিল মাথা অসির প্রহারে॥
ভারতীর বাক্য কভু খণ্ডন না যায়।
সেই হেতু মহাজনে হেন গতি পায়।
বাণী বাক্য উপলক্ষে প্রাণত্যাগ করি।
সেইক্ষণ দ্বিজ চলি গেল স্বর্গপুরী॥
সহসা করিল রাজা হইয়া কুপিত।
পরে ব্রহ্মবধ হেতু পাইল বড় ভীত॥
কোন্‌রূপে হেন পাপে হইবে মোচন।
এত বলি নৃপবরে ভাবে মনেমন॥
তুষানল বিনা গতি নাহি দেখি আর।
ইহা বলি চিন্তে রাজা তাহার প্রকার॥
যেন আছে বেদে লেখা তেন মত করি।
প্রাণত্যাগ করি ভূপে গেল স্বর্গপুরী॥
এই বাণী যেই শুনে ভক্তি ভাবি চিত্তে।
নাহি তার পাপ শঙ্কা এ তিন জগতে॥
নানামত সুখে সেই থাকে ধনেজনে।
অন্তকালে ছুইতে তাকে না পারে শমনে।
নির্ব্বাণ মুকতি পায়া যায় স্বর্গপুরে।
যেন মত ঘটে তার ভারতীর বরে॥
যেইজনে ভক্তমনে করে বাণীপূজা।
ক্ষিতিতলে সেইজন হয় মহারাজা॥
শুন মাতা সরস্বতী নিবেদন বাণী।
না বুঝে তোমার গুণ ব্যাস আদি মুনি॥
তাতে অতি মূর্খ আমি অধম অজ্ঞান॥
তবে কেন মতে হবে কবিতা নির্ম্মাণ॥
কহাইলা যেন মত অনুগ্রহ করি।
ভণিল তেমতি তব পদ শিরে ধরি॥
ইহা জানি ক্ষম দোষ হৈয়া [illegible]পামতি।
পুনঃ পুনঃ বলি বাণী শুন সরস্বতী॥
যেন মত উপদেশ যে মত ধীষণা।
তেমত হইল মাতা পাঁচালী রচনা॥
তারহ তারিণী মাতা আমি তব দাস।
অন্তকালে তুমি বিনা নাহি অন্য আশ॥
বলি আমি করপুটে ক্ষম মোর দোষ।
নিজগুণে কৃপা কর না করিও রোষ॥
সুসঙ্গ আখ্যান দেশ দুর্গাপুর গ্রাম।
কিশোর কেশরী ভূপ তথা অনুপম॥
রাজসিংহ নাম দ্বিজ তাহার তনুজে।
নূতন সঙ্গীত ভণে বাণী পদাম্বুজে॥

চৌপদী।

শুন সরস্বতী, আমি হীনমতি,
নাহি অন্যগতি, চরণ বিনে।
তোমার চরিত, হইল রচিত,
না হৈও কুপিত, অধম জনে॥
সাঙ্গ হৈল পুঁথি, শুনগো ভারতী,
হৈয়া হৃষ্টমতি, ভবনে যাও।
দেও এই বর, পদযুগে তোর,
রৌক মতি মোর, শুনগো মাও॥
পূজা সাঙ্গ হৈল, পদে নিবেদিল,
শত নতি কৈল, চরণোপরে।
না করিও রোষ, ক্ষমা কর দোষ,
হইয়া সন্তোষ, চলহ ঘরে॥
তুমি নারায়ণী, মাতা শুন বাণী,
যুড়ি যুগ্ম পাণি, তারহ দাসে।
এ তনু পতনে, লইতে শমনে,
রাখিবে আপনে, চরণ পাশে॥
যত দেবগণে, আসর ভবনে,
আইলা আবাহনে, শুনহ বাণী।
করিয়া সত্বরে, চলহ বাসরে,
কৃপা করি মোরে, অধম জানি॥
বলি নিবেদনে, হীন ভৃত্য জনে,
রাখহ চরণে, করি এ স্তুতি।
ক্ষম অপরাধ, করি কাকুর্ব্বাদ,
করহ প্রসাদ, অজ্ঞান প্রতি॥
শুনহ বচন, আমি মূর্খ জন,

করহ মার্জ্জন আমার দোষ।
সব দেবগণে, হের সুনয়নে,
দাস জানি মনে, ক্ষমহ রোষ॥
হেদেগো ভারতী, করি এ মিনতি,
হৈয়া হর্ষমতি, শুনহ বাণী।
সভাপতি সনে, যত সভাগণে,
করহ কল্যাণে, তনয় জানি॥
স্তুতি বাক্য বলি, হৈয়া কৃতাঞ্জলি,
তোমার পাঁচালী, নির্ম্মাণ হৈল।
পূর্ণ হৈল গীত, কত অনুচিত,
সকলি বিদিত, চরণে কৈল॥
সুসঙ্গ নগর, অতি মনোহর,
তথা নৃপবর, অপূর্ব্ব অতি।
বটে পুণ্যবান, সভার প্রধান,
অতি জ্ঞানবান, সুন্দর মতি।
ভারতীর গান, হইতে নির্ম্মাণ,
করি প্রণিধান, কহিলা মোরে।
নৃপাজ্ঞা কারণ, করিল রচন,
কাব্য বিলক্ষণ, মূর্খে কি পারে॥
যেন সাধ্য ধরে, তেমন প্রকারে,
বাণী বন্দি শিরে, ভণিল গীত।
করি লক্ষ নতি, কৃপা করি অতি,
রাখ সরস্বতী, চরণে চিত॥
দোষ শতে শতে, আছে কবিতাতে
সভার বিদিতে, বলিছে বাণী।
শঙ্কররত্নাকরে, মূর্খে নাহি পারে,
ক্ষমা কর মোরে, ইহাকে জানি॥
করিল বিনয়, যেন বুদ্ধি লয়,
হইবা সদয়, আমার প্রতি।
দোষ না ধরিবে, গুণ আদরিবে,
বলি ধীর সবে, এতেক স্তুতি॥
সমাপ্ত পাঁচালী, হৈয়া কুতুহলী,
হর্ষে সবে মিলি, বলহ হরি।
নিজ প্রাণপণে, জপি রাত্রি দিনে,
তার পঞ্চাননে, মিনতি করি॥
শিব শিবাসনে, অন্য দেবগণে,
নতি দণ্ড মানে, চরণোপরে।
বলি এই ভাষ, পূর্ণ কর আশ,
জানি নিজ দাস, তারহ মোরে॥
শত কোটী নতি, করিছি ভারতী,
হৈয়া হর্ষমতি, দেহগো বর।
ভণে ভূপানুজে, রাজসিংহ দ্বিজে,
জপি চিত্ত মাঝে, চরণ তোর॥

রাজা রাজসিংহ বিরচিত ভারতী-মঙ্গল কাব্য সম্পূর্ণ।

বাদরায়ণ ও শঙ্করের জীবতত্ত্ব-বিচার।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

২১ সূত্র হইতে ২৮ সূত্র পর্য্যন্ত পূর্ব্বপক্ষ, ইহাতে জীবাত্মাকে অণুপরিমাণবিশিষ্ট বলিয়া প্রতিপাদন করা হইয়াছে। এইক্ষণে ২৯ সূত্র হইতে ৩২ সূত্র পর্য্যন্ত তাঁহার অণু-পরিমাণ সমীক্ষণ হইতেছে।

তদ্‌গুণসারত্বাত্তু তদ্ব্যপদেশঃ প্রাজ্ঞবৎ।”
ঐ ঐ ২৯ সূত্র।

যেরূপ সগুণ উপাসনা প্রকরণে পর-ব্রহ্মকে অণুপরিমাণবিশিষ্ট বলা হইয়াছে, সেইরূপ বুদ্ধির ইচ্ছাদি গুণ জীবের সংসরণ অর্থাৎ উৎক্রমণাদি ব্যাপারে মুখ্য প্রয়োজক বলিয়া তাঁহাকে অণু বলা হইয়াছে।

ভাষ্য—

সূত্রস্থ 'তু' শব্দ পূর্ব্বপক্ষের নিরাকরণ সূচনা করিয়াছে। আত্মার অণুপরিমাণ

সঙ্গত হইতে পারে না। কেন না তাহার উৎপন্ন হইবার কথা অশ্রুত। আর পরব্রহ্মের জীব রূপে প্রবিষ্ট হওয়া ও জীবের সহিত তদাত্ম্য উপাদিষ্ট হইয়াছে, এই জন্য পরব্রহ্মই জীব ইহা অভিহিত হইয়াছে। সুতরাং যখন পরব্রহ্মই জীব হইল, তখন তাঁহার যে পরিমাণ, জীবেরও সেই পরিমাণ হওয়াই উচিত। অধিকন্তু পরব্রহ্মের পরম মহৎ পরিমাণই বেদে উপদিষ্ট হইয়াছে। অতএব জীব ব্যাপকই বটে, কিন্তু অণু নহে। আর ইহাও অসত্য নহে যে, সেই এই আত্মা মহান্ ও অজন্মা, যিনি অন্তর্জগতে নিরন্তর বিজ্ঞানপূর্ণ থাকিয়া বিজ্ঞান জ্যোতি ছড়াইয়া দিতেছেন—শ্রুতি এবং নিত্য সর্ব্বব্যাপী ও অবিরাম একরূপে বর্ত্তমান স্মৃতির আত্মা যে ব্যাপক এই উপদেশ। আত্মাকে ব্যাপক স্বীকার না করিলে কিছুতেই যুক্তিযুক্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে না। ইহাও স্বীকার করিতে পারা যায় না যে, জীব অণু হইলেও তাঁহার সহিত ত্বগিন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ আছে বলিয়া সমস্ত শরীরব্যাপী বেদনা উপলব্ধি হইতে পারে, কেন না তবে পদতলে কণ্টক বিদ্ধ হইলে পরও নিখিল অঙ্গ ব্যাপিয়া ব্যথার উপলব্ধি প্রসঙ্গ হইয়া পড়ে এই জন্য যে, ত্বক্ ও কণ্টকের সংযোগ সমস্ত ত্বগিন্দ্রিয়ে আছে এবং ত্বগিন্দ্রিয় নিখিল শরীর ব্যাপিয়া বর্ত্তমান। আর দেখিতে পাই বিপরীত, যেই প্রদেশে কণ্টক বিদ্ধ হয় কেবল সেই প্রদেশেই তজ্জনিত ব্যথার উপলব্ধি হইয়া থাকে। এই রূপও বলিতে পারা যায় না যে, অণুপরিমাণ বিশিষ্ট বস্তু স্বয়ং সকল প্রদেশে ব্যাপ্ত না হইতে পারিলেও তদীয় গুণের ব্যাপ্তি সমগ্র প্রদেশে হইতে কোন বাধা নাই, কেন না তাহা হইলে গুণের অর্থ গুণীর কোন অংশ ব্যতীত অপর কিছু নহে বলিয়া গুণী ভিন্ন অন্য জিনিষকে আশ্রয় করিলে তাহার গুণত্বেরই অপলাপ হইয়া পড়ে। প্রদীপ-প্রভাকে দৃষ্টান্তে রাখিয়া যে গুণ ব্যাপ্তিকে নিখিল প্রদেশব্যাপী বলিবে তাহাও অসঙ্গত, এই জন্য যে, প্রভা দ্রব্যান্তর বলিয়াই ব্যাখ্যাত হইয়াছে অর্থাৎ প্রভা প্রদীপাদি তেজ পদার্থ হইতে এক অতিরিক্ত দ্রব্য বিশেষ। এইরূপে গুণ বলিয়া স্বীকৃত হওয়ায় গন্ধও আশ্রয়ের সহিতই সঞ্চারিত হইতে পারে নচেৎ উহা গুণত্ব হইতেই বিচ্যুত হইয়া পড়ে। আর দ্বৈপায়নও বলিয়াছেন যে, অনিপুণলোকেরাই জল ও বায়ুতে গন্ধ আছে এইরূপ বলিয়া থাকে, প্রকৃত পক্ষে উহা পৃথিবীরই বটে। (এই স্থলে এইরূপ অনুমিতির আকার উহ্য রহিল যে, গন্ধ আশ্রয় হইতে বিশ্লিষ্ট হইতে পাবে না যে হেতু উহা গুণ উদাহরণ রূপ।) পক্ষান্তরে যদি জীবের চৈতন্য সর্ব্বশরীরব্যাপী হয়, তবে অনলের উত্তাপ ও প্রকাশের ন্যায় চৈতন্য জীবের স্বরূপ হওয়াতে তাহাকে অণু বলা যাইতে পারে না। আর এই স্থলে গুণগুণী ভাবজনিত ভিন্নতার সম্ভাবনা নাই এই জন্য যে, চৈতন্যকে জীবের স্বরূপেই অন্তর্ভুক্ত করা হইল। যেরূপ জীবের অণু পরিমাণ অসঙ্গত, তদ্রূপ তাহার শরীরানুরূপ পরিমাণও প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে। সুতরাং পরিশেষে জীবের পরম মহৎ পরিমাণ প্রতিপন্ন হইল। তবে কি প্রকারে শাস্ত্রে জীবকে অণু বলা হইয়াছে এই আশঙ্কায় উক্ত হইতেছে 'তদ্গুণ সারত্বাত্তু তদ্ব্যপদেশঃ' এই সূত্রাংশ। এই স্থলে তদ্গুণ শব্দের অর্থ বুদ্ধির ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ ও দুঃখ প্রভৃতি গুণ উহাই সার অর্থাৎ সংসরণ ব্যাপারে মুখ্য যাঁহার তিনিই তদ্গুণ সার আর তাহার ভাবই তদ্গুণ সারত্ব। ইহা অতীব সত্য যে, বুদ্ধির গুণ ব্যতীত কেবল আত্মার কোন প্রকারে জন্ম মরণাদি রূপ সংসারিত্ব হইতে পারে না, ভাবার্থ টা এই যে, কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদি ধর্ম্মের পরপারে

অবস্থিত অসংসারী নিত্যমুক্ত সত্যস্বরূপ আত্মার কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব রূপ সংসারিত্ব কেবল বুদ্ধ্যাদি উপাধিজনিত। (এইরূপে তদ্ব্যপদেশ শব্দের অর্থ করা হইতেছে) ঐ তদ্গুণসারত্ব হেতু বুদ্ধির পরিমাণ আরোপ করিয়া আত্মার অণুপরিমাণ অভিহিত হইয়াছে। এই রূপে বুদ্ধির উৎক্রমণ প্রভৃতিও আত্মাতে আরোপিত হইয়া থাকে মাত্র, প্রকৃত পক্ষে তিনি নির্লিপ্ত। এই বিষয়ে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের প্রমাণ আছে যে, "কেশের অগ্রভাগকে শতধা বিভক্ত করিলে যে ভাগ দাঁড়ায় জীবের পরিমাণ উহার তুল্য, আর ঐ জীবও অনন্ত অর্থাৎ অবিনশ্বর"। এই উপনিষদে জীবের অণুপরিমাণ নির্দ্দেশ করিয়া তাহাকেই আবার অনন্ত বলা হইল। সুতরাং তখনই জীবের অনন্ত হওয়ায় সামঞ্জস্য হইতে পারে, যখন তাহার অণুত্ব ঔপচারিক (ভ্রান্তি সিদ্ধ) এবং অনন্তত্ব পারমার্থিক (সত্য) বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। এই স্থলে ইহাও বলা যাইতে পারে না যে, অণুত্ব ও অনন্তত্ব উভয়ই সত্য অথবা অনন্তত্ব আরোপিত ও অণুত্ব পারমার্থিক, কেন না সকল উপনিষদেই আত্মার ব্রহ্মভাব উপদিষ্ট হইয়াছে। (এই স্থলে ইহা উহ্য রহিল যে ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপী বলিয়া তদ্ভাবাপন্ন জীব কোন প্রকারে অণু হইতে পারে না।) অপর অণুপরিমাণপাদক শ্রুতিও দেখিতে পাওয়া যে "বুদ্ধির গুণ আত্মগুণ বলিয়া অধ্যস্ত হওয়ায় জীব আরাগ্র পরিমাণ বলিয়া দৃষ্ট হইয়া থাকে।" অবশ্যই এই স্থলে স্বীকার করিতে হইবে যে, বুদ্ধির গুণ আত্মাতে আরোপিত হওয়াই আত্মাকে আরাগ্রপরিমাণবিশিষ্ট বলা হইয়াছে, কিন্তু ঐ পরিমাণটা স্বয়ং আত্মার নহে। প্রকারান্তরে "এই আত্মাকে শুদ্ধচিত্ত দ্বারা জানিবে" এই মণ্ডুক শ্রুতিতেও জীবের অণুপরিমাণ নির্দ্দিষ্ট হয় নাই, কেন না তাহা হইলে পরব্রহ্ম বাহ্য ইন্দ্রিয়ের অনধিগম্য ও শুদ্ধ জ্ঞানের অধিগম্য এইরূপ প্রস্তাবিত হওয়ায় উহার সঙ্গতি কোন প্রকারে হইতে পারে না। সুতরাং এই স্থলে অণু বলিয়া নির্দ্দেশ করার তাৎপর্য্য আত্মা দুরধিগম্য অথবা তদীয় উপাধিটা অণুপরিমাণবিশিষ্ট ইহা ছাড়া আর কি হইতে পারে? এই "প্রজ্ঞা দ্বারা শরীর সমারোহণ করিয়া" এই কৌষিতকী শ্রুতির জীব ও বুদ্ধির পরস্পর ভিন্নতাসূচক উপদিষ্ট বিষয়েও উপাধিভূত বুদ্ধি দ্বারা জীব শরীরে আরোহণ করিয়া এই প্রকার অর্থেরই সমাবেশ করিয়া লওয়া উচিত। আর যদি এই স্থলে প্রজ্ঞা শব্দের অর্থ চৈতন্যই তোমার অভিপ্রেত হয়, তবে শিলা-পুত্রের শরীর এইরূপ ব্যবহার যেরূপে শিলা পুত্র ও শরীর একিভাবাপন্ন হইলেও হইয়া থাকে, সেই রূপে জীব ও চৈতন্য এক বস্তু হইলেও উহাদিগের ভিন্নতা ব্যপদেশ হইয়া থাকে। (শাস্ত্রে এই রূপ ব্যপদেশকেই ব্যপদেশীবদ্ভাবের সংজ্ঞা বলা হইয়া থাকে)। এই স্থলে যে গুণগুণী বিভাগের সম্ভাবনা নাই তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। জীবকে যে হৃৎপদ্মবাসী বলা হইয়াছে তাহার তাৎপর্য্য জীবের উপাধিভূত বুদ্ধি তথায় বাস করে। এইরূপে "কাহার উৎক্রমণ হইলে আমার উৎক্রমণ হইবে, কে প্রতিষ্ঠিত হইলে আমি প্রতিষ্ঠিত হইব" ইত্যাদি শ্রুতি হইতে বুঝা যায় যে, উপাধিভূত বুদ্ধির উৎক্রমণ না হইলে জীবের গমনাগমন হইতে পারে না আর ব্রহ্ম দেহ হইতে অপসৃত হয় নাই। তাঁহার পক্ষে কোন দেহ হইতে গমন এবং কোন দেহে আগমন অসম্ভব। সুতরাং উপাধিভূত বুদ্ধির গুণ জীবের সংসরণ ব্যাপারে প্রয়োজক হওয়ায় তাহার অণুপরিমাণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই বিষয়ের [illegible] প্রাজ্ঞ অর্থাৎ পরমাত্মাকে রাখা যাইতে পারে। আর বুদ্ধির গুণ আরোপ

করিয়া পরমাত্মা স্বগুণ উপাসনা প্রকরণে অণু বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। এই বিষয়ে শ্রুতির প্রমাণ—"ব্রীহি এবং যব হইতেও আত্মা অণুতর"। "আত্মা মনোময়, বুদ্ধি তাঁহার শরীরস্থানীয়, এজন্যই তাঁহাকে সর্ব্ব গন্ধ, সর্ব্বরস, সত্যকাম ও সত্যসংকল্প বলা যায়।"

ইহা যেন প্রমাণিত হইল স্বীকার করিলাম, কিন্তু যদি বুদ্ধির গুণকে আত্মার সংসরণ দশার কারণ বল, তবে পরস্পর ভিন্ন বিভু আত্মা ও বুদ্ধির সংযোগটা যে এক সময়ে অবসানগ্রস্ত হইবে ইহাও বাধ্য হইয়া তোমায় স্বীকার করিতে হইবে। আর এইরূপ স্বীকার করিলে বুদ্ধিবিযুক্ত আত্মার কোন প্রকারে উপলব্ধি না হওয়ায় তিনি অস্তিত্বে বঞ্চিত বা অসংসারী হইয়া পড়েন; অতএব উত্তরে বলা যাইতেছে,—

"যাবদাত্মভাবিত্বাচ্চ নদোষস্তদ্দর্শনাৎ।"

ঐ ঐ ৩০।

আত্মসাক্ষাৎকার অর্থাৎ ব্রহ্মাত্মার অপরোক্ষ অনুভূতি পর্য্যন্ত বুদ্ধির সহিত আত্ম সংযোগের অবসান হয় না; সুতরাং ঐ আপত্তিটা কোন দোষের মধ্যেই নহে; কেন না জীব আত্মার তত্ত্ব সাক্ষাৎকার পর্য্যন্ত বুদ্ধি সংযোগ শ্রুতিতে দেখিতে পাওয়া যায়।

ভাষ্য—

উক্ত দোষের অভ্যুত্থান আশঙ্কা করা যাইতে পারে না, কেন না বুদ্ধির সহিত আত্মার সংযোগটা তত্ত্বজ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত স্বীকৃত হইয়াছে। ইহার বিশদ ও বিস্তীর্ণ ব্যাখ্যা এই যে, যে পর্য্যন্ত এই আত্মা সংসারী থাকে, যে পর্য্যন্ত সম্যক জ্ঞান দ্বারা তাহার সংসার দশার অবসান না হয়, সেই পর্য্যন্ত বুদ্ধির সহিত সংযোগ ব্যাপারটা আত্মার কোন প্রকারে নিবৃত্ত হয় না; সুতরাং যত কাল পর্য্যন্ত বুদ্ধিরূপ উপাধির সহিত আত্মার সম্বন্ধ থাকিবে ততকাল পর্য্যন্ত জীবের জীবত্ব ভাব ও সংসারিত্ব ভাবের বিরাম হয় না। এই ত গেল মায়িক দৃষ্টির কথা। পরমার্থ দৃষ্টিতে বুদ্ধিরূপ উপাধি দ্বারা কল্পিত স্বরূপ ব্যতিরেকে জীব নামে কোন জিনিষ নাই। বেদান্তের প্রকৃত তত্ত্ব নিরূপণের দিক্ দিয়া দেখিলে কোন স্থলে নিত্যমুক্তস্বরূপ সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর হইতে ভিন্ন কোন একটা চেতন ধাতুর অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায় না। এই বিষয়ে প্রমাণ—"পরব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত দ্রষ্টা, শ্রোতা ও মননকারী নাই।" বৃহং। "তুমি ব্রহ্ম।" ছাং। "আমি ব্রহ্ম"। বৃহং। বুদ্ধি সংযোগটা যে, আত্মসাক্ষাৎ পর্য্যন্ত থাকে ইহা তুমি কি প্রকারে জানিলে এই রূপ প্রশ্নের উত্তরে বলা হইয়াছে—"তদ্দর্শনাৎ।" আর বেদ আমাদিগকে দেখাইতেছেন যে, "অন্তর্জগতে যিনি বিজ্ঞানময় যিনি হৃদয়ের অভ্যন্তরে জ্যোতি ঢালিয়া দিতেছেন, সেই পুরুষই তুল্যভাবে ইহলোকে ও পরলোকে বিচরণ করিয়া থাকে, সেই যেন চিন্তন করে এবং চলিতে থাকে।" এইস্থলে বিজ্ঞানময় শব্দের অর্থ বুদ্ধিময়। আর বুদ্ধিময় শব্দের অর্থও বুদ্ধির বিকার নহে, কিন্তু বুদ্ধিপ্রচুর অর্থাৎ বুদ্ধিপূর্ণ, ইহার কারণ এই যে স্থলান্তরে বিজ্ঞানময় শব্দ মন প্রভৃতির সহিত পঠিত হইয়াছে। ইহার দৃষ্টান্ত "বিজ্ঞানময় মনোময় প্রাণময়, চক্ষুর্ময়, শ্রোত্রময়। (এই সকল ময়ট্ প্রত্যয় গুলির অর্থ প্রচুর, কেন না নিত্য আত্মা কোন প্রকারে অনিত্য বস্তুর পরিণাম হইতে পারে না) পক্ষান্তরে এই স্থলে বুদ্ধিময়ত্বের তাৎপর্য্যটা বুদ্ধির আনুগত্য। আর লোক-নীতিতেও স্ত্রীর অনুগত দেব দত্তকে স্ত্রীময় বলা হইয়া থাকে। "সেই পুরুষই তুল্যভাবে ইহলোক ও পরলোকে বিচরণ করিয়া থাকে" শ্রুতির এই অংশ আত্মা যে বুদ্ধিবিযুক্ত হন না ইহাই প্রতি-

পাদন করে। তুল্যভাবের স্থলেও বুদ্ধির সহিত ইহা উহ্য করিয়া লইবে, কেননা উহার ঘনিষ্ঠতা আছে। ইহাই সূচিত হইতেছে "সেই যেন চিন্তন করে এবং চলিতে থাকে" এই অংশ দ্বারা। ইহার ভাবার্থটা আত্মা স্বতঃ চিন্তন করেন না এবং চলেন না, কিন্তু বুদ্ধি চিন্তন করিলে চিন্তনকারীর ন্যায় এবং বুদ্ধি গমন ক্রিয়ায় ব্যাপৃত হইলে গতিশীলের ন্যায় অজ্ঞানীর দৃষ্টিতে প্রতীয়মান হইয়া থাকেন। আর ইহাও অসত্য নহে, ভ্রান্তি জ্ঞান যাহার বিবরণ সেই মিথ্যা জ্ঞানের উপরই আত্মার বুদ্ধিরূপ উপাধির সহিত সম্বন্ধটা নির্ভর করিতেছে। পরন্তু সম্যক জ্ঞান অর্থাৎ জীব ব্রহ্মের একত্ব জ্ঞান ব্যতিরেকে এই মিথ্যা জ্ঞানটা বিনষ্ট হয় না বলিয়া, যে পর্য্যন্ত ঐ সম্যক জ্ঞান জীবের না হয়, সেই পর্য্যন্ত বুদ্ধি সম্বন্ধ অজ্ঞান দৃষ্টিতে অবশ্যম্ভাবী। ইহাই "আমি সেই মহান্ পুরুষকে জানি তিনি চিন্ময় জ্যোতিতে নিরন্তর উজ্জ্বল ও মায়ার পরপারে অবস্থিত, তাঁহার একমাত্র সম্যক্ জ্ঞান দ্বারাই মোক্ষলাভ হইয়া থাকে" শ্রুতি দ্বারা সূচিত হইয়াছে।

সুষুপ্তি ও প্রলয় অবস্থাতে বুদ্ধির সহিত আত্মার সম্বন্ধ স্বীকার করিতে পায়া যায় না এই জন্য যে, "সুষুপ্তি অবস্থাতে হে সৌম্য, আত্মা স্বয়ং বুদ্ধি প্রভৃতি উপাধি হইতে বিলীন হইয়া ব্রহ্মরূপে অবস্থিতি করেন" এই শ্রুতি আত্মার নিখিল উপাধি হইতে বিমুক্তি উপদেশ করে এবং প্রলয়ে নিখিল মায়িক বস্তুর বিনাশ স্বীকৃত হইয়াছে; সুতরাং আত্মসাক্ষাৎকার পর্য্যন্ত বুদ্ধি সম্বন্ধের অবস্থিতি কি প্রকারে সঙ্গত হইতে পারে, এইরূপ আশঙ্কায় সূত্রকার বলিতেছেন—

"পুংস্ত্বাদিবত্ত্বস্য সতোঽভিব্যক্তিযোগাৎ"

ঐ ঐ ৩১

যেরূপ বীর্য্য শ্মশ্রু প্রভৃতি বাল্য অবস্থায় বীজরূপে বিদ্যমান থাকিয়াই যৌবনে অভিব্যক্ত হয়, সেইরূপ সুষুপ্তি ও প্রলয়ে বীজরূপে বর্ত্তমান যে বুদ্ধি তাহা হইতেই জাগ্রৎ ও সৃষ্টিকালে এই বুদ্ধি সম্বন্ধের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে"।

ভাষ্য—

যেরূপ জনসমাজে দেখিতে পাওয়া যে, বীর্য্য ও শ্মশ্রু প্রভৃতি বাল্য প্রভৃতি অবস্থায় উপলব্ধি না হইলেও বীজরূপে বর্ত্তমান থাকিয়াই লোকের নিকটে যেন নাই বলিয়াই প্রতীয়মান হইয়া থাকে এবং যৌবন প্রভৃতি অবস্থায় আবার আবির্ভূত হইয়া পড়ে কিন্তু নপুংসক প্রভৃতির পক্ষে ঐরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না বলিয়া মূলতঃ অবিদ্যমান ঐ গুলির আবির্ভাব অসম্ভব, সেইরূপ বুদ্ধি সম্বন্ধটা সুষুপ্তি ও প্রলয় অবস্থাতে বীজরূপে অর্থাৎ মূলাবিদ্যারূপে বর্ত্তমান থাকিয়াই প্রবোধ ও সৃষ্টি সময়ে আবির্ভূত হয়। আর ইহাও যুক্তিসঙ্গত নহে যে, কোন জিনিষ আকস্মিকভাবে উৎপন্ন হইতে পারে, কেন না তাহা হইলে মানুষীর গর্ভে শৃগাল ও শৃগালীর গর্ভে মানুষ উৎপন্ন হইবার আপত্তি আসিয়া পড়ে। আর শ্রুতিও দেখাইয়াছেন যে, সুষুপ্তি হইতে পুনরুত্থানটার অবিদ্যারূপ বীজ সত্তাবই কারণ। ঐ শ্রুতি এই—"সুষুপ্তিতে বীজ পরব্রহ্মরূপে অবস্থিত থাকিয়াও জানে না যে আমরা ঐরূপে অবস্থিত আছি।" "সুষুপ্তিতে বীজ ব্রহ্মরূপে অবস্থিত থাকিয়াও আবার জাগ্রতে সেই ব্যাঘ্ররূপে সেই সিংহরূপে অভিব্যক্ত হয়"। ছান্দোগ্য। অতএব প্রতিপন্ন হইল যে, বুদ্ধি সম্বন্ধটা আত্ম সাক্ষাৎকারের অব্যবহিত পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত থাকে।

এই ভাষ্য দ্বারা সুস্পষ্ট রূপে বুঝিতে পারা গেল যে- সুষুপ্তিতে জীবের উপাধি স্বরূপ বুদ্ধিটা মূল অবিদ্যাতে মিলাইয়া যায়। ঐ অবস্থাতে অবিদ্যা হইতে তাহার অতিরিক্ত

স্বরূপ থাকে না। আর বিভিন্ন জীবের সুষুপ্তিটা একীভাবাপন্নই দেখিতে পাওয়া যায়। আজ পর্য্যন্তও বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক এমন কোন উপকরণ আবিষ্কৃত হয় নাই, যাহা হইতে আমরা রাম, যদু ও উপেনের সুষুপ্তিটাকে বিভিন্নরূপে ধরিয়া লইতে পারি। এইরূপ নিয়মে বিভিন্ন জাতীয় মনুষ্য, পশু, পক্ষি প্রভৃতি সম্বন্ধেও সুষুপ্তিটা একই প্রকার দেখিতে পাই বলিয়া ইহা সাহসের সহিত বলিতে পারা যায় বিভিন্ন জাতীয় নিখিল জীবের সুষুপ্তিটা একই রকমের। আর সুষুপ্তি এক বলিয়া ঐ অবস্থার অধিষ্ঠাতা জীব ও একই বটে। কিছুতেই আমরা সুষুপ্তি অবস্থাপন্ন জীবের ভিন্নভাব বুঝিয়া উঠিতে পারি না। সুতরাং নানা জীববাদীর পৃষ্ঠ প্রদর্শনই এই ভাষ্য দ্বারা ব্যক্ত হইয়া পড়িল।

"নিত্যোপলব্ধ্যনুপলব্ধি প্রসঙ্গোঽন্যতর
নিয়মোবান্যথা"। ঐ ঐ ৩২।

এইরূপ বুদ্ধি না মানিলে সর্ব্বদা মণিকাঞ্চনাদি বিষয়ের উপলব্ধি, অনুপলব্ধি অথবা আত্মার একটা অভিনব শক্তি স্বীকারের আপত্তি আসিয়া পড়ে।"

ভাষ্য—

আত্মার উপাধিভূত অন্তঃকরণকে মন, বুদ্ধি, বিজ্ঞান ও চিত্ত বলিয়া শাস্ত্রের অনেক স্থলে বলা হইয়াছে। কোন স্থলে বৃত্তিগুলিকে বিভাগ করিয়া সংশয় বৃত্তিকে মন নিশ্চয় বৃত্তিকে বুদ্ধি বলা গিয়াছে। কাজেই এই প্রকার অন্তঃকরণ আছে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। বিপক্ষে স্বীকার না করিলে বিষয়ের সর্ব্বদাই উপলব্ধি বা অনুপলব্ধি প্রসঙ্গ হইয়া পড়ে। ইহার বিশদ ব্যাখ্যা এই যে, উপলব্ধির কারণ আত্মা, ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের পরস্পর সম্বন্ধ হইলে পর সর্ব্বদাই বিষয়ের উপলব্ধি হউক এইরূপ একটা অভিযোগ খাড়া হয়। আবার কারণকলাপের সমবধানেও যদি ফলের অভাব মানিয়া লওয়া যায়, তবে নিত্য অনুপলব্ধি প্রসঙ্গ হইয়া পড়ে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এইরূপ ঘটনা ঘটিতে দেখা যায় না। পক্ষান্তরে অন্তর অর্থাৎ আত্মা বা ইন্দ্রিয়ের উপলব্ধি অনুকূল একটা অভিনব শক্তি স্বীকারে লিপ্ত হইতে হয়। আর নির্ব্বিকার বলিয়া আত্মার এইরূপ শক্তির ব্যবস্থাটা কোন প্রকারে সুসঙ্গত হইতে পারে না। ইন্দ্রিয়ের পক্ষেও এইরূপ দশা; কেন না তাহার পূর্ব্বক্ষণে ও পরক্ষণে কার্য্যকারিণী শক্তির কোন প্রতিবন্ধক নাই বলিয়া অকস্মাৎ ঐ শক্তিটা প্রতিরুদ্ধ হইয়া যাইতে পারে না। সুতরাং যাহার সমবধানে বা অনবধানে উপলব্ধি ও অনুপলব্ধি হইয়া থাকে সেই মন। এই বিষয়ে শ্রুতির এইরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় যে, "অন্যমনা হইয়া ছিলাম বলিয়া দেখিতে পাই নাই এবং ঐ প্রকার অবস্থা হওয়ায় শুনিতে পাই নাই।" "মনের দ্বারাই শুনে এবং উহা দ্বারাই দেখে।" বৃহ। কাম প্রভৃতি যে মনের বৃত্তি বিশেষ ইহাও "কাম, সঙ্কল্প, বিচিকিৎসা, শ্রদ্ধা, অশ্রদ্ধা, সন্তোষ, অসন্তোষ, লজ্জা, বুদ্ধি ও ভয় এই সকলগুলিই মন।" শ্রুতি দ্বারা জানা যাইতেছে। অতএব বুদ্ধির গুণ আত্মার সংসরণ ব্যাপারে মুখ্য বলিয়া তাহাকে অণু বলা হইয়াছে।

এই বুদ্ধি স্বীকার দ্বারা এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া লইতে পারা যায় যে, সুষুপ্তিতেও এই বুদ্ধিটা পূর্ব্ববৎ অক্ষতভাবেই বর্ত্তমান থাকে, কেন না অব্যাহিতপূর্ব্ব সূত্রের ভাষ্যে সুস্পষ্ট ভাবে ভাষ্যকার ব্যক্ত করিয়াছেন যে, সুষুপ্তিতে মনের বিবরণরূপ বুদ্ধিদেবী মূল অবিদ্যারূপ জননীর অঙ্গে মিলাইয়া যান অর্থাৎ মূল অজ্ঞানের স্বরূপে তিনি বিলীন হইয়া যান। তবে জাগ্রৎ ও স্বপ্ন অবস্থার সুসঙ্গতির জন্য কেবল ঐ অবস্থাদ্বয় স্থায়ী আবির্ভাব বিলাসরূপ সাময়িক মন বা বুদ্ধি মানিলে কোন ক্ষতি

নাই। ইহার কারণ এই যে, সুষুপ্তি অবস্থায় আলোচিত মন বা বুদ্ধির নিজ কারণে লয় হওয়ার কারণ শরীরবিশিষ্ট জীবের একত্বের কোনই প্রতিবন্ধক রহিল না। সুতরাং বেদান্তের মুখ্য সিদ্ধান্ত একজীববাদের বিজয় না লইয়া রহিল না। দেখিতেছি একত্বেরই

পূর্ব্ব অধিকরণে আত্মার সম্বন্ধে অণু-পরিমাণ নির্দ্দেশ যে অধ্যাস নীতিমূলক তাহা দেখাইয়া তাহার স্বতঃসিদ্ধ মহৎ পরিমাণ সংস্থাপিত হইয়াছে। এই ১৪ অধিকরণে তদতিরিক্ত আত্ম-কর্ত্তৃত্বের সংস্থাপন হইতেছে।

"কর্ত্তা শাস্ত্রার্থবত্ত্বাৎ"। ঐ ঐ ৩৩ সূত্র।

আত্মা অর্থাৎ জীব পাপ ও পুণ্য কর্ম্মের সম্পাদনকর্ত্তা, কেন না তাহা হইলেই "যজেত" প্রভৃতি বিধি শাস্ত্রের সার্থকত্ব অক্ষুণ্ণ থাকে।

ভাষ্য—

তদ্‌গুণসারত্ব প্রসঙ্গে জীবের অপর ধর্ম্মেরও আলোচনা চলিতেছে। এই জীব শুভাশুভ কর্ম্মের সম্পাদনকারীই বটে, কেন না তাহা হইলেই শাস্ত্রের সার্থকতা অব্যাহত থাকে। ফলতঃ জীবকে কর্ত্তা না স্বীকার করিলে, 'যজেত,' 'জুহুয়াৎ' 'দদ্যাৎ' প্রভৃতি বিধি শাস্ত্র নিরর্থক হইয়া পড়ে। ইহার কারণ এই যে, ঐ বিধিশাস্ত্রগুলি কোন কর্ত্তারই কর্ত্তব্য বিশেষ উপদেশ করে। এমন মানুষ বিরল যিনি আত্মার কর্ত্তৃত্ব স্বীকার না করিয়া ঐ শাস্ত্রগুলির সমন্বয় করিতে পারেন। এই রূপ নীতিতে "এই পুরুষই দ্রষ্টা, শ্রোতা, মননকারী, বোধনকারী, কর্ত্তা এবং বিজ্ঞানাত্মা" এই শাস্ত্রও নিরর্থক হয় না।

"বিহারোপদেশাৎ"। ঐ ঐ ৩৪ সূত্র—

এই জন্যও জীব কর্ত্তাই বটে যে, স্বপ্ন অবস্থায় তাহার বিহার শ্রুতিতে উপদিষ্ট হইয়াছে।

ভাষ্য—

জীবের কর্ত্তৃত্ব এই জন্য স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারা যায় না যে, জীব প্রকরণে স্বপ্ন অবস্থায় তাহার বিচরণ শ্রুতি উপদেশ করিতেছে। "সেই অমর আত্মা যে স্বপ্ন অবস্থায় যদৃচ্ছাক্রমে বিহার করিয়া থাকেন"। "আত্মা নিজের শরীরে ইচ্ছানুরূপ স্থান পরিবর্ত্তন করেন"।

"উপাদানাৎ"। ৩৫ ঐ ঐ।

এই জন্যও জীবের কর্ত্তৃত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে, জীব প্রকরণে তাহাকে ইন্দ্রিয় সমূহের গ্রহীতা বলিয়া শ্রুতি কীর্ত্তন করিতেছে।

ভাষ্য—

এই জন্যও জীবের কর্তৃত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে যে, জীব প্রকরণে "অন্তঃকরণের অন্তর্বর্ত্তী বুদ্ধি দ্বারা জ্ঞানেন্দ্রিয় সমূহ গ্রহণ করিয়া"-"ইন্দ্রিয় সমূহ গ্রহণ করিয়া" এরূপে জীবের পক্ষে ইন্দ্রিয় সকলের গ্রহণ করা বেদ বলিতেছে।

"ব্যপদেশাচ্চ ক্রিয়ায়াং নচেন্নির্দ্দেশ বিপর্য্যয়ঃ"। ঐ ঐ ৩৬ সূত্র।

এই জন্যও জীবের কর্তৃত্ব সিদ্ধ হইতেছে যে, শাস্ত্রে লৌকিক ও বৈদিক ক্রিয়া সম্বন্ধে তাহার কর্তৃত্ব নির্দ্দেশ হইয়াছে। আর ঐ কর্ত্তৃত্বটা জীবের পক্ষে নহে। কিন্তু বুদ্ধির এইরূপ বলিলে নির্দ্দেশ বিপর্য্যয় হইয়া পড়ে

ভাষ্য—

এই জন্যও জীবের কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিতে হয় যে শাস্ত্র লৌকিক বৈদিক ক্রিয়াতে জীবের কর্ত্তৃত্ব উপদেশ করে। ঐ শাস্ত্রটা এই-"বিজ্ঞানই যজ্ঞ করিয়া থাকে, উহাই কর্ম্ম করিয়া থাকে।" এই স্থলে এই রূপ আপত্তি করিতে পারা যায় না যে বিজ্ঞান শব্দ বুদ্ধির বাচকই দেখিতে পাওয়া যায়, তুমি কি প্রকারে [illegible] দ্বারা জীবের কর্তৃত্ব সূচনা করিতেছ। কেন না জীবের কর্তৃত্ব

না মানিয়া বুদ্ধির উহা মানিলে নির্দ্দেশ বিপর্য্যয় ঘটিয়া উঠে অর্থাৎ বিজ্ঞানের তৃতীয়ান্ত নির্দ্দেশ হইতে পারে। ইহার বিশদ ব্যাখ্যা এই যে, অপর স্থলে বুদ্ধি বিবক্ষাতে বিজ্ঞান শব্দ তৃতীয়ান্ত নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ইহার উদাহরণে "অন্তঃকরণের অন্তর্ব্বর্ত্তী বুদ্ধি দ্বারা জ্ঞানেন্দ্রিয় সমূহ গ্রহণ করিয়া" শ্রুতিকে রাখিতে পারা যায়। "আর বিজ্ঞান যজ্ঞ করিয়া থাকে" স্থলে 'বিজ্ঞানং' প্রথমান্ত নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে বলিয়া কর্ত্তৃত্ব সামাধিকরণ্যই বিজ্ঞানের প্রতীয়মান হইয়া থাকে, সুতরাং বিজ্ঞান শব্দ দ্বারা বুদ্ধি ব্যতিরিক্ত আত্মারই কর্ত্তৃত্ব সূচিত হইয়া থাকে।

যদি বুদ্ধি হইতে ভিন্ন জীবই কর্ত্তা হয়, সে স্বতন্ত্র বলিয়া নিজের প্রিয় ও হিতকার্য্যই নিয়তভাবে সম্পাদন করুক, কিন্তু অপ্রিয় ও অহিত কার্য্য কখন না করুক। আর দেখিতেছি বিপরীত অর্থাৎ স্থল বিশেষে সে নিজের প্রতিকূল কার্য্যও করিয়া থাকে। কিন্তু স্বতন্ত্র আত্মার এইরূপ বিশৃঙ্খল প্রবৃত্তি কোন প্রকারে যুক্তিযুক্ত বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। এই রূপ আশঙ্কার সমাধান হইতেছে যে—

"উপলব্ধিবদনিয়মঃ"। ৩৭ ঐ ঐ

যেরূপ এই আত্মা বস্তুর উপলব্ধিতে স্বতন্ত্র হইয়াও অনিয়মিতভাবে ইষ্ট ও অনিষ্টের উপলব্ধি করিয়া থাকে, সেরূপ অনিয়মিত ভাবে ইষ্ট ও অনিষ্ট কার্য্যের সম্পাদনেও তাহার পক্ষে কোন বাধা নাই।

ভাষ্য—

যেরূপ এই আত্মা উপলব্ধি ব্যাপারে স্বাধীন হইয়াও অনিয়ম পূর্ব্বক অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে উপলব্ধি করিয়া থাকে, তদ্রূপ ইষ্টানিষ্ট কার্য্য সম্পাদনেও তাহার পক্ষে নিয়মের ত্রুটি হইলে কোন ক্ষতি নাই। এই স্থলে এইরূপও বলিতে পারা যায় না যে, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বিষয়ের উপলব্ধি হয় বলিয়া উপলব্ধিতেও তাহার পরতন্ত্রতাই প্রতিপন্ন হইতেছে, কেন না উপলব্ধি করণরূপ ইন্দ্রিয়াদির সাহায্যটা কেবল চৈতন্যের সহিত মণিমুক্তাদি বিষয়ের সম্বন্ধের জন্য, কিন্তু নিজ সম্বন্ধের উপলব্ধিতে আত্মা স্বাধীনই বটে। পক্ষান্তরে কার্য্যকারিত্বের দিক দিয়া দেখিলেও কোন কার্য্যে তাহার পূর্ণ স্বাধীনতা দেখিতে পাওয়া যায় না এই জন্য যে তিনি কোন কার্য্যে কোন প্রকারেও দেশ, কাল ও নিমিত্ত বিশেষের অধীনতা হইতে পরিত্রাণ পান না। সুতরাং অপরের সাহায্যাপেক্ষা থাকিলেও কর্ত্তার কর্ত্তৃত্বটা বিলুপ্ত হয় না। ইন্ধন ও সলিলাদির অপেক্ষা রাখিয়াও পাচককে পাচকত্ব হইতে বিচ্যুত হইতে দেখা যায় না। আর উপকরণ সমূহের বৈচিত্র্য নিবন্ধন আত্মার অনুকূল ও প্রতিকূল কার্য্যে অনিয়মে প্রবৃত্তি হইলেও যে কোন আপত্তি উঠিতে পারে না ইহা বলা কেবল পুনরুক্তি মাত্র।

"শক্তিবিপর্য্যয়াৎ"। ৩৮ ঐ ঐ।

এইজন্যও বুদ্ধি ব্যতিরিক্ত জীবের কর্ত্তৃত্ব যে, বুদ্ধির কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিলে তাহার করণ শক্তির হানি ও কর্ত্তৃত্ব শক্তি প্রসঙ্গরূপ বিপর্য্যয় হইয়া উঠে।

ভাষ্য—

এই জন্যও বিজ্ঞান ব্যতিরিক্ত জীবই কর্ত্তা যে, যদি বিজ্ঞান শব্দবাচ্য বুদ্ধিকে কর্ত্তা বলা যায়, তবে শক্তি বিপর্য্যয় ঘটিয়া উঠে অর্থাৎ বুদ্ধির করণ শক্তির বিলোপ ও কর্ত্তৃশক্তি প্রসঙ্গ হইয়া পড়ে। আর যদি বুদ্ধিকে কর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করিতে তোমার অত্যন্ত ব্যাকুলতা হইয়া থাকে, তবে স্বীকার কর, কিন্তু উহাতে আমাদের পক্ষে কোনই দোষ আসিতেছে না। এই জন্য যে, বুদ্ধির কর্ত্তৃশক্তি হইলে অহং প্রতীতির বিষয়ও তাহাকেই

বলিতে হইবে, কেন না অহংকার পূর্ব্বকই সর্ব্বত্র প্রবৃত্তি দেখিতে পাই। ইহার উদাহরণে "আমি যাইতেছি, আমি আসিতেছি, আমি খাইতেছি এবং আমি পান করিতেছি" প্রভৃতিকে রাখা যাইতে পারে। আর ঐ কর্তৃশক্তিবিশিষ্ট বুদ্ধির সকল কার্য্য সম্পাদনের জন্য অতিরিক্ত করণও তোমাকে মানিয়া লইতে হইবে, কেন না কর্ত্তা কার্য্য সম্পাদনে স্বয়ং শক্ত হইয়াও করণের সাহায্যেই কার্য্যে প্রবর্ত্তমান হয় সুতরাং তুমি করণ ব্যতিরিক্ত স্বতন্ত্র কর্ত্তা স্বীকার করিলে বলিয়া কেবল নাম মাত্রেই বিবাদ রহিল, কিন্তু বস্তুগত বৈলক্ষণ্য কিছুই রহিল না।

"সমাধ্যভাবাচ্চ"। ঐ ঐ ৩৭ সূত্র।

আত্মাকে কর্ত্তা বলিয়া স্বীকার না করিলে শাস্ত্রে যে জ্ঞান সাধনের উপায় স্বরূপ সমাধি উপদিষ্ট হইয়াছে তাহা অসঙ্গত হইয়া পড়ে।

ভাষ্য—

বেদান্তে যে আত্মজ্ঞানের উপায়স্বরূপ শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাও আত্মার কর্তৃত্ব স্বীকার না করিলে সুসঙ্গত হয় না। ইহার ভাবার্থ এই যে, "হে মৈত্রেয়ি, আত্মার সাক্ষাৎকার, শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন করা কর্ত্তব্য, জিজ্ঞাসু তাঁহারই অন্বেষণ করিবেও তাঁহাকেই জানিবার ইচ্ছা রাখিবে"। "ওঁকারশব্দপ্রতিপাদ্য পরব্রহ্মকে ধ্যান করিবে"—শ্রুতির শ্রবণাদি কর্তৃত্বটা মুক্তিফল উপভোক্তার পক্ষেই যুক্তি যুক্ত হয়। আর মোক্ষ অবস্থাতে যে বুদ্ধির বিধ্বংশ ঘটিয়া থাকে ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। সুতরাং মুক্তিফলের উপভোগকারী আত্মারই কর্তৃত্ব সিদ্ধ হইল।

এই স্থলে ইহাও অনুসন্ধেয় যে সমাধি অবস্থাতে বুদ্ধি অদৃশ্য হইয়া যায় বলিয়া তাহার পক্ষে সমাধি-কর্তৃত্বই অসম্ভব হইয়া পড়ে। সমাধি শব্দটার অর্থও আনন্দগিরি ও রত্ন প্রভাকারের মতে তত্ত্বজ্ঞানের সাধনসামগ্রী এবং বাচস্পতি মিশ্রের মতে লক্ষণাবৃত্তি দ্বারা ধারণা, ধ্যান ও সমাধিরূপ সংযমত্রয়।

১৫ অধিকরণ।

"যথা চ তক্ষোভয়থা"। ঐ ঐ ৪০ সূত্র।

যেরূপ সূত্রধর কখন তাহার অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা স্বকীয় কার্য্য করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়ে, কখন আবার কার্য্য হইতে অবসর প্রাপ্ত হইয়া নির্ব্বৃতি লাভ করে, তদ্রূপ জীব জাগ্রৎ ও স্বপ্ন অবস্থায় অভিমানে লিপ্ত হইয়া ভাল মন্দ অনেক কার্য্য করে কিন্তু সুষুপ্তিতে আবার দেহাভিমান হইতে বিমুক্ত হইয়া নিজানন্দে নিমগ্ন হয়; সুতরাং জীবের কর্তৃত্বটা ঔপাধিক, কোন প্রকারে ইহাকে স্বাভাবিক বলিয়া স্বীকার করিতে পারা যায় না।

ভাষ্য—

এই প্রকারে শাস্ত্রের সার্থকত্বরূপ হেতু দ্বারা জীব যে কর্ত্তা তাহা দেখান গিয়াছে, উহা স্বাভাবিক কি ঔপাধিক এইক্ষণে সেই বিষয়ে আলোচনা চলিতেছে। বিপক্ষে যুক্তির অভাব মনে করিয়া যদি কেহ বলে যে, ঐ হেতু দ্বারা জীবের স্বাভাবিক কর্তৃত্বই প্রতিপন্ন হইতেছে, তবে এই সম্বন্ধে আমরা উত্তরে ব্যক্ত করিতেছি যে, মুক্তির বিলোপ প্রসঙ্গ হয় বলিয়া জীবের স্বাভাবিক কর্তৃত্ব সম্ভবপর নহে। ইহার কারণ এই যে, যেরূপ অগ্নিদেব কখন নিজের স্বভাবরূপ উষ্ণতা হইতে অব্যাহতি পান না, সেইরূপ কর্তৃত্বটাকে আত্মার স্বভাব বলিলে উহা হইতে মুক্তিলাভ তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়ে। এই স্থলে এইরূপ আপত্তিও উঠিতে পারে না যে, আত্মার কর্তৃত্বশক্তি বর্ত্তমান থাকিলেও কর্তৃত্বের কার্য্যগুলিকে উপেক্ষা করিয়া তাঁহার মোক্ষ রূপ পুরুষার্থের সিদ্ধি হইবে; আর যেরূপ অনলের দহনশক্তিযুক্ত হইলেও কাষ্ঠের অভাবে দহন ক্রিয়ারও অভাব ঘটিয়া থাকে,

সেইরূপ আত্মা কর্ত্তৃত্বশক্তিযুক্ত হইয়াও কর্ত্তৃত্বের নিমিত্ত রূপ উপকরণ সমূহকে পরিত্যাগ করিলেই উহার কার্য্য স্বতঃই উপেক্ষিত হইবে; কেন না শক্তিরূপ সম্বন্ধের সহিত সম্বন্ধ নিমিত্ত গুলির সর্ব্বথা পরিত্যাগ অসম্ভব। * ইহাও বলা যাইতে পারে না যে, মোক্ষের সাধন করিলেই তাহার সিদ্ধি অবশ্যম্ভাবী, কেন না তাহা হইলে সাধনাধীন বলিয়া মোক্ষের অনিত্যত্ব আপত্তি আসিয়া পড়ে।

পক্ষান্তরে আত্মা নিত্য শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত বলিয়া বেদে প্রতিপাদিত হইয়াছে। এই জন্য মোক্ষ সিদ্ধি যে নিমিত্তক ইহাই শ্রুতির অভিপ্রেত। আর আত্মার কর্ত্তৃত্বটা নৈসর্গিক হইলে শ্রুতির এইরূপ আত্মা প্রতিপাদন কোন প্রকারে সঙ্গত হইতে পারে না। অতএব বুদ্ধিরূপ উপাধির ধর্ম্ম আরোপ করিয়াই আত্মাকে কর্ত্তা বলা হইয়াছে, কিন্তু স্বভাবতঃ তিনি অকর্ত্তাই বটেন। এই বিষয়ে শ্রুতির প্রমাণও যে নাই তাহা নহে, কেন না "তিনিই যেন চিন্তা করেন, তিনিই যেন চলিয়া থাকেন" (ইহার তাৎপর্য্য বুদ্ধিরূপ উপাধির প্রভাবে আত্মা না চলিয়াও যেন চলিয়া থাকেন এবং চিন্তন না করিয়াও যেন চিন্তিত হইয়া পড়েন)। "মনীষীরা মন ও ইন্দ্রিয়যুক্ত আত্মাকেই ভোক্তা বলিয়া থাকেন"। আর এই শ্রুতি যুগল দ্বারা ইহা প্রতিপন্ন না হইয়া রহিল না যে, উপাধিসংযুক্ত আত্মার পক্ষেই ভোক্তৃত্ব প্রভৃতি সম্ভবপর। পরন্তু বিবেকী ব্যক্তির পক্ষে পরব্রহ্ম হইতে ভিন্ন জীব নামে একটা কর্ত্তা বা ভোক্তা আছে এইরূপ উক্তি উন্মত্ত-প্রলাপেই পরিণত হইয়া থাকে। আর শ্রুতি বলিতেছে যে, "পরব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত কোন দ্রষ্টা নাই"। এই স্থলে এইরূপ আপত্তিও উঠিতে পারে না যে, তবে পরব্রহ্মই কর্ত্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব দোষে লিপ্ত হইয়া পড়িলেন অর্থাৎ পরব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত বুদ্ধি প্রভৃতি ব্যতিরেকে কোন কর্ত্তাই রহিল না; কেন না অবিদ্যোপহিত চৈতন্যের কর্ত্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব স্বীকার করাতে কোন দোষের অভ্যুত্থান হইতে পারে না। এই বিষয়ে শ্রুতি-প্রমাণ এই যে, "অবিদ্যা অবস্থাতে যেন ব্রহ্ম দ্বৈতরূপে পরিণত হইয়া যান বলিয়া বোধ হয় সুতরাং ভিন্নভাবে এক অপরকে দেখিয়া থাকে"। এই শ্রুতি অবিদ্যা অবস্থায় আত্মার কর্ত্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব প্রতিপাদন করে। আবার "যে প্রবুদ্ধ অবস্থাতে তত্ত্বদর্শীর পক্ষে সমস্ত জিনিষ আত্মা বলিয়া প্রতীয়মান হইয়া থাকে, সেই অবস্থাতে দ্বৈতভাবে কে কাহা দ্বারা কাহাকে দেখিবে" শ্রুতি তত্ত্বজ্ঞান অবস্থাতে ঐ কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বের নিবারণ করিতেছে। এইরূপে "সুষুপ্তিতে আত্মার স্বরূপকে কোন প্রকার দুঃখ স্পর্শ করিতে পারে না এবং উহা আনন্দস্বরূপ বলিয়া আপনার কামনা আপনি করিয়া থাকে, আপনা হইতে অতিরিক্ত কাম্য বস্তু নাই এই জন্য অপর কিছুর কামনা করে না, সুতরাং আত্ম-কাম ও অকাম হওয়ায় উহাকে আপ্তকাম বলিতেও কোন বাধা রহিল না" আরম্ভ করিয়া "এই ইহার পরম গতি, এই ইহার পরম সম্পদ, এই ইহার পরম লোক ও এই ইহার পরম আনন্দ" পর্য্যন্ত শ্রুতি আকাশে উড্ডীয়মান শ্যেন পক্ষীর দৃষ্টান্তে জাগ্রৎ ও স্বপ্ন অবস্থায় আত্মার উপাধি সম্পর্ক জনিত ক্লান্তির বর্ণন করিয়া সুষুপ্তিতে আবার পরব্রহ্মরূপ আত্মায় একাকার হওয়ায় তিনি সমস্ত মায়িক জঞ্জাল হইতে মুক্ত হইয়া যান এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছে। ইহাই আচার্য্য বাদরায়ণ প্রস্তাবিত সূত্র দ্বারা দেখাইতেছেন।

*শক্তশক্যাশ্রয়াশক্তিঃ স্বসত্তয়াবস্তুং শক্যং আক্ষিপতি তথাচ তয়াক্ষিপ্তং শক্যং সদৈবস্যাৎ। রত্নপ্রভা। ইহার তাৎপর্য্য শক্তি আশ্রয় ও বিষয়ের আশ্রিত বলিয়া তাহার অস্তিত্ব বিষয়ের অস্তিত্বের উপর নির্ভর করিতেছে।

সূত্রে 'চ' শব্দটা 'তু' শব্দের অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। এইরূপ মনে করিওনা যে, অগ্নির উত্তাপের ন্যায় আত্মার কর্তৃত্বটা স্বাভাবিক, কেন না, যেরূপ লোকনীতিতে সূত্রধর কুদ্দাল হস্তে স্বকার্য্য সম্পাদনে রত হইয়া ক্লেশে পতিত হয়, আবার স্বগৃহে যাইয়া কুদ্দাল পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বস্থ নির্ব্যপার, নির্ব্বৃত ও সুখী হইয়া থাকে, সেইরূপ অবিদ্যোপস্থাপিত দ্বৈত জঞ্জালে স্বপ্ন ও জাগ্রৎ অবস্থায় আত্মা লিপ্ত হইয়া আপনাকে কর্ত্তা মনে করে এবং এই জন্য দুঃখপঙ্কে মগ্ন হয়, আবার সেই ঐ দুঃখ হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য সুষুপ্তিতে পরব্রহ্মরূপ নিজ আত্মাতে প্রবিষ্ট হইয়া কার্য্য ও করণ সঙ্ঘাত পরিত্যাগপূর্ব্বক কর্তৃত্বে নির্লিপ্ত ও সুখী হয়। মুক্তি অবস্থাতেও এইরূপ নিয়মের যোজনা করিয়া লইতে পারা যায় অর্থাৎ ঐ অবস্থাতে আত্মা অবিদ্যাতিমিরকে বিদ্যা প্রদীপদ্বারা বিধ্বস্ত করিয়া অসঙ্গ নির্বৃতি সুখে নিমগ্ন হয়। সূত্রধরের দৃষ্টান্তেও ইহা অনুধাবন করিয়া লইতে হইবে যে, সূত্রধর বিশেষ তক্ষণ ব্যাপারে তাহার অস্ত্র শস্ত্রের অপেক্ষায়ই কর্ত্তা বলিয়া প্রথিত হয়, কিন্তু কেবল নিজ শরীরের দিক দিয়া দেখিলে সে অকর্ত্তাই বটে। এইরূপ নিয়মে আত্মাও প্রত্যেক কার্য্যে মন প্রভৃতি উপকরণের অপেক্ষায়ই কর্ত্তা বলিয়া প্রতীয়মান হইয়া থাকেন, কিন্তু স্বস্বরূপের দিক দিয়া দেখিলে তিনি অকর্ত্তা বলিয়া নিশ্চিত হন। আর সূত্রধরের ন্যায় আত্মার হস্তাদি অবয়ব নাই, সুতরাং সে যেরূপ কুদ্দাল প্রভৃতি অস্ত্র গ্রহণ এবং পরিত্যাগ করে, সেরূপ আত্মা মন প্রভৃতি উপকরণের গ্রহণ বা পরিত্যাগে লিপ্ত হন না।

শাস্ত্রের সার্থকতারূপ হেতু দ্বারা যে আত্মার স্বাভাবিক কর্তৃত্ব বলা হইয়াছে তাহা নহে, কেন না বিধি শাস্ত্র কেবল আরোপিত কর্তৃত্ব লইয়াই কর্ত্তব্য বিশেষের উপদেশ করে, কিন্তু আত্মার কর্তৃত্ব প্রতিপাদন করে না। আর ইহাও ব্যক্ত করিতে ত্রুটি হয় নাই যে, শ্রুতিতে আত্মা ব্রহ্ম বলিয়া উপদিষ্ট হওয়ায় তাঁহার স্বাভাবিক কর্তৃত্ব অসঙ্গত। সুতরাং অবিদ্যার উদ্ভাবিত কর্তৃত্ব লইয়াই বিধি শাস্ত্রের প্রবৃত্ত হইয়া উচিত। আর কর্ত্তা বিজ্ঞানাত্মা পুরুষ এই প্রকার শাস্ত্র ও অনুবাদ রূপ বলিয়া যথাপ্রাপ্ত অবিদ্যোদ্ভাবিত কর্তৃত্বের অনুবাদ মাত্রেই প্রবর্ত্তমান হইবে। ইহা দ্বারা আত্মার বিচরণ ও ইন্দ্রিয়াদির পরিগ্রহ যে অবিদ্যারই ক্রীড়া বিশেষ ইহা বুঝিয়া লইতে কোন বাধা রহিল না, কেন না ঐ উভয়ই অনুবাদ মাত্র। এইরূপও আপত্তি করিতে পারা যায় না যে, স্বপ্ন-অবস্থায় ইন্দ্রিয় প্রভৃতি করণগ্রাম প্রসুপ্ত হইলে আত্মা নিজের শরীরে স্বেচ্ছানুসারে ভ্রমণ করিয়া থাকেন, এইরূপ শাস্ত্রের বিহার উপদেশই আত্মার কর্তৃত্ব বুঝাইয়া দেয় এবং 'এই ইন্দ্রিয় সমূহের জ্ঞানকে বুদ্ধি দ্বারা গ্রহণ করিয়া' এই স্থলে কর্ম্ম ও করণের বিভক্তি নির্দ্দিষ্ট হওয়ায় আত্মার কর্তৃত্ব প্রতিপন্ন হয়, কেন না ঐ সবস্থায় সর্ব্বথারূপে আত্মার করণ গ্রাম স্বকার্য্য হইতে বিরত হয় না। আর এই বিষয়ে প্রমাণ এই যে, "ঐ বুদ্ধিই স্বপ্ন রূপে পরিণত হইয়া অদ্ভুত ক্রিয়া কলাপ সম্পাদন করে" শ্রুতি ও "ইন্দ্রিয় সমূহ স্বকার্য্য হইতে বিরত হইলে মন আপনার কার্য্যে প্রবৃত্ত থাকিয়া যে বিষয় রাশির উপলব্ধি করিয়া থাকে তাহাকে স্বপ্ন দর্শন জানিবে" স্মৃতি। পক্ষান্তরে শ্রুতি দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, কামাদি মনেরই বৃত্তি বিশেষ, কিন্তু স্বপ্নে ঐগুলি বিদ্যমান থাকে। সুতরাং স্বপ্ন অবস্থায় মনের সাহায্যেই আত্মা বিহার করে। আর কোন প্রকারে ঐ বিহারটাকে মায়াময় ছাড়া পারমার্থিক বলা যাইতে পারে না, কেন না শ্রুতি ইবশব্দের সহযোগেই স্বপ্ন ব্যাপারের বর্ণন করিয়াছে। "উতেব স্ত্রীভিঃ

সহ মোদমানো জক্ষচ্ছেবাপি ভয়ানি পশ্যন্" অথবা যেন রমণীদিগের সহিত হাসিতে হাসিতে অথবা যেন তাহাদের সহিত পাশা খেলিতে খেলিতে ভয় দেখিয়া। লোকনীতিতেও "আমি যেন গিরিশৃঙ্গে আরোহণ করিয়াছিলাম আমি যেন অটবী সমূহ দেখিয়াছিলাম" এই ভাবে এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির নিকট আপন স্বপ্নের কথা ব্যক্ত করে। ইন্দ্রিয়ের জ্ঞান গ্রহণ সম্পর্কিত বিষয়েও ইহা অনুধাবন করিয়া লওয়া উচিত যে, যদ্যপি আত্মার উপকরণ সম্বন্ধে কর্ম্ম ও করণের বিভক্তি নির্দ্দেশ হইয়াছে, তথাপি উপকরণসংপৃক্ত আত্মারই কর্ত্তৃত্ব জানিবে, কেন না শুদ্ধ আত্মার যে কর্ত্তৃত্ব অসম্ভব তাহা দেখান গিয়াছে।

শ্রীঅচ্যুতানন্দ সরস্বতী

সাহিত্য-সভার কার্য্য-বিবরণী।

১২শ বার্ষিক তৃতীয় মাসিক অধিবেশন।

১৭ই আষাঢ় ১৩১৮ সাল।

রবিবার, অপরা ছ ৫।০ ঘটিকা।

১ সভাস্থলে নিম্নলিখিত সভ্যগণ উপস্থিত ছিলেন,—

১। শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর।
২। ,, মহামহোপাধ্যায় কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ।
৩। ,, কবিরাজ অঘোরনাথ শাস্ত্রী।
৪। ,, পণ্ডিত রাজকৃষ্ণ শিরোমণি।
৫। ,, কবিরাজ যতীন্দ্রনাথ সেন।
৬। ,, সুবলচন্দ্র মিত্র।
৭। ,, কুমার প্রমোদকৃষ্ণ দেব বাহাদুর।
৮। ,, যতীন্দ্রনাথ দত্ত।
৯। ,, অখিলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল।
১০। ,, বোধিসত্ত্ব সেন।
১১। ,, হেমচন্দ্র সেন গুপ্ত।
১২। ,, কবিরাজ বিরজাচরণ গুপ্ত।
১৩। ,, অমৃতানন্দ ভট্টাচার্য্য।
১৪। ,, শিবগোপাল চক্রবর্ত্তী।
১৫। ,, গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
১৬। ,, অম্বিকাচরণ দেব।
১৭। ,, কুঞ্জবিহারী বসু বি, এ।
১৮। ,, কুমার প্রদ্যুম্নকৃষ্ণ দেব বাহাদুর।
১৯। ,, শশাঙ্ক গঙ্গোপাধ্যায়।
২০। ,, বিহারিলাল সরকার।
২১। ,, রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর এম, এ।
২২ ,, পণ্ডিত চণ্ডীচরণ স্মৃতিভূষণ।
২৩। ,, কবিরাজ কেদারনাথ কাব্যতীর্থ
২৪। ,, আশুতোষ স্মৃতিরত্ন।
২৫। ,, সতীশচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ।
২৬। ,, ডাক্তার ভুবনেশ্বর মিত্র।
২৭। ,, উমাচরণ তর্করত্ন।
২৮। ,, পণ্ডিত আলোকনাথ ভট্টাচার্য্য
২৯। ,, পণ্ডিত প্রসন্নকুমার তর্কনিধি।
৩০। ,, মহারাজ-কুমার বনোয়ারি আনন্দ দেব বাহাদুর।
৩১। ,, মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম, এ, পি এচ, ডি।
৩২। ,, খগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।
৩৩। ,, রামগোপাল ভট্টাচার্য্য।
৩৪। ,, সতীশচন্দ্র পাল চৌধুরী বি, এ
৩৫। ,, বলাই চাঁদ মল্লিক।
৩৬। ,, কুমুদবিহারী সেন।
৩৭। ,, চারুচন্দ্র বসু।
৩৮। ,, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যারত্ন।

৩৯। „ শীতল প্রসাদ ঘোষ বি, এল।
৪০। „ ডাক্তার যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ।
৪১। „ পণ্ডিত দক্ষিণাচরণ স্মৃতিতীর্থ।

২। শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

৩। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণী পঠিত ও অনুমোদিত হইল।

৪। কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি, সভার নিয়মাবলীর ৮৩ ধারার নিম্নলিখিত সংশোধন করিয়া, ৩২ ধারা অনুসারে ঐ সংশোধন সভার অনুমোদনার্থ প্রেরণ করেন। শ্রীযুক্ত রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুরের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত সুবলচন্দ্র মিত্রের সমর্থনে সর্ব্বসম্মতিক্রমে ঐ সংশোধন অনুমোদিত হইল। সংশোধিত ধারাটী এই,—

"তিনি (সম্পাদক), সভ্যবর্গের দেয় অর্থাদি সংগ্রহ করিবেন ও সভার ধনরক্ষকের সহিত একযোগে প্রাপ্ত অর্থাদির অঙ্গীকারপত্র প্রদান করিবেন।"

৫। পরে শ্রীযুক্ত সভাপতি মহাশয়, শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ মহাশয়ের লিখিত প্রবন্ধের উল্লেখ ও প্রসঙ্গতঃ তাঁহার পূর্ব্বলিখিত দার্শনিক প্রবন্ধ সমূহের প্রশংসা করিয়া তাঁহাকে "বৌদ্ধদর্শন" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিতে অনুরোধ করিলেন।

৬। প্রবন্ধ পাঠান্তে শ্রীযুক্ত সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানানুসারে নিম্নলিখিত সভ্যগণ উক্ত প্রবন্ধ সম্বন্ধে স্ব স্ব মতামত প্রকাশ করিলেন।

৭। শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম, এ, পি এচ, ডি মহাশয় বলিলেন, প্রবন্ধটী অনেকের পক্ষে দুর্ব্বোধ হইয়াছে, তথাপি উহার প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। প্রবন্ধটী হৃদয়গ্রাহী। কিন্তু ঐ প্রবন্ধোক্ত মত, এক পক্ষের মত, উহাতে প্রতিবাদী বৌদ্ধদিগের উত্তরের কোন আভাস পাওয়া যায় না। ন্যায় বৈশেষিক প্রকৃতির সমকালীন বৌদ্ধদর্শনের উৎপত্তি; ঐ দর্শন প্রথমতঃ পালি ভাষায় রচিত হয়। যখন উহা উদ্ভাবিত হয়, তখন বৈদিকমতা লম্বীরা তাহা জানিতে চেষ্টা করেন নাই, পরে ৪০০।৫০০ বৎসর পরে সংস্কৃত ভাষায় ঐ দর্শনের তত্ত্ব সমূহ প্রচারিত হইলে, হিন্দু ও বৌদ্ধমতের সংঘর্ষ আরম্ভ হয়। উহা মহাযান সূত্রাদির সময় হইতে তৃতীয় চতুর্থ শতাব্দী পর্য্যন্ত অব্যাহত থাকে। পরে কুমারিলের সময় বৌদ্ধমতের পরাজয় আরম্ভ ও শঙ্করের সময় শেষ হয়। শঙ্করাচার্য্য অনেক স্থলে প্রকৃত বৌদ্ধমতের উদ্ধার করেন নাই। তিনি কোন কোনস্থলে বৌদ্ধমত বিকৃতভাবে উদ্ধার করিয়াছেন, কোথাও বা বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার টীকাকার বাচস্পতি মিশ্র কিন্তু এই দোষদুষ্ট নহেন। তিনি বৌদ্ধমতের প্রকৃত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শেষে উদয়নাচার্য্য স্বীয় "বৌদ্ধধিকার" গ্রন্থে এই বিকৃত ব্যাখ্যার চরম নিদর্শন দেখাইয়াছেন। প্রবন্ধের অধিকাংশ (১২খানা) সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ হইতে গৃহীত। তবে এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে, হিন্দু দর্শনোক্ত বিরুদ্ধবাদ না থাকিলে বোধ হয় ভারতে বৌদ্ধদর্শন লুপ্ত হইত। পরে মাধ্যমিক নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রবন্ধোক্ত মতের সমালোচনা করিলেন ও বলিলেন যে, যে সকল বৌদ্ধ মধ্যমার্গাবলম্বী অর্থাৎ যাহারা অস্তিবাদীও নহে, অথবা নাস্তিবাদীও নহে, তাহারাই মাধ্যমিক নামে অভিহিত হইয়াছিল। পরে সর্ব্বদর্শনে প্রতিপাদিত ক্ষণিকত্ববাদ ও শূন্যত্ববাদ যে যথাযথভাবে বিবৃত হয় নাই ও বৌদ্ধ গ্রন্থে যে ঐ সকল মত বিশেষ চাতুর্য্য সহকারে সমর্থিত হইয়াছে, তাহার উল্লেখ করিলেন ও প্রবন্ধকারকে ধন্যবাদ দিয়া আসন গ্রহণ করিলেন।

৮। শ্রীযুক্ত বিহারিলাল সরকার প্রবন্ধের বিশিষ্ট প্রশংসা করিয়া বলিলেন যে, তর্কবাগীশ মহাশয় ব্যতীত অপরের পক্ষে এ সকল প্রবন্ধ পাঠ অসম্ভব। পরে তিনি পরমাণু বাদের কথার উল্লেখ করিলেন। তাঁহার মতে স্বয়ং ভগবান বুদ্ধরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন; এ কথা প্রকৃত নহে। ভগবানের "মায়া মোহই" বুদ্ধরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ভগবান স্বয়ং অবতীর্ণ হন নাই ইত্যাদি।

৯। শ্রীযুক্ত রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর এম্, এ, বলিলেন, প্রবন্ধ বড়ই উপাদেয় হইয়াছে, উহাতে বৌদ্ধদর্শনের জটিল তত্ত্ব গুলি যথাসম্ভব বিশদভাবে বিবৃত হইয়াছে। প্রবন্ধকার মহাশয়কে তিনি অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিতেছেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ কর্তৃক হিন্দু দার্শনিকদিগের উপর কটাক্ষের উল্লেখ করিয়া বলিলেন যে, বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের ঐরূপ কটাক্ষের কারণ কতদূর বিচারসহ তাহা বলা যায় না। শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি দার্শনিকগণ যে, বৌদ্ধদর্শনের মত সমুহের বিকৃতভাবে উদ্ধার ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন, আবার বাচস্পতি মিশ্র যে ঐ সকল মতের প্রকৃত ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এ কথার মূল কি? আশা করি বিদ্যাভূষণ মহাশয় এ সম্বন্ধে প্রমাণ প্রয়োগের উল্লেখ করিয়া সাধারণের সংশয়াপনোদন করিবেন। আরও এক কথা- যখন বৌদ্ধদর্শনের সৃষ্টি, তখন উহা পালি ভাষাতেই রচিত হইয়াছিল ও বৈদিক মতাবলম্বীরা উহার অর্থ গ্রহণে চেষ্টা করেন নাই, পরে মহাযানবাদের সৃষ্টি হইতেই হিন্দু ও বৌদ্ধ মতের প্রথম সংঘর্ষ আরম্ভ হয়,এ সকল কথাও প্রমাণসহ বলিয়া বোধ হয় না। বিদ্যাভূষণ মহাশয় ঐ সকল কথার প্রমাণ্য সংস্থাপন করিলে সাধারণের সংশয় দূর হইতে পারে। সংক্ষেপে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি আর্য্য দার্শনিকদিগের সময় বৌদ্ধ ধর্ম্ম জীবিত ছিল, ও তাঁহারা সেই জীবিত ধর্ম্ম নিরাসেরই চেষ্টা করিয়াছেন,কোন রূপ কাল্পনিক মতের সহিত বিবাদ করেন নাই।

১০। সভাপতি শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর বলিলেন, প্রবন্ধটী সম্পূর্ণভাবে হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। তর্কবাগীশ মহাশয় হিন্দু শাস্ত্রজ্ঞদিগের মতই প্রবন্ধটী লিখিয়াছেন। আমার মতে তিনি যথাযথ ভাবেই ঐ সকল মতের আলোচনা করিয়াছেন। মৃত্যু হইতে অব্যাহিত লাভের উপায় উদ্ভাবনই হিন্দুদর্শনের উদ্দেশ্য। প্রবন্ধকার এই উদ্দেশ্য স্বীয় প্রবন্ধে সম্যক উপপন্ন করিয়াছেন। এক্ষণে প্রশ্ন এই যে, শঙ্কর, কুমারিল্ল, উদয়ন প্রভৃতি মনীষীগণ বৌদ্ধ মত উল্লেখ করিবার সময় কোন সত্য গোপন করিয়াছিলেন কি না? তাঁহারা যে সময় প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন তখন বৌদ্ধমত জানিবার সুযোগ ও উপায় এখনকার কাল অপেক্ষা অধিক ছিল কি না? আর পালি ভাষায় লিখিত দার্শনিক গ্রন্থ সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, ঐ ভাষায় অদ্যাপি শঙ্করাচার্য্যের লিখিত দর্শনের ন্যায় কোন দর্শন শাস্ত্র এপর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। কোন ইংরাজি লেখক বলিয়াছেন যে, হিন্দুদর্শন উন্নতির চরম সীমায় উঠিয়াছে। এ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় যে হিন্দু দার্শনিকদিগের উপর আনীত পক্ষপাত দোষের প্রতিবাদ করিয়াছেন, তাহাও সর্ব্বসাধারণের বিচার্য্য। বক্তৃতা বড়ই শিক্ষাপ্রদ হইয়াছে ও তর্কবাগীশ মহাশয় এই প্রাচীন বয়সে যেরূপ গবেষণা ও পরিশ্রমশক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা তাঁহার পক্ষে বড়ই গৌরবের বিষয়।

১১। পরে শ্রীযুক্ত সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীরাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী। শ্রীশশিভূষণ মিত্র।
সম্পাদক। সভাপতি।

৩২শে শ্রাবণ, ১৩১৮ সাল।

সাহিত্য-সংহিতা

দ্বাদশ খণ্ড] ১৩১৮ সাল, আশ্বিন। [৬ষ্ঠ সংখ্যা

বাঙ্গালা ভাষার পূর্ব্বাভাষ।

অগ্রেই প্রদর্শিত হইয়াছে যে, গৌড়মণ্ডলের প্রদেশ বিশেষের ভাষা সমূহ পরস্পর বিভিন্ন হইলেও মূলপ্রকৃতি এক। দূরদেশে স্থিতি নিবন্ধন পরস্পরের বাক্যালাপের অত্যন্তাভাববশতঃ ক্রমশঃ বাক্য-ভঙ্গির শৈথিল্য ঘটায় ভাষা পৃথক হইতে লাগিল।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে গিরি, নদী, বন ও পর্ব্বতাদির ব্যবধান থাকিলেই গতিবিধির সহজেই ব্যাঘাত জন্মে। তন্নিমিত্ত পরস্পরের সহিত সাক্ষাৎ না ঘটায় অনায়াসেই আচার ব্যবহারের পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। তাহা ঘটালেই নূতন নূতন কথার সৃষ্টি হয়। শেষে অধস্তন পুরুষে পূর্ব্বাপর কথোপকথনের ইতর বিশেষ ঘটে। কথাবার্ত্তার স্বর-বৈলক্ষণ্য এবং সত্বরতা হেতু একরূপ বাক্যই বিভিন্নরূপ ধারণ করে। এইরূপ ভাষা পৃথক হইয়া পড়িলেও মূল প্রকৃতির অনৈক্য সহসা ঘটে না, শাখা পল্লবের পুষ্টি ও ক্ষীণতায় পরস্পরের রূপের পার্থক্য দাঁড়ায়। যেমন ড, ল, র এই তিন অক্ষর একার্থক হওয়াতে প্রদেশ বিশেষে শব্দের বিভিন্নতা হইয়া যায়। যথা বাড়ী—বারি, নড়ী—নলী, কড়ী,—করি। অর্থেরও বৈপরীত্য জন্মে। গমনাগমনের সুগমতা দুর্গমতা ও অগম্যতা নিবন্ধন কথাবার্ত্তা পৃথক হইয়া যায়, সুতরাং আচার ব্যবহার বিভিন্ন হইতে আর বাধা থাকে না। কারে ও পৃথক গতিতে প্রচলিত হইতে অগ্রসর হয়। ইহাই ভাষা বৈলক্ষণ্যের প্রধান হেতু। ইহার দেদীপ্যমান প্রমাণ সম্মুখেই বিদ্যমান আছে। সুবর্ণরেখা নদীর উত্তরতীরস্থ লোকের কথা বার্ত্তা বাঙ্গালা। দক্ষিণতটস্থ জন সমূহের কথা বার্ত্তা লিখন পাঠন উৎকলীয় (উড়িয়া ভাষা) কিন্তু পরস্পর সম্মুখীন ব্যক্তিবর্গ পরস্পরের ভাষায় অভিজ্ঞ এবং কথোপকথনে বিলক্ষণ পটু। কিন্তু কার্য্যকালে এবং আচার ব্যবহারে পরস্পরে পৃথক। এইরূপে বিন্ধ্যগিরির অন্তর্গত জনপদ সমূহের পরস্পরের গতিবিধির সুগমতা ও দুর্গমতা হেতু আচার ব্যবহারের অনৈক্য নিবন্ধন কথা বার্ত্তা বিভিন্ন হইয়া গিয়াছে। তাহাতেই অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ সুহ্ম, মৈথিল ও ভোজপুরাদির ভাষা পৃথক।

বন, পর্ব্বত ও নদী ব্যবধান হেতু মণিপুর ও প্রাগ্জ্যোতিষাদি প্রদেশের ভাষা বিভিন্ন কিন্তু মূল প্রকৃতির বৈষম্য ঘটে নাই। প্রাগ্জ্যোতিষের ও মৈথিল প্রদেশের ভাষার ও অক্ষরের বিভিন্নতা দেখা যায় না। তবে মিথিলা প্রদেশে দুই চারিটী অক্ষর স্থল বিশেষে রূপান্তর ধারণ করিয়াছে বটে কিন্তু পূর্ব্বাবয়বও একেবারে পরিভ্রষ্ট হয় নাই। উড়িয়া ভাষার অক্ষর সমূহ কুণ্ডল ধারণ করিয়াই পৃথক আকারে পরিদৃশ্যমান হইয়াছে। নতুবা

পণ্ডিতবর্গ অনুমান করেন যে, ঈশ্বর যখন তৎপুত্র ঋষিবর্গের সঙ্গে কথোপকথন করিয়াছেন, তখন তদীয় ভাষাকে ঋষিগণ দেববাণী বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ঐ ভাষা প্রথমে বেদ নামে কথিত হয়। পরে শ্রুতি পরম্পরায় ঐ প্রচলিত হইয়া গেলে ঐ সকলের নাম শ্রুতিরূপে নির্দ্ধারিত হইয়া আইসে। ঐ শ্রুতি গুলির কতক কালক্রমে অপ্রচলিত হইয়া গেলে উহা জনশ্রুতিরূপে পরিগণিত হয়। কালক্রমে উহাই পুরাতন হইল। তখন পুরাণরূপে ইতিবৃত্তের আকারে লোকের স্মরণ-পথের পথিক হইল। তদবধি লোকের হিতার্থে ঋষিগণ উহা স্মরণ রাখিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদিগের স্মরণ বাক্যগুলিই শেষে লোকের আচার ব্যবহার ও জ্ঞান বিষয়ক শাস্ত্র অর্থাৎ স্মৃতিনামে প্রখ্যাত হয়।

ক্রমে লোকসৃষ্টি-বাহুল্য হেতুবশতঃ অনেকে দুর্ম্মেধ হইল। এবং বয়োসাতীত হইলেই লোকের স্মরণশক্তিতে পূর্ব্বস্মৃতির ব্যতিক্রম ঘটে। ইহা স্থির সিদ্ধান্ত হইলে বেদ, শ্রুতি, স্মৃতি বাক্যের স্থিরতা রাখিবার নিয়ম নির্দ্ধারণ হইল। নিয়ম নির্দ্দেশ করিতে গেলেই একটা সঙ্কেত বা চিহ্ন স্থির করাই যুক্তিযুক্ত। সেই যুক্তিমার্গের বশবর্ত্তী হইয়া ঋষিবর্গ যে সঙ্কেত বা চিহ্ন স্থির করিলেন, তাহার নাম অক্ষর হইল। ন ক্ষরতি ইতি অক্ষর। (অর্থাৎ যাহা বিনষ্ট হয় না।) নিত্যপদার্থের ক্ষয় হয় না। সুতরাং অক্ষরের সৃষ্টি হইল। অক্ষর শব্দের স্বরূপ মাত্র। শব্দ নিত্য-পদার্থ ব্রহ্মের স্বরূপ। শব্দ সাকার নহে। উহাকে স্মরণ রাখিতে হইলে, প্রথমতঃ একটা অবয়ব প্রত্যক্ষ করা আবশ্যক। সেই নিমিত্তই অক্ষরের সৃষ্টি হইল। ঋষিগণ ও দেবগণ শব্দ স্মরণার্থ যে সঙ্কেত করিলেন, সেই স্মারক চিহ্নের নাম দেবাক্ষর। পরে নগরের লোকের সুগমতা জন্য ঋষিবর্গ উহার সংস্কার করেন, তাহাতেই ঐ সকল অক্ষরের নাম দেবনাগর বা সংস্কৃতাক্ষর হয়। অপিচ ঋষিগণ যে ভাষায় সচরাচর কথা কহিতেন, তাহারই নাম সংস্কৃত হইয়া গেল। বৈদিক ভাষা ও শ্রুতিভাষা মৌলিক ভাষা হইতে কিছু বিভিন্ন। সেই দেবনাগর অক্ষর এবং সংস্কৃত ভাষা সকল ভাষার মূল। সুতরাং তাহা হইতে বা তদ্দৃষ্টে যে অক্ষর সৃষ্টি হইয়াছে, তন্মধ্যে বঙ্গাক্ষর ও উড়িয়া অক্ষর আমাদিগের প্রধান লক্ষ্যস্থল ও বিচার্য্য বিষয়।

দেবনাগর	বাঙ্গালা	
क	ক	ইত্যাদি—
ख	খ	

কেহ কেহ বলেন, বঙ্গাক্ষর দেবনাগরাক্ষরের সমসাময়িক। তাহার কারণ এই বলেন যে, তন্ত্রে যে ককারাদি অক্ষরের আকৃতি বর্ণনা আছে, তাহাতে ককারের রূপ নির্ব্বাচন স্থলে "ক" এই অক্ষরের ত্রিকোণ-রূপে অবয়ব নির্দ্দিষ্ট দেখা যায়। তন্ত্রের অনাদি স্বীকার করিলে বঙ্গাক্ষর দেবনাগরাক্ষর হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া অভিহিত করিতে হয়। উড়িয়া অক্ষর দেবনাগর অক্ষরের অনুকৃতিমাত্র। তদ্বিষয়ে কোন সংশয় নাই। তবে কুণ্ডলালঙ্কারে অলঙ্কৃত।

বঙ্গাক্ষর মিথিলাদেশে ও প্রাগ্‌জ্যোতিষ প্রদেশে অবিকলরূপে প্রচলিত আছে। তবে ত্রিহুত জিলার অক্ষর মধ্যে দুই একটীর কিঞ্চিৎ অঙ্গ-বৈকল্য ঘটিয়াছে। সেইগুলিকে এ দেশের লোকে ত্রিহুতে অক্ষর বলে। ত্রিহুত বা (দ্বারভাঙ্গা) মিথিলা, পূর্ব্বকালাবধি বিদ্যার আকরস্থান ছিল। জনকরাজা ও পক্ষধর মিশ্র যে এই অক্ষর

ব্যবহার করেন নাই তাহা কে বলিতে সাহসী হয়েন? আমরা বঙ্গদেশের সাগর-সঙ্গমস্থলে মহামুনি কপিলের আশ্রমস্থান দেখিতে পাই, তখন তিনি যে বঙ্গদেশের জনসমূহের ভাষার স্মারকচিহ্ন বঙ্গাক্ষর তুচ্ছ করিয়াছেন তাহাও আমাদিগের মনে হয় না। অতএব আমরা অনায়াসে কহিতে পারি যে বঙ্গাক্ষর অতিপ্রাচীন। ইহা আধুনিক সৃষ্টির বস্তু নহে।

শব্দ ও অক্ষর নিত্যপদার্থ ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন। আমরা সাধারণ কথায় ও স্থূল লক্ষ্যে দেখিতে পাই, যে ব্যক্তি যে স্বরে বা সুরে যে গীত রচনা করিয়া গাহিয়াছেন, উহা সেই স্বরে অর্থাৎ সেই সুরে সংগীত না হইলে সুমধুর ও সুশ্রাব্য হয় না। সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে, শব্দ নিত্য ও স্বর সুরও নিত্যপদার্থ। আমার এই কথা প্রমাণ করিবার জন্য অন্য প্রমাণ প্রয়োগের অবতারণা করিতে হইবে না। অধিক প্রয়াসেরও আবশ্যকতা নাই। অনেকেই এখানকার কলের গান শুনিয়াছেন। ঐবংশীর কলে পূর্ব্বে যে গান যে সুরে সংগীত হইয়াছিল এক্ষণেও তাহার প্রতিশব্দ তদ্রূপেই প্রতিধ্বনিত হইয়া থাকে। কোন প্রকারেই উহার অঙ্গবৈকল্য ঘটে না। তবে ইহার স্মারক লিপিগুলি যথাযথ রূপে যথাযথ স্থানে সংস্থাপন করিতে হয়। নচেৎ প্রকৃত স্বরে প্রকৃত বাক্যে উচ্চারিত হয় না। ইহা পর্য্যালোচনা ও পর্য্যবেক্ষণ করিলে সহজে বোধ হইবে যে, শব্দ নিত্য ও অক্ষর এবং তাহার স্মারক অক্ষর নিত্যবস্তু। অক্ষর বা বর্ণ সজীব ও নির্জীব ভাবে অবস্থান নিবন্ধন প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত আছে। যেগুলিস্বয়ং উচ্চারিত হয়, উহা স্বর বা সজীব এবং যাহা স্বরের সহায়তা ব্যতীত উচ্চারিত হয় না ঐগুলি নির্জীব অথবা ব্যঞ্জনবর্ণ। স্বরবর্ণ আবার হ্রস্ব ও দীর্ঘানুসারে দুই প্রকার। তাহাও আবার উচ্চারণ বৈলক্ষণ্যে অর্থাৎ স্বরের (সুরের) লঘু গুরু কাল-ব্যাপকতার ক্রমানুসারে ত্রিবিধ হইয়া থাকে। যথা হ্রস্ব দীর্ঘ ও প্লুত। একমাত্রা বা একটী লঘু স্বরের নাম হ্রস্বস্বর। দুই মাত্রা বা দুইটী লঘুস্বর অথবা একটী দীর্ঘস্বরের নাম দ্বিমাত্রা। তিনটী হ্রস্বস্বর অথবা একটী হ্রস্ব ও একটী দীর্ঘ যোগে ত্রিমাত্রায় প্লুত স্বর হইয়া থাকে। উহা কিন্তু দূর হইতে আহ্বানকালে গানে এবং রোদন সময়ে আবশ্যক হয়। নচেৎ প্লুত হয় না।

উচ্চারণের স্বরবৈলক্ষণ্য আরও একটী কারণে ঘটে। যথা বর্ণসমূহ কণ্ঠ তালু মূর্দ্ধা দন্ত ওষ্ঠ রসনা ও জিহ্বামূলের ঘাত প্রতিঘাতে বাগিন্দ্রিয় হইতে উচ্চারিত হইলে ও ব্যঞ্জনবর্ণের অল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণরূপ ভাব বিদ্যমান থাকায় অনেক জাতিই তাহা সম্যকরূপে উচ্চারিত করিতে পারে না। তজ্জন্য অনেক জাতির ভাষায় মহাপ্রাণ বর্ণের নাম গন্ধও নাই। এবং যাহাদিগের ভাষায় মহাপ্রাণ বর্ণের নাম আছে, তাহাদিগের মধ্যে যাহারা চিরকৌমার ভাবাপন্ন বা অল্পমতি তাহারাও মহাপ্রাণ বর্ণের উচ্চারণ নিতান্ত অসাধ্য মনে করিয়া বহুবর্ণের প্রথম স্থলে তৃতীয় এবং বিপর্য্যস্তভাবে তৃতীয় স্থলে প্রথম বর্ণের উচ্চারণ করে। সেইপ্রকার দ্বিতীয়স্থলে চতুর্থ এবং বিপর্য্যয় করিতে কিঞ্চিন্মাত্র সঙ্কুচিত হয় না। অথবা অসাধ্যই জান করিয়া চিরকালই ভ্রান্ত থাকে। ভ্রান্ত হইলেই অন্ধ হয়। অন্ধের নিকট রাত্রি ও দিন সমান। *

---

* অল্পপ্রাণ—ক গ ঙ। চ জ ঞ। ট ড ণ। ত দ ন। প ব ম। য র ল। ১৮।

মহাপ্রাণ—খ ঘ। ছ ঝ। ঠ ঢ। থ ধ। ফ ভ শ ষ স হ। ১৫।

বাঙ্গালীরা সমুদায় বর্ণই উচ্চারণ করিতে সমর্থ ও পটু। সেই কারণেই বঙ্গভাষা সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন। শ্রুতশীলতা ও লেখা পড়ার চর্চ্চা প্রধানত ব্রাহ্মণজাতির মধ্যে স্থিরবৃত্তি বলিয়া নির্দ্ধারিত ছিল অন্যজাতির মধ্যে বৈষয়িক ব্যবহার সংসৃষ্ট মাত্রে যদ্দূর থাকা সম্ভব তাহার অতিরিক্ত দেখা যায় না। কৃষকাদির মধ্যে বিদ্যার জ্যোতি একেবারেই বিরলপ্রকাশ।

ব্রাহ্মণেরা প্রায় নির্ধন নিরাশ্রয় ও ভিক্ষুক ছিলেন। তাঁহারা যে পুঁথি পত্র লিখিতেন উহা তাঁহাদিগের কুটীরেই থাকিত কুটীর ধ্বংসের সমকালেই তাহা মহাকালের গর্ভে বিলীন হইত। অনেক সময়ে যত্ন করিয়া রাখিলেও কীটপতঙ্গাদির ভক্ষ্য হইয়া বিনষ্ট হইয়া যাইত। এত দৈব দুর্ঘটনা। সে কথা সদূরপরাহত। বঙ্গদেশ অনেকবার অনেক রাজার অভ্যুত্থানে ধনপ্রাণ ও জ্ঞানে বঞ্চিত হইয়াছে। পুঁথিপত্র তাহারই সঙ্গে বিলয় পাইবে তদ্বিষয়ে আর কোন সন্দেহমাত্র নাই।

আমরা আদিশূরের সময় হইতে পুনর্ব্বার বঙ্গদেশে বিদ্যাব্রাহ্মণ্যের প্রচার দেখিতে পাই। কিন্তু সে বিদ্যাব্রাহ্মণ্য কাহারা প্রচার করিল? দেখি কান্যকুব্জ-ব্রাহ্মণগণই সে জ্যোতি প্রকাশের সুখ-সূর্য্য।

সেই দ্বাদশ সূর্য্য যদি এককালে বঙ্গদেশে উদিত না হইতেন, তবে কত কাল অন্ধকার থাকিত তাহা বলা যায় না। তাঁহারা এখানে আসিয়া সংস্কৃত ভাষায় বিদ্যাব্রাহ্মণ্য প্রচার করিলেন। তৎকালে এদেশে যে ভাষা ছিল তাহা গৌড়ীয়। এই মহাপুরুষেরা গৌড়ীয় ভাষা অভ্যাস করিয়া যে রীতিতে শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহার নিদান পাওয়া নিতান্ত সুকঠিন। তবে ইঁহাদিগের অধস্তন সন্তান পরম্পরা যে গৌড়ীয় ভাষার শিক্ষা দিয়াছিলেন তদ্বিষয়ে মতদ্বৈধ দেখা যায় না। কারণ সদাচার ও সদ্ব্যবহারের আদর্শ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ। তাঁহাদিগের স্ত্রীগণ পূর্ব্বকালের ঋষিপত্নীদিগের মত সুশিক্ষিতা নহেন। এমন কি অধিকাংশ ব্রাহ্মণী অশিক্ষিতা বা বর্ণপরিচয়েরও একান্ত বিরোধিনী ছিলেন। তাঁহাদিগের ও সাধারণ লোকের স্থূল জ্ঞানের জন্য গৌড়ীয় ভাষায় যে সকল বাক্যব্যয় করিতেন, তাহারই কতকগুলি কিংবদন্তী, (জনশ্রুতি) কতকগুলি ডাক-বাক্য এবং কতকগুলি লোকাচার বাক্য খনা বরাহমিহিরাদির বচন বলিয়া বঙ্গসমাজ প্রচলিত আছে। তাহাই এক্ষণে বাঙ্গালা ভাষার আদি বলিয়া গ্রহণ করিতে বৈমুখ্য প্রদর্শন করা যায় না, কারণ উহা বাঙ্গালাদেশের আপামর সাধারণের কণ্ঠস্থ আছে। পুরাতন গাথা না হইলে ইতর লোক মধ্যে সহসা প্রচার হয় না।

ঐ জনশ্রুতি বা গাথাগুলি রচনার পরবর্ত্তী কালের কবিতা যে কি ছিল, তাহারও সন্ধান পাইবার উপায় নাই। কারণ মুষলমানদিগের অত্যাচারে হিন্দুর সর্ব্বস্ব অপহৃত হইয়াছিল। হাতের লেখা চলিত ভাষার কাব্য রক্ষার জন্য কেহ কিছুমাত্র চেষ্টা করে নাই—ভাবিয়াছিল পুনর্ব্বার রচিত হইতে পারিবে।*

* প্রবাদবাক্য।

নরা গজ বিশে শর তার অর্দ্ধ বাঁচে হয়।
বাইশ বলদা তের ছাগলা
তার অর্দ্ধ বরা পাগলা॥
ডাকরে পক্ষী না ছাড়ে বাসা।
উড়িয়ে বসে খাবে করি আশা॥
ফিরে যায় বাসে না পায় দিশা।
খনা ডেকে বলে সেই সে ঊষা॥

শাস্ত্রীয় পুথির বিলোপে ধর্ম্মনষ্ট হইবে বলিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা পুঁথি লইয়া প্রাণপণে নিবিড় অরণ্যে পলায়ন করিয়াছিলেন। তাহাতে শাস্ত্রীয় পুস্তক সুরক্ষিত হয়। সামাজিক পুথিও কুলজ্ঞদিগের জীবিকা রক্ষণের প্রধান অবলম্বন ছিল বলিয়া, তাহাও তাঁহাদিগের প্রাণপণ যত্নে কথঞ্চিৎ সুরক্ষিত হয়। বাঙ্গীয় কাব্য কলাকে রক্ষা করে কয়জন লোকেরই বা তদ্বিষয়ে রসাস্বাদ ছিল এবং কয়জনে বা মাতৃভাষার সংরক্ষণে আপনাকে সুখী জ্ঞান করিয়াছিলেন? কাজেই অনাদর ও তাচ্ছিল্য বশতঃ বঙ্গভাষার পূর্ব্বতন কাব্য লোপ হইয়া গিয়াছে।

উড়েপড়ে খায়না। তখন কেন বয় না॥
যার দোষে চৈত্রমাসের ফল।
মধুমাসে প্রথম দিবসে বসে যে সে বার।
রবি চোষে কুঞ্জবর্ষে বুধ দুর্ভিক্ষ সবার॥
সোম শুক্র গুরুবারে পৃথ্বি না শয় শস্যভার।
পাঁচশনি ধায় মানে। শকুনি মাংস না খায় মৃগ।
উঠা বসা পাশমোড়া।
তার আগে ভীমে ছোঁড়া॥
দুই ছেলের জন্মতিথি।
যাতে সধবারও গতি॥
পাগলার চৌদ্দ পাগলীর আট।
এই নিয়ে জন্ম কাট॥
যদি উপোস না কর্ত্তে পারিস।
ভবের গালে ডুবে মরিস।
আঢ় নবমী শুকুল পাখা
তাহে আছে জলের লেখা।
যদি বর্ষে মুষলধারে।
মধ্য সমুদ্রে বগা চরে।
যদি বর্ষে ছিটে ফোটা
পর্ব্বতে হয় মীনের ঘটা।
যদি বর্ষে ইমি ঝিমি।
শষ্যের ভার না সহে মেদিনী।
আমে ধান তেঁতুলে গাণ।
ইত্যাদি।

এখন যাহা দেখিতে পাই তন্মধ্যে রমাই পণ্ডিতের লিখিত শূন্যপুরাণকে প্রাচীন বোধ হয়। কিন্তু তাহার লিখন ভঙ্গীতে মুষলমানের স্থিতিগন্ধ সংপূর্ণরূপে প্রবাহিত হইতেছে। সে যাহা হউক তাহার ভাষা দেখিলে উড়িয়া এবং আসামী ভাষাকে বাঙ্গালা ভাষার—গৌড়ীয় ভাষার রূপান্তর বা অংশ বিশেষ ব্যতীত আর কিছুই মনে হইবে না।

উৎকল ভাষায় ক্রিয়ায় করিমু, দিমু, করোহ, করন্তু, যান্তু খান্তু, নিয়ন্তু, দিয়ন্তু প্রভৃতি শব্দ দৃষ্ট হয়। সর্ব্বনামে আম্ভে, তুম্ভে সেমানে, এমানে, যেমানে, তাঙ্ক, তাহাঙ্ক, কামি, মুহ, লোকমানে, তাক, যাক এবং আকারস্থানে অকারাদিষ্ট শব্দ দেখা যায়। ঠিক সেই-প্রকার আসামি ভাষায় করিমোঁ, দিবোঁ, করন্তি, নিগদতি, কহন্তি, দিয়ন্ত, নিয়ন্ত, এড়ন্ত, যাক, তাক, তান, তঙ্ক, তাহাঙ্ক লোকমানে প্রভৃতি বাক্য প্রয়োগের সঙ্গে ক্রিয়া দেদীপ্যমান আছে। পাঠকগণের বোধসৌকার্য্যার্থ প্রথমত আসামী ভাষার মহাকাব্য শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণের অষ্টমস্কন্ধ অর্থাৎ বলির ছলন খণ্ড হইতে দৃষ্টান্ত স্বরূপ সামান্য দুই চারিটি উদাহরণ দেখান গেল। যথা—

দেবগণে ক্রীড়ন্ত স্বর্গত (১) সম্প্রতি।
তক দেখিবাক বাঞ্ছা (২) করা মহাসতী॥
কাশ্যপ স্বামীক তুমি থাকিয়ো উপাসি। (৩)
তোহর গর্ভত মই উপজিবু আসি॥
নতো ন কহিবা তুমি হেন গোপ্য কথা।
মোর আরাধনা এতো কাকে নে হে বৃথা॥
বালক কটাক্ষে চান্ত অথর কামরি (৪)।
মূর্ত্তিক দেখন্ত যেন খাতু যাই উরি (৫)॥
শুনিয়ো ন শুনে যেন বসি থাকে কলা। (৬)
দেখিয়ো ন দেখে যিনেত আঁধলা॥ (৭)
(৮) মরীচি প্রভৃতি যত দেবগণ।

চারিবেদ দৈখ্য ৯) শাস্ত্র অষ্টর (১০) পুরাণ ॥
সপ্তরবৎসরে ভান (১১) ত্যজিল সমাধি।
স্বর্গক গেলা পাছে বিষ্ণুক আরধি॥
যত্তপি পুরুষোত্তম সমস্ত প্রাণীত সম
তথাপি ভক্তক করে দায়া।
এড়ায়ো দারুণ শোক চাহিবাক লাগে মোক
মুই সি ভুঞ্জার আ।॥
হেন শুনি মহার্ণব মাতিলন্ত বিমরিষি
কিনো বিষ্ণু মায়ার প্রভা।
দৈব দেহা দৈবজীব দৈত পাইলা পুত্রজীব
কন্ধ কোলে গোলে বাপ মায়॥
সংসার সকল মিছা তথাপি তাহাত ইহা
মোহে যাতি বাঁধি আছে টান।
কোন্ বুদ্ধি করোঁ আ.ব দেব দৈত্য যত সবে
ছুয়া আছে মোহর সমান॥
অনেক যোগন্ত বলি বচন প্রবোধ।
কিঞ্চিতেকো ন পালটে বামনর ক্রোধ॥

শ্রীলালমোহন বিদ্যানিধি।

প্রাচীন ভারতের শব-সৎকার।

স্মরণাতীতকাল পূর্ব্বে প্রাচীন ভারতে কিরূপ প্রণালীতে শব-সৎকার করা হইত, সে সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। এই আলোচনার ফলে আমরা বুঝিতে পারিব যে, ত্রিকালজ্ঞ আর্য্যঋষিগণ বহুদর্শিতা এবং অভিজ্ঞতার ফলে শব-সৎকার সম্বন্ধে কিরূপ প্রথা ও অনুষ্ঠান পদ্ধতি প্রচলিত করিয়া গিয়াছেন এবং আমরা আরও বুঝিতে পারিব যে, সহস্র সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে যে প্রথা প্রচলিত হইয়াছিল, এক্ষণে সে প্রথা প্রচলিত থাকিলেও অনুষ্ঠান পদ্ধতির কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছে, কি না? যদি কিছু পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে, তাহা হইলে ইহাও জানিতে পারিব যে সেই পরিবর্ত্তন উন্নতিমূলক কি শোচনীয়।

এই বিশাল বিশ্বের প্রত্যেক সভ্যজাতির প্রতি দৃষ্টি দান করিলে, আমরা দেখিতে পাই যে প্রায় সকল সভ্যজাতিই স্মরণাতীত কাল হইতে আজি পর্য্যন্ত ভূগর্ভে শব প্রোথিত করিয়া আসিতেছেন। তবে আজকাল সুসভ্য য়ুরোপের কোন কোন নগরে—বিশেষতঃ ইংলণ্ডে শবদাহ করিবার প্রথা প্রচলিত হইয়াছে। এমন কি ইংরাজদিগের জন্য কলিকাতাতেও শবদাহাগার স্থাপিত হইয়াছে এবং অনেক ইংরাজের শব তাহাতে ভস্ম করা হইয়া থাকে। ভূগর্ভে শব প্রোথিত করা এবং শবদাহ করা, এই উভয় প্রথার মধ্যে কোনটী শ্রেষ্ঠ সে সম্বন্ধে আলোচনা করা আমাদিগের উদ্দেশ্য নহে। তবে এই মাত্র বলিতে পারি যে, উন্নতির উচ্চসোপানে সমারূঢ় সুসভ্য ইংরাজজাতির মধ্যে এতকাল পরে যখন শবদাহ-প্রথা প্রচলিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, তখন সমাধি অপেক্ষা দাহ প্রথাই প্রকৃষ্ট।

এখন দেখা যাউক, এই প্রাচীন আর্য্যভূমিতে সহস্র সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে শব-সংকার সম্বন্ধে কিরূপ প্রথা প্রচলিত ছিল। স্বর্গীয় মোক্ষমূলার প্রভৃতি কতিপয় আর্য্যশাস্ত্রজ্ঞ পাশ্চাত্য পণ্ডিত এবং তাঁহাদিগের এদেশীয় মন্ত্রশিষ্যগণ বলেন যে, পুরাকালে আর্য্যভূমিতে শব ভূগর্ভে প্রোথিত করাও হইত এবং দগ্ধ করাও হইত। কিন্তু এ বিষয়ে আমাদিগের বিষম সন্দেহ আছে। এই সন্দেহ নিরসন জন্য একটু চেষ্টা করা যাউক।

প্রাচীন আর্য্যভূমিতে শব ভূগর্ভে প্রোথিত

করা হইত কি দাহ করা হইত, এ বিষয়ের প্রকৃত তথ্য জানিতে হইলে, জগতের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ বেদের আশ্রয় লইতে হয়, তদ্ব্যতীত আর অন্য সহজ উপায় নাই। আর্য্যশাস্ত্রজ্ঞ ম্যাক্সমুলার প্রভৃতি সেই বেদাবলম্বনেই সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন যে, প্রাচীন ভারতে শবদাহ করা হইত এবং ভূগর্ভে প্রোথিত করাও হইত। আমরাও সেই বেদের আশ্রয় গ্রহণ করিতে অগ্রসর হইলাম।

আমরা সর্ব্বাদৌ ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের ১৮ সূক্তের নিম্নলিখিত চারিটী ঋক্ উদ্ধৃত করা আবশ্যক বোধ করিতেছি—

"উপ সর্প মাতরং ভূমিমেতামুরুব্যচসং
পৃথিবীং সুশেবাং।
ঊর্ণম্রদা যুবতির্দক্ষিণাবত এষা ত্বা
পাতু নির্ঋতেরুপস্থাৎ ॥১০।
উচ্ছ্বঞ্চস্ব পৃথিবী মা নি বাধথাঃ
সূপায়নাস্মৈ ভব সূপবঞ্চনা।
মাতা পুত্রং যথা সিচাভ্যেনং
ভূম ঊর্ণুহি ॥১১।
উচ্ছ্বঞ্চমানা পৃথিবী সু তিষ্ঠতু সহস্রং
মিত উপ হি শ্রয়ন্তাং।
তে গৃহাসো ঘৃতশ্চুতো ভবন্তু
বিশ্বাহাস্মৈ শরণাঃ সন্ত্বত্র ॥১২।
উত্তে স্তভ্নামি পৃথিবীং ত্বৎপরীমং
লোগং নিদধন্মো অহং রিষং।
এতাং স্থূণাং পিতরো ধারয়ন্তু তেঽত্রা
যমঃ সাদনা তে মিনোতু ॥১৩॥"

অর্থ—হে মৃত! এই মাতৃস্বরূপা বিস্তীর্ণা পৃথিবীর নিকট গমন কর। ইনি সর্ব্বব্যাপিনী, ইঁহার মূর্ত্তি সুন্দর, ইনি যুবতী স্ত্রীর ন্যায় তোমার পক্ষে যেন রাশিকৃত মেষ লোমের মত কোমলস্পর্শ হয়েন। তুমি (যজ্ঞে) দক্ষিণা দান করিয়াছ, ইনি যেন নির্ঋতি হইতে তোমাকে রক্ষা করেন।১০।

হে পৃথিবী! এই মৃতকে উন্নত করিয়া রাখ, ইহাকে পীড়া দিও না। ইহাকে উত্তম উত্তম সামগ্রী—উত্তম উত্তম প্রলোভন দাও। যেরূপ মাতা আপনার অঞ্চলের দ্বারা পুত্রকে আচ্ছাদন করে, তদ্রূপ তুমি ইহাকে আচ্ছাদন কর।১১।

পৃথিবীর উপরে স্তূপাকার হইয়া উন্নতরূপে অবস্থিতি করুন। সহস্র ধূলি এই মৃতের উপর অবস্থিতি করুক। তাহারা ইহার পক্ষে ঘৃতপূর্ণ গৃহস্বরূপ হউক। প্রতিদিন এই স্থানে তাহারা ইহার আশ্রয়স্থান স্বরূপ হউক।১২

তোমার উপর পৃথিবীকে উত্তম্ভিত করিয়া রাখিতেছি; তোমার উপরে এই একটী লোষ্ট্র অর্পণ করিতেছি, তাহাতে মৃত্তিকা তোমার মধ্যে প্রবেশ করিয়া তোমাকে নষ্ট করিতে পারিবে না। এই স্থূণা (খুঁটী) পিতৃগণ ধারণ করুন। যম এই স্থানে তোমার বাসস্থান নির্দ্দেশ করুন।১৩

উপরে আমরা যে চারিটী ঋক উদ্ধৃত করিলাম, তাহা পাঠ করিয়া আমাদিগের মনে সহসা কি উদয় হয়? অবশ্যই এই ঋক্চতুষ্টয় শব প্রোথিত করিবার মন্ত্র বলিয়া বোধ হয়। ঋকগুলির মধ্যে স্পষ্টই পৃথিবীগর্ভে প্রোথিত করিবার কথা রহিয়াছে। প্রোথিত করিবার পর তদুপরি লোষ্ট্র নিক্ষেপ এবং শেষ একটী খুঁটী প্রোথিত করা হইত, ইহা স্পষ্টই জানা যাইতেছে। অতএব আমরা সহজেই সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে, এই বেদের প্রমাণে জানা যাইতেছে যে, পুরাকালে আর্য্যভূমিতে শব প্রোথিত করিবার প্রথা প্রচলিত ছিল। এই ঋক চতুষ্টয় অবলম্বন করিয়াই পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ স্থিরনিশ্চয় করিলেন যে, প্রাচীন আর্য্যভূমিতে শব প্রোথিত করা হইত। কিন্তু আমরা বলি যে, এই সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ ভ্রান্ত।

অনেক মনীষী ঋগ্বেদের ভাষ্য করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদিগের মধ্যে সায়ণাচার্য্য প্রধান। সায়ণাচার্য্যের ভাষ্যই এক্ষণে সর্ব্বাপেক্ষা আদরণীয় এবং সায়ণাচার্য্যের ভাষ্য অবলম্বন করিয়াই পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ জার্ম্মান ও ইংরাজি প্রভৃতি ভাষায় ঋগ্বেদ অনুবাদ করিয়াছেন। সেই সায়ণাচার্য্য উক্ত ১৮ সূক্তের ভাষ্য স্থলে বলিয়াছেন যে, শবদাহ করার পর অস্থি সঞ্চয় করা হইত। যে সকল অস্থি ভস্ম হইত না, সেই গুলি একটি ক্ষুদ্র মৃৎপাত্রে সঞ্চয় করিয়া, সেই পাত্রটি নদী বা বাপী-তীরে ভূগর্ভে প্রোথিত করা হইত। পরে সেই পাত্রের উপর লোষ্ট্র খণ্ড অর্পণ করিয়া তদুপরি মৃত্তিকা স্থাপন এবং সর্ব্বশেষে সেই স্থানের উপর একটী স্থূণা প্রোথিত করা হইত। সায়ণের এই ব্যাখ্যাই অভ্রান্ত, আমাদিগের এমত ধারণা। তবে যাঁহারা সায়ণাচার্য্যকে ভ্রান্ত এবং পাশ্চাত্য সংস্কৃত ভাষাভিজ্ঞদিগকে অভ্রান্ত বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছেন, তাঁহাদিগের সেই বিশ্বাসকে বিচলিত করা আমাদিগের প্রয়োজন নাই। কিন্তু পাঠকগণকে বলিয়া রাখি যে, আমরা আর একটু অগ্রসর হইলে স্পষ্টই জানিতে পারিব যে, সায়ণের ব্যাখ্যাই সম্পূর্ণ অভ্রান্ত।

প্রাচীন ভারতে যে শব প্রোথিত করিবার প্রথা প্রচলিত ছিল, ঋগ্বেদের কুত্রাপি তাহার স্পষ্ট উল্লেখ নাই, সুতরাং আমরা এ স্থলে নিশ্চিত স্থির করিতে পারি যে, স্মরণাতীত-কাল পূর্ব্বে আর্য্যভূমিতে শব সমাধিস্থ করিবার প্রথা ছিল না। কিরূপ প্রথা প্রচলিত ছিল, এক্ষণে তাহার অনুসন্ধান করা যাউক।

এক্ষণে ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের ১৪শ সূক্তটি উদ্ধৃত করা আবশ্যক বোধ

"পরেয়িবাংসং প্রবতো মহীরনু বহুভ্যঃ পন্থামনুপস্পশানং।
বৈবস্বতং সংগমনং জনানাং যমং রাজানং হবিষা দুবস্য ॥১।
যমো নো গাতুং প্রথমো বিবেদ নৈষা গব্যূতিরপভর্ত্তবা উ।
যত্রা নঃ পূর্ব্বে পিতরঃ পরেয়ুরেনা যজ্ঞানাঃ পথ্যা অনু স্বাঃ ॥২।
মাতলী কব্যৈর্যমো অংগিরোভির্বৃহস্পতি-র্ঋক্বভির্বাবৃধানঃ।
যাংশ্চ দেবা বাবৃধুর্যে চ দেবান্ত্স্বাহান্যে স্বধয়ান্যে মদংতি ॥৩।
ইমং যম প্রস্তরমা হি সীদাংগিরোভিঃ পিতৃভিঃ সংবিদানঃ।
আ ত্বা মংত্রাঃ কবিশস্তা বহংত্বেনা রাজন্‌হবিষা মাদয়স্ব ॥৪।
অংগিরোভিরা গহি যজ্ঞিয়েভির্যম বৈরূপৈরিহ মাদয়স্ব।
বিবস্বংতং হুবে যঃ পিতা তেঽস্মিন্‌যজ্ঞে বর্হিষ্যা নিষদ্য ॥ ৫।
অংগিরসো নঃ পিতরো নবগ্বা অথর্বাণো ভৃগবঃ সোম্যাসঃ।
তেষাং বয়ং সুমতৌ যজ্ঞিয়ানামপি ভদ্রে সৌমনসে স্যাম ॥ ৬।
প্রেহি প্রেহি পথিভিঃ পূর্ব্ব্যেভির্যত্রা নঃ পূর্ব্বে পিতরঃ পরেয়ুঃ।
উভা রাজানা স্বধয়া মদংতা যমং পশ্যাসি বরুণং চ দেবং ॥ ৭।
সং গচ্ছস্ব পিতৃভিঃ সং যমেনেষ্টা-পূর্ত্তেন পরমে ব্যোমন্‌।
হিত্বায়াবদ্যং পুনরস্তমেহি সং গচ্ছস্ব তন্বা সুবর্চাঃ ॥ ৮।
অপেত বীত বি চ সর্পতাতোঽস্মা এতং পিতরো লোকমক্রন্‌।
অহোভিরদ্ভিরক্তুভির্ব্যক্তং যমো

অঙ্গিরোভির্যজ্ঞিয়ৈরা গহি
অতি দ্রব সারমেয়ৌ শ্বানৌ
চতুরক্ষৌ শবলৌ সাধুনা পথা।
অথা পিতৄন্ত্সুবিদত্রাঁ উপেহি
যমেন যে সধমাদং মদংতি ॥ ১০।
যৌ তে শ্বানৌ যম রক্ষিতারৌ
চতুরক্ষৌ পথিরক্ষী নৃচক্ষসৌ।
তাভ্যামেনং পরি দেহি রাজন্ত্স্বস্তি
চাস্মা অনমীবং চ ধেহি ॥ ১১।
উরূণসাবসুতৃপা উদুংবলৌ যমস্য
দূতৌ চরতো জনাঁ অনু।
তাবস্মভ্যং দৃশয়ে সূর্যায়
পুনর্দাতামসুমদ্যেহ ভদ্রং ॥ ১২।
যমায় সোমং সুনুত
যমায় জুহুতা হবিঃ।
যমং হ যজ্ঞো গচ্ছত্যগ্নিদূতো
অরংকৃত ॥ ১৩।
যমায় ঘৃতবদ্ধবির্জুহোত
প্র চ তিষ্ঠত।
স নো দেবেষ্বা যমদ্দীর্ঘমায়ুঃ
প্র জীবসে ॥ ১৪।
যমায় মধুমত্তমং রাজ্ঞে
হব্যং জুহোতন।
ইদং নম ঋষিভ্যঃ পূর্বজেভ্যঃ
পূর্বেভ্যঃ পথিকৃদ্ভ্যঃ ॥ ১৫।
ত্রিকদ্রুকেভিঃ পততি
ষলুর্বীরেকমিদ্বৃহৎ।
ত্রিষ্টুব্‌গায়ত্রী ছংদাংসি
সর্বা তা যম আহিতা ॥ ১৬।

অর্থ।

হে অন্তঃকরণ! তুমি বিবস্বানের পুত্র যমকে হোমের দ্রব্য দিয়া সেবা কর। তিনি সৎকর্ম্মান্বিত ব্যক্তিদিগকে সুখের দেশে লইয়া যান। তিনি অনেকের পথ পরিষ্কার করিয়া দেন, তাঁহার নিকটেই সকল লোকে গমন করে। ১।

আমরা কোন্ পথে যাইব, তাহা যমই প্রথমে দেখাইয়া দেন। সেই পথ আর বিনষ্ট হইবে না। যে পথে আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ গিয়াছেন, সকল জীবই নিজ নিজ কর্ম্ম অনুসারে সেই পথে যাইবেন। ২।

মাতলির প্রভু ইন্দ্র কব্য নামক পিতৃলোকের সাহায্যে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়েন। যম অঙ্গিরাদিগের সাহায্যে (এবং বৃহস্পতি ঋক নামক ব্যক্তিদিগের সাহায্যে) বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়েন। যাহারা দেবতাদিগের সংবর্দ্ধনা করে, এবং যাহাদিগকে দেবতাগণ সংবর্দ্ধনা করেন, সকলেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েন। কেহ স্বাহা দ্বারা কেহ বা স্বধা দ্বারা আনন্দিত হয়েন। ৩।

হে যম! এই আরব্ধ যজ্ঞে আসিয়া উপবেশন কর, তুমি এই যজ্ঞ জান, তোমার সঙ্গে অঙ্গিরা নামক পিতৃলোকদিগকে লইয়া আইস। তোমার উদ্দেশে কবিদিগের মুখোচ্চারিত মন্ত্র সকল চলিতে থাকুক। হে রাজন্! এই হোমের দ্রব্য গ্রহণ পূর্ব্বক আমোদ কর। ৪।

হে যম! নানা মূর্ত্তিধারী অঙ্গিরা নামক যজ্ঞভোক্তা পিতৃলোকদিগের সহিত আসিয়া এই স্থানে আমোদ কর। তোমার যে পিতা বিবস্বৎ তাঁহাকেও আহ্বান করিতেছি। এই যজ্ঞে আসিয়া কুশের উপর উপবেশন কর। ৫।

অঙ্গিরা নামক অথর্ব্ব নামক এবং ভৃগু নামক আমাদিগের পিতৃলোকগণ এই মাত্র আসিয়াছেন। তাঁহারা সোমরস পাইবার অধিকারী। সেই যজ্ঞভোক্তা পিতৃলোকগণ যেন আমাদিগের শুভানুষ্ঠান করেন, যেন আমরা তাঁহাদিগের প্রসন্নতা লাভ করিয়া কল্যাণভাগী হই। ৬।

আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ যে পথ দিয়া যে স্থানে গিয়াছেন, তুমিও (মৃত) সেই স্থানে গমন কর। সেই যে দুই রাজা যম

এবং বরুণ, যাঁহারা স্বধা প্রাপ্ত হইয়া আনন্দ করিতেছেন, তাঁহাদিগকে যাইয়া দর্শন কর। ৭।

সেই চমৎকার স্বর্গধামে পিতৃলোকদিগের সহিত মিলিত হও। যমের সহিত ও তোমার ধর্ম্মানুষ্ঠানের ফলের সহিত মিলিত হও। পাপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অস্ত (নামক গৃহে) প্রবেশ কর এবং উজ্জ্বল দেহ ধারণ কর। ৮।

দূর হও, চলিয়া যাও, সরিয়া যাও, সরিয়া যাও, পিতৃলোকেরা তাঁহার (মৃতের) জন্য এই স্থান প্রস্তুত করিয়াছেন। এই স্থান দিবা দ্বারা, জল দ্বারা ও আলোক দ্বারা শোভিত; যম এই স্থান মৃত ব্যক্তিকে দিয়া থাকেন। ৯।

হে মৃত! এই যে দুই কুকুর, যাহাদিগের চারি চক্ষু এবং বর্ণ বিচিত্র, ইহাদিগের নিকট দিয়া শীঘ্র চলিয়া যাও। তৎপরে যে সকল সুবিজ্ঞ পিতৃলোক, যমের সহিত সর্ব্বদা আমোদ আহ্লাদে কালক্ষেপ করেন, তুমি উত্তম পথ দিয়া তাঁহাদের নিকট গমন কর। ১০।

হে যম! তোমার প্রহরীস্বরূপ যে দুই কুকুর আছে, যাহাদিগের চারি চক্ষু, যাহারা পথ রক্ষা করে, এবং যাহাদিগের দৃষ্টিপথে সকল মনুষ্যকেই পতিত হইতে হয়, তাহাদিগের কোপ হইতে এই মৃত ব্যক্তিকে রক্ষা কর। হে রাজন্! ইহাকে কল্যাণ-ভাগী ও অরোগী কর। ১১।

সেই যে দুই যমদূত, যাহাদিগের বৃহৎ বৃহৎ নাসিকা, যাহারা অসু ভক্ষণ করিয়া তৃপ্ত হয়, এবং সকল ব্যক্তির পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়া থাকে, তাহারা যেন আমাদিগকে অদ্য এই স্থানে বল ও মঙ্গল প্রদান করে। যেন আমরা সূর্য্যের দর্শন পাই। ১২।

যমের জন্য সোম প্রস্তুত কর। যমের জন্য হোমের দ্রব্যে হোম কর। এই যে যজ্ঞ, অগ্নি যাহার দূত হইতেছেন এবং যাহাকে নানা সজ্জায় সুশোভিত করা হইয়াছে, এই যজ্ঞ যমের দিকেই যাইয়া থাকে। ১৩।

যমের সেবা কর, ঘৃতযুক্ত হোমের দ্রব্যে তাঁহার জন্য হোম কর। দেবতাদিগের মধ্যে যম যেন বহুকাল বাঁচিয়া থাকিবার জন্য আমাদিগকে দীর্ঘ পরমায়ু প্রদান করেন। ১৪।

যম রাজার উদ্দেশে অদ্য মিষ্ট হোমের দ্রব্যে হোম কর। পূর্ব্বকালের যে সকল ঋষি আমাদিগের অগ্রে জন্মগ্রহণ করিয়া ধর্ম্মের পথ দেখাইয়া গিয়াছেন, তাঁহাদিগকে নমস্কার করি। ১৫।

যম, ত্রিকদ্রুক নামক যজ্ঞ পাইয়া থাকেন, তিনি ছয় স্থানে এবং এক বৃহৎ জগতে গতিবিধি করেন। ত্রিষ্টুব, গায়ত্রী প্রভৃতি সকল ছন্দই যমের জন্য প্রয়োগ করা হয়। ১৬।

উপরে উদ্ধৃত ১৪শ সূক্তটী আমাদিগের চক্ষের সমক্ষে অনেকগুলি সত্য, তথ্য এবং প্রমাণ উপস্থিত করিয়া দিতেছে। এই সূক্তটীর প্রধানতঃ দেবতা যম, ঋষিও যম। ইহা যে, সৎকারসম্বন্ধীয় তাহা সহজেই বুঝা যাইতেছে। এতৎপাঠে আমরা আরও অনেক কথা জানিতে পারিতেছি।

যম, মৃত্যুপতি, এবং সকল মানবই মৃত্যুর পর যমের নিকট গিয়া থাকে ও যমই সৎকর্ম্মশালী ব্যক্তিদিগকে সুখের দেশে—স্বর্গে লইয়া যান, স্মরণাতীত কাল পূর্ব্বে আর্য্য ঋষিগণ ইহা স্থির করিয়াছিলেন। দুইটী ভীমদর্শন কুকুর যমের প্রহরী বা দূতস্বরূপ আছে। ৯ম ঋকটী বলিয়া দিতেছে যে, শ্মশানে শব আনীত হইলে, তথা হইতে ভূতপ্রেতদিগকে অপসারিত করিবার জন্য উক্ত মন্ত্র পঠিত হইত। উক্ত

১৪শ সূক্তটী পাঠ করিয়া আমরা জানিতে পারিলাম যে, পূর্ব্বে শব শ্মশানে আনীত হইলে, ত্রিকক্রক নামক যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া উক্ত মন্ত্রগুলি পাঠপূর্ব্বক মৃত্যুপতি যমকে সোমপান করাইয়া তাঁহার নিকট উক্ত প্রকার প্রার্থনা করা হইত এবং পিতৃলোক-গণকেও আহ্বান করিয়া হোমের দ্রব্য উপহার দেওয়া হইত। কিন্তু শব প্রোথিত করা হইত কি দাহ করা হইত, উক্ত সূক্তটী তাহা বলিয়া দিতেছে না। এখন ১০ম মণ্ডলের ১৬শ সূক্তটী উদ্ধৃত করা যাউক,—

"মৈনমগ্নে বি দহো মাভি শোচো মাস্য
ত্বচং চিক্ষিপো মা শরীরং।
যদা শৃতং কৃণবো জাতবেদোঽথেমেনং
প্র হিণুতাৎ পিতৃভ্যঃ। ১।
শৃতং যদা করসি জাতবেদোঽথেমেনং
পরি দত্তাৎ পিতৃভ্যঃ।
যদা গচ্ছাত্যসুনীতিমেতামথা
দেবানাং বশনীর্ভবাতি ॥২।
সূর্য্যং চক্ষুর্গচ্ছতু বাতমাত্মা দ্যাং
চ গচ্ছ পৃথিবীং চ ধর্ম্মণা।
অপো বা গচ্ছ যদি তত্র তে
হিতমোষধীষু প্রতি তিষ্ঠা শরীরৈঃ ॥৩।
অজো ভাগস্তপসা তং তপস্ব তং তে
শোচিস্তপতু তং তে অর্চিঃ।
যাস্তে শিবাস্তন্বো জাতবেদাস্তাভি-
র্বহৈনং সুকৃতামু লোকং ॥৪।
অব সৃজ পুনরগ্নে পিতৃভ্যো
যস্ত আহুতশ্চরতি স্বধাভিঃ।
আয়ুর্বসান উপ বেতু শেষঃ সং
গচ্ছতাং তন্বা জাতবেদঃ ॥৫।
যত্তে কৃষ্ণঃ শকুন আতুতোদ
পিপীলঃ সর্প উত বা শ্বাপদঃ।
অগ্নিষ্টদ্বিশ্বাদগদং কৃণোতু সোমশ্চ
যো ব্রাহ্মণাঁ আবিবেশ ॥৬।
অগ্নের্বর্ম্ম পরি গোভির্ব্যয়স্ব সং
প্রোর্ণুষ্ব পীবসা মেদসা চ।
নেত্বা ধৃষ্ণুর্হরসা জর্হৃষাণো
দধৃগ্বিধক্ষ্যন্পর্য্যঙ্খয়াতে ॥৭
ইমমগ্নে চমসং মা বি জিহ্বরঃ
প্রিয়ো দেবানামুত সোম্যানাং।
এষ যশ্চমসো দেবপানস্তস্মিন্দেবা
অমৃতা মাদয়ন্তে। ৮।
ক্রব্যাদমগ্নিং প্র হিণোমি দূরং
যমরাজ্ঞো গচ্ছতু রিপ্রবাহঃ।
ইহৈবায়মিতরো জাতবেদা দেবেভ্যো
হব্যং বহতু প্রজানন্ ॥৯।
যো অগ্নিঃ ক্রব্যাৎ প্রবিবেশ বো
গৃহমিমং পশ্যন্নিতরং জাতবেদসং।
তং হরামি পিতৃযজ্ঞায় দেবং স
ঘর্ম্মমিন্বাৎপরমে সধস্থে ॥১০।
যো অগ্নিঃ ক্রব্যবাহনঃ পিতৄন্যক্ষদৃতাবৃধঃ।
প্রেদু হব্যানি বোচতি দেবেভ্যশ্চ
পিতৃভ্য আ ॥১১।
উশন্তস্ত্বা নি ধীমহ্যুশন্তঃ
সমিধীমহি।
উশন্নুশত আ বহ পিতৄন্
হবিষে অত্তবে ॥১২।
যং ত্বমগ্নে সমদহস্তমু
নির্বাপয়া পুনঃ।
কিয়াংম্বত্র রোহতু
পাকদূর্ব্বা ব্যল্কশা ॥১৩।
শীতিকে শীতিকাবতি
হ্লাদিকে হ্লাদিকাবতি।
মণ্ডূক্যা সু সং গম
ইমং সগ্নিং হর্ষয়ঃ ॥১৪।

এক্ষণে এই উদ্ধৃত সূক্তের অর্থানুসারে আমাদিগের লক্ষ্য বিষয়ের অনুসন্ধান করা যাউক। প্রথম ঋকের অর্থ—

হে অগ্নি! এই মৃতব্যক্তিকে একেবারে ভস্ম করিও না, ইহাকে ক্লেশ দিও না, ইহার চর্ম্ম বা শরীর ছিন্ন ভিন্ন করিও না।

হে জাতবেদা! যখন ইহার শরীর তোমার তাপে উত্তমরূপে পক্ক হইবে, তখন ইহাকে পিতৃলোকের নিকট পাঠাইয়া দেও।

দ্বিতীয় ঋকটার অর্থ—

হে অগ্নি! যখন ইঁহার শরীর উত্তমরূপ পক্ক করিবে, তখনই পিতৃলোকদিগের নিকট ইঁহাকে দিবে। যখন ইঁনি পুনর্ব্বার সজীবত্ব প্রাপ্ত হইবেন, তখন দেবতাদিগের বশতাপন্ন হইবেন।

উক্ত দুইটী ঋকের দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, মৃতব্যক্তিকে অগ্নিতে দাহ করা হইত। এই মন্ত্র দ্বারা আর একটী কথা জানিতে পারিলাম যে, অগ্নি দ্বারা মৃতের দেহ পক্ক হইলে, মৃতব্যক্তি পুনরায় সজীবতা লাভ করিয়া দেবতাদিগের বশতাপন্ন হইতেন।

তৃতীয় ঋকের অর্থ—

হে মৃত! তোমার চক্ষু সূর্য্যে গমন করুক, তোমার শ্বাস বায়ুতে যাউক। তুমি তোমার পুণ্যফলে আকাশে ও পৃথিবীতে যাও, অথবা যদি জলে যাইলে তোমার হিত হয়, তবে জলে যাও। তোমার শরীরের অবয়বগুলি উদ্ভিজ্জ বর্গের মধ্যে যাইয়া অবস্থিতি করুক।

মনুষ্যের দেহ পঞ্চভূতে গঠিত; দেহের পাঁচটী অংশ সেই পঞ্চভূতে বিলীন হউক, তৃতীয় ঋকটী ইহাই মৃতকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছে।

চতুর্থ ও পঞ্চম ঋকের অর্থ—

এই মৃতব্যক্তির যে অংশ অজ অর্থাৎ জন্মরহিত, যাহা চিরকালই আছে, হে অগ্নি! তুমি সেই অংশকে তোমার তাপদ্বারা উত্তপ্ত কর, তোমার ঔজ্জ্বল্য, তোমার শিখা, সেই অংশকে উত্তপ্ত করুক। হে জাতবেদা বহ্নি! তোমার যে সকল মঙ্গলময়ী মূর্ত্তি পুণ্যবান লোকদিগের ভবনে বহন করিয়া লইয়া যাও। ৪।

হে অগ্নি! যে তোমার আহুতি স্বরূপ হইয়া যজ্ঞের দ্রব্য ভোজন করিয়া আসিতেছে, সেই মৃতকে পিতৃলোকদিগের নিকট প্রেরণ কর। ইহার যাহা অবশিষ্ট আছে, তাহা জীবন প্রাপ্ত হইয়া উত্থিত হউক। হে জাতবেদা! সে পুনর্ব্বার জীবন লাভ করুক। ৫।

চতুর্থ ঋকের প্রথমেই মৃতব্যক্তির আত্মা সম্বন্ধেই বলা হইয়াছে, ইহা সুধীবর্গ সহজেই বুঝিতে পারিতেছেন। পঞ্চম ঋকে জানা যাইতেছে যে, মৃতব্যক্তি পিতৃলোকে গমন করিয়া থাকে।

৬ষ্ঠ ও ৭ম ঋক মৃত ব্যক্তিকে সম্বোধন করিয়া পঠিত হইত,—

হে মৃত! কৃষ্ণকায় পক্ষী (কাক) তোমার শরীরের যে অংশে ব্যথা দিয়াছে, কিম্বা পিপীলিকা বা সর্প, বা হিংস্র জন্তু যে অংশে ব্যথা দিয়াছে, এই সর্ব্বভক্ষণকারী অগ্নি তাহা নীরোগ করুন। আর সোম, যিনি ব্রাহ্মণদিগের শরীরে প্রবেশ করিয়াছেন, তিনিও তাহা নীরোগ করুন। ৬।

হে মৃত! তুমি গোচর্ম্মের সহিত অগ্নি শিখাস্বরূপ কবচ ধারণ কর, তোমার প্রচুর মেদের দ্বারা তুমি আচ্ছাদিত হও, তাহা হইলে, এই যে দুর্দ্ধর্ষ অগ্নি, যিনি বলপূর্ব্বক ও অহঙ্কারের সহিত তোমাকে দগ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, তিনি একেবারে তোমার সর্ব্বাংশে ব্যাপ্ত হইতে পারিবেন না। ৭।

সপ্তম ঋকে যে গোচর্ম্মের উল্লেখ দেখা যাইতেছে, ইহার অর্থ সহসা বুঝা যায় না। কিন্তু পূর্ব্বে শবের উপর গোচর্ম্ম দেওয়া হইত। আমরা ইহা অনুমান করিয়া বলিতেছি না, পাঠকগণ আর একটু অগ্রসর

অষ্টম ঋকের অর্থ,—

হে অগ্নি! এই শবকে বিচলিত করিও না, ইহা সোমপানকারী দেবতাদিগের প্রীতি উৎপাদন করে। এই যে দেবতাদিগের পান করিবার জন্য চমস রহিয়াছে, ইহা দর্শন করিয়া অমর দেবতাগণ আহ্লাদিত হয়েন।৮।

অষ্টম ঋকে যে চমসের উল্লেখ দেখা যাইতেছে, মৃতব্যক্তি আজীবন যজ্ঞে ও হোমে যে চমস ব্যবহার করিতেন, ইহা সেই চমস। তখন শবের সহিত এই চমস দেওয়া হইত। ইহার প্রমাণ পাঠকগণ আর একটু পরেই প্রাপ্ত হইবেন।

নবম হইতে দ্বাদশ ঋক্কের অর্থ নিম্নে বিবৃত হইল,—

মাংসভোজনকারী এই অগ্নিকে আমি দূরে অপসারিত করি, ইহা অশুদ্ধ বস্তু বহন করিতেছে। যম যাহাদিগের রাজা, এই অগ্নি তাহাদিগের নিকট গমন করুক। আর এই স্থানেই আর এক অগ্নি রহিয়াছেন, ইনিই বিবেচনা পূর্ব্বক দেবতাদিগের নিকট হোমের দ্রব্য বহন করুন।৯।

এই যে, মাংসভোজনকারী অগ্নি (চিতার অগ্নি) তোমাদিগের গৃহে প্রবেশ করিয়াছে, তাহাকে আমি অপসারিত করি, আর এই দ্বিতীয় জাতবেদা অগ্নিকে আমি পিতৃলোকের উদ্দেশে যজ্ঞ দিবার জন্য গ্রহণ করিতেছি। ইনিই পরমধামে যজ্ঞ লইয়া গমন করুন ১০।

যে অগ্নি শ্রাদ্ধের দ্রব্য বহন করেন, এবং যজ্ঞের উন্নতি সাধন করেন, তিনি দেবতা দিগকে এবং পিতৃলোকদিগকে আরাধনা করেন, তিনি দেবতাদিগের এবং পিতৃলোক দিগের নিকট হোমের দ্রব্য নিবেদন করিয়া দেন।১১।

হে অগ্নি! যত্নপূর্ব্বক তোমাকে সংস্থাপন করিতেছি। যজ্ঞকামনাকারী দেবতাগণ এবং পিতৃলোকদিগের নিকট তুমি যত্নপূর্ব্বক হোমের দ্রব্য তাঁহারা ভোজন করিবেন বলিয়া বহন কর।

উক্ত ৪টী ঋক পাঠে বিশদরূপেই জানা যাইতেছে যে, পূর্ব্বে শবসংকারকালে আর্য্যগণ যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া যম, দেবগণ ও পিতৃলোকদিগকে হোমের দ্রব্যে আহুতি প্রদান করিতেন।

ত্রয়োদশ এবং চতুর্দ্দশ ঋক দুইটী শব সংকারের শেষ মন্ত্র। অর্থ যথা—

হে অগ্নি! তুমি যাহাকে দাহ করিলে, পুনর্ব্বার তাহাকে নির্ব্বাপিত কর। কিঞ্চিৎ জল এই স্থানে উপস্থিত হউক, এবং শাখা প্রশাখাযুক্ত পরিণত দূর্ব্বা এই স্থানে উৎপন্ন হউক।১৩।

হে পৃথিবী! তুমি শীতল, তোমাতে অনেক শীতল উদ্ভিজ্জ আছে। তুমি আহ্লাদ কারিণী, তোমাতে অনেক আহ্লাদকারী উদ্ভিজ্জ আছে। ভেকী যাহাতে সন্তুষ্ট হয়, সেই বৃষ্টি আনয়ন কর, আর এই অগ্নিকে সন্তুষ্ট কর।১৪।

প্রাচীন ভারতের শব-সংকার সম্বন্ধে আমরা অনেক তথ্যই জানিতে পারিলাম। এক্ষণে ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের ১৮শ সূক্তের আর কয়েকটী ঋক এ স্থলে উদ্ধৃত করা আবশ্যক হইতেছে,—

"পরং মৃত্যো অনু পরেহি পংথাং
যস্তে স্ব ইতরো দেবযানাৎ।
চক্ষুষ্মতে শৃণ্বতে তে ব্রবীমি মা নঃ
প্রজাং রীরিষো মোত বীরান্॥ ১।
মৃত্যোঃ পদং যোপয়ংতো যদৈত
দ্রাঘীয় আয়ুঃ প্রতরং দধানাঃ।
আপ্যায়মানাঃ প্রজয়া ধনেন
শুদ্ধাঃ পূতা ভবত যজ্ঞিয়াসঃ। ২॥

দেবহূতির্নো অদ্য।
প্রাংচো অগাম নৃতয়ে হসায়
দ্রাঘীয় আয়ুঃ প্রতরং দধানাঃ ॥ ৩
ইমং জীবেভ্যঃ পরিধিং দধামি
মৈষাং নু গাদপরো অর্থমেতং।
শতং জীবংতু শরদঃ পুরূচীরং-
তর্মৃত্যুং দধতাং পর্বতেন ॥ ৪।
যথাহান্যনুপূর্বং ভবংতি যথা
ঋতব ঋতুভির্যংতি সাধু।
যথা ন পূর্বমপরো জহাত্যেবা
ধাতরায়ূংষি কল্পয়ৈষাং ॥ ৫।
আ রোহতায়ুর্জরসং বৃণানা
অনুপূর্বং যতমানা যতি ষ্ট।
ইহ ত্বষ্টা সুজনিমা সজোষা
দীর্ঘমায়ুঃ করোতি জীবনে বঃ ॥ ৬।
ইমা নারীরবিধবাঃ সুপত্নীরাংজনেন
সর্পিষা সংবিশংতু।
অনশ্রবোহনমীবাঃ সুরত্না
আরোহংতু জনয়ো যোনিমগ্রে ॥ ৭।
উদীর্ষ্ব নার্যভি জীবলোকং
গতাসুমেতমুপ শেষ এহি।
হস্তগ্রাভস্য দিধিষোস্তবেদং
পত্যুর্জনিত্বমভি সং বভূথ ॥ ৮।
ধনুর্হস্তাদাদদানো মৃতস্যাস্মে
ক্ষত্রায় বর্চসে বলায়।
অত্রৈব ত্বমিহ বয়ং সুবীরা
বিশ্বা স্পৃধো অভিমাতীর্জয়েম ॥ ৯।”

হে মৃত্যু! তুমি আর এক পথে ফিরিয়া যাও, দেবলোকে যাইবার যে পথ, তাহা ত্যাগ করিয়া অন্যপথে যাও। তোমার চক্ষু আছে, তুমি শুনিতে পাও, সেই নিমিত্ত তোমাকে কহিতেছি। আমাদিগের সন্তান সন্ততি বা লোকজনকে হিংসা করিও না।১।

তোমরা মৃত্যুর পথ ছাড়িয়া যাও, তাহা হইলে উৎকৃষ্ট ও অতি দীর্ঘ আয়ু প্রাপ্ত হইবে; তোমাদিগের গৃহ, সন্তানসন্ততি ও ধনে পরিপূর্ণ হইবে। তোমরা শুদ্ধ ও পবিত্র যজ্ঞানুষ্ঠানকারী হও। ২।

এই সকল ব্যক্তি জীবিত আছে, ইহারা মৃতদিগের নিকট প্রত্যাগমন করিয়াছে, আমাদিগের যজ্ঞ অদ্য কল্যাণকর হইয়াছে। আমরা প্রকৃষ্টরূপে নৃত্য ও হাস্য করিতে থাকি, আমরা উৎকৃষ্ট ও অতি দীর্ঘ আয়ু প্রাপ্ত হইয়াছি। ৩।

যাহারা জীবিত আছে, তাহাদিগের চতুর্দ্দিকে এই বেষ্টন দিতেছি, ইহাতে মৃত্যুকে রোধ করা যাইবে। ইহাদিগের মধ্যে আর কেহ যেন এই অবস্থা অর্থাৎ মৃত্যু প্রাপ্ত না হয়। ইহারা শতবর্ষ জীবিত থাকুক, মৃত্যু যেন এই পর্ব্বতের দ্বারা রুদ্ধ হইয়া নিকটে না আসিতে পারে। ৪।

যেরূপ পরে পরে দিন সকল যায়, যেরূপ ঋতুর পর ঋতু অবাধে চলিয়া যায়, যেমন যে শেষে আসিয়াছে, সে অগ্রে যায় না, হে বিধাতঃ! ইঁহাদিগের আয়ুর ব্যবস্থা এইমত কর। ৫।

তোমরা জরা দ্বারা আচ্ছন্ন হও, দীর্ঘ পরমায়ুর উঁপর আরোহণ কর। জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠের নিয়মে অগ্রপশ্চাৎ হইয়া তোমরা কর্ম্মকার্য্য কর। এই স্থানে সুজন্মা ত্বষ্টাদেব তোমাদিগের সহিত একত্র হইয়া তোমাদিগের দীর্ঘ আয়ু করিয়া দিতেছেন। তাহা হইলেই তোমরা জীবিত থাকিবে। ৬।

এই সকল সধবা স্ত্রীলোক, যাঁহারা সাধ্বীপত্নী, তাঁহারা অঞ্জনজনক ঘৃত চক্ষে দিয়া প্রবেশ করুন। তাঁহাদিগের চক্ষে জল নাই, মনে দুঃখ নাই, সেই সকল রত্নভূষিতা নারী সর্ব্বাগ্রে গৃহে আগমন করুন। ৭।

হে নারি! সংসারের দিকে ফিরিয়া চল, গাত্রোত্থান কর। তুমি যাহার নিকট শয়ন

করিয়াছ, সে গতাসু অর্থাৎ মৃত হইয়াছে। চলিয়া এস। যিনি তোমার পাণিগ্রহণ করিয়া গর্ভাধান করিয়াছিলেন, সেই পতির পত্নী হইয়া যাহা কিছু কর্ত্তব্য ছিল, সকলই তোমার করা হইয়াছে ৮।

মৃত ব্যক্তির হস্ত হইতে ধনু গ্রহণ করিলাম, ইহাতে আমাদিগের তেজ ও বল লাভ হইবে। হে মৃত! তুমি এই স্থানেই অর্থাৎ শ্মশানে থাক; আমরা অনেক বীর পুরুষের সহিত একত্র হইয়া, যাবতীয় স্পর্দ্ধাকারী শত্রুকে যেন জয় করিতে পারি ৯।

উপরে যে ৯টী ঋক উদ্ধৃত হইল, উহা যে শব-সংকার সম্বন্ধীয় পাঠকগণ তাহা সহজেই বুঝিতে পারিলেন। ৭ম ও ৮ম ঋকটী নূতন তথ্য প্রকাশ করিয়া দিতেছে। পুরাকালে স্ত্রীলোকগণও যে শ্মশানে গমন করিতেন, ৭ম ঋক পাঠে তাহা স্পষ্টই জানা যাইতেছে। আর ৮ম ঋক পাঠে বুঝা যাইতেছে যে, মৃতব্যক্তির স্ত্রী স্বামীর শব দেহের পার্শ্বে শয়ন করিতেন এবং তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া তুলিয়া আনা হইত। এরূপ করিবার কারণ অনুসন্ধান করিতে যাইলে, সহজেই অনুমান হয় যে, স্ত্রী, মৃত পতির পার্শ্বে যখন শয়ন করিতেন, তখন অবশ্যই ইহা সহমরণের আভাস দিতেছে। স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য রঘুনন্দন, এই ৭ম ঋকটী উদ্ধৃত করিয়া, সহমরণের মন্ত্ররূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু এস্থলে একটী গোল উপস্থিত। ৭ম ঋকে লিখিত আছে,—"আরোহন্তু জনয়ো যোনিমগ্রে", কিন্তু রঘুনন্দন, "আরোহন্তু জনয়ো যোনিমগ্নে" উদ্ধৃত করিয়াছেন। "অগ্রে" এবং "অগ্নে" এই দুইটী শব্দের অর্থ সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এইজন্য কেহ কেহ রঘুনন্দনকে জালিয়াৎ বলিয়াছেন। আমরা প্রবন্ধান্তরে এ বিষয়ের আলোচনা করিব।

বেদের পরই কল্পসূত্রগুলি আমাদিগের অবলম্বনীয়। কল্পসূত্রের সংখ্যা অনেক সুতরাং সকল কল্পসূত্র হইতে একটী প্রবন্ধে সমস্ত প্রমাণ উদ্ধৃত করা অসম্ভব। তবে কল্পসূত্রে শব-সংকার সম্বন্ধে কিরূপ বিধি ব্যবস্থা আছে, তাহা যাহাতে জানিতে পারি এমত চেষ্টা করা যাউক।

কোন কল্পসূত্রেই শব প্রোথিত করিবার বিধি নাই, কেবল দাহ করিবার বিধি আছে। কিরূপ স্থানে শবদাহ করিবার বিধি আছে, অগ্রে তাহাই দ্রষ্টব্য—

"দক্ষিণ-পূর্ব্ব বা দক্ষিণ-পশ্চিমদিকের এক খণ্ড ভূমি, যাহা দক্ষিণ বা দক্ষিণ-পূর্ব্বাভিমুখে ঢালু, তাহা খনন করিতে হইবে। একজন মনুষ্যকে শয়ন করাইয়া, তাহার হস্তদ্বয় মস্তকের দিকে তুলিয়া দিলে, যতটা স্থান হয়, ততটা স্থান দীর্ঘ, এক ব্যাস পরিমিত প্রস্থ এবং এক বিতস্তী পরিমিত গভীর রূপে খনন করিবে। শ্মশানের চারিদিকে যেন কিছু না থাকে। তথায় যেন রসাল শস্যাদি জন্মে। তাহার চারিদিকে যেন তরঙ্গিণী থাকে। ইহাই দাহ জন্য শ্মশানের উপযুক্ত স্থান।" আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্র, ৪। ২।

পরে শব-সংকারের নিম্নলিখিত বিধি ও প্রণালী দেখা যাইতেছে—

"প্রথমে শবের কেশ ও শ্মশ্রু মুণ্ডন করিয়া দিবে। প্রচুর পরিমিত কুশ এবং ঘৃত সংগ্রহ করিবে। দাহস্থানে ঘৃত এবং দধি মিশ্রিত করিয়া সিঞ্চন করিবে। মৃত ব্যক্তির আত্মীয়গণ মৃতের আলয়স্থ যজ্ঞাগ্নি এবং যজ্ঞপাত্রগুলি শ্মশানে লইয়া যাইবে। তাহাদিগের পশ্চাতে অযুগ্মসংখ্যক বৃদ্ধ পুরুষ শব বহন করিয়া লইয়া যাইবে। স্ত্রীলোকেরা একসঙ্গে যাইবেন না। কেহ কেহ বলেন, শব গোবাহিত শকটে তুলিয়া লইয়া যাইবে। কেহ বলেন, শবের শরীর

আচ্ছাদিত করিবার জন্য স্ত্রীপশু অর্থাৎ গাভী বা একবর্ণের বা কৃষ্ণবর্ণের ছাগী লইয়া, তাহার বামপদে রজ্জু বন্ধন করিয়া শবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ লইয়া যাইবে। অগ্রে বয়োজ্যেষ্ঠগণ এবং পরে কনিষ্ঠগণ যাইবে। তাহারা শ্মশানে উপনীত হইলে, যে ব্যক্তি প্রধান দাহকারী হইবে সে ব্যক্তি দাহস্থানটী তিনবার বামদিক দিয়া প্রদক্ষিণ করিবে, এবং শমীবৃক্ষের শাখা লইয়া (ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের ১৪শ সূক্তের ৯ ঋক*) মন্ত্র দ্বারা জল সিঞ্চন করিবে। পরে উক্তস্থানের দক্ষিণপূর্ব্ব কোনে আহবনীয় অগ্নি, উত্তরপশ্চিমে গার্হপত্য এবং দক্ষিণপশ্চিমে দক্ষিণাগ্নি স্থাপন করিবে। পরে অভিজ্ঞ ব্যক্তি দ্বারা উক্ত অগ্নিগুলির মধ্যে দাহকাষ্ঠ সজ্জিত করিবে। সেই কাষ্ঠের পর কুশ সজ্জিত করিয়া, তদুপরি কৃষ্ণসার মৃগের চর্ম্ম পাতিয়া, তাহার উপর শবকে শায়িত করিবে। কিন্তু শব এরূপ ভাবে লইয়া যাইবে যে, যেন গার্হপত্য অগ্নি দক্ষিণে রাখিয়া আহবনীয় অগ্নি মস্তকের দিকে থাকে। শবের উত্তর দিকে মৃত ব্যক্তির স্ত্রীকে শয়ান করাইবে। মৃতব্যক্তি ক্ষত্রিয় হইলে একটী ধনু দিবে। স্ত্রীর দেবর, তাহার স্বামীর প্রতিনিধি হওয়ায়, তিনি অথবা স্বামীর কোন পুত্র অথবা বৃদ্ধ ভৃত্য সেই স্থান হইতে (ঋগ্বেদ, ১০ম মণ্ডল ১৮শ সূক্ত ৮ঋক*) মন্ত্র পাঠ করিয়া স্ত্রীকে তুলিয়া আনিবে। যদি কোন পুত্র ঐরূপ স্ত্রীকে তুলে, তাহা হইলে দাহকারী নিজে উক্ত মন্ত্র পাঠ করিবে। ক্ষত্রিয় হইলে (ঋগ্বেদ, ১০ম মণ্ডল, ১৮শ সূক্ত, ৯ঋক*) মন্ত্র পাঠ করিয়া ধনুটী তুলিয়া লইবে। ধনুটী ভাঙ্গিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া শবোপরি নিক্ষেপ করিবে। পরে মৃত ব্যক্তি জীবিতাবস্থায় নিজ যজ্ঞকালে যে সমস্ত দ্রব্য ব্যবহার করিতেন, অর্থাৎ জহু, উপভৃৎ, ধ্রুবা, স্রুব, প্রাশীত্র, পাত্রী, শমীরা, প্রভৃতি বিবিধ দ্রব্য শবের হস্ত, বক্ষ, চক্ষু, নাসা, কর্ণ, উদর, উরু, জঘন প্রদেশ, পদ প্রভৃতি সর্ব্বাঙ্গে স্থাপন করিবে। পরে স্ত্রীপশু বধপূর্ব্বক তাহার উদরস্থ বপা বাহির করিয়া শবের মস্তকে এবং মুখে মাখিয়া দিবে। সেই সময় (ঋগ্বেদ ১০ম মণ্ডল ১৬ সূক্ত, ৭ ঋক*) মন্ত্র পাঠ করিবে। পরে পশুর উদরস্থ কোষ্ঠদ্বয় লইয়া শবের দুই হস্তে দিয়া (ঋগ্বেদ, ১০ম মণ্ডল ১৪শ সূক্ত, ১০ ঋক*, মন্ত্র পাঠ করিবে। পশুর হৃদয়টী লইয়া শবের হৃদয়ে দিবে। পরে পশুর দেহের এক একটি অঙ্গ শবের সেই সেই অঙ্গে দিয়া, শেষ পশুর চর্ম্মখানি শবের উপর আচ্ছাদিত করিয়া (ঋগ্বেদ, ১০ম মণ্ডল, ১৬শ সূক্তর ৮ ঋক*) মন্ত্র পাঠ করিবে। পরে প্রধান দাহকারী দক্ষিণাগ্নিতে অগ্নি, কাম, পৃথিবী, এবং অনুমতিকে আজ্য প্রদান করিয়া, পরে শবের বক্ষস্থলে একটী আজ্য প্রদান করিবে।

পরে আহবনীয় সকল অগ্নি একেবারে প্রজ্জ্বলিত করিতে বলিবে। যদি আহবনীয় অগ্নি প্রথমে শবকে স্পর্শ করে, তাহা হইলে, মৃত ব্যক্তি স্বর্গলাভ করিয়াছেন এবং তিনি তথায় সুখে বাস করিবেন এবং এজগতে তাঁহার পুত্রও সমৃদ্ধ হইবে, এরূপ জানিবে। যদি গার্হপত্য অগ্নি প্রথমে শবকে স্পর্শ করে, তাহা হইলে, তিনি অন্তরীক্ষ লোক লাভ করিয়াছেন এবং তিনি তথায় অবস্থান করিয়া সমৃদ্ধ হইবেন এবং তাঁহার পুত্রও এই পৃথিবীতে সমৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে, এরূপ জানিবে। যদি দক্ষিণাগ্নি মৃতকে প্রথম স্পর্শ করে, তাহা হইলে জানা যাইবে যে, তিনি মনুষ্যলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং

* পূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে।

* পূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে।

সেই মনুষ্যলোকে তিনি সমৃদ্ধ হইবেন এবং তাঁহার সংস্কারকর্ত্তা পুত্রাদিও তথায় সমৃদ্ধ হইবে।

যদি সমস্ত অগ্নি এককালে শবকে স্পর্শ করে, তাহা হইলে তিনি পরমগতি লাভ করিয়াছেন জানিবে। যে সময়ে শব দগ্ধ হইতে থাকিবে, সেই সময়ে ঋগ্বেদের (১০ম মণ্ডল ১৪শ সূক্ত, ৭ঋক*) মন্ত্র পাঠ করিতে থাকিবে। যে ব্যক্তি দাহকার্য্য জানেন, তাঁহার দ্বারা শব সংস্কৃত হইলে, মৃতব্যক্তির আত্মা ধূমের সঙ্গে সঙ্গেই স্বর্গলোকে গমন করেন, শ্রুতিতে এমত বিদিত আছে। আহবনীয় অগ্নির উত্তর-পূর্ব্ব দিকে একটী জানু পর্য্যন্ত গর্ত্ত খনন করিয়া, তন্মধ্যে সিপাল নামক জলজাত শৈবাল স্থাপন করিবে। সেই অহিতাগ্নি পুরুষ আতিবাহিক দেহাবলম্বনে উক্ত শৈবালে অবস্থান পূর্ব্বক প্রতীক্ষা করিতে থাকেন; উক্ত প্রকারে সংস্কৃত হইবার পর তথা হইতে ধূমের সহিত স্বর্গলোকে গমন করেন, শ্রুতিতে এমত বিদিত আছে। পরে ঋগ্বেদের (১০ম মণ্ডল ১৮ সূক্ত, ৩ ঋক*) মন্ত্র পাঠ করিয়া সংস্কার-কর্ত্তা, অপরাপর সঙ্গী লোকদিগের সহিত সংস্কার-স্থানকে বামে রাখিয়া, আর পশ্চাতে না চাহিয়া তথা হইতে চলিয়া যাইবে।

পরে যে জলাশয়ের জল স্থির, সকলে তথায় গমন করিয়া স্নান পূর্ব্বক মৃতব্যক্তির নাম ও গোত্রোচ্চারণ করিয়া সকলে এক এক অঞ্জলি জল উৎসর্গ করিবে। পরে জল হইতে উত্থিত হইয়া অন্য বস্ত্র পরিধান করিবে এবং আর্দ্র বস্ত্রগুলি নিংড়াইয়া, তাহার ছিলাগুলি উত্তর দিকে থাকে, এমন ভাবে শুকাইতে দিবে। পরে আকাশে নক্ষত্র দৃষ্ট হইলে বাটীতে প্রত্যাগমন করিবে। এবং যদি রাত্রিতে সংস্কার করা হয়, তাহা হইলে, সূর্য্যোদয় দৃষ্টে আলয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে। প্রথমে যুবক এবং পরে বৃদ্ধগণ বাটীতে প্রবেশ করিবে। বাটীতে প্রবেশ কালে প্রস্তর, অগ্নি, গোময়, যবভাজা, তিল এবং জল স্পর্শ করিবে।"

আশ্বলায়ণ গৃহ্য সূত্র হইতে আমরা উপরে যাহা উদ্ধৃত করিলাম, পাঠকগণ তৎপাঠে প্রাচীন ভারতের শবসংস্কার-প্রণালী বিশদ-রূপেই জানিতে পারিলেন। শবসংস্কারের পর আর একটী অনুষ্ঠান হইত, তাহার নাম অস্থিসঞ্চয়। তৎসম্বন্ধীয় বিধি-প্রণালী আশ্বলায়ণ গৃহ্য সূত্র হইতে নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—

"দাহকার্য্যের দশ দিন পরে যে তিথি পড়িবে, সেই তিথিতে (যে তিথিতে একটী মাত্র নক্ষত্র থাকিবে) অস্থি সঞ্চয় করিবে। অযুগ্মবয়স্ক পুরুষগণ এবং স্ত্রীগণ একত্র চয়ন করিবেন। পাত্রহস্তে বামদিক দিয়া তিন বার দাহস্থান প্রদক্ষিণ করিবে এবং ঋগ্বেদের (১০ম মণ্ডল, ১৬শ সূক্ত, ১৪ শ ঋক*) মন্ত্র পাঠ করিয়া, জল ও দুগ্ধ একত্র মিশ্রিত করিয়া, সমীবৃক্ষের শাখাদ্বারা সিঞ্চন করিবে। পরে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও চতুর্থ অঙ্গুলীর দ্বারা একটী একটী অস্থি তুলিয়া যেন শব্দ না হয় এমত ভাবে সেই পাত্রে রাখিবে। প্রথমে পদের দিকের অস্থি তুলিয়া পরে মস্তকের দিকের অস্থি তুলিবে। সমগ্র অস্থি তুলিয়া কুলায় বাতাস পবিত্র করিয়া ঋগ্বেদের (১০ম মণ্ডল, ১৮শ সূক্ত, ১০ম ঋক*) মন্ত্র পাঠ করিয়া মৃত্তিকাতে প্রোথিত করিবে। এমত স্থানে প্রোথিত করিবে, যেন ভিন্ন ভিন্ন দিক হইতে তথায় জল না যায়। পরে তাহার উপর মৃত্তিকা স্থাপন করিয়া, ঋগ্বেদের (১০ম মণ্ডল, ১৮ শ সূক্ত

* পূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে।

* পূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে।

১৩শ ঋক*) মন্ত্র পাঠ করিয়া, পশ্চাদ্ভাগে আর দৃষ্টিদান না করিয়া চলিয়া আসিবে। পরে স্নান করিয়া মৃত ব্যক্তির শ্রাদ্ধ করিবে।"

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ১০ম মণ্ডলের ১৮শ সূক্তের ১০ম প্রভৃতি কয়টী ঋক পাঠে স্থির করিয়াছেন যে, পূর্ব্বে আর্য্য জাতির মধ্যে শব প্রোথিত করা হইত, কিন্তু কল্পসূত্রগুলি বলিতেছে যে, শব দাহের পর অস্থিগুলি প্রোথিত করা হইত। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের উক্তি যে, ভ্রান্ত এস্থলে স্পষ্টই তাহা জানা গেল।

কল্পসূত্রগুলির পরই ধর্ম্মশাস্ত্র বা সংহিতাগুলি আমাদিগের অবলম্বনীয়। সংহিতাতে শবসৎকার সম্বন্ধে যে সকল বিধি আছে, তাহা পাঠ করিলে আমরা অনেক পরিবর্ত্তন দেখিতে পাইব। কাত্যায়ন-সংহিতায় লিখিত আছে,—

"গৃহী প্রাণত্যাগ করিলে, তাহাকে স্নান করাইয়া শুদ্ধ বস্ত্র পরিধান করাইবে। অনন্তর দক্ষিণশিরা করিয়া কুশাস্তৃত ভূমিতে শয়ন করাইবে। অনন্তর তাহাকে ঘৃতাভ্যক্ত করিয়া পুনরায় স্নান করাইবে। পরে অন্য যজ্ঞোপবীত পরাইবে এবং কুসুম-ভূষিত করিবে ও তাহার সর্ব্বাঙ্গে চন্দন লিপ্ত করিবে। অনন্তর পুত্রগণ তাহার দেহের সপ্তছিদ্রে সুবর্ণখণ্ড দিয়া অন্য বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া, তাহাকে বহন করিয়া লইয়া যাইবে। অগ্রে অগ্রে অগ্নিহোত্র পশ্চাতে মৃত অগ্নিহোত্রীকে লইয়া যাইতে যাইতে আম্রপত্রে গৃহীত অন্নের অর্দ্ধেক ভাগ পথে ছড়াইতে ছড়াইতে যাইবে। অপরার্দ্ধ ভাগ পিণ্ডের জন্য রাখিবে। অনন্তর দাহকর্ত্তা পুত্রাদি শ্মশানে উপস্থিত হইয়া, দক্ষিণাস্যে বামজানু পাতন পূর্ব্বক উপবেশন করতঃ পিণ্ডদানরীতি অনুসারে সেই অর্দ্ধভাগ অন্ন তিলযোগে দান করিবে। অনন্তর স্নান করিয়া পবিত্র ভূতলে চিতাযোগ্য পঞ্চবিধ ভূসংস্কার করিয়া, তাহাতে কাষ্ঠরাশি সজ্জিত করিবে। তদুপরি মৃত সাগ্নিক ব্যক্তিকে উত্তান এবং দক্ষিণশিরা করিয়া শয়ন করাইয়া, তাহার মুখে আজ্যপূর্ণ স্রুক, নাসিকাতে দক্ষিণাগ্র স্রুব, পাদদ্বয়ে পূর্ব্বা অরণি, বক্ষস্থলে উত্তরা অরণি, বাম পার্শ্বে শূর্প, দক্ষিণ পার্শ্বে চমস, উরু মধ্যদ্বয়ে মুষল, গুহ্য অঙ্গ দেশে উদূখল স্থাপন করিবে। নিরগ্নি ব্যক্তিকে অধোমুখ করিয়া স্থাপন করিবে। দাহকারী ব্যক্তি সাশ্রুলোচন বা ভীত হইবে না। সংযতবাক্, দক্ষিণমুখ, এবং বিকৃত-উত্তরীয় হইয়া, এই সকল কার্য্য করিয়া, বামজানু পাতিত করিয়া দক্ষিণমুখ হইয়া শনৈঃ শনৈঃ ধূমাগ্নি করিবে। "তুমি ইহার দ্বারা উৎপন্ন হইয়াছিলে, ইনি আবার তোমার সাহায্যে দেহান্তর লাভ করুন—ইনি স্বর্গে গমন করুন।" অগ্নিদান সময়ে এই মন্ত্র পাঠ করিবে। গৃহস্বামী এইরূপে দগ্ধ হইলে সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়। যে ব্যক্তি ইহাকে দগ্ধ করে, সেও অনিন্দিত সন্তান লাভ করে। যেমন পথিক, নিজের অস্ত্র সঙ্গে থাকিলে, নির্ভয়ে অরণ্য অতিক্রম করিয়া গন্তব্য স্থান প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ এই সাগ্নিক ব্যক্তি যজ্ঞ-পাত্রাদির দ্বারা ভূষিত হইয়া, অন্যলোক সকল অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মত্ব লাভ করে।" কাত্যায়ন-সংহিতা, ২১শ খণ্ড।

"অনন্তর সকল শবস্পর্শী, চিতাগ্নির দিকে না চাহিয়া জলে গিয়া সবস্ত্র স্নানান্তে আচমন পূর্ব্বক দক্ষিণাগ্রাকুশ করিয়া প্রেতোদ্দেশে শীতল উদক দান করিবে। গোত্র ও নাম উল্লেখ পূর্ব্বক "তর্পয়ামি" বলিবে। ইহাই

* পূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে।

তর্পণ মন্ত্র। সকলে এইরূপে তর্পণ করিয়া, পুনরায় স্নান আচমন করিবার পর শাদ্বল ভূমিতে উপবিষ্ট হইলে, তাহাদিগের অনুগামী লোকেরা তাহাদিগকে বলিবে,—'সকল প্রাণীই অনিত্য, ইহার জন্য তোমরা শোক করিও না। যত্নপূর্ব্বক ধর্ম্মকার্য্য কর। এই ধর্ম্মই তোমাদিগের সংগমন করিবে। কদলীস্তম্ভ সদৃশ অসার, জলবুদ্বুদ সম নশ্বর এই মনুষ্যদেহে যে ব্যক্তি সার অন্বেষণ করে, সে অতিশয় মূঢ়। পৃথিবী বল, দেবতা বল, সকলেরই নাশ আছে। তবে জলবুদ্বুদ তুল্য মর্ত্ত্যলোক বিনষ্ট না হইবে কেন? পঞ্চভূতে নির্ম্মিত শরীর যদি পঞ্চভূতেই পরিণত হইয়া থাকে, তাহাতে আবার শোক কি? সকল সঞ্চয়ের শেষ—ক্ষয়; উন্নতির শেষ—পতন; সংসারের শেষ বিয়োগ এবং জীবনের শেষ—মরণ। আত্মীয়গণ মৃত ব্যক্তির জন্য রোদন সময়ে যে শ্লেষ্মা ও নেত্রজল পরিত্যাগ করে, মৃত ব্যক্তি অবশ হইয়া তাহা ভোজন করিতে বাধ্য হয়। অতএব রোদন করা অনুচিত। যত্ন সহকারে মৃতের উদ্দেশে শ্রাদ্ধাদি কার্য্য করাই বিহিত।" কাত্যায়ন-সংহিতা—২২শ খণ্ড।

"পরদিনে বা তৃতীয় দিনে অস্থি সঞ্চয় করিবে। ঋষিগণ এই কার্য্যে যে বিধির আদেশ করিয়াছেন, অধুনা তাহা কথিত হইতেছে। পূর্ব্ববৎ স্নান সমাধা করিয়া প্রাচীনাবীতী হইয়া, তূষ্ণীভাবে গব্য দুগ্ধ দ্বারা অস্থি সকল সিক্ত করিবে। শমী-শাখা এবং পলাশ শাখা দ্বারা ভস্ম হইতে অস্থি উদ্ধৃত করিয়া গব্যঘৃতাভ্যক্ত করিবে, পরে গন্ধ জল দ্বারা অভিষিক্ত করিবে।

পাত্রের মধ্যে স্থাপন করিয়া, তাহা সূত্র বেষ্টিত করিবে। পরে পবিত্র ভূমিতে গর্ত্ত খনন করিয়া দক্ষিণমুখ হইয়া তাহা প্রোথিত করিবে। পঙ্ক পিণ্ড এবং শৈবাল দ্বারা গর্ত্ত পূরণ করিয়া এবং তাহা উপরে দিয়া অবশিষ্ট পৌর্ব্বাহ্নিক কার্য্য সমাধা করিবে।" কাত্যায়ন-সংহিতা, ২৩শ খণ্ড।

বেদ, কল্পসূত্র এবং সংহিতা হইতে যে সকল প্রমাণ উদ্ধৃত করিলাম, পাঠকগণ তৎপাঠে জানিতে পারিলেন যে, প্রাচীন ভারতে কিরূপ শব-সৎকার-প্রথা প্রচলিত ছিল। মূল দাহ-প্রথা অক্ষুণ্ণ থাকিলেও আনুষ্ঠানিক বিধিগুলি যে, ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহাও পাঠকগণের অবিদিত রহিল না।

শ্রীগোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

বাদরায়ণ ও শঙ্করের জীবতত্ত্ব-বিচার

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

আর লোকনীতিতেও অনেক প্রকার নিয়মে শব্দ প্রয়োগ দেখিতে পাই। উদাহরণে "সৈন্যেরা যুদ্ধ করিতেছে।" "সৈন্য সমূহ দ্বারা রাজা যুদ্ধ করিতেছেন।" এই বাক্যযুগলকে* ব্যাখ্যা যাইতে পারে। পক্ষান্তরে ইন্দ্রিয়ের জ্ঞান গ্রহণ সম্পর্কিত শ্রুতিতে করণ ব্যাপারের উপন্যাসমাত্র বিবক্ষিত হইয়াছে, কিন্তু কাহারও স্বতন্ত্রতা নহে। আর এই উপন্যাস ব্যাপারটাকে† অজ্ঞান

* এইরূপ স্থলে কর্ত্তায় করণ বিভক্তি প্রয়োগ হইল। ভাষ্যটীকারও বলিয়াছেন যে, 'করণাদিষপি কর্ত্তৃ বিবক্ষা'

† "অপিচেন্দ্রিয়াদাম শ্রুতিঃ করণব্যাপারোপন্যাসপরা ন স্বাতন্ত্র্যপরা কর্ত্তৃত্ব বিভক্তিস্তু ভাক্তী। মূলং লিপ্সতিবর্ত্তীতিবৎবুদ্ধি পূর্ব্বকত্ব করণ ব্যাপারোপন্যাসত্ব

পূর্ব্বকই বলিতে হইবে, কেন না স্বপ্নে এইরূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু "বিজ্ঞান যজ্ঞ করিয়া থাকে" স্থলে বিজ্ঞান শব্দবাচ্য বুদ্ধিই কর্ত্তা, কেন না ইহা বুদ্ধিবাচী বলিয়াই বিখ্যাত এবং মনোময়কোষের অব্যবহিত পরেই পঠিত। "তস্য শ্রদ্ধৈব শিরঃ" এই শ্রুতিও প্রতিপাদন করে যে, শ্রদ্ধাদি বিজ্ঞানময় আত্মার অবয়ব, কিন্তু বুদ্ধির ধর্ম্ম বলিয়াই শ্রদ্ধা প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। "নিখিল ইন্দ্রিয় বিজ্ঞানরূপ জ্যেষ্ঠ ব্রহ্মকে উপাসনা করে।" এই প্রকার বাক্য শেষ হইয়াছে বলিয়াও বিজ্ঞান শব্দ বুদ্ধিবাচীই বটে। আর জ্যেষ্ঠ শব্দের অর্থ যে প্রথমজাতত্ব তাহা বুদ্ধি সম্বন্ধেই খাটে। "যজ্ঞ বুদ্ধি ও বাক্যেরই কার্য্য বিশেষ" এই শ্রুতি দ্বারা বুদ্ধি ও বাক্য যে যজ্ঞের সম্পাদনকর্ত্তা তাহা ব্যক্ত হয়। এইরূপ আপত্তিও হইতে পারে না যে, করণের কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিলে বুদ্ধির শক্তি বিপর্য্যয় ঘটিতে পারে, কেন না সমস্ত কারকেরই নিজ ব্যাপারে কর্ত্তৃত্ব অবশ্যম্ভাবী ‡ যেরূপ কাষ্ঠ প্রভৃতির নিজ ব্যাপারে কর্ত্তৃত্ব হইলেও পাকক্রিয়াদির অপেক্ষায় করণত্ব হইয়া থাকে, সেইরূপ বুদ্ধি প্রভৃতির অধ্যবসায় ও সংকল্পাদির প্রতি কর্ত্তৃত্ব হইলেও উপলব্ধি অপেক্ষায় ঐ গুলির করণত্ব হইতে পারে। আর উপলব্ধিকে আপাততঃ আত্মার ব্যাপার বলিয়া অতত্ত্বদর্শীর পক্ষে প্রতীয়মান হইলেও প্রকৃতপক্ষে উপলব্ধি সম্বন্ধে আত্মাকে কোন্ প্রকারে কর্ত্তা বলা যাইতে পারে না এই জন্য যে, উহা নিত্য বলিয়াই শাস্ত্র ও যুক্তি দ্বারা অবধারিত হইয়াছে। এইরূপ আপত্তিও হইতে পারে না যে, অহং জানামি প্রভৃতি প্রতীতির বলে উপলব্ধির প্রতিও বুদ্ধ্যাদির কর্ত্তৃত্ব আরোপিত হইতে পারে, কেন না অহঙ্কার উপলব্ধির বিষয় অর্থাৎ কর্ম্ম বলিয়া বুদ্ধির অন্তঃপাতী হইলেও তদ্‌বিশিষ্ট আত্মাকে উপলব্ধির কর্ত্তা স্বীকার করা যাইতে পারে না। এই প্রকারে বিশিষ্ট আত্মার কর্ত্তৃত্ব হওয়াতে বিশেষণীভূত জড় বুদ্ধির করণত্ব হইতে পারে বলিয়া আমাদের মতে অতিরিক্ত করণ কল্পনার আপত্তি উঠিবে না। পক্ষান্তরে যথাপ্রাপ্ত আরোপিত কর্ত্তৃত্বকে ভিত্তি করিয়া সমাধি বিধিবদ্ধ হওয়ার শাস্ত্রের সার্থকত্ব অব্যাহত থাকা প্রযুক্ত সমাধি বিলোপের আপত্তিটাও খণ্ডবিখণ্ড না হইয়া রহিল না। অতএব আত্মার কর্ত্তৃত্বটা কেবল উপাধিমূলক বলিয়াই প্রতিপন্ন হইল।

পাঠক! আত্মাকে কর্ত্তা ভোক্তা নিশ্চয় করিয়া অজ্ঞানীসমাজ কি না অনর্থ করে? কিন্তু শঙ্কর যুক্তি ও শাস্ত্রদ্বারা আত্মার কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বকে ভ্রান্তি-বিজৃম্ভিত ও সাময়িক বলিয়াই প্রতিপন্ন করিলেন। এইরূপ অবস্থাতেও যিনি লোকৈষণা বা বিত্তৈষণামূলক কার্য্যকলাপ লইয়াই জীবন অতিবাহিত করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ তাঁহাকে কি প্রকারে বুদ্ধিমান বলিয়া প্রশংসা করিতে পারা যায়?

১৬ অধিকরণ।

"পরাত্তু তচ্ছ্রুতেঃ"। ঐ, ঐ, ৪১ সূত্র।

"জীবের কর্ত্তৃত্ব পরমেশ্বর হইতে সিদ্ধ হইয়া থাকে, কেন না তাহার প্রমাণ শ্রুতিতে পাওয়া যায়"।

ভাষ্য—

অবিদ্যা অবস্থাতে জীবের যে, উপাধিমূলক কর্ত্তৃত্ব অভিহিত হইয়াছে, তাহা কি ঈশ্বরসাপেক্ষ অথবা তন্নিরপেক্ষ, এই বিষয়ের আলোচনা চলিতেছে। কিন্তু পরীক্ষার উদ্দেশে আপাততঃ মানিয়া লওয়া যাইতেছে যে, জীবের কর্ত্তৃত্বটা ঈশ্বর-নির-

‡ "বিক্লিত্তে তণ্ডুলাঃ জ্বলন্তি কাষ্ঠানি বিভর্ত্তি স্থালীতি স্ব স্ব ব্যাপারেষু সর্ব্বকারকাণাং কর্ত্তৃত্ব স্বীকারাৎ"। রত্নপ্রভা।

পেক্ষই বটে, কেন না এই সম্বন্ধে ঈশ্বরের অপেক্ষা এই জন্য অনাবশ্যক যে, জীব স্বয়ংই রাগ দ্বেষাদি প্রণোদিত হইয়া অপরাপর কারকের সাহায্যে কর্তৃত্ব অনুভব করিতে পারে, সুতরাং এই ব্যাপারে ঈশ্বর অন্যথা-সিদ্ধ হইয়া পড়িল। আর লোকনীতিতেও দেখিতে পাই যে, কৃষিকার্য্যে কৃষিবল বলিবর্দ্দ প্রভৃতির ন্যায় ঈশ্বরের অপেক্ষা রাখে না। ইহা নিশ্চয় যে, এই ব্যাপারে ঈশ্বরের কর্তৃত্ব স্বীকার করিলে, তিনি ক্লেশময় কর্তৃত্বশালী জীবের সৃষ্টি করেন বলিয়া তাঁহার উপর নিষ্ঠুরতার অভিযোগ না আসিয়া থাকে না এবং ঐ কর্তৃত্বটা বিষমফলপ্রদ বলিয়া তদ্বিধানকারী বৈষম্য দোষে লিপ্ত হইয়া পড়ে। এই সম্বন্ধে এইরূপ আপত্তিও করিতে পারা যায় না যে, "বৈষম্য নৈর্ঘৃণ্যে ন সাপেক্ষত্বাৎ" অর্থাৎ ঈশ্বরের পক্ষে বৈষম্য ও নিষ্ঠুরতার অভিযোগ আসে না এই জন্য যে, তিনি স্ব স্ব কর্ম্ম অনুসারে জীবদিগকে সুখ দুঃখ প্রভৃতি বিষম ফলের ভাগী করিয়া থেন। সূত্রে এই ব্যাপারে ঈশ্বরকে নির্দ্দোষ বলা হইয়াছে, কেন না এইরূপ বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, কর্ম্ম অনুসারে ঈশ্বর জীবদিগকে বিষম ফলের ভাগী করিয়াছেন বলিয়া কর্ম্মের উপর ঐ দোষ চাপান গিয়াছে। কিন্তু সাপেক্ষত্বের দিক দিয়া দেখিলে ইহাই ব্যক্ত হইয়া পড়ে যে, ঈশ্বরের সাপেক্ষত্বটা জীবের পাপ পুণ্যের উপর নির্ভর করিতেছে এবং পাপ পুণ্যটা জীবের কর্তৃত্বের উপর নির্ভর করে, সুতরাং ঐ কর্তৃত্বটা যদি আবার ঈশ্বরসাপেক্ষ হয়, তবে ঈশ্বরের সাপেক্ষত্বের বিধান কি হইবে? (ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, এইরূপ বলিলে চক্রক দোষের সমুত্থান হইয়া পড়ে) পক্ষান্তরে জীবের কর্তৃত্বকে ঈশ্বরাধীন বলিলে পরবর্তী জীবের কর্তৃত্বটা পূর্ব্বকর্ম্ম-বাসনাসাপেক্ষ না হওয়ায় অকৃতাভ্যাগম রূপ দোষের আবির্ভাবও না হইয়া থাকে না। অতএব জীবের কর্তৃত্বটাকে ঈশ্বরাধীন বলা যাইতে পারে না। এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষগুলিকে 'তু' শব্দ দ্বারা নিরাকরণ করিয়া 'পরাৎ' পদ দ্বারা প্রতিজ্ঞা সূচনা করা হইতেছে। অবিদ্যা অবস্থাতে কার্য্যকারণ সংঘাতের অবিবেকদর্শী, অবিদ্যা তিমিরান্ধ জীবের কর্ম্মের ফলদাতা, সর্ব্বভূতাধ্যুষিত, সাক্ষী পরমাত্মা, ঈশ্বরের নিকট হইতে তাঁহার আদেশ অনুসারে কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব রূপ সংসরণ সিদ্ধ হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে তাঁহার অনুগ্রহ বর্ষণ হইলে আবার জীব মোক্ষপদ লাভের অধিকারী হয়। এই স্থলে যদি বল যে তুমি এইরূপ কি প্রকারে বলিতেছ? তবে তাহার উত্তরে বলিতে পারি যে, এই বিষয়ে শ্রুতিই প্রমাণ স্বরূপ। ইহা সত্য যে, জীব রাগদ্বেষাদি দোষ দ্বারা প্রণোদিত হইয়া স্বয়ং কার্য্য সম্পাদন করিলেও এবং লোকনীতিতে কৃষি প্রভৃতি কার্য্যে ঈশ্বর যে অন্যথাসিদ্ধ ইহা প্রসিদ্ধ থাকিলেও প্রত্যেক কার্য্যেই ঈশ্বর হেতু কর্ত্তা ইহা শ্রুতি দ্বারা নিশ্চিত হইয়াছে। ঐ শ্রুতি এই—"ঈশ্বর যাঁহাদিগকে ঊর্দ্ধলোকে নিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগকে সাধু কর্ম্ম করান এবং যাহাদিগকে অধোলোকে পাঠাইতে অভিলাষী, তাহাদিগকে অসাধু কর্ম্ম করাইয়া থাকেন।" "যিনি আত্মার অন্তরে বর্ত্তমান থাকিয়া তাঁহাকে শুভাশুভ কার্য্যে নিযুক্ত করেন।"

ঈশ্বর জীবের হেতুকর্ত্তা হইলে তাঁহার উপর বৈষম্য নৈর্ঘৃণ্য দোষ এবং জীবের পক্ষে অকৃতাভ্যাগম দোষ আইসে, এইরূপ আশঙ্কার সমাধান হইতেছে যে—

"কৃতপ্রযত্নাপেক্ষস্তু বিহিতপ্রতিষিদ্ধা
বৈয়র্থ্যাদিভ্যঃ।" ঐ ঐ তৎ সূত্র—

"ঈশ্বর জীবকৃত কর্ম্মের অনুসারেই জীবকে সুখ দুঃখ প্রভৃতির ভোগে নিযুক্ত করেন, কেন না তাহা হইলেই শাস্ত্রের বিহিত ও নিষিদ্ধ কার্য্য বিধানের অব্যর্থতা অব্যাহত থাকে।"

ভাষ্য—

'তু' শব্দ উক্ত দোষের নিবারণার্থ। জীব যে ধর্ম্ম ও অধর্ম্মরূপ কর্ম্ম করে, তদনুসারেই ঈশ্বর কর্তৃক সে সুখ দুঃখ প্রভৃতির ভোগে নিযুক্ত হয়, কেন না তাহা হইলেই উপস্থাপিত দোষগুলির উপশম হইয়া যায়। ইহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা এই যে, লোকনীতিতে যেরূপ পর্জ্জন্যদেব স্ব স্ব অসাধারণ বীজ হইতে উৎপন্ন গুচ্ছ গুল্মাদি ও ব্রীহি যবাদির সাধারণ নিমিত্ত কারণ মাত্র, সেইরূপ ঈশ্বর জীবকৃত ধর্ম্মাধর্ম্মের বৈষম্যানুপাতে জীবকে সুখ দুঃখ প্রভৃতি বিষম ফল প্রদান করেন মাত্র। এই স্থলে ইহাও জ্ঞাতব্য যে, যেরূপ স্ব স্ব বীজ ও পর্জ্জন্যদেব এই উভয়ের মধ্যে অন্যতরের অভাব হইলে রস, পুষ্প ফল পত্রাদির বৈষম্য হয় না, সেইরূপ জীবের পক্ষেও ঈশ্বর এবং জীবকৃত কর্ম্ম এই দুয়ের মধ্যে একটার অভাব হইলে ভোগ-বৈষম্য হইতে পারে না। ইহাতে এইরূপও বলিতে পারা যায় না যে, জীব যে পূর্ব্বকৃত কর্ম্মসাপেক্ষ ইহা পরাধীন কর্ত্তৃত্বে অসঙ্গত হইয়া পড়ে, কেন না জীবের কর্তৃত্বটা পরাধীন হইলেও সে যে কার্য্য করে ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। সুতরাং জীবের প্রতি ঈশ্বরের পরিচালকতার কোন ব্যাঘাত ঘটিতেছে না। আর এই স্থলে অনবস্থা বা চক্রক দোষের অভ্যুত্থান হইতে পারে না এইজন্য যে, পূর্ব্বকর্ম্ম অপেক্ষা ঈশ্বরের বর্ত্তমান প্রেরকতা এবং পূর্ব্বতর কর্ম্ম অপেক্ষা পূর্ব্বপ্রেরকতা এইরূপ প্রণালীতে সংসরণ দশার অনাদিত্ব প্রতিপন্ন হইয়া থাকে।

ঈশ্বর যে জীবকৃত কর্ম্মের অপেক্ষা রাখেন, তাহা কি প্রকারে জানিতে পারা যায়?—এই প্রকার জিজ্ঞাসায় বলা হইতেছে —"বিহিতপ্রতিষিদ্ধ বৈয়র্থ্যাদিভ্যঃ।" এইরূপ বলাতে "স্বর্গকামো যজেত", 'ব্রাহ্মণো ন হন্তব্যঃ' এই প্রকার বিধি নিষেধের ব্যর্থতা হয় না, নচেৎ উহা নিরর্থক হইয়া পড়ে। আদি শব্দ দ্বারা ইহা সূচিত হইতেছে যে, জীবকৃত কর্ম্মের অপেক্ষা স্বীকার না করিলে, ঈশ্বরই বিহিত ও নিষিদ্ধ কার্য্যে জীবকে নিযুক্ত করুন, কেন না সে অত্যন্ত পরাধীন আর তাহা হইলে ঈশ্বর বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠাতাকে অনর্থে লিপ্ত করুন, এবং নিষিদ্ধ কর্ম্মের অনুষ্ঠাতাকে উৎকৃষ্ট ফল দিন, কিন্তু ইহা দ্বারা বেদের প্রামাণ্যটা বিলুপ্ত না হইয়া রহিল না। এইরূপে ঈশ্বরকে সর্ব্বথা নিরপেক্ষ বলিলে লৌকিক পুরুষকার দেশ, কাল ও নিমিত্ত নিরর্থক হইয়া উঠে এবং পূর্ব্বোক্ত অকৃতাভ্যাগম দোষও আসন জমাইয়া থাকে।

১৭ অধিকরণ—

"অংশোনানাব্যপদেশাদন্যথাচাপিদাশ-
কিতবাদিত্বমধীয়তএকে।"

ঐ ঐ ৪৩ সূত্র।

"জীব যেন ঈশ্বরের অংশ এইরূপ জানা উচিত, কেন না শাস্ত্রে জীব পরব্রহ্মকে অন্বেষণ করিবে ও জানিবে ইত্যাদি ভেদভাব শাখা চন্দ্রনীতিতে উপদিষ্ট হইয়াছে, কিন্তু এইরূপ অংশের ন্যায় প্রতীতির কারণ কেবল ঐরূপ ভেদ ভাবের উপদেশকেই বলা যাইতে পারে না এই জন্য যে, দাশ ব্রহ্ম কিতব ব্রহ্ম এইরূপ নীতিতেও কোন শাখার লোকেরা উপদেশ করিয়াছেন।"

ভাষ্য—

উপকারী ঈশ্বর কর্তৃক জীব যে উপকৃত হইয়া থাকেন ইহা বলা হইয়াছে। কিন্তু ঈশ-

কার্য্য উপকারক ভাব পরস্পর সংসৃষ্ট বস্তুরই ঘটিয়া থাকে ইহা লোকনীতিতে দেখিতে পাই। ইহার দৃষ্টান্তে প্রভু ও ভৃত্য এবং অনল ও বিস্ফুলিঙ্গকে রাখা যাইতে পারে। সুতরাং জীব ঈশ্বরের উপকার্য্য-উপকারক ভাব স্বীকার করা গেল বলিয়া তাঁহাদের সম্বন্ধটা স্বামী ভৃত্য বা অগ্নি বিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় হইবে এই সন্দেহে অনিয়মের অভ্যুত্থান হইতে পারে। পক্ষান্তরে প্রভু ভৃত্য স্থলে শাসক শাস্য ভাবটা প্রসিদ্ধ আছে বলিয়া প্রভু ভৃত্যের ন্যায় শাসকশাস্য ভাবরূপ সম্বন্ধের প্রাপ্তি হইয়া পড়িল। অতএব অংশবাদের অবতারণা। যেরূপ বিস্ফুলিঙ্গ অগ্নির অংশ, সেইরূপ জীবকে ঈশ্বরের অংশ বলা উচিত। এই স্থলে অংশ শব্দের অর্থ অংশের ন্যায়, কেন না নিরবয়ব ঈশ্বরের মুখ্য অংশ অসম্ভব। এই স্থলে যদি বল যে নিরবয়ব বস্তুর সম্বন্ধে অংশের ন্যায় বলাও ঠিক নহে, তবে শুন শ্রুতিতে "তাঁহাকে অন্বেষণ করিবে তাঁহাকে জানিবে", "এই পরব্রহ্মকে জানিয়া জীব মুনীশ্বর হয়" ও "যিনি অন্তর্যামীরূপে আত্মাতে অবস্থিত হইয়া তাঁহাকে সদসদ্‌বিষয়ে চালিত করেন" এই প্রকার ভেদ ভাব উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহার সামঞ্জস্য ঐরূপে ভিন্নভাব মানিলেই হইতে পারে।

এই ভেদ ভাবের উপদেশটা জীব ঈশ্বরের ভৃত্য প্রভুভাব না মানিলে সুসঙ্গত হইতে পারে না এইরূপ আশঙ্কায় বলা হইতেছে—'অজ্ঞথাচাপি' ইত্যাদি অংশ। কেবল নানাত্বের উপদেশ হেতু জীবকে ঈশ্বরাংশ বলা যাইতেছে না, কিন্তু একত্বের প্রতিপাদক অন্য প্রকার উপদেশও রহিয়াছে। কোন আথর্ব্বণিক শাখার লোকেরা ব্রহ্ম সূক্তে ব্রহ্মের দাশকিতবাদিভাবও ব্যক্ত করিয়াছেন। ইহার বিশদ ব্যাখ্যা এইরূপ, "ব্রহ্মদাশা ব্রহ্মদাসা ব্রহ্মৈবেমে কিতবাঃ" শ্রুতি। কৈবর্ত্ত বলিয়া যাহারা বিখ্যাত সেই দাশেরা, যাহারা প্রভুর নিকট আপনাদিগকে বিক্রয় করিয়াছে সেই দাসেরা এবং যাহারা জুয়া খেলিয়া থাকে, সেই কিতবেরা ব্রহ্মই বটে এই উদাহরণ দ্বারা নানারূপের লীলাভূমি কার্য্যকারণ সংঘাত প্রবিষ্ট নিখিল জীবের ব্রহ্মভাব ব্যক্ত করিতেছে। এইরূপে অন্য স্থলের ব্রহ্ম-প্রকরণেও দেখিতে পাওয়া যায় যে "হে বিশ্বতোমুখ, তুমি স্ত্রী, তুমি পুরুষ, তুমি কুমার, তুমি কুমারী, তুমিই জরাজীর্ণ হইয়া দণ্ডের উপর নির্ভর করিয়া ইতস্তত যাইতেছ তুমিই জন্ম লইতেছ।" "যিনি প্রত্যেক নাম বিধান করিয়া ব্যবহার করিতেছেন তাঁহার সম্যক জ্ঞান লাভ করিলে মুক্তি হয়।" ও "পরব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত কোন দ্রষ্টা নাই।" আর অগ্নি ও বিস্ফুলিঙ্গের উষ্ণতা অংশে যেরূপ কিছুমাত্র ভিন্নতা নাই, সেইরূপ জীব ও ঈশ্বরের চৈতন্য অংশে ভেদভাবের গন্ধও নাই। অতএব ভেদ ও অভেদ উভয়েরই শ্রুতি প্রমাণ পাওয়া যায় বলিয়া অংশাংশী ভাব বুঝা যাইতেছে।

কি কারণে অংশ বলিয়া স্বীকার করা যায়—

"মন্ত্রবর্ণাচ্চ"। ঐ ঐ ৪৪ সূত্র।

"বেদের মন্ত্র দ্বারাও জীবকে ঈশ্বরাংশ বলিয়া জানা যায়।"

ভাষ্য—

বেদমন্ত্রও এই অংশাংশী ভাবের প্রতিপাদন করিতেছে—"এই সহস্রশীর্ষ পুরুষের পক্ষে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড কেবল বিভূতি মাত্র, প্রকৃত পক্ষে তিনি উহা হইতে অতীব বৃহত্তর।" "এই মহান পুরুষের চারি অংশের একাংশ মাত্র স্থাবর জঙ্গম জীব, কিন্তু অপর তিন অংশ স্বয়ং প্রকাশ স্বরূপের অন্তর্ভুক্ত সুতরাং চির অমর।" এই শ্রুতির

অন্তঃপাতী ভূত শব্দের অর্থ হয়। অন্তর জীব, যেমন না "শাস্ত্রোক্ত যাগাদি ক্রিয়াকে বাদ দিয়া অপর লৌকিক ব্যাপার মাত্রে কোন ভূতের হিংসা না করিলে মনুষ্য ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকে" স্থলে ভূত শব্দটা ঐ অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে। আর অংশ পাদ ও ভাগ এই গুলি পর্য্যায় শব্দ, সুতরাং জীব ঈশ্বরের অংশ বলিয়াই সিদ্ধ হইল।

জীব যে ঈশ্বরের অংশ এই সম্বন্ধে অপর কারণ দেখান যাইতেছে—

"অপিচ স্মর্য্যতে"। ঐ ঐ ৪৫ সূত্র।

"জীব যে ঈশ্বরের অংশ এই বিষয়ে গীতা স্মৃতির প্রমাণ পাওয়া যায়।"

ভাষ্য—

জীব যে ঈশ্বরাংশ ইহা ঈশ্বর-গীতাদ্বারাও প্রমাণিত হয়। "জীবলোকে নিত্য জীব আমারই অংশ।" যদ্যপি লোকনীতিতে স্বামি-ভৃত্য ভাবের স্থলেই শাসক শাস্য ভাব দেখিতে পাই, তথাপি শাস্ত্র হইতেই এই স্থলে অংশাংশীভাব ও শাস্য শাসক ভাব অবধারিত হইয়াছে। ভাবার্থটা এই যে, নিরতিশয় উপাধিশালী ঈশ্বর অল্পোপাধিসম্পন্ন জীবদিগকে শাসন করেন বলিলে কোনই দোষ আইসে না।

জীবকে ঈশ্বরের অংশ মানিলে তাহার সংসার দুঃখ হইয়া থাকে বলিয়া উহাতে ঈশ্বরও লিপ্ত হইয়া পড়িলেন। আর লৌকিক ব্যাপারেও দেখিতে পাই যে, হস্তপদ প্রভৃতি কোন অঙ্গের ব্যাঘাতে অঙ্গীরূপ দেবদত্তও ব্যথিত হইয়া পড়েন। সুতরাং এই হিসাবে ঈশ্বরের পক্ষে জীব অপেক্ষাও অধিক দুঃখ হওয়ার সম্ভাবনা।* দেখায় জীব সংসার দশাকেই প্রাপ্ত বিষয় মনে করুক এই জন্য যে, দুঃখসংপৃক্ত ঈশ্বর রূপ হওয়ায় নিদান যে তত্ত্বজ্ঞান উহা নিরর্থক হইয়া পড়ে।

* এই স্থলে এইরূপ অনুমিতি বাক্য উহ্য রহিল যে, ঈশ্বর নিজের অংশের দুঃখে দুঃখী যেহেতু তিনি অংশী, দৃষ্টান্ত দেবদত্ত।

ইহার উত্তরে বলা হইতেছে—

"প্রকাশাদিবন্নৈবংপরঃ"। ঐ ঐ সূত্র ।৪৬

"যেরূপ মরিচিমালীর প্রকাশ উপাধি সম্পর্কে ঋজু বক্রভাব প্রাপ্তের ন্যায় প্রতীয়মান হইয়াও পরমার্থরূপে অর্থাৎ প্রকৃত পক্ষে উহাতে নির্লিপ্ত থাকে, সেইরূপ পরমেশ্বর ঐ হিসাবে দুঃখসংপৃক্তের ন্যায় প্রতীয়মান হইলেও পরমার্থতঃ তিনি জীবের দুঃখাদি ব্যাপারে নির্লিপ্ত।"

ভাষ্য—

জীবের ন্যায় ঈশ্বর যে, সংসার-দুঃখ অনুভব করেন না এই সম্বন্ধে আমরা প্রতিজ্ঞা করিতে পারি। জীবই অবিদ্যার বশবর্ত্তী হইয়া দেহাদিতে যেন আত্ম জ্ঞান করে এবং দেহসম্পর্কিত দুঃখে আমি দুঃখিত অবিদ্যার কুহকে এই প্রকার দুঃখ ভোগ মনে করে। আর পরমেশ্বরের পক্ষে না দেহাত্ম বুদ্ধি না দুঃখ মনে করা সম্ভবপর। জীবের পক্ষেও অবিদ্যার যে কারুকার্য্য নাম ও রূপ তাহা দ্বারা রচিত দেহ ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতি উপাধির অবিবেকরূপ ভ্রান্তি হইতেই দুঃখাভিমান সমুত্থিত। কিন্তু পরমার্থতঃ উহার অস্তিত্বই নাই। যেরূপ জীব আপনার দেহ সম্বন্ধে দাহচ্ছেদাদি নিমিত্তক দুঃখ তদভিমান ভ্রান্তিতে মনিয়া থাকে, সেইরূপ পুত্র মিত্র প্রভৃতি সম্বন্ধেও তদভিমান ভ্রান্তিতে দুঃখ বোধ করে। ইহার কারণ এই যে, অত্যন্ত মমতার জন্য আমিই পুত্র আমিই মিত্র এইরূপ ভাবে পুত্র মিত্র প্রভৃতিতে জীবের অভিনিবেশ হইয়া থাকে। সুতরাং ইহা নিশ্চিত যে, মিথ্যা অভিমান ভ্রান্তিতেই দুঃখানুভব হয়। এই ত গেল

সপক্ষের কথা। এইরূপে বিপক্ষে বলা যাইতেছে যে, কোন স্থলে পুত্রমিত্রাদি-সম্পন্ন ব্যক্তি, তৎসম্পর্কিত লোক ও অপরাপর মনুষ্য উপবিষ্ট হইলে, যদি কোন আগন্তুক ব্যক্তি আসিয়া বলে যে, অমুক পুত্র ও অমুক মিত্র মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছে, তবে যাঁহাদের ঐ মৃত ব্যক্তিদিগের সহিত বিশিষ্ট সম্বন্ধের অভিমান আছে, তাঁহাদেরই তজ্জনিত দুঃখ বোধ হয়, কিন্তু ঐ প্রকার অভিমানশূন্য পরিব্রাজক প্রভৃতির তাহা হয় না। কাজেই যখন লৌকিক ব্যক্তির পক্ষেও সম্যক্ জ্ঞান সার্থক দেখা যাইতেছে, তখন যিনি আপনার নির্ব্বিশেষ স্বরূপ হইতে দ্বিতীয় বস্তু দেখিতে পান না, সেই নিত্য-চৈতন্যমাত্র স্বরূপে পরিণত তত্ত্বদর্শীর পক্ষে যে উহা নিরর্থক নহে ইহা বলাই নিষ্প্রয়োজন। এইরূপে বুঝিতে বাকি রহিল না যে, সম্যক্ জ্ঞান কখন নিষ্ফল নহে।

সূত্রের "প্রকাশবৎ" অংশদ্বারা দৃষ্টান্তের উপন্যাস করা হইয়াছে। যেরূপ রবি শশীর প্রকাশ আকাশে শুদ্ধ নির্ব্বিকার ভাবে বর্ত্তমান থাকিয়াও অঙ্গুলি প্রভৃতি উপাধির সংস্রবে পড়িয়া উহাতে ঋজু বক্রভাববিশিষ্টের ন্যায় প্রতীয়মান হইয়া থাকে কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা নহে, যেরূপ ঘটাদির গতিতে আকাশ গতিশীলের ন্যায় মনে হইলেও উহা অসত্য এবং যেরূপ জল ও শরাব প্রভৃতির কম্পনে তৎসম্পর্কিত সূর্য্য প্রতিবিম্ব কম্পমান হইলেও বিম্বরূপ সূর্য্য স্থির থাকে, সেইরূপ অবিদ্যা-রচিত বুদ্ধি আদি উপহিত জীবরূপ অংশ দুঃখায়মান হইলেও অংশী ঈশ্বর দুঃখ দ্বারা অস্পৃষ্টই থাকেন। আর জীবের পক্ষেও যে দুঃখ প্রাপ্তির নিদান অবিদ্যাই বটে তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। ইহার তাৎপর্য্যটা এই যে, "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি বেদান্তের মহাবাক্য অবিদ্যা রচিত জীবভাবের পরিহার করিয়া জীবের ব্রহ্মভাবই ঘোষণা করে। সুতরাং জীবসম্পর্কিত দুঃখে পরমাত্মা দুঃখিত হন না।

"স্মরন্তি চ"। ঐ ঐ ৪৭ সূত্র।

"জীব-সম্পর্কিত দুঃখে যে পরমাত্মা দুঃখিত হন না, এই বিষয়ে স্মৃতির প্রমাণও আছে।"

ভাষ্য।—

পরমাত্মা যে জীবের দুঃখাদি ব্যাপারে নির্লিপ্ত এই সম্বন্ধে ব্যাস প্রভৃতি আপন স্মৃতিতে উপদেশ করিয়াছেন,—"জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে পরমাত্মা নিত্য ও নির্গুণ এবং জল দ্বারা পদ্মপত্রের ন্যায় পাপপুণ্যের ফলে তিনি লেপায়মান হন না।"

"অপর আত্মা অর্থাৎ জীব বন্ধন ও মোক্ষের ভাগী হইয়া থাকে এবং সে আবার সপ্তদশ অবয়ব লিঙ্গ শরীর দ্বারা আবদ্ধ।" সূত্রস্থ 'চ' শব্দ দ্বারা সূচিত হইয়াছে যে, এই সম্বন্ধে শ্রুতি প্রমাণও আছে, কেন না "জীব ও পরমাত্মার মধ্যে জীবাত্মা কর্ম্মফল ভোগ করিয়া থাকে এবং পরমাত্মা স্বপ্রকাশ রূপে নিরন্তর বিরাজমান রহিয়াছেন।" "সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা এক এবং লোকের দুঃখ হইতে বহুদূরে বর্ত্তমান।"

যদি সর্ব্বভূতে অন্তরাত্মা এক হয়, তবে শাস্ত্রের লৌকিক ও বৈদিক অনুজ্ঞা পরিহার অর্থাৎ বিধি নিষেধের কি গতি হইবে? এইস্থলে এইরূপ আপত্তিও করিতে পারা যায় না যে, জীবকে ঈশ্বরের অংশ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, সুতরাং তদ্ভেদেই তদাশ্রিত অনুজ্ঞা পরিহার সুসঙ্গত হইবে? তুমি কেন বৃথা আপত্তি তুলিতেছ? কেন না অভেদ প্রতিপাদক বেদবাক্য সকল দেখিতে পাওয়া যায়। "ঈশ্বর জীব সৃষ্টি করিয়া তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছেন।

সুতরাং বলিয়া পরব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত কোন জিনিষ নাই।” “সর্ব্বমিদং ব্রহ্ম।” আর যদি ইহাতেও আপত্তি কর যে, ব্রহ্মের ভেদাভেদ স্বীকৃত হইয়াছে বলিয়া জীব যে ব্রহ্মাংশ ইহাই সিদ্ধ হইয়া থাকে পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, তবে শুন ভেদাভেদ তখনই সিদ্ধ হইতে পারে, যখন উভয়ই বেদবাক্যের তাৎপর্য্য বিষয়ীভূত হয়। কিন্তু ব্রহ্মাত্মভাবের প্রতিপত্তিতে পুরুষার্থ সিদ্ধি হয় বলিয়া অভেদই শ্রুতির অভিপ্রেত, সুতরাং ভেদটা কেবল অজ্ঞানিসমাজের পরিতোষার্থ অনূদিত মাত্র। আর নিরবয়ব ব্রহ্মের মুখ্য অংশ জীব হইতে পারে না ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। কাজেই সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা পরব্রহ্ম জীবভাবে অবস্থিত বলিয়া শাস্ত্রের অনুজ্ঞা পরিহারের সঙ্গতি অবশ্যই করা উচিত। এইরূপ আশঙ্কার সমাধান হইতেছে।

পাঠক, বাদরায়ণ-শঙ্করের অংশাংশীভাব প্রতিপাদন জ্ঞাপন করিয়া দিতেছে যে সগুণ ঈশ্বর সর্ব্বস্বরূপ সমষ্টি বিরাট্ পুরুষ, কেন না তিনি জীব হইতে অত্যন্ত পৃথক বা ভিন্ন তাঁহার অংশ জীবকে বলিলে হিমাচলের কোন প্রত্যন্ত পর্ব্বতকেও হিমাচলের অংশ বলা যাইতে পারে। সুতরা ব্যক্তিবিশেষ ঈশ্বরের বা বনের মানুষের অংশ যে জীব হইতে পারে না, ইহাতে কোন সংশয় রহিল না। আর অবাবহিতপূর্ব্ববর্ত্তী ভাষ্যাংশ দ্বারা ইহা সূচিত হইল যে পরব্রহ্মই জীবভাবে অবস্থিত রহিয়াছেন, কেন না নিরবয়ব বস্তুর অংশ আর অনলের শৈত্য একই কথা। সুতরাং উপাধি সম্পর্কে অংশাংশী ভাবের অবতারণাটাও অজ্ঞানি-পরিতোষ নীতিতেই হইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে মনোযোগ সহকারে বেদান্ত সূত্র ও ভাষ্যের অবলোকনে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, এক সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্মই মায়া দ্বারা অসংখ্যরূপে প্রতীয়মান হইতেছেন। কিন্তু যেরূপ ব্রহ্ম এক, সেইরূপ মায়া ও কারণরূপে একই বটেন, সুতরাং তৎপ্রতিবিম্বিত জীবকে কারণরূপে একই বলিতে হইবে। আর কারণরূপিণী মায়া যে এক ইহা চক্ষুতে অঙ্গুলি প্রদান করিয়া প্রতিদিন সুষুপ্তিই বুঝাইয়া দিতেছে।

(ক্রমশঃ।)

শ্রীঅচ্যুতানন্দ সরস্বতী।

শিশুদিগের মধ্যে অকালমৃত্যুর আধিক্য ও তৎসম্বন্ধে জননীর কর্ত্তব্য।

অস্মদ্দেশে হিন্দুগৃহে গর্ভিণীকে যে কিরূপ শোচনীয় অবস্থায় থাকিতে, এবং কত প্রকার কষ্ট পাইতে হয়, তাহা প্রায় সকলেই অবগত আছেন। সাময়িক আলস্য তো আছেই, তাহার উপর প্রায়ই কোষ্ঠ-বদ্ধতা বা বদ-কাটিত আসিয়া জুটে। প্রস্রাবও ভালরূপ হয় না। এ সকলের জন্য, না আছে পূর্ব্বসতর্কতা, না আছে পশ্চাৎ-প্রতিবিধান। গর্ভাবস্থায় কোনও রূপ ঔষধ সেবন করিতে নাই, ইহাই মেয়েলী-শাস্ত্র। বিশেষতঃ, যেখানে সেকেলের বর্ষীয়সীদিগের প্রাদুর্ভাব, সেখানে গর্ভিণীর কষ্টের সীমা নাই। তাঁহাদিগের মতে পরিশ্রম করিতে হয়, যাঁতা ঘুরাও, ঢেঁকিতে “পাড়” দাও; ভারী কলসী করিয়া পুষ্করিণী হইতে জল আন ইত্যাদি, ইত্যাদি। তাহার

পর ছাই, মাটি, খুড়ি প্রভৃতি অখাদ্য, মন্দ দ্রব্য, যাহা অভিরুচি, তাহাই খাও।

কোষ্ঠবদ্ধতার উপর এই সমস্ত অত্যাচারে নানাপ্রকার রোগ উপস্থিত হয়। সে গর্ভস্থ ভ্রূণও বিপন্ন হইবে, তাহা আশ্চর্য্য নয়। এইরূপে কঠিন রোগাক্রান্তা হইলে গর্ভস্রাব অবশ্যম্ভাবী। প্রসূতিরও প্রাণ লইয়া টানাটানি। অন্তঃপুরের গৃহিণী তখন গ্রামস্থ "রোজা" মহাশয়কে ডাক দিলেন।

ধীরে, গম্ভীরে, "রোজা" মহোদয়ের উদয় হইল। রুগ্নার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া, 'বিকট ভূতে পাইয়াছে!" সিদ্ধান্ত হইল। ঔষধের ব্যবস্থা হইল, একগাছা মুড়ো ঝাঁটা আর একখান শীল পাথর। গুণ গুণ স্বরে মন্ত্রপাঠ আরম্ভ হইল, তাহার সঙ্গে ঝাঁটার আঘাত। রুগ্না গর্ভিণী "মলুম্! মলুম্!" ডাক ছাড়িল। রোজা কিন্তু নাছোড়-বান্দা। খড়কীর পুষ্করিণী হইতে শীলখানি ধুইয়া আনিবার আদেশ হইল। অগত্যা হুকুম তামিল করিতে গিয়া গর্ভিণী পুকুর পাড়ে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। এ দিকে "ভূত ছাড়িয়াছে," অতএব পাঁচসিকা গণ্ডা (মায় পুরস্কার) লইয়া "রোজা" প্রস্থান করিলেন।

এইরূপে যে কত শত স্থানে, কত শত গর্ভস্থ শিশু ও গর্ভিণী, অনভিজ্ঞতার এবং অসাবধানতায় অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়েছে, তাহার ইয়ত্তা নাই।

গর্ভিণীর শারীরিক দৌর্ব্বল্য ও মানসিক অবসাদ যে গর্ভস্থ ভ্রূণের মহৎ অপকারী তাহা বোধ হয় সকলের জানা আছে, অন্ততঃ জানা উচিত। এ বিষয়ে অণুমাত্র অবহেলা করিলে পরিণামে বিষময় ফল ফলিবে।

অনেক স্থলে গর্ভিণীকে মৃত বৎস প্রসব করিতে [illegible] তাহাতে প্রসূতির মৃত্যুপ্রায় হইয়া থাকে—প্রাণনাশও ঘটে। ইহার কারণ অসাবধানতা ও অত্যাচার; আর গৃহকর্ত্রীগণের অনভিজ্ঞতা এবং অবিমৃষ্যকারিতা। এখানে প্রসূতির কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য কিছুই না থাকা সম্ভব। যখন সেই সেকেলে অজ্ঞানাচ্ছন্ন বৃদ্ধাগণ কর্ত্তৃক পরিচালিতা, তখন আর কি আশা করা যাইতে পারে? অবনতমস্তকে তাঁহাদের আজ্ঞা পালন (ভালই হউক আর মন্দই হউক) বধূদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য।

সন্তান প্রসবকালে সূতিকাগৃহের আবশ্যক। এবং বহুদর্শী ধাত্রীরও প্রয়োজন। যাঁহারা সঙ্গতিপন্ন তাঁহারা একটি স্বতন্ত্র মেটে ঘর প্রস্তুত করিয়া রাখেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, ঘরটি বারমাস বন্ধ থাকে এবং উহা রাজ্যের উচ্ছ দ্রব্যসমূহে পরিপূর্ণ থাকে। দুই একটি বিষধরেরও সংস্থান হয়, সূতিকাগৃহের উপযোগী করিবার সময় উহা পরিষ্কার করা হয়। বহুদিন গৃহ অবরুদ্ধ থাকায়, মাটির মেঝে যেরূপ স্যাঁৎসেঁতে এবং দুর্গন্ধময় হইয়া থাকে, তাহা বর্ণনাতীত। যে গৃহমধ্যে নীরোগ লোক থাকিলে অসুখী হয়, তাহার মধ্যে রুগ্না, ক্ষীণজীবী প্রসূতি বাস করিবে। ইহাতে তাহার কত আনন্দ ও স্ফূর্ত্তি হইবে, তাহা অনায়াসে বোধগম্য হইতে পারে। এতৎ সম্বন্ধে আলোচ্য বিষয়-সমূহ যথাস্থানে বিবৃত হইবে।

অমুক ধাত্রী (সম্ভবতঃ চর্ম্মকারজাতীয়া) বহুদর্শী, এবং অনেক লোকের গৃহের "ধাই-মা"। সুচতুরা হইলে হইতে পারে, কিন্তু সুনিপুণা কি না, সেটা সন্দেহস্থল। ধাত্রীর সূতিকাগৃহে প্রবেশের পূর্ব্বে কাপড় ছাড়া ও হস্তের নখগুলি কাটা উচিত; কিন্তু সে কাজ দুইটি বোধ হয় সমাহিত হইয়া না। এই কাজের উপর যে অনেক শুভাশুভ নির্ভর করে তাহা সকলে অবগত [illegible]

থাকিতে পারেন। ইতরজাতীয়া স্ত্রীলোক ইতরপ্রসর্বেই থাকে। অস্পৃশ্য ও সংক্রামক বহুতর রোগের সংস্রবে পরিধেয় বস্ত্রে তত্তৎ রোগের বীজ নিহিত থাকে। সে সমস্ত রোগের বীজ সূতিকাগৃহে প্রবিষ্ট হইলে অনর্থপাতের সম্ভাবনা। প্রসবকালে ধাত্রীকে হস্তদ্বারা অনেক কার্য্য করিতে হয়। এইজন্য আগে হইতে নখরকর্ত্তন ব্যবস্থা।

গর্ভিণীর শারীরিক এবং মানসিক অবস্থার উপর গর্ভস্থ বালকের দৈহিক অবস্থা সম্পূর্ণ নির্ভর করে। এজন্য তদ্বিষয়ে বিশেষ সতর্ক থাকা উচিত। সূতিকাগৃহের শোচনীয় অবস্থায় উপর অপরিণামদর্শী ধাত্রীর দোষে, প্রসূতি নানারূপ রোগাক্রান্তা হইয়া পড়ে। গর্ভস্থ বালকও যে তদ্রূপ রুগ্ন হইবে, তাহার বিচিত্রতা কি? সদ্যোজাত শিশুর প্রাণই বা কত টুকু? এখানেও অশিক্ষিতা ধাত্রীর ব্যবহারে প্রায়ই বালক প্রাণ হারাইয়া থাকে। প্রসূতিও যায় যায়।

গৃহকর্ত্রীর দোষই অধিক। কিসে কি হয়, তাহা তিনি নিশ্চই জানেন না। জানিবার চেষ্টা বা ইচ্ছাও নাই। যাহা জানেন তাহাই যথেষ্ট। এরূপ অবস্থায় কি আশা করা যাইতে পারে? তাহার পর একটা কথা গিন্নীদের মুখে শুনা যায় "দশ মাসের আট নরকো।" এ কথার মর্ম্মগ্রহণ করা সহজ নয়। কি যেন একটা ঘৃণিত দ্রব্যের আভাস পাওয়া যায়। এইটি লইয়া মহা গোলযোগ। ছুঁইতে নাই, দেখিতে নাই ইত্যাদি। পোয়াতি পচিয়া মরুক। আঁতুড় ঘর নরককুণ্ড বিশেষ। ওখানে যায় কে? উহার সংস্পর্শে স্নান করা বিধি। এত হেনস্থায় প্রসূতির শারীরিক ও মানসিক গতি কত ভাল হইতে পারে?

কিন্তু বালককে বাঁচাইতে হইলে জননীর শুশ্রূষা আবশ্যক; কারণ জননী অসুস্থা হইলে বালকও তাদৃশ অবস্থাপন্ন হইবে। সুস্থশরীরা জননী, নবপ্রসূত শিশুর যত যত্ন লইতে পারেন, অপর কাহারও দ্বারা তাহা সম্ভবে না। তজ্জন্য শিশুর প্রধান আহার্য্য শারীরিক অসুস্থতাকে উহা দূষিত হইলে বালক কখনও পুষ্টিলাভ করিতে পারে না। অপিচ, নানারূপ রোগাক্রান্ত হইয়া থাকে—কালগ্রাসেও পতিত হয়।

বিগত সেপ্টেম্বর মাসে জর্ম্মনীর অন্তর্গত প্রুসিয়ার প্রধান নগর বার্লিনে শিশুদিগের অকালমৃত্যুর প্রতিবিধান উদ্দেশে একটি মহৎ অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, জর্ম্মণীতেও শিশুদিগের অকালমৃত্যু লইয়া মহা আন্দোলন চলিতেছে, এবং সেখানেও ইহার সংখ্যা অল্প না হওয়ার সম্ভব। নতুবা এ বিষয়ের তদন্ত ও প্রতিবিধান জন্য মহাসমিতি গঠনের প্রয়োজন দেখা যায় না। জর্ম্মণী যখন উন্নতি সম্বন্ধে প্রায় প্রধান পদ-অধিকারী, তখন সেখানে এই মৃত্যুসংখ্যা খুব বেশী হইবার সম্ভাবনা বিরল বলিয়াই ধারণা হইতে পারে। কিন্তু কলে তদ্রূপ নহে দেখা যাইতেছে।

ইংলণ্ড এবং আমেরিকার যুক্তরাজ্যে জনসংখ্যা বেশী। সুতরাং তত্তৎ স্থানে শিশুদিগের মৃত্যুসংখ্যা অধিক হওয়া সম্ভব। তাহা হইলে, তাহারও যে প্রতিবিধান চেষ্টা হইতেছে না, অথবা হইবে না, তাহারই বা প্রমাণ কি? অবশ্যই হইতেছে, এরূপ আশা করা যায়।

তাহার পর ভারতবর্ষ। এরূপ প্রবাদ আছে যে, ইহার কোন কোন অঞ্চলে কন্যাসন্তান ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র মারিয়া ফেলা হইত। এখনও সে প্রথা প্রচলিত আছে কি না, সন্দেহস্থল। ইহাও একপ্রকার শিশুর অকালমৃত্যু বলিতে পারা যায়। এক

গণনার সংখ্যাবৃদ্ধি নিশ্চয়ই হইয়া পড়ে। এরূপ নৃশংস ও অমানুষিক কার্য্য, সেই স্থানের লোকদিগকে সম্ভবতঃ সমাজভয়ে করিতে হয়। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে সমাজশাসনকে শত শত ধন্যবাদ দেওয়া উচিত!

ইং ১৯০৮ সালের শিশুদিগের অকাল-মৃত্যুর তালিকা:—

এক বৎসরের মধ্যের শিশু		২০০,৪৪৮
এক হইতে ৫ বৎসরের	„	২৯৫,০০৫
পাঁচ হইতে ১০ „	„	১৪৮,৮০৫
		৮৪৪,২৭৮

ইহা দ্বারা জানা যাইতেছে যে, গড়পড়তায় এক বৎসর বয়সের মধ্যের শিশু প্রতিদিন প্রায় ১,১০০ করিয়া কালকবলিত হইতেছে। এবং মোট দশ বৎসর বয়সের মধ্যের শিশু প্রায় ২,৩০০ করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে।

এই তো বঙ্গদেশের অবস্থা। কি ভয়ানক কথা! কি লোমহর্ষণ ব্যাপার! শুনিলে কর্ণে হস্ত দিতে হয়। ইহার কি প্রতিকার নাই? অবশ্যই আছে; এবং তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা হইতেছে। অনেকেই জানেন, শিশুর প্রথম অবস্থায় জননীরই তত্ত্বাবধান আবশ্যক। জননী সুস্থশরীরা না হইলে, তাহার সম্ভাবনা কোথায়? সংপ্রতি শিক্ষিতসম্প্রদায় তাহার বিধিমত চেষ্টা করিতেছেন কিন্তু সেকেলে গৃহকর্ত্রীগণের তাড়নায় প্রায়ই তাঁহারা বিফল-মনোরথ হইতেছেন। অতি শৈশবে বালকগণের অকালমৃত্যুর প্রধান কারণ এইটি।

এ অবস্থায় গর্ভিণীগণের শুশ্রূষা পালন কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? কিন্তু এমন কতকগুলি বিষয় আছে যে, সে সম্বন্ধে জন্য তাঁহাদের পরামর্শ গ্রহণ করা উচিত। আবার সেগুলি নির্ব্বাচনও সহজ নয়, চিন্তাশীল মনুষ্যমাত্রেই, কোন একটা কথা পড়িলে, তাহা তলিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন। বিজ্ঞান-বলে বলীয়ান্ যুবক, যদি আত্মশ্লাঘাপূর্ণ না হয়েন, তাহা হইলে বহু অনর্থ নিবারিত করিতে পারেন। পুরাতন প্রচলিত প্রথার সহিত আধুনিক বৈজ্ঞানিক মতের সাদৃশ্য কতটুকু জানিয়া, সারাংশ গ্রহণ এবং তদনুরূপ প্রকরণ, অনেক কার্য্যকরী হইতে পারে।

গৃহিণীর কর্ত্তব্য।

দুহিতার অথবা পুত্রবধূর গর্ভলক্ষণ লক্ষিত হইলে, তাহাকে তখন হইতে কোনরূপ কঠিন কর্ম্মে নিয়োজিতা করিবে না। যে সকল গৃহকার্য্য সহজ এবং আমোদজনক (পরিবেশনাদি) তৎসমুদয় করিতে দিবে। যাহা সমধিক শ্রমসাধ্য তাহা পরিবর্জ্জিত করিবে। ক্লান্তিযুক্তা হইলে কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিতে দিবে। সময় সময় সঙ্গিনীদিগের সহিত তাস, দশপঁচিশ ইত্যাদি ক্রীড়া করিতে দিবে।

দুষ্পাচ্য দ্রব্য খাইতে দিবে না। গর্ভাবস্থায় বেশী অম্ল ও নানারূপ অখাদ্য (পোড়া মাটি প্রভৃতি) খাইতে না দেওয়া উচিত। সামান্য পরিমাণে পুরাতন তেঁতুলের অম্ল, পাতি ও কমলা লেবু মন্দ নয়। পথ্যের জন্য (গর্ভিণী আর রোগী প্রায় একই কথা, এজন্য "পথ্য" শব্দ ব্যবহৃত হইল) সুসিদ্ধ পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন; মুগ, মসূরের ডাইল; কৈ, মদ্গুর, বাটা, (বাসি না হয়) এইরূপ মৎস্যের ঝোল; সামান্য ঘৃতসংযুক্ত উপরি লিখিত চাউল এবং দাইলের খিচুড়ী; এই সকল সুপথ্য এবং সুপাচ্য। আহারের পর একটু বিশ্রাম আবশ্যক।

মল, মূত্রের উপর বিশেষ নজর রাখিবে। কোষ্ঠ পরিষ্কার না হইলে, ত্রিফলার ভেজান

অরেণ (পরিষ্কৃত রেড়ীর তৈল) জোলাপ দেওয়া উচিত। প্রস্রাব খোলাসা না হইলে কাঁচা দুধের সহিত সামান্য শর্করা মিশ্রিত জল (সরবতের মত) পান করাইবে।

একাকিনী শয়ন করিতে এবং কোথাও যাইতে দিবে না। যথাসম্ভব সঙ্গিনীগণের সহিত হাস্য, পরিহাস, আমোদাদিতে লিপ্ত রাখিবে। বিশ্রামকাল ভিন্ন সর্ব্বদা সামান্য সামান্য গৃহকার্য্য করিতে দিবে। সমস্ত দিবস আলস্যে শুইয়া কাটাইতে দিবে না। অধিক রাত্রি জাগরণ করিতে দিবে না। পেটে কোনরূপ আঘাত না পায়—আছাড় খাইয়া পড়িয়া না যায়।

মহাভারত, রামায়ণ এবং অন্যান্য সহজ অথচ হৃদয়গ্রাহী পুস্তক পাঠ করিতে দিবে (এক্ষণকার বালিকারা একটু একটু লিখিতে পড়িতে শিখে অধিক বয়স পর্য্যন্তও লেখা পড়ার চর্চ্চা দেখা যায়)। সৎসঙ্গ, সদালাপ বড়ই দরকার। ক্রমে যতই পূর্ণ গর্ভাবস্থা হইবে, ততই চিত্তবিনোদনের প্রতি দৃষ্টি রাখিবে। কোনরূপ ক্রোধ, হিংসাদির প্রাবল্য হইতে দিবে না। শকটাদিযোগে দূরদেশ গমন করিবে না। পরিহিত বস্ত্রাদি ঢিলা ও শিথিলবন্ধন অবস্থায় রাখিবে। প্রসবের কিছুদিন পূর্ব্বে একবার জোলাপ দেওয়া উচিত।

সূতিকা গৃহ—সম্ভব হইলে, দ্বিতলের প্রশস্ত এবং বড় বড় বাতায়নসংযুক্ত একটি কক্ষ নির্ব্বাচন করিয়া লইবে। উহাতে আবশ্যক মত যেন রৌদ্রালোক এবং বাতাসের সমাগম হয়। অভাব পক্ষে নিম্ন তলে সর্ব্বাপেক্ষা এবং সর্ব্বপ্রকারে উত্তম কক্ষটি লইতে হইবে। গৃহমধ্যে ২।৩ খানি সুন্দর এবং মনোহর চিত্রপট থাকিলে ভাল হয়। কিছুই কোনরূপ [illegible] হইবার সম্ভাবনা নাই। কারণ কক্ষমধ্যে অগ্নি এবং তৎসহযোগী ধূমের সম্পর্ক থাকিবে না। দিবাভাগে আবশ্যক হইলে, এবং রাত্রিতে নারিকেল ও রেড়ীর তৈল মিশ্রিত সুরক্ষিত দীপালোকে গৃহ আলোকিত রাখিবে। কেরোসিন্ তৈলের সম্পর্ক একেবারেই না থাকে। একে ত দুর্গন্ধময়, তাহার উপর তৈজসাদিতে এবং নাসিকারন্ধ্রে কালী পড়ে ও নিশ্বাসের সহিত গ্যাস উদরস্থ হয়। সকাল সন্ধ্যায় অতি মৃদু সুগন্ধ (ধূপাদি) দেওয়া বোধ হয় মন্দ নয়।

গ্রীষ্মকালে দরজা, জানালা একেবারে বন্ধ রাখা উচিত নয়। সমস্ত রুদ্ধ থাকিলে সহজ মানুষ যখন কষ্ট বোধ করে, তখন ভরা পোয়াতি, যাহার পেটের ভিতর আর একটা আছে সে কিরূপ কষ্ট ভোগ করিবে, ইহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। অত্যন্ত শীতেও তাহার গরম বোধ হইয়া থাকে।

রৌদ্র গমের সুবন্দোবস্ত থাকিলে, শীতকালেও দিবাভাগে সমস্ত দরজা জানালা বন্ধ করিয়া রাখিবার আবশ্যক নাই। পোয়াতি সন্নিপাতগ্রস্ত হইবার ভয়ে গৃহমধ্যে মোটা মোটা কাঠের ভুষা জ্বালাইয়া ধূমাকীর্ণ করিয়া প্রসূতিকে প্রসব বেদনার উপর অধিকতর কষ্ট দিবার প্রয়োজন কি? কেবল দুই কোণে দুইটা জলন্ত ধূমশূন্য আগুনের আংটা রাখিলেই যথেষ্ট। সময়ে সময়ে তাহাও অসহ্য হইয়া উঠে।

ধাত্রী।—প্রসববেদনা উপস্থিত হইলে সুশিক্ষিতা সুনিপুণা ধাত্রীর আবশ্যক। সেইরূপ ধাত্রী আপনা হইতেই পরিহিত বস্ত্র ছাড়িয়া, হস্তের নখর কাটিয়া এবং হস্তপদাদি উত্তমরূপে ধৌত করিয়া, সূতিকাগৃহে প্রবেশ করে। কেহ কেহ সূতিকাগৃহের বাহিরে কটাহে করিয়া অগ্নি রাখিয়া থাকেন। গৃহ প্রবেশকালে উহাতে হস্ত পদাদি উত্তপ্ত করিয়া লইতে হয়। [illegible]

কারণ কেবল হস্তপদাদি ধৌত করিলেই উহা ব্যাধি-বৃদ্ধির বীজ হইতে নিষ্কৃতি প্রাপ্ত না হইতে পারি। যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে তাহা অগ্নিতাপে ভস্মীভূত হইবে। কেহ অগ্নিস্পর্শ করিয়াই ক্ষান্ত হয়েন। কিন্তু তাহা উদ্দেশ্য নয় উচিতও নয়।

সূতিকাগারে প্রসূতি ধাত্রী এবং দুই তিন জন সমবয়স্কা আত্মীয়া ভিন্ন অপর বহুলোকের সমাগম বা উপস্থিতি আবশ্যক নাই। তাঁহাদের মধ্যে কাহারও বাহিরে যাইবার প্রয়োজন হইলে, পুনরায় কাপড় ছাড়িয়া এবং হস্তপদাদি ধৌত ও উত্তপ্ত করিয়া প্রবেশ করা উচিত। মোট কথা, কক্ষটি যেন যথাসম্ভব পবিত্রতা য থাকে। সঙ্গিনীগণেরও পোয়াতিকে প্রফুল্লচিত্ত রাখিতে চেষ্টা ও তদর্থে বিশেষ যত্ন করা বিধেয়।

(ক্রমশঃ।)

লীলাবতী দাস।

সেকালের বঙ্গীয় হিন্দু রমণীর প্রসাধন।

সকলদেশে সকল সময়েই রমণী প্রসাধনপ্রিয়; কিন্তু আমার মনে হয়, আধুনিক বঙ্গীয় হিন্দু রমণীগণ তাঁহাদের সেকালের ভগিনীদিগের ন্যায় প্রসাধনে যত্নপর নহেন। আমরা প্রাচীন বঙ্গীয় সাহিত্যে নারীদিগের প্রসাধন বর্ণনার যেরূপ বাহুল্য দেখিতে পাই, তাহাতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, তখনকার রমণীরা রন্ধনাদি গৃহকার্য্যে যেরূপ নিপুণা ছিলেন, শরীরের যত্নেও সেইরূপ মনোযোগ করিতেন। আজকাল সকলেই কার্য্যে ব্যস্ত। লোকে জীবন-সংগ্রামে এরূপ ব্যাপৃত হইয়া পড়িয়াছে যে, অন্য কোন বিষয়ে মনোনিবেশ করিবার সময় পায় না। তখন স্বামী স্ত্রীর নেপথ্য-রচনায় উৎসাহ দিতেন; কাজেই স্ত্রীও বেশবিন্যাসে যত্নবতী ছিলেন। যখন ধনপতি সদাগর প্রথমা পত্নী লহনার সুখের সংসারে সপত্নীরূপ কণ্টকবৃক্ষ রোপণ করিলেন, তখন অভিমানিনী বনিতাকে এই রূপে সান্ত্বনা প্রদান করিতেছেন—

"স্নান কাল কৈলে প্রিয়ে রন্ধনের শালে।
ভিজাবধি নাথ কৈলে কাছের বসনে॥
স্নান করিয়া শিরে না দেও চিরণি।
রৌদ্র নাহি পায় কেশ শিরে বিন্দু পানি॥
অবিরত ঐ চিন্তা আর নাহি গণি।
রন্ধনের শালে নষ্ট করিনু পদ্মিনী॥"

(কবিকঙ্কণ)

কিন্তু এখন স্ত্রীর বেশবিন্যাসে কর্ম্মক্লান্ত, চিন্তাক্লিষ্ট স্বামীর সে আদর, যত্ন নাই; কাজেই সে বিষয়ে স্ত্রীরও ঔদাসীন্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে; যেহেতু—"স্ত্রীণাং প্রিয়ালোকফলো হি বেশঃ।" যাহা হউক, সে কালের বঙ্গীয় হিন্দু রমণীর প্রসাধন ব্যাপার কিরূপ ছিল তাহা বিবৃত করিতেছি।

এই প্রসাধন ব্যাপারের প্রধান সহায়ভূতা নাপিতানির বর্ণন আমরা বাঙ্গালা ভাষার আদি কবি চণ্ডীদাসের রচনায় প্রাপ্ত হই। স্বয়ং রসিকচূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণ নাপিতানির বেশ ধারণ করিয়া শ্রীরাধিকার ভবনে উপস্থিত হইয়াছেন। তিনি—

"ধরি নাপিতানি বেশ, মহলেতে পরবেশ,
যেখানেতে বসিয়াছে রাই।
হাতে নিয়া দরপণী, খোলে নখ-রঞ্জনী,

যোজে, তৈল, সেই কমাই।
মুদিয়া যে রূপবতী নারী।
খুলিল কনক বাটি, আনিয়া জলের ঝারি,
চালিলেক সুবাসিত বারি॥
করে নখরঞ্জনী, চাঁছয়ে নখের কণি,
শোভিত করিল যেন চাঁদে।
আলসে অবশ গায়, সুখ লাগে আধ গায়
হাত দিলা নাপিতানি কাঁধে॥
নাপিতানি একে ভায়া, ননীর পুতলী, কায়া
বুলাইছে মনের আকুতে।
ঘসি ঘসি রাজা পায়, আলতা লাগায় তায়,
রচয়ে মনের হর ষতে॥"

চতুর্দ্দশ শতাব্দীর এই নাপিতানির সহিত বিংশতি শতাব্দীর নাপিতানিদিগের তুলনা করিলে বুঝিতে পারা যায়—"how slow the world moves !"

আমরা সংস্কৃত কাব্যে "একবেণীধরা", "প্রবলরুদিতোচ্ছূননেত্রা", "শিশিরমথিতা পদ্মিনী"র ন্যায় শোচনীয়া প্রোষিতভর্ত্তৃকা দিগকে দেখিয়াছি। বাঙ্গালা কবিরা সংস্কৃত কবিদিগের ন্যায় এ বিষয়ে ততটা বাড়াবাড়ি করেন নাই। যাহা স্বাভাবিক তাঁহারা তাহাই লিখিয়াছেন। স্বামী বিদেশে থাকিলে নারীগণ সহজেই বেশবিন্যাসে ঔদাসীন্য প্রকাশ করিয়া থাকেন, প্রিয় সমাগমেই তাঁহাদের প্রসাধনে অনুরাগ দৃষ্ট হয়। যখন ধনপতি সিংহলে বাণিজ্যার্থ গমন করিয়াছিলেন, তখন লহনা বা খুল্লনা বেশবিন্যাসে রতবতী ছিলেন না। কিন্তু সাধু বহুদিনের পর প্রবাস হইতে প্রত্যাগত হইলে সপত্নীদ্বয়ের বেশ-বিন্যাসের ধুম পড়িয়া গেল। অগ্রে খুল্লনার কথা বলি।

"খুল্লনার চরণে প্রণাম করে চেড়ী।
মাণিক ভাণ্ডারে আনে আভরণ পেড়ী॥
অবধানে ধরয়ে দুই বসন গাঁঠি।
মোচাড়ি করিয়া পরে অম্বরের শাড়ী॥
খুল্লনা মার্জ্জন করে পরে প্রবালবলী।
বাহুযুগে হেমরত্ন রসাল বলী॥
নয়নে কজ্জল দিল সীমন্তে সিন্দূর।
মার্জ্জন করিয়া পরে বলি কর্ণপুর॥
শ্রবণ উপরে পরে কনক বউলি।
সজল জলদে যেন খেলিছে বিজুলি॥
কবরী বান্ধিয়া দিল কুসুমের গভ।
আষাঢ়িয়া মেঘে যেন চাঁদ করে শোভা॥
বাহুযুগে আরোপিল কনক কেয়ূর।
পদযুগে আরোপিল কনক নূপুর॥
কটি বিরাজিত হেম মধুর কিঙ্কিণী।
পদে পদে শুনি মত্ত মরালের ধ্বনি॥
ডানি করে নিল রাঙ্গা রজতের ঝারি।
বাম করে নারায়ণ তৈল বাটি পূরি॥"
(কবিকঙ্কণ)

খুল্লনা নবীনা, সুন্দরী। সাধু বনিতার এই বেশ দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন, ও বিশেষ প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ঈর্ষায় লহনার সমস্ত শরীর জ্বলিতে লাগিল। এক সময়ে তিনিও সুন্দরী ছিলেন; কিন্তু বয়সে তাঁহার সে রূপ গিয়াছে। খুল্লনার সহিত তাঁহার রূপের তুলনা করিয়া সেই কথা আবার দুর্ব্বলা দাসী তাঁহাকে বিশেষ করিয়া দেখাইয়া দিয়াছে।—

"কলাপী কলাপ জিনি খুল্লনার কেশ।
অর্দ্ধ পাকা কেশে তোমার কি করিবে বেশ।
খুল্লনার মুখশশী করে টলমল।
বাহিতা পড়িল তোমার এবে গণ্ডস্থল॥
* * *
ক্ষীণমধ্যা খুল্লনা যেমন মধুকরী।
যৌবনবিহীনা তুমি হইলে ঘটোদরী॥
আসিবেন সাধু গৌড় থাকি কতদিন।
খুল্লনার রূপে হবে * * অধীন॥
অধিকারী হবে তুমি রন্ধনের হাবে।
মোর কথা স্মরণ করিবে পরিণামে॥
লোটাইয়া আউদল বন্দ ছন্দ মনুজন।

নাহি লেউটে পুনরপি জীবন যৌবন ॥"

লহনা সকলই বুঝেন। কিন্তু সপত্নী যে স্বামীর সমস্ত হৃদয় অধিকার করিয়া বসিবে, ইহা তাঁহার অসহ্য। তাই তিনিও গত-যৌবন ফিরাইয়া আনিবার জন্য প্রসাধনে নিযুক্ত হইলেন। তাঁহারও আভরণ-পেটিকা আসিল, তিনিও দোছুটি করিয়া বার হাত শাড়ী পরিলেন; কজ্জল, সিন্দুর ধারণ করিলেন, আর—

"আঁচড়িল কেশ পাশ নানা পরবন্ধে।
তৈলযুক্ত হয়ে পড়ে লহনার স্কন্ধে ॥
কবরী বান্ধিল রামা নাম গুয়ামুটি।
দর্পণ নেহালি দেখে যেন গুয়াগুটি ॥"

কিন্তু হায়! সকলই বৃথা হইল। মুখের মাছিতা ঢাকিল না। লহনা দুঃখে, ক্রোধে, অভিমানে—

"মাছিতা দেখিয়া মারে দর্পণে চাপড়।"

দর্পণের বড় অপরাধ! কিন্তু প্রবাদই আছে—

"নিন্দতি কঞ্চুককারং প্রায়ঃ শুষ্কস্তনী নারী।"

লহনা বুঝিলেন যে তিনি বালুকার উপর প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিতেছেন। তাই—

"লহনা বিকলা পানি পূরিয়া ভৃঙ্গারে।
নানা ঔষধ রামা মিশাল কর্পূরে ॥"

দুর্ব্বলের বল—মন্ত্র আর ঔষধ। লহনা ভাবিলেন যে সাধুর মনোমাতঙ্গ যদি প্রসাধনের সূক্ষ্ম ফাঁদ ছিন্ন করিয়া চলিয়া যায়, ঔষধের শৃঙ্খলে সে নিশ্চয়ই বশীভূত হইবে।

কবিকঙ্কণ মেছেতার ঔষধ জানিতেন না; সেই জন্যই লহনা এত কষ্ট পাইয়াছিলেন। তাঁহার পরবর্ত্তী কবিগণ তাহা জানিতেন। ইহা "বসন্ত-মালতী", "সুশীল-মালতী" বা এইরূপ কোন কবিরাজী ঔষধ নহে; ইহা সাক্ষাৎ "তেল-পড়া"। এমন অব্যর্থ ঔষধ আর নাই। কারণ শ্রীধর্ম্মমঙ্গলের কবি বলিয়াছেন—

"মুখে মাখে তৈল-পড়া, মরদে কাজর।
চাহিতে চক্ষের কোণে পুরুষ পাগল ॥"

ভারতচন্দ্র কেবলমাত্র যে "তৈল-পড়া" জানিতেন, তাহা নহে। "কাজল-পড়া", "ফুলপড়া", "সিন্দুরপড়া" ইত্যাদিও তাঁহার জানা ছিল।

"সখীর বচন শুনি, চন্দ্রমুখী মনে গুণি,
বটে বটে বলিয়া উঠিলা।
মন করে ধড় ফড়, কেশ বৈশ মড়মড়,
পতি ভুলাইতে মন দিলা ॥
খোঁপা বাঁধি তাড়াতাড়ি, পরিয়া চিকণ শাড়ী,
পড়িয়া কাজল চক্ষে দিলা।
পড়া তৈল মুখে মাখি, পড়া ফুল চুলে রাখি,
নানা মন্ত্রে সিন্দুর পড়িলা ॥
পরি পড়া গন্ধ চুয়া, মুখে পড়া পাণ গুয়া,
স্বায় বেশ নাগান ঝাঁপান।"

* * * *

(অন্নদামঙ্গল)

"পদযুগে আরোপিল কনক-নূপুর"

খুল্লনার এই বেশ হইতে মনে হয় যে, তখন সুন্দরীরা চরণে স্বর্ণালঙ্কার পরিধান করিতেন। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে সুন্দরীদিগের "রত্নপাশকসংযুক্তং," "দধতং রত্নমঞ্জীরং" পদযুগের বর্ণনা পাঠ করি। চরণে স্বর্ণ বা রত্নালঙ্কার পরিধান কতদিন অপ্রচলিত হইয়াছে তাহা ঠিক বলা যায় না। মাইকেল আধুনিক রীতি দেখিয়াই লিখিয়াছেন—

"স্বর্ণ-অলঙ্কার যারা পরে শিরোদেশে,
কণ্ঠে, হস্তে, পরেনা কি রজত
চরণে"? (বীরাঙ্গনা)

উপরোক্ত অংশগুলি হইতে আমরা দেখিতে পাই যে নবীনা, প্রৌঢ়া—সকল সধবা স্ত্রীলোকই তখন নয়নে কজ্জল পরিতেন। মুসলমান ও হিন্দুস্থানী স্ত্রীলোকেরা এখনও কাজল পরিয়া থাকেন। সংস্কৃত কবিও পুরসুন্দরীদিগের প্রসাধন বর্ণনায় বলিয়াছেন—

"বিলোচনং দক্ষিণমঞ্জনেন
সম্ভাব্য তদ্বঞ্চিতবামনেত্রা।
তথৈব বাতায়নসন্নিকর্ষং
যযৌ শলাকামপরা বহন্তী॥"
(কুমারসম্ভব।)

কিন্তু প্রাপ্তবয়াঃ বঙ্গীয় রমণীদিগের মধ্যে এই প্রথা এক্ষণে উঠিয়া গিয়াছে।

কবিকঙ্কণে আমরা অনেক স্থানে প্রসাধন ব্যাপারে নারায়ণ তৈলের উল্লেখ দেখিতে পাই। মনসার ভাসানেও দেখি—

"বড বণিকের বালা বয়সে নবীনা।
বেহুলার রূপ বেশ করে সর্ব্বজনা॥
হরিদ্রা বাটিয়া দিল বেহুলার গায়।
নারায়ণ তৈল দিল বেহুলার মাথায়॥"

নারায়ণ-তৈলের গুণ জানিলে আমরা বুঝিতে পারি সেকালের রমণীরা কেন ইহার এত আদর করিতেন। বৈদ্যকগ্রন্থে নারায়ণ-তৈলের গুণ এইরূপ লিখিত আছে:—

"বন্ধ্যা চ নারী লভতে চ পুত্রং
বীরোপমং সর্ব্বগুণোপপন্নম্।
শাখাশ্রিতে কোষ্ঠগতে চ বাতে
বৃদ্ধৌ বিশেষং পবনার্দ্দিতানাম্॥
জিহ্বানিলে দন্তগতে চ শূলে
উন্মাদ কৌব্জে অরকর্ষিতানাম্।
প্রাপ্নোতি লক্ষ্মীং প্রমদাপ্রিয়ত্বং
জীবেচ্চিরঞ্চাপি ভবেদ্ যুবেব॥"

যে হিন্দুরমণী মাতৃত্বলাভ জীবনের চরম উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করেন, যাঁহার—

"কাণা খোঁড়া পুত্র হো'ক তবু দুঃখ ঘোচে," সেই হিন্দুরমণী মাতৃত্বলাভের অনুকূল নারায়ণ তৈলের যে এত আদর করিবেন, তাহা বিচিত্র নহে।

যে কালে সাবান ছিল না। নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলির দ্বারা সাবানের কার্য্য সম্পাদিত হইত:—

"হরিদ্রা, কুঙ্কুম, তৈল আমিল দুর্ব্বলা।
খুল্লনার অঙ্গে দিয়ে দূর কৈল মলা॥
আমলকী দিয়া কৈল কেশের মার্জ্জন।"
(কবিকঙ্কণ)

হিন্দুস্থানী স্ত্রীলোকেরা এখনও কেশের মার্জ্জনের জন্য আমলকী ব্যবহার করিয়া থাকেন। নিম্নশ্রেণীর হিন্দুর গৃহে এবং সময় বিশেষে ভদ্র-পরিবারেও তৈল হরিদ্রার যথেষ্ট ব্যবহার হইয়া থাকে। কৃত্তিবাস পিটুলির দ্বারাও অঙ্গমার্জ্জনের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

সেকালে প্রচুর পরিমাণে চন্দন ব্যবহৃত হইত, এবং নারীগণ ফুলের মালার যথেষ্ট ব্যবহার করিতেন। "সুগন্ধি পুষ্পের মালা" ভিন্ন কবরীর শোভা হইত না। কেবল কবরীতে নহে—

"গলায় লম্বিত মাল্য মনোহর ফুল।
মকরন্দ লোভে মত্ত ভ্রমে অলিকুল॥"
(শ্রীধর্ম্মমঙ্গল)

এই কুসুমপ্রিয়তা এক্ষণে কোন কোন বাঙ্গালী কবির কবিতাতেই দৃষ্ট হইয়া থাকে।

স্ত্রীলোকেরা কপালে সিন্দুরের টিপ পরিতেন, তাহাতে কিরূপ শোভা হইত দেখুন:—

"কপালে সিন্দুর, তম করে দূর,
যেন প্রভাতের ভানু।"
(কবিকঙ্কণ)

"কপালে সিন্দুর ফোঁটা প্রভাতের রবি।
চন্দন চন্দ্রিমা কোলে মঙ্গলের ছবি॥"
(ধর্ম্মমঙ্গল)

ইহার কত কাল পরে যে,—"চন্দনের বিন্দুসহ কপালেতে উল্‌কি"র সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা নির্ণয় করিতে আমরা অক্ষম।

কবিকঙ্কণের সময়ে কাঁচুলির বড় আদর ছিল দেখা যায়। কাঁচুলি নানা কারুকার্য্যে খচিত হইত। স্বয়ং বিশ্বকর্ম্মা দুর্গার জন্য কাঁচুলি প্রস্তুত করিতেন, ইহা

আমরা রামেশ্বরের শিবায়নে ও কবিকঙ্কণের চণ্ডীতে দেখিতে পাই। রামেশ্বর কর্ণটী কাঁচুলির বিশেষ সুখ্যাতি করিয়াছেন। পুরাণ ও মহাভারতের নানাচিত্র সেই কাঁচুলিতে অঙ্কিত হইত।

"বিশাই কাঁচুলি লেখে ভারত পুরাণ দেখে
লেখে নানা নিগমের সার।
করিয়া চণ্ডিকা ধ্যান তুলি করে সাবধান
আগে লেখে দশ অবতার॥" ইত্যাদি

গলিতযৌবনা লহনা—

"রসনে তুলিয়া রামা বান্ধে * ।
বিনোদ কাঁচুলি পরে তাহার উপর॥"

"নয়ানী শিবাই দত্ত বারুয়ের বৌ"—

"চলিতে গলিতে * * যাবে ভুলে।
তিন ছেলের মা মাগি কাঁচুলি বাঁধে তুলে॥"
(ধর্ম্মমঙ্গল)

এই শেষোক্ত নিম্নোক্ত হইতে বুঝা যায় যে বঙ্গদেশে কাঁচুলির ব্যবহার ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছিল। তাই দেখিতে পাই যে ভারতচন্দ্র চিরাগত প্রথানুসারে বর্ণিত অন্নপূর্ণার—

"অমূল্য কাঁচুলী শাড়ী উড়ানী যে আর।"

এর কথা বলিয়াছেন, কিন্তু অন্য নায়িকাগণের বেশবর্ণনায় কাঁচুলীর উল্লেখ করেন নাই। তবে তাঁহার সময় বা তাহার কিছু পূর্ব্ব হইতে "উড়ানী" বা "ওড়নার" ব্যবহার প্রচলিত হইয়া থাকিবে। মুসলমানেরা বহুকাল বঙ্গদেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহাদের অনুকরণে এই "উড়ানীর" ব্যবহার যে ক্রমশঃ হিন্দু রমণীদিগের মধ্যে প্রচলিত হইবে ইহা বিচিত্র নহে। যে সকল বঙ্গীয় রমণী পশ্চিমাঞ্চলে বাস করেন, তাঁহারা এখনও দেশের প্রথানুসারে ওড়না ব্যবহার করিয়া থাকেন। ওড়না ব্যবহারের প্রথা উত্তম বলিয়াই মনে হয়।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসরোজরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ।

বিবাহ-সম্বন্ধে একটী প্রশ্ন।

আজ আমরা একটী প্রশ্ন লইয়া সাহিত্যিক-সমাজে উপস্থিত হইতেছি। আমাদের সবিনয় নিবেদন এই যে, কোন পাঠক যেন এই প্রশ্নটীকে কোনরূপ প্রচ্ছন্ন-রসিকতার বিষয় বলিয়া মনে না করেন। প্রকৃত পক্ষে, আমাদের মনে অনেক দিন হইতে এই প্রশ্নটী উদিত হইতেছে; পরিচিত অনেক বন্ধুবান্ধবের নিকট ইহার সদুত্তর পাইবার চেষ্টা করিয়া বিফলমনোরথ হইয়াছি; এবং সেই জন্যই সাহিত্যসভার আশ্রয় লইতে অগ্রসর হইয়াছি। আশা করি, সাহিত্য-সংহিতার কোন বিজ্ঞ পাঠক

প্রায় ত্রিংশবর্ষ অতীত হইতে চলিল—আমরা তখন বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করি,—আমাদের পরিচিত একটী সম্ভ্রান্ত মুসলমান ভদ্রলোক একটী তরুণী গণিকাকে মুসলমান ধর্ম্মশাস্ত্র-বিহিত নিয়মে বিবাহ করিয়া গৃহে আনয়ন করেন। আমরা তখন সংসারের প্রায় কোন সংবাদই রাখি না, অথচ বালচপলতা বশতঃ সকল বিষয় লইয়া তর্ক করিতে এবং তদানীন্তন বিদ্যাবুদ্ধি সঙ্গত এক একটা মীমাংসা করিতে বেশ পটু ছিলাম। গণিকার যে বিবাহ হইতে পারে, তিনি যে "গৃহিণী," "সহধর্ম্মিণী",

পারেন, বিশেষতঃ তিনি যে অবগুণ্ঠনাবৃত হইয়া অন্দরের ভিতর একেবারে "পর্দানশীন বিবি" হইতে পারেন, এই জ্ঞান আমাদের হিন্দু সমপাঠিগণের মধ্যে কাহারও ছিল না;—সুতরাং উল্লিখিত বিবাহ ব্যাপার লইয়া আমাদের মধ্যে তুমুল তর্কযুদ্ধ উপস্থিত হইল। হিন্দু সহপাঠিগণ সকলেই, কেবল এই অধম লেখক ব্যতীত, সমস্বরে বলিলেন যে বেশ্যা বিবাহ অতিশয় অপকার্য্য,—ইহার দ্বারা কুলমান নষ্ট, চরিত্র অধঃপতিত, এবং পারিবারিক পবিত্রতা অন্তর্হিত হইয়া যায়, ইত্যাদি ইত্যাদি। আমাদের শ্রেণীতে যে দুই চারিজন মুসলমান ছাত্র ছিলেন, তাঁহারা তাঁহাদের ধর্ম্মশাস্ত্রের দোহাই দিয়া ঐ বিবাহ-নীতির সমর্থন করিতে গেলেন বটে কিন্তু তাঁহাদের যুক্তিতর্ক গণ্ডগোলের মধ্যে ডলাইয়া গেল,—তাঁহারা পরাস্ত হইলেন। আমরা (বর্ত্তমান লেখক) কিন্তু হিন্দু সমপাঠীদিগের সহিত একমত হইতে পারিলাম না;—বলিলাম,—

"তোমরা মুসলমানদিগের এই পদ্ধতির এত নিন্দা করিতেছ কেন? উঁহাদের শাস্ত্র ত সকলকে বাছিয়া বাছিয়া বেশ্যাদিগকে বিবাহ করিতে বলেন না। তবে যদি কোন সদ্বংশজাত যুবক অবিমৃষ্যকারিতা বশতঃ কুপথগামী হয় এবং যদি তাহার প্রেমাস্পদ জন তাহার প্রতি সমান ও অকপট প্রীতি করে, তবে, এরূপ স্থলে মঙ্গল হয় না কি? একজন পতিত উদ্ধার হইয়া সমাজের ক্রোড়ে গৃহীত হইল, অন্যজনও বিষম নৈতিক পাপ হইতে রক্ষা পাইল এবং যদি উভয়ের সংযোগ-প্রসূত কোন সন্তান উৎপন্ন হয়, সেও সমাজের মধ্যে বংশের একজন হইয়া উঠিতে পারে; এরূপ বিবাহ কি সর্ব্বাংশেই মন্দ? তোমাদের হিন্দুসমাজে এইরূপ শত সহস্র কুপথগামী যুবক যুবতীর কি দুর্দ্দশা হইতেছে তাহা কি দেখিতেছ না? ইত্যাদি"—আমাদের এই কথায় আমাদের হিন্দুবন্ধুগণ উচ্চহাস্যের রোল উঠাইয়া দিয়া আমাদিগকে "হিন্দুর কুলাঙ্গার", "ম্লেচ্ছ", "খৃষ্টান্" ইত্যাদি সুমিষ্ট উপাধি পরম্পরা দ্বারা আপ্যায়িত করিলেন এবং অনেক দিন পর্য্যন্ত তাঁহারা আমাদিগকে ঐ সকল নাম দিয়া আহ্বানাদি করিতেন।

সেই ঘটনার পর হইতে এই প্রশ্ন আমাদের হৃদয় অধিকার করিয়া আছে। মুসলমান ও খৃষ্টান ধর্ম্মে যে বেশ্যাকে বিবাহে অধিকার দিয়াছে, তাহার উদাহরণ নিত্যই দেখিতেছি কিন্তু আর্য্য ধর্ম্মশাস্ত্রের মত কি? পূর্ব্বে এই প্রশ্ন যাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি, তিনিই উপহাস করিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন। আবার যে সকল ব্যক্তি আর্য্যদিগের ধর্ম্মনীতি বা সমাজনীতির কোনরূপ অনুশীলন করেন নাই, তাঁহারাই উপহাস করিতে অধিকতর পটু! যাহা হউক, অদ্য সেই পুরাতন প্রশ্ন লইয়াই উপস্থিত হইতেছি,—"বেশ্যাদিগের বিবাহ হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজানুমোদিত কি না এবং বর্ত্তমান সময়ে না হইলেও কোন দিন হিন্দুসমাজে এইরূপ বিবাহ প্রচলিত ছিল কি না?"—এ সম্বন্ধে আমরা যতদূর আলোচনা করিয়াছি, তাহাও পাঠক মহাশয়দিগকে জানাইতেছি।

প্রথমেই অকপটভাবে স্বীকার করিতেছি যে, বর্ত্তমান হিন্দুসমাজে এই প্রকার বিবাহ প্রচলিত নাই। প্রচলিত থাকিলে এই প্রশ্ন উত্থাপন মাত্রেই এত উপহাস শুনিতে হইত না। বর্ত্তমানে হিন্দুসমাজে দেখিতে পাইতেছি যে, অনেক এরূপ প্রথা প্রচলিত রহিয়াছে যে শাস্ত্র দ্বারা তৎসমুদয়ের সমর্থন করিতে না পারিলেও সকলেই সেই সকল প্রথা মানিয়া চলিতেছেন এবং কেহ তৎসম্বন্ধে কোন আপত্তি

কারণে পণ্ডিতগণ "দেশাচার" নামক বস্তুর দোহাই দিয়া তাহাদের সমর্থন করেন। দেবোদ্দেশে নিবেদিত ভিন্ন অন্য মৎস্য মাংস-ভোজন যে শাস্ত্র-নিন্দিত, তাহা কে না জানেন? অথচ বাজারের মৎস্য মাংস গ্রহণ করেন না এরূপ হিন্দুর সংখ্যা মুষ্টিমেয়। রঙ্গপুর, কোচবেহার, আসাম প্রভৃতি প্রদেশে হংস ও পারাবত দেব সেবায় দেওয়া হয়, মানুষের সেবার ত কথাই নাই। যাঁহারা নিজমনে বেশ জানেন যে দৃষ্টরজস্কা অবিবাহিতা কন্যা গৃহে রাখিতে নাই,—বহু পূর্ব্বেই তাহার বিবাহ দেওয়া উচিত;—অন্যথায় পিতা, মাতা, ভ্রাতা, বিবাহকারী সকলেই ঘোর পাপে পাপী,—তাঁহারাই অর্থাৎ বঙ্গদেশের কুলীন মহাশয়েরাই—শাস্ত্রাজ্ঞা অবহেলনে সর্ব্বাগ্রণী! অধিক আর কি বলিব? কোন প্রকারে একবার সমাজে সুপ্রচলিত করিয়া দিলেই সেই প্রথা সর্ব্বজন-মাননীয় হইয়া উঠে। এই ভারতবর্ষে, স্থানবিশেষে, হিন্দুসমাজের রমণীকুল অবাধে স্বেচ্ছামত পুরুষ-সংসর্গ করিতেছেন, এরূপ প্রণয়ে সন্তানের পিতৃনির্দ্দেশ অসম্ভব বলিয়া সে মাতুলের ধনাধিকারী বলিয়া স্থির হইতেছে। দাক্ষিণাত্যে দ্বিজগণের মধ্যেও মাতুলকন্যা বিবাহ প্রচলিত রহিয়াছে। বঙ্গদেশে যে সকল আচরণীয় উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদিগের মধ্যে বিধবা বিবাহের নাম গন্ধও নাই, বঙ্গদেশের বাহিরে সেই সকল হিন্দুদিগের মধ্যে বিধবা বিবাহ অবাধে চলিতেছে এবং বিধবা-বিবাহ-জাত পুত্র পিতার ঔরসপুত্রবৎ সমাজে গৃহীত ও ধর্ম্মাধিকরণে স্বীকৃত হইতেছে। কোনও প্রদেশে এক পরিবারের মধ্যে ভগিনী প্রকাশ্যে নৃত্য-গীত-ব্যবসায়ে এবং অপ্রকাশ্যে অপবিত্র ব্যবসায়ে জীবিকোপার্জ্জন করিতেছেন, অধিকে ভ্রাতা বিবাহ করিয়া গার্হস্থ্যধর্ম্ম প্রতিপালন করিতেছেন! এবম্বিধ শত শত প্রথা অবাধে হিন্দুসমাজে চলিয়া যাইতেছে এবং সামাজিকগণ বাঙ্‌নিষ্পত্তিও করিতেছেন না। যদি কোন হেতুবশতঃ এইরূপ বিবাহ সমাজে প্রচলিত থাকিত, তাহা হইলে সকলে উপহাসের পরিবর্ত্তে উহার সাগ্রহ সমর্থন করিতেন।

প্রচলিত হিন্দুশাস্ত্রেও এবম্প্রকার বিবাহ অনুমোদিত হয় নাই। বঙ্গদেশ-প্রচলিত হিন্দুশাস্ত্র অর্থে স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয় সংকলিত "উদ্বাহ-তত্ত্ব"। উহাতে বেশ্যার বিবাহ কেন, যুবতী- বিবাহ এবং বিধবা বিবাহও অনুমোদিত হয় নাই। আর এক কথা এই যে বর্ত্তমানে অসবর্ণ-বিবাহ হিন্দুসমাজে বিদ্যমান নাই, সুতরাং এরূপ বিবাহও শাস্ত্রানুমোদিত হইতে পারে না।

প্রাচীন স্মৃতিসমূহ অধ্যয়ন করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, পুরাকালে আর্য্যদিগের মধ্যে অসবর্ণ-বিবাহ প্রচলিত ছিল। শাস্ত্রসমূহ অবাধ অসবর্ণ বিবাহের গতি রোধ করিতে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাও এ সকল শাস্ত্র পাঠে বেশ বুঝিতে পারা যায়। শাস্ত্র প্রথমতঃ অনুলোম-বিবাহে অনুমতি দিয়াছেন এবং প্রতিলোম-বিবাহ নিবারণকল্পে অশেষ পরিশ্রম করিয়াছেন। স্থলবিশেষে অনুলোম-বিবাহ-জাত সন্তানগণ পিতৃ-সবর্ণতা এবং কোন কোন স্থলে মাতৃ-সবর্ণতা পাইবার অধিকারী—ইহা নির্দ্দেশ করিয়া শাস্ত্র প্রতি-লোম-বিবাহ-জাত সন্তানকে "বর্ণসংকর" অপবাদ দিয়া সমাজের নিম্ন—অতি নিম্নস্তরে বসাইয়াছেন। যে সমাজে চৌর্য্য ঘটনা ঘটেনা সে সমাজে যেমন চুরি নিবারণোদ্দেশ্যে আইন করিবার আবশ্যকতা হয় না, তদ্রূপ শাস্ত্রকারদিগের

সময়ে সমাজে যদি প্রতিলোম-বিবাহ প্রচলিত না থাকিত, তাহা হইলে তাহার নিবারণজন্য সামাজিক কঠোর দণ্ড প্রয়োগের ব্যবস্থা রচনা করিতে হইত না। যাহা হউক পরিশেষে—শাস্ত্র-শাসনে প্রতিলোম-বিবাহ-প্রথা সমাজ হইতে উঠিয়া যায় এবং কালক্রমে অনুলোম-বিবাহ-প্রথারও লোপ পাইয়া এককমাত্র সবর্ণ-বিবাহ প্রথা দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং এখন একমাত্র সবর্ণ বিবাহই প্রচলিত। অথবা, এখন সবর্ণ নহে, সজাতির শত শত উপ-বিভাগের মধ্যে অতি সংকীর্ণ হইতে সংকীর্ণ সীমার মধ্যে বিবাহ হইয়া থাকে। এক ব্রাহ্মণ বর্ণ এখন ১৮০০ পৃথক্ পৃথক্ উপশ্রেণীতে বিভক্ত; এই অষ্টাদশ শত শ্রেণীর মধ্যে একতর শ্রেণীর ব্রাহ্মণ অন্যতর শ্রেণীর কন্যা গ্রহণ করেন না। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য-বর্ণেরও তদ্রূপ দশা। আর শূদ্র বর্ণের ত কথাই নাই! যাবতীয় সংকরবর্ণ, আর্য্যগৃহীত অনার্য্যগণ এবং বহুবিধ পতিত বা ব্রাত্য ক্ষত্রিয় বৈশ্য এই চতুর্থ বর্ণের কুক্ষিগত। শাস্ত্রানুসারে রজক ও ধীবর, কুম্ভকার ও নাপিত প্রভৃতি জাতি সকলেই শূদ্র, সুতরাং ইহাদের মধ্যে পরস্পর বিবাহ চলিতে পারে, কিন্তু তাহা কে চালাইতেছে? এক নাপিতই যে কত উপশ্রেণীতে বিভক্ত তাহারই সংখ্যা নাই।

যাহা হউক, অসবর্ণ বিবাহ যে সময়ে আর্য্যজাতির সমাজে প্রচলিত ছিল, সেই সময়েও বেশ্যাগণ বিবাহে অধিকারী ছিল কি না? আমরা এই প্রশ্নের সদুত্তর দিতে অক্ষম। তবে শাস্ত্রীয় কোন প্রকৃত বাধা ছিল বলিয়া বোধ হয় না। মহর্ষি মনুর সময়ে যে অসবর্ণ-অনুলোম-বিবাহ প্রচলিত ছিল, তাহা নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকাবলী হইতে জানিতে পারা যায়—

"সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তাদারকর্ম্মণি।
কামতস্তু প্রবৃত্তানামিমাঃ স্যুঃ ক্রমশো বরাঃ ॥১২॥
শূদ্রৈব ভার্য্যা শূদ্রস্য সা চ স্বা চ বিশঃ স্মৃতে।
তে চ স্বা চৈব রাজ্ঞঃ স্যুস্তাশ্চ স্বা চাগ্রজন্মনঃ ॥১৩॥ তৃতীয় অধ্যায়॥"

এই শ্লোকদ্বয়ের মর্ম্মার্থ এই যে দ্বিজগণের পক্ষে সবর্ণাবিবাহই প্রশস্ত; তবে ইচ্ছা হইলে ক্রমশঃ হীনবর্ণা স্ত্রী গ্রহণ করিতে পারিবে। উদাহরণ স্বরূপ বলিতেছেন, শূদ্রের পক্ষে একমাত্র শূদ্রা, বৈশ্যের পক্ষে বৈশ্যা ও শূদ্রা, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা এবং শূদ্রা এবং ব্রাহ্মণের পক্ষে পূর্ব্বোক্ত বর্ণত্রিতয়ের কন্যা অথবা ব্রাহ্মণ স্ত্রী হইতে পারে। বিবাহের প্রকার ভেদের সম্বন্ধে মনুর মত এই ঃ—

"ব্রাহ্মোদৈবস্তথৈবার্ষঃ
প্রাজাপত্যস্তথাসুরঃ।
গান্ধর্ব্বোরাক্ষসশ্চৈব পৈশাচশ্চাষ্টমোধমঃ ॥২১॥" তৃতীয় অধ্যায়॥

এই আট প্রকার বিবাহের মধ্যে আসুর গান্ধর্ব্ব ও পৈশাচ বিবাহের লক্ষণ ঃ—

"জ্ঞাতিভ্যো দ্রবিণং দত্ত্বা কন্যায়ৈ চৈব শক্তিতঃ।
কন্যা প্রদানং স্বাচ্ছন্দ্যাদাসুরো ধর্ম্ম উচ্যতে ॥৩১॥
ইচ্ছয়া ন্যোন্য সংযোগঃ কন্যায়াশ্চ বরস্য চ।
গান্ধর্ব্বঃ স তু বিজ্ঞেয়ো মৈথুন্যঃ কাম-সম্ভবঃ ॥৩২॥
সুপ্তাং মত্তাং প্রমত্তাং বা রহো যত্রোপগচ্ছতি।
স পাপিষ্ঠো বিবাহানাং পৈশাচশ্চাষ্টমোধমঃ ॥৩৪॥" ৩য় অধ্যায়।

এই তিন প্রকার বিবাহ হিন্দুশাস্ত্রানুসারে নিকৃষ্ট শ্রেণীর তাহাতে সন্দেহ নাই; তথাচ গান্ধর্ব বিবাহ ক্ষত্রিয়দিগের এবং

আসুর বিবাহ বৈশ্য ও শূদ্রের পক্ষে বিহিত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে এবং পৈশাচ বিবাহ অতি অধম বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। যাহাই হউক এই তিন বিবাহে যে বেশ্যার অধিকার নাই তাহা নিঃসংশয়িতরূপে বলা যাইতে পারে না। পরন্তু এই তিন প্রকার যৌনসম্বন্ধকে "বিবাহ" বলিয়া স্বীকার করায় তদানীন্তন হিন্দুসমাজের অতিশয় উদারতা প্রকাশ পাইতেছে। প্রাচীনকালে হিন্দুসমাজ স্ত্রীজাতির সম্বন্ধে আধুনিক সময়ের মত কঠোর ছিল না এরূপ অনুমান করিবার যথেষ্ট কারণ আছে।

প্রাচীন স্মৃতিশাস্ত্রে আমাদের অনুমানের অনুকূল অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। অধুনা কোন সতী রমণী ঘটনাচক্রে কোন পাপিষ্ঠ কর্ত্তৃক বিষম অত্যাচারে প্রপীড়িত হইলে তিনি আর সমাজের ক্রোড়ে স্থান পান না। সে হতভাগিনীর পক্ষে হয় আত্মহত্যা নয় অপবিত্রভাবে জীবন যাপন অনিবার্য্য হইয়া উঠে। পূর্ব্বে কুলস্ত্রী কোন কারণে দৈবাৎ পদস্খলিত হইলেও এমন কি গৃহত্যাগ করিলেও তিনি সমাজের আশ্রয় হইতে বঞ্চিত হইতেন না। সময় বিশেষে রমণীগণ স্বামীর অভাবে অপরের আশ্রয় গ্রহণ করিতেন এবং তাহা ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রতিকূল ছিল না। আমরা শ্লোক উদ্ধার করিয়া প্রবন্ধের কলেবর অযথা স্ফীত করিতে ইচ্ছুক নহি; কৌতুহলী পাঠক অত্রি-সংহিতা ও বশিষ্ঠ-সংহিতা পাঠ করিয়া দেখিলেই আমাদের উক্তির সত্যতা বুঝিতে পারিবেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসত্যবন্ধু দাস।

বঙ্কিমচন্দ্র।

বঙ্গের সাহিত্য-পটে যে মনোজ্ঞ ছবি
আঁকিলে কল্পনাবলে হে মনীষি কবি!
কোথায় উপমা তার এ ভব মণ্ডলে?
কিম্বার শোভয়ে ভৃঙ্গ অমল কমলে?
আছে কি এ পূর্ণ শোভা শারদ অম্বরে?
অথবা শিশিরসিক্ত কুসুম-অধরে?
অদ্ভুত কল্পনার অপূর্ব্ব সৃজন—
রাজসিংহ, সীতারাম মোহনদর্শন—
রজনী, আনন্দমঠ, দুর্গেশনন্দিনী,
আরও বিবিধ কত মরকত মণি—
উজ্জ্বল করিয়া দিলে সাহিত্য-ভাণ্ডার।
মাতৃভাষা উদ্দীপিতা গৌরবে তোমার।
ভারতীর বর পুত্র ধন্য কবিবর!
অপূর্ব্ব প্রতিভা তব অক্ষয় অমর।

শ্রীমতী সরলাসুন্দরী মিত্র

ওঁ।

ওঁই বেদ, ওঁই ব্রহ্ম

একমেবাদ্বিতীয়ম্।

অ উ ম ত্রি অক্ষরে ওঁ—

ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শঙ্করম্।

ত্রি হ'তে তেত্রিশকোটী

প্রকাশ বিভক্তাকারে।

যে বিভক্ত, সেই তিন,

তিনই এক ওঁকারে।

সূক্ষ্ম-স্থূল-কারণ, ওঁ

হ্রী-শ্রী-স্বধা-স্বাহা।

পুং স্ত্রী সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ

এক ওঁয়ে সবি তাহা।

তেজোরূপী পরমাত্মা,

ওঁকারের ওই বিন্দু।

জ্যোতির্ম্ময়ী জীবাত্মা সে

অর্দ্ধমাত্রা রেখা-ইন্দু।

প্রকৃতি পুরুষ এক—

'চন্দ্র' 'বিন্দু' যুক্ত হ'য়ে।

'ওঁ' টি সে বিরাট রূপ,

জ্ঞান-কর্ম্মেন্দ্রিয় ল'য়ে।

অদ্বিতীয় এক ব্রহ্ম,

ওঁই এক নাম তাঁর।

নাম নামী অপার্থক্য,

সত্য-নিত্য-সারাৎসার।

ক্ষিত্যপ্‌তেজ-মরুদ্ব্যোম—

চন্দ্র-সূর্য্য জ্যোতিষ্মান—

সপ্ত ধাতু ওঁকারের

রূপই প্রকাশমান।

নবগ্রহ, অষ্টবসু,

ভূত যত দিকপাল।

কুবের, বরুণ, ইন্দ্র,

কাল কাল মহাকাল।

দেবতা, সপ্তর্ষি, সিদ্ধ,

চারণ, কিন্নর, যক্ষ।

বেতাল, দানব, নাগ,

অপ্সর, গন্ধর্ব্ব, রক্ষ।

উদ্ভিদ, পর্ব্বত, সিন্ধু,

মানবাদি প্রাণীকুল।

সচল নিশ্চল যত,

চরাচরে সূক্ষ্ম স্থূল।

সবারি ওঁকার হ'তে,

উৎপত্তি-পালন হয়।

ও বিরাট ওঁকারেতে,

পুনঃ সবি পায় লয়।

ভ্রাম্যমান বিশ্বচক্রে—

উঠিছে ওঁকার রব।

সপ্তভাগ হ'য়ে ওঁই,

ধ্বনিতেছে দিক সব।

"ওঁ ঐঁ হ্রীঁ ক্লীং হ্রীং হ্রীঁং ক্লীং" এ—

বীজমন্ত্র সুমধুরে;

সা রে গা মা পা ধা নি, সে

বাজিতেছে সপ্তস্বরে।

ওই সুর ব্যাকরণে,

সপ্ত-বিভক্তিতে বন্দে।

আলোড়িয়া সর্ব্বলোক,

ললিত গায়ত্রী-ছন্দে।

ওঁ ওঁ ভূঃ, ওঁ ভুবঃ, ওঁ স্বঃ,

ওঁ মহঃ, ওঁ জনঃ" দেব!

"ওঁ তপঃ, ওঁ সত্যং" ব্রহ্ম

নমঃ নমঃ একমেব।

ওম্ তৎ সৎ।

শ্রীমতী সুশীলাসুন্দরী মিত্র।

২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত।

সাহিত্য-সংহিতা।

দ্বাদশ খণ্ড] ১৩১৮ সাল, কার্ত্তিক। [৬ষ্ঠ সংখ্যা

প্রাচীন ও আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্য।

এই প্রবন্ধের নাম দেখিয়া যেন কেহ মনে না করেন যে, বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের ধারাবাহিক ইতিহাস লেখা ইহার উদ্দেশ্য। এই প্রবন্ধে স্থূলতঃ প্রাচীন ও আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রকৃতি আলোচিত হইয়াছে ও সংক্ষেপে উভয় কালের সাহিত্যের তুলনায় সমালোচনা করা হইয়াছে।

এই উদ্দেশ্যে আমরা চণ্ডীদাসকে বাঙ্গালার আদি কবি ও ভারতচন্দ্রকে* প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের শেষ কবি বলিয়া ধরিয়া লইয়াছি। প্রাচীন কবিগণের মধ্যে কেহ কেহ কৃষ্ণ, কালী প্রভৃতি দেবদেবী-গণের বিষয়ে পদাবলী প্রণয়ন করিয়াছেন, কেহ কেহ প্রাচীন সংস্কৃত কাব্য পুরাণাদির অনুবাদ করিয়া গিয়াছেন, কেহ কেহ পুরাণাদির আখ্যায়িকা অবলম্বনে কাব্য প্রণয়ন করিয়াছেন, এবং কতকগুলি কবি চৈতন্যের চরিত্র বর্ণনা করিয়াছেন। পদাবলী-প্রণেতৃগণের মধ্যে চণ্ডীদাস, গোবি-ন্দদাস, রামপ্রসাদ প্রভৃতি, অনুবাদকগণের মধ্যে কৃত্তিবাস, কাশীদাস প্রভৃতি, পৌরাণিক আখ্যায়িকা অবলম্বনে কাব্যপ্রণেতৃগণের মধ্যে মুকুন্দরাম, রামেশ্বর, কেতকাদাস, ঘন-রাম, ভারতচন্দ্র প্রভৃতি, ও চৈতন্য-চরিত্র-লেখকগণের মধ্যে কৃষ্ণদাস, বৃন্দাবনদাস প্রভৃতি কবিগণই সমধিক প্রসিদ্ধ।

এই সকল কবির কাব্য পাঠ করিলে আমরা দেখিতে পাই যে কোন দেব বা দেবীর চরিত্র অবলম্বনে তাঁহাদের প্রত্যেকের কাব্য রচিত। চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, জ্ঞান-দাস প্রভৃতি কবিগণ রাধাকৃষ্ণের প্রেমের বর্ণনা করিয়াছেন, রামপ্রসাদ কালীবিষয়ক পদাবলী প্রণয়ন করিয়াছেন, কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীরাম দাসের মহাভারত রাম ও কৃষ্ণের লীলা ও মাহাত্ম্য বর্ণনায় পূর্ণ, মুকুন্দরাম চণ্ডীর, রামেশ্বর শিবের, কেতকা-দাস মনসার, ঘনরাম ধর্ম্মের ও ভারতচন্দ্র অন্নদার মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়াছেন, আর চৈতন্য-চরিতাখ্যায়কগণ চৈতন্যকে কৃষ্ণের অবতাররূপে বর্ণনা করিয়া কাব্য প্রণয়ন করিয়াছেন। মোটকথা, প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য কৃষ্ণ, শিব, দুর্গা, মনসা প্রভৃতি দেবদেবীগণের মাহাত্ম্য বর্ণনাতেই পরিপূর্ণ।

মুসলমান আধিপত্যের সময়েই বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতির সূত্রপাত দেখিতে পাই, অথচ এই মুসলমান আধিপত্য সকল সময়ে হিন্দুর পক্ষে শুভকর হয় নাই। বাঙ্গালার সিংহাসন লইয়া কোন কালেই মুসলমান শাসনকর্ত্তাদিগের মধ্যে আত্মকলহের বিরাম ছিল না। অতি অল্পসংখ্যক নবাবই নির্ব্বিবাদে বাঙ্গালার সিংহাসনে আরোহণ বা রাজ্যশাসন করিতে পারিয়াছিলেন। দিল্লীর বাদসাহের শাসন প্রায়ই বাঙ্গালার সীমা পর্য্যন্ত পৌঁছিত না; যখন পৌঁছিত,

* সাহিত্য-সভার অধিবেশনে পঠিত।

তখন দেশ ছারখার হইত। রক্তপাত, গৃহদাহ, অধিবাসীদিগের দ্রব্যাদি লুণ্ঠন, এ সকল একরূপ নিত্য ঘটনার মধ্যে ছিল। হোসেন শাহ গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করিয়া তাঁহার অনুচরগণকে কয়েকদিনের জন্য গৌড়ের হিন্দু অধিবাসীদিগের গৃহাদি লুণ্ঠন করিবার অনুমতি দিয়াছিলেন। একবার অনুমতি পাইয়া তাহারা এই সহজ ও লাভজনক কার্য্যে এরূপ উৎসাহী হইয়া উঠিয়াছিল যে, লুণ্ঠন কার্য্য নির্দ্দিষ্ট সময়ের পরও বহুদিন চলিতে লাগিল। শেষে ব্যাপার এরূপ গুরুতর হইয়া দাঁড়াইল যে, লোভোন্মত্ত দস্যুদিগকে নিরস্ত করিতে না পারিয়া নবাব বাধ্য হইয়া প্রায় বার শত সৈনিকের প্রাণ নাশের আদেশ দিয়াছিলেন। হিন্দু বিধর্ম্মী, কাফের; কাফের স্বীয় প্রজা হইলেও তাহার নির্য্যাতন পুণ্য কার্য্য বলিয়াই মুসলমান নবাবগণ মনে করিতেন। সময়ে সময়ে হিন্দুর অপমান ও নির্য্যাতনের জন্য অতি কঠোর আইন সকল প্রণীত হইত।

ইহার উপর নবাবগণের মধ্যে মধ্যে এক একটা খেয়ালের উদয় হইত। এক সময়ে একটা মিথ্যা জনরব উঠিয়াছিল, যে গৌড়ে মুসলমান প্রাধান্য বিলুপ্ত হইয়া ব্রাহ্মণ-প্রভাবের পুনরভ্যুদয় হইবে। গৌড়েশ্বর এই জনরবে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া নানারূপে ব্রাহ্মণনির্য্যাতন করিতে লাগিলেন। চৈতন্যমঙ্গলে লিখিত আছেঃ—

"ব্রাহ্মণে যবনে বাদ যুগে যুগে আছে।
বিষম পিরল্যা গ্রাম নবদ্বীপের কাছে॥
গৌড়েশ্বর বিদ্যমানে দিল মিথ্যাবাদ।
নবদ্বীপ বিপ্র তোমা করিবে প্রমাদ॥
গৌড়ে ব্রাহ্মণ রাজা হবে হেন আছে।
নিশ্চিন্ত না থাকিও প্রমাদ হবে পাছে।
নবদ্বীপে ব্রাহ্মণ অবশ্য হবে রাজা।
গন্ধর্ব্বে লিখন আছে ধনুর্দ্ধর প্রজা॥
এই মিথ্যা কথা রাজার মনেতে লাগিল।
নদীয়া উৎসন্ন কর রাজা আজ্ঞা দিল॥"

এই ধর্ম্মান্ধতা ও হিন্দু-বিদ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া মুসলমান নবাবগণ হিন্দুর দেবমন্দির সমূহ ভগ্ন ও নানারূপে কলঙ্কিত করিতেন। চৈতন্যভাগবতে হোসেন শাহের সম্বন্ধে লিখিত আছে—

"স্বভাবেই রাজা মহা-কাল-যবন
মহাতমোগুণ বুদ্ধি জন্মে ঘনে ঘন॥
ওড্রদেশে কোটি কোটি প্রতিমা প্রাসাদ।
ভাঙ্গিলেক কত কত করিল প্রমাদ॥"

বাঙ্গালার মুসলমান নবাবদিগের মধ্যে এমন হোসেন শাহ অনেক ছিলেন। শেষে এমন হইয়াছিল যে মুসলমানের ভয়ে হিন্দুরা মুখ ফুটিয়া দেবতার নাম উচ্চারণ করিতে পারিতেন না। যখন চৈতন্য ও তাঁহার অনুচরগণ নবদ্বীপে হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন নবদ্বীপবাসিগণের হৃদয়ে দারুণ আশঙ্কার উদয় হইয়াছিল।

তাঁহারা বলিতেন—

"এ ব্রাহ্মণ করিবেক গ্রামের উৎসাদ॥
মহাতীব্র নরপতি যবন ইহার।
এ আখ্যান শুনিলে, প্রমাদ নদীয়ার॥
কেহ বলে এ বামনে এই গ্রাম হৈতে।
ঘর ভাঙ্গি ঘুচাই ফেলাই নিয়া স্রোতে॥
এ বামনে ঘুচাইলে গ্রামের মঙ্গল।
অন্যথা যবনে গ্রাম করিবে কবল॥"

(চৈতন্য ভাগবত)

বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী হরিদাসের প্রতি কাজি সাহেব যে দণ্ডাজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিলে এখনও শরীর শিহরিয়া উঠে।

"কাজি বলে বাইশ বাজারে নিয়া মারি।
প্রাণ লহ, আর কিছু বিচার না করি।
বাইশ বাজারে মারিলেও যদি জীয়ে।
তবে জানি জ্ঞানী সব সাচা কথা কহে॥

পাইক সকলে ডাকি তর্জ্জ করি কহে।
এমন মারিবি যেন প্রাণ নাহি রহে॥
যবন হইয়া যেন হিন্দুয়ানি করে।
প্রাণান্ত হইলে শেষে এ পাপেতে তরে॥"

কাজির আজ্ঞা পালিত হইল—

"বাজারে বাজারে সব বেড়ি দুষ্টগণে।
মারয়ে নির্জ্জীব করি মহা-ক্রোধ-মনে॥"

কিন্তু তাহাতেও যখন হরিদাসের প্রাণ বহির্গত হইল না, তখন—

"যবন সকল বলে আয়ে হরিদাস।
তোমা হৈতে আমা সবার হইবেক নাশ॥
এত প্রহারেও প্রাণ না যায় তোমার।
কাজি প্রাণ লইবেক আমা সবাকার॥"

তখন হরিদাস হাসিয়া বলিলেন—

"আমি জীলে যদি তোমা সবার মন্দ হয়॥
তবে আমি মরি এই দেখ বিদ্যমান।
এত বলি আবিষ্ট হইলা করি ধ্যান॥
সর্ব্ব-শক্তিসমন্বিত প্রভু হরিদাস।
হইলেন আবিষ্ট, কোথাও নাহি শ্বাস॥
দেখিয়া যবনগণ বিস্মিত হইল।
মুলুকপতির দ্বারে নিয়া ফেলাইল॥
মাটি দেহ নিয়ে বলে মুলুকের পতি।
কাজি কহে—তবে ত পাইবে ভাল গতি॥
বড় হ'য়ে যেমন করিল নীচ কর্ম্ম।
অতএব ইহারে জুয়ায় এই ধর্ম্ম॥
মাটি দিলে পরলোকে হইবেক ভাল।
গাঙ্গে ফেল যেন দুঃখ পায় চিরকাল॥
কাজির বচনে সব ধরিয়া যবনে।
গাঙ্গে ফেলাইতে সভে তোলে গিয়ে তানে॥"

(চৈ ভা)

উপরোদ্ধৃত অংশগুলি হইতে তখনকার বাঙ্গালী হিন্দুদিগের অবস্থা অনেকটা বুঝিতে পারা যাইবে। মুসলমান নবাবগণের মধ্যে ভাল লোক যে একেবারে ছিলেন না, আমি এ কথা বলিতেছি না। তবে তাঁহাদের সংখ্যা নিতান্ত অল্প ছিল। যে হোসেন শাহের অত্যাচারের কথা উপরে লিখিত হইয়াছে, তিনিই কালে বাঙ্গালী কবিগণের একজন পরম অনুগ্রাহক হইয়াছিলেন। হিন্দু মুসলমান বহুকাল একত্রে বাস করিতে করিতে ক্রমশঃ তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে সম্প্রীতির সঞ্চার হওয়া স্বাভাবিক। কাজি ক্রুদ্ধ চৈতন্যকে শান্ত করিবার জন্য যে বলিয়াছিলেন—

"গ্রাম সম্বন্ধে চক্রবর্ত্তী হয় আমার চাচা।
দেহ সম্বন্ধ হইতে গ্রাম সম্বন্ধ সাঁচা॥
নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী হয় তোমার নানা।
সে সম্বন্ধে হও তুমি আমার ভাগিনা॥"

ইহা হইতে দেখা যায় যে মুসলমানেরা ক্রমশঃ বুঝিয়াছিলেন যে হিন্দুর দেশে থাকিয়া হিন্দুর সহিত সম্প্রীতি করিয়া না চলিলে রাজা প্রজা উভয়েরই বিশেষ অশান্তি ও অসুবিধা হইবে। "দেহ সম্বন্ধ হইতে গ্রাম সম্বন্ধ সাঁচা"—ইহা অতি সত্য কথা। তবে দুঃখের বিষয়, এই বচনানুসারে সকল সময়ে কার্য্য হইত না। তাহার উপর হিন্দুদিগের বুদ্ধিপ্রাখর্য্য দর্শন করিয়া মুসলমান নবাবগণ ক্রমশঃ তাঁহাদের অধীনে উচ্চ রাজকার্য্যে হিন্দু কর্ম্মচারিগণকে নিয়োজিত করিতে লাগিলেন। আর এক কথা, মুসলমানেরা যদিও বাঙ্গালাদেশ অধিকার করিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহাদের শাসনশৃঙ্খলার অভাবে ও আত্মবিরোধের ফলে বাঙ্গালার সকল প্রদেশে সমানভাবে তাঁহাদের শাসন বিস্তৃতি লাভ করে নাই। এমন অনেক স্থান ছিল, যেখানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হিন্দু রাজা বা ভূম্যধিকারিগণ কতকটা স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতেন। তাঁহাদের অধিকারে হিন্দুপ্রজাগণ নিশ্চিন্তভাবে বাস করিত। যাহা হউক, সে সময় যে হিন্দুর জাতীয় অবনতির সময়, তাহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে।

এই জাতীয় অবনতির কালে বাঙ্গালা কাব্য সাহিত্যের উন্নতির আরম্ভ হইল, ইহাই আশ্চর্য্যের কথা। ইংরাজী সাহিত্যের অনেক ইতিহাস-লেখক পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইংরাজী কাব্য সাহিত্যের দৈন্যের কথায় লিখিয়াছেন,—

"The middle of the fifteenth century witnessed the expulsion of the English from France, and a time of national humiliation is unfavourable to the production of poetry. If, indeed, humiliation become permanent, and involve subjection to the stranger, the plaintive wailings of the elegiac Muse are naturally evoked. But where a nation is merely disgraced, not crushed, it keeps silence, and waits for a better day." (Arnold : Manual of English Lit.)

কিন্তু প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতি ইহার একটি কথাও খাটে না। জাতীয় অবনতির সময়েই বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতির আরম্ভ হইয়াছে,এবং প্রাচীন বাঙ্গালী কবি চিরদিনের জন্য স্বাধীনতারত্ন হারাইয়া, অরুন্তুদ যন্ত্রণায় হাহাকার না করিয়া, রাধাকৃষ্ণের বিরহমিলন ঘটাইয়া কাঁদিয়াছেন ও হাসিয়াছেন, কিংবা হরগৌরীর বিবাহ দিয়া দম্পতী-কলহ বাধাইয়া হাততালি দিয়া নৃত্য করিয়াছেন। এই হিসাবে বাঙ্গালা সাহিত্য অন্য দেশের সাহিত্য হইতে বিভিন্ন। ইহার কারণ কি?

ইংরাজী শিক্ষার ফলে আমরা জাতীয় ভাব নামক যে জিনিষ হৃদয়ঙ্গম করিতেছি, প্রাচীন বাঙ্গালীর হৃদয়ে সে ভাবের বিন্দু বিসর্গ কখনও প্রবেশ করে নাই। এখনকার মত তখন রাস্তা ঘাট সুগম ছিল না, তাড়িত-বার্ত্তাবহ ও সংবাদপত্রের সৃষ্টি হয় নাই; এক প্রদেশের লোক সহজে অন্য প্রদেশে যাইতে চাহিত না, এক প্রদেশের সংবাদ সহজে অন্য প্রদেশে আসিয়া পৌঁছিত না। এরূপ অবস্থায় জাতীয় ভাবের উৎপত্তি অসম্ভব। সাধারণ বাঙ্গালী নিজের গ্রামের বা আশে পাশের দুই চারি খানি গ্রামের সংবাদমাত্র রাখিতেন। নিজের গ্রামস্থ, দলস্থ বা সমাজস্থ লোকের উপকারের জন্য তিনি প্রাণপণে চেষ্টা করিতেন, কোন পর্ব্ব বা উৎসব উপলক্ষে সকলে একত্র মিলিত হইয়া প্রাণ খুলিয়া আমোদ আহ্লাদ করিতেন, সময়ে সময়ে প্রাণ খুলিয়া পরস্পরে ঝগড়া বিবাদও করিতেন। কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত। তখনকার সাধারণ হিন্দুর সহানুভূতি তাঁহার পরিচিত গ্রাম বা ব্যক্তিবর্গের মধ্যেই আবদ্ধ থাকিত, সেই গণ্ডীর বাহিরে যাইতে পারিত না। সমগ্র হিন্দুসমাজের কথা তিনি মনে ধারণা করিতে পারিতেন না। কাজেই জাতীয় অবমাননা বা অবনতি বলিলে আমরা যাহা বুঝি, তিনি তাহা বুঝিতেন না। এই জন্য প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে জাতীয় ভাবোদ্দীপক বা জাতীয় অবনতি-জনিত খেদসূচক কবিতার একান্ত অভাব।

তাহার পর, হিন্দু ঘোরতর অদৃষ্টবাদী ও পরকালের উপর নিতান্ত বিশ্বাসবান্। হিন্দু ধর্ম্মপ্রাণ জাতি, তাঁহার জীবনের সকল কার্য্যেরই এক লক্ষ্য ধর্ম্ম। তিনি ইহজীবনের সুখ দুঃখ অনিত্য বলিয়া বুঝিতে শিখিয়াছেন। তাই বাঙ্গালী হিন্দু কবি ইহজীবনে সহস্র বিপজ্জালে জড়িত হইয়াও এই বলিয়া মনকে প্রবোধ দিতেন—

"এই মত কাল-গতি কেহ কারো নহে।
অতএব সংসার অনিত্য বেদে কহে॥

ঈশ্বরের অধীন সে সকল সংসার।
সংযোগ বিয়োগ কে করিতে পারে আর॥
অতএব যে হইল ঈশ্বর-ইচ্ছায়।
হইল সে কার্য্য, আর দুঃখ কেন তায়॥"

হিন্দুর—তথা বাঙ্গালীর এই কষ্ট-সহিষ্ণুতা ইউরোপীয়দিগকেও চমৎকৃত করিয়াছে। ইহ-জীবনের দুঃখ কষ্ট এইরূপে সহ্য করিতে পারিতেন বলিয়া, প্রাচীন বাঙ্গালী কবি ঘোর দুর্দ্দিনেও নিশ্চিন্তমনে বাগ্দেবীর আরাধনায় মনোযোগী হইতে পারিয়াছিলেন।

আর এক কথা, পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে মুসলমান নবাবদিগের প্রতাপ বাঙ্গালার সকল প্রদেশে সমানভাবে প্রবেশলাভ করে নাই বা সকল মুসলমান নবাবই হিন্দু-বিদ্বেষ প্রকাশ করেন নাই। বরং কোন কোন নবাব বাঙ্গালী হিন্দু কবিকে কাব্যরচনায় উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন। আর সে সময়ে বাঙ্গালায় যে সকল স্বাধীন বা অর্দ্ধ-স্বাধীন হিন্দু নৃপতি ছিলেন, তাঁহারাও অনেক কবিকে আশ্রয় ও অর্থসাহায্য দান করিতেন। এইরূপে মুসলমান রাজত্ব সময়ে বাঙ্গালায় নানা অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা বিদ্যমান থাকিলেও, বাঙ্গালা সাহিত্য দিন দিন পুষ্টিলাভ করিতে লাগিল।

কিন্তু ইহা বলিলেই সকল কথা বলা হইল না। প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে হিন্দু-দেবদেবীর চরিত্রই বর্ণনীয় বিষয় কেন হইল, তাহার উত্তর ইহাতে পাওয়া যায় না। ইহার একটি উত্তর আমরা সহজেই দিতে পারি। যে কবির জীবনের চরম উদ্দেশ্য ধর্ম্ম, তাঁহার পক্ষে আরাধ্য দেবদেবীর চরিত্র আলোচনা দ্বারা পুণ্যসঞ্চয়ের চেষ্টা করাই স্বাভাবিক। তাহার উপর যদি এরূপ কাব্য-প্রণয়নের দ্বারা ইহকাল পরকাল উভয় কালেই লাভের সম্ভাবনা হয়, তাহা হইলে সেরূপ কাব্যপ্রণয়নের উদ্দেশ্য বুঝি তার পক্ষে কোন কষ্টই হয় না। চণ্ডী, মনসা, শীতলা প্রভৃতি দেবীগণের পূজা তখন বাঙ্গালাদেশে বিলক্ষণ প্রচলিত ছিল, ও সেই সকল পূজা বিশেষ লাভজনকও ছিল। চৈতন্য-ভাগবতের বৈষ্ণব কবি দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন—

"ধর্ম্মকর্ম্ম লোক সবে এই মাত্র জানে।
মঙ্গলচণ্ডীর গীতে করে জাগরণে॥
দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোন জনে।
পুত্তলি করয়ে কেহ দিয়া বহু ধনে॥
ধন নষ্ট করে পুত্র কন্যার বিভায়।
এই মত জগতের ব্যর্থ কাল যায়॥"

আর এক স্থলে চৈতন্য দেব খোলা-বিক্রেতা দরিদ্র শ্রীধরের সহিত উপহাস করিয়া বলিয়াছেন—

"প্রভু বলে—শ্রীধর তুমি যে অনুক্ষণ।
"হরি হরি" বল, তবে দুঃখ কি কারণ?
লক্ষ্মীকান্ত সেবন করিয়া কেন তুমি।
অন্নবস্ত্রে দুঃখ পাও কহ দেখি শুনি॥
শ্রীধর বলেন—উপবাস ত না করি।
ছোট হউ, বড় হউ বস্ত্র দেখ পরি॥
প্রভু বলে—দেখিলাম গাঁঠি দশ ঠাঁই।
ঘরে বোল, এই দেখিতেছি খড় নাই॥
দেখ এই চণ্ডী, বিষহরিরে পূজিয়া।
কে না ঘরে খায় পরে সব নগরিয়া॥"

প্রাচীন বাঙ্গালা কাব্যের অধিকাংশই এইরূপ কোন না কোন দেব দেবীর পূজার সময় চামর মন্দিরাদি সহযোগে গীত হইত, এবং প্রত্যেক কবিই স্বীয় কাব্য প্রতিদিনের পালায় গীত হইবার মত করিয়া কতকগুলি অংশে বিভক্ত করিতেন।

কিন্তু আর একটি উত্তর আছে, তাহাই প্রধান বলিয়া আমাদের মনে হয়। তাহা এই—সংস্কৃত সাহিত্যের অনুকরণ। প্রায় প্রত্যেক প্রধান সংস্কৃত কাব্যেরই নায়ক

নায়িকা হয় কোন দেব দেবী, নচেৎ দেব-দেবীর অংশসম্ভূত কোন মানব মানবী। পুরাণে এই দেবদেবী প্রসঙ্গের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে। এই সকল সংস্কৃত কাব্য ও পুরাণ টোলে পড়ান হইত, কথকেরা সেই সকল পুরাণপ্রসঙ্গের ব্যাখ্যা ও গানের দ্বারা লোকের মনোরঞ্জন করিতেন। এইরূপে পুরাণের কথা, ভাগবতের কথা, রামায়ণ, মহাভারতের কথা, হাড়ী বাগ্‌দি প্রভৃতি অতি নিকৃষ্ট জাতিগণের মধ্যেও প্রচলিত হইয়াছিল। এই সকল পুরাণপ্রসঙ্গ এক-দিকে যেরূপ চিত্তাকর্ষক, অন্যদিকে সেইরূপ শিক্ষাপ্রদ। এই শিক্ষা লাভ করার জন্য, এখনও বাঙ্গালার অতি নীচ জাতিগণ সুসভ্য ইউরোপের নিম্নশ্রেণীর লোকদিগের অপেক্ষা অধিকতর ধার্ম্মিক ও সচ্চরিত্র।

প্রায় সকল প্রাচীন বাঙ্গালা কবিই তাঁহাদের গ্রন্থে পুরাণের দোহাই দিয়াছেন

কবিকঙ্কণ বলিয়াছেন—

"ব্যাস মুনি রস গাওয়ে তুয়া
নিবেদি তুয়া চরণে।
চণ্ডীর চরিত রচিয়া সঙ্গীত
দেবকী-নন্দন ভনে॥"

শিবরামের যুদ্ধের কবি কবিচন্দ্র গ্রন্থ শেষে লিখিতেছেন—

"ব্যাসের আদেশে দ্বিজ কবিচন্দ্রে গায়।
হরি হরি বল সবে পালা হৈল সায়॥"

কবি ঘনরাম এক অদ্ভুত পুরাণ হইতে তাঁহার কাব্যের উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন; তাহার নাম ও রচয়িতা উভয়ই অদ্ভুত।

"শুন সবে সমাদরে যুগে যুগে ঘরে ঘরে
করিত ধর্ম্মের আরাধনা।
এবে হৈল ঘোর কলি, যুগধর্ম্মে ধর্ম্ম বলি
পাছে কেহ না করে মাননা॥
আপনি ঠাকুর চিতে, এত ভাবি পৃথিবীতে
পূজা ল'য়ে বাড়াতে প্রভাব।
ভাবনা করেন—কেবা কালে প্রকাশিবে সেবা
লবে কেবা চতুর্ব্বর্গ লাভ॥
দেখি এত ভাব্যমান, কাছে ছিল হনুমান্
হাকন্দ পুরাণ বিজ্ঞবর।
নিবেদিল যোড় করে, কলিকালে ঘরে ঘরে
হবে ধর্ম্ম পূজার আদর॥"

বাঙ্গালী হিন্দুর উপর এই পৌরাণিক আখ্যায়িকা সকলের কি যে এক আকর্ষণী শক্তি আছে, তাহা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। আধুনিক কালের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালা কাব্য সকলও এই পৌরাণিক ভিত্তির উপর নির্ম্মিত। রঙ্গলাল রাজস্থানের ঐতিহাসিক ঘটনা সকল অবলম্বনে কাব্য রচনা করিয়া এক নূতন পথ আবিষ্কার করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু সে বিষয়ে সফলকাম হইতে পারেন নাই। শেষে তিনি কালিদাসের কুমারসম্ভবের অনুবাদে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। মাইকেলের তিলোত্তমাসম্ভব, মেঘনাদবধ, বীরাঙ্গনা, ব্রজাঙ্গনা, হেমচন্দ্রের বৃত্রসংহার, দশমহাবিদ্যা, নবীনচন্দ্রের রৈবতক, কুরুক্ষেত্র, প্রভাস, পৌরাণিক প্রসঙ্গ অবলম্বনে রচিত।

প্রাচীন বাঙ্গলা কবিতায় দেবদেবী-গণের চরিত্র বর্ণনার কারণ এক্ষণে বুঝিতে পারা যাইবে। চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতি কবিগণের রাধাকৃষ্ণবিষয়ক পদাবলী জয়দেবের গীতগোবিন্দের অনুকরণে রচিত।

বাঙ্গালী কবিগণের এই সংস্কৃত-সাহিত্যানুকরণের ফলে বাঙ্গালা সাহিত্যের লাভ লোকসান দুইই হইয়াছিল। লাভের অপেক্ষা বরং ক্ষতির ভাগই অধিক হইয়াছে।

লাভ হইয়াছে এই যে, বাঙ্গালা ভাষা প্রাচীন কাল হইতেই মার্জ্জিত হইয়াছে। যে Chaucerকে ইংরাজেরা গর্ব্ব করিয়া "the well of English undefiled"

বলিয়া থাকেন, তাঁহার ভাষা পরবর্ত্তী ইংরাজগণ বুঝিতে কষ্ট বোধ করিতেন। এমন কি সাধারণ পাঠকের পক্ষে সুগম করিবার জন্য Pope, Chaucerএর কয়েক খানি কাব্য তাঁহার সময়ে ইংরাজী ভাষায় রূপান্তরিত করিয়াছিলেন। কিন্তু যে সময়ে ইংলণ্ডের আদি কবি, খাস লণ্ডনবাসী Geaffrey Chaucer

"A frere ther was, a wantown and merye,
A limitour, a ful solempne man;
In all the ordres foure is noon that can
So moche of daliaunce and fair langage;"

ইত্যাদি Anglo-Saxon Latin-French মিশ্রিত অদ্ভুত ইংরাজী ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিতেছিলেন, প্রায় সেই সময়ে বাঙ্গালার আদি কবি চণ্ডীদাস সুদূর পল্লী গ্রামে, ইতর লোকের মধ্যে বাস করিয়া গাহিতেছিলেন——

"বঁধু, কি আর বলিব আমি।
মরণে জীবনে, জনমে জনমে
প্রাণনাথ হও তুমি॥
ভাবিয়াছিলাম— এ তিন ভুবনে
আর মোর কেবা আছে।
রাধা বলি কেহ সুধাইতে নাই
দাঁড়াব কাহার কাছে॥
এ কুলে ও কুলে দুকুলে গোকুলে
আপনা বলিব কায়।
শীতল বলিয়া শরণ লইনু
ও দুটি কমল পায়॥"

সাহিত্যের প্রথম অবস্থায় এরূপ মার্জ্জিত সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ভাষা বাঙ্গালা ভিন্ন অন্য সাহিত্যে দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া মনে হয় না।

স্বীকার করি, প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে এরূপ মার্জ্জিত ভাষা সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হইতে দেখা যায় না। প্রত্যেক প্রাচীন বাঙ্গালা কাব্যে পাশাপাশি দুই প্রকার ভাষা দেখিতে পাওয়া যায়, এক—মার্জ্জিত সাধুভাষা দ্বিতীয়—চলিত গ্রাম্য ভাষা। ইহার কারণ আছে। যেখানে কোন দেবতার স্তব, ঐশ্বর্য্য বর্ণনা বা কোন উচ্চভাবের বর্ণনা করিবার আবশ্যক হইত, কবিগণ সে স্থানে ভাষা বিষয়ে বিশেষ সাবধান হইতেন। সে সকল স্থলে সাধুভাষা ভিন্ন কখনও গ্রাম্য ভাষা ব্যবহার করিতেন না। তাঁহারা বোধ হয় মনে করিতেন, এ সকল স্থলে গ্রাম্য ভাষা ব্যবহার করিলে দেবদেবীগণের অবমাননা করা হইবে, অথবা বর্ণনীয় উচ্চ বিষয়ের যথাযথ বর্ণনা হইবে না। তাহার উপর, পুরাণাদি সংস্কৃত গ্রন্থ সমূহে ঐ সকল বিষয়ের বর্ণনা অবিরত পাঠ করিয়া বা লোকমুখে শুনিয়া উহা তাঁহাদের এরূপ অভ্যস্ত হইয়া যাইত, যে প্রয়োজন হইলে সেই ভাষা আপনি হইতেই তাঁহাদের লেখনীমুখ হইতে নির্গত হইত। লঘু ব্যাপারের বর্ণনায় ভাষা বিষয়ে সাবধান হওয়া তাঁহারা প্রয়োজন মনে করিতেন না, ও সে বিষয়ে সংস্কৃত সাহিত্য হইতেও কোন সাহায্য পাইতেন না। কাজেই এরূপ স্থলে চলিত গ্রাম্য ভাষাই ব্যবহৃত হইত।

কবিকঙ্কণ চণ্ডীর রূপ বর্ণনার সময় লিখিতেছেন—

"সুচারু নিতম্ব সাজে চরণ পঙ্কজ রাজে
মণিময় কাঞ্চন নূপুর।
নির্ম্মল অঙ্গের আভা নানা অলঙ্কারে শোভা
রবির কিরণ করে দূর॥
ত্রিবলি বলিত মাঝে সুবর্ণ কিঙ্কিণী সাজে
ঊরুযুগ রম্ভার সমান।

জিনিয়া কুঞ্জর কুম্ভ কুচযুগ ধরে দম্ভ।
নেতের বসন পরিধান॥
মুখচন্দ্র অনুপাম বিন্দু বিন্দু শোভে ঘাম
সিন্দুর তিলক তিমিরারি।
অধর বিদ্রুমদ্যুতি তাম্বুলের রাগ তথি
নাসায় মাণিক মনোহারী॥"

দুই একটি শব্দ ভিন্ন ইহার প্রায় সকল শব্দই সংস্কৃত।

কিন্তু ব্যাধপত্নী অভাগিনী ফুল্লরার—

"আচ্ছাদন নাহি, অঙ্গে পড়ে মাংস জল।
কত মাছি খায় অঙ্গে মোর কর্ম্মের ফল॥
নিয়োজন কৈল বিধি সবার কাপড়।
অভাগী ফুল্লরা পরে হরিণের ছড়॥
হরিণ-বদলে পাইনু পুরাণ খোষলা।
নড়িতে সকল অঙ্গে বরিষয়ে ধূলা॥"

সাধু ধনপতির বিবাহে—

"দিনপতি গণপতি পূজিলেন প্রজাপতি
অধিবাস প্রতিগ্রহগণে।
পাতিয়া মঙ্গল ষষ্ঠি সভাজন কৈল ষষ্ঠী
পূজা কৈল মুকুন্দ-নন্দনে॥
দ্বিজগণে বেদগান মহীগন্ধ শিলাধান
দুর্ব্বা পুষ্প ঘৃত ফল দধি।
রজত দর্পণ হেম স্বস্তিক সিন্দুর হেম
কজ্জল গোরোচনা বিধি॥"

কিন্তু এই বৈবাহিক মঙ্গলানুষ্ঠানের পরে যখন ঔষধ করিবার জন্ত পুরস্ত্রীমহলে হুড়াহুড়ি পড়িয়া গেল, তখন—

"ঔষধ করিতে রম্ভা ফিরে বাড়ী বাড়ী।
দোছটি করিয়া পরে বার হাত শাড়ী॥
কাটা মহিষের আনে নাসিকার দড়ি।
দুর্গার প্রদীপ পুছি রেখেছিল চেড়ি॥
আদেশ কাকড়ি গাছ হাস্তি আমলাতি।
আকুল কুন্তল করি আনে অর্দ্ধরাতি॥
সাপের আঁটুলি আনে বাজিকার ঘরে।
রোহিত মৎস্যের পিত্ত মঙ্গল বাসরে॥"

কবি রামেশ্বর মশকের বর্ণনায় হিতোপদেশের—

"প্রাক্ পাদয়োঃ পতি খাদতি পৃষ্ঠমাংসম্
কর্ণে কলং কিমপি রৌতি শনৈর্বিচিত্রম্।
ছিদ্রং নিরূপ্য সহসা প্রবিশত্যশঙ্কঃ
সর্ব্বং খলস্য চরিতং মশকঃ করোতি॥"

এই শ্লোকের অনুকরণে—

"শ্যামবর্ণ স্বর্ণরেখা শোভন শরীর।
খলের লক্ষণে খাবে করিবে অস্থির॥
কাণে কাণে কুণু কুণু করিয়া সম্ভাষ।
গায় পড়ি, পশ্চাৎ পৃষ্ঠের খাবে মাস॥"

লিখিলেন;

কিন্তু মশা যখন—

"নির্ভরে নির্ভয় হয়ে মারিল কামড়।
চমকিয়া চন্দ্রচূড় চালাইল চড়॥
ঠস্ ঠাস্ দুই ঠাট ঠাকুরের করে।
দশ পাঁচ উড়ে যায় দুই চারি মরে॥
চট্ কট্ কেটে কোটি কোটি দেয় ভঙ্গ।
ফুরাবার নয় কিন্তু ফুণাকেক অঙ্গ॥
বার বার করে ভীম বাপ্ বাপ্ বল্যা।
কামড়ে কাতর হয়ে কাঁদে দুটি হেল্যা॥
হাঁটু পাতি বুড়া এঁড়ে বসে গেল পাঁকে।
ঠুই জানি ঠেঁটা কাক ঠোকুরায় তাকে॥
আসিয়া চণ্ডলে মাছি বসিলেক ঘায়।
মাছেতা পড়িবামাত্র কৃমি হৈল তায়॥
রক্ত পড়ে, দাঁড় কাক গাঢ় করে পেরে।
কোগলের বনে বৃষ লুকাইল গিরে।"

আর উদাহরণ তুলিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু যাহা উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা হইতেই দেখা যাইবে যে, কাব্যে ব্যবহৃত গ্রাম্য চলিত ভাষাও নিতান্ত ছোট লোকের ভাষার মত ছিল না। গ্রাম্য শব্দগুলি বাদ দিলে ইহা প্রায় সাধুভাষার মতই শুনায়।

সাধুভাষা ও চলিত ভাষার এইরূপ পাশাপাশি প্রয়োগ আমরা স্কচ্ কবিগণের কাব্যেও দেখিতে পাই। কবি Burns এর

যখন প্রাণের ফোয়ারা খুলিয়া গিয়াছে, তখন তিনি—

"There's news, lasses, news,
Gude news I have to tell
There's a boat ful o' lads
Come to our town to sell.
The wean wants a cradle,
An' the cradle wants a cod,
An' I'll no gang to my bed
Until I get a nod.
Father,quo' she,Mither, quo' she,
Do what you can,
I'll no gang to my bed
Till I get a man."

ইত্যাদি আধা Scotch ও আধা ইংরাজী ভাষায় হৃদয়ের উচ্ছ্বাস ব্যক্ত করিতেছেন। কিন্তু যখন হাস্য পরিহাস নাই, গম্ভীরভাবের বর্ণনা করা হইতেছে, তখন তিনি বিশুদ্ধ ইংরাজীতে বলিতেছেন—

"Lives there a man so firm,
who, while his heart
Feels all the bitter horrors of his
crime,
Can reason down its agonising
throbs,
And, after proper purpose of
amendment,
Can firmly force his jarring
thoughts to peace ?
O happy, happy, enviable man !
O glorious magnanimity of soul !"

সংস্কৃত সাহিত্যের অনুকরণে বাঙ্গালা সাহিত্যের লাভের কথা বলা হইল; এবার আমরা লোকসানের কথা বলিব।

অনুকরণ মাত্রই দোষের নহে। বরং প্রথম অবস্থায় অনুকরণই শিক্ষার একমাত্র উপায়। কিন্তু এই অনুকরণ একমাত্রায় চলিলে, মানসিক শক্তির ব্যাঘাত অবশ্যম্ভাবী। বাঙ্গালা কবিগণ এই অনুকরণের মাত্রা এতদূর বাড়াইয়া তুলিলেন যে, চিন্তা ও কল্পনা শক্তির অনুশীলনে তাঁহাদের আদৌ অবসর রহিল না। কেবল বর্ণনীয় বিষয় নহে, ভাব, বর্ণনা সমস্তই তাঁহারা সংস্কৃতের রত্নভাণ্ডার হইতে অপহরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা ভাবিলেন, হাতের কাছে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর তৈয়ারি জিনিষ থাকিতে অনর্থক পরিশ্রম করিয়া নিকৃষ্ট দ্রব্য নির্ম্মাণের কি প্রয়োজন? কিন্তু একবারও ভাবিয়া দেখিলেন না যে, পরিশ্রম কখনও একেবারে বিফল হয় না, এবং অতিরিক্ত অনুকরণ মানসিক উন্নতির বিষম অন্তরায়। ক্রমে এমন হইল যে পরবর্ত্তী কবি স্বয়ং সংস্কৃত সাহিত্যভাণ্ডার লুণ্ঠনের আয়াস স্বীকার না করিয়া পূর্ব্ববর্ত্তী কবির উপর বাটপাড়ি আরম্ভ করিলেন। অনেক সময় বাটপাড়, চোরের অপেক্ষা অধিক যশস্বী হইতেন।

সাহিত্য-সংসারে কে বুকে হাত দিয়া বলিতে পারেন—আমি কখনও কাহারও চুরি করি নাই? কিন্তু Penal Codeএ এ চুরির শাস্তি নাই। কারণ, সাহিত্য জাতীয় সম্পত্তি, কাহারও নিজস্ব নহে। একান্নবর্ত্তী হিন্দুপরিবারের সম্পত্তির ন্যায় যে কেহ নিজ শক্তিতে এই জাতীয় সম্পত্তির উন্নতিসাধন করেন, তিনি কেবলমাত্র স্বয়ং সেই উন্নতির ফলভোগ করিতে পারেন না। স্বজাতীয় সকলেরই তাহাতে সমান অধিকার। কাজেই এ চুরি চুরি নহে। তবে সুধী-সমাজ ইহার একটা সীমা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। তুমি চুরি কর, তাহাতে ক্ষতি নাই; কিন্তু সেই অপহৃত দ্রব্যের সম্যক্ ব্যবহার করিতে না পারিলে, তোমার

কপালে চোরের ছাপ মারিয়া দিব। তুমি যে শব্দ বা যে ভাবটি পূর্ব্ববর্ত্তী কবির গ্রন্থ হইতে গ্রহণ করিবে, তাহার উৎকর্ষ সাধন করিতে পার, হীরকখণ্ডটিকে পালিশ করিয়া তাহার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য আরও শতগুণ বর্দ্ধিত করিতে পার, তাহাতে তোমাকে কেহ দোষ দিবে না; বরং সেই হীরকখণ্ডের আবিষ্কর্ত্তা অপেক্ষাও তুমি অধিকতর সম্মান লাভ করিবে; কিন্তু তুমি যদি তাহার সৌন্দর্য্যবৃদ্ধি দূরে থাকুক, অর্ব্বাচীনের ন্যায় ব্যবহার করিয়া তাহার গৌরব-হানি কর, তাহা হইলে তোমার দোষ অমার্জ্জনীয়। দুঃখের বিষয়, আমাদের প্রাচীন বাঙ্গালা কবিগণের অনেকেই এই অমার্জ্জনীয় অপরাধে অপরাধী।

সংস্কৃতের অযথা অনুকরণে ও পরবর্ত্তী কবিগণ কর্ত্তৃক পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণের রচনার যথেচ্ছ ব্যবহারে প্রাচীন বাঙ্গালা কবিতা সময়ে সময়ে কিরূপ হাস্যজনক হইয়াছিল, তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

সংস্কৃতজ্ঞ মাত্রেই কুমারসম্ভবে—

সা রাজহংসৈরিব সন্নতাঙ্গী
গতেষু লীলাঞ্চিতবিক্রমেষু।
ব্যনীয়ত প্রত্যুপদেশলুব্ধৈ
রাদিৎসুভির্নূপুরশিঞ্জিতানি॥

ইত্যাদি পার্ব্বতীর রূপবর্ণনা পাঠ করিয়াছেন। এই বর্ণনাতেই যথেষ্ট অতিশয়োক্তি হইয়াছে। তবে মহাকবির লিপিচাতুর্য্যে তাহা মানাইয়া গিয়াছে।

কবিকঙ্কণ এই বর্ণনার উপর আর একটু রং ফলাইলেন। তিনি বলিতেছেন—

"গৌরীর বদন শোভা লিখিতে না পারি কিবা
দিনে চন্দ্র নাহি দেয় দেখা।
মলিন চাঁদ সেই শোকে, না বিচারি সর্ব্বলোকে
মিথ্যা কহে কলঙ্কের রেখা॥
গৌরীর দশন রুচি দেখিয়া দাড়িম্ব বীচি
মলিন হইল লজ্জাভরে।
অনুমান করি মনে ঐ শোকের কারণে
পক্ককালে দাড়িম্ব বিদরে॥
স্থূলতা উদরে ছিল ব'লে তা লুটিয়া নিল
উরঃস্থল অধম দুজনে।
চরণ-চঞ্চল ভাব লোচন করিল লাভ
নব নৃপ আসিতে যৌবনে॥"

ভারতচন্দ্র ইহার উপর আর এককাঠি চড়াইলেন। কালিদাস ও কবিকঙ্কণ রাজহংসের গতির সহিত পার্ব্বতীর গমনের তুলনা করিয়াছেন। ভারতচন্দ্র বলেন—

"যে জন না দেখিয়াছে বিদ্যার চলন।
সেই বলে ভাল চলে মরাল বারণ॥"

কবিকঙ্কণ বলিতেছেন যে, গৌরীর বদন শোভা দেখিয়া চাঁদ লজ্জায় দিনে দেখা দেয় না। ইহাতেও ভারতচন্দ্রের তৃপ্তি হইল না; তিনি বলিলেন—

"কি ছার শারদ শশী সে মুখের তুলা।
পদ নখে পড়ে তার আছে কত গুলা॥"

কালিদাসের সময়েও যাগ যজ্ঞের প্রচলন ছিল। তাই নিত্যদৃষ্ট ক্ষীণাকার বেদীমধ্যের সহিত পার্ব্বতীর ক্ষীণ মধ্যদেশের তুলনা সহজেই তাঁহার মনে উদিত হইয়াছিল। কৃত্তিবাস মুষ্টিতে সীতার কাঁকালি ধরিতে পারিতেন; ভারতচন্দ্র ইঁহাদের উপরে উঠিয়াছেন:—

"কত সরু ডমরু কেশরী মধ্যখান।
হর গৌরী কর পদে আছয়ে প্রমাণ॥
কে বলে অনঙ্গ-অঙ্গ দেখা নাহি যায়।
দেখুক সে আঁখি ধ'রে বিদ্যার মাজায়॥"

কিন্তু রামপ্রসাদ ভারতচন্দ্রকেও হারাইয়াছেন:—

"কেহ বলে মধ্যস্থল নাহি কি রহস্য।
কেহ বলে বৈদস্থিতি, থাকিবে অবশ্য॥"

এই সকল বর্ণনায় বঙ্কিম বাবুর আশমানির রূপবর্ণনার মূল দেখিতে পাওয়া যায়। শিবের অপূর্ব্ব বরবেশ দর্শনে নারীদিগের

মনের ভাব ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে এইরূপ বর্ণিত আছে :—

"দৃষ্ট্বা রামা ঃরং মেনা জহৌ শোকং মুদান্বিতা।
প্রশশংসুর্ব্বধ্বতাশ্চ ধন্যো ধন্য ইতীরিতাঃ॥
দুর্গা ভাগ্যবতীত্যেব মুচুঃ কাশ্চন কন্যকাঃ।
ন দৃষ্টো বর ইত্যেবমস্মাভির্জ্ঞানগোচরে॥
কাশ্চিন্নিমেষরহিতা মূর্চ্ছামাপুশ্চ কাশ্চন।
নিনিন্দুঃ স্বপতিং কাশ্চিৎ স্বেচ্ছাং চক্রুশ্চ কাশ্চন॥
কাশ্চিদ্ভাবেন রুরুদুঃ পুলকাঞ্চিতবিগ্রহাঃ।
কামেন কাশ্চিৎ কামিন্যো মৌনীভূতাশ্চ স্তম্ভিতাঃ॥"

যাহা এখানে এইরূপে ইঙ্গিতে বর্ণিত হইয়াছে, তাহার উপর উত্তরোত্তর রংয়ের মাত্রা চড়াইয়া কবিকঙ্কণ, ঘনরাম, রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্র নারীগণের পতি-নিন্দারূপ যে অঘন্য ব্যাপারের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা সকলেই অবগত আছেন। এই অতিরঞ্জন ও অস্বাভাবিকতা কোন কোন সংস্কৃত কবির গ্রন্থে যথেষ্ট দৃষ্ট হইয়া থাকে, এবং এই দোষটি তাঁহাদের নিকট হইতে প্রাচীন বঙ্গীয় কবিগণ পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করিয়াছেন।

অতিরিক্ত অনুকরণের ফলে প্রাচীন কবিগণের উদ্ভাবনী শক্তির কি প্রকার হ্রাস হইয়াছিল তাহা দেখাইতেছি। যেমন সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা কাব্যের কতকগুলি বাঁধা ধরা বিষয় নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন, প্রাচীন বাঙ্গালা কবিদিগের মজলিশেও সেইরূপ কতকগুলি বাঁধাধরা বিষয় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। গ্রন্থের প্রারম্ভেই কতকগুলি দেবদেবীর স্তব, পরে সৃষ্টিতত্ব, শিবের বিবাহ, হরগৌরীর কোন্দল, কার্ত্তিক গণেশের জন্ম প্রভৃতি পৌরাণিক বিষয় গুলি ত ছিলই, তাহার উপর, প্রাসঙ্গিক হউক আর না হউক, রামায়ণ, মহাভারত বা কোন পুরাণ হইতে দীর্ঘ দীর্ঘ অংশ সকল উদ্ধৃত করা হইত। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে পৌরাণিক প্রসঙ্গ প্রাচীন বাঙ্গালীর বড় প্রিয় বস্তু ছিল, এবং প্রাচীন বাঙ্গালা কাব্য সকল কোন দেব বা দেবীর পূজোপলক্ষ্যে লোক-সমক্ষে গীত হইত। প্রাচীন কবিগণ লোকের মনোরঞ্জনার্থে যে এইরূপ দীর্ঘ দীর্ঘ পৌরাণিক প্রসঙ্গ সকল দীর্ঘ গ্রন্থের অন্তর্নিবিষ্ট করিতেন, তাহা বুঝা যায়। তাহার উপর স্বয়ং ব্যাসদেব যখন রামায়ণের সুদীর্ঘ আখ্যায়িকা স্বীয় গ্রন্থের অন্তর্নিবিষ্ট করিয়াছেন, তখন বাঙ্গালা কবিরা ছাড়িবেন কেন? এক্ষণে মহাভারতের এ অংশ প্রক্ষিপ্ত বিবেচিত হইলেও, পূর্ব্বে সেরূপ বিবেচিত হইত না। এ সকলের উপর নারীগণের পতিনিন্দা, বার মাস্যা, বেসাতির হিসাব ইত্যাদি ছিল।

প্রত্যেক রাজার রাজধানীতেই স্মৃতিশাস্ত্রানুযায়ী জাতিবিভাগ অবলম্বনে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, জাতিগণকে বসাইতে হইবে, তাহার কোন ব্যতিক্রম চলিবে না। যদি কেহ বলেন যে গ্রন্থ সকল মুসলমান রাজত্বকালে রচিত হইলেও, কবিগণ প্রাচীনতর হিন্দুসমাজের বর্ণনা করিয়াছেন বলিয়া তদানীন্তন বর্ণ-বিভাগের অনুসরণ করিয়াছেন, তাঁহার কথার উত্তর—

"পুরীর অন্তর পড়ে স্বতন্তর
বসিল যবন যত।
পাইয়া মর্য্যাদা কত মিয়াজাদা
সৈয়দ পাঠান কত॥
সমরকুশল বসিল মোগল
সেখজাদা যত জনা।
পেলে এক রুটি সবে খায় বাঁটি
রণে পাশরে আপনা।"

(ধর্ম্মমঙ্গল)

বালকগণের পাঠারম্ভ একই প্রকার,

এ বিষয়ে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বণিকের ছেলের কোন প্রভেদ ছিল না। সকল স্থানেই সেই—

"কাব্য অলঙ্কার কোষ আগম নিগম।
ভক্তিযোগ সার যায় ঘুচে মনভ্রম॥"

(ধর্ম্ম)

এমন কি পূর্ব্ববর্ত্তী কবি যে সকল ব্যক্তি বা স্থানের নাম দিয়াছেন, পরবর্ত্তী কবি স্বীয় গ্রন্থে তাহা অবিকল ব্যবহার করিয়াছেন, একটা নূতন নাম উদ্ভাবন করিবার আয়াসটি পর্য্যন্ত স্বীকার করেন নাই। ঘটকঠাকুর বা পুরোহিত হইলেই তাঁহার নাম জগাই ওঝা হইবে, হাট হইলেই তাহা গোলাহাট হইবে, বণিক বাণিজ্য যাত্রা করিলে তাঁহাকে "চৌদ্দ ডিঙ্গা মধুকর" লইয়া "দক্ষিণ পাটনে" যাইতে হইবে; সেই ক্ষুদ্র ডিঙ্গাগুলি যদি জলে ডুবাইবার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলেও স্বয়ং হনুমানের প্রয়োজন। রামায়ণের অদ্ভুতকর্ম্মা বীর হনুমান বাঙ্গালী কবির নিকট deus ex machina হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। তাঁহাদের ডাকাডাকিতে বীর একদণ্ডের জন্য সুস্থির হইয়া থাকিতে পারিতেন না। আমরা দেখিতে পাই, হনুমান স্বয়ং কোদালি ধরিয়া কাদা তুলিয়া কালকেতুর গৃহনির্ম্মাণে কামিলা অর্থাৎ বিশ্বকর্ম্মার সহায়তা করিতেছেন; তিনিই সমুদ্রে ঝড় তুলিয়া সাধু ধনপতি ও চাঁদবেণের ডিঙ্গাগুলি জলে ডুবাইতেছেন; শেষে এমন হইয়াছে যে অতি সামান্য কার্য্যের জন্যও তাঁহার সাহায্যের প্রয়োজন হইয়াছে। চাঁদবেণে মনসার সহিত বিবাদে হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া যখন জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য বন হইতে কাঠ কাটিয়া বাজারে বিক্রয় করিতে যাইতেছেন, তখন মনসা দেখিলেন —সর্ব্বনাশ!

"কাষ্ঠ বেচি খাইয়া যদি সাধু যায় দেশে॥
আমাকে দিবেক গালি যত মনে আসে॥"

তখন নিরুপায় হইয়া সখীকে উপায় জিজ্ঞাসা করিলেন। সখী নিরুপায়ের উপায়, অগতির গতি, পবন-নন্দনের সহায়তা প্রার্থনা করিবার পরামর্শ দিলেন।

"নেত বলে বিষহরি যুক্তি কেন ভোলণ
পবনের পুত্র হনু তার তরে বোল॥
হনুমান চাপুক উহার বোঝার উপরে।
এই বোঝা সাধু যেন লইতে না পারে॥
দেবীর আজ্ঞায় তবে হনুমান যায়।
আসিয়া বসিল চাঁদের কাষ্ঠের বোঝায়॥
কাষ্ঠ বোঝা ফেলে সাধু পড়ে ঘন পাকে।
ঘাড়ে হস্ত দিয়া সাধু বাপ্ বাপ্ ডাকে॥"

যে বীর সাগর লঙ্ঘন করিয়াছিলেন, গন্ধমাদন পর্ব্বত মস্তকে বহন করিয়া আনিয়াছিলেন, তাঁহাকে এই সকল সামান্য কার্য্যে নিয়োজিত দেখিলে আমাদের মনে কষ্ট হয়; কিন্তু আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কষ্ট হয় যখন আমরা দেখি বাঙ্গালী কবির অনুরোধে কপিবর কবিবর সাজিয়া হস্তে লেখনী ধারণ পূর্ব্বক পুরাণ রচনায় নিমগ্ন হইয়াছেন; স্বয়ং বীরেরও বোধ হয় এ কার্য্য প্রীতিকর হয় নাই। হনুমানের ন্যায় বিশ্বকর্ম্মাকেও বাঙ্গালী কবিরা অনেক খাটাইয়া লইয়াছেন। কাহারও ডিঙ্গা, কাহারও গৃহ, কাহারও কঞ্চুলিকা, কাহারও ব্যজনী নির্ম্মাণ করিতে হইলেই বিশাইকে ডাক পড়িত। ইহা হইতে কেহ কেহ অনুমান করেন যে, বোধ হয় তখন বঙ্গদেশে শিল্পের তাদৃশ উন্নতি হয় নাই। কিন্তু আমরা ইহা সঙ্গত মনে করি না। মাটির ঘর প্রস্তুত করিবার লোকও কি তখন ছিল না, যে বিশ্বকর্ম্মা ও হনুমানকে সেই কার্য্যে নিযুক্ত হইতে হইয়াছিল? আমাদের বিশ্বাস এ সকল তদনীন্তন 'বাঙ্গালী

কবিদিগের উদ্ভাবনী শক্তির দীনতার ও গতানুগতিকতার পরিচায়ক।

পূর্ব্বোক্ত কারণে অর্থাৎ সংস্কৃত সাহিত্যের অযথা অনুকরণ ও তজ্জনিত কল্পনাশক্তির দীনতার ফলে প্রাচীন বাঙ্গালী কবিদিগের রচনায় আরও একটি মহৎ দোষ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। তাঁহাদের রচনায় অনেক স্থলে পূর্ব্বাপর সঙ্গতি দেখা যায় না। সংস্কৃত কবিরা সমাজের যে অবস্থায় বাস করিয়া তাঁহাদের কাব্য রচনা করিয়াছেন, প্রাচীন বাঙ্গালী কবিরা তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থায় বাস করিতেন। তাঁহারা যে সকল ক্ষুদ্র গ্রামে বাস করিতেন, তাহা দেখিয়া,—

"স্বল্পীভূতে সুচরিতফলে স্বর্গিনাং গাং
গতানাং
শেষৈঃ পুণ্যৈর্হৃতমিব দিবঃ কান্তিমৎ
খণ্ডমেকম্।"

বলিয়া কস্মিন্ কালে কাহারও ভ্রম সম্ভাবনা ছিল না। তাঁহারা সামান্য পল্লীগ্রামে, সামান্য গৃহে, সামান্য অবস্থার লোকের মধ্যে, সামান্য কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন। স্বভাবের মহতী সৃষ্টির মধ্যে বাস করিলে সামান্য হৃদয়েও উচ্চভাবের উদয় হইয়া থাকে। বাঙ্গালী কবিকে ভগবান এ সুযোগও দেন নাই। গ্রামের প্রান্তবাহিনী ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী তাঁহাদের সমুদ্র, আম জাম প্রভৃতি গাছের বন তাঁহাদের দণ্ডকারণ্য, ক্ষুদ্র বৃক্ষবাটিকা তাঁহাদের নন্দন কানন। তাঁহাদের গ্রামের বা পার্শ্ববর্ত্তী অন্য গ্রামের কোন ভূম্যধিকারী তাঁহাদের নিকট সার্ব্বভৌম নরপতি, ও কোন পল্লীসুন্দরী তাঁহাদের চক্ষে রতি বা তিলোত্তমা।

অত্যুচ্চ কল্পনাশক্তিসম্পন্ন মহাকবিও সমাজ কাল নির্দ্দেশকালের প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন না। যে সমাজে তিনি বাস করেন, অলক্ষিতে তাঁহার কাব্যে সে সমাজের ছায়া আসিয়া পড়িবেই। এই জন্যই যে Milton

"Things unattempted yet in prose or rhyme" বর্ণনা করিবেন বলিয়া গর্ব্ব করিয়াছিলেন, তাঁহার কাব্যে—

"God the Father turns a school divine."

ক্ষীণকল্পনাশক্তিসম্পন্ন বাঙ্গালী কবির ত কথাই নাই। প্রাচীন বাঙ্গালী কবি সংস্কৃত কাব্য হইতে উচ্চভাব বা উচ্চ বর্ণনা ধার করিয়া লইলেও, তাঁহার কাব্যে তাঁহার সমাজের ছায়া আসিয়া পড়ায় তাঁহার রচনার অনেক স্থলে পূর্ব্বাপর বিরোধ ও অসামঞ্জস্য ঘটিয়াছে। তিনি সংস্কৃত সাহিত্যভাণ্ডার হইতে সোণার থাল চাহিয়া লইয়া তাহাতে সরিষার শাক ও পল্তা ভাজা খাইয়াছেন, নানা অমূল্য রত্নাভরণ লইয়া বাগ্দিনীর অঙ্গে পরাইয়া দিয়াছেন, মণিময় মর্ম্মর প্রাসাদে ছেঁড়া কাঁথার শয্যা বিছাইয়াছেন। ইহা আমরা দৃষ্টান্তের দ্বারা বুঝাইবার চেষ্টা করিব।

কৃত্তিবাস মহর্ষি বাল্মীকির—

"লঙ্কা নাম সমুদ্রস্য মধ্যে মম মহাপুরী।
সাগরেণ পরিক্ষিপ্তা নিবিষ্টা গিরিমূর্দ্ধনি॥
সম্পূর্ণা রাক্ষসৈর্ঘোরৈর্যথেন্দ্রস্যামরাবতী॥
প্রাকারেণ পরিক্ষিপ্তা পাণ্ডুরেণ বিরাজিতা
হেমকক্ষ্যা পুরীরম্যা বৈদূর্য্যময় তোরণা॥"

ইত্যাদি বর্ণনার অনুকরণে—

"চিত্রকূট পর্ব্বতের উপর লঙ্কাপুরী।
শোভিতেছে স্বর্গ যেন ইন্দ্রের নগরী॥
কাঞ্চন স্ফটিক মণি রজতে নির্ম্মাণ।
পুরী শোভা দেখিয়া বিস্মিত হনুমান॥
চারিদিকে লঙ্কাপুরী বেষ্টিত সাগর।
দেবতার শক্তি নাহি লঙ্কার ভিতর॥

স্বর্ণের প্রাচীর মধ্যে বাহিরে লোহার।
গগনমণ্ডলে চূড়া লেগেছে তাহার॥"

রাবণের লঙ্কাপুরীর এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। এই কনক লঙ্কাপুরীর দুর্জ্জয় অধিপতি রাবণ, যাঁহার ভয়ে "দেবতার গতি নাহি লঙ্কার ভিতর",—

"হেন ছার যুদ্ধে আর নাহি প্রয়োজন।
থাকিব কপাট দিয়া প্রাণ বড় ধন॥
প্রবেশিতে লঙ্কাপুরে নাহি দিব বাট।
লঙ্কাপুরে চারিদ্বারে দেহত কপাট॥"

এই বলিয়া রামসৈন্যের ভয়ে দুয়ারে কপাট দিয়া লুকাইয়া রহিলেন। মন্ত্রী জাম্ববানের পরামর্শে একদিন রজনীযোগে বানরেরা পুরীমধ্যে প্রবেশ করিয়া লঙ্কায় আগুন লাগাইয়া দিল।—

"এক এক বানর নিল দুই দুই মশাল।
অগ্নি দিয়া পোড়ায় লঙ্কার চালে চাল॥
অগ্নিতে পুড়িয়া পড়ে বড় বড় ঘর।
পরিত্রাহি ডাক ছাড়ে লঙ্কার ভিতর॥
পর্ব্বত প্রমাণ অগ্নি ভয়ঙ্কর দেখি।
পিঞ্জর সহিত পোড়ে পোষণীয়া পাখী॥
নানা জাতি পোষ জন্তু পোড়ে পালে পালে।
প্রাণভয়ে কেহ বা পলায় উভরড়ে॥"

এই অগ্নিকাণ্ড পাঠ করিলে মনে হয়, রাত্রিতে অতর্কিতভাবে দস্যুরা ফুলিয়া গ্রামে প্রবেশ করিয়া গৃহে অগ্নিসংযোগ পূর্ব্বক লুঠপাট করিতেছে। এ হিসাবে ইহা উৎকৃষ্ট বর্ণনা হইয়াছে; কিন্তু লঙ্কার পক্ষে ইহা হাস্যজনক। লঙ্কায় রাজসভায় রাবণের সহিত অঙ্গদের বাগ্‌যুদ্ধ পাঠ করিলে মনে হয়, কৃত্তিবাসের গ্রামে বারোয়ারী তলায় দুইজন কবিওয়ালা পরস্পরকে বাক্যবাণের দ্বারা আক্রমণ করিতেছে। কালকেতুর ও কলিঙ্গভূপতির যুদ্ধবর্ণনা পাঠ করিলে কে না বুঝিবেন যে পল্লীগ্রামের দুইজন সামন্ত জমিদার পরস্পরের বধ মুক্তায় জন্য লাঠিয়াল সংগ্রহ করিয়া পরস্পরকে আক্রমণ করিতেছেন, এবং পরাজিত ব্যক্তি প্রাণভয়ে লুকাইতেছে?

কবির গ্রামের কোন ক্ষুদ্র মহাজন আপন জমিতে উৎপন্ন ফসল দুই একখানি ক্ষুদ্র ডিঙ্গায় বোঝাই করিয়া গোড়াই বা দারকেশ্বর নদী বাহিয়া দুই চারি ক্রোশ দূরস্থিত কোন হাটে বিক্রয় করিতে যাইতেছে, ও সেই সকল দ্রব্যের বিনিময়ে অন্য দ্রব্য লইয়া ফিরিতেছে; যাইবার সময় বা প্রত্যাগমন কালে অকস্মাৎ ঝটিকা উত্থিত হইয়া মহাজনকে বিপন্ন করিতেছে; মহাজন ইষ্টদেবতা স্মরণ করিয়া অতি কষ্টে ধন প্রাণ রক্ষা করিতেছে; ইহাই ধনপতির বাণিজ্যযাত্রা-চিত্রের আদর্শ। সমুদ্র, সিংহল, সেতুবন্ধ—ও সকল ধার করা কথা।

রামায়ণে সীতার অগ্নিপরীক্ষার কথা আছে, সুতরাং কবিকঙ্কণ খুল্লনার অগ্নিপরীক্ষা করাইলেন, ইহা সঙ্গত কি, অসঙ্গত হইল, তাহা ভাবিয়া দেখিলেন না।

কবি রামেশ্বর কুমারসম্ভব হইতে হিমালয়ের বর্ণনা, শিবের ও গৌরীর তপস্যা ইত্যাদি ধার করিয়া তাঁহার কাব্যের অন্তর্নিবিষ্ট করিলেন। কিন্তু তিনি যদুপুরের বাগ্‌দিপাড়ার নিকট বাস করিতেন, এইজন্য কালিদাসের——

অবৃষ্টিসংরম্ভমিবাম্বুবাহ
মপামিবাধারমনুত্তরঙ্গম্।
অন্তশ্চরাণাং মরুতাং নিরোধা
ন্নিবাত নিষ্কম্পমিব প্রদীপম্॥

এই মহাযোগী শিবমূর্ত্তির ভাব হৃদয়ে ধারণ করিতে না পারিয়া তাঁহার কাব্য শিবায়নে এক শিবে বাগ্‌দীকে নায়ক করিয়া বসিয়াছেন। সে বাগ্‌দী মাঠের ধারে সামান্য কুঁড়ে ঘরে বাস করে, বেলো গরু লইয়া জমি চাষ করে, ও রাত্রে মশারির অভাবে সর্ব্বাঙ্গে

সর্ষপতৈল মার্জ্জন করিয়া মশকদংশন নিবারণ করে। আর তাহার স্ত্রী "হেমু দোলই"এর কন্যা গৌরীবাগ্‌দিনী—

"মাঠে মাঠে মাছ মারি হাটে হাটে বেচে।"

বর্ণনার পূর্ব্বাপর বিরোধের ইহাপেক্ষা উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত আর হইতে পারে বলিয়া মনে হয় না।

আমরা এতক্ষণ প্রাচীন বাঙ্গালা কবিগণের দোষেরই আলোচনা করিলাম। এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে কাব্যের এত দোষ তাহার এত আদর কেন? ইহার উত্তর প্রাচীন বাঙ্গলা সাহিত্যে এমন একটি জিনিস ছিল, যাহা আধুনিক বাঙ্গলা সাহিত্যে দেখিতে পাই না। যদি প্রাচীন বঙ্গীয় হিন্দু সমাজের প্রাণের কথা জানিতে চাও, যদি জানিতে চাও আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা কিরূপ ভাবে বাস করিতেন, কিরূপ বিষয়ের চিন্তা করিতেন, তাঁহাদের সুখের বিষয়ই বা কি ছিল, দুঃখের বিষয়ই বা কি ছিল, তাহা হইলে প্রাচীন কাব্য সাহিত্য সন্ধান কর, সকল কথাই চক্ষের সমক্ষে দেখিতে পাইবে। প্রাচীন বাঙ্গলা কবিতা বাঙ্গালীর কবিতা, হিন্দুর কবিতা, পল্লীগ্রামের কবিতা। ইহাতে বাঙ্গালী হিন্দুর ঘর করনার কথা পাইবে, বারমাসের সুখ দুঃখের বর্ণনা পাইবে, ব্যবসাবাণিজ্য, বাজার বেসাতির হিসাব পাইবে, বাঙ্গালী হিন্দুর হেঁসেলের খবর পর্য্যন্ত পাইবে। ইহাতে একদিকে সেকালের বাঙ্গালী হিন্দুর আতিথেয়তা, দেবদ্বিজে ভক্তি, উদার প্রেমপ্রবণ হৃদয়ের কপটতাশূন্য ভালবাসা দেখিতে পাইবে, অন্যদিকে আধুনিক রুচিবিগর্হিত তামাসা, গালাগালি, দলাদলিও পাইবে। প্রাচীন বাঙ্গালী যেমনটি ছিল, তাহার অবিকল ছবি যদি দেখিতে চাও, তাহা হইলে প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য অনুসন্ধান ভিন্ন গত্যন্তর নাই। প্রাচীন বাঙ্গালী কবির হাত হইতে তদানীন্তন সমাজের এক একটি এরূপ নিখুঁত ছবি বাহির হইয়াছে, যাহা অমূল্য। বেনে মুরারি শীল, ভাঁড়ু দত্ত, দুর্ব্বলা দাসীর চিত্র যে কবি-চিত্রকরের তুলিকায় লিখিত হইয়াছে, সহস্রদোষ থাকিলেও আমরা তাঁহার আদর করিব। প্রাচীন বঙ্গালী কবির হৃদয় জাতিত্বভাবে অনুপ্রাণিত না হইলেও, তাঁহার কবিতা বাঙ্গালীর জাতীয় কবিতা না হইলেও তাহা বাঙ্গালীর কবিতা ছিল। আমরা সেই বাঙ্গলার প্রাণের কবিতার কয়েকটি উদাহরণ দিতেছি :—

"যোগ করি পুত্র দুটি লয়ে দুই পাশে।
পাতে পুরট পীঠে পুরহর বসে॥
তিন ব্যক্তি ভোক্তা একা অন্ন দেন সতী।
দুটি সুতে সপ্তমুখে পঞ্চমুখে পতি॥
তিন জনে একুনে বদন হইল বার।
গুটি গুটি দুটি হাতে যত দিতে পার॥
তিন জনে বার মুখে পাঁচ হাতে খায়।
এই দিতে এই নাই হাঁড়ি পানে চায়॥
দেখি দেখি পদ্মাবতী বসি এক পাশে।
বদনে বসন দিয়া মন্দ মন্দ হাসে॥
সুক্তা খেয়ে ভোক্তা চায় হস্ত দিয়া শাকে।
অন্ন আন অন্ন আন রুদ্রমূর্ত্তি ডাকে॥
হাসিয়া অভয়া অন্ন বিতরণ করে।
ইষদুষ্ণ সূপ দিল বেসারির পরে॥
বড় বড় দেবী এনে দিল ভাজা দশ।
খেতে খেতে গিরিশ গৌরীর গান যশ॥
উদ্ধ্বণ চর্ব্বণে ক্ষের ফুরাল ব্যঞ্জন।
এককালে শূন্য থালে ডাকে তিনজন॥
ফট পট পিশিত মিশ্রিত করি যূষে।
বায়ুবেগে বিধুমুখী ব্যস্ত হয়ে আসে॥
দিতে নিতে খুড়ায়তে নাহি অবসর।
শ্রমে দুইল সজল কোমল কলেবর॥
ইন্দুমুখে মন্দ মন্দ ঘর্ম্মবিন্দু সাজে।

মৌক্তিকের পংক্তি যেন বিদ্যুতের মাঝে॥"
তার পর দাসদাসী সকলকে খাওয়াইয়া—
"সহচরী সঙ্গে করি পসারিয়া পা।
গ্রামগঠে গিরিসুতা গণেশের মা॥
মধ্যখানে মহামায়া সখী চারি পাশে।
অন্নমুখে উপকথা আরম্ভিয়া বাসে॥"

এ একটি প্রাচীন বাঙ্গালা হিন্দু গৃহিণীর নিখুঁত বর্ণনা। ইহার পার্শ্ব বৃত্রসংহারের শচীও যেন কেমন প্রাণশূন্য বলিয়া মনে হয়।

ধনপতি যখন লহনার সুখের সংসারে সপত্নীরূপ কণ্টক বৃক্ষের রোপণ করিতে অভিলাষী হইয়া সে বিষয়ে বিগতযৌবনা বনিতার সম্মতি চাহিতেছেন, সে কপট কথা গুলি কেমন সুন্দর!——

"লহনা লহনা বলে ডাকে সদাগর।
অভিমানে সাধুরে বামা না দেয় উত্তর॥
ইঙ্গিতে বুঝিয়া লহনার অভিমান।
কপট প্রবন্ধে সাধু লহনা বুঝান॥
রূপনাশ কৈলে প্রিয়ে, রন্ধনের শালে।
চিন্তামণি নাশ কৈলে কাচের বদলে॥
স্নান করি শিরে না দেও চিরণি
রৌদ্র নাহি পায় কেশ, শিরে বিন্ধে পানি॥
অবিরত ঐ চিন্তা আর নাহি গণি।
রন্ধনের শালে নষ্ট করিনু পদ্মিনী॥
মাসী মাতুলা পিসি বহিন সতিনী।
নাহি ঘরে ত কেহ হৈতে রন্ধনী॥
যুক্তি যদি লয় মনে কহিবে প্রকাশি।
রন্ধনের তরে তবে করে দি যে দাসী॥
বরিষা বাদলে অনলে দেহ সু।
কর্পূর তাম্বুল বিনা শুকাইল মু॥
ধূমযুক্ত অনলে সদাই চক্ষে লোহ।
দর্পণে েহারি দেখ চক্ষে রক্ত মোহ॥
সদাগর বলে যত কপট আশ্বাস।
উত্তর না দেয় রামা ছাড়য়ে নিশ্বাস॥"

তার পর সাধু বিদেশে গমন করিলে দুই সতীনের মধ্যে সপত্নীপ্রেম উছলিয়া, উঠিয়াছিল, তাহাও কেমন স্বাভাবিক—

"ঘন ঘন ঘন দুন্দে বাহুনাড়া।
শুনিয়া ধাইল বেনিয়া পাড়া॥
খুল্লনার হাত দৈব বিপাকে।
লাগিল ঠেকন লহনার মুখে।
হইল যেন আগুনির কণা।
দুই গালে মারে চড় ঠোনা॥
কেশাকেশি দুই সতীনে ফিরে।
প্রবোধ করিতে কেহ ত নারে॥
ফেলে ছোট বন স তীনের কাঁটা।
এই মুখে চাহ গারীর বাটা॥"

খুল্লনার বারমাসের দুঃখ, তাহাও কেমন মর্ম্মস্পর্শী!—

"পাশেতে বসিয়া রামা কহে দুঃখবাণি।
ভাঙ্গা কুঁড়িয়া তালপাতার ছাওনী॥
ভেরেণ্ডার থামা মোর আছে মধ্যঘরে।
প্রথম আষাঢ়ে ঘর নিত্য পড়ে ঝড়ে॥
কহিতে দুঃখের কথা চক্ষে পড়ে জল।
বড় বড় গৃহস্থের টুটিল সম্বল॥
শ্রাবণে বরিষে যেন দিবস রজনী।
সিতাসিত দুই পক্ষ একই না জানি॥
আচ্ছাদন কুঁড়ে, অঙ্গে পড়ে মাংস জল।
কত মাছি খায় অঙ্গে মোর কর্ম্মের ফল॥
শুন গো শুন গো রামা দুঃখের কাহিনী।
কত শত খায় জোঁক, নাহি খায় ফণী॥"

বাঙ্গালী হিন্দুর তখন যথার্থই দুর্দ্দিন। তাই এই দুর্দ্দিনের বর্ণনায় বাঙ্গালীর হৃদয়তন্ত্রী বাজিয়া উঠে।

ইহার পর প্রাচীন বাঙ্গালীর আতিথেয়তা ও ভক্তি-প্রবণ-হৃদয়ের কয়েকটি চিত্র উদ্ধৃত করিতেছি।—

"কর্ণ বলে এই কর্ম্ম যদি না করিবে।
বিপ্রক্রোধ' হৈলে তবে নরকস্থ হবে॥
তুমি যদি বল, পুত্রে না দিব কাটিতে।
কি কথা কহিব গিয়া ব্রাহ্মণ-সাক্ষাতে॥
দয়া করি একবার দেহ অনুমতি।

রাজা কর্ণ ব'লে মাথ রাখ পদ্মাবতি ॥
যেন কালে দ্বিজবর তাকে দিয়া কয়।
শীঘ্র করি এস রাজা বিলম্ব না সয় ॥
অঙ্গীকার করিয়াছ শুন কর্ণ তাই।
বল যে নারিনু দিতে ফিরে ঘরে যাই ॥
রাজা বলে, নাহি দিলে সংকে নিবাস।
হয় তার শত জন্ম; কহিনু নির্য্যাস।
এত শুনি পদ্মবতী কহে দুঃখ মনে।
পুত্রকে কাটিয়া দিব বলহ ব্রাহ্মণে।"

(দাতাকর্ণ)

"নিকটে হরির ঘর, নহে অতি দূরতর
সন্ধ্যা কৈলা সেইখানে যেতে।
আহারি উঠানে গিয়া, বসিলেন হয় প্রয়া
কহেন চলিতে নারি রেতে ॥
কহিলা মধুর স্বরে থাকিলাম তোর ঘরে
হরি বলে একাব কেমনে।
ভাঙ্গাকুড়ে ছাওয়া পাতে, বৃদ্ধ পিতা মাতা
ঠাঁই নাই হয় চারি জনে ॥
অতিথি আপনি হবে উপোষ কেমনে রবে
অন্নের সংযোগ মোর নাই।
হেন ভাগ্য নাহি ধরি অতিথি সেবন করি,
এই বেলা দেখ আন ঠাঁই ॥
এই দেখ বৃদ্ধ বাপ অন্ন বিনা পান তাপ
বৃদ্ধ মাতা অন্ন বিনা মরে।
গেল চারি পর দিন অন্ন বিনা আমি ক্ষীণ
যমযোগ্য অতিথি এ ঘরে ॥"

(অন্নদামঙ্গল)

শেষে যখন অন্নদার কৃপায় অন্ন মিলিল—

"বুড়ীটি কহেন বাছা আগে অন্ন খাও।
শেষে দিব পরিচয় আর যাহা চাও ॥
হরি বলে পিতা মাতা আগে খান ভাত।
পরিচয় দিলে অন্ন খাইব পশ্চাৎ ॥" (ঐ)

কিংবা—

"পাটুনী কহে চক্ষে বহে জল।
[illegible] পরিচয় বুঝিনু সে [illegible] ॥
যেই দেখ সেঁউতিতে থুয়ে ছিলা পদ।
কাষ্ঠের সেঁউতি মোর, হৈল অষ্টাপদ ॥
ইহাতে বুঝিনু তুমি দেবতা নিশ্চয়।
দয়ায় দিয়াছ দেখা দেহ পরিচয় ॥
তপ জপ নাহি জানি ধ্যান জ্ঞান আর।
তবে যে দিয়াছ দেখা দয়া সে তোমার ॥
যে দয়া করিল মোর এ ভাব উদয়।
সেই দয়া হৈতে মোর দেহ পরিচয় ॥
ছাড়াইতে নারি দেবী কহিল হাসিয়া।
কহিয়াছি সত্য কথা বুঝহ ভাবিয়া ॥
আমি দেবী অন্নপূর্ণা প্রকাশ কাশীতে।
চৈত্র মাসে মোর পূজা শুক্লা অষ্টমীতে ॥
কতদিন ছিনু হরিহোড়ের নিবাসে।
ছাড়িলাম তার বাড়ী কোন্দলের ত্রাসে ॥
ভবানন্দ মজুমদার নিবাসে রহিব।
বর মাগ মনোনীত যাহা চাহ দিব ॥
প্রণমিয়া পাটুনি কহিছে যোড় হাতে।
আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে ॥"

(অন্নদা)

আর অধিক অংশ উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন নাই। যাহা উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা হইতেই বুঝা যাইবে যে প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য বাঙ্গালীর কিরূপ প্রাণের সামগ্রী ছিল।

এবার আমরা আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রকৃতির আলোচনা করিব। আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের সমালোচনার সময় এখনও আসিয়াছে কি না বলিতে পারি না। ইহার গতি দিন দিন যেরূপ পরিবর্ত্তিত হইতেছে, তাহাতে এ সময়ে ইহার সম্বন্ধে সাধারণভাবে কোন মন্তব্য প্রকাশ করিতে সাহস হয় না। তথাপি আমার মনে হয় ইহার প্রকৃতি সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা যাইতে পারে।

আধুনিক বঙ্গসাহিত্য ইংরাজ শাসন ইংরাজী শিক্ষার ফল।

ইংরাজের সুশাসনে বাঙ্গালা দেশে সর্ব্বত্র শান্তি বিরাজ করিতেছে; বাঙ্গালী আর উৎপীড়নের আশঙ্কায় দূর পল্লীগ্রামে গৃহের কোণে লুকাইয়া থাকে না। স্থলে রেল ও জলে জাহাজ এখন বাঙ্গালীকে দুই দণ্ডে দুই দিনের পথে লইয়া যাইতেছে। পল্লীগ্রামের ঘরমুখো বাঙ্গালী আজ হিমালয়ের বক্ষে, কাল মানসসরোবরের তীরে, পরদিন সুদূর সমুদ্রের বক্ষে বিচরণ করিতেছেন; ঘরে বসিয়া প্রত্যহ সমগ্র ভূমণ্ডলের সংবাদ পাইতেছেন।

তাহার উপর ইংরাজী সাহিত্য তাঁহার সম্মুখে অনন্ত রত্নরাজির অক্ষয় ভাণ্ডার উদ্ঘাটিত করিয়া দিয়াছে। ইংরাজী শিক্ষার আলোকে তিনি নিবিড় তমসাচ্ছন্ন প্রাচীন ভারতের প্রাচীনতম ইতিহাসের সন্ধান পাইয়াছেন। তাঁহার দৃষ্টি, তাঁহার প্রেম, এখন কেবল তাঁহার ক্ষুদ্র পরিবারের বা ক্ষুদ্র পল্লীর মধ্যে নিবদ্ধ নহে; তাহা ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ছুটিয়াছে। বাঙ্গালীর হৃদয়ে জাতীয় ভাবের উদয় হইয়াছে। আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের পাতায় পাতায় এই ভাবের অভিব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। কেবল মাতৃভূমির জন্য নহে, মাতৃভাষার জন্যও এখন বাঙ্গালী কবির প্রাণ কাঁদে।

"নানান্ দেশে নানান্ ভাষা।
বিনা স্বদেশীয় ভাষা পূরে কি আশা?
কত নদী সরোবর কিবা ফল চাতকীর
ধারাজল বিনা কভু ঘুচে কি তৃষা?"

কিংবা—

"মাতৃসম মাতৃভাষা পুরাও তোমার আশা,
তুমি তার সেবা কর সুখে।"

ইত্যাদি কথা আমরা প্রাচীন বাঙ্গালী কবির মুখে শুনিতে পাই না।

এমন কি একবারে অতি উচ্চ ইংরাজী শিক্ষিত বাঙ্গালী কবিও অপূর্ব্ব সম্পদশালী ইংরাজী সাহিত্যের আলোচনায় অত্যধিক কালক্ষেপ করায় অনুতাপ করিয়া বলিয়াছেন—

"কাটাইনু বহুদিন সুখ পরিহরি,
অনিদ্রায় অনাহারে সঁপি কায় মন;
মজিনু বিফল তপে অবরেণ্যে বরি,
কেলিনু শৈবালে ভুলি কমল কানন।"

শুধু বঙ্গভূমি ও বঙ্গভাষা নহে, বাঙ্গালী কবির হৃদয় আজ সমগ্র ভারতবর্ষের দিকে ছুটিয়াছে। তিনি যেমন বঙ্গমাতার তেমনি ভারতমাতারও সন্তান, বরং তাঁহার প্রাণের টান বঙ্গমাতার অপেক্ষা ভারতমাতার দিকেই অধিক, কারণ তিনি বুঝিয়াছেন যে ভারতমাতার সেবা করিলেই বঙ্গমাতারও সেবা করা হইবে। তাই এখন বাঙ্গালী কবি সমস্ত ভারতের জাতীয় কবি।

৬ পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, সে কালের কাব্যে ইহজীবনের অনিত্যতা, অসারতার কথা প্রতিপদে দৃষ্ট হইয়া থাকে। উৎপীড়িত, লাঞ্ছিত, হৃতসর্ব্বস্ব, দুর্ব্বল ব্যক্তির ইহকালে সুখ কোথায়? এরূপ ব্যক্তি অদৃষ্টের দোহাই দিয়া আত্মবঞ্চনার দ্বারা শান্তিলাভের চেষ্টা করিয়া থাকেন। ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থায় বাস করিয়া আধুনিক কবি ইহজীবনের মূল্য বুঝিয়াছেন। যাঁহার চতুর্দ্দিকে উন্নতির স্রোত প্রবাহিত, যিনি প্রতি মুহূর্ত্তে চেষ্টা, পরিশ্রম, আত্মনির্ভরতার সুখময় ফল দেখিতে পাইতেছেন তাঁহার নিকট ইহজীবন অনিত্য অসার বোধ হইবে কেন? যাঁহার নিকট বিজ্ঞান ঐন্দ্রজালিকের ন্যায় দিন দিন অত্যাশ্চর্য্য, অচিন্তনীয় ব্যাপার সকল সংঘটন করিতেছে, ও আপনার অখর্ব্ব বলদর্পে জগৎকে "টানিয়া ছিঁড়িয়া নূতন করিয়া গড়িতে চাহিতেছে", তাঁহার নিকট এ

জীবন অনিত্য, অসার বোধ হইবে কেন? তাঁহার কতদূর উচ্চ আকাঙ্ক্ষা শুন—

"কিরূপ বেগেতে পবনের গতি,
তরল বায়ুতে শবদ-শকতি
রাখিব ছাপিয়া দেখিব খুলিয়া
রবির কিরণ গঠন প্রথা।
আনিব নামায়ে ভীষণ অশনি
পৃথিবী উপরে, বাসব-শিঞ্জিনী
বাঁধিব সুন্দর দামিনী-লতা ॥"

তাই তিনি বলিতেছেন,—

"মানব জনম সার, এমন পাবে না আর,
বাহ্য দৃশ্যে ভুলোনারে মন।
কর যত্ন হবে জয়, জীবাত্মা অনিত্য নয়,
অহে জীব কর আকিঞ্চন ॥"

তখন কবি এ জীবনের যে উদ্দেশ্য বুঝিয়াছিলেন, এখনকার কবি তাহার বিপরীত উদ্দেশ্য বুঝিয়াছেন। তাই তিনি উপদেশ দিতেছেন—

"করো না সুখের আশ, পরো না দুঃখের ফাঁস,
জীবনের উদ্দেশ্যতা' নয়;
সংসারে সংসারী সাজ কর নিত্য নিজ কাজ
ভবের উন্নতি যাতে হয়।"

তাই আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যে আমরা আদর্শ চরিত্রের সৃষ্টির চেষ্টা দেখিতে পাই। যে চরিত্রের অনুসারে আমরা নিজেদের চরিত্র গঠন করিতে পারিব, যাহার দৃষ্টান্তে আমরা এই সার মানবজীবনের উদ্দেশ্যসাধনে সমর্থ হইব, আধুনিক কালের কবির কাব্যে সেইরূপ চরিত্রের সৃষ্টিই দৃষ্ট হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে প্রাচীন কালের ন্যায় আধুনিক কবিও পুরাণাদির আখ্যায়িকা অবলম্বনে কাব্য প্রণয়ন করিয়াছেন ইঁহাদের কাব্যেও শিব, দুর্গা, কৃষ্ণ প্রভৃতি দেবদেবীগণের চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু এ শিব দুর্গা যথার্থই হিন্দুর আরাধ্য দেবতা, আদর্শ দাম্পতিনী বটেন। নবীনচন্দ্রের শ্রীকৃষ্ণ, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাসের প্রেমোন্মত্ত যুবক বা কাশীরামদাসের কূটবুদ্ধি কুচক্রী ক্ষত্রিয় নরপতি নহেন, তিনি জ্ঞানরূপী আদর্শ পুরুষ, ধরাতলে ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য অবতীর্ণ। কৃষ্ণ, অর্জ্জুন, সুভদ্রা—

"কি ত্রিমূর্ত্তি অপার্থিব! ভারত-জগতবাসি,
দেবগণ, ঋষিগণ, একবার দেখ আসি।
জ্ঞানদেব নারায়ণ; বল-দেব ধনঞ্জয়;
মধ্যে ভক্তিদেবী ভদ্রা; সম্মুখে মহিমাময়
চিতা আত্ম বিসর্জ্জন; জ্ঞান, বল, আত্মদান
ভক্তির নিষ্কামসূত্রে সম্মিলিত, সমপ্রাণ।
এই চতুর্ব্বর্গ এই মানবের মোক্ষধাম,—
দ্বাপরের অবতার। (কুরুক্ষেত্র)

বর্ত্তমান প্রবন্ধের আর বাহুল্য করিব না। আমরা মোটামুটি প্রাচীন ও আধুনিক বঙ্গীয় সাহিত্যের প্রকৃতির আলোচনা করিলাম। যাহা বলা হইয়াছে তাহাতে আধুনিক বঙ্গীয় সাহিত্যের শ্রেষ্ঠত্বই প্রতিপাদিত হইয়াছে। বস্তুতঃ প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য অপেক্ষা আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্য যে সকল বিষয়েই উন্নত তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু একটি কথা, আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্য শিক্ষিত বাঙ্গালীরই আদরের জিনিষ, সাধারণ বাঙ্গালী তাহার সংবাদ রাখে না। কিন্তু এই শিক্ষিত বাঙ্গালী কয়জন? আজও দেশের পনর আনা লোক কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীরাম দাসের মহাভারত ও কবিকঙ্কণের চণ্ডীপাঠ করিয়া অপার আনন্দ ও প্রভূত শিক্ষালাভ করে। মধুসূদন হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্রের গ্রন্থ কয়জন পাঠ করেন? আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যে আমরা যেন বাঙ্গালীর প্রাণের কথা পাই না। যদি বাঙ্গালীর ইতিহাস কখনও রচিত হয়, তাহা হইলে প্রধানতঃ প্রাচীন বঙ্গীয় কাব্য সাহিত্য হইতে তাহার উপকরণ সংগ্রহ করিতে হইবে। আধুনিক কাব্য সাহিত্য

হইতে যে বিষয়ে বিশেষ খোঁজ পাওয়া যাইবে না। এ সম্বন্ধে আধুনিক বঙ্গীয় সাহিত্যের সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র যে কয়টি অতি সুন্দর, সারগর্ভ কথা বলিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিয়া এ প্রবন্ধের উপসংহার করিব। তিনি বলেন—

"আজিকার বিদেশজাতীয়ভাব এবং উন্নতির পথে সমারূঢ় সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট বাঙ্গালা সাহিত্য দেখিয়া অনেক সময় বোধ হয়, হৌক সুন্দর, কিন্তু এ বুঝি পরের—আমাদের নহে। খাঁটি বাঙ্গালীর কথায়, খাঁটি বাঙ্গালীর মনের ভাব ত খুঁজিয়া পাই না। ** মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ শিক্ষিত বাঙ্গালীর কবি। এখন আর খাঁটি বাঙ্গালী কবি জন্মে না—জন্মিবার যো নাই জন্মিয়া কাজ নাই। বাঙ্গালার অবস্থা আবার ফিরিয়া অবনতির পথে না গেলে খাঁটি বাঙ্গালী কবি আর জন্মিতে পারে না। আমরা "বৃত্র সংহার" পরিত্যাগ করিয়া "পৌষপার্ব্বণ" চাই না। কিন্তু তবু বাঙ্গালীর মনে পৌষপার্ব্বণে যে একটা সুখ আছে— বৃত্র সংহারে তাহা নাই। পিঠাপুলিতে যে একটা সুখ আছে, শচীর বিম্বাধর-প্রতিবিম্বিত সুধায় তাহা নাই। সে জিনিষগা একেবারে আমাদের ছাড়িলে চলিবে না; দেশ শুদ্ধ জোন্‌স্, থমিসের তৃতীয় সংস্করণে পরিণত হইলে চলিবে না। বাঙ্গালী নাম রাখিতে হইবে। জননী জন্মভূমিকে ভাল বাসিতে হইবে। যাহা মার প্রসাদ, তাহা যত্ন করিয়া তুলিয়া রাখিতে হইবে। এই দেশী জিনিষগুলি মার প্রসাদ। এই খাঁটি বাঙ্গালাটি, খাঁটী দেশী কথাগুলি মার প্রসাদ। মার প্রসাদে পেট না ভরে, বিলাতী বাজার হইতে কিনিয়া খাইতে পারি—কিন্তু মার প্রসাদ ছাড়িব না।"

শ্রীসরোজরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ।

বাদরায়ণ ও শঙ্করের জীবতত্ত্ব-বিচার।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

"অনুজ্ঞা পরিহারৌ দেহসম্বন্ধাজ্জ্যোতিরাদিবৎ"। ঐঐ ৪৮ সূত্র।

"যেরূপ জ্যোতিরূপে এক হইলেও ক্রব্যাৎ অগ্নিকে অর্থাৎ শ্মশানের মাংসাশী অগ্নিকে পরিহার করা হইয়া থাকে, কিন্তু অপর পবিত্র অগ্নিকে নহে এবং যেরূপ পার্থিবত্ব রূপে এক হইলেও বজ্র বৈদূর্য্য প্রভৃতিকে আগ্রহ ও আদরে লোকে গ্রহণ করে কিন্তু নরকপাল প্রভৃতিকে ঘৃণায় দূরে পরিহার করিতে প্রবৃত্ত হয়, সেইরূপ "ঋতৌ ভার্য্যামুপেয়াৎ" প্রভৃতি অনুজ্ঞা (বিধি) এবং "গুর্ব্বঙ্গনাং নোপগচ্ছেৎ" প্রভৃতি পরিহার (নিষেধ) দেহাত্মভাবে অন্বিত।"

ভাষ্য—

"ঋতুকালে ভার্য্যার সঙ্গ করিবে" ও "অগ্নিষোমীয় পশু হনন করিবে" ইহা বৈদিক অনুজ্ঞা, এবং "গুরুপত্নী গমন করিবে না" ও "কোন প্রাণীর হিংসা করিবে না" ইহা বৈদিক পরিহার। পক্ষান্তরে "মিত্রের আদর সৎকার করিবে" ইহা লৌকিক অনুজ্ঞা, এবং "শত্রুকে পরিত্যাগ করিবে" লৌকিক পরিহার। এই উভয় প্রকার অনুজ্ঞা-পরিহার, আত্মা এক হইলেও দেহ-সম্বন্ধমূলক। আর "এই সাত্ত্বিক্-হন্ত সংঘাতই আমি" এইরূপে যে আত্মাতে বিপরীত জ্ঞান, তাহাকেই দেহ সম্বন্ধের সত্তা বলা হইয়া থাকে। লোক-নীতিতেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, সকলেই "আমি যাইতেছি" "আমি আসিতেছি," "আমি অন্ধ," "আমি অন্ধ নহি," "আমি মূঢ়" ও "আমি মূঢ় নহি" এইরূপ প্রণালীতে আত্মাকে দেহ প্রভৃতির

কর্তৃ আরোপ করিয়া থাকে। পরন্তু তত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত অপর কাহারায়া এই ভ্রান্তির বিধ্বংশ না হওয়ায় ঐ জ্ঞান লাভের পূর্ব্বে অর্থাৎ বন্ধন-দশাতে ইহাকে নিখিল প্রাণীতে আসন জমাইতে দেখা যায়। সুতরাং আত্মা এক অদ্বিতীয় হইলে পরও অবিদ্যামূলক যে দেহ প্রভৃতি উপাধির সম্বন্ধ তাহাই অনুজ্ঞা-পরিহারের মূলে রহিয়াছে। এই স্থলে এইরূপ অসম্বন্ধ প্রলাপেরও অবকাশ রহিল না যে, তত্ত্বজ্ঞানীর পক্ষে অনুজ্ঞা-পরিহারটা নিরর্থক হইয়া পড়িল। কেন না তত্ত্বজ্ঞানের লোকোত্তর প্রভাবে তিনি কৃতার্থ হইয়াছেন বলিয়া তাঁহার প্রতি এইরূপ অনুযোগ আনিতে পারা যায় না। আর ইহাও মিথ্যা নহে যে, হেয় ও উপাদেয় বস্তু সম্বন্ধেই কেহ নিয়োজ্য হইতে পারে; সুতরাং যিনি আত্মাতিরিক্ত কোনই হেয় বা উপাদেয় জিনিষ দেখিতে পান না, তাঁহাকে কোন প্রকারে নিযোজ্য বলিয়া পরিগণিত করা যুক্তিসঙ্গত নহে, কেন না এইরূপ করিলে তিনি নিজের প্রতি নিজে নিযোজ্য হইয়া থাকেন। ইহার উপরও যদি এইরূপ আপত্তি হয় যে, যিনি শরীর হইতে "আমি অতিরিক্ত" এইরূপ জানেন, তিনিও পারলৌকিক ফলজনক কর্ম্মে নিযুক্ত হয়েন। তবে তাহার উত্তরে বলিতেছি যে, যিনি "শরীর হইতে আমি অতিরিক্ত" এইরূপ জানেন, তাঁহারও "আমি দেহাদিমিশ্রিত" এই প্রকার অভিমান থাকিতে পারে, সুতরাং তাঁহার পক্ষে নিযোজ্যত্ব অসম্ভব নহে। ইহা সত্য, যেরূপ আকাশ অপরাপর বস্তুতে নির্লেপ, সেইরূপ আত্মা দেহাদিতে নির্লেপ এইরূপ যাহার জ্ঞান নাই, তাহার পক্ষেই ঐ নিযোজ্যব্যতিরেক। পক্ষান্তরে যিনি আত্মাকে শরীরাদি হইতে নির্লেপ বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছেন, এইরূপ কোন ব্যক্তির নিয়োগ দেখিতে পাই না; সুতরাং একাত্মদর্শীর পক্ষে উহা কি প্রকারে সম্ভবপর হইতে পারে? এই স্থলে এইরূপ কুতর্কেরও অবতারণা করিতে পারা যায় না যে, নিয়োগের অভাবে সম্যক্‌দর্শী যথেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হইতে পারেন। কেন না সকল স্থলেই দৃষ্ট হইয়া থাকে যে, প্রবর্ত্তকতার মূলে অভিমান রহিয়াছে, কিন্তু সম্যক্‌দর্শীর পক্ষে লেশ মাত্রও উহা দেখিতে পাওয়া যায় না। অতএব প্রতিপন্ন হইল যে, অনুজ্ঞা-পরিহারটা দেহ-সম্বন্ধজনিত। এইরূপে সূত্রের "জ্যোতিরাদিবৎ" অংশের ব্যাখ্যা হইতেছে। যেরূপ জ্যোতিরূপে এক হইলেও শ্মশানের মাংসভক্ষণকারী অগ্নিকে পরিত্যাগ করা যায়, কিন্তু অপর পবিত্র নির্দ্দোষ অগ্নিকে নহে, যেরূপ একই সূর্য্যের অমেধ্য দেশ-সংপৃক্ত প্রকাশ উপেক্ষিত হয়, কিন্তু অন্য বিশুদ্ধ ভূমিস্থ প্রকাশ নহে, যেরূপ একই ভূমির বিকারভূত বজ্র বৈদূর্য্য প্রভৃতি উপাদেয় হইয়া থাকে, কিন্তু তথাবিধ নরকপাল পরিহৃত হয় এবং এবং যেরূপ ভগবতীর বিষ্ঠা মূত্রকে পবিত্র জিনিষ বলিয়া লোকে জানে, কিন্তু শূকর প্রভৃতির ঐ জিনিষটাকে সকলেই ঘৃণা সহকারে পরিহার করে, তদ্রূপ।

"অসন্ততেশ্চাব্যতিকরঃ"। ঐ ঐ ৪৯ সূত্র। "কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ববিশিষ্ট জীবের প্রত্যেক শরীরের সহিত সম্বন্ধ না থাকাতে কর্ম্ম ও তৎফলের সাঙ্কর্য্য হয় না।"

ভাষ্য—

এক আত্মার দেহ বিশেষের সহিত সম্বন্ধ আছে বলিয়া, অনুজ্ঞা-পরিহার অসঙ্গত না হইলেও আত্মার একত্ব স্বীকারে কর্ম্ম ও তৎফলের সহিত তদীয় সম্বন্ধটার সাঙ্কর্য্য না হইয়া থাকে না এই জন্য যে, ঐ উভয়ের অধিকারী একই— এইরূপ আপত্তি

আসিতে পারে না, যেহেতু এরূপ সম্বন্ধের অভাব সুনিশ্চিত। ইহার তাৎপর্য্যটা এই যে, শুদ্ধ আত্মা সর্ব্বব্যাপী হইলেও কর্ত্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ববিশিষ্ট আত্মা প্রত্যেক শরীরের সম্বন্ধ নহে। আর আত্মা যে বুদ্ধি আদি উপাধি-তন্ত্র ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, সুতরাং উপাধির সম্বন্ধ প্রত্যেক শরীরের সহিত নাই বলিয়া জীবেরও ঐ প্রকার সম্বন্ধটা অসঙ্গত। কাযেই কর্ম্ম ও তৎফলের সাঙ্কর্য্য দোষ আসিতে পারে না।

(অংশশীর্ষক সূত্রে ঘটাকাশ যেরূপ ঘট-রূপ উপাধি দ্বারা অবচ্ছিন্ন, সেইরূপ আত্মা ও বুদ্ধি প্রভৃতি উপাধি দ্বারা অবচ্ছিন্ন হওয়াতে তাঁহার অংশত্ব প্রতিপন্ন হইয়াছে বলিয়া অবচ্ছেদবাদ সূচিত হইয়াছে। এইক্ষণে একথার দ্বারা অবচ্ছেদ বাদে অরুচি ইঙ্গিত করিয়া "রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব" প্রভৃতি প্রতিসিদ্ধ প্রতিবিম্ববাদ ভগবান সূত্রকার উত্থাপন করিতেছেন।—

রত্নপ্রভা)

"আভাস এবচ"। ৫০ ঐঐ সূত্র।

"বেদান্তমতে জীব আভাস অর্থাৎ ব্রহ্ম-প্রতিবিম্বরূপ।"

ভাষ্য—

জল-সূর্য্যক প্রভৃতির ন্যায় এই জীব পরমাত্মার আভাস মাত্র। ইহাকে সাক্ষাৎ অনুপহিত পরমাত্মা বা অতিরিক্ত বস্তু বলা যাইতে পারে না। সুতরাং যেরূপে এক জলসূর্য্যক (জল-প্রতিবিম্বিত সূর্য্য) কম্পমান হইলে পরও অপর জল-সূর্য্যক কম্পিত হয় না, সেইরূপে এক জীব কোন কর্ম্মফলের সহিত সম্বন্ধ হইলেও অন্য জীব উহার সহিত অসম্বন্ধই থাকে। এই প্রকার রীতিতে কর্ম্ম ও তৎফলের সাঙ্কর্য্য দোষ হয় না। এই আভাস অর্থাৎ প্রতিবিম্ব অবিদ্যা-রচিত বলিয়া তন্মূলক সংসরণ দশাও যে অবিদ্যা-কৃত ইহা যুক্তিযুক্ত। সুতরাং এই আভাসবাদে অবিদ্যা ও তৎকৃত সংসারদশার উপশম হইলে ব্রহ্মাত্মভাবের অর্থাৎ মুক্তির সিদ্ধিতে কোন বাধা নাই। বিপক্ষে যে ভেদবাদীদিগের মতে ব্যাপক অনন্ত আত্মা স্বীকৃত হইয়াছে তাঁহাদের পক্ষে অভিহিত সাঙ্কর্য্য দোষ অপরিহার্য্য। ইহার বিশদ ব্যাখ্যা এই যে, সাঙ্খ্যবাদীরা বলিয়া থাকেন, চিন্মাত্রস্বরূপ, নিরতিশয়, নির্গুণ, সর্ব্বব্যাপী, অসংখ্য আত্মার ভোগ ও অপবর্গ সিদ্ধির নিমিত্ত সাধারণ প্রধান অর্থাৎ প্রকৃতি বর্ত্তমান রহিয়াছেন। এই-রূপে কণাদমতাবলম্বীরাও বলিয়া থাকেন যে, আত্মা সর্ব্বব্যাপী হইলেও ঘট কুম্ভ প্রভৃতির ন্যায় স্বতশ্চৈতন্যরহিত দ্রব্যমাত্র। তাঁহার ভোগ সাধনের উপকরণ স্বরূপ অচেতন অণু-পরিমাণবিশিষ্ট মন। আত্মা ও মনের সংযোগমূলক ইচ্ছাদি নব বৈশেষিক গুণ আত্মার উৎপন্ন হইয়া থাকে। আর ঐ গুণগুলি সমভাবে প্রত্যেক আত্মায় সমবেত অর্থাৎ সমবায় সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইয়া থাকে, কিন্তু তাহাকে সংসার বলা যায়। পক্ষান্তরে ঐ নববিধ গুণের আত্যন্তিক অনুৎপত্তিই ঐ মতে মোক্ষ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। এই যে সাঙ্খ্য ও বৈশেষিক মত দেখান গেল, ইহার মধ্যে সাঙ্খ্যমতে দোষ এই যে, প্রত্যেক আত্মা চৈতন্যস্বরূপ হওয়াতে সান্নিধ্যের বৈলক্ষণ্যাভাব বশত এক আত্মার কোন সুখ দুঃখে সম্বন্ধ হইলে সমস্ত আত্মারই ঐরূপ হওয়ার সম্ভাবনা। এইরূপ সমস্যায় সাঙ্খ্য-বাদীরা বলিতে পারেন যে, পুরুষ সমূহের কৈবল্য উদ্দেশে প্রকৃতির প্রবৃত্তি, সুতরাং কৈবল্যের ব্যাঘাত ঘটে এই জন্য যাহাতে ঐ প্রকার সাঙ্কর্য্য দোষ না হয় সেইরূপে প্রকৃতির প্রবৃত্তি হইবে বলিয়া [illegible]

কোন আশঙ্কা নাই। কেন না তাহা না হইলে নিজের প্রভুত্ব দেখাইবার জন্যই প্রকৃতি দেবীর প্রবৃত্তি বলিতে হইবে; কাজেই অনির্দ্দেশ্য প্রসঙ্গ হইয়া পড়ে। পরন্তু আমরা এইরূপ উক্তির কোন সারবত্তা বুঝিতে পারিলাম না—এই জন্য যে, একমাত্র অভিলষিত বিষয়ের সিদ্ধি কোন ব্যবস্থার কারণ হইতে পারে না, কিন্তু উহার কারণ কোন না কোন যুক্তি। আর যুক্তির অভাবে ঐ মতে অভিলষিত পুরুষ কৈবল্যটাই অব্যবস্থায় পড়িয়া সার্ব্বর্য্য দোষে লিপ্ত না হইয়া থাকে না। বৈশেষিকমতেও এক আত্মার মনের সহিত সম্বন্ধ হইলেই অপরাপর আত্মারও সান্নিধ্যের অবিশেষতামূলক ঐরূপ ঠিক সম্বন্ধ হইতে পারে। সুতরাং কারণের কোন বিশেষ ভাব না থাকিলে ফলেরও বিশেষ ভাব না হওয়া অবশ্যম্ভাবী বলিয়া এক আত্মার সুখ দুঃখের সহিত সম্বন্ধ ঘটিলে নিখিল আত্মাই কেন উহাতে লিপ্ত হয় না, এইরূপ আপত্তিটা অক্ষত শরীরেই রহিয়া গেল।

অদৃষ্ট দ্বারাও যে উক্ত বিষয়ে কোন ব্যবস্থা হইতে পারে না তাহা দেখান হইতেছে,—

"অদৃষ্টানিয়মাৎ"। ঐ ঐ ৫১ সূত্র।

"আত্মা সর্ব্বব্যাপী হওয়াতে প্রত্যেক অদৃষ্টই প্রত্যেক আত্মা দ্বারা ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল বলিয়া, এই অদৃষ্ট এই আত্মারই বটে, কিন্তু অপর আত্মার নহে এইরূপ নিয়মের অভাবে উক্ত দোষ অক্ষতই রহিল।"

ভাষ্য—

প্রত্যেক শরীরের কি বাহিরে কি অভ্যন্তরে সর্ব্বত্রই যখন সমভাবে আকাশের ন্যায় সর্ব্বব্যাপী প্রত্যেক আত্মা বর্ত্তমান, [illegible], বাক্য ও শরীর দ্বারা যে পাপ পুণ্যরূপ অদৃষ্ট অর্জ্জিত হয়, তাহাও নিখিল আত্মারই সাধারণ সম্পত্তি। সাংখ্য-মতে যদিও অদৃষ্ট আত্ম সমবেত নহে বলিয়া তাহাকে প্রকৃতির অন্তর্ব্বর্ত্তী বলিতে হইবে, তথাপি প্রকৃতি সর্ব্বাত্ম সাধারণ হওয়াতে অদৃষ্ট প্রত্যেক আত্মার অসাধারণ সুখ দুঃখ ভোগের নিয়ামক হইতে পারে না। কাজেই এই মতে সুখ দুঃখ ভোগের সর্ব্বাত্ম সাধারণ্য দোষ থাকিয়াই গেল। পক্ষান্তরে বৈশেষিক মতে সর্ব্বসাধারণ আত্মমনঃ সংযোগ দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়াছে যে অদৃষ্ট, তাহা হইতেও এই আত্মারই এই অদৃষ্ট, এইরূপ ব্যবস্থার অভাবে অভিহিত দোষের উপশম হইল না।

"আমি এই ফল পাইয়াছি," "আমি ইহাকে পরিহার করি" এবং "এই প্রণালীতে আমি করি" এই প্রকার যে, বিভিন্ন রাগ-দ্বেষ প্রভৃতি আত্মাতে বর্ত্তমান রহিয়াছে তাহা দ্বারাই এই আত্মার এই অদৃষ্টই বটে এইরূপ স্বস্বামিভাবের ব্যবস্থা হইতে পারে এই প্রকার আশঙ্কায় সূত্রকার বলিতেছেন—

"অভিসংধ্যাদিষ্বপি চৈবং।" ঐ ঐ ৫২ সূত্র।

"রাগদ্বেষাদিতেও এইরূপ অব্যবস্থাই ঘটিয়া থাকে"।

ভাষ্য—

রাগ-দ্বেষাদি দ্বারাও ঐরূপ অব্যবস্থা বিদূরিত হয় না, কেন না ঐগুলি সর্ব্বাত্ম সাধারণ এই জন্য যে, উহাদের সম্পাদনকারী আত্মমনঃ সংযোগ নিখিল আত্মার সাধারণ জিনিষ।

"প্রদেশাদিতি চেন্নান্তর্ভাবাৎ"। ঐ ঐ ৫৩ সূত্র।

"প্রত্যেক আত্মার প্রত্যেক শরীরাবচ্ছিন্ন প্রদেশে সম্বন্ধ হওয়াতে আত্মার ঐরূপ প্রদেশ বিশেষ কল্পনা করিলেও কোন ব্যবস্থা হয় না।"

ভাষ্য—

এইরূপ বলিতে পারা যায় না যে, আত্মা

ব্যাপক হইলেও তাঁহার শরীরান্তর্বর্ত্তী দ্রব্যের সহিত সংযোগটা শরীরাবচ্ছিন্ন প্রদেশ বিশেষেই হইবে বলিয়া রাগ-দ্বেষাদি সুখ দুঃখ এবং অদৃষ্ট সম্বন্ধেও কোন অব্যবস্থা হইবার নহে। কেন না প্রত্যেক আত্মা তুল্যরূপে ব্যাপক হওয়াতে নিখিল আত্মাই নিখিল শরীরে সম্বদ্ধ হইয়া পড়িল। এই সম্বন্ধে বিশিষ্টভাবে আলোচনা করা যাইতেছে যে, বৈশেষিকেরা আত্মার একটা শরীরাবচ্ছিন্ন প্রদেশ কল্পনা করিতে পারেন না এই জন্য যে, নিষ্প্রদেশ আত্মার এই কল্প্যমান প্রদেশটা কাল্পনিক হওয়ায় অকাল্পনিক বিষয়ের ব্যবস্থাপক হইতে পারে না। আর প্রদেশের অবচ্ছেদক শরীরটাও সকল আত্মার সহিত সমভাবে সম্বদ্ধ হইয়া উৎপন্ন হওয়াতে এই আত্মারই এই শরীর, কিন্তু অপর আত্মার নহে, এইরূপ ব্যবস্থার কারণ হইতে পারে না। পক্ষান্তরে ঐরূপ অদ্ভুত প্রদেশটাকে আহার্য্য জ্ঞানের মহিমায় মানিয়া লইলেও কোন না কোন সময়ে সমান সুখ দুঃখের ভাগী আত্মদ্বয়েরও এক শরীর দ্বারাই উপভোগ প্রসঙ্গ হইয়া পড়ে। কেন না দুই আত্মার অদৃষ্টটাও তুল্য প্রদেশশালী হইতে পারে। এই বিষয়টাই স্পষ্ট করা যাইতেছে যে,—দেবদত্ত যেই প্রদেশে সুখ বা দুঃখ অনুভব করিয়াছিল, ঐ প্রদেশ হইতে তাঁহার শরীর অপসারিত এবং ঐ প্রদেশে যজ্ঞদত্তের শরীর সংস্থাপিত হইলে যজ্ঞদত্তেরও দেবদত্তের ন্যায় সুখ বা দুঃখের অনুভব দৃষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু উভয়ের অদৃষ্টকে তুল্য প্রদেশশালী না মানিলে ইহা সম্ভবপর নহে। আর প্রদেশবাদীর পক্ষে স্বর্গাদির উপভোগটা অসম্ভব ব্যাপারে পরিণত না হইয়া থাকে না,—কেন না ব্রাহ্মণাদি-শরীরের অন্তঃপাতী স্বর্গাদির উপভোগটা হইবে দেবাদি শরীরাবচ্ছিন্ন প্রদেশ বিশেষে। এইরূপে দৃষ্টান্ত অদৃষ্টচয় বলিয়া অনেক আত্মার সর্ব্বব্যাপিত্বটাকে অসঙ্গতি দোষ হইতে নির্মুক্ত করিতে পারা যায় না। কেন না সমান প্রদেশশালী ব্যাপক বহু ব্যাপক বস্তু কি এইরূপ প্রশ্ন করিলে প্রদেশবাদী রূপ প্রভৃতিকেই বাগ্‌ব্যবহারে খাড়া করিবেন, কিন্তু ইহা যুক্তিবিরুদ্ধ এই জন্য যে রূপ প্রভৃতি নিজের আশ্রয়রূপ দ্রব্যের সহিত তাদাত্মভাবাপন্ন অর্থাৎ রূপ প্রভৃতি দ্রব্য হইতে কোন অতিরিক্ত জিনিষ নহে এবং পরস্পর ভিন্ন লক্ষণাক্রান্ত বলিয়া আত্মার সম্বন্ধে উদাহরণের অযোগ্য। আর বহু আত্মার সম্বন্ধে লক্ষণেরও কোন বিভিন্নতা দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহাতেও যদি প্রদেশবাদী বলেন যে, স্বতঃ ইতরব্যাবৃত্ত বিশেষ পদার্থটাকেই আত্মলক্ষণের বিভিন্নতা সম্বন্ধে নিয়ামক বলিব। তবে বলিতেছি যে, অদ্যাপি আত্ম বিভিন্নতা সিদ্ধ না হওয়াতে তন্মূলক বিশেষ পদার্থটার স্বসিদ্ধিতে ইতরেতরাশ্রয় দোষগ্রস্ত হইয়া পড়ে অর্থাৎ আত্মবিভিন্নতা সিদ্ধ না হইলে স্বতঃ ইতরব্যাবৃত্ত বিশেষ পদার্থের সিদ্ধি হয় না। এবং ঐরূপ বিশেষ পদার্থের সিদ্ধি না হইলে আত্মবিভিন্নতা সিদ্ধ হয় না। পক্ষান্তরে ব্রহ্মবাদী, শ্রুতিতে আকাশ প্রভৃতি কার্য্য দ্রব্যরূপে অভিহিত হইয়াছে বলিয়া উহাদিগকে সর্ব্বব্যাপী বলেন না। সুতরাং আত্মার একত্ব পক্ষে যে কোন দোষ নাই, ইহা সুসিদ্ধ হইয়া গেল।

পাঠক, জীবতত্ত্ববিচার সমাপ্ত হইল। পরন্তু ইহার প্রকৃত মর্ম্ম পরিজ্ঞান বিষয়াসক্তচিত্ত কৃতবিদ্য ব্যক্তির পক্ষেও সহজ ব্যাপার

ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ের অভাবে মেধাবী হইয়াও দিশাহারা হইয়া পড়েন এবং অবশেষে সিদ্ধান্ত করিয়া বসেন যে, যোগ সিদ্ধ না হইলে আত্মতত্ত্ব কোন প্রকারে বুঝিয়া উঠিতে পারা যায় না। অবশ্যই ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে আত্মার প্রকৃত স্বরূপ পরিজ্ঞানের জন্য যোগের আবশ্যকতা আছে। কিন্তু তাই বলিয়া যে বিচারপটু, সূক্ষ্মবুদ্ধি, ধীরপ্রকৃতি, অপ্রতিহত-অধ্যবসায় মনীষীরাও আত্মতত্ত্ব পরিজ্ঞানের উদ্দেশে যোগের ব্যাপদেশে অস্বাভাবিক বায়ুরোধ প্রভৃতি ব্যাপারে ব্যাপৃত হইয়া অকালমৃত্যু বা আগন্তুক উৎকট ব্যাধি ডাকিয়া আনিবেন ইহাকে কোন প্রকারে বিধি-বোধিত বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারা যায় না। পঞ্চদশীকারও লিখিয়াছেন যে, "বহুব্যাকুলচিত্তানাং বিচারাৎ তত্ত্বধীর্ণহি যোগোমুখ্যস্ততস্তেষাং ধীদর্পস্তেন নশ্যতি।" অর্থাৎ যাঁহারা সুবর্ণমুদ্রা ও ললামলাবণ্য-বতীর মুখচন্দ্রমার চাঁদনী ভাবিতে ভাবিতে ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছেন সুতরাং কিছুতেই লক্ষ্য স্থির করিতে পারেন না বলিয়া ব্রহ্ম-বিচারণায় অনধিকারী হওয়াতে তত্ত্বজ্ঞানে বঞ্চিত, তাঁহাদের নিমিত্ত যোগই জ্ঞান লাভ করিবার প্রধান উপায়স্বরূপ, কেন না উহা দ্বারা তাঁহাদের বুদ্ধির বিষয় চাতুর্য্যঘটিত দর্পটা চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইবে। "জন্মাদ্যস্য-যতঃ"সূত্রের ভাষ্যে ভাষ্যকারও লিখিয়াছেন, "বাক্যার্থবিচারণাধ্যবসান নির্ব্বৃত্তাহি ব্রহ্মা-বগতির্ণানুমান প্রমাণান্তর নির্ব্বৃত্তা" অর্থাৎ তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্যের ও তদর্থের তাৎপর্য্য নিশ্চয় দ্বারাই ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লব্ধ হয়, কিন্তু অপর অনুমান প্রমাণ দ্বারা নহে। এই স্থলে আনন্দগিরি (শারীরক ভাষ্যের অন্যতর টীকাকার) লিখিয়াছেন যে, "বাক্যস্য তদর্থস্য চ তাৎপর্য্য নিশ্চয়ার্থং সম্ভাবনার্থং চ বিচারণা তস্যাশ্চাধ্যবসানং তদ্ভূতস্য নিশ্চয়ঃ তেন নির্ব্বৃতো ব্রহ্মসাক্ষাৎকারঃ তস্মাৎ বিচারোঽর্থবান ইত্যর্থঃ বিচারাবধারিত শক্তি তাৎপর্য্যাভ্যাং প্রমাণাপকং শব্দং হিত্বা শক্তিমাত্রেণ প্রমাপকং প্রমাণান্তরং ব্রহ্মণি লাঘবাদাদেয়ং ইত্যাশঙ্ক্যাহ 'নানুমানাদি'।" অর্থ সহজ। এক্ষণে বেশ বুঝিতে পারা গেল যে ব্রহ্ম বিচারণাই ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের কারণ। আর যোগমতেও "বিবেক খ্যাতি রবিপ্লবাহানোপায়ঃ" সূত্রে দেখিতে পাই। এই সূত্রের বিবেক খ্যাতি আর বিচার একই জিনিষ।

যদ্যপি বেদান্তমতেও "ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ" শ্রুতি, "যৎসাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্যোগৈরপি গম্যতে" স্মৃতি, ও "অপিসংরাধনে প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং" ব্যাসসূত্র প্রভৃতিতে যোগকেও ব্রহ্মসাক্ষাৎ-কারের কারণ বলা হইয়াছে, তথাপি বিচারই তত্ত্বজ্ঞান লাভের প্রকৃষ্ট, সুগম, অপ্রতিহত, অবশ্যম্ভাবী কারণ। ইহাই জ্ঞানিপ্রবর ঋষি অষ্টাবক্র প্রকারান্তরে ব্যক্ত করিয়াছেন—"যদি দেহং পৃথক্ কৃত্য চিতি বিশ্রাম্য তিষ্ঠসি। অধুনৈব সুখী শান্তো বন্ধামুক্তো ভবিষ্যতি" অর্থাৎ হে জনক, তুমি যদি দেহকে চিন্ময় ব্রহ্মাত্মা হইতে পৃথক করিয়া ঐ ব্রহ্মাতে বিশ্রাম লাভ করিতে পার, তবে এই ক্ষণেই তুমি সুখী, শান্ত ও সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া যাও।" এইস্থলে পৃথক করার দ্বারা বিচার ও বিশ্রাম লাভ দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান সূচিত হইয়াছে। ফলতঃ বিচার ব্যতীত এমন জিনিষ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, যাহা হইতে অবিলম্বে, সহজে ও নিরাপদে ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারা যায়। আর যোগের এইরূপ প্রকৃতি যে উহা মনকে শান্ত ও লক্ষ্যে স্থির করিয়া দেয় মাত্র

কিন্তু উহা দ্বারা লক্ষ্যের পরিজ্ঞানটা কোন প্রকারে সুলভ নহে। বেদান্ত-সিদ্ধান্ত-লেশের জ্ঞানকরণ নামক প্রকরণেও এইরূপই দেখিতে পাই। "যেষান্তু বুদ্ধি মান্দ্যাৎ ন্যায়ব্যুৎপাদনকুশলবিশিষ্ট গর্ব্ব-লাভাদ্বা শ্রবণাদি ন সম্ভবতি তেষামপি অধ্যয়ন গৃহীতৈর্বেদান্তৈরাপাততোঽধিগমিত ব্রহ্মাত্মভাবানাং তদ্বিচারং বিনৈব প্রশ্নো-পনিষদাদ্যুক্ত আর্ষগ্রন্থেষু ব্রাহ্মবাশিষ্টাদি কল্পেষু পঞ্চীকরণাদিষু চ ক্রমিক শাখাবিপ্র-কীর্ণ সর্ব্বার্থোপসংহারেণ কল্পসূত্রেষু অগ্নিহোত্রাদি বৎন্নির্দ্ধারিতানুষ্ঠানপ্রকারং নির্গুণোপাসন সম্প্রদায় মাত্র বিদ্ভ্যোগুরু-ভ্যোঽবধার্য্য তদনুষ্ঠানক্রমেণোপাস্যভূত নির্গুণ ব্রহ্মসাক্ষাৎকারঃ সম্পদ্যতে অবি-সম্বাদি বিভ্রমন্যায়েনোপাস্তেরপি ক্বচিৎ ফলকালে প্রমাপর্য্যমান সম্ভবাৎ"।

যাঁহাদের বুদ্ধিটা কদলী বৃক্ষের ন্যায় স্থূল বা যুক্তি-প্রদর্শন-নিপুণবিশিষ্ট গুরু লাভ ঘটে নাই বলিয়া শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন সম্ভবপর নহে, তাঁহারা যদি বেদান্ত শাস্ত্রের অধ্যয়ন প্রভাবে ব্রহ্মাত্ম-ভাবের কোন আভাস পাইয়া থাকেন, তবে ব্রহ্মবিচারণা ব্যতিরেকেও তাঁহাদের নিখিল নির্গুণ উপাসনা পদ্ধতি বিশারদ গুরু হইতে উপাস্য নির্গুণ ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার হইতে পারে। ইহার প্রণালীটা এই যে, গুরু যাহা প্রশ্ন প্রভৃতি উপনিষদে ব্রহ্ম-কল্প ও বা শিষ্ট প্রভৃতি কল্পে অথবা পঞ্চীকরণে ক্রমশঃ বেদের প্রতিশাখায় বিপ্রকীর্ণ বিষয় সকলের সংগ্রহপূর্ব্বক অভিহিত হইয়াছে এবং যাহার অনুষ্ঠান প্রণালী অগ্নিহোত্রাদির ন্যায় কল্পসূত্রসমূহে নিশ্চিত হইয়াছে, সেই উপাসনাতত্ত্ব শিষ্যকে উপদেশ করিবেন। পক্ষান্তরে শিষ্য নিয়মপূর্ব্বক তাহার অনুষ্ঠান করিলে। এইরূপ উপাসনাপ্রভৃত ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারটাকে অসম্ভব বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারা যায় না এইজন্য যে, উপাসনা ও অবিসম্বাদী ভ্রান্তিনীতিতে (যেরূপ কোন ব্যক্তির মণির প্রভাতে মণিভ্রান্তি হওয়াতে মণিলাভ হইয়াছিল সেইরূপে) কোন স্থলে ফল প্রদান কালে প্রমার ন্যায় যথার্থ হইতে দেখা যায়। উক্ত গ্রন্থে আবার বিচারাঙ্গ শ্রবণাদি ও উপাসনার গুণ তারতম্য দেখিতে পাওয়া যায় "ইয়াংস্তু বিশেষ প্রতিবন্ধ রহিতস্য পুংসঃ শ্রবণাদি প্রণাত্যা ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারো ঝটিতি ইতি সাংখ্যমার্গোমুখ্যঃ কল্পঃ উপাস্ত্যাতু বিলম্বেনেতিযোগে মার্গোঽ-নুকল্প ইতি"।

শ্রবণাদি ও যোগের মধ্যে এই বিশেষ-ভাব পাওয়া যায় যে, বিষয়াসক্তি, অযোগ্য বুদ্ধি ও কুতর্ক প্রভৃতি প্রতিবন্ধকরহিত ব্যক্তির বিচারাঙ্গ শ্রবণাদি দ্বারাই ঝটিতি ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হইয়া থাকে এইজন্য তাঁহাদের পক্ষে সাংখ্যমার্গ অর্থাৎ ব্রহ্ম-বিচারণাই মুখ্য কল্প। আর উপাসনা দ্বারা বিলম্বে ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার হয় বলিয়া উহা অনুকল্প মাত্র।

এইত গেল বিচার ও যোগের কথা। পরন্তু চিদাভাস সম্বন্ধেও মত মতান্তর দেখিতে পাওয়া যায়। কোন মতবাদীরা যেরূপ দর্পণাদিতে মুখাদির অভিনব প্রতি-বিম্ব মানেন, সেইরূপ অবিদ্যা প্রভৃতি উপাধিতেও ব্রহ্মের ঐরূপ প্রতিবিম্ব স্বীকার করেন। আবার পঞ্চপাদিকা ও বিবরণের মতানুযায়ীরা বলেন যে, উপাধির বিচিত্র শক্তিতে যেরূপ দর্পণাদিতে মুখকে সম্মুখবর্ত্তী বলিয়া মনে হয়, ফলত দর্পণস্থ মুখ শরীরস্থ মুখ হইতে কোন ভিন্ন জিনিষ নহে; এই মত নির্দ্দোষ এবং একত্ব ও মুক্তির কোন বিঘ্ন জন্মায় না বলিয়া সর্ব্বজনপ্রিয়।

"আভাস এবচ" সূত্রে ভাষ্যকার যে

"এক জল-সূর্য্যক কম্পমান হইলে পরও অপর কম্পিত হয় না, সেইরূপ এক জীব কোন কর্ম্মফলের সহিত সম্বদ্ধ হইলেও অপর জীব উহার সহিত অসম্বদ্ধই থাকে" ইহা দ্বারা জীবের নানাভাব সূচনা করিয়াছেন। তাহাও অবিদ্যার কার্য্যভূত বুদ্ধির বিভিন্নতা নিবন্ধন, কিন্তু মূল অবিদ্যার ভিন্নতামূলক নহে। কিন্তু বিভিন্ন বুদ্ধির অস্তিত্বটা কেবল জাগ্রৎ ও স্বপ্ন অবস্থাতেই দেখিতে পাই। সুষুপ্তিতে বুদ্ধি প্রভৃতির বিলোপ ঘটাতে জীব ব্রহ্মভাবাপন্ন। ইহাই ৩য় অধ্যায়ের ২য় পাদের ৭ম সূত্রের ভাষ্যে বিশদরূপে ব্যক্ত হইয়াছে—

"অপিচ নাড্যঃ পুরীতত্বা জীবস্যোপাধ্যাধার এব ভবতি—তত্রাস্য করণানি বর্ত্তন্ত ইতি। নহি উপাধিসম্বন্ধমন্তরেণ স্বত এব জীবস্যাধারঃ কশ্চিৎ সংভবতি, ব্রহ্মা ব্যতিরেকেণ স্বমহিমপ্রতিষ্ঠিতত্বাৎ। ব্রহ্মাধারত্বমপ্যস্য সুষুপ্তে নৈবাধারাধেয় ভেদাভিপ্রায়েনোচ্যতে কথং তর্হি তাদাত্মাভিপ্রায়েণ যত আহ—সতা সৌম্য তদাসংপন্নো ভবতি স্বমপীতো ভবতি ইতি [illegible] স্বশব্দেনাত্মাভিলপ্যতে স্বরূপ মাপন্নঃ সুপ্তো ভবতি ইত্যর্থঃ। অপিচ নকদাচিজ্জীবস্য ব্রহ্মণাসংপত্তির্ণাস্তি স্বরূপস্যা নপায়িত্বাৎ। স্বপ্নজাগরিতয়োস্তু পাধি সম্পর্কবশাৎ পররূপাপত্তিমিবাপেক্ষ্য তদুপশমাৎ সুষুপ্তেঃ স্বরূপাপত্তির্ব্বক্ষ্যতে। অতএব সুপ্তাবস্থায়াং কদাচিৎ সতা সংপদ্যতে কদাচিন্ন সংপদ্যতে ইত্যযুক্তং। অপিচ স্থানবিকল্পা ভ্যুপগমেঽপি বিশেষ বিজ্ঞানোপ শমলক্ষণং তাবৎ নকচিদ্বিশিষ্যতে। তত্র সতিসংপন্নভাবত্তদেকত্বান্ন বিজানাতীতি যুক্তং—"তৎ কেন কং বিজানীয়া" দিতি শ্রুতে"।

"পক্ষান্তরে নাড়ী অথবা পুরিতৎ (শরীরস্থ আবরণ বিশেষ) জীবের উপাধিরই আধার, কেন না ঐ উভয় স্থানে জীবোপাধির অন্তর্ভুক্ত করণ সমূহ থাকে। আর উপাধি সংশ্রব ব্যতীত আপনা হইতেই জীবের কেন আধার সম্ভবপর হইতে পারে না এই জন্য যে, সুষুপ্তিতে জীব ব্রহ্মতাদাত্ম্য ভাবে নিজের মহিমায় নিজে অবস্থিতি করেন। কাযেই শ্রুতিতে সুষুপ্তিতে জীবের আধার ব্রহ্ম এইরূপ যে বলা হইয়াছে তাহার আশয় ঐ অবস্থায়-জীব ব্রহ্মে একাকার হইয়া যায়; কিন্তু আধার আধেয় ভাব শ্রুতির অভিপ্রেত নহে। কেন না "সতাসৌম্যতদা সম্পন্নো ভবতি স্বমপীতো ভবতি" অর্থাৎ হে সৌম্য সুষুপ্তিতে জীব ব্রহ্মতাদাত্ম্য লাভ করে, সুতরাং সে আপনার স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াই শয়ন করে। শ্রুতিতে 'স্ব'শব্দের অর্থ আত্মা হওয়ায় জীব আপনার স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া শয়ন করে, ইহা লব্ধ হইতেছে। আর এইস্থলে এইরূপ আপত্তি আসিতে পারে না যে, কখন জীব ব্রহ্মভাবসম্পন্ন হইতে পারে না, কেন না তাহার স্বরূপ অবিনশ্বর হওয়াতে ব্রহ্মই বটে। ইহার কারণ এই যে শ্রুতিতে জাগ্রৎ ও স্বপ্ন অবস্থায় উপাধি সংসর্গ জনিত জীবের অপরভাব দেখিয়াই যেন ঐ ভাব নাই বলিয়া সুষুপ্তিতে জীব ব্রহ্মভাবাপন্ন ইহা ব্যক্ত হইবে। এই জন্যই নাড়ী, পুরিতৎ ও ব্রহ্ম-প্রভৃতি সুষুপ্তি স্থানের বিকল্প অধিকার করিয়া এইরূপ আপত্তি উঠিতে পারে না যে, সুষুপ্তি অবস্থায় কখন জীবের ব্রহ্মতাদাত্ম্য ঘটে এবং কখন উহা ঘটে না। আর ঐরূপ স্থান বিকল্প স্বীকার করিয়া লইলেও স্থান বিকল্পবাদীকে বাধ্য হইয়া বলিতে হইবে যে, কোন স্থানেই অনাত্ম প্রপঞ্চ বিজ্ঞানরূপ বিশেষ বিজ্ঞানের নিবৃত্তির স্বরূপটার কোন বিশেষ ভাব বৈলক্ষণ্য নাই।

ইহার তাৎপর্য্য নাড়ীতে বা পুরিতৎ

জিনিষটায় যদি সুষুপ্তিতে জীব স্থিত হয়, তবে তাঁহাকে দ্বৈতাবস্থ বলিতে হইবে, আর দ্বৈতাবস্থের পক্ষে বিশেষ বিজ্ঞানের অভাব অসম্ভব এই জন্য যে ভেদাভাবই ভেদজ্ঞানাভাবের হেতু হইতে পারে।

কিন্তু ব্রহ্মের সহিত একীভাবাপন্ন জীবের ব্রহ্ম এক অখণ্ড জিনিষ বলিয়া কোন অনাত্ম বস্তুই যে সুষুপ্তিতে জ্ঞানের বিষয় হয় না, ইহা যুক্তিযুক্ত, কেননা "সুষুপ্তিতে ব্রহ্মের সহিত একীভাবাপন্ন জীব চৈতন্য কোন সাধন দ্বারা কি জানিবে?" শ্রুতি সুস্পষ্ট ভাবে বিশেষ বিজ্ঞানের অভাব ঐ অবস্থাতে বুঝাইয়া দিতেছে।

এই ভাষ্য দ্বারা সুষুপ্তিতে যে ভেদভাবের লেশও থাকে না ইহা সুচারুরূপে প্রতিপন্ন না হইয়া রহিল না। এইরূপ অবস্থায় আত্মার নানাত্ব লইয়া কোলাহল করাতে কেবল অজ্ঞতারই সূচনা হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে কোন কোন কৃতবিদ্যাভিমানী বা সাম্প্রদায়িক ভাবের ক্রীড়া কুরঙ্গ শঙ্করের লেখ হইতেও ভেদভাব প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়া থাকেন দেখিয়া কোন প্রবুদ্ধ ব্যক্তিই হাস্য সম্বরণ করিতে পারেন না। তবে ইহা সত্য যে শঙ্কর অনুকম্পা পরবশ হইয়া বা নিজের আত্মা মনে করিয়া ভেদবাদীদিগকে তত্ত্বজ্ঞানের দিকে অগ্রসর হইবার পথ দেখাইতে ত্রুটি করেন নাই। তাঁহাদের জন্য ও স্বকীয় ভাষ্যে তারতম্য অনুসারে অহং গ্রহ, অঙ্গাববদ্ধ ও প্রতিক উপাসনার পদ্ধতি যথাযথরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। পরন্তু ভেদবাদীদিগের সর্ব্বদা ইহা মনে রাখা উচিত যে, জগতে সকলেই অন্ধ নহে, কিন্তু চক্ষুষ্মানেরও আধার ভূমি।

শ্রীঅচ্যুতানন্দ সরস্বতী।

শিশুদিগের মধ্যে অকাল মৃত্যুর আধিক্য ও তৎসম্বন্ধে জননীর কর্ত্তব্য।

(পূর্ব্বপ্রকাশের পর।)

কিরূপে সহজে প্রসব করাইতে পারা যায়, এবং প্রসবান্তে কি কি প্রক্রিয়া আবশ্যক, সুশিক্ষিতা ধাত্রী মাত্রেরই সে সমস্ত অবগতি আছে। এজন্য আত্মীয়াদিগকে তাহার উপদেশানুসারে চলিতে হইবে। নবপ্রসূত সন্তানের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পরীক্ষা করিয়া, তাহার গাত্র স্বরিত হস্তে যথাসম্ভব ক্লেদশূন্য করা প্রধান এবং প্রথম কার্য্য। নাড়ী কাটাও তদ্রূপ।

সূতিকাগৃহে প্রসবের পর অশিক্ষিতা ধাত্রীর দোষে যে সকল শিশুর অকাল মৃত্যু হয়, তাহার মধ্যে "পেঁচোয় পাওয়া" টাই সর্ব্ব প্রধান। ইহা কেবল নাড়ী কাটিবার দোষেই হইয়া থাকে। সংক্রামক ব্যাধিগ্রস্ত হইয়াও অনেক বালক আঁতুড় ঘরেই মারা যায়।

প্রসূতি যাহাতে শীঘ্র প্রকৃতিস্থ হয়, তৎপ্রতি মনোযোগ দান করা ধাত্রীর অবশ্য কর্ত্তব্য। আত্মীয়াগণেরও জানা উচিত যে, প্রসূতি ও শিশুর প্রাণ ধাত্রীর হস্তে। ইহা জানিয়া তাঁহাদের সেইরূপ আচরণ করা উচিত। সেক, তাপ আবশ্যক নাই—গোয়াঁতিকে ভাজা ভাজা করিবার, কিম্বা বালককে উত্তপ্ত রাখিবার জন্য যদি প্রজ্বলিত অগ্নির

ও প্রয়োজনাভাব। সে সকলের জন্ত যে যে প্রক্রিয়া আবশ্যক, তাহা ধাত্রী কর্ত্তৃক সুসম্পাদিত হইবে, তাহার সন্দেহ নাই।

প্রবাদ আছে যে, দস্তুর মত তাপ না হইলে পো, পোয়াতি চাঙ্গা হয় না। এটা কিন্তু ভ্রম ভিন্ন আর কিছুই নয়। সুশিক্ষিতা ধাত্রীর সুকৌশলে প্রসূতি শীঘ্রই প্রকৃতিস্থা হইয়া, স্বয়ং ক্রমে ক্রমে বালকের তত্ত্বাবধানে নিযুক্তা হইতে পারে। "ফরির মুট ছেলে" বলিয়া অপর সাধারণে যাহা কিছু করিয়া থাকে, তাহা এই সুশিক্ষিতা ধাত্রীর কার্য্যানুকরণ মাত্র। কিন্তু সেই অনুকরণটি নানা রূপ ধরিয়া প্রায়ই বিকৃতাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

জননীর কর্ত্তব্য।

সুশিক্ষিতা ধাত্রী নবপ্রসূত শিশুর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পর্য্যবেক্ষণাদি ক্রিয়া এবং তাহার নিজের অন্যান্য কর্ত্তব্য সমূহ সুসম্পন্ন করিয়া দিয়া খালাস। শুধু তাহাই নহে, কোমল ফ্লানেলে জড়িত শিশুকে মাতৃক্রোড়স্থ করিয়া গেল। ফ্লানেল এবং ক্রোড়ের উত্তাপে শিশু শীঘ্রই সুনিদ্রাভিভূত হইয়া থাকে। তখন তাহাকে জাগ্রত করা অনুচিত।

জননের অব্যবহিত পরে, শিশু মলত্যাগ করিয়া থাকে। যদি প্রায় তিন দণ্ড কাল মধ্যে মলত্যাগ না করে, তাহা হইলে মধু মিশ্রিত রিকাইন্ ক্যাষ্টর অয়েল অঙ্গুলি দ্বারা তাহার মুখে দিবে। ইহাপূর্ব্বে কিন্তু মলত্যাগের জন্ত ব্যতিব্যস্ত হইবার আবশ্যক নাই।

এমনও ঘটিতে পারে যে, মাতৃস্তনে দুই এক দিবস আদৌ দুগ্ধ থাকে না। তখন ব্যস্ত সমস্ত হইয়া বালককে গোদুগ্ধ বা অন্ত দুগ্ধ পান করান উচিত নয়। স্তন টানিয়া যাহা কিছু পায়, শিশুর তাহাই যথেষ্ট। নবোৎপন্ন শিশুর অন্নের কিয়দংশ তাহার পেট ভার রাখে। প্রসূতির এই বিষয়টি মনে রাখা উচিত।

শিশুকে তৈল মাখাইয়া রৌদ্রে রাখা কিংবা সেক দেওয়া উচিত নয়। স্তন পান করিতে করিতে নিদ্রাগত হইলে ধীরে ধীরে বিছানায় শায়িত করিবে। ধাত্রী যে প্রায় তিন অঙ্গুলি রাখিয়া নাড়ী কাটিয়াছে, এবং তাহা গরমে রাখিবার যে প্রকরণ করিয়াছে, তাহাতে উহা দুই তিন দিন মধ্যে খুলিয়া পড়িবে। তাহার পরেও নাভিকুণ্ড সেক দিবার আবশ্যক নাই। কেবল পেট গরম কোমল বস্ত্রে বাঁধিয়া রাখিলেই হইবে।

প্রত্যহ বালকের গাত্র (কোন উপসর্গ না থাকিলে) সাবধানে ঈষদুষ্ণ স্নান-জলে ধৌত করা উচিত। প্রসূতি বুক পর্য্যন্ত আঁটিয়া কাপড় পরিয়া থাকিবে। অবশ্য স্তনের নিম্নদেশ দিয়া কাপড় বাঁধিবে, নহিলে বালকের স্তনপান এক প্রকার অসম্ভব। এই সময় প্রসূতির উঠিয়া চলা ফেরা একেবারে নিষিদ্ধ। কেবল বসিয়া বসিয়া শিশুকে স্তনপান করাইবে। স্তন্য পানের নিয়ম ২।৩ দিন বাঁধাবাঁধি থাকে না। পরে অবশ্য একটা নিয়ম অনুসারে চলা উচিত।

প্রসবের পর তিন দিনের মধ্যে পোয়াতির প্রায় স্তনে তেমন দুগ্ধ হয় না। তাহাতে শিশুর আহার্য্যের অল্পতা বশতঃ মলত্যাগ সম্পূর্ণরূপে না হওয়া সম্ভব। এজন্য পূর্ব্ব লিখিত মত ইতি মধ্যে জোলাপ দেওয়া বিধেয়, নতুবা কোষ্ঠবদ্ধতা দোষে অসুস্থতা অবশ্যম্ভাবী। পরেও স্তন্যদুগ্ধ যথোচিত না পাইলে, চারিগুণ পরিমাণ পরিষ্কার জলের সহিত কিঞ্চিৎ মিছরির গুঁড়া মিশ্রিত গাভী-দুগ্ধ (যেঁড়ে গাই না হয়) একটি মাত্র বলক দিয়া, ঈষদুষ্ণ অবস্থায়, মলশূন্য মাই-পোষে করিয়া দিবসে ৮ বার ও রাত্রে ২ বার

করিয়া খাওয়াইবে। ঝিনুক কিম্বা পলিতে করিয়া খাওয়ান অতীব অনিষ্টকর। মাইপোষ প্রভৃতির উত্তমরূপ শৌচ করিবে, এবং ঈষদুষ্ণ টাট্‌কা মিশ্রিত দুগ্ধ খাওয়াইবে। শিশু ইচ্ছামত খাইবে। জবরদস্তি করিয়া খাওয়াইবে না।

ইহার পরেও মাতৃদুগ্ধের অভাবে, তিন গুণ জল ও মিছরির গুড়া মিশ্রিত গাভীদুগ্ধ, পূর্ব্ব প্রকরণ মতে খাওয়াইবে। এই প্রক্রিয়া এক মাস পর্য্যন্ত চলিতে পারে। তাহার পর ৫।৬ মাস পর্য্যন্ত প্রায় সমপরিমাণ জল। এখন ক্রমে দিনে ৪।৫ বার ও রাত্রিতে ১।২ বার দুগ্ধ খাওয়াইলে চলে।

শিশুর পেট ফাঁপিয়াছে বোধ হইলে, মিশ্রিত টাট্‌কা দুগ্ধে, চূণের জল, কিংবা মৌরি ভিজান জলে মিশাইয়া লইবে। আবশ্যক বোধে শিশুকে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে শীতল জল খাইতে দিবে। কিন্তু পীড়িত শিশুকে ঈষদুষ্ণ জল পান মাত্র করিতে দিতে হয়।

গাভীদুগ্ধ অসহ্য বোধ হইলে, অল্প পরিমাণে জাল দেওয়া ছাগদুগ্ধ ব্যবহার করা সঙ্গত। গর্দ্দভদুগ্ধ সকল অবস্থায় সম্ভব নয়। নচুবা উহাই প্রশস্ত।

"দুধ মা" (শিশুর বয়সাপেক্ষী অপর দুগ্ধবতী স্ত্রীলোক) নিয়োজিত করা অনেকের সাধ্যাতীত। বড় লোকের ঘরে গর্দ্দভ দুগ্ধ এবং "দুধ মা" প্রায়ই প্রচলিত দেখা যায়।

পোয়াতির দুগ্ধ ক্রমাগত না পাইলে শিশু চিররুগ্ন হওয়া সম্ভব। ইহার সদুপায় বোধ হয় গৃহিণী মাত্রেই অবগত আছেন। গোটা কতক ভেরেণ্ডার পাতা, জলে খুব সিদ্ধ করিবে। হাঁড়ি নামাইয়া ঐ জল সামান্য গরম থাকিতে থাকিতে, উহা দ্বারা স্তন বিলক্ষণ উত্তমরূপ ধৌত করিবে। পরে পাতাগুলি বাহির করিয়া, জলশূন্য অথচ উষ্ণাবস্থায় (সহ্য হয় এরূপে) স্তন দ্বয় বেষ্টিত করিয়া বাঁধিয়া রাখিবে। এই প্রক্রিয়াই দুগ্ধাগম হইয়া থাকে।

প্রসূতির জানা উচিত যে, স্তন দুগ্ধই হউক বা অপর দুগ্ধই হউক, পরিমাণাধিক্য হইলে, শিশু অজীর্ণ রোগাক্রান্ত হইয়া থাকে। নিয়মিত পানে শিশুর গলা শুখাইয়া যায় না।

কোন কারণে জননীর শারীরিক বা মানসিক অসুস্থতা বা অবসাদ ঘটিলে, সে সময়ে শিশুকে স্তন পান করাইবে না।

বালকের গাত্রে হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগাইতে দিবে না। শিশু যে পরিমাণে গরম সহ্য করিতে পারে, তাহার চতুর্থাংশ শীতও অসহনীয়। গ্রীষ্মকালে গরম কাপড় গাত্রে জড়াইবে না। শীত এবং বর্ষায়, তদ্বিপরীত।

রাত্রিকালে মশারীর নিম্নদেশ উত্তমরূপ গুঁজিয়া দিবে। মশা, আরসুলা, মাকড়সা প্রভৃতি যেন একবারেই প্রবেশ করিতে না পারে।

বিছানা [illegible] বদলাইবে এবং জলে কাচিয়া রৌদ্রে উত্তমরূপে শুখাইয়া লইবে। কোনরূপ দুর্গন্ধ না থাকে।

শিশু বিছানায় প্রস্রাব করিলে, তৎক্ষণাৎ ঐ শয্যা দূরে নিক্ষেপ করিয়া, অপর কোমল শয্যা রচনা করিয়া দিবে।

শয়নকক্ষে রেড়ী, সরিষা, বা নারিকেল তৈলের সুরক্ষিত দীপ সমস্ত রাত্রি প্রজ্বলিত থাকিবে। মোমের অথবা চর্ব্বির বাতিও প্রশস্ত; কিন্তু উহা ব্যয়সাপেক্ষ। কোন রূপ অঙ্গারের আগুন একেবারেই রাখিবে না। ইহা অতীব বিঘ্নজনক।

শিশুর বয়োধিক্যের সঙ্গে সঙ্গে জননীর কার্য্য বাড়িতে থাকে। চারি দিকে চক্ষু রাখিতে হয়। হামাগুড়ি দিয়া কোথায়

গেল। ছাই, মাটি প্রভৃতি কি মুখে পুরিল; এইটি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হয়।

ক্রমে ছেলে "দামাল" হইলে, মাতার সর্ব্বদাই ভয়ে বুক দুর্দুর্ করে। সেই সময়ে ছেলের পেট একটু নরম হইয়া থাকে। ইহাতে চিন্তার বিষয় বিশেষ কিছু নাই। তবে দুধের সঙ্গে একটু চুণের জল মিশাইয়া খাওয়াইলে ভাল হয়। ফল কথা, মাতা জীবিতাবস্থায় সন্তান সম্বন্ধে কখনই নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না।

এই সময় হইতে ক্রমে স্তনপানের ভাগ কমান উচিত। সন্তানকে আদর দিয়া বেশী বয়স পর্য্যন্ত ক্রমাগত স্তন পান করিতে দেওয়া উচিত নয়। অন্নপ্রাশন কালে প্রায়ই দাঁত উঠিতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক অসুস্থতা প্রায়ই উপস্থিত হয়। একজন্য বিশেষ সতর্কতা আবশ্যক। উপযুক্ত ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ, এবং তাঁহার উপদেশানুসারে চলা উচিত।

সন্তান এক বৎসর বয়স পর্য্যন্ত এক এক বার স্তন পান করিতে পারে। সেই সময় এক রহস্যোদ্দীপক কাণ্ড প্রায়ই ঘটিয়া থাকে—বালক তাহার "কুরকুরে" দাঁতে স্তন কামড়াইয়া ধরে, আর জননীর উহুঃ উহুঃ করিয়া না হাসি না কান্না!

উপসংহারে এই মাত্র উল্লেখ করা উচিত যে, যিনি যতই স্পর্দ্ধা করুন না কেন, গৃহস্বামিনী সুশিক্ষিতা না হইলে, কিছুতেই মঙ্গল নাই। আর যেখানে কর্ত্রীঠাকুরাণী সদ্বিবেচক, সে গৃহে শান্তি এবং স্বাস্থ্য বিরাজমান।

লীলাবতী দাস।

বিবাহসম্বন্ধে কয়েকটি প্রশ্ন

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

প্রাচীন হিন্দুসমাজে যতই উদারতা থাকুক, বেশ্যা-বিবাহ সমাজে যে চলিত তাহার প্রমাণ আমরা পাই নাই। পুরাণ শাস্ত্রে কোন কোন রাজার সহিত স্বর্বেশ্যা-দিগের প্রণয়-কাহিনী এবং তাদৃশ প্রণয় ফলে প্রসিদ্ধ চন্দ্রবংশের উৎপত্তি কথিত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাতে আমাদের প্রশ্নের কোনরূপ সমাধান হয় না। সংস্কৃত কাব্য-কথাদি গ্রন্থে রাজবাটীতে, দেবালয়ে এবং সম্ভ্রান্তব্যক্তিদিগের অন্তঃপুরে গণিকা কুলের খুব আধিপত্য লক্ষিত হয় সন্দেহ নাই, (১) কিন্তু য়ুরোপের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি-দিগের মধ্যে কেহ কেহ যেমন থিয়েটারের অভিনেত্রী বিবাহ করিয়া সংসার করিতেছেন, তদ্রূপ প্রথা যে ভারতে প্রচলিত ছিল, তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না। একমাত্র "মৃচ্ছকটিক" নামক প্রকরণে গণিকার বিবাহ বা বধূত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ গ্রন্থের নায়িকা বসন্তসেনা উজ্জয়িনী নগরের অতি সমৃদ্ধিশালিনী এবং নানা বিদ্যা ও কলার অধিকারিণী গণিকা। মৃচ্ছকটিকে মৈত্রেয়ের মুখে তাঁহার বাসভবনের যেরূপ পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে তিনি যে অসাধারণ ধনশালিনী ও অতিশয় মার্জ্জিত-রুচিসম্পন্না ছিলেন, তাহা সহজেই বুঝিতে

(১) কাদম্বরী, মালতীমাধব, মেঘদূত প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

পাওয়া যায়। গ্রন্থের নায়ক চারুদত্ত এক জন সম্ভ্রান্ত কুলজাত স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ; গ্রন্থশেষে দেখিতে পাওয়া যায় বসন্তসেনা চারুদত্তের বধূ হইয়াছেন। বসন্তসেনার ক্রীতদাসী মদনিকা, তিনিও গণিকা অথচ চতুর্ব্বেদবিদ্ রাজনীতি এবং অর্থনীতি পারদর্শী পণ্ডিত ব্রাহ্মণ শর্ব্বিলক সেই মদনিকাকে নিজ গৃহের গৃহিণী করিয়াছেন। কবি তাঁহার রচিত গ্রন্থে দুই ব্রাহ্মণ যুবকের সহিত দুইটী গণিকার বিবাহ দিয়াছেন। পাঠক ভাবিবেন না যে বসন্তসেনা বা মদনিকা অর্থ বা তদ্রূপ কোন কারণে স্ব স্ব প্রিয়জনের "আশ্রয়" গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা প্রকৃত পক্ষে পত্নীর সম্মান এবং অধিকার লাভ করিয়াছেন। মৃচ্ছকটিকের চতুর্থ অঙ্কে বসন্তসেনা যখন নিজ ক্রীতদাসী মদনিকাকে শর্ব্বিলকের হস্তে অর্পণ করিতেছেন, তথাকার দৃশ্য পাঠক একবার দেখুন :—

বসন্তসেনা—হঞ্জে মদণিএ সুদিট্ঠং মং করেহি। জিন্নাসি। আরুহ পবহণম সুমরেসি মম্। (ক)

মদনিকা—(রুদতী) পরিচ্চত্তম্হি অজ্জআএ (খ) (ইতি পাদয়োঃ পতিত।)

বসন্তসেনা—সংপদং তুমং জ্জেব বন্দণীআ সংবুত্তা। তা গচ্ছ। আরুহ পবহণম্। সুমরেসি মম্। (গ)

শর্ব্বিলক :—স্বস্তি ভবত্যৈ। মদনিকে,

সুদৃষ্টঃ ক্রিয়াতামেষ শিরসা বন্দ্যতাং জনঃ।
যত্র তে দুর্লভং প্রাপ্তং বধূশব্দাব গুণ্ঠনম্ ॥ ২৪ ॥

(ক) চেটি মদনিকে, সুদৃষ্টাং মাং কুরু। যতাসি। আরোহ প্রবহণম। স্মরসি মাম্।

(খ) পরিত্যক্তাস্ম্যার্য্যয়া।

(গ) সাম্প্রতং ত্বমেব বন্দনীয়া সংবৃত্তা। তদ্‌গচ্ছ। আরোহ প্রবহণম। স্মরসি মাম্।

যে বসন্তসেনা এক মুহূর্ত্তপূর্ব্বে মদনিকার সর্ব্বময় প্রভু ছিলেন, এখন সেই বসন্তসেনা সেই মদনিকাকে বলিতেছেন,—

"সংপদং তুমং জ্জেব বন্দণীআ সংবুত্তা।"

অর্থাৎ মদনিকা সম্প্রতি পূজ্যপাদ শর্ব্বিলক শর্ম্মার গৃহিণী হইয়াছেন, বসন্তসেনা অতুল সম্পদের অধিকারিণী হইলেও তিনি তখন গণিকা মাত্র ;—সুতরাং মদনিকা বসন্তসেনার বন্দনীয়া হইয়াছেন। এই কথোপকথন হইতেই কবির উদ্দেশ্য স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে, তিনি মদনিকাকে শর্ব্বিলকের প্রকৃত স্ত্রী বলিয়া স্বীকার করিতেছেন।

এই গ্রন্থের দশম বা চরম অঙ্কে বসন্তসেনাও চারুদত্তের গৃহিণী-পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। শর্ব্বিলক সে সময় নূতন রাজার প্রধান সচিব, তিনি বসন্তসেনাকে বলিতেছেন,—

"আর্য্যে বসন্তসেনে, পরিতুষ্টো রাজা ভবতী. বধূশব্দেনানুগৃহ্লাতি।"

বসন্তসেনা পরমপরিতুষ্ট হইয়া বলিতেছেন,

"অজ্জ, কদত্থম্হি।" (আর্য্য কৃতার্থাস্মি।)

তাহার পর শর্ব্বিলক বসন্তসেনার মস্তকে অবগুণ্ঠন নিক্ষেপ।

এই দুইটি গণিকার বধূত্ব প্রাপ্তির বিবরণ মৃচ্ছকটিক প্রকরণে প্রদত্ত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে অনেকগুলি কথা ভাবিবার আছে। প্রথমতঃ এই দৃশ্যকাব্যের কবি কে? দ্বিতীয়তঃ ইহা কোন্ সময়ের রচনা এবং তৃতীয়তঃ এই গণিকা-বিবাহ প্রকৃত কি কবিকল্পনা?

পুস্তকেই দেখিতে পাই এই কবি—

দ্বিরদেন্দ্রগতিশ্চকোরনেত্রঃ
পরিপূর্ণেন্দুমুখঃ সুবিগ্রহশ্চ।
দ্বিজমুখ্যতমঃ কবি র্বভূব
প্রথিত শূদ্রক ইত্যগাধসত্ত্বঃ ॥ ৩ ॥

অপিচ,—ঋগ্বেদং সামবেদং গণিতমথকলাং

বৈশিকীং হস্তিশিক্ষাং জ্ঞাত্বা শর্বপ্রসাদাদ্ব্যপগততিমিরে চক্ষুষী চোপলভ্য।

রাজানং বীক্ষ্য পুত্রং পরমসমুদয়েনাশ্বমেধেন চেষ্ট্বা লব্ধা চায়ুঃ শতাব্দং দশদিনসহিতং শূদ্রকোঽগ্নিং প্রবিষ্টঃ॥ ৪ ॥

অপিচ,—সমরব্যসনী প্রমাদশূন্যঃ

ককুদং বেদবিদাং তপোধনশ্চ।

পরবারণবাহুযুদ্ধলুব্ধঃ

ক্ষিতিপালঃ কিল শূদ্রকো বভূব॥৫॥

উল্লিখিত শ্লোকাবলী হইতে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, কবি শূদ্রক অশেষ বিদ্যাজ্ঞানসম্পন্ন, কলানিপুণ, ধর্মকর্মকারী হিন্দু নরপতি ছিলেন। দুঃখের বিষয়, আমাদিগের প্রাচীন ইতিহাস নাই, সুতরাং এই রাজকবি কোন্ সময়ে ভারতের কোন্ প্রদেশকে অলংকৃত করিয়াছিলেন তাহা জানিবার উপায় নাই। "কাদম্বরীর" গ্রন্থকার মহাকবি বাণভট্ট তাঁহার কথা এবং কাদম্বরীর কথামুখ অথবা ভূমিকাতে বিদিশাধিপতি সর্ব্বগুণসম্পন্ন শূদ্রক নামক নৃপতির উল্লেখ করিয়াছেন। বাণভট্ট খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, তাহা নানা ঐতিহাসিক প্রমাণে স্থিরীকৃত হইয়াছে। তিনি যেরূপ ভাবে রাজা শূদ্রকের গল্প বলিয়াছেন, তাহাতে স্পষ্টই বোধ হয় যে, শূদ্রক বাণভট্টের বহুশতাব্দী পূর্ব্বে বিদিশা নগরীতে বর্ত্তমান ছিলেন। কেহ কেহ বলেন শূদ্রক অন্ধ্রবংশীয় নৃপতিদিগের আদিপুরুষ। মৃচ্ছকটিকের কবি যিনিই হউন না, তিনি যে অতি প্রাচীন কালের কবি ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। গ্রন্থের আভ্যন্তরীণ প্রমাণ হইতে অবগত হওয়া যায় যে, সেই সময়ে বৌদ্ধধর্ম এবং হিন্দুধর্ম তুল্যরূপে সমাজে প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছে। মহামহোপাধ্যায় উইলসন্‌প্রমুখ পাশ্চাত্য সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদিগের মতে মৃচ্ছকটিক বহু পুরাতন গ্রন্থ, এমন কি ইহাকে নাট্যসাহিত্যের আদি পুস্তক বলিতেও অনেকে প্রস্তুত আছেন। ফলতঃ এই দৃশ্যকাব্যে যেরূপ দক্ষতার ও দূরদর্শিতার সহিত সামাজিক এবং রাজনৈতিক বিবিধ বিষয় অতি সুচারুরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাতে কবির অগাধ পাণ্ডিত্য, ধর্মশাস্ত্রজ্ঞান, এবং অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। এরূপ একজন মহাকবি নিজ উৎকৃষ্ট দৃশ্যকাব্যে একটী সমাজবহির্ভূত, শাস্ত্রনিন্দিত এবং লোকব্যবহারের বিরোধী বিষয়ের অবতারণা করিয়া দর্শক সম্প্রদায়ের বিরক্তি উৎপাদন করিবেন, তাহা কিছুতেই বিশ্বাস করা যায় না। সাহিত্যদর্পণে উক্ত হইয়াছে:—

"যৎস্যাদনুচিতং বস্তু নায়কস্য রসস্য বা।
বিরুদ্ধং তৎপরিত্যাজ্যমন্যথা বা

প্রকল্পয়েৎ॥৬৫০॥

অনুচিতমিতিবৃত্তং যথা—রামস্য ছদ্মনা বালিবধঃ। তচ্চোদাত্ত রাঘবেনোক্তমেব। বীরচরিতে তু বালী রামবধার্থমাগতো রামেণ হত ইত্যন্যথা কৃতঃ।"

দেখুন, রস বা নায়কের অনুচিত বিষয় ইতিবৃত্তমূলক হইলেও দৃশ্য কাব্যের কবি তাহা দেখাইবেন না; হয় একেবারে পরিত্যাগ করিবেন, নচেৎ আবশ্যকমত পরিবর্ত্তন করিয়া লইবেন। রামায়ণে রামকর্তৃক বালিবধ বৃত্তান্তটী রামচরিত্রের একটী বিশেষ কলঙ্কস্বরূপ। তজ্জন্য উদাত্ত রাঘব এবং বীরচরিতের কবি ঐ বৃত্তান্ত গ্রহণ করেন নাই। উদাত্ত রাঘবের কবি ঐ ঘটনা একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং বীরচরিতের কবি ঐ বৃত্তান্তটী এমন ভাবে দেখাইয়াছেন যাহাতে রামের চরিত্রে কলঙ্কস্পর্শ করিতে না পারে। রামায়ণে ভরতজননী কৈকেয়ীদেবীর চরিত্র উদাহরণস্বরূপ ক্ষত্রিয়-বীরকন্যা অথবা বীরপত্নীর উপযুক্ত

ভাবে অঙ্কিত হয় নাই কিন্তু তাঁহার ঐ প্রকার চরিত্রই ঐতিহাসিক রূপে সচরাচর গৃহীত হইয়া থাকে। বীরচরিতের কবি (মহাকবি ভবভূতি) কিন্তু কৈকেয়ীর চরিত্র ঐরূপ গর্হিত ভাবে অঙ্কিত করেন নাই। তিনি রামের বনবাস ঘটনাকে কৈকেয়ীর পাপপ্রবৃত্তির ফলরূপে চিত্রিত না করিয়া উহা রাবণ, মাল্যবান এবং সূর্পনখা এই ব্যক্তি ত্রিতয়ের গভীর কৌশলপূর্ণ বিষম ষড়যন্ত্রের ফলরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন এবং তাহাতে কৈকেয়ীর চরিত্র রক্ষা পাইয়াছে। নাট্যশাস্ত্রের এরূপ সুন্দর বিধান বর্ত্তমান থাকিতে কবি শূদ্রক (সত্য হইলেও) লোক-বিদ্বিষ্ট কোন বস্তু তাঁহার দৃশ্যকাব্যে অবতারিত করিতেন না। ইহাতে স্পষ্ট অনুমিত হয় যে বেশ্যাবিবাহ তৎকালীন হিন্দু সমাজে অপ্রচলিত অথবা নিন্দিত ছিল না।

"মৃচ্ছকটিকে" বসন্তসেনা এবং মদনিকা এই দুই গণিকার বিবাহ উক্ত হইয়াছে বলিয়া আমরা উহাকে ঐতিহাসিক প্রমাণ বলিতেছি না, তাহা পাঠক অবশ্যই বুঝিতে পারিতেছেন। সংস্কৃত "নাটক"গ্রন্থ যেরূপ ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক নায়ক নায়িকাদিগের চরিত্র অবলম্বনে লিখিত হয়, "প্রকরণ" সেরূপ নহে। কবি নিজ ইচ্ছানুমত লৌকিক বা সামাজিক কোন বৃত্তান্ত অবলম্বন করিয়া প্রকরণ লিখিতে পারেন। সাহিত্যদর্পণকার বলিয়াছেন,—

"ভবেৎ প্রকরণে বৃত্তং লৌকিকং কবিকল্পিতম্।"

মৃচ্ছকটিক যে "প্রকরণ" তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ের "নীলদর্পণ" এবং তজ্জাতীয় দৃশ্যকাব্য "প্রকরণের" শ্রেণীভুক্ত হইতে পারে। নীলদর্পণের সমস্ত পাত্র পাত্রীদিগের ঐতিহাসিক অস্তিত্ব না থাকিলেও ঐ দৃশ্যকাব্য যেমন কবি দীনবন্ধুর যৌবন কালের বঙ্গদেশের স্থানবিশেষের সামাজিক চিত্র প্রকাশ করিতেছে,—তদ্রূপ মৃচ্ছকটিকের চারুদত্ত, শার্বিলক, বসন্তসেনা এবং মদনিকার ঐতিহাসিক অস্তিত্ব না থাকিলেও ঐ গ্রন্থ কবি শূদ্রকের সমসাময়িক সামাজিক অবস্থার চিত্র প্রকাশ করিতেছে। ভিত্তিশূন্য অলীক ঘটনা কখনও সামাজিক কাব্যের অবলম্বন হইতে পারে না—বিশেষতঃ লোকবিদ্বিষ্ট ঐরূপ ঘটনা আদৌ কোন কাব্যের বিষয় হইতে পারে না। আধুনিক সময়ের কোন কবি যদি তাঁহার রচিত দৃশ্যকাব্যে কোন ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণের সহিত কোন মেম সাহেবের (হিন্দুমতে) বিবাহ দৃশ্য প্রকটিত করেন, তাঁহার সেই কাব্য নিশ্চিতই "চাঁড়ালের হাত দিয়া পোড়ান" হইবে।*

"হিন্দুসমাজে বেশ্যাবিবাহ" সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য [illegible] সংক্ষেপে বলিলাম এবং এ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ব্যক্তিবৃন্দের মতামত জানিবার নিমিত্ত উৎসুক রহিলাম নিবেদনমিতি।

শ্রীসমাচরণ দাস।

---

*অবশ্য Civil marriage act অনুসারে এরূপ বিবাহ হইতে পারে, সুতরাং কোন দৃশ্যকাব্যে কোন ভট্টাচার্য্যের সহিত কোন মিস টমসন কি জনসনের সিভিল বিবাহের দৃশ্য দেখাইলে তাহা বর্ত্তমান সময়ের উপযোগী হইবে।

"রাজা প্রকৃতিরঞ্জনাৎ।"

(অনুবৃত্ত।)

এই প্রবন্ধের পূর্ব্ব অংশে রাজাবস্থা (লোকপালগণের রাজমূর্ত্তিতে ভূলোকে আবির্ভাব) বর্ণিত হইয়াছে; এখন সে সকল শক্তির সমুদ্রেকের মূল যে অভিষেক তাহাই আদৌ আলোচ্য, তৎপর তদুত্তরকালে কর্ত্তব্য কর্ম্মগুলি নির্দ্দেশ করা যাইবে।

অভিষেক শব্দার্থ—মন্ত্রপূত মাঙ্গলিক দ্রব সমন্বিত তীর্থ জলধারা স্নপন (স্নান করান) অভিষেকের পূর্ব্বে পিত্রাদির জীবন কালে ভাবী উত্তরাধিকারী রাজা যখন পিত্রাদির ন্যস্ত গুরু রাজভারের ভাগী হইয়া শিক্ষা পরীক্ষা (Probationary) হই তন, তখন তিনি যুবরাজ পদবাচ্য। আবার যখন তিনি মূল রাজার পূর্ণপদ পাইতেন, তখনই অভিষেকের আবশ্যকতা। অভিষেকের অন্তে সেই ব্যক্তি পরম পুরুষ ও লোকপালের পূর্ণ মূর্ত্তি [illegible] ভূমণ্ডলে দণ্ডায়মান। সেই দণ্ডধারী [illegible] নিগ্রহানুগ্রহের প্রাণ নষ্ট করিয়া আর্য শাসন উদ্বোধন করিয়াছেন :—

"যস্য প্রসাদে পদ্মাশ্রীর্বিজয়শ্চ পরাক্রমে।
মৃত্যুশ্চ বসতি ক্রোধে সর্ব্বতেজোময়োহি সঃ ॥১॥" মনুসংহিতা।

যাঁহার অনুগ্রহে বিপুলবিভব ও বিজয় লাভ ও নিগ্রহে যম-সদনে যাইতে হয়, এরূপ সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন ভূপ সকলের সেব্য। বাস্তবিকপক্ষে যে সকল গুণালঙ্কৃত হইলে রাজপদে অভিষেকের যোগ্য বলিয়া ঋষিগণ নির্ব্বাচন করিয়াছেন, তৎসমুদায় গুণের সাধারণ মনুষ্য সমাবেশ হয় না, সুতরাং ঈশ্বরত্ব থাকা চাই। নিম্নে উক্ত শাসন ও [illegible] বর্ণিত করিলে প্রতীতি হইবে যে, রাজশরীর সত্ত্ব ও রজোগুণের সমান উপাদানে গঠিত এবং যোগভোগের অবিরোধী আশ্রয়। জগতে এইরূপ যুগপৎ বিরোধী গুণদ্বয়ের (সত্ত্ব ও রজোগুণের) সমাশ্রয় রক্ষা প্রাকৃত পুরুষের কর্ম্ম নহে; তারকেশ্বর বিন্দুমাত্র অযথাপাত হইলে সর্ব্বনাশ। এই সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য রাজাদিগকে অ চ রণক্ষেত্রে নির্ব্বেদখিন্ন অর্জ্জুনের প্রতি ভগবানের গীতাশাস্ত্রের উপদেশ দান। পক্ষান্তরে রাজার রজোগুণের প্রয়োগমাত্রাধিক্য নিবারণের জন্য ধর্ম্ম ও অর্থশাস্ত্র প্রণেতা পূর্ব্বাচার্য্যগণ বারংবার সাবধান করিয়াছেন —

"ধর্ম্মেণ ব্রাহ্মণাদেশ ক্রোধ-লোভ-বিবর্জ্জিতঃ।"

মহাকবিকুলও আদর্শ রাজাকে সত্ত্বগুণ-সম্মুখে আকৃষ্ট রাখিবার জন্য আকুল। কালিদাস মহারাজ অতিথিকে আন্তরিক ষট্শত্রুজেতা ঋষির আসনে বসাইয়া ছাড়িয়াছেন।

যথা—

"অনিত্যাঃ শত্রবো বাহ্যা বিপ্রকৃষ্টাশ্চ তেষতঃ
অতঃ সোহভ্যন্তরান্ নিত্যান্ ষট্পূর্ব্বমজয়দ্ রিপূন্ ॥"

যাহা হউক, যেরূপ গুণসম্পন্ন ব্যক্তি রাজ্যে অভিষেকের যোগ্য, শাস্ত্রকারগণের সেই বিধান দেখিলে সমস্তই প্রতীত হইবে।

যথা যাজ্ঞবল্ক্য—

"মহোৎসাহঃ স্থূললক্ষঃ, কৃতজ্ঞো বৃদ্ধসেবকঃ।
বিনীতঃ সত্ত্বসম্পন্নঃ কুলীনঃ সত্যবাক্ শুচিঃ

[illegible]

অদীর্ঘসূত্রঃ স্মৃতিমান্ অক্ষুদ্রোহপরুষস্তথা।
ধার্ম্মিকোহব্যসনশ্চৈব প্রাজ্ঞঃ শূরো রহ-

[illegible]

[illegible]

বিনীতমুর্ব্বার্তায়াং, এবাপ্রৈৈ নয়াধিপঃ ॥৩॥"
"নয়াধিপোরাজ্যাভিষিক্তঃ স্যাদিতি সর্ব্বত্র সম্বন্ধঃ ইতি মিতাক্ষরা।

সারার্থঃ—

অভিশয় অধ্যবসায়সম্পন্ন, বহু অর্থদানশীল, কৃত উপকার ও অপকারের ধারণাবিশিষ্ট, জ্ঞানগুণাদিবৃদ্ধের পরিচারক, সুশিক্ষা-শিষ্টাচারসম্পন্ন, সত্ত্বগুণসুগত বিভ্রমবিকারাদিবিবর্জ্জিত, বিশুদ্ধ মাতৃ পিতৃকুলজাত, সত্যবাদী, বাহ্যাভ্যন্তর-শৌচশালী, কর্ত্তব্য কর্ম্মের ক্ষিপ্রবুদ্ধাতা, জ্ঞাতিবিষয়ের সর্ব্বদা স্মরণশীল, দুর্জ্জন:দ্বেষী, পর দোষাকীর্ত্তনশীল, (সংবৃতবাক্) মৃগয়া মদ্যাদিতে অনাসক্ত, ধর্ম্মপরায়ণ, প্রাজ্ঞ (গম্ভীরতত্ত্বের বিচারশক্তিসম্পন্ন), নির্ভিক, গোপনীয়-বিষয়-রক্ষণপটু, স্বীয় সপ্তাঙ্গ রাজ্যের দোষ প্রচ্ছাদনে নিপুণ, অন্যায়বিদ্য রাজনীতিশাস্ত্র, কৃষি-বাণিজ্য পশুপালনবিদ্যা ও বেদত্রয়ে সুশিক্ষিত ব্যক্তি রাজ্যে অভিষিক্ত হইবার উপযুক্ত।

উক্ত রূপ আর্ষ বিধানে অবধান করিলে, ভারতের ঈশ্বর ভগবানের অবতার ব্যতীত আর কিছুই নহে, ইহাই প্রতীতি হইবে। ভারতের কেন, যে কোন সভ্য ভূমির ভূপ কেবল ভোগ শরীর নহে, যে গ-জীবন বটে, তিনি প্রজাপুঞ্জের ভক্তিরই পরমপাত্র, শক্তি প্রয়োগ সেখানে অকিঞ্চিৎকর বা উপলক্ষ্য মাত্র। যুবরাজ-কালে উক্ত রূপ সমস্ত গুণের পরীক্ষা পদে পদে হইত। তাহাতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া যিনি অভিষেকের পর রাজ্য পালন করিতেন, তদীয় রাজ্য অবিনশ্বর। এই সমস্ত গুণালঙ্কৃত কুমার বিনীত শব্দে পরিভাষিত হইতেন। এই বিনয়বলে প্রলয় পর্য্যন্ত রাজ্য রক্ষা হয়, তাহার অপচারে যাহা হয়, তাহা মহাত্মা মনুই বলিতেছেন :—

"তেভ্যোঽধিগচ্ছেদ্বিনয়ং, বিনীতাত্মাহি নিত্যশঃ।
বিনীতাত্মাহি নৃপতির্নবিনশ্যতি কর্হিচিৎ ॥১॥
বহবোঽবিনয়ান্নষ্টা, রাজানঃ সপরিচ্ছদাঃ।
বনস্থা অপি রাজ্যানি, বিনয়াৎ প্রতিপেদিরে ॥২॥
বেণো বিনষ্টোঽবিনয়াৎ নহুষশ্চৈব পার্থিবঃ।
সুদাঃ সবনশ্চৈব, সুমুখো নিমিরেব চ ॥৩॥
পৃথুস্তু বিনয়াদ্রাজ্যং, প্রাপ্তবান্ মনুরেব চ।"

সারার্থ—বিনীত রাজার রাজ্য চিরস্থায়ী, বিনয়-বিবর্জ্জিত ব্যক্তি রাজপদে অভিষিক্ত হইলেও বহুদিন ভোগ করিতে পারেন না, প্রত্যুত বনবাসী বিনয়ান্বিত ব্যক্তিও রাজ্যলাভ করিয়া থাকেন। অবিনয়াচরণে বেণ, নহুষ ও সুদাস প্রভৃতি লব্ধ রাজ্য হইতে বঞ্চিত হইলেন। অধিক দূরে যাইবার প্রয়োজন নাই—"দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা" এই শ্লোক যে মহাত্মার প্রতি প্রযুক্ত হইয়াছিল, তাঁহার অধস্তন বংশধরগণের বিনয়বৈধুর্য্যে যাহা হইল, অতীতসাক্ষী ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিদান করিলে তাহা জানা যাইবে। মনু-যাজ্ঞবল্ক্যের দোহাই দিয়া বেণ নহুষগণকে বিস্তীর্ণ ভাবে উদাহরণে আকর্ষণ নিষ্প্রয়োজন।

লোক-চরিত্র-চিত্র প্রণেতা মহাকবিগণ শাস্ত্রীয় বিধানের প্রতি পদে পদে প্রণিধান করত অভিষেক বেদীতে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বিনীত কুমারকে খাড়া করিয়াছেন। রাজারাজকস দুর্য্যোধনও সসাগরাধরার অধীশ্বর হইয়া বনেচর-বদনে সুযোধন ("সুযোধন") হইয়া বসিলেন। রাজলক্ষ্মী রক্ষা করিতে গেলে সুযোগ ব্যতীত দুর্যোগ কখনই হয় না। যাহা হউক, এখন অভিষেকের দিকে দৃষ্টিপাত আবশ্যক। অভিষেক-সলিল তীর্থাদি হইতে সংগৃহীত

হইত। মহারাজ রাম প্রভৃতি সেই সলিল-স্নাত হইয়া অভিষিক্ত সম্রাট্য ধারণ করিতেন। সেই বিনয়-বিভূষিত রাজকুমার অতিথি যখন লোকপাল-মূর্ত্তিতে অভিষেক-বেদীতে গেলেন, তখন কাব্যকানন-কোকিল কালিদাস গাহিলেন —

"তেতাঁক কলয়াবাসুরভিষেকং দ্বিজাতিভিঃ।
বিমানং নব মুদ্বেদি, চতুঃ স্তম্ভ প্রতিষ্ঠিতম্ ॥১।
তত্রৈনং হেমকুম্ভেষু, সম্ভৃতৈ স্তীর্থবারিভিঃ।
উপতস্থুঃ প্রকৃতয়ো, ভদ্রপীঠোপবেশিতম্ ॥২।
নদদ্ভি স্নিগ্ধ গম্ভীরং, তূর্য্যৈরাহতপুষ্করৈঃ।
অন্বমীয়ত কল্যাণং, তস্যাবিচ্ছিন্ন সন্ততি ॥৩।
দূর্ব্বা যবাঙ্কুর প্লক্ষ ত্বগভিন্ন পুটোত্তরান্।
জ্ঞাতিবৃদ্ধৈঃ প্রযুক্তান্ স ভেজে নীরাজনাবিধিম্ ॥৪।
পুরোহিতপুরোগাস্তং, জিষ্ণুং জৈত্রৈরথর্ব্বভিঃ।
উপচক্রমিরে পূর্ব্বমভিষেক্তুং দ্বিজাতয়ঃ ॥৫।
তস্যৌঘমহতী মূর্দ্ধ্নি, নিপতন্তী ব্যরাজত।
সশব্দমভিষেক শ্রীঃ, গঙ্গেবত্রিপুরদ্বিষঃ ॥৬।
স্তূয়মানঃ ক্ষণেতস্মিন্ [illegible] সবন্দিভিঃ।
প্রবৃদ্ধ ইব পর্য্যন্যোঃ, সারঙ্গৈ [illegible]ন্দিতঃ ॥৭।"

সারার্থঃ—মন্ত্রিগণ ভদ্রপীঠ নামক সিংহাসন বিশেষে রাজকুমার অতিথিকে বসাইয়া স্বর্ণকলসরক্ষিত তীর্থসলিল দ্বারা সৎকার করিতে লাগিলেন। তখন বাদ্যযন্ত্র সমূহ মধুর গম্ভীর নিনাদ উদ্গার করতঃ এ প্রকারে বাজিতে লাগিল যে, তদ্দ্বারা তাঁহার চিরস্থায়ী মঙ্গল-পরম্পরাসূচিত হইল। তৎপরে বৃদ্ধ জ্ঞাতিগণ দূর্ব্বা-যবাঙ্কুরাদিদ্বারা নীরাজনা (আরতি) করিলে পুরোহিত প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ জয়সূচক অথর্ব্ববেদীয় মন্ত্র সমূহ দ্বারা প্রথমত অভিষেক আরম্ভ করিলেন। সেই অভিষেক বারিধারা রাজা অতিথির মস্তকে নাস্ত হইয়া গঙ্গাধরের জটাজুট [illegible] বারিধারার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। জলদাগমে পর্ব্বতে যেমন চাতককুলের নিনাদ দ্বারা সৎকৃত হয়, তদ্রূপ তিনি বন্দিগীতি দ্বারা অভিনন্দিত হইয়াছিলেন।

এইরূপ মন্ত্রাভিষেক-অন্তে বৃষ্টিসিক্ত বিদ্যুৎ বহ্নির ন্যায় তাঁহার তেজঃ আরও বাড়িয়া গেল।

সতঃবস্ত্রপূতাভিঃ স্নানশুদ্ধিঃ প্রতীষ্টতঃ।
যয়ৌ বৈদ্যুতবহ্নেঃ, বৃষ্টিসেকাদিব দ্যুতিঃ ॥১।

এইরূপ অভিষেক-সংস্কৃত রাজার শরীরে ঐশশক্তি আরও অধিষ্ঠান করিল। অভিষিক্ত মহীপতির উত্তর কালে যাহা কর্ত্তব্য, মহাকবি তাহার দৃষ্টান্তকে দণ্ডায়মান করিয়াছেন্ :—

'স তাবদভিষেকান্তে স্নাতকেভ্যো দদৌ-বসু।
যাবতৈষাং সমাপ্যেরন্ যজ্ঞাঃ পর্য্যাপ্ত দক্ষিণাঃ ॥১।

অতিথি বিদ্যোৎসাহের জন্য স্নাতকগণকে ধনদান করিলেন, তদ্দ্বারা তাঁহাদিগের ভূরি দক্ষিণাসমন্বিত যজ্ঞ সমূহ সম্পাদিত হইয়াছিল। তাহার পর,—

বন্ধচ্ছেদং সবন্ধানাং বধার্হাণামবধ্যতাম্।
ধুর্য্যানাঞ্চধুরোমোক্ষ মদোহঞ্চাদিশদ্গবাম্ ॥১।
"ক্রীড়া-পতত্রিণোপ্যস্য, পঞ্জরস্থাঃ শুকাদয়ঃ।
লব্ধমোক্ষস্তদাদেশাদ্ যথেষ্ট গতয়োঽভবন্ ॥২॥

কারাবাসীদিগকে মুক্তি, বধদণ্ডাদেশপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গের প্রতি অবধাদেশ, শকটবাহক গবাদির ভার বিমোচন ও গাভীগণের অদোহন বিধান করিয়াছিলেন। তদীয় ধাম-নিলয়ে বিহগকুল তাঁহার আদেশে পিঞ্জরমুক্ত হইয়া স্বেচ্ছাহার-বিহারে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। যাহারা ভাগ্যবিপাকে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ভোগ হইতে বঞ্চিত হইয়াছিল, রাজাধিরাজ সর্ব্বভিগম্যাধীন তাহারা [illegible]

সর্ব্বত্র রাজ্যলাভকালে তাঁহাদিগকে প্রতিনিধি স্বকীয়তায় পৌঁছাইয়া দিলেন।

তাহার পর—

"ততঃ কক্ষান্তরন্যস্তং গজদন্তাসনং শুচি।
সোত্তরচ্ছদমধ্যাস্ত, নেপথ্যগ্রহণায় সঃ ॥১॥
"তং ধূপাশ্যানকেশান্তং, তোয়নির্ণিক্তপাণয়ঃ।
আকল্পসাধনৈস্তৈস্তৈরুপসেদুঃ প্রসাধকাঃ ॥২॥
"তেহস্য মুক্তাগুণোন্নদ্ধং, মৌলিমন্তর্গতস্রজম্।
প্রত্যূপুঃ পদ্মরাগেণ, প্রভামণ্ডলশোভিনা ॥৩॥
"চন্দনেনাঙ্গরাগঞ্চ, মৃগনাভিসুগন্ধিনা।
সমাপয্য ততশ্চক্রুঃ, পত্রং বিন্যস্তরোচনম্ ॥৪॥
"আমুক্তাভরণঃ স্রগ্বী, হংসচিহ্নদুকূলবান্।
আসীদতিশয়প্রেক্ষ্যঃ, স রাজ্যশ্রীবধূবরঃ ॥৫॥
"সরাজককুদব্যগ্র, পাণিভিঃ পার্শ্ববর্ত্তিভিঃ।
যযাবুদীরিতালোকঃ সুধর্ম্মানবমাং সভাম্ ॥৬॥
"বিতানসহিতং তত্র, ভেজে পৈতৃকমাসনম্।
চূড়ামণিভিরুদ্ঘৃষ্ট, পাদপীঠং মহীক্ষিতাম্ ॥৭॥"

অত্র কথার মহারাজ অতিথি আস্তরণ সুসজ্জিত বিশদ গজদন্ত-নির্ম্মিত আসনে উপবিষ্ট হইলে বেশবিন্যাস-পরিচারকগণ তাঁহার কেশকলাপ ধূপসন্তাপদ্বারা বিশোধিত করিয়া, বেশভূষাদিদ্বারা সর্ব্বাঙ্গ অলঙ্কৃত করিয়া, তদীয় মস্তকে মুক্তাগুণের দ্বারা বাঁধিয়া প্রভাপুঞ্জ-সুশোভিত পদ্মরাগ মণি ও মাল্যসমন্বিত মুকুট পরাইয়া দিল। তাহার পর তদীয় সর্ব্বাঙ্গে বেশবিধায়ক ভৃত্যেরা কস্তূরী চন্দনাদি লেপন করিয়া গোরোচনা-দিয়া পত্রাবলী রচনা করিয়া দিয়াছিল। তখন সেই অনুপম বেশভূষিত মহারাজ নববধূরূপিণী রাজলক্ষ্মীর নবীন বরের ন্যায় দর্শকগণের নিরতিশয় দর্শনীয় হইলেন।

এই ত গেল অভিষেকের পর বেশ-বিন্যাসাদির ব্যাপার। এইরূপে বরযাত্রের কথা। ছত্র-চামরধারী পার্শ্বচরগণ তাঁহাকে ইন্দ্রসভাপ্রতিস্পর্দ্ধিনী রাজসভায় উপস্থাপিত করিলে তিনি চন্দ্রাতপমণ্ডিত পৈতৃক সিংহাসনে যাইয়া বসিলে সামন্তরাজগণ স্ব স্ব মস্তক ন্যস্ত মণি পাদপীঠে সংযোজিত করিয়া অভিবাদন করিতে লাগিলেন। অনুজীবিবর্গ তাঁহার—

"প্রসন্নমুখরাগং তং স্মিতপূর্ব্বাভিভাষিণম্।
মূর্ত্তিমন্তমমন্যন্ত বিশ্বাসমনুজীবিনঃ ॥১॥"

প্রসন্নমুখমণ্ডলে ঈষদ্ হাস্যপূর্ব্বক আলাপ ব্যবহারে বিশ্বাসের অবতার বোধে গলিয়া গেল। তাঁহার মস্তক-স্তম্ভ রাজছত্রের বিমল সাবণ্যে তদীয় পিতৃ-বিয়োগ-জনিত তাপ প্রকৃতিপুঞ্জের অন্তর হইতে অন্তর্হিত হইল। ইহাকেই সৌরাজ্য বলে। রাজকুমার পরম্পরা এরূপ প্রকৃতিপ্রিয় হওয়া চাই যে, তদীয় গুণগৌরবে পূর্ব্বপূর্ব্ব পিতৃপুরুষ-দিগকে লোকে ভুলিয়া যায়, এজন্য সম্রাট্ অতিথির সুশাসন ও সদাচরণে তদীয় জনক মহারাজ কুশের সময়ে সুখ সমৃদ্ধিতে বর্দ্ধিত প্রজাগণ শ্রাবণ-মাসীয় স্রোতস্বতীর স্ফূর্ত্তির ভাদ্রমাসে [illegible] উদ্রেকের ন্যায় আরও বাড়িয়াছিল। যাঁহার সুশাসনে প্রকৃতিপুঞ্জ দিন দিন ধনে ধান্যে জনে প্রাণে না বাড়ে, তাঁহার সৌরাজ্য কোথায়?

"প্রজাস্তদ্‌গুরুণা নদ্যো, নভসেব বিবর্দ্ধিতাঃ।
তস্মিংস্তু ভূয়সীং বৃদ্ধিং, নভস্যেতাঃ সমায়যুঃ ॥১

রাজার অভিষেকোত্তরকালে গজারোহণে পুরপ্রদক্ষিণ করিতে হয় এবং ভৃত্যগণকে পারিতোষিক দিতে হয়; রাজাধিরাজ অতিথি তাহাই করিয়াছিলেন। ক্রমমাণশ্চ-কারদ্যাং নাগেনৈরাবতৌজসা ॥ সুবোধ-পাকাদি ভূতৈর্ভৃত্যান্ বদ্ধাপমাকটৈঃ ॥ সম্রাট অতিথির ব্যক্তিগত চরিত্রের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন ঃ—

"বয়ুধাত সত্যরিখ্যা, মহমৌর অহার তৎ।

উদ্ধৃতঃ শত্রুন্ উদ্ধৃত্য প্রতিরোপয়ন্।।

তিনি যাহা বলিতেন তাহা মিথ্যা হইত না, যাহা দিতেন, তাহা হরণ করিতেন না; কিন্তু উন্মূলিত শত্রুকে পুনঃস্থাপন করিয়া কখন কখন প্রতিজ্ঞা করিতেন। ইহাকে বলে ক্ষমা নিষ্ঠা, যোগর্ষির অপেক্ষা রাজর্ষির ক্ষমা সর্ব্বদা কাম্যনীয়; কারণ রাজকুলে পদে পদে অপরাধী হইতে হয়; ক্ষমা না করিলে প্রজা বাঁচিবে কেমনে? ক্ষমতাস্থলেই ক্ষমা।"

"একৈকমপ্যনর্থায় কিমু যত্র চতুষ্টয়ম্।
তানি তস্মিন্ সমস্তানি নতসোৎ সিষিবে

মনঃ ॥১।"

যৌবন, আধিপত্য ও ঐশ্বর্য্যের উগ্রতা সুরাজা অতিথির দরবারে অবনতশিরাঃ হইয়াছিল। তিনি অত্যুন্নত হইয়াও কোন সময়ে উৎপথে পদ প্রক্ষেপ করেন নাই এবং কূট যুদ্ধের রহস্যজ্ঞ হইয়াও ধর্ম্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেন। তিনি প্রকৃতি-বৈরাগ্য ঘটিলে তৎক্ষণাৎ তাহার শান্ত করিতেন, কিন্তু বিরাগ জাগিতেই না পারে, এই নীতিতে কার্য্য করিতেন। প্রবল বা সমবল শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতেন, দুর্ব্বলের দিকে যাইতেন না।

অপথেন প্রববৃতে নাজাতুপাটতোহপি সঃ ॥১॥
"কৃৎস্নমপি বিবিক্তেঽপি, তস্মিন্ সমার্থ-

বোধিনি ॥২।

"কাম্য প্রকৃতি বৈরাগ্যং সদ্যঃ শময়িতুং

ক্ষমঃ।

যস্য কার্য্যঃ প্রতীকারঃ স তন্নৈবোদপাদয়ৎ ॥৩
শক্যো যেষা তবহুবাত্রক্ততন্য শক্তিমঃ মতঃ॥৪

এইরূপ সর্ব্বসৌভাগ্যসম্পন্ন রাজরাজেশ্বর অতিথির সুশাসনে পুণ্যে নিরতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া ভারতভূমি—

"খনিভিঃ সুষুবেরত্নং ক্ষেত্রৈঃ শস্যং

বনৈর্গজান্।

দিদেশ বেতনং তস্মৈ রক্ষা সদৃশমেবভূঃ।"

খনি সমূহের দ্বারা মণি, ক্ষেত্রদ্বারা শস্য ও বনাবলী দ্বারা গজ উপহার দিয়া তাঁহার শাসন প্রান্তির বিনোদন ও সৎকার করিতেন। ভারতের আদর্শরাজগণ উক্তরূপে ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের সমান সেবা করিয়া প্রজারঞ্জন করিতেন, এজন্য রাজ্যে—

ন দুর্ভিক্ষং নচ ব্যাধি নাকাল মরণং নৃণাম্।
না ধর্ম্মকচরঃ পৌরা তস্মিন্ শাসতি মেদিনীম্ ॥৩

মার্কণ্ডেয় পুরাণ।

(ক্রমশঃ।)

শ্রীরামচরণ বিদ্যাবিনোদ।

দেখা।

এক নিমেষের মাঝে কত লেখে কেলি—
সকল দৃশ্যের মাঝে তোমার অঙ্গুলি
করিছে অদ্ভুত ক্রীড়া! এই মহাকাশ
ব্যাপিয়া রচিয়া কত বর্ণের বিকাশ;
নীলাম্বুর বক্ষোমাঝে বিরাট কল্লোলে
হিল্লোলে হিল্লোলে নাচে ঊর্ম্মিবালা দুলে;
তীরে সমীরণ প্রাণে ছিন্ন আয়োজন,
কাননে কাননে জাগে মৃদু আন্দোলন;
তরুতে মর্ম্মর স্বর, লতায় সোহাগ,
অমৃত সঙ্গীত শুনি পাখির বেহাগ!
কতই প্রয়াস সাধো অসীম প্রভাবে
হে সৌম্য সুন্দর শান্ত!

সরল স্বভাবে
শুনি, দেখি, অনুভব করি মনোমাঝে—
এই মহাকর্ম্মশালে নানা কর্ম্মেকাজে!

শ্রীচণ্ডীচরণ মিশ্র।

সমালোচনা।

১। Sanskrit Grammar for University Students, শ্রীযুক্ত রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর, এম্ এ, প্রণীত; প্রথম ভাগ। মূল্য দেড় টাকা। আমরা এই পুস্তক খানি পাঠ করিয়া অতীব প্রীত হইয়াছি। সংস্কৃত ব্যাকরণের কয়েকটি অতি জটিল বিষয় ইহাতে অতি প্রাঞ্জল ভাবে বিবৃত হইয়াছে। বর্ণের উচ্চারণ স্থান, যত্ব বিধি, ণত্ববিধি প্রভৃতি বিষয়গুলি ইতঃপূর্ব্বে এরূপ সহজ ও হৃদয়গ্রাহী ভাবে লিখিত হইতে আমরা দেখি নাই। এই পুস্তকে শিক্ষক ছাত্র উভয়েরই যথেষ্ট উপকার হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। আশা করি ইহার দ্বিতীয় বা শেষ খণ্ড শীঘ্র প্রকাশিত হইবে।

২। হিতগ্রন্থাবলী প্রথম খণ্ড, সচিত্র, স্বর্গীয় হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত, মূল্য দুই টাকা। স্বর্গীয় গ্রন্থকারের কতকগুলি কবিতা তদীয় ভ্রাতা পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিয়াছেন। গ্রন্থকারের কবিত্ব শক্তি কোরক সময়েই বিচ্ছিন্ন হইয়াছে, উহা প্রস্ফুটিত হইবার অবসর পাইলে তাঁহার দ্বারা বঙ্গ সাহিত্যের যথেষ্ট উপকার সাধিত হইত সন্দেহ নাই। মুদ্রিত কবিতাবলীর কয়েকটি আমাদের ভাল লাগিয়াছে। ছবিগুলিরও কয়েক খানির অঙ্কণে নিপুণতা প্রকাশ পাইতেছে।

৩। অভিষেক অভিনন্দন। ভারতেশ্বর ও ভারতেশ্বরীর অভিষেকোৎসব উপলক্ষে শ্রীযুক্ত রায় বাহাদুর চুণিলাল বসু প্রণীত কবিতা পুস্তিকা। কবিতাগুলি আমাদের বড় ভাল লাগিয়াছে। স্থানে স্থানে হেমচন্দ্রের বীণার ঝঙ্কার পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ আমরা নিম্নলিখিত কবিতাটি উদ্ধৃত করিতেছি—

বীরত্বের খনি পুণ্য রাজস্থান,
জহর ব্রতের যথা অনুষ্ঠান,
কেশগুচ্ছ কাটি ধনুকের ছিলা
স্বদেশরক্ষায় হাসিমুখে দিলা,
যথায় রমণী পতিপুত্র মুখ
না করে দর্শন সমরে বিমুখ।
দ্বাদশ বৎসর অনশান ব্রত,
বন্য পশুপ্রায় ভ্রমিয়া নিয়ত,
মোগল সম্মান হেয় জ্ঞান করি,
জন্মভূমি রক্ষে প্রতাপ কেশরী।
পুণ্য হলদিঘাট, বীররক্তপূত,
মধুর চারন-কণ্ঠে উদারিত।
চিতোর, মেবার, যোধ, উদিপুরী,
সম্মিলিত সহ ব্রিটিশ কেশরী;
কাহার সম্মান করিতে প্রদান
সুসজ্জিত হয়ে করে অভিযান?

৪। শ্রীজর্জ্জ-জন্ম-গাথা। শ্রীরাম চরণ বিদ্যাবিনোদ কৃতা, খুলনা অভিষেকোৎসবে পঠিতা। বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের সংস্কৃত কবিতা রচনায় শক্তি আছে। কবিতাটি হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে।

৫। সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ ও সম্রাজ্ঞী মেরীর জীবন চরিত। শ্রীবৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় বি, এ প্রণীত। পুস্তক খানিতে ভারতেশ্বর ও ভারতেশ্বরীর জীবনীর অনেক কথা লিখিত হইয়াছে, ও পরিশিষ্টে বঙ্গের কয়েকজন খ্যাতনামা ব্যক্তির সংক্ষিপ্ত পরিচয়ও দেওয়া হইয়াছে। পুস্তক খানি বালক বালিকাদিগের পাঠের উপযোগী, ইহাতে কয়েক খানি সুন্দর চিত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। স্থানে স্থানে ভাষাগত দুই একটি দোষ না থাকিলে আরও ভাল হইত। সম্রাজ্ঞী শব্দটিতে আমাদের আপত্তি আছে

সাহিত্য-সংহিতা।

দ্বাদশ খণ্ড] ১৩১৮ সাল, অগ্রহায়ণ। [৮ম সংখ্যা।

সংস্কৃত কাব্যে—রামায়ণ।*

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি পূতসলিলা তমসানদীর তীরভূমিতে বিচরণ করিতে করিতে তমসার বিপুল পুলিনে অবস্থিত বিপুল অরণ্যানীর সৌন্দর্য্য দেখিয়া কেনই বা মোহিত হইয়াছিলেন? নদীতট বিচরণশীল ক্রৌঞ্চমিথুনের মনোহর স্বস্বরে মুগ্ধ নয়ন-যুগল কেনই বা তাহাতে পাতিত করিয়াছিলেন? জানি না, বিধাতার কোন্ নির্ব্বন্ধের বশবর্ত্তী হইয়া ঠিক সেই সময়ে ক্রূরকর্ম্মা ব্যাধ আসিয়া মহর্ষি-লোচনের আসেচনকারী সেই বিহঙ্গম মধ্য [illegible] বিহঙ্গমীর কাম-মোহিত বিহঙ্গমটীকে স[illegible]ক্ষ্ণ কঠোর শরাঘাতে রুধিরাপ্লুতদেহে ভূপাতিত করিয়া বিহঙ্গমীর আর্ত্তনাদে বনস্থলীকে পরিপূর্ণ ও নিপীড়িত করিয়া, সেই অনাসক্ত মহর্ষির অনাসক্ত পাষাণ নির্ম্মম হৃদয় হইতে উষ্ণ প্রস্রবণ ছুটাইয়া একটি মনোহর উৎসের সৃষ্টি করিল।

শত সহস্র বৎসর অতীত হইয়াছে, যুগ-যুগান্তর অতীত হইয়াছে, সেই উৎসনিঃসৃত অমৃতধারার বিরাম নাই, হ্রাস নাই, বৃদ্ধি নাই, প্রচীনতা আসিয়া নবানুরাগোন্মত্ত ব্যক্তিদিগকে বিমুখ করে নাই! সে ধারার স্বচ্ছতা, সে ধারার নির্ম্মলতা সে ধারার স্বাদুতা শত সহস্র বৎসরেও বিনষ্ট হয় নাই, যুগযুগান্তরেও অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে. বলিতে পারা যায় কি কোন্ তপস্যার ফলে অমরবাঞ্ছিত সেই অমৃত-ধারার মরভূমি বা মরুভূমিতে অবতরণ? বলিতে পারা যায় কি, কোন্ কঠোর সাধনার ফলে উষ্ণ অশ্রুমিশ্রিত সেই উষ্ণ প্রস্রবণ প্রবাহিত হইয়া ত্রিতাপদগ্ধ—পাপদগ্ধ জগৎকে সুশীতল করিয়াছে।

শুনিয়াছি পিতামহ হইতে আরম্ভ করিয়া ভগীরথ দীর্ঘকালব্যাপী তপস্যার ফলে গঙ্গাকে মর্ত্ত্যে অবতারণ করিয়াছেন ও তাহার ফলে পূর্ব্বপুরুষদিগের উদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন। জানি না, একজন্মের তপস্যার ফলে বল্মীক-কীটাশিদষ্ট মৃৎপ্রোথিত কঙ্কালসার বাল্মীকি কি এই সুধাধারার পৃথিবীতে অবতারণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন; বলিতে পারি না মহর্ষি বাল্মীকির পূর্ব্বপুরুষগণ বাল্মীকির মত কঠোর সাধনায়—কঠোর তপস্যায় নিরত ছিলেন কি না, জানি না, বাল্মীকিই বা কত জন্ম-জন্মান্তর ঈদৃশ কঠোর সাধনায়—কঠোর তপস্যায় নিযুক্ত হইয়া বাগ্দেবীর উপাসনা করিয়াছিলেন কি না—যাহার ফলে ভারতের আদি কবি, পৃথিবীর আদি কবি ভারতভূমির মত অগণ[illegible] ফল-পুষ্প-বি[illegible]বিত ললিতা লতিকায়, আপাদপল্লবিত [illegible] গুল্মে অলঙ্কৃত

হিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। যে দেব-নদীতে আদিকাল হইতে গৃহী, ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসী, ধনী, ভক্ত, জ্ঞানী, যোগী, পণ্ডিত, মূর্খ, এক কথায় বলিতে গেলে ভারতের সমস্ত নরনারী পুনঃপুনঃ অবগাহন করিয়া সুশীতল পবিত্র সলিলে আকণ্ঠ মগ্ন থাকিয়া, আবার অবগাহন করিতে চায়, আবার আকণ্ঠ মগ্ন হইয়া থাকিতে চায়, এই শীতল সলিল ছাড়িয়া তীরে উঠিতে ইচ্ছা করে না।

অগঙ্গদেশ হইতে দেহ পবিত্র করিবার জন্য, পাপ ক্ষালনের জন্য, চিত্ত ও আত্মাকে পরিতৃপ্ত ও কৃতার্থ করিবার জন্য শতশত যাত্রী গঙ্গায় আসিয়া উপস্থিত হয়, স্নানান্তে নিজ নিজ কাংস্যনির্ম্মিত, পিত্তলনির্ম্মিত বা কাচনির্ম্মিত পাত্রে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ গঙ্গাজল উত্তোলিত করিয়া দেশে লইয়া যায়। সেই পবিত্র জলপূর্ণপাত্র পবিত্র গৃহে রক্ষিত হয়, প্রত্যহ তাহা হইতে কুশাগ্রদ্বারা উত্তোলিত জলকণা স্পর্শ করিয়া সকলে পবিত্র হয়। বাল্মীকির এই দেবনদীতেও সেইরূপ অনেক ভাগ্যবান অবগাহন করিয়া কেহ বা হিরণ্ময় কুম্ভে, কেহ বা রৌপ্য কলসে, কেহ বা পিত্তল ঘটে যাহার যেমন ঐশ্বর্য্য সেই পূত বারি সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছেন। শত সহস্র বৎসর অতীত হইয়াছে, পাত্রের গুণে নয় জলের গুণে সে জলেও পিচ্ছিলতা, দুর্গন্ধ মলিনতা আসে নাই, দূষিত কীটের উৎপত্তি হয় নাই। পাত্রে উত্তোলিত গঙ্গাজল দীর্ঘ কাল রক্ষিত হইলেও তাহাতে সেই সেই দোষের সম্ভাব হয় না প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি গঙ্গাজলের এটিও একটি মহা গুণ, এ গুণেও গঙ্গাজলের মহিমা।

মহর্ষি বাল্মীকি-প্রসূত নির্ঝরিণীর পবিত্র সলিলেও সেইটি একটি মহাগুণের সম্ভাব জলের মহিমা শতকণ্ঠে কীর্ত্তিত হইতেছে। ভক্ত, কবি, পণ্ডিতগণ কুশাগ্রদ্বারা সেই সেই পাত্র হইতেও জলকণা উদ্ধৃত করিয়া আত্ম শুদ্ধি ও পরশুদ্ধির বিধান করেন। উদ্ধৃত গঙ্গাজলে অন্য জল মিশ্রিত হইলে গঙ্গাজলের মাহাত্ম্য থাকে না। কিন্তু এই ঋষিনদীর উদ্ধৃত জলে একান্ত অমেধ্য জল মিশ্রিত না হইলে অন্য জলেও ইহার পবিত্রতা নষ্ট করিতে পারে না। প্রত্যুত সেই জলও পবিত্র হইয়া যায়।

এই নদীর পবিত্র কূলে যাঁহাদিগের বাসভূমি, পূর্ব্বসংস্কার অনুসারে কখনই তাহারা উদ্ধৃত জলে বা জলপ্রবাহে অমেধ্য অর্পণ করিতে পারেন না। আমাদিগের বিশ্বাস, আমাদিগের এই পবিত্র দেশে তাহা কখনও হয় নাই। নিতান্ত দূরদেশে—অগঙ্গদেশে—অপবিত্র দেশে এই পবিত্র বারি নীত হইয়া তাহাতে অন্ধ কর্ত্তৃক অমেধ্য জৈবশোণিত সংযোজিত হইয়াছে। তাহাতেই আদর্শ সতী সীতার পবিত্র স্থানে বসিয়া, সুন্দরী [illegible] প্যারিসের রূপ চিন্তা করিয়া অনন্ত নরকের অগ্নিকুণ্ডে আত্ম-বিসর্জ্জন করিতেছে। কেহ কেহ বলিবেন, প্রতিভাশালী কবির, প্রতিভাশালী লেখকের চিন্তাপ্রসূত তুল্যরূপ ভাবতরঙ্গ দেশের সুদূর ব্যবধান ও কালের সুদীর্ঘ ব্যবধান বাধা দিতে অসমর্থ। আমরাও এই অমূল্য উপদেশের প্রত্যেক অক্ষরের উপরে শ্রদ্ধার সহিত সম্মান প্রদর্শন করিতাম, যদি তাঁহারাই আবার অশ্বঘোষ কবির রচিত বুদ্ধচরিত হইতে ভাব সংগ্রহ করিয়া কালিদাস রঘুবংশ লিখিয়াছেন, খ্রীষ্টের উপদেশমালাই ভারতে ভগবদ্গীতাকারে নিবদ্ধ এইরূপ না বলিতেন। ভাবের সৌসাদৃশ্য এক কথা, যথাযথ ভাবের সংগ্রহ অন্যকথা। রামায়ণ

(উভয়গ্রন্থে) যথাযথরূপে একই ভাব বিদ্যমান অবধারণ করি। অগ্নি সংযোগে লঙ্কানগরীকে দগ্ধ করার মত ট্রয়নগরীকে দগ্ধ করা পর্য্যন্ত হইয়াছে। ভারতীয় কবির লিখিত কাব্যের ছায়াবলম্বনে ইলিয়াড লিখিত, বড়ই লজ্জাজনক।

কোন কোন বিজ্ঞ অধ্যাপক ঐতিহাসিক গবেষণাপূর্ণ যুক্তির সহায়তায় রামায়ণ, মহাভারতের পরবর্ত্তী কালে লিখিত, ইহা প্রমাণ করিবার জন্য যত্ন ও আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। প্রমাণের অভাব নাই, যুক্তির অসদ্ভাব নাই, যে প্রমাণের বলে রাজা রাজেন্দ্র লাল মিত্র জীবিত কালেই ব্রাহ্মণ বলিয়া অবধারিত হইয়া ছিলেন; * সেইরূপ প্রমাণ ও যুক্তির সাহায্যে কালে রামায়ণ যে খৃষ্টীয় ষষ্ঠ বা সপ্তম শতাব্দীতে লিখিত বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে, তাহাতেও আশ্চর্য্য ও বিস্ময়ের কিছুই নাই। আমরা যাহা বলিতেছি তখন আবার তাহাই পরিবর্ত্তিত হইয়া আমাদিগের কর্ণে প্রবেশ করিবে, তখন কেন বলি, এক্ষণেও আমরা কোন কোন শিক্ষিত ব্যক্তি[illegible] শুনিয়াছি হোমরের ইলিয়ড অবলম্বনে বাল্মী[illegible] রামায়ণের সৃষ্টি করিয়াছেন।

যে সকল যুক্তি ও তর্কের অবতারণা করিয়া গ্রন্থের পৌর্ব্বাপর্য্য ও গ্রন্থকারের পূর্ব্ববর্ত্তিতা ও পরবর্ত্তিতা অবধারণ করা যায়, যাঁহারা সেই সিদ্ধান্তের প্রতিকূল-সিদ্ধান্তের সমর্থন করেন, তাঁহারা সেই সমস্ত যুক্তির মূলে উচ্ছেদ করিবার জন্য মনঃকল্পিত মতের সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহাদিগের মতে সমস্ত মহাভারত এক সময়ের রচিত পুস্তক নহে। মহাভারত যতই প্রাচীন গ্রন্থ হউক তাহার তৃতীয় বার সংস্করণ খৃষ্টের পরবর্ত্তী সময়ে হইয়াছে। মহাভারতের মত ভারতীয় অনেক প্রাচীন গ্রন্থেও যে অনেক পরবর্ত্তী সময়ে অংশ বিশেষ রচিত হইয়া সংযোজিত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। আবার অনেক সময়ে পণ্ডিতগণ আত্মমত সমর্থন উদ্দেশে বা অন্য কোন উদ্দেশে শ্লোক বা শ্লোকার্দ্ধ রচনা করিয়াও গ্রন্থমধ্যে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। সেই সকল নবযোজিত অংশ বিশেষেও প্রক্ষিপ্ত শ্লোক বা শ্লোকার্দ্ধ পরবর্ত্তী সময়ের অনেক বিষয়ই বিনিবদ্ধ হইয়াছে। যাহাতে পরবর্ত্তী বিষয়ের উল্লেখ আছে, তাহা দ্বারাতেই করিতে হইবে সেই অংশবিশেষের ও শ্লোকবিশেষের নবীনত্বের অবধারণ। আমরা পশ্চাৎ এই তর্কের সমালোচনা করিব. রামায়ণ ও মহাভারতের পৌর্ব্বাপর্য্য ও ইলিয়ড দৃষ্টে রামায়ণ বা রামায়ণ দৃষ্টে ইলিয়ড লিখিত, তাহার অবধারণ ও সমাধান করিবার জন্য যথামতি যত্ন ও চেষ্টা করিব। এস্থলে এইমাত্র বক্তব্য যে, ভারতবর্ষের মত ঋষিভক্ত দেবভক্ত শাস্ত্রভক্ত দেশে ঋষিবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া ঋষি-প্রণীত শাস্ত্র গ্রন্থে স্বলিখিত অংশ বিশেষের যোজনা করিবে এ সাহস কাহারও ছিল বলিয়া অন্ততঃ আমাদিগের বিশ্বাস নাই। সকলেরই অবগতি আছে, গঙ্গাজলে বা অন্য জলে পিণ্ড বিসর্জ্জনের পদ্ধতি আছে; কিন্তু পিণ্ডসংযুক্ত তুলসী, পুষ্প, কুশ, কাশ, কদলী-বল্কল নির্ম্মিত পাত্র জলে নিক্ষিপ্ত হয় না, [illegible]তি সন্তর্পণে বাছিয়া তীরে নিক্ষিপ্ত হয় [illegible] গঙ্গাপূজায় অর্পিত পুষ্পচন্দনাদিও গ[illegible]জলে নিক্ষিপ্ত

* লেখক যথার্থ বলিয়াছেন। একজন পাশ্চাত্য পণ্ডিত, রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রকে বিশ্বামিত্রের বংশধর বলিয়াছিলেন। তাঁহার যুক্তি এই যে, ঋষি বিশ্বামিত্র, মিত্র আর রাজেন্দ্রলালও মিত্র, অতএব রাজেন্দ্রলাল বিশ্বামিত্রের ন্যায় ব্রাহ্মণ। বঙ্কিমচন্দ্রের জলধর-জেলেনীর কথাও মনে পড়ে। সাং-সং।

হইয়া "দেবতাশ্চ সনির্ম্মাল্যাঃ" এই শাসন অনুসারে আবার তীরে উদ্ধৃত হইত। গঙ্গার ন্যায় শত দেবনদী বাঙ্গলার বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিয়া অধীরগতিতে মহাসাগরে মিলিত হইয়াছে, সেই দেবসেবিত দেশে বাস করিয়া দেবপূজিত ঋষিদিগের হৃদয়োৎসমিদ্ধ দেবনদীতে কখনই কেহ মেধ্যামেধ্য বস্তুর নিক্ষেপ করিবে না দৃঢ়নিশ্চয়।

আমি সংস্কৃত কাব্যগ্রন্থের সমালোচনায় নিযুক্ত, বাল্মীকি-প্রণীত রামায়ণ কাব্য কি না প্রথমতঃ তাহারই অবধারণ করা কর্ত্তব্য। কাহাকে কাব্য বলে, কাব্য বলিলে আমরা কি বুঝি, কাব্যের লক্ষণ কি, না জানিলে রামায়ণ কাব্যের অন্তর্নিবিষ্ট কি না বুঝিতে পারা যাইবে না। রস, ভাব, অলঙ্কার রীতি, কাব্যের দোষগুণ-নির্ণায়ক কাব্যনির্দেশক সংস্কৃতে অনেকগুলি অলঙ্কার গ্রন্থ আছে, তন্মধ্যে একমাত্র অগ্নিপুরাণকে পরিত্যাগ করিলে শৌদ্ধোদনিকৃত অলঙ্কারসূত্রকে প্রাচীন বলিতে হইবে, মহর্ষি ভরত-কৃত নাট্যসূত্র ভিন্ন আর কোন অলঙ্কার গ্রন্থ আছে কি না জানি না। প্রসিদ্ধ গ্রন্থ কাব্যপ্রকাশের কারিকাগুলি মহর্ষি ভরত প্রণীত বলিয়া যে প্রবাদ আছে, তাহার মূলে কোন সত্য আছে কি না তাহার কোন প্রমাণ নাই। পূজনীয় বন্ধু মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয় এই প্রবাদের প্রতিকূলে যে সকল যুক্তির অবতারণ করিয়াছেন, তাহার বিরুদ্ধে কিছু বলিবার আছে বলিয়া বোধ হয় না। সুতরাং আমরা শৌদ্ধোদনিকৃত অলঙ্কারসূত্রকেই প্রাচীন ও প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া মনে করি, তাহাতে আছে "রসাদিমৎ বাক্যং কাব্যং" রসাদিযুক্ত বাক্যের নাম কাব্য। ভোজদেবের সরস্বতী-কণ্ঠাভরণে ও বাগ্ভটের অলঙ্কার গ্রন্থে রস শব্দের সন্নিবেশ আছে। সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথ অন্যান্য সমস্ত পদের বর্জ্জন করিয়া একমাত্র রসশব্দ গ্রহণ করিয়া কাব্যের লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বিশ্বনাথের মতে একমাত্র রসই কাব্যের আত্মা। যদিও কাব্যপ্রকাশ প্রভৃতি প্রাচীন ও প্রামাণিক অন্যান্য অলঙ্কার গ্রন্থে কাব্যলক্ষণে রস শব্দের গ্রহণ করা হয় নাই, তথাপি কাব্যপ্রকাশের ন্যায় সর্ব্বজনবিদিত কবিজনপূজিত প্রামাণিক প্রাচীন গ্রন্থেও "যে রসস্যাঙ্গিনো ধর্ম্মাঃ শৌর্য্যাদয় ইবাত্মনঃ" ইত্যাদি কারিকাদ্বারা রসকেই কাব্যের অঙ্গী—প্রধান আত্মা বলা হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ করিবার কিছুই নাই। সুতরাং সকল আলঙ্কারিকের মতেই রসাত্মক বাক্যই কাব্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। রামায়ণে যেমন রসের অনুভূতি হয়, রামায়ণ পাঠে বা শ্রবণে পাঠক ও শ্রোতা যেমন রসে তন্ময় হইয়া উঠে রামায়ণের সর্ব্বত্র যেমন রসনির্ঝরের কল্লোলময় শুভ্র তরঙ্গক্রীড়া, সংস্কৃত অন্য কাব্যে তাহা নাই। সাহস করিয়া বলিতে পারি জগতের কোন কাব্যেই এরূপ রসবৈচিত্র্যের সমাবেশ নাই। আলঙ্কারিকদিগের সুসম্মত লক্ষণ যখন রামায়ণে বাধা প্রাপ্ত হয় না, তখন রামায়ণকে কাব্য না বলিয়া কি বলিব? রামায়ণে যখন মহাকাব্যের ন্যায় সর্গবন্ধ আছে, সর্গশেষে প্রায় অন্য ছন্দে কবিতা লিখিত হইয়াছে, বিশেষতঃ সর্গশেষে "ইত্যার্ষে মহাকাব্যে" বা "বাল্মীকীয়ে আদি কাব্যে" বলিয়া স্পষ্টতঃ নির্দ্দেশ আছে, তখন আর তাহাকে কাব্য না বলিয়া অন্য কিছু বলিবার সম্ভাবনা নাই। কোন কোন খ্যাতনামা শিক্ষিত সাহিত্যিকের মতে রামায়ণে পূর্ব্বে অধ্যায় শব্দের প্রয়োগ ছিল, সর্গশব্দের সমাবেশ ছিল না। উত্তরবর্ত্তী সময়ে অধ্যায় শব্দকে স্থানচ্যুত করিয়া সেইস্থানে সর্গশব্দ অধ্যাসীন হইয়াছে। প্রয়োজন কি বুঝিলাম না, স্মৃতি পুরাণ অপেক্ষা যেমন বেদের গৌরব ও সম্মান

,কাব্য অপেক্ষায়ও সেইরূপ স্মৃতি পুরাণের ন্যায় ঋষিপ্রণীত গ্রন্থের গৌরব ও সম্মান অধিক। ঋষিপ্রণীত গ্রন্থের পরিচায়ক অধ্যায় শব্দের পরিবর্ত্তন করিয়া কাব্য গ্রন্থের অনুমাপক সর্গশব্দের সংযোজন করিয়া পরিবর্ত্তনকারীর কীদৃশ অভীষ্ট সিদ্ধি ও তাহা দ্বারা গ্রন্থের কীদৃশ সম্মান বৃদ্ধি করা হইয়াছে অবধারণ করা সহজ নয়। অতিরিক্ত অপি তামদের হস্তলিখিত তালপত্রের জীর্ণ রামায়ণেও দেখিলাম, সর্গ শব্দ আছে, অধ্যায় শব্দ নাই। কেহ যদি দ্বাদশবর্ষ কাল কোন সম্পত্তি ভোগদখল করে ইংরেজী আইন অনুসারে সেই সম্পত্তিতে তাহারই স্বত্ব নির্দ্ধারিত হয়, তামাদি দোষে প্রকৃত উত্তরাধিকারীও সেই সম্পত্তিতে বঞ্চিত হয়। একবার দুইবার নয়,বহুবার দ্বাদশ বর্ষ অতীত হইয়াছে; ইংরেজাধিকারে বাস করিয়া ইংরেজি আইনে অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতে পারি না, বহু দ্বাদশ বর্ষের দখলী স্বত্ব হইতে সর্গকে বঞ্চিত করিয়া অধ্যায়কে স্বত্ববান করিতে পারি না। পরিবর্ত্তনকারী কোন তপস্যার ফলে, কোন [illegible] বরে, কোন মন্ত্রসিদ্ধির প্রভাবে [illegible] সিদ্ধ লেখনী দণ্ডের সহায়তায় নিজের পুস্তকে যেমন অধ্যায় শব্দের কর্ত্তন করিয়া সর্গশব্দ বসাইলেন; তেমনি তৎক্ষণাৎ পৃথিবীস্থ সমস্ত রামায়ণে সর্গ শব্দকে স্থান প্রদান করিয়া অধ্যায় শব্দ বিলুপ্ত হইয়া গেল; তাহার নির্ণয় ও সমাধান করিবার অধিকার আমাদিগের নাই। অধ্যায় ও সর্গ যখন একার্থক শব্দ; তখন অধ্যায় থাকিলেই কি আর সর্গ থাকিলেই কি? রামায়ণ যখন রসাত্মক বাক্য, তখন আর তাহাকে কাব্য না বলিয়া পশ্চাৎপদ হইবার কারণ নাই।

প্রাচীন আলঙ্কারিকেরাও "রামাদিবৎ-প্রবর্ত্তিতব্যং ন রাবণাদিবৎ" ইত্যাদি বলিয়া রামায়ণকে স্পষ্টতঃ কাব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন সুতরাং আমি পাঠক পাঠিকার নিকট অশ্রুতপূর্ব্ব একটী নূতন মতের উত্থাপন করিয়া তাঁহাদিগকে একটী নূতন মত শুনাইতেছি বলিয়া অপরাধী হইব না। মহর্ষি বাল্মীকিও তাঁহার রচিত রামায়ণকে কাব্য বলিয়াই অঙ্গীকার করিয়াছেন। "নিত্যং শৃণ্বন্তি সংহৃষ্টাঃ কাব্যং রামায়ণং দিবি", উত্তরকাণ্ড বাল্মীকির পবিত্র লেখনী হইতে নিঃসৃত হয় নাই বলিয়া কেশবচতুর্ভির্নিং শত্তিতম অধ্যায়ের এই শ্লোকার্দ্ধকে অস্বীকার করিলেও "নতে বাগনৃতা কাব্যে কাচিদত্র ভবিষ্যতি" আদি কাণ্ডের তৃতীয় সর্গস্থ এই শ্লোকার্দ্ধকে ও "কৃৎস্নং রামায়ণং কাব্যমীদৃশৈঃ ক্রিয়তাং ত্বয়া" সেই কাণ্ডের সেই সর্গস্থ শ্লোকার্দ্ধকে অনাদর ও অপমান করিবার কোন কারণ নাই। স্থলে ইহাও বক্তব্য যে, উত্তর কাণ্ডকেও আমরা অনাদর করিতে পারি না বাল্মীকির লেখনী-বিনিঃসৃত নয় বলিয়া অবধারণ করিতেও পারি না, যথা সময়ে তাহার আলোচনা করা যাইবে।

আলঙ্কারিকেরা পদ্য প্রবন্ধ কাব্যকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন,—মহাকাব্য, খণ্ড-কাব্য ও কোষকাব্য। মহাকাব্যে সর্গ চাই, দেবতা বা সদ্বংশীয় ক্ষত্রিয় একটী নায়ক চাই, সেই নায়ক আবার ধীরোদাত্ত গুণে (আত্মশ্লাঘাশূন্যতা, ক্ষমাশালিতা, অত্যন্ত গাম্ভীর্য্য, হর্ষশোকাদিদ্বারা অনভিভূততা, গর্ব্বের আচ্ছাদনকারী বিনয় ও দৃঢ়সঙ্কল্প) অলঙ্কৃত হওয়া চাই, অথবা একবংশজাত কুলীন অনেক রাজা নায়ক চাই, শৃঙ্গার, বীর, শান্ত,এই রসত্রয়ের মধ্যে একটী অঙ্গী (আত্মা) চাই, সেই অঙ্গী ভিন্ন অন্য সমস্ত রসও অঙ্গ হইতে পারে। নাটকের [illegible] মহাকাব্যেও মুখ, প্রতিমুখ, বিমর্ষ ও নি[illegible] নামক সন্ধি গুলির প্রয়োজনীয়তা [illegible]। মহাকাব্যের

আখ্যান ইতিহাস হইতে বা সাধুপুরুষের নিকট হইতে গৃহীত হওয়া চাই। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চারি বর্গেরই সন্নিবেশ থাকিবে, কিন্তু তন্মধ্যবর্ত্তী একটী ফলরূপে গৃহীত হইবে।

গ্রন্থের আদিতে দেবতার নমস্কার, আশীর্ব্বাদ বা বস্তুনির্দ্দেশ থাকিবে। সেই সঙ্গে খলের নিন্দা ও সাধুদিগের প্রশংসা থাকিলেও থাকিতে পারে। সর্গগুলি আয়তনে অতি অল্প বা অতি দীর্ঘ না হয়। নানা ছন্দের কবিতায় সর্গ গ্রথিত হইবে না, একটি মাত্র ছন্দে সর্গের অধিকাংশ কবিতা লিখিয়া, সর্গশেষে অন্য ছন্দে লিখিত কবিতার সন্নিবেশ করিতে হইবে। মহাকাব্যে অন্ততঃ আট সর্গ চাই, আট সর্গের ন্যূনে মহাকাব্য হইবে না। সর্গশেষে উত্তরবর্ত্তী সর্গস্থ কথার কিঞ্চিৎ সূচনা চাই। চন্দ্র, সূর্য্য, দিবা, রাত্রি, প্রাত, মধ্যাহ্ন, সায়াহ্ন, প্রদোষ ও অন্ধকারের বর্ণনা চাই, পর্ব্বত, অরণ্য, সমুদ্র ও ঋতুর বর্ণনা চাই, সম্ভোগ, বিপ্রলম্ভ চাই, স্বর্গ, নরক মুনি ও যজ্ঞের বর্ণনা চাই, মৃগয়া, যুদ্ধযাত্রা বিবাহ, মন্ত্রণা ও পুত্রজন্ম প্রভৃতি যথাসম্ভব সাঙ্গোপাঙ্গ মহাকাব্যে বর্ণনীয় হওয়া চাই। কারিকায় "যথাযোগং" (যথাসম্ভবং) আছে বলিয়া দুই একটী লক্ষণ না থাকিলেও মহাকাব্যত্বের হানি হইবে না।

অন্য মহাকাব্যে উল্লিখিত সমস্ত লক্ষণের সমাবেশ, আলঙ্কারিকদিগের নির্দ্দিষ্ট সেই সমস্ত বিষয়ের সমাহার থাকুক বা না থাকুক, সাহস করিয়া সনির্ব্বন্ধে বলিতে পারি, রামায়ণে তৎসমস্ত বিষয়েরই অবতারণা আছে, বৃদ্ধ কর্ত্তৃক একটীও পরিত্যক্ত হয় নাই।

বাল্মীকি যাহার পুস্তকে যে যে বিষয়ের আহরণ করিয়াছেন, উত্তরবর্ত্তী কবিরা উত্তরকালে তাহারই অনুসরণ করিয়া আলঙ্কারিকেরা আবার তাঁহারই প্রদর্শিত রীতির অবলম্বন করিয়া মহাকাব্যের লক্ষণ লিখিয়াছেন। মহাকাব্যে সর্গ চাই, রামায়ণে সর্গ আছে, মহাকাব্যের সর্গ দীর্ঘ হইবে না, হ্রস্ব হইবে না, রামায়ণের সর্গ দীর্ঘও নহে হ্রস্বও নহে। একশত শ্লোক-নিবদ্ধ অধ্যায় রামায়ণে অল্পই আছে। রামায়ণের অধিকাংশ সর্গের আদিতে যে ছন্দের গ্রহণ করা হইয়াছে, সর্গ শেষের দুই একটী শ্লোক ভিন্ন সমস্ত সর্গই সেই ছন্দে লিখিত। রামায়ণের কোন কাণ্ডই আট সর্গে সমাপ্ত হয় নাই। একবার নয়, দুইবার নয়, অনেকবার চন্দ্র, সূর্য্য, প্রাত, মধ্যাহ্নের বর্ণনা আছে, প্রদোষের বর্ণনা, অন্ধকার বর্ণনা, ঋতু বর্ণনা, পর্ব্বত, অরণ্য, সমুদ্রের বর্ণনাও রামায়ণে আছে, মৃগয়া, যুদ্ধযাত্রা, মন্ত্রণা, বিবাহ ও পুত্রজন্ম আছে, স্বর্গের বর্ণনা আছে, যজ্ঞের বর্ণনা আছে, নগরের বর্ণনা আছে, একটি নহেন, দুইটী নহেন, রামায়ণে অনেক মুনিরই সমাবেশ আছে, নাই কেবল বেদবিভাগকর্ত্তা শারীরিক সূত্রের রচয়িতা, পাতঞ্জল-ভাষ্যের প্রণেতা মহাভারত ও অষ্টাদশ পুরাণের সৃষ্টিকর্ত্তা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ভগবান ব্যাসদেবের রামায়ণে উপস্থিতি।

মহাকাব্যে দেবতা বা সদ্বংশীয় ক্ষত্রিয় নায়ক। দেবতা বলিতে চাও বল; সদ্বংশীয় ক্ষত্রিয় বলিতে চাও বল, রামায়ণের নায়ক রাজা রামচন্দ্র। দেবত্ব ও নরত্বের সমাবেশ এক রামচন্দ্রে। নরচরিত্র কলঙ্কে অধ্যুষিত, পুরাণ ভারতে শুনিয়াছি, দেব-চরিত্রেও কলঙ্ক আছে। রাম-চরিত্রে বিন্দুমাত্র কলঙ্ক নাই। তবে নায়ক ধীরোদাত্ত নায়কের উদাহরণে আলঙ্কারিকদিগের সর্ব্ববাদি-সিদ্ধরূপে উল্লিখিত ও কীর্ত্তিত, তাঁহাকে

আবার সেই সেই নির্দ্দিষ্টগুণে অলঙ্কৃত করিয়া বীরোদাত্ত নায়কের অন্তর্নিবিষ্ট করিবার জন্য যত্ন ও যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ, পিষ্টপেষণ ও সিদ্ধসাধন ভিন্ন কিছুই নহে। "আশীর্নমস্ক্রিয়া বস্তুনির্দ্দেশো বা" এই বস্তুনির্দ্দেশ কি, ব্যাস—বাল্মীকির পরবর্ত্তী কবিরা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই, পরবর্ত্তী আলঙ্কারিকেরাও অবধারণে অসমর্থ হইয়াছেন। যদি "অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশি দেবতাত্মা", "শ্রিয়ঃ পতিঃ শ্রীমতি শাসিতুং জগৎ" বা—"নিপীয় যস্য ক্ষিতিরক্ষিণঃ কথা" বলিয়া আরম্ভের নামই বস্তুনির্দ্দে হয়, তবে বস্তুনির্দ্দেশের জন্য উপদেশের কোনই সার্থক্য থাকে না, কাব্য লিখিতে গেলেই ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, এই ভাবে আরম্ভ হইবেই হইবে। এই জন্য বলিতেছি ইহার নাম বস্তুনির্দ্দেশ নয়। সমস্ত কাব্যের প্রধান প্রধান বক্তব্য বিষয় গুলির সংক্ষেপে কীর্ত্তনের নামই বস্তুনির্দ্দেশ। এইরূপ বস্তুনির্দ্দে— —য়ণে আছে, মহাভারতে আছে, আর্ষ যুগের পরবর্ত্তী যুগে সেই আকারের বস্তু-নির্দ্দেশ আর আমরা দেখিতে পাই না। রামায়ণ দৃষ্টে স্পষ্টতঃ উপলব্ধি হয়, রামচন্দ্র যখন অযোধ্যায় রাজা ছিলেন, সেই সময়েই রামায়ণ লিখিত। অতীত সত্যঘটনার নাম ইতিহাস, অতীত ঘটনা ভিন্ন বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ কেহ লিখিতে পারেন না। বর্ত্তমানকেও আমরা অতীত ভবিষ্যতের সংক্ষিপ্ত সমাচার ভিন্ন আর কিছু বলিতে পারি না। বর্ত্তমানের ও অতীত অংশ লিখিতে পারা যায়। অতীত ঘটনা ইতিহাস, সুতরাং রামায়ণের বিবরণকে ইতিহাসোক্ত বৃত্ত বলা যাইতে পারে। সে সময়ে দেবর্ষি নারদের তুল্য সাধুপুরুষ কেহ ছিলেন বলিয়া ঘটনা-লেখক ঋষিদিগের মুখে শুনি নাই, সাধু পুরুষেরই নাম সজ্জন। মহর্ষি বাল্মীকি দেবর্ষি নারদের মুখে শুনিয়া রামায়ণের বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। সুতরাং রামায়ণের বৃত্ত সজ্জনাশ্রয়ও বটে। (ক্রমশঃ।)

শ্রীযাদবেশ্বর তর্করত্ন।

অগ্রে ধ্বনি পরে অক্ষরের সৃষ্টি

আমরা আগম নিগম ও পুরাণাদি পদ্ধতি সমূহে ধ্বনি বা স্বরের প্রাধান্য অর্থাৎ আধিপত্য দেখিতে পাই। প্রথমাবস্থায় মনুষ্য জাতিও পশুপক্ষ্যাদির ন্যায় ধ্বনি বা স্বরের প্রয়োগ দ্বারা আত্মগত মনের ভাব প্রকাশ করিতেন। এখনও সদ্যজাত শিশু হইতে অস্ফুটবাক্ শিশু পর্য্যন্ত ধ্বনি বা স্বরের দ্বারাই সুখ দুঃখ প্রকাশ করিয়া থাকে। ক্রন্দন ও চীৎকার তাহার প্রমাণস্বরূপ। শিশুগণের রোদন ও চীৎকারে সাতটী ধ্বনি বা স্বর অনুভূত হয়। যথা—

। ॥ ৫ । ॥ ৫ । ॥ ৫ । ॥ ৫
অ অ অ আ আ আ ই ঈ ঈ উ ঊ ঊ
ঋ ৠ ৠ ঌ ৡ ৡ এ ঐ ও ঔ। শেষ চারিটী স্বরের ধ্বনি সহজে হয় না। ঐ চারিটী স্বরে বা ধ্বনির মধ্যে অ আ এর সহিত ই ঈ যোগে এ ঐ এবং অ আ এই দুই স্বরের সঙ্গে উ মিলিত হইয়া ও ঔ অপিচ অ বা ই এই দুই স্বরের সঙ্গে স্বরের বৃদ্ধিতে ঐ ঔ স্বরের বা ধ্বনির উৎপত্তি হইয়া থাকে। ভারতীয় ঋষিগণই [illegible] প্রয়োগ যেমন বুঝিয়াছিলেন, তেমন আর কোন জাতীয় পণ্ডিতগণ বুঝিতে পারেন নাই

শিশুদিগের ক্রন্দন ধ্বনি বা স্বরে তাহাদিগের দুঃখ হইয়াছে অনুভূত হয়। অস্ফুটস্মিত-বিকশিত নয়নোন্মীলনের চিহ্নে আনন্দলক্ষণ প্রকাশ পায়।

শব্দ বা কথা সৃষ্টির অগ্রে যে মানবগণ ধ্বনি বা স্বরের দ্বারা শোকহর্ষাদি মনের ভাব প্রকাশ করিতেন তাহার প্রমাণ এই—

প্রথমে সর্ব্বাগ্রে ও সর্ব্বসময়ে শ্রুতিরই প্রাধান্য দেখা যায়। শ্রুতি প্রথমতঃ উদাত্ত অনুদাত্ত ও স্বরিত এই তিন ভাগে বিভক্ত হয়। ঐ তিন প্রকার ধ্বনি আবার গীতির বিনিয়োগ সময়ে সপ্তস্বর বা ধ্বনির সহায়তা নিতান্ত আবশ্যক হইয়া থাকে নচেৎ গানের তান লয় বিশুদ্ধ হয় না। তাহা না হইলে শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে যিনি সঙ্গীত বিদ্যায় অভিজ্ঞ অথবা অনভিজ্ঞ কাহারই শ্রুতি-সুখাবহ হয় না। কর্ণ-কুহরে সুস্বর গতি ধ্বনিত হইলেই সকলেই মোহিত হয়। এমন কি অতি হিংস্রক সর্পও সুমধুর ধ্বনি শুনিয়া বিষবৈদ্যের করতলে ক্রীড়নক হয়।

সেই সপ্ত স্বর বা ধ্বনি এই যথা—

সা	রি	গা	মা	পা	ধা	নি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭

এই গুলি বৈদিক স্বর বা ধ্বনির বাঙ্গালা ভাষায় সংক্ষেপ সঙ্কেত মাত্র। যথা—

ষড়্‌জ = সা, ঋষভ = রি, গান্ধার = গা, মধ্যম = ম, পঞ্চম = পা, ধৈবত = ধা নিষাদ = নি।

এখন দেখা যাউক এই ধ্বনি বা স্বর গুলি নরগণ কোন্ কোন্ জীবের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন অর্থাৎ কোন্ কোন্ পশু পক্ষীর ধ্বনির অনুকরণে নিজ নিজ স্বর দণ্ডের সাধনা করিয়া ধ্বনির দ্বারা স্বীয় কণ্ঠ হইতে নির্গত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। উহাতে দেখা গেল যে ময়ূরের কেকা রবকে আদর্শ করিয়া ... হইয়াছে। তদ্রূপে পঞ্চম স্বর বা ধ্বনি কোকিলের মধুর রব হইতে সংগৃহীত ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। ঋষভ (বৃষের) ধ্বনি শ্রবণে ঋষভ স্বরের উৎপত্তি, তদ্বিষয়ে কোন্ ব্যক্তি সংশয় করিতে সমর্থ? ছাগ জাতি স্বরনির্গমের অনুকরণে গান্ধার ধ্বনির শিক্ষা, ইহা কি কেহ অপ্রত্যয় করিতে পারেন? অশ্বের হ্রেষারব হইতে ধৈবত স্বরের অনুকৃতি হইয়াছে তদ্বিষয়ে সন্দেহাভাব। ক্রৌঞ্চির কণ্ঠবিনির্গত শব্দ আদর্শ করিয়া যে মধ্যম স্বর শিক্ষা হইয়া থাকে, উহা কে অবিশ্বাস করিতে পারগ হইবে? কুঞ্জরের চীৎকার হইতে নিষাদ ধ্বনির সৃষ্টি, এতদ্বিষয়ে কাহারও মনে কি দ্বিভাব জন্মে? তবে একটা কথা আছে—ভাবুকতা, সহৃদয়তা ও রসিকতা এবং সঙ্গীত বিদ্যায় অনুরাগের অভাব থাকিলে সে মানবের এ সকল রহস্য বুঝিবার অধিকার দেখা যায় না।

এই সকল কথা যে অলীক নহে, তাহা প্রমাণ ... সঙ্গীত শাস্ত্র হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করা গেল। যথা—

ষড়্‌জং রৌতি ময়ূরস্তি ঋষভো নদতি চার্ষভং।
অজা রৌতি গান্ধারং মধ্যমং রৌতি ক্রৌঞ্চকঃ॥
অশ্বশ্চ ধৈবতং রৌতি নিষধং রৌতি কুঞ্জরঃ।
পুষ্প সাধারণে কালে কোকিলো রৌতি পঞ্চমং॥

এখন ইহা এক প্রকার স্থির সিদ্ধান্ত যে ময়ূর কোকিল এবং বক এই তিন পক্ষীর নিকট হইতে তিনটী স্বর (সুর) এবং হাতী, অশ্ব, গো এবং ছাগের নিকট হইতে অবশিষ্ট চারিটী ধ্বনি (সুর) শিক্ষা হইয়াছে। ইহারা যখন উন্মত্ত হয়, তখন পঞ্চস্বর তাহাদিগের কণ্ঠ হইতে বহির্গত হইয়া থাকে যথা—

"... রৌতি ... পঞ্চমং ..."

ষড়্জ সঞ্জোগর্জ্জত্যাহোহসৌ সপঞ্চমং ॥
ষড়্জঞ্চ পঞ্চমঞ্চেতি ময়ূরো নদতি দ্বিধা।
অথাহ্যাধৈবতাদীংশ্চ প্রাহুস্তত্তাশ্চপঞ্চমং ॥"

ভরত।

একণে উদাত্ত ও স্বরিত স্বর বা ধ্বনির বিচার করা কর্ত্তব্য। কালিদাসের রসিকতা ও ভাবুকতার সঙ্গে কোন কবিরই তুলনা হয় না। রঘুরাজের আগমনে মহর্ষি বশিষ্টের আশ্রমের ময়ূরময়ূরীগণ তাঁহার অভ্যর্থনায় ষড় জসংবাদিনী কেকা রব করিল। ময়ূরী দ্বিধা শব্দ করিল অর্থাৎ ষড়জ ও পঞ্চম রব করিয়াছিল।

'ষড়্জসংবাদিনী কেকা দ্বিধা ভিন্নাশ্চ'।

অতি উচ্চস্বরের নাম উদাত্ত, অতি লঘু স্বরের নাম অনুদাত্ত অর্থাৎ আমরা সাধারণ কথায় যাহাকে খাদ সুর বলি। স্বরিত স্বর উচ্চারণ অর্থাৎ কখনও উচ্চ কখনও নিম্ন কখন বা উভয়ের সামঞ্জস্যে মধ্যম অর্থাৎ সুললিত। এই ত্রিবিধ উচ্চারণের সংঘর্ষ মাত্র।

আমাদিগের ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণী কোথা হইতে উৎপন্ন হইল তাহা পরে বিচারিত হইবে। একণে যে স্বর হইতে স্বরবর্ণের উৎপত্তি হইয়াছে, তদ্বিষয়ে কাহারও মনে দ্বৈধ জন্মিবে কি ?

এখন হল বর্ণের কথা প্রসঙ্গে এই বলা যায় যে, মনুষ্যের কণ্ঠ তালু দন্ত এবং ওষ্ঠাদির অভিঘাতে জিহ্বা হইতে ঐ সপ্ত স্বরের অভ্যাস বশত হল বর্ণের উৎপত্তি দেখা যায়। ঐ সকল অক্ষর নিজে প্রকাশিত হইতে পারে না, উহারা স্বর-সংযোগে উচ্চারিত হয়; তন্নিমিত্ত উহাদিগের নাম ব্যঞ্জন বর্ণ। হল বর্ণ বলিবার তাৎপর্য্যতা আর কিছুই নহে। কলিহলি কামধেনু যে দিকে লওয়া যায়।

শ্রীলালমোহন বিদ্যানিধি।

সাংখ্য কি নাস্তিক ?

জগতে আস্তিক ও নাস্তিক [illegible] আছে ও থাকিবে; যখন আস্তিক্যের বৃদ্ধি হয়, তখনই কৃতযুগ, আর নাস্তিকতার বর্দ্ধনেই কলিযুগ। ভারতীয় সরস্বতী-ভাণ্ডার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বীক্ষণ করিলে প্রতীতি হয় যে, সকল যুগেই নাস্তিক্য বিদ্যমান ছিল। মহামতি বৃহস্পতি একজন নাস্তিক-চূড়ামণি ছিলেন; অনেকের মতে তিনিই নাস্তিক্যের প্রথম প্রচারক। তচ্ছিষ্য চার্ব্বাকও নাস্তিকবাদ সুদৃঢ় করিবার জন্ত গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, এবং সেই দর্শন "নাস্তিকদর্শন" নাম ধারণপূর্ব্বক খ্যাত হইয়াছে। একণে জিজ্ঞাসা এই যে, জগৎসিদ্ধ মহর্ষি কপিলও নাস্তিক ছিলেন কি না ? উত্তরে বলিতে হয়—না। কেন না তিনি যদি নাস্তিক হইতেন তবে নাস্তিক নামমালায় তাঁহারও নাম গ্রথিত থাকিত; বিশেষতঃ মহর্ষি কপিল অতীব প্রাচীন কালের লোক, ভাগবতাদি দৃষ্টে জানা যায়, তিনি ব্রহ্মার সমসাময়িক ছিলেন। যদি কপিলের সাংখ্য নাস্তিকবাদ-সমর্থক হইত, তবে নাস্তিকমতস্রষ্টার সহিত বৃহস্পতির নাম শ্রুতিগত না হইয়া কপিলের নামই প্রাগথিশ্রুত হইত। আর যদি কপিলকে 'বৃহস্পতি ও চার্ব্বাকের পরবর্ত্তী' বলিয়াও স্বীকার করা যায়, তবে কপিলের পৃথক্ দর্শন রচনা ব্যর্থ হয়। প্রাচীন কালে সহজে কেহ নূতন গ্রন্থ প্রকাশ করিতে পারিতেন [illegible] রচিত গ্রন্থ সর্ব্বাগ্রে রাজকীয় [illegible] উপস্থাপিত করিতে হইত; রাজ[illegible] জগতের হিতসাধক বুঝি[illegible] তাহা

সাধারণ্যে প্রচারিত হইত। একই বিষয়ে ভিন্ন পুস্তক লিখিয়া তৎকালে লোকে অনর্থক শ্রমস্বীকারে প্রয়াসী হইতেন না; ভাষ্যাদি রচনা করিয়াই পূর্ব্ববর্ত্তী মতের পোষণ ও প্রচার করিতেন।

মহর্ষি কপিল যদি চার্ব্বাকাদির পশ্চাদ্বর্ত্তী বা তন্মতাবলম্বীও হইতেন, তবে পৃথক্ গ্রন্থ রচনা না করিয়া, তাঁহাদের গ্রন্থোপরি ভাষ্যরচনা করিয়াই স্বকর্ত্তব্য শেষ করিতেন। কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই, সুতরাং তিনি বৃহস্পত্যাদির পরবর্ত্তী ত নহেনই এবং নাস্তিকও নহেন। নাস্তিকগণ দেহাত্মবাদী, কপিল তদতিরিক্ত আত্মবাদী; নাস্তিকগণ আত্মার অনিত্যত্ব স্বীকার করেন, কপিল আত্মার নিত্যত্ব প্রমাণ করেন; নাস্তিকগণ পূর্ব্ব ও পর জন্ম স্বীকার করেন না, কপিল জন্মান্তরবাদী, নাস্তিকগণ দুঃখ পরিণাম সুখকে প্রকৃত সুখ বলেন, পক্ষান্তরে আদ্যন্তমধ্য যাহার সুখময়, কপিল তাদৃশ ব্যাপারকেই সুখ সংজ্ঞা দেন; নাস্তিকেরা বলেন জগৎ স্বভাবতঃ সৃষ্ট, কপিল বলেন ঈশ্বরের অধিষ্ঠাতৃত্বে প্রকৃতি হইতে সৃষ্ট; নাস্তিককুল ঈশ্বর অস্বীকার করেন, কপিল ঈশ্বর স্বীকার করেন; নাস্তিক-সমাজ বেদকে পৌরুষের ও অপ্রামাণ্য বলেন, কপিল বেদকে অপৌরুষের ও স্বতঃপ্রামাণ্য বলিয়া হ্লাদ প্রকাশ করেন; এরূপ স্থলে কপিলকে নাস্তিক বলা কি সঙ্গত? উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটী তথ্য নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

কপিলমত।	নাস্তিকমত।
ন সাংসিদ্ধিকং চৈতন্যং প্রত্যেকাদৃষ্টেঃ ॥৩।২০ ক্ষিত্যাদি প্রত্যেকটীতে চৈতন্য নাই, সুতরাং তাহাদের সংহতিতেও চৈতন্য হইতে পারে না। দেহাদিব্যতিরিক্তোসৌ বৈচিত্র্যাৎ ॥ দেহ, ইন্দ্রিয়, মন ইত্যাদি সংঘাত জড়, আত্মা ইহা হইতে বিচিত্র চেতন, এই হেতু দেহাদির নামান্তর আত্মা, ইহা ঠিক নহে, আত্মা দেহ ব্যতিরিক্ত। "শরীরাদি ব্যতিরিক্তঃ পুমান্।"	চতুর্ভ্যঃ খলুভূতেভ্যঃ চৈতন্যমুপজায়তে। কিণ্বাদিভ্যঃ সমেতেভ্যঃ দ্রব্যেভ্যো মদশক্তিবৎ॥ মদকণা সমূহের সংযোগে যেমন মাদকতা জন্মে ... চয়ের সংযোগে চৈতন্য উৎপন্ন হয়। দেহস্থৌল্যাদি যোগাচ্চ স এবাত্মা ন চাপরঃ॥ দেহেই স্থূলতাদি দৃষ্ট হওয়ায় আমি স্থূল ইত্যাকার জ্ঞান হয়, সুতরাং দেহই আত্মা, অন্য আত্মা নাই॥
কপিলমত।	নাস্তিক-মত।
প্রকৃতি-পুরুষয়োরন্যৎ সর্ব্বমনিত্যম্। প্রকৃতি এবং জীবাত্মাও পরমাত্মারূপী পুরুষ ব্যতীত সকলই অনিত্য।৫।৭২ জন্মাদি ব্যবস্থাতঃ পুরুষবহুত্বম্ ॥১।১৪৯। জন্মাদির ব্যবস্থা হইতে পুরুষের বহুত্ব সাব্যস্ত হয় এস্থলে জন্মান্তর স্বীকৃত হইল। ত্রিবিধদুঃখা...ঃনিবৃত্তিরত্যন্ত পুরুষার্থঃ ॥১।১	এতেভ্যোভূতেভ্যঃ সমুত্থায় তান্যেবানু বিনশ্যতি। ভূত হইতে চৈতন্যরূপী যে আত্মা উৎপন্ন হয়, ভূতের নাশেই তাহার নাশ হয়, সুতরাং আত্মা অনিত্য॥ নাস্তিমৃত্যোঃগোচরঃ॥ মৃত্যুর পর আর কিছুই নাই, অর্থাৎ

ত্তিক এই তিন প্রকার দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তির নাম পরম পুরুষার্থ—মোক্ষসুখ।

পাঞ্চভৌতিকো দেহঃ।৩।১৭

দেহ পাঞ্চভৌতিক।

ত্যাজ্যং সুখং বিষয়সঙ্গমজন্ম পুংসাং দুঃখোপসৃষ্টমিতি মূর্খ বিচারণৈষা॥

বিষয়সঙ্গম জন্ম সুখে দুঃখসংপৃক্ত আছে বলিয়া, তাহা ত্যাগ করা মূর্খের কার্য্য।

ন স্বর্গো নাপবর্গঃ।

স্বর্গও নাই মোক্ষও নাই॥

অত্র চত্বারি ভূতানি॥

দেহ চাতুর্ভৌতিক॥

কপিলমত।

ন পৌরুষেয়ত্বং তৎকর্ত্তুঃ পুরুষস্যাভাবাৎ॥৫।৪৬

বেদকর্ত্তা কোনও পুরুষ নাই, সুতরাং উহা পৌরুষেয় নহে।

মুক্তামুক্তয়োরযোগ্যত্বাৎ।৫।৪৭

মুক্ত ও অমুক্ত কেহই বেদ রচনা করিতে পারে না।

ন ত্রিভিরপৌরুষেয়ত্বাদ্বেদস্য॥২।৫অ

বেদ অপৌরুষেয়...ইত্যাদি॥

নিজশক্ত্যভিব্যক্তেঃ স্বতঃ প্রামাণ্যম্॥৫।৫১॥

নিজ শক্তিদ্বারা অভিব্যক্ত হওয়ায় উহা স্বতঃ প্রমাণ॥

তৎ ত্রিবিধং।১।৮৭

প্রমাণ তিন প্রকার।১।৮০।১০০।১০১।সূঃ যথা প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব্দ॥

নাস্তিক-মত।

অগ্নিহোত্রং ত্রয়োবেদা ত্রিদণ্ডং ভস্মগুণ্ঠনম্।
বুদ্ধি-পৌরুষহীনানাং জীবিকা ধাতৃনির্ম্মিতা॥
ত্রয়ো বেদস্য কর্ত্তারো ভণ্ড ধূর্ত্ত নিশাচরাঃ।
জর্ব্বরী তুর্ফরীত্যাদি পণ্ডিতানাং বচঃ স্মৃতম্॥

অগ্নিহোত্র, বেদত্রয়, ত্রিদণ্ড, ভস্মলেপন, এসকল কেবল বুদ্ধি ও পৌরুষহীন ধূর্ত্তদিগের জীবিকামাত্র; বিধাতা তাহাদের জন্ত এইরূপ জীবিকা বিধান করিয়াছেন।

ভণ্ড, ধূর্ত্ত ও নিশাচর ইহারাই বেদের কর্ত্তা. তাহাদিগের নানাবিধ জর্ব্বরী ও তুর্ফরীত্যাদি বিকট বাক্যদ্বারাই বেদ পরিপূর্ণ রহিয়াছে। ঐ সকল বাক্য দ্বারাই বেদের সত্যাসত্য জানা যায়॥

অনুমানাদেঃ প্রামাণ্যং নস্যাৎ॥

প্রত্যক্ষ ব্যতীত অনুমানাদির প্রামাণ্য নাই।

কপিলমত।

তৎসন্নিধানাৎ
অধিষ্ঠাতৃত্বমণিবৎ।১।৯৬
সিদ্ধরূপ বোদ্ধৃত্বাদ্বাক্যার্থোপদেশ॥১।৯৮
সামান্যতোদৃষ্টাদুভয়সিদ্ধিঃ॥১।১০৩

সান্নিধ্যমাত্র হইতে ঈশ্বরের অধিষ্ঠাতৃত্ব সিদ্ধ।

ঈশ্বর সিদ্ধ ও বোদ্ধা বলিয়া সন্নিধিমাত্রেই বাক্যার্থের (বেদের) উপদেশ করিতে সমর্থ।

সামান্যতোদৃষ্ট অনুমান দ্বারাই প্রকৃতি, পুরুষ ঈশ্বরসিদ্ধ হইয়া থাকেন।

নাস্তিক-মত।

ঈশ্বর নাই।

সাংখ্যদর্শন এবং সাংখ্যমতবর্ণনাকারী তাবতাদি গ্রন্থ পর্য্যালোচনা করিলে, ব্রহ্মর্ষি কপিলকে নাস্তিক বলা দূরে থাকুক, পরমাস্তিক বলিয়াই ধারণা হয়। ধর্ম্মাত্মা মনু স্বকীয় ধর্ম্মশাস্ত্রে উন্নতকণ্ঠে বিঘোষিত করিয়াছেন—"নাস্তিকো বেদনিন্দকঃ" অর্থাৎ যে, বেদকে পৌরুষেয়, ভ্রমসঙ্কুল ইত্যাকাররূপে নিন্দা করে, সেই নাস্তিক-পদবাচ্য। আমরা সাংখ্যে ভূরিভূরি বেদ-প্রশংসা দেখিতে পাই সুতরাং সাংখ্য কখনই নাস্তিকমতসাধক নহে। কপিল একজন বেদপ্রাণ ঋষি; তাঁহার প্রতি পদক্ষেপ বেদানুকূল। যিনি বেদকে ঈশ্বর-বাক্য এবং অভ্রান্ত স্বতঃপ্রমাণ বলিয়া সোদ্যমে প্রচার করেন, তিনি যে কিরূপে নাস্তিকাখ্যাত হইতে পারেন, তাহা প্রকৃত আস্তিকের জ্ঞানগম্য নহে। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলস্থ, ১৬৪ সূক্তের ৩৯ মন্ত্রে কথিত আছে—"ঋচো অক্ষরে পরমে ব্যোমন্ যস্মিন দেবা অধিবিশ্বে নিষেদুঃ। যস্তন্ন বেদ কিমৃচা করিষ্যতি য ইত্তদ্বিদুস্ত ইমে সমাসতে॥"

যিনি দিব্যগুণকর্ম্মস্বভাব, বিদ্যাযুক্ত, যাঁহাতে পৃথিবী ও সূর্য্যাদি লোক স্থিত, যিনি আকাশবৎ ব্যাপক, সকল দেবের দেবস্বরূপ পরমেশ্বর, তাঁহাকে যে মনুষ্য না জানে, না মানে, ধ্যান না করে, সেই মন্দমতি নাস্তিক সর্ব্বদা সাগরের অতলতলে নিমজ্জিত থাকে, তাহি বেদ তাহার কিছুই করিতে পারে না এবং যে সেই পরব্রহ্মকে জানিতে পারে, সেই ব্রহ্মে স্থিত হয়।

ব্রহ্মর্ষি কপিল ঋগাদি বেদচতুষ্টয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ অধ্যয়ন ও বিশেষ বিচার বিবেচনাপূর্ব্বক কৃতনিশ্চয় হইয়াছিলেন যে, বেদ অভ্রান্ত সত্য। এক্ষণে সেই বেদেই লিখিত রহিয়াছে যে "যস্তন্নবেদ কিমৃচা করিষ্যতি", যে ব্যক্তি ঈশ্বরকে জানে না, মানে না সেই নাস্তিক; বেদ তাহার কি করিবে?

সুতরাং কপিল, ঈশ্বর স্বীকার করেন না, একথা কিরূপে বলা যাইতে পারে? যে বেদ কপিলের হৃদয়মণি, সেই বেদে যখন ঈশ্বর স্বীকৃত, তখন কপিলেরও কি ঈশ্বর স্বীকার করা হইল না? এবং কপিল যখন দুঃখ হইতে পরিত্রাণের উপায় নির্ণয় করিতে গিয়াছেন, আর বেদ বলিতেছেন ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার ও উপাসনাই দুঃখ হইতে ত্রাণের একমাত্র উপায়, তখন কি কপিলের ঈশ্বর স্বীকার করা হইল না? কপিল দুঃখ হইতে ত্রাণের যে উপায় স্বকীয় দর্শনে নির্ণয় করিয়াছেন, তাহার ঐমত্য দৃষ্ট হয়।

সুতরাং ... ক নহেন। আর এক-দল লোক আছেন, তাঁহারা বলেন, কপিল নাস্তিক নহেন কিন্তু ঈশ্বর নাস্তিক বটেন! একেই বলে "যাকে দেখতে নারি, তার চলন বাঁকা" ইহারা অনেক গ্রন্থ অলোচনা পূর্ব্বক দেখিলেন, কপিলকে নাস্তিক বলিতে হইলে মনুকে খণ্ডন করিতে হয়, তাহা সম্ভব নহে সুতরাং ধ্যানমগ্ন হইয়া উপায়োদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। অবশেষে সিদ্ধান্ত করিলেন, কপিল নাস্তিক্ নহেন কিন্তু ঈশ্বর নাস্তিক! হায় মনু! তুমি কি কুকর্ম্ম করিয়াই নাস্তিকতার মূলসূত্র গ্রথিত করিয়া গিয়াছ! যদি আজি তোমার স্মৃতি নাস্তিক্যের সংজ্ঞা স্মরণ না করাইত, তবে কপিলাদিকে আধুনিক বিদ্যাৎকরা অনর্গল নাস্তিকতার

জ ভাসাইয়া দিত। কিন্তু যোগ-স্তায়-বৈশেষিক-মীমাংসা-বেদান্ততীর্থরূপ উপাধি-ব্যাধিপীড়িত বর্ণাত্মক মহামহোপাধ্যায়াখ্য নবীন জনকুলের বাক্য, মনুর তুলনায় অতীব অকিঞ্চিৎকর, তাই .আধুনিক জনগণের সহস্র চীৎকারেও কেহ সাংখ্যকে নাস্তিক বলিয়া পূর্ণ বিশ্বাস করেন না। প্রাচীন আর্য্যগণ বৃহস্পতি ও তন্মতাবলম্বী দিগকেই নাস্তিকপদবাচ্য করিয়া গিয়াছেন, কপিলকে কেহই নাস্তিপদগত করেন নাই, সুতরাং তুমি আমি তাঁহাকে নাস্তিক বা ঈশ্বর নাস্তিক বলিলে আমাদেরই নাস্তিকতা প্রমাণিত হয় মাত্র। সেই বৌদ্ধযুগের শেষ দশায় মাধবাচার্য্য কপিলকে "নিরীশ্বর দর্শনকার" উপাধি দিয়া গিয়াছেন আর আজিও দার্শনিক অদার্শনিক, সংস্কৃতজ্ঞ সংস্কৃতাজ্ঞ অনেকেই মাধবাচার্য্যের চক্ষুতে কপিলকে দেখিতেছেন। ইহাতেই প্রতীতি হয় যে. ভারতীয় আর্য্যকুলের হৃদয় হইতে বৌদ্ধভাব এখনও দূরীভূত হয় নাই।

বেদান্তসূত্রের [illegible] ভারতে অক্ষরে অক্ষরে [illegible] লেন "নাস্তি সাংখ্য সমং জ্ঞানং নাস্তি যোগাৎ পরো বলং"। ইহা হইতে সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইতেছে যে, ব্যাসের আমলে কপিল নাস্তিক বা ঈশ্বর নাস্তিক ছিলেন না; ভারতে নাস্তিক্যের বৃদ্ধির সহিত সাংখ্য কেন দর্শনমাত্রেই অর্ব্বাচীনগণ কর্ত্তৃক নাস্তিকাখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে।

যে দর্শন ভারতবাসীর দর্শনস্বরূপ, এবং যাহার জন্ত ভারতবাসী জনসমাজে সুদর্শন, সেই দর্শনে নাস্তিক্যবাদ! হা ভারত! তোমার আরও কি দুর্দ্দশা হইবে জানি না।

ভারতীয় বিদ্বৎসমাজ, পৌরাণিক, স্মার্ত্ত নৈয়ায়িক ও নবীনবেদান্তী এই কয় শ্রেণীতে বিভক্ত, বৈদিক প্রকৃত দার্শনিক পণ্ডিত অতীব বিরল। আর প্রোক্ত নৈয়ায়িক এবং বেদান্তীকুলও পৌরাণিকাশ্রিত সুতরাং তাঁহারা দর্শনে পৌরাণিকত্বের প্রলেপ দিয়া থাকেন মাত্র। এরূপস্থলে দর্শনগুলি যে নাস্তিকতার আগার বলিয়া উক্ত হইবে তাহাতে আর বৈচিত্র কি? কারণ দর্শন-গুলির কোন খানিতেই চুকুলবধূটি চোরের বন্দনা নাই, ধড়াচূড়াধারী কোনও ঈশ্বরের নির্ণয় নাই, মন্ত্র, যন্ত্র, বীজাদির উল্লেখ নাই, গঙ্গাস্নান ও তিলকাদি ব্যবহারের দার্শনিক যুক্তি নাই, সুতরাং দর্শনগুলি নাস্তিকমত প্রবর্ত্তক না হইয়া আর যায় কোথায়? দার্শনিক হইতে হইলে বিচারা-গ্নিবিদগ্ধবুদ্ধি চাই, অ-লা স্মৃতি চাই, সত্যপূত অসত্যান্তক সুতীক্ষ্ণ দর্শন চাই; কিন্তু ভারতে এগুলির সম্পূর্ণ অভাব পরি-দৃষ্ট হইতেছে, সুতরাং দর্শন কাহার নিকট সুদর্শন হইবে?

যাহাই হউক, এক্ষণে সাংখ্যে নাস্তিক্য বাদারোপের মূলসূত্র অনুসন্ধান করা যাউক।

ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ ॥১অ, ৯২সূত্র।

সাংখ্যকে যে জন্ত নাস্তিক বলা হয়, এই সূত্রটিই তাহার প্রথম ও প্রধান সূচক। দেখা যাউক এই সূত্রে ঈশ্বরের নাস্তিত্ব-সাধক কি না।

অনুবাদ—ঈশ্বরের অসিদ্ধি হওয়ায়। সূত্রটী শ্রবণমাত্রই বোধ হয় ইহা একটি আশঙ্কার উত্তর প্রদানার্থ সূচিত হইয়াছে, এবং ইহার পূর্ব্বে ও পরে বহু কথা আছে যাহার সঙ্গে উক্ত সূত্রটি সংগ্রথিত। যদি ইহার পর ও পূর্ব্ববর্ত্তী সূত্রগুলির সহিত সম্পর্কিত না থাকে, তাহা হইলে উহার সার্থকতাই থাকে না, সুতরাং ইহা স্বাধীন ও সিদ্ধান্তসূত্র নহে। [illegible] হত্তপদাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যতক্ষণ দেহে [illegible] থাকে,

তদবধিই তাহারা কার্য্যকর হয়, কিন্তু বিচ্ছিন্ন হইলে তাহাদের পূতিগন্ধ মারণীয় ও অপ্রিয় হইয়া উঠে, তদ্রূপ দার্শনিক সূত্রগুলিও বিচ্ছিন্ন অযথাসংলগ্ন হইলে কেবল নাস্তিকতা কেন সর্ব্ববিধ পাপের প্রণোদক হইতে পারে।

যাহা হউক সাংখ্যের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অবিচ্ছেদ সাধন করিয়াই অর্থোদ্ধারের চেষ্টা করা যাইতেছে :—

প্রঃ—ঈশ্বরের অসিদ্ধি হওয়ায় কি?

উঃ—দোষ নাই? প্রঃ—কি দোষ? উঃ—অব্যাপ্তি, অতঃ অর্থটী দাঁড়াইতেছে। ঈশ্বরের অসিদ্ধি হওয়ায় অব্যাপ্তি দোষ হয় না? প্রঃ—এখনও অর্থটী ভাসিত হইতেছে না; অব্যাপ্তি দোষ কাহার? উঃ—প্রত্যক্ষ প্রমাণের যে লক্ষণ করা হইয়াছে তাহারই অব্যাপ্তি। সুতরাং অর্থটী এইরূপ হইল—প্রত্যক্ষ প্রমাণের যে লক্ষণ করা গেল, উহাতে ঈশ্বরের অসিদ্ধি হইলেও, অব্যাপ্তি দোষদুষ্ট নহে।

প্রঃ—প্রত্যক্ষ প্রমাণের লক্ষণ কি?

উঃ—যৎ সম্বদ্ধং সৎ তদাকারোল্লেখি বিজ্ঞানং তৎ প্রত্যক্ষম্॥

সৎপদার্থ ও ইন্দ্রিয় সম্বন্ধ হইলে, সেই সতের আকারোল্লেখি যে বিজ্ঞান, সেই বিজ্ঞানের নাম প্রত্যক্ষ। অতএব প্রত্যক্ষে—১মতঃ সৎপদার্থ, ২য়তঃ ইন্দ্রিয়, ৩য়তঃ তাহাদের সম্বন্ধন প্রয়োজন এবম্বিধ সম্বন্ধন হেতু যে বিজ্ঞানোৎপন্ন হয় তাহাই প্রত্যক্ষ জ্ঞান।

প্রঃ—যোগীদের যখন ইন্দ্রিয় সম্বন্ধ ব্যতীতও প্রত্যক্ষ হয়, তখন এই লক্ষণে অব্যাপ্তি দোষ না হইবে কেন?

উঃ—যোগিনামবাহ্যপ্রত্যক্ষত্বান্নদোষঃ॥ ৯০।১ অ।

যোগীদের বাহ্যপ্রত্যক্ষই হয় না সুতরাং তাঁহাদের জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ জ্ঞানও যায় না, এইহেতু অব্যাপ্তিও হইতে পারে না। অথবা যোগী প্রত্যক্ষ স্বীকার করিলেও অব্যাপ্তিদোষ হইবে না, কারণ :—

লীনবস্তু লব্ধাতিশয়সম্বন্ধাদ্বাহদোষঃ॥ ১৯১॥

সাধারণের বিদ্যমান পদার্থেরই প্রত্যক্ষ হয় কিন্তু যোগীর লীনবস্তুও প্রত্যক্ষীভূত হইয়া থাকে, অতএব এস্থলেও প্রত্যক্ষসংজ্ঞাটীত অব্যাপ্তিদোষ আসিতেছে না। কেবলমাত্র প্রত্যক্ষপ্রমাণের সর্ব্বাঙ্গসিদ্ধিও যোগিপ্রত্যক্ষকে দৃঢ়ী করণার্থই পরবর্ত্তীসূত্র-"ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ" বলা হইয়াছে।

এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ" বলিলে, ঈশ্বর নাই, তিনি সৃষ্টিকর্ত্তা নহেন, অন্যান্তব নাস্তি ইত্যাকার নাস্তিকতার ভাণ কোথা হইতে আইসে? ঈশ্বরের নাস্তিত্ব স্থাপন করা উদ্দেশ্য হইলে ব্রহ্মর্ষি কপিল প্রত্যক্ষ প্রমাণের ব্যাপকতা নির্দ্ধারণার্থ ঈশ্বরবাদ স্থাপন করিতেন না। আর যদি সূত্রটী [illegible] সাধক বলা যায়, তাহা [illegible] অধ্যায়ের ৯৬ ও ১০৩ সূত্রে এবং অন্যত্র ঈশ্বরের স্তিত্ব স্বীকার করিবেন কেন? তিনি কি আধুনিক পত্রিকাসর্ব্বস্ব সন্ন্যাসীদের মত সর্ব্বদাই মতপরিবর্ত্তক ছিলেন? এবং এইরূপ হইলে ব্রহ্মাত্ম কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসই বা কেন উন্নত কণ্ঠে সাংখ্য-বিজয়বার্ত্তা ঘোষণা করিবেন? সুতরাং সাংখ্যে নাস্তিকতা অমূলক।

কপিল প্রত্যক্ষের যে লক্ষণ করিলেন, তাহাতে সৎপদার্থ, নির্ব্বিকারে ইন্দ্রিয় ও তাহাদের অবাধ সম্বন্ধ থাকা চাই; সুতরাং এই প্রত্যক্ষ, ঐন্দ্রিয়িক বলিয়া প্রকৃতির অন্তর্গত, ঈশ্বর এইরূপ ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষগোচর নহেন, সুতরাং উক্ত প্রত্যক্ষ লক্ষণের অন্তর্গতও নহেন, কিন্তু ঈশ্বরে

ব্যাপ্ত নহে বলিয়া, প্রত্যক্ষ লক্ষণটী অব্যাপ্ত হইতে পারে না, কারণ উক্ত লক্ষণে ইন্দ্রিয় চাই, ঈশ্বর ইন্দ্রিয়াতীত। অতএব যাহার সহিত যে পদার্থের সম্পর্ক নাই, তাহাতে আবার ব্যাপ্তি, অব্যাপ্তি কি? কথিত 'প্রত্যক্ষ' লক্ষণ ইন্দ্রিয় ও অর্থ লইয়া, সুতরাং ঐ লক্ষণে যদি ঈশ্বর লক্ষিত নাই হ'ন তাহাতে দোষ কি? তবে যাঁহারা ঈশ্বরকে এই চর্ম্মচক্ষুতে দেখিবার আশায় তন্ময়, তাঁহারা দোষ ভাবিতে পারেন। হায়! বহুশতবর্ষ তপোনিরত থাকিয়া বাল্মীক হইলেও প্রকৃত চক্ষুতে ভগবদ্দর্শন আশা দিবাস্বপ্নমাত্র। ঋষিগণ উপনিষদে উপন্যস্ত করিয়াছেন—"ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি, ন বাগ্‌গচ্ছতি, ন মনঃ।" কেঃ-উঃ ১।৩। চক্ষুঃ, বাক্ বা অপর কোনও ইন্দ্রিয় বা ইন্দ্রিয়নেতা মন ব্রহ্মে পৌঁছাইতে পারে না সুতরাং তদ্দ্বারা ঈশ্বরলাভ ও নৃশৃঙ্গলাভ উভয়ই একার্থক। উপনিষদের প্রতিমন্ত্রই অমৃতনিক্বণে শুনাইতেছে—ঐন্দ্রিয়ক শক্তি ত্যাগ করিয়া আ[illegible] ধর সেই পুরুষপ্রধান [illegible] কপিল ইন্দ্রিয়সাধ্য প্রত্যক্ষ প্রমাণের অতীত বলিয়া ঈশ্বরে কোনও দোষারোপ বা তাঁহার নাস্তিত্বসাধন করেন নাই। স্থিতপ্রজ্ঞ, স্থিতবীর্য্য, স্থিতপ্রাণ না হইলে আর্য্যদর্শন বুঝা সুদূরপরাহত; অধুনাতন স্বয়ং পণ্ডিতস্মন্য সতত অস্থিতপ্রজ্ঞ চঞ্চলবীর্য্য ও বিক্ষুব্ধপ্রাণ জনগণ কপিলের দর্শনকে নাস্তিকদর্শন বলে, ইহা অপেক্ষা হাস্যকর ব্যাপার কমই দৃষ্ট হয়। তান্ত্রিক, বৌদ্ধ, মহম্মদীয় ও খৃষ্টিয় ধর্ম্মের সংঘর্ষে হিন্দুগণের মনোমধ্যে নাস্তিকতার বীজ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। ভগবান্ শঙ্কর এবং অন্যান্য আচার্য্যগণের প্রাণপণ চেষ্টাতেও নাস্তিকতার বীজ ভারতীয় উর্ব্বর হৃদয় হইতে নিষ্কাসিত হয় নাই; সেই পূর্ব্বসংস্কারের বশেই সাংখ্যকে নাস্তিক দেখিতে হয়। জীবমাত্রেই সংস্কারের ক্রীতদাস সংস্কারের যে গণ্ডী, তাহার সীমা অতিক্রম করা জীবের অসাধ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সুতরাং তুমি, আমি যে সাংখ্যকে নাস্তিক ব'ল, সেটি আমাদের হৃদয়স্থ নাস্তিকতার অভ্যাস ব্যতীত কিছুই নহে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসিদ্ধেশ্বর বাৎস্য বেদার্থী।

আত্মস্তব।

ভগবান্ বিষ্ণু নৃসিংহমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া, প্রহ্লাদের পিতা হিরণ্যকশিপুর বধ-সাধনান্তে স্বস্থানে প্রস্থান করিলে পর, প্রহ্লাদ কায়মনোবাক্যে নারায়ণের শরণাপন্ন হইয়া একাগ্রচিত্তে তাঁহার মনোময়ী পূজায় প্রবৃত্ত হইলেন। এদিকে অন্তর্য্যামী হরি ক্ষিরোদলহরীমালা-মধ্যে থাকিয়া তাঁহার সর্ব্বব্যাপিনী বুদ্ধি-সহায়ে প্রহ্লাদের তাদৃশী চিত্ত- সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। প্রহ্লাদ তাঁহাকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া সহর্ষে প্রীতিভরে বিবিধ স্তব করিতে লাগিলেন। ভগবান মাধব পরম পরিতুষ্ট হইয়া প্রহ্লাদকে সংসার-সম্ভ্রম-শান্তিরূপ পরম ফললাভ জন্য ব্রহ্মবিচার বা আত্ম-বিচারের আদেশ দিয়া অন্তর্হিত হইলে, প্রহ্লাদ আত্ম-বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া পরমাত্মার [illegible] শেষ স্তব

(১)

সর্ব্বপদাতীত হে পরব্রহ্মন্!
বহুকাল পরে পেয়েছি তোমারে
বিবেক-সহায়ে পরম ধন।
স্মৃতি-পথে মম এখন হে সুখে
প্রিয় বন্ধু তুমি করিছ বিরাজ।
সমাধিতে তব আনন্দ-স্বরূপ
পেয়েছি করিতে অনুভব আজ।
যাবৎ তোমাকে জানা নাহি যায়,
ধ্যান, বিনাশাদি কর অনুষ্ঠান,
জেনেছি এখন যাইবে কোথায়?
ব্যাপিয়া যখন আছ সর্ব্বস্থান।
তুমি কৃত কৃত্য, কর্ত্তা, ভোক্তা, নিত্য,
করিহে তোমায় আমি নমস্কার।
তোমাতে আমাতে জলতরঙ্গেতে
শব্দমাত্র ভেদ, হই একাকার।
অনন্ত রূপেতে নিয়তি-সাথে
বিচিত্র বিলাসে করহে বিহার,
হে দেব! তোমায় সর্ব্ব-ভাবময়
দ্রষ্টা স্রষ্টা জানি করি নমস্কার।

(২)

মৃন্ময়, পাষাণ তরুতে নির্ম্মাণ,
এই বিশ্বে যাঁর(ই) সত্তা-মাত্র রয়,
দর্শন-ক্রিয়াতে সর্ব্বদা আঁখিতে
যাঁহারি কেবল অবস্থান হয়,
কেন তবে লোকে না পায় তাঁহাকে
আত্মরূপী দেবে-দেখিতে হায়।

(৩)

স্পর্শ-রূপে যিনি ব্যাপিয়া আপনি
আছেন সমস্ত ত্বকের ভিতর,
কি নিমিত্ত তাঁকে অনুভবে লোকে
পারে না জানিতে সেই বিশ্বম্ভর?
যিনি আত্মারূপে অন্তর্হৃদয়ে
করেন [illegible] জীবের কাজ,
কেন হায়! [illegible] অজ্ঞান মানবে
ওহে লোকনাথ! তুমিহে
আত্ম-দৃষ্টি যোগে হ'য়েছ মন্ময়,
আমিও তেমতি বিমল দৃষ্টিতে
তব প্রসাদাৎ হ'য়েছি ত্বন্ময়।
তোমাতে আমাতে হ'য়েছি হে এক,
তুমি আমি শব্দ ভেদ নাহি আর,
নিরাকার তুমি, নিরাকার আমি,
তোমাকে আমাকে করি নমস্কার।

(৪)

পুষ্পেতে সৌগন্ধ, তিলে তৈল সম
যেমন, ব্রহ্মণ্! রহ যেথা সেথা;
তুমি প্রকাশিছ, তুমিই নাশিছ,
অভয় দিতেছ, নাহিক অন্যথা।
তোমার চরিত্র অতি যে বিচিত্র,
হইলেও তুমি পরমাণু-কায়,
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড দেখিতে প্রকাণ্ড
তোমার অন্তরে চিরকাল রয়।

(৫)

এই দেহ মোর পুষ্পস্বরূপ
হও তুমি দেব সৌরভ তার।
চন্দ্রস্বরূপ,
তুমিহে অমৃত তার।
এই দেহ মোর বিটপস্বরূপ,
তুমিই হ'তেছ রস হে তার।
এই দেহ মোর হিম-স্বরূপ
তুমিই শৈত্য হও হে তার।
তুমিই তেজ, তেজের প্রকাশ,
পবনের স্পন্দ, বহ্নির বিকাশ।
তুমিই সকল রসের আধার,
লীলাময় দেব! করি নমস্কার।

(৬)

দেব!
নাহি মূর্ত্তি তব,
তথাপি আপনি
অনন্ত মূর্ত্তির তুমি।
গাত্র স্পর্শ উভয় স্বরূপ;

প্রমাণের অতীত যে তুমি,
তথাপি প্রামাণ্য হও নাথ!
হইলেও জাত, অজাত তোমারে কয়;
অভাবেও হও তুমি সর্ব্বভাবময়।

জন্ম, মৃত্যু, বিপদ, সম্পদ,
ভাবাভাব নাহি হে আমার;—
নির্ব্বাণের পদে আজি প্রতিষ্ঠিত আমি।
কবি দেব! তব পদে শত নমস্কার,
নমস্কার লও বিভো! আত্ম-নমস্কার।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

রামচন্দ্র এবং সীতা দেবীর বয়স।

আমার একটী প্রশ্নের সমাধান জন্য আমরা "সাহিত্য-সভার" দ্বারস্থ হইতেছি। আমাদের বিনীত প্রার্থনা যে, "সাহিত্য-সভার" কোন বিদ্বান সভ্য কৃপাপরবশ হইয়া এই প্রশ্নের সমাধান করিয়া আমাদিগকে বাধিত করিবেন।

আমার জ্যেষ্ঠ পুত্রটী উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতেছে। বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীদিগের যে সংস্কৃত-পাঠ্য-পুস্তক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে বাল্মীকি রামায়ণ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত [illegible]। আমার পুত্র ঐ পুস্তক হইতে [illegible] প্রস্তাব পাঠ করিতেছিল। পাঠ করিতে করিতে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "সীতার কি ষষ্ঠবৎসর বয়সে বিবাহ হইয়াছিল?" তাহার প্রশ্নের কারণ পুস্তকে আছে—

"রাবণেন তু বৈদেহী তদা পৃষ্টা জিহীর্ষুণা।
পরিব্রাজকরূপেণ শশংসাত্মানমাত্মনা ॥১॥
ব্রাহ্মণশ্চাতিথিশ্চৈষ অনুক্তো হি শপেত মাম্।
ইতি ধ্যাত্বা মুহূর্ত্তন্তু সীতা বচনমব্রবীৎ ॥২॥
দুহিতা জনকস্যাহং মৈথিলস্য মহাত্মনঃ।
সীতা নাম্নাস্মি ভদ্রং তে রামস্য মহিষী প্রিয়া ॥৩
উষিত্বা দ্বাদশ সমা ইক্ষ্বাকূণাং নিবেশনে।
ভুঞ্জানা মানুষান্ ভোগান্ সর্ব্বকামসমৃদ্ধিনী ॥৪॥
তত্র ত্রয়োদশে বর্ষে রাজামন্ত্রয়ত প্রভুঃ।
অভিষেচয়িতুং রামং সমেতো রাজমন্ত্রিভিঃ ॥৫
তস্মিন্ সম্ভ্রিয়মাণে তু রাঘবস্যাভিষেচনে।
কৈকেয়ী নাম ভর্ত্তারং মমার্য্যা যাচতে
বরম্ ॥৬॥
পরিগৃহ্য তু কৈকেয়ী শ্বশুরং সুকৃতেন মে।
মম প্রব্রাজনং ভর্ত্তুর্ভরতস্যাভিষেচনম্।
দ্বাবযাচত ভর্ত্তারং সত্যসন্ধং নৃপোত্তমম্ ॥৭॥
নাদ্য ভোক্ষ্যে ন চ স্বপ্স্যে ন পাস্যে চ কদাচন।
এষ মে জীবিতস্যান্তো রামো যদ্যভিষিচ্যতে ॥৮॥
ইতি ব্রুবাণাং কৈকেয়ীং শ্বশুরো মে স
পার্থিবঃ।
অযাচতার্থৈরন্বর্থৈ র্ন চ যাচ্ঞাং চকার সা ॥৯॥
মম ভর্ত্তা মহাতেজা বয়সা পঞ্চবিংশকঃ।
অষ্টাদশ হি বর্ষাণি মম জন্মনি
গণ্যতে ॥১০॥"

প্রবেশিকা, ২য় ভাগ, ১২০ পৃষ্ঠা অথবা রামায়ণ, অরণ্যকাণ্ড, ৪৭ সর্গ।

এস্থলে সীতা, রাবণের নিকট পরিচয় দিতেছেন। বলিতেছেন "আমার স্বামীর বয়স পঞ্চবিংশ বৎসর আমার বয়স অষ্টাদশ বৎসর।" এখন বয়স কোন্ সময়ের? যে সময়ে সীতাদেবী রাবণের নিকট নিজ পরিচয় দিতেছেন, সে সময়ের বয়স হইতে পারে না। উক্ত বাক্যাংশের চতুর্থ শ্লোকে সীতা বলিয়াছেন যে, তিনি বিবাহের পর

দ্বাদশ বৎসর ইক্ষ্বাকু রাজান্তঃপুরে বাস করিবার পর ত্রয়োদশ বর্ষে রামের বনবাস ঘটে। সকলেই অবগত আছেন যে চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাস সময়ের শেষভাগে অর্থাৎ ত্রয়োদশ বৎসরের শেষে "সীতাহরণ" হয়। সুতরাং রামসীতায় বিবাহের সময়ের পর হইতে এই কথোপকথনের সময় পর্য্যন্ত ন্যূনাধিক ষড়্‌বিংশ বৎসর অতীত হইয়াছে। তাই অর্থ-পুস্তক-প্রণেতা বলিয়াছেন—"কৈকেয্যাঃ বর-প্রার্থনা সময়ে মৎপতি পঞ্চবিংশতি বৎসর বয়স্কঃ আসীৎ। অহমপি অষ্টাদশবর্ষবয়স্কা আসম্"। এই উক্তি হইতেই আমার পুত্র জিজ্ঞাসা করিতেছিল, তাহা হইলে বিবাহ সময়ে সীতা দেবীর বয়স ৫।৬ বৎসর ও রামচন্দ্রের বয়স ১২।১৩ বৎসর হইবে ত?

বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকে এরূপ সন্দেহসঙ্কুল বাক্য থাকা উচিত কি না তাহা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ বিবেচনা করিবেন। আমাদের নিজের বিশ্বাস যে, সীতাদেবীর বিবাহ অত অল্পবয়সে হয় নাই এবং উল্লিখিত বাক্যে যে বয়সের কথা বলা হইয়াছে, তাহা তাঁহাদের বিবাহের সময়ের বয়স বলিয়া মনে হয়, কিন্তু এরূপ মনে করিবার অনুকূলে কি যুক্তি আছে? যাহা হউক, আমরা এই প্রশ্নের সদুত্তর দিতে অক্ষম হইয়া স্থানীয় দুই চারি জন পণ্ডিত ব্যক্তিকে (দেশী টোলে এবং ইংরাজী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষিত উভয় প্রকার) এই প্রশ্নের বিষয় জিজ্ঞাসা করি, কিন্তু কোন সন্তোষজনক উত্তর পাইলাম না। আমাদের নিকট ভাল টীকা সহিত উত্তম সংস্করণের পুস্তকও নাই, অতএব গত্যন্তর বিরহিত হইয়া "সাহিত্য-সভার" শরণাপন্ন হইলাম। এ সন্দেহের ভঞ্জন হইলে প্রবেশিকাপাঠী [illegible]ক ছাত্র এবং ঐ পুস্তকের অধ্যাপক [illegible] শিক্ষকেরা মহদুপকার সাধিত হই[illegible]।

যৌবনারম্ভের পূর্ব্বে যে সীতা দে[illegible] বিবাহ হয় নাই এই মতের অনুকূল যুক্তি অনুসন্ধান করিতে গিয়া, আমরা যাহা পাইয়াছি তাহাও নিবেদন করিতেছি। আমাদের ভ্রম ভ্রান্তি থাকিলে তাহারও সংশোধনের প্রার্থনা করি।

রামায়ণের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে সীতা-স্বয়ম্বরের বিষয় কথিত হইয়াছে। অযোধ্যাকাণ্ডের ১১৮শ সর্গে সীতা-অনসূয়া-সংবাদ প্রস্তাবে অত্রিপত্নী অনসূয়ার সহিত সীতার নিম্নলিখিত কথোপকথন দেখিতে পাওয়া যায়:*—

অনসূয়া। "স্বয়ম্বরে কিলপ্রাপ্তা ত্বমনেন যশস্বিনা।
রাঘবেণেতি মে সীতে কথা শ্রুতি মুপাগতা ॥২৪॥
তাং কথাং শ্রোতুমিচ্ছামি বিস্তরেণ চ মৈথিলি।
যথাভূতঞ্চ কাৎস্নেন তন্মে ত্বং বক্তুমর্হসি ॥২৫॥
সী[illegible] [illegible]পতির্বীরো জনকো নাম ধর্ম্মবিৎ।
ক্ষত্রকর্ম্মণ্যভিরতো ন্যায়তঃ শাস্তি মেদিনীম্ ॥২৭॥
তস্য লাঙ্গল-হস্তস্য কৃষতঃ ক্ষেত্র-মণ্ডলম্।
অহং কিলোত্থিতা ভিত্ত্বা জগতীং নৃপতেঃ সুতা ॥২৮॥
স মাং দৃষ্ট্বা নরপতির্মুষ্টি বিক্ষেপতৎপরঃ।
পাংশুগুণ্ঠিত সর্ব্বাঙ্গীং বিস্মিতো জনকোহভবৎ ॥২৯॥
অনপত্যেন চ স্নেহাদঙ্কমারোপ্য চ স্বয়ম্।

* প্রবেশিকা পুস্তকে সীতানসূয়া-সংবাদ প্রস্তাবের কিয়দংশ লওয়া হইয়াছে, উহাতে এই ১১৮শ সর্গের ২২শ শ্লোক পর্য্যন্ত আছে, অবশিষ্টাংশ, যাহা আমাদের আলোচনীয়, সেই অংশ গৃহীত হয় নাই।

...ইয়ং জনয়েত্থাৎ সুতা মেহো যদি নিপা-
তিতঃ ॥৩০॥
অন্তরিক্ষে চ বা গুক্ত প্রতিমামানুষী কিল।
এবমেতন্নরপতে ধর্ম্মণ তনয়া তব ॥৩১॥
ততঃ প্রহৃষ্টো ধর্ম্মাত্মা পিতা মে মিথিলাধিপঃ।
অবাপ্তো বিপুলাবৃদ্ধিং মামবাপ্য নরাধিপঃ
॥৩২॥
দত্তা চাস্মীষ্টবদ্দেব্যৈ জ্যেষ্ঠায়ৈ পুণ্যকর্ম্মণে।
তয়া সম্ভাবিতা চাস্মি স্নিগ্ধয়া মাতৃ-
সৌহৃদাৎ ॥৩৩॥
পতিসংযোগসুলভং বয়ো
দৃষ্ট্বা তু মে পিতা।
চিন্তামভ্যগমদ্দীনো বিত্তনাশাদিবাধনঃ ॥৩৪॥
সদৃশাচ্চাপকৃষ্টাচ্চ লোকে কন্যা পিতা জনাৎ।
প্রধর্ষণবাপ্নোতি শক্রেনাপি সমো ভুবি ॥৩৫॥
তাং ধর্ষণামদূরস্থাং সংদৃশ্যাত্মনি পার্থিবঃ।
চিন্তার্ণবগতঃ পারং নাসসাদাপ্লবো যথা ॥৩৬॥
অযোনিজাং হি মাং জ্ঞাত্বা নাধ্যগচ্ছৎ স চিন্ত-
য়ন্।
সদৃশঞ্চাভিরূপঞ্চ মহীপালঃ পতিং মম ॥৩৭॥*
তস্য বুদ্ধিরিয়ং জাতা চিন্তয়ানস্য সন্ততম্।
স্বয়ংবরং তনুজায়াঃ ...
করামীতি ধর্ম্মতঃ ॥৩৮॥
মহাযজ্ঞে তদা তস্য বরুণেন মহাত্মনা।
দত্তং ধনুর্বরং প্রীত্যা তূণী চাক্ষয়্যসায়কৌ
॥৩৯॥
অসঞ্চাল্যং মনুষ্যৈশ্চ যত্নেনাপি চ গৌরবাৎ।
তন্ন শক্তা নময়িতুং স্বপ্নেষ্বপি নরাধিপাঃ
॥৪০॥
তদ্ধনুঃ প্রাপ্য মে পিত্রা ব্যাহৃতং সত্য-
বাদিনা।
সমবায়ে নরেন্দ্রাণাং পূর্ব্বমামন্ত্র্য পার্থিবান্
॥৪১॥

ইদং চ ধনুরুদ্যম্য সজ্যং যঃ কুরুতে নরঃ।
তস্য মে দুহিতা ভার্য্যা ভবিষ্যতি ন সংশয়
॥৪২॥
তচ্চ দৃষ্ট্বা ধনুঃ শ্রেষ্ঠং গৌরবাদ্ গিরিসন্নিভম্।
অভিবাদ্য নরা জগ্মুরশক্তাস্তস্য তোলনে ॥৪৩॥
সুদীর্ঘস্য তু কালস্য রাঘবোঽয়ং
মহাদ্যুতিঃ।
বিশ্বামিত্রেণ সহিতো যজ্ঞং দ্রষ্টুং সমাগতঃ।
লক্ষ্মণেন সহ ভ্রাত্রা রাম সত্যপরাক্রমঃ ॥৪৪॥
ইত্যাদি।

এই বাক্যাংশ হইতে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে (১) সীতার "পতিসংযোগ-সুলভ" বয়স দেখিয়া জনক, কন্যার বিবাহের জন্য চিন্তিত হইয়া বরা ন্বেষণ করিতে লাগিলেন কিন্তু কন্যার অনুরূপ বর পাইলেন না। তখন তিনি (২) স্বয়ংবর করিতে ইচ্ছুক হইয়া বরুণদত্ত ধনুতে গুণ সংযোজন রূপ পণ রাখিয়া সীতার স্বয়ংবর-বার্ত্তা-বিঘোষিত করিলেন এবং বিবাহার্থী অনেক নরপতি আসিয়া ধনুতে গুণ দেওয়া দূরে থাকুক, তুলিতেও না পারিয়া প্রস্থান করিতে লাগিলেন এবং (৩) "সুদীর্ঘকাল" অতীত হইলে বিশ্বামিত্র মুনির সহিত সলক্ষ্মণ রামচন্দ্র যজ্ঞ-দর্শনে জনক-গৃহে আগমন করিলেন এবং তিনি ধনুর্ভঙ্গ করতঃ সীতাকে লাভ করিলেন।

আদিকাণ্ডের ষট্‌ষষ্টিতমসর্গে রাজা জনক বিশ্বামিত্রের নিকট ধনুর্ভঙ্গণের সম্বন্ধে বলিতেছেন,—

"দেবরাতো ইতি খ্যাতো নিমের্জ্যেষ্ঠো
মহীপতিঃ।
ন্যাসোঽয়ং তস্য ভগবান্ হস্তে দত্তো
মহাত্মনঃ ॥ ৮ ॥

* * * *

তদেতদ্দেবদেবস্য ধনুরত্নং মহাত্মনঃ ॥ ১২ ॥
ন্যাসভূতং তদা ন্যস্তমস্মাকং পূর্ব্বজে বিভো।

* "মহীপাল চিন্তা করতঃ আমাকে অযোনিসম্ভবা জানিয়া আমার কুলশীলাদি ও সৌন্দর্য্য প্রভৃতির অনুরূপ বর পাইলেন না।" পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন কৃত অনুবাদ।

অথ মে কৃষতঃ ক্ষেত্রং লাঙ্গলাদুত্থিতা-
ততঃ ॥ ১৩ ॥
ক্ষেত্রং শোধয়তা লব্ধা নাম্না সীতেতি বিশ্রুতা।
ভূতলাদুত্থিতা সা তু ব্যবর্দ্ধত মমাত্মজা ॥ ১৪ ॥
বীর্য্যশুল্কেতি মে কন্যা স্থাপিতেয়মযোনিজা।
ভূতলাদুত্থিতাং তাং তু বর্দ্ধমানাং
মমাত্মজাম্ ॥ ১৫ ॥
বরয়ামাসুরাগত্য রাজানো মুনিপুঙ্গব।
তেষাং বরয়তাং কন্যাং সর্ব্বেষাং
পৃথিবীক্ষিতাম্ ॥ ১৬ ॥
বীর্য্যশুল্কেতি ভগবন্ন দদামি সুতামহম্
ততঃ সর্ব্বে নৃপতয়ঃ সমেত্য মুনিপুঙ্গব ॥ ১৬ ॥
মিথিলামভ্যুপাগম্য বীর্য্যং জিজ্ঞাসবস্তদা।
তেষাং জিজ্ঞাসমানানাং শৈবং ধনুরুপাহৃতম্
॥ ১৮ ॥
ন শেকুর্গ্রহণে তস্য ধনুষস্তোলনেঽপি বা।
তেষাং বীর্য্যবতাং বীর্য্যমল্পং জ্ঞাত্বা মহামুনে
॥ ১৯ ॥
প্রত্যাখ্যাতা নৃপতয়স্তন্নিবোধ তপোধন।
ততঃ পরমকোপেন রাজানো মুনিপুঙ্গব ॥ ২০ ॥
অরুন্ধন্ মিথিলাং সর্ব্বে বীর্য্য সন্দেহমাগতাঃ।
আত্মানমবধূতং মে বিজ্ঞায় নৃপপুঙ্গবাঃ ॥ ২১ ॥
রোষেণ মহতাবিষ্টাঃ পীড়য়ন্ মিথিলাং পুরীম্।
ততঃ সংবৎসরে পূর্ণে ক্ষয়ং যাতানি সর্ব্বশঃ
॥ ২২ ॥
সাধনানি মুনিশ্রেষ্ঠ ততোঽহং ভৃশদুঃখিতঃ।
ততো দেবগণান্ সর্ব্বাংস্তপসাহং প্রসাদয়ম্
॥ ২৩ ॥
দদুশ্চ পরমপ্রীতাশ্চতুরঙ্গবলং সুরাঃ।
ততো ভগ্না নৃপতয়ো হন্যমানা দিশো যযুঃ
॥ ২৪ ॥
অবীর্য্যা বীর্য্যসন্দিগ্ধাঃ সামাত্যাঃ পাপকারিণঃ
ইত্যাদি।

এবং [illegible] আদিকাণ্ডে একসপ্ততমসর্গে
উক্ত প্রসঙ্গে [illegible]জনকবাক্য,—
[illegible] [illegible] রাজো ধর্ম্মাত্মা মহাবলঃ।
জ্যেষ্ঠোঽহমনুজো ভ্রাতা মম বীরঃ কুশধ্বজঃ
॥ ১৩ ॥
মাস্তু জ্যেষ্ঠং পিতা রাজ্যে সোঽভিষিচ্য পিতা
মম।
কুশধ্বজং সমাবেশ্য ভারং ময়ি বনং গতঃ
॥ ১৪ ॥
বৃদ্ধে পিতরি স্বর্যাতে ধর্ম্মেণ ধুরমাবহম্।
ভ্রাতরং দেবসঙ্কাশং স্নেহাৎ পশ্যন্ কুশধ্বজম্
॥ ১৫ ॥
কস্যচিত্ত্বথ কালস্য সাঙ্কাশ্যাদাগতঃ পুরাৎ।
সুধন্বা বীর্য্যবান্ রাজা মিথিলামবরোধকঃ
॥ ১৬ ॥
স চ মে প্রেষয়ামাস শৈবং ধনুরনুত্তমম্।
সীতা চ কন্যা পদ্মাক্ষী মহ্যং বৈ দীয়তামিতি
॥ ১৭ ॥
তস্যাপ্রদানাদ্ ব্রহ্মর্ষে যুদ্ধমাসীন্ময়া সহ।
স হতো বিমুখো রাজা সুধন্বা তু ময়া রণে
॥ ১৮ ॥
নিহত্য তং মুনিশ্রেষ্ঠ সুধন্বানং নরাধিপম্।
সাঙ্কাশ্যে ভ্রাতরং শূরমভ্যষিঞ্চৎ কুশধ্বজম্
॥ ১৯ ॥

[illegible] বাক্যাংশ হইতে পাওয়া [illegible] (১) জনক, সীতার বিবাহ নিমিত্ত বীর্য্যশুল্করূপ পণ স্থির করিয়াছিলেন।* (২) রাজগণ সীতার বিবাহার্থী হইয়া আগমন করিলে † জনক বলেন যে বীর্য্য-

---

* সীতাবাক্যে এবং জনকবাক্যে ধনুঃপ্রাপ্তি সম্বন্ধে মতদ্বৈধ ঘটিয়াছে, সীতা বলিয়াছেন, বরুণদেব জনককে দিয়াছিলেন, কিন্তু জনক বলিতেছেন যে স্বয়ং মহাদেব জনকের পূর্ব্বপুরুষ দেবরাত নৃপতির নিকট ন্যাসরূপে রাখিয়াছিলেন। যাহা হউক, এই মতদ্বৈধ আমাদের প্রস্তাবের অনুকূল অথবা প্রতিকূল নহে।

† পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় অনুবাদ করিয়াছেন "মুনিপুঙ্গব, পরে ভূতল হইতে উত্থিতা আমার সেই কন্যা যৌবনসম্পন্না হইলে, অনেক রাজা আসিয়া তাহার পাণি প্রার্থনা করিলে, বীর্য্যশুল্কা বলিয়া আমি তাঁহাদিগকে আমার কন্যা প্রদান করি নাই।" ১৫—১৭ শ্লোকের অনুবাদ, ৬৬ সর্গ।

[illegible]কন্যাকে বীর্য্যশুল্কা ভিন্ন অন্য নি বিবাহ দিবেন না, (৩) রাজগণ শৈবধনু তুলিতে অপারগ হইলেন এবং প্রত্যাখ্যাত হইলেন এবং তদ্ধেতু তাঁহারা অবমানিত বোধে ক্রুদ্ধ হইয়া মিথিলা অবরোধ করিলেন এবং সংবৎসর কাল অবরোধজনিত যুদ্ধে যুদ্ধোপকরণ সমূহ ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে তপস্যা দ্বারা তিনি দেবতাদের প্রসাদ সাধন করতঃ চতুরঙ্গ সৈন্য প্রাপ্ত হইলেন এবং তদ্দ্বারা অবরোধকারী নরপতিদিগকে পরাস্ত করিলে তাঁহারা পলায়ন করিলেন এবং (৪) সাংকাশ্যানগরাধিপতি সুধন্বাও সীতালাভে অকৃতকার্য্য হইয়া মিথিলা অবরোধ করেন কিন্তু জনক কর্ত্তৃক যুদ্ধে পরাস্ত ও নিহত হন এবং জনক তাঁহার রাজ্য-গ্রহণ করতঃ স্বীয় কনিষ্ঠ কুশধ্বজকে ঐ রাজ্য প্রদান করেন।

যেরূপ ভাবে এই কথাগুলি বলা হইয়াছে, তাহাতে এই সকল ঘটনা অনেকদিন পূর্ব্বেই ঘটিয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। সীতা-দেবী অনুসূয়ার নিকট [illegible] য়াছেন, তাহাতেও দেখা যায় [illegible] সীতালাভে বিফলমনোরথ হইয়া যাওয়ায় সুদীর্ঘ কাল পরে রাম, জনক-গৃহে আগমন করেন। সীতার ও জনকের বাক্য একত্র করিয়া পাঠ করিলে দেখিতে যায় যে সীতা পতিসংযোগসুলভ বয়স প্রাপ্ত হইবার পর তাঁহার পিতা তাঁহার বিবাহ দিবার নিমিত্ত সচেষ্ট হন এবং তাঁহার কন্যার কুলশীল ও সৌন্দর্য্যের অনুরূপ বর না পাইয়া ধনুর্ভঙ্গরূপ পণ বা বীর্য্যশুল্ক স্থাপন করতঃ স্বীয় কন্যার স্বয়ংবর ঘোষণা করেন এবং ভারতের বহু প্রদেশের বহু নরপতি সীতাদেবীর অনুপম রূপলাবণ্য[illegible] মুগ্ধ হইয়া তাঁহার পাণিগ্রহণার্থ মিথিলায় আগমন করেন কিন্তু নির্দ্দিষ্ট শুল্কতায় ধনু তুলিতে অসমর্থ হন সুতরাং জনক তাঁহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করেন। তাঁহারা কিন্তু আপনাদিগকে অবমানিত জ্ঞান করতঃ ক্রুদ্ধ হইয়া মিথিলা অবরোধ করেন এবং সংবৎসর যুদ্ধে জনকরাজার সম্পূর্ণ বলক্ষয় ঘটে। তিনি তাহার পর কোন উপায়ে বলসঞ্চয় করিয়া মিথিলাকে অবরোধ হইতে মুক্ত করেন এবং অবরোধকারী রাজগণ পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন। তাঁহাদিগের মধ্যে সাংকাশ্যাধিপতি মহারাজ সুধন্বা যুদ্ধে নিহত হইলে জনক তাঁহার রাজ্য annex করিয়া নিজভ্রাতা কুশধ্বজকে তথাকার রাজ্যে অভিষিক্ত করেন। এই ঘটনার অনেক দিন পরে রামচন্দ্র ভ্রাতার সহিত মিথিলায় আগমন করিলে জনকের ধনুর্ভঙ্গপণ রক্ষা হয় এবং রাম সীতার পরিণয় ঘটে।

এস্থলে বিচার করিয়া স্থির করিতে হইবে (১) "পতিসংযোগসুলভ বয়স" অর্থ কি? (২) সাধারণতঃ রাজকন্যাদিগের স্বয়ংবর কত বয়সে হইত?

সোজাসুজি "পতিসংযোগসুলভ বয়স" অর্থে পতিসহবাসোপযোগী বয়স। কিন্তু আমার মাননীয় কোন পণ্ডিত মহাশয় বলিয়াছেন, "পতিসংযোগসুলভ বয়স" অর্থে বিবাহোপযুক্ত বয়স। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে আমাদের প্রথম ও দ্বিতীয় প্রশ্নের—সমাধান একত্র করিলেই হইবে—অর্থাৎ সেকালে রাজকন্যাদিগের বিবাহের বয়স কত ছিল?

রামায়ণ, মহাভারত এবং পুরাণে যতগুলি রাজকন্যার বিবাহ বর্ণিত হইয়াছে, তাহার একটীতেও "অষ্টবর্ষা গৌরী", "নববর্ষা রোহিণী" কি "দশবর্ষা[illegible]কন্যা"র বিবাহ হওয়া দেখা যায় না। [illegible]সাবিত্রী, দময়ন্তী, দ্রৌপদী, উত্তরা, [illegible] সুভদ্রা,—ক[illegible]

নাম করিব?—রাজকন্যাগণ সকলেই যৌবনবতী হইবার পর পাত্রস্থা হইয়াছিলেন। বিবাহের যে সকল বৈদিক মন্ত্র দেখা যায়, এবং বিবাহের পর একবর্ষ, ষন্মাস, ত্রিমাস, একমাস এবং নিতান্ত পক্ষে ত্রিরাত্র ও ব্রহ্মচর্য্য পালনের জন্য শাস্ত্রের যে ব্যবস্থা দেখা যায়, তাহাতে গর্ভাষ্টমী নগ্নিকা (প্রকৃত অর্থে) কন্যার বিবাহে ঐ সকল বিধি নিতান্তই নিষ্ফল বলিয়া বোধ হয়। আর্য্য বৈদ্যক শাস্ত্রেও দেখা যায়,—

"পঞ্চবিংশে ততো বর্ষে পুমান্ নারীতু ষোড়শে
সমত্বাগতবীর্য্যৌ তৌ জানীয়াৎ কুশলো ভিষক্॥
ঊনষোড়শ বর্ষায়া অপ্রাপ্তঃ পঞ্চবিংশতিম্।
যদ্যাধত্তে পুমান্ গর্ভং কুক্ষিস্থঃ স বিপদ্যতে॥
জাতো বা ন চিরং জীবেৎ জীবেদ্বা
দুর্ব্বলেন্দ্রিয়ঃ।
তস্মাদত্যন্তবালায়াং গর্ভাধানং ন কারয়েৎ॥"
সুশ্রুত-সূত্রস্থান।

ইহাতেও স্পষ্ট দেখা যায় যে ষোড়শ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে নারী "পতিসংযোগ-সুলভ বয়স প্রাপ্ত হন না। মহর্ষি মনুমহারাজের বিধি—

"ত্রীণিবর্ষাণ্যুদীক্ষেত কুমার্য্যৃতুমতী সতী।
ঊর্দ্ধন্তুকালাদেতস্মাদ্বিন্দেত সদৃশং পতিম্॥"

অনুসারে ষোড়শবর্ষের নূন্যে স্বয়ংবরের বয়স নির্দ্ধারিত হইতে পারে না। যাহা হউক, বিবাহ সময়ে যে সীতার স্বামিসহবাসোপযোগী বয়স হইয়াছিল তাহা রামায়ণ হইতেই প্রমাণিত হইতেছে। শুধু সীতার নহে,—সীতা, উর্ম্মিলা এবং কুশধ্বজদুহিতা মাণ্ডবী ও শ্রুতকীর্ত্তি চারি ভগিনীই বিবাহ কালে যৌবনদশা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন দেখা যায়। রামলক্ষ্মণাদির বিবাহ পরে তাঁহাদের সস্ত্রীক অযোধ্যা গমনের বর্ণনায় মহর্ষি বাল্মীকি বলিয়াছেন,— [illegible]

"কৌশল্যা চ [illegible] চ কৈকেয়ী চ সুমধ্যমা।
বধূপ্রতিগ্রহেযুক্তা যাশ্চান্যা রাজযোষিতঃ॥
ততঃ সীতাং মহাভাগামূর্ম্মিলাঞ্চ যশস্বিনীম্।
কুশধ্বজসুতে চোভে জগৃহুর্নৃপযোষিতঃ॥১১॥
মঙ্গলালাপনৈর্হোমৈঃ শোভিতাঃ ক্ষৌমবাসসঃ
দেবতায়তনান্যাশু সর্ব্বাস্তাঃ প্রত্যপূজয়ন্॥১২॥
অভিবাদ্যাভিবাদ্যাংশ্চ সর্ব্বা রাজসুতাস্তদা।
রেমিরে মুদিতাঃ সর্ব্বা ভর্ত্তৃভিঃ
সহিতা রহঃ॥১৩॥
৭৭ সর্গ আদিকাণ্ড।

পাঠকগণ দেখিতেছেন যে, রাজসুতাগণ যৌবনস্থা না হইলে তাঁহাদের সম্বন্ধে "রেমিরে মুদিতাঃ সর্ব্বা ভর্ত্তৃভিঃ সহিতা রহঃ" এই বাক্য প্রযুক্ত হইতে পারে না।

এই কবি-বচন হইতে দেখা যায় যে সীতা, উর্ম্মিলা, মাণ্ডবী এবং শ্রুতকীর্ত্তি চারি ভগিনীই বিবাহকালে যৌবনপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সীতা যে উর্ম্মিলা অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠা ছিলেন, তাহার প্রমাণ রামায়ণেই রহিয়াছে। রাজা জনক যখন সীতাকে প্রাপ্ত হন, তখন তিনি অনপত্য ছিলেন*। সুতরাং মাণ্ডবী ও শ্রুতকীর্ত্তিও সীতা অপেক্ষা [illegible] ছিলেন। এরূপ অবস্থায় সীতা "অষ্টাদশ হি বর্ষাণি মম জন্ম ন গণ্যতে" বাক্য তাঁহার বিবাহ সময়ের বয়স সম্বন্ধেই বলিতেছেন, সন্দেহ নাই।

আমরা এইরূপে প্রাগুক্ত প্রশ্নের সমাধান করিবার চেষ্টা করিলাম বটে কিন্তু একটা খট্‌কা রহিয়া গেল। সীতা বলিয়াছেন "মম ভর্ত্তা মহাতেজা বয়সা পঞ্চবিংশকঃ"—সুতরাং আমাদের গৃহীত অর্থ হইবে, বিবাহ সময়ে রামের বয়স পঞ্চবিংশতি বৎসর ছিল।

---

* অনপত্যেন চ স্নেহাদঙ্কমারোপ্য চ স্বয়ং।
মমেয়ং তনয়েত্যুক্তা স্নেহো ময়ি নিপাতিতঃ॥৩০॥
১১৮ সর্গ, অযোধ্যাকাণ্ড। সীতানসূয়াসংবাদে পূর্ব্বেই উদ্ধৃত।

ক্রমতঃ আদিকাণ্ডে মহর্ষি বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রকে তাড়কাবধার্থ লইতে আসিলে মহারাজ দশরথ অতিশয় কাতর হইয়া বলিয়াছিলেন—

"ঊনষোড়শবর্ষো মে রামো রাজীবলোচনঃ।
ন যুদ্ধযোগ্যতামস্য পশ্যামি সহ রাক্ষসৈঃ ॥২॥" ২০শ সর্গ, আদিকাণ্ড।

ঐই "ঊনষোড়শবর্ষ" শব্দের অনেকে "পঞ্চদশ" অর্থ করিয়াছেন, এবং সেই অর্থ যে না হয়, এমত নহে। যদি এই সময়ে রামের প্রকৃত পক্ষে পঞ্চদশ বৎসর বয়স হয় তাহা হইলে বিবাহের সময় তাহার সেই বয়স ছিল, পঞ্চবিংশতি বৎসর কদাপি হইতে পারে না। আমাদের বিবেচনায় পুত্রগত প্রাণ দশরথ, পুত্রের অমঙ্গল আশঙ্কায় বিহ্বল হইয়াছিলেন এবং যাহাতে বিশ্বামিত্র রাক্ষসবধের নিমিত্ত রামকে লইয়া না যান, তজ্জন্যেই বলিয়াছেন "আহা, আমার রাম এখনও ষোল বৎসরেরও হয় নাই, সে কি রাক্ষসদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার যোগ্য ?" দশরথ ইহার পর অনেক কাঁদাকাটী করিয়াছেন, কিন্তু কিছুতেই [illegible] মুনি ভিজিল না, তিনি রাম-লক্ষ্মণকে লইয়া গেলেন। রাম-লক্ষ্মণ কোথায়ও বালকোচিত ব্যবহার করেন নাই। মারীচ এবং সুবাহু প্রভৃতি রাক্ষসদিগের সহিত সংগ্রামে, ধনুর্ভঙ্গে, মহাদুর্দ্ধর্ষ পরশুরামের সহিত ব্যবহারে,—সর্বত্রই তাঁহাদের বীরশ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয়-যুবকের বুদ্ধিমত্তা এবং বাহুবলের পরিচয় দিয়াছেন। আর বিশ্বামিত্র যে সময়ে রামলক্ষ্মণকে লইবার নিমিত্ত রাজা দশরথের সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, সেই সময়ে রাজা নিজ পুত্রচতুষ্টয়ের বিবাহের কথা পাড়িতেছিলেন। ঐ স্থানেরই কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে উক্ত আছে যে দশরথের পুত্রচতুষ্টয়ের সাঙ্গোপাঙ্গ চতুর্বেদে ও ধনুর্বিদ্যায় বিদ্বান, সর্ব্বজ্ঞানে জ্ঞানী এবং অলোকসামান্য বীর হইয়াছিলেন। যাঁহারা আর্য্য ধর্মশাস্ত্রের সহিত সামান্যরূপেও পরিচিত, তাঁহারা জানেন যে বৈদিক সময়ের ও তাহার পর সময়ের সমাজে পুরুষের পক্ষে বিবাহের নিম্নতম বয়স ছিল চতুর্বিংশতি। চতুর্বিংশতি বৎসরের পূর্ব্বে কোন ক্ষত্রিয়—শুধু ক্ষত্রিয় কেন,—কোন দ্বিজ-যুবকেরও বিবাহ হইত না।

সাঙ্গোপাঙ্গ বেদাধ্যয়ন, ধনুর্বিদ্যা, চতুঃষষ্টি কলাবিদ্যা আয়ত্ত না করিলে ক্ষত্রিয় যুবকের শিক্ষা সম্পূর্ণ হইত না এবং শিক্ষা সম্পূর্ণ না হইলে বিবাহের নিয়ম ছিল না। সকল দিক বিবেচনা করিলে স্পষ্টই অনুভূত হয় যে, রামচন্দ্র প্রকৃতই পঞ্চবিংশতি বৎসর বয়স্ক ছিলেন, রাজা দশরথ কেবল অতি-স্নেহবশে নিজ পুত্রের অল্প বয়স অনুভব করিয়াছিলেন। এরূপ ভ্রম যে স্বাভাবিক, তাহাও অনেকস্থলে দেখা যায়।

আমাদের ধারণা যে সীতার উক্তি "মম-ভর্ত্তা ইত্যাদি" হইতে তাঁহাদিগের বিবাহ-সময়ের বয়স সূচিত হইতেছে। পুনশ্চ সাহুনয়ে নিবেদন এতদ্বিষয়ে "সাহিত্য-ভার" কোন বিদ্বান সভ্য আমাদের ধারণায় ভ্রান্তি নিরসন করিয়া এই প্রশ্নের একটী সুমীমাংসা করিবেন।*

শ্রীসত্যবন্ধু দাস।

---

*আমরা অন্য এক উপায়েও রামসীতার বিবাহকালীন বয়স স্থির করিতে পারি;—অথবা স্থির করিতে না পারিলেও তৎসম্বন্ধে একটী ধারণা করা যাইতে পারে। অন্ততঃ প্রাচীনকালের সুশিক্ষিত পণ্ডিতদিগের বক্ষ্যমান প্রস্তাব সম্বন্ধে কিরূপ অভিমত ছিল; তাহা সহজেই নির্দ্ধারিত হইতে পারে। প্রাচীনকালে রামসীতার চরিত্র অবলম্বনে সংস্কৃত ভাষায় অনেকগুলি পুস্তক সংকলিত হইয়াছে। রামায়ণই এ[illegible] আছে। তদ্ব্যতীত অন্যূনখানি পু[illegible] রামসীতার প্রসঙ্গ অল্প বিস্তর আলোচিত হইয়াছে। আর মহাকবি কালিদাস, ভ[illegible], ভবভূতি,

হনুমান (বা হনুমান্) ও রাবণ অবলম্বনে কাব্য এবং নাটকাদি প্রণয়ন করিয়াছেন। কালিদাস প্রণীত "রঘুবংশে" রামসীতার বিবাহ প্রস্তাব অতি সংক্ষেপে লিখিত হইয়াছে। সেইজন্য তাহাতে তাঁহাদের বয়ঃ সম্বন্ধে আলোচনা নাই। কালিদাসের সমসাময়িক মহাকবি মহারাজ কুমারদাস স্বরচিত মহাকাব্য "জানকীহরণে" এই প্রস্তাব অতি বিস্তৃতভাবে দিয়াছেন। বঙ্গদেশে এই কবির নাম সংস্কৃতজ্ঞ মহাশয়দিগের মধ্যে তত প্রচলিত নহে কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইনি একজন মহাকবি। কুমারদাস ৫১৫ খৃষ্টাব্দে সিংহলের সিংহাসনে আরোহণ করিয়া কয়েক বৎসর রাজত্ব করার পর কবি কালিদাসের প্রতি অত্যধিক প্রণয় হেতু উক্ত কবিবরের চিতায় আত্মসমর্পণ করেন। সিংহলদেশীয় "পূজাবলী" এবং "Perakum basinita"নামক পুস্তকে এই আখ্যান পাওয়া যায়। সেই সকল কথা বিস্তৃতভাবে বলিবার স্থান ইহা নহে কিন্তু তাঁহার কবিত্ব সম্বন্ধে কোন প্রসিদ্ধ সমালোচক বলিয়াছেন,

"Kumardasa was one of the greatest admires of Kalida's poetical production. And this is almost literally true when we but compare his Janakiharan with any of the Kavyas of Kalidas, especially his Raghuvansa. His Janakiharan is no doubt a close imitation of Kalidas's great epic to which, we may add, *it is not inferior either in quality or in quantsty.*" এই কবি কুমারদাস প্রণীত মহাকাব্যের সপ্তমসর্গে জানকী যে সময়ে ধনুর্ভঙ্গের পর পিতৃনিদেশানুসারে মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে প্রণাম করিতে তাঁহার নিকটে গিয়াছেন, সেই প্রসঙ্গে নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটি পাওয়া যায়। এই সময় তাঁহার বিবাহ হয় নাই। রাম ধনুর্ভঙ্গের পর মহর্ষি বিশ্বামিত্রের নিকট বসিয়া আছেন জনকী সেই সময়ে মহর্ষিকে প্রণাম করিতে গিয়াছেন। পাঠক দেখুন কবির বর্ণনা,—

"মুখেন [illegible] নম্রভূতশীল—
ভাসানভক্তা [illegible] পাদৌ মহর্ষেঃ।
[illegible]
সমুন্নমায় প্রতিপক্ষ্য হন্তুম্॥" ২॥

সপ্তমসর্গ।

পাঠক ভাবিবেন না, এই একটিমাত্রই শ্লোকে সীতা দেবীর এইরূপ পূর্ণ যৌবনের বর্ণনা আছে। প্রকৃতই যে তাঁহার বয়স অষ্টাদশ অপেক্ষা ন্যূন নহে, তাহার প্রমাণ আরও দেখুন। রাম সীতার রূপ মোহিত হইয়া মনে মনে ভাবিতেছেন,—

"কুচৌ নিতান্তং কৃশবৃত্তিমধ্যাং
মা স্ম ছিদ্যন্তোণিরিতি প্রচিন্ত্য।
গুর্বী তদূরুদ্বয় পাত কোত্ত
স্তম্ভদ্বয়েনেব ধৃতা বিধাত্রা॥ ৮॥
সদত সোম্যং কঠিনং প্রকৃত্যা
তথোপিত আপং স্তনয়োর্দ্বয়ং যৎ।
মধ্যস্থমাপ্যতদনিন্দ্যবৃত্তে—
র্বলিত্রয়ং মা দধতীতি চিত্রম্॥ ৯॥

সপ্তমসর্গ।

পাঠক এই কাব্যের সপ্তম ও অষ্টম সর্গে দেখিবেন কুমারসম্ভবের সপ্তম এবং অষ্টম সর্গের পুনরাবৃত্তি ঘটিয়াছে। অধিক উদ্ধৃত করিবার আবশ্যকতা কি?

মহাকবি ভবভূতি প্রণীত "মহাবীর চরিত" নাটকের দ্বিতীয়াঙ্কে, বিবাহের পর জনকগৃহে ক্রুদ্ধ পরশুরামের সরোষ আহ্বান শুনিয়া অন্তঃপুরস্থিত রামচন্দ্র প্রিয়াপার্শ্ব হইতে উঠিয়া [illegible] দেবী তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে [illegible] হইলে রাম তাঁহাকে নিরস্ত করিতেছেন :—

"প্রিয়ে, সন্ধ্যা সতী নিবর্ত্তস্ব।
আতঙ্ককম্প সাধ্বসবাতিকরোৎকম্পঃ কথং সহতা—
সদৈবমুন্মধুকপুষ্পকচিভির্বিগাসাদৈরময়ম্।
উদ্বন্ধনবৃত্তকুড্মল গুরুখাপাবস্থানস্ত তে
মধ্যস্ত ত্রিবলীতরঙ্গকুসুমো ভঙ্গঃ প্রিয়ে মা ভূৎ॥" ২১॥

এই উক্তি দ্বাদশবর্ষ বয়স্ক বালকের মুখ হইতে আর ষষ্টবৎসর বয়স্কা বালিকার প্রতি প্রযুক্ত হইয়াছে বলিলে মহাকবির অপমান করা হয়। দ্বিতীয়াঙ্কের সম্পূর্ণ অংশেই উভয়ের পূর্ণযৌবনের পূর্ণ পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে।

অন্যান্য পুস্তকগুলি দেখিবার সুবিধা পাই নাই,—বোধ হয় আবশ্যকও নাই।

বাঙ্গালা ভাষা ও উহার অভিধান সম্বন্ধে কয়েকটি কথা।

বাঙ্গালাভাষা এক্ষণে ভারতবর্ষের মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠভাষা বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। এমন কি অনেক পণ্ডিত স্বীকার করিয়াছেন যে, প্রচলিত প্রাদেশিক ভাষাসমূহের মধ্যে বাঙ্গালা ভাষাই সমধিক উন্নতি লাভ করিয়াছে। ডাক ও খনার বচনের ভাষা, চৈতন্যচরিতামৃত, এমন কি কবিকঙ্কণের ভাষা পাঠ করিয়া যাঁহারা মধুসূদন হেম চন্দ্র, নবীনচন্দ্রের ভাষা পড়িবেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই বঙ্গভাষার এই অপূর্ব্ব উন্নতি দেখিয়া চমৎকৃত হইবেন।

এই উন্নতির প্রধান কারণ—মাতৃভাষার প্রতি শিক্ষিত বাঙ্গালীর অনুরাগ। প্রাচীন বাঙ্গালা ভাষার লেখকগণের মধ্যে অশিক্ষিতের সংখ্যাই অধিক ছিল। শিক্ষিত অর্থে তখন সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত বুঝাইত। যাঁহারা সংস্কৃতভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন, তাঁহারা বাঙ্গালা ভাষাকে অ[illegible] অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতেন। সংস্কৃত দেবভাষা, পণ্ডিতের ভাষা, আর বাঙ্গালা সাধারণ লোকের ভাষা, ইতরের ভাষা, ইহাই তাঁহাদের ধারণা ছিল। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া তদানীন্তন পণ্ডিতগণ বাঙ্গালাভাষার চর্চ্চায় একেবারে উদাসীন ছিলেন। ইহার ফলে এই হইয়াছিল যে, যে সকল পণ্ডিত সংস্কৃতভাষার অতি দুরূহ ন্যায়াদি শাস্ত্রসমূহের টীকা প্রণয়ন ও অধ্যাপনা করিতেন, বাঙ্গালাভাষায় সামান্য একখানি পত্র লিখিতে হইলে তাঁহাদের গলদঘর্ম্ম উপস্থিত হইত, ও পাঁচ ছত্র লিখিতে তাঁহারা পঁচিশটি ভুল করিয়া বসিতেন, কখনও কখনও বা রচনা এরূপ সংস্কৃতশব্দবহুল করিয়া তুলিতেন যে তাহা পাঠ করিলে হাস্যসংবরণ করিতে পারা যায় না। সংস্কৃতাভিমানী ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের বাঙ্গালা ভাষার প্রতি এ অবজ্ঞা যে এখনও একেবারে বিদূরিত হইয়াছে, তাহা নহে। বিধবা-বিবাহের শাস্ত্রীয়তা বিচারের সময় একপক্ষ সংস্কৃত ভাষার আশ্রয় লইয়াছিলেন। মাইকেলের নাটকগুলি দেখিয়া একজন পণ্ডিত নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বলিয়াছিলেন —"এই গুলায় সংস্কৃত অলঙ্কারের কোন সূত্রই অনুসৃত হয় নাই, অতএব এ গুলা নাটকই নহে।" ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা এখন বাধ্য হইয়া আত্মীয়স্বজনাদির সহিত বাঙ্গালা ভাষায় পত্রব্যবহার করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু অধ্যাপক-নিমন্ত্রণের পত্রে বাঙ্গালা ব্যবহার করিলে গুরুতর পাপ হইল বলিয়া মনে করেন। পূর্ব্বে যে সকল পণ্ডিত বাঙ্গালাভাষায় কাব্যাদি প্রণয়ন করিতেন, ভাষার শ্রীবৃদ্ধির প্রতি তাঁহাদের লক্ষ্য ছিল না। মাতৃভাষায় তাঁহাদের গ্রন্থরচনার প্রবৃত্তির নিম্নলিখিত কয়টি কারণ দেওয়া যাইতে পারে:—

প্রথম এবং প্রধান কারণ এই যে তাঁহাদের অনেকের অন্তর্নিহিত কবিপ্রতিভা স্বভাবতঃ মাতৃভাষার দ্বার দিয়া বহির্গত হইবার চেষ্টা করিত। শিক্ষা ও সময়ের প্রভাবে অনেক কবিকেই প্রথম অবস্থায় লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে দেখা গিয়া থাকে, কিন্তু কোন স্থলে তৃপ্তি না পাওয়ায় পরিশেষে তাঁহাদিগের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হয় ও তাঁহারা প্রকৃত পথ দেখিতে পান। আমাদের দেশের মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন ইহার একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। প্রাচীন সংস্কৃত-শিক্ষিত বাঙ্গালী কবিরা বাঙ্গালা লিখিতেন, যে হেতু তাঁহারা

বাঙ্গালাভাষায় মনের ভাব ব্যক্ত না করিয়া থাকিতে পারিতেন না।

দ্বিতীয় কারণ, ধর্ম্মমত প্রচার। কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রভৃতি প্রাচীন বৈষ্ণব কবিগণের অনেকে সংস্কৃত ভাষায় প্রগাঢ় পণ্ডিত ছিলেন। কিন্তু তাঁহারা দেখিলেন যে দেশের অধিকাংশ লোকই অশিক্ষিত। তাহাদের মধ্যে বৈষ্ণবধর্ম্ম ও চৈতন্যদেবের মহিমা প্রচার করিতে হইলে প্রচলিত ভাষার আশ্রয় লইতে হইবে। এই জন্য তাঁহারা বাঙ্গালা ভাষায় গ্রন্থ লিখিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তথাপি সেই সকল গ্রন্থে স্থানে স্থানে সংস্কৃত শ্লোক যোজনা করিতে নিবৃত্ত হন নাই। তাঁহারা হয় ত ভাবিয়াছিলেন যে এইরূপে সংস্কৃত শ্লোক সংযুক্ত থাকিলে তাঁহাদের গ্রন্থ পণ্ডিতগণের আদরণীয় ও প্রামাণিক বলিয়া বিবেচিত হইবে।

তৃতীয়, রাজাদেশ। তখনকার অনেক কবিই রাজপ্রসাদে সম্মানিত হইয়াছিলেন। সংস্কৃতানভিজ্ঞ অনুগ্রাহক রাজা ও রাজসভাসদ্‌গণের তুষ্টিবিধানার্থ সেই সকল কবিকে বাঙ্গালা ভাষায় কাব্য লিখিতে হইত।

চতুর্থ—প্রাচীন অনেক বাঙ্গালা কাব্যে দেবদেবীগণের মাহাত্ম্য বর্ণিত হইত। সেই সকল কাব্য সাধারণের সমক্ষে চামর মন্দিরাদি সহযোগে গীত হইত। ইহাতে গ্রন্থকারের যশ ও অর্থ উভয়ই লাভ হইত।

এইরূপে হেলায় শ্রদ্ধায় বাঙ্গালা ভাষা দিন দিন পুষ্টিলাভ করিতে লাগিল। ক্রমে ইংরাজেরা বঙ্গদেশে আধিপত্য বিস্তার করিলেন। তখন বঙ্গদেশে আর এক স্রোত বহিল। ইংরাজী শিক্ষায় ধুম পড়িয়া গেল। প্রাচীন সংস্কৃত শিক্ষিতগণের ন্যায় ইংরাজী-শিক্ষিত ব্যক্তিগণও তখন বাঙ্গালা ভাষাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতে লাগিলেন। বাঙ্গালা ছোটলোকের ভাষা, উহা ভুলিয়া যাও ভাল, ইহাই তখনকার কৃতবিদ্যগণের ধারণা ছিল। শুধু বাঙ্গালা ভাষা নহে, সংস্কৃত ভাষা ও সেই সঙ্গে হিন্দু ধর্ম্ম ও হিন্দু সমাজের প্রতিও তাঁহাদের বিশেষ অশ্রদ্ধা ছিল। সে সময়ের হিন্দু কলেজের একজন কৃতবিদ্য ছাত্র বলিয়াছিলেন—"If there is anything that we hate from the bottom of our heart, it is Hinduism." মাইকেল মধুসূদন বাঙ্গালা ভাষা এমন ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে তিনি মাদ্রাজ হইতে তাঁহার বন্ধু গৌরদাসবাবুকে লিখিয়াছিলেন—

"As soon as you get this letter write off to father to say that I have got a daughter. I do not know how to do the thing in Bengali." তদানীন্তন কৃতবিদ্যগণের মাতৃভাষার প্রতি অশ্রদ্ধার ইহাপেক্ষা সুন্দর দৃষ্টান্ত আর কি হইতে পারে?

কিন্তু মাতৃভাষার প্রতি এই অবজ্ঞা স[illegible] ইংরাজী-শিক্ষিত ব্যক্তিগণের হৃদয় হইতে [illegible] ক্রমে বিদূরিত হইতে লাগিল। যে দিন ভারত-হিতৈষী বেথুন সাহেব মাইকেলের Captive Lady নামক ইংরাজী কাব্যের সমালোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন—

"As an occasional exercise and proof of his proficiency in the language, such specimens may be allowed, but he could render far greater service to his country and have a better chance of achieving a lasting reputation, for himself, if he will employ the taste and talents which he has cultivated

By the study of English, in improving the standard and adding to the stock of the poems of his own language, if poetry at all events he must write"—বাঙ্গালী ও বাঙ্গালা ভাষার পক্ষে সে এক বিশেষ শুভদিন। সেই দিন আধুনিক কালের বঙ্গ ভাষার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবিকে বঙ্গকুললক্ষ্মী স্বপ্নে আদেশ করিলেন—

"ওরে বাছা মাতৃ-কোষে রতনের রাজি,
এ ভিখারী দশা তবে কেন তোর আজি ?
যা ফিরি', অজ্ঞান তুই, যা রে ফিরি ঘরে।"

আর সেই আদেশ পালন করিয়া কবিবর—

———"পাইলেন কালে,
"মাতৃভাষারূপে খনি পূর্ণ মণিজালে।"

আর সেই দিন হইতে ইংরাজী শিক্ষিত বাঙ্গালী বুঝিলেন—

"নানান্ দেশে নানান্ ভাষা।
বিনা স্বদেশীয় ভাষা পূরে কি আশা ?
কত নদী সরোবর, কিবা বল চাতকীর'
ধারা জল বিনা কভু ঘুচে [illegible]

যেমন বাঙ্গালা ভাষার [illegible]তে লাগিল, সেই সঙ্গে সংস্কৃত ভাষারও প্রতি কৃতবিদ্যগণের অনুরাগ জন্মিতে লাগিল। শত শত বৎসরের সঞ্চিত ঔদাসীন্যের ধূলিরাশি ও অজ্ঞানের অন্ধকার বিদূরিত করিয়া Colebrooke, Wilson, Sir William Jones প্রমুখ সংস্কৃতানুরাগী পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ সংস্কৃত সাহিত্যের অনেক লুপ্ত রত্নের উদ্ধার করিলেন। সেই রত্নরাজির প্রভা দর্শনে কৃতবিদ্য বঙ্গবাসিগণ চমৎকৃত হইলেন। আবার তাঁহারা যখন দেখিলেন যে পাশ্চাত্য মনস্বিগণ— যাঁহাদিগকে তাঁহারা দেবতার ন্যায় পূজা করিতেন—সেই সকল রত্নের মালা গাঁথিয়া সাদরে কণ্ঠে ধারণ করিয়াছেন, তখন তাঁহাদের ভ্রম একেবারে বিদূরিত হইল। ইতঃপূর্ব্বে যখন গবর্ণমেণ্ট কলিকাতায় এক সংস্কৃত বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ করিতেছিলেন তখন রাজা রামমোহন রায় তাহার প্রতিবাদ করিয়া তদানীন্তন ভারতের গবর্ণর জেনরল লর্ড আমহার্ষ্ট বাহাদুরকে লিখিয়াছিলেন :—

"The Sanskrit language, so difficult that almost a life-time is necessary for its acquisition, is well known to have been for ages a lamentable check to the diffusion of knowledge, and the learning concealed under this almost impervious veil, is far from sufficient to reward the labour of acquiring it.........Neither can much improvement arise from such speculations as the following which are the themes suggested by the Vedanta:—In what manner is the soul absorbed in the deity? What relation does it bear to the Divine Essence? Nor will youths be fitted to be better members of society by the Vedantic doctrines which teach them to believe that all visible things have no real existence, that as father, brother, &c. have no actual entity they consequently deserve no real affection, and therefore the sooner we escape from them and leave the world the better. Again, no essential benefit can be derived by the student of the Mimamsa from

knowing what it is that makes the killer of a goat sinless by pronouncing certain passages of the Vedanta, and what is the real nature and operative influence of passages of the Vedas &c. The Student of the Nyaya Sastra can not be said to have improved his mind after he has learned from it into how many ideal classes the objects in the universe are divided and what speculative relation the soul bears to the body, the body to the soul, the eye to the ear &c."

অর্থাৎ সংস্কৃত বিদ্যার চর্চ্চায় কেবল সময়ের অপব্যয়, ইহাতে জনসমাজের কোন উপকার নাই। রামমোহন রায় তখনকার কৃতবিদ্যগণের গুরু ছিলেন, সুতরাং তাঁহার এই কথা তাঁহারা বেদবাক্যের ন্যায় গ্রহণ করিলেন। কিন্তু উইলসন সাহেব প্রমুখ মনীষিগণ যখন বুঝাইয়া দিলেন যে—

"Upon the cultivation of Sanskrit depends the means of the native dialects to embody European learning and science. It is a visionary absurdity to think of making English the language of India. It should be extensively studied, no doubt, but the improvement of the native dialects, must be made by enriching them with Sanskrit terms for English ideas, and to effect this Sanskrit must be cultivated as well as English—" তখন সে উক্তির সারবত্তা বুঝিয়া গবর্ণমেন্ট সংস্কৃতকলেজ স্থাপন করিলেন ও সেই সংস্কৃত বিদ্যার চর্চ্চা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

এই যুগপৎ বাঙ্গালা ও সংস্কৃতের অনুশীলনে বাঙ্গালা ভাষার প্রভূত উন্নতি সাধিত হইতে লাগিল। বাঙ্গালা সাহিত্য অধিকতর সংস্কৃতানুযায়ী হইতে লাগিল। প্রাচীন বাঙ্গালা কবিগণের গ্রন্থে পাশাপাশি দুইপ্রকার বাঙ্গালা ভাষা পরিলক্ষিত হইয়া থাকে; প্রথম চলিত, গ্রাম্য ভাষা, দ্বিতীয় অধিকতর মার্জ্জিত সাধুভাষা। দেবদেবীর রূপবর্ণনা, স্তব প্রভৃতি গম্ভীর ভাব প্রকাশ করিবার সময় মার্জ্জিত সাধুভাষার ব্যবহার হইত, আর লঘু ভাব প্রকাশের জন্য চলিত গ্রাম্যভাষার আশ্রয় লওয়া হইত। মুসলমানদিগের সংসর্গে আসিয়া বাঙ্গালা ভাষা আরবি ও পারসি কতকগুলি শব্দ গ্রহণ করিয়াছে; ইংরাজ-রাজত্বে কতকগুলি ইংরাজী শব্দও বাঙ্গালা ভাষার অন্তর্গত হইয়াছে। কিন্তু এই সকল বৈদেশিক শব্দের সংখ্যা বড়

করিয়া থাকেন, আমরা যদি সেরূপ যত্নের সহিত বাঙ্গালা ভাষার চর্চ্চা করিতাম, তাহা হইলে কোন্ বাঙ্গালা কবি কত খাঁটি বাঙ্গালা শব্দ, কত সংস্কৃত শব্দ বা কত অন্য বৈদেশিক শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, তাহার তালিকা প্রকাশিত হইত। এরূপ তালিকা প্রস্তুত না হইলেও আমরা দেখিতেছি বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যে—বিশেষতঃ বাঙ্গালা গদ্যে খাঁটি বাঙ্গালা শব্দ অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের "সীতার বনবাস" প্রকাশিত হইবার পর, বাঙ্গালা গদ্যসাহিত্য-ক্ষেত্রে দুইটি সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হয়। একদলে কতকগুলি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, ও অপর দলে ইংরাজীশিক্ষিত

আলালী লেখকগণ ছিলেন। উক্ত সম্প্রদায়ই "আলালের ঘরের দুলাল" ও "হুতোম পেঁচার নক্সার" ভাষার উপর পক্ষপাতী। কিন্তু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সম্প্রদায় বলেন যে ভাষায় যত সংস্কৃতশব্দ ব্যবহার করিতে পারা তাহার চেষ্টা কর, বিপক্ষদল বলেন— ওরূপ করিলে ভাষা অত্যন্ত নীরস ও শ্রীহীন হইয়া পড়িবে। প্রথম সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করিয়া বঙ্কিম বাবু বলিয়াছিলেন— "এই আইন চলিলে বোধ হয় ইহার পর শুনিব যে শিশু মাতার কাছে খাবার চাহিবার সময় বলিতেছে—'হে মাতঃ খাদ্যং দেহি মে', এবং ছেলে বাপের কাছে জুতার আবদার করিবার সময় বলিতেছে—'ছিন্নেয়ং পাদুকা মদীয়া।'

ভাষা এইরূপ সংস্কৃত-শব্দ-বহুল হওয়ায় বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ ও অভিধান লইয়া গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে। ব্যাকরণের কথা এ প্রবন্ধের বিষয়ীভূত নহে। আমরা অভিধানের কথাই বলিব।

ইংরাজেরা এদেশে আসিবার পূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষার কোন অভিধান ছিল না। সাহিত্যের হিসাবে বাঙ্গালার চর্চ্চাই ছিল না, কাজেই অভিধানেরও প্রয়োজন হইত না। কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীরাম দাসের মহাভারত প্রভৃতি যে সকল পুঁথি সচরাচর পঠিত হইত, সে সকল সাধারণ লোকে একরূপ বুঝিতে পারিত, এবং বুঝিতে না পারিলেও বড় ক্ষতিবোধ করিত না। কারণ তাহারা ভাবিত ধর্ম্মগ্রন্থ অর্থগ্রহের সহিত হউক আর না হউক পাঠ করিলে পুণ্যলাভ হইবে। সাহিত্যের হিসাবে সে সকল পুঁথি কেহ পাঠ করিত না। আমি স্বয়ং অতি সামান্য-বর্ণজ্ঞান-সম্পন্ন এক মুদীকে পদ-বিন্যাস করিয়া কালীপ্রসন্ন সিংহের বাঙ্গালা মহাভারত গ্রন্থ পাঠ করিতে দেখিয়াছি। আমি জানি সে তাহা বড় একটা বুঝিত না।

যখন ইংরাজ সিভিলিয়ানগণকে এতদ্দেশীয় ভাষা সকল শিক্ষা দিবার জন্য কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপিত হইল, তখন বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষেরা দেখিলেন যে বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্যগ্রন্থের একান্ত অভাব। সেই অভাব পূরণার্থ তাঁহারা সচেষ্ট হইলেন। কিন্তু গদ্য গ্রন্থ লেখে কে? নব্যবাঙ্গালী সম্প্রদায় বা সংস্কৃতজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ কেহই বাঙ্গালা জানিতেন না। তথাপি ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণই এ কার্য্যে অধিকতর উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইলেন। তদনুসারে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার প্রভৃতি কয়েকজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতকে এ কার্য্যে নিযুক্ত করা হইল। তাঁহারা পুরুষপরীক্ষা, বত্রিশ সিংহাসন, প্রভৃতি কয়েক খানি গদ্যগ্রন্থ প্রণয়ন করিলেন। সে গুলি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে পঠিত হইতে লাগিল। তখন বাঙ্গালা ভাষার অভিধানের অভাব অনুভূত হইতে লাগিল। এই অভাব দূরীকরণার্থ ডাক্তার Gilchrist, ডাক্তার Hunter ও Forster সাহেব প্রমুখ কয়েকজন ইংরাজ বাঙ্গালা ভাষার অভিধান প্রণয়নে মনো-নিবেশ করিলেন। ইংরাজ সিভিলিয়ানদিগের ব্যবহারার্থ প্রণীত বলিয়া তাঁহাদের অভিধানে বাঙ্গালাশব্দ সমূহের ইংরাজী অর্থ প্রদত্ত হইয়াছিল। Forster সাহেবের অভিধান ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে সঙ্কলিত হইয়াছিল। বোধ হয় ইহাই বাঙ্গালার প্রথম অভিধান। ইহাতে প্রায় ১৮০০০ শব্দ ছিল। এই গ্রন্থ এক্ষণে নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য।

ইহার পর ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের তদানীন্তন সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষার অধ্যাপক ডাক্তার কেরি সাহেব যে অভিধান সঙ্কলন করেন, তাহাই সেই সময়কার সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ বাঙ্গালা

অভিধান। এই অভিধানে প্রায় ৮০০০০ শব্দ আছে। এই শব্দবাহুল্য দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কথা; কিন্তু সাহেব তাঁহার গ্রন্থের ভূমিকায় যে কয়টি কথা বলিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে বিস্ময়ের কোন কারণই থাকিবে না। তিনি বলিতেছেন—

"Almost nine tenths of the words in the Bengali language are pure sanskrit, or such as are evidently derived from that source." এবং ঐ ভূমিকার আর এক স্থানে বলিতেছেন যে সমাস করিয়া যে সকল শব্দ প্রস্তুত করিতে পারা যায়, সে সকল শব্দও তাঁহার অভিধানে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে যে কেরি সাহেবের অভিধান প্রকৃত বাঙ্গালা অভিধান নহে, উহা প্রধানতঃ সংস্কৃত শব্দকোষ। উদাহরণ স্বরূপ উক্ত অভিধান হইতে যদৃচ্ছাক্রমে কতকগুলি শব্দ উদ্ধৃত হইতেছে, যথা—

এতচ্ছায়োৎপাদক, অর্থ, Producer of this shade, নাবাকৃত্যস্থিছিদ্র, অর্থ, one of the cavities of the ear, আমাশয়-মূর্দ্ধোক্তরক্তবাহক নাড়ী, অর্থ, the coronary stomachic arteris; এইরূপ নিয়-যোজ্যমন প্রযুক্ত, স্থিতিব্যাঘাতক, ইত্যাদি।

কিন্তু এইরূপ অদ্ভুত বাঙ্গালা শব্দের বাহুল্য থাকিলেও, কেরি সাহেবের অভিধানের একটি গুণ এই যে ইহাতে উর্দ্দু ও পারসি ভাষা হইতে যে সকল শব্দ—প্রধানতঃ আইন আদালত সংক্রান্ত শব্দ—বাঙ্গালা ভাষায় স্থান পাইয়াছে, সেইরূপ অনেক শব্দের সংগ্রহ আছে। কেবল সংগ্রহ নহে, সে সকল শব্দের ব্যুৎপত্তিও প্রদত্ত হইয়াছে। অবশ্য কেরি সাহেব তখনকার জ্ঞানে যে শব্দের যে ব্যুৎপত্তি দিয়াছেন, এখন অনেকে সে সকল স্বীকার করিবেন না; কিন্তু তাহা হইলেও ভবিষ্যৎ বাঙ্গালা কোষকার যে উক্ত গ্রন্থ হইতে যথেষ্ট সাহায্য লাভ করিতে পারিবেন, সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। কেরি সাহেব পিত্রর্থে ব্যবহৃত সংস্কৃত বপ্র শব্দ হইতে বাঙ্গালা বাবু শব্দের উৎপত্তি নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

কেরি সাহেবের পর Marshman, Haughton প্রভৃতি আরও কয়েকজন সাহেব বাঙ্গালা অভিধান সঙ্কলনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা কেরি সাহেবের উপর আর কিছু করিয়া উঠিতে পারেন নাই।

সাহেবদের দেখাদেখি কয়েকজন বাঙ্গালী ও এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজন সংস্কৃত অমর কোষের বঙ্গানুবাদ করিয়া তাহা বাঙ্গালা অভিধান বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন।

এইরূপে বাঙ্গালা অভিধান নামে যত গুলি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাদের [illegible] প্রকৃত বাঙ্গালা অভিধান নহে। বা[illegible]হিত্যে ব্যবহৃত সংস্কৃত শব্দগুলির অর্থ ও ব্যুৎপত্তি ইহাদের সাহায্যে জানা গেলেও এই সকল অভিধান হইতে প্রাচীন বাঙ্গালাসাহিত্যে ব্যবহৃত অনেক খাঁটি বাঙ্গালা শব্দের অর্থ ও ব্যুৎপত্তি বিষয়ে জ্ঞানলাভের আদৌ সম্ভাবনা নাই।

১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে পণ্ডিত রামকমল বিদ্যালঙ্কার-সঙ্কলিত প্রকৃতিবাদ অভিধান সম্পূর্ণ ও প্রকাশিত হয়। গ্রন্থের বিজ্ঞাপনে সংগ্রহকার বলিতেছেন—

"পণ্ডিতাগ্রগণ্য ডাক্তার উইলসন সাহেবের অভিধান, শ্রীযুক্ত রাজা রাধাকান্ত দেবের শব্দকল্পদ্রুম, ভরত মল্লিক ও রায় মুকুট প্রভৃতি মহাত্মাদিগের অমরকোষের টীকা এবং অন্যান্য সংস্কৃত গ্রন্থ সকল অবলম্বন

করিয়া ছাত্রবর্গের কতকগুলি প্রচলিত শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রভৃতি বিনির্ণয় পূর্ব্বক অর্থপ্রতীতির জন্য এই প্রকৃতিবাদ অভিধান সঙ্কলিত হইল।" এই ভূমিকায় বাঙ্গালা সাহিত্য বা কোন বাঙ্গালা গ্রন্থের নামোল্লেখ পর্য্যন্ত নাই। এই কেবল সংস্কৃত গ্রন্থ সকল অবলম্বন করিয়া সঙ্কলিত হইয়াছে, তবে "বঙ্গভাষার ছাত্রদিগের বোধ সৌকর্য্যার্থে সমাসের কিছু কিছু পরিবর্ত্ত করা হইয়াছে।"

প্রায় তেইশ বৎসর পরে, অর্থাৎ ১২৯১ সালে, এই অভিধানের চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হয়। তখন বাঙ্গালাসাহিত্যের যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে ও বাঙ্গালাসাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিগণের সংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহার প্রায় পনর বৎসর পূর্ব্বে পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়ের বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব প্রকাশিত হওয়ায় প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতি বঙ্গীয় শিক্ষিত সমাজের নবোন্মিষিত অনুরাগ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছিল। প্রকৃতিবাদ অভিধানের চতুর্থ সংস্করণের বিজ্ঞাপনে লিখিত আছে—

"এই বারে পূর্ব্বাপেক্ষা বাঙ্গালা, সংস্কৃত এবং নবাবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক শব্দ বহুল পরিমাণে সংযোজিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। সংস্কৃত এবং বাঙ্গালা ভাষায় কবিগণকৃত রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতিতে ব্যবহৃত এবং মহাকবি কালিদাস, ভবভূতি, শ্রীহর্ষ প্রভৃতি এবং প্রাচীন কবি বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, কবিকঙ্কণ, ভারতচন্দ্র, মাইকেল প্রভৃতির কাব্যকলাপে ব্যবহৃত প্রচলিত ও অপ্রচলিত শব্দের মৌলিক এবং বিবিধ অর্থ এবং যে যে স্থলে যেরূপে ও যে অর্থে তাঁহারা সেই সেই শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, তাঁহাদের কাব্য হইতে সেই সকল প্রয়োগও উদ্ধৃত করিয়া ঐ সকলের সুসঙ্গত ব্যাখ্যা পর্য্যায় সন্নিবেশিত করিতে সাধ্যমত ত্রুটি করি নাই।"

সম্পাদক ভূমিকায় যেরূপ আড়ম্বর করিয়াছেন, গ্রন্থমধ্যে তদনুরূপ কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রাচীন বাঙ্গালা কবিগণের মধ্যে ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল হইতেই অধিকাংশ বাঙ্গালা শব্দ সংগৃহীত হইয়াছে দেখিতে পাই। কবিকঙ্কণ, বিদ্যাপতি প্রভৃতির নামমাত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। চৈতন্য ভাগবত ও চৈতন্যচরিতামৃত হইতেও কয়েকটি উদাহরণ আছে। তদ্ভিন্ন কবিগণের কোন উল্লেখই বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না। কেবল নিতান্ত প্রচলিত শব্দ সকলই উদ্ধৃত হইয়াছে, এবং সেই সকল শব্দের ব্যুৎপত্তির স্থলে প্রায় "দেশজ" বলিয়াই কাজ শেষ করা হইয়াছে। আমরা প্রাচীন কবিগণের গ্রন্থ হইতে কয়েকটি স্থল উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি যে, সে সকল স্থলের অর্থ-পরিগ্রহে প্রকৃতিবাদ তথা অন্যান্য প্রচলিত বাঙ্গালা অভিধান সকল হইতে কোন সাহায্যই পাওয়া যায় না।

কালকেতুর গৃহনির্ম্মাণ প্রসঙ্গে কবিকঙ্কণ বলিতেছেন—

বিশ্বকর্ম্মা শিরে ধরি চণ্ডীর আদেশ।
বেরুনিয়া বেশে বিশাই করিল প্রবেশ॥
তেন মত প্রবেশ করিল হনুমান্।
বীরের যোগেন ঘর হ'য়ে সাবধান॥
আওয়াস ভূমিল এক ক্রোশ প্রমাণ।
আপনি কোদালি ধরি বীর হনুমান্॥
নাড়ি গাঁতি ধরে বিশাই, না ধরে সেউনি।
অঞ্জলি করিয়া হনুমান্ তোলে পানি॥
কাদা তুলি দিল বীর শুভক্ষণ বেলা।
পোয়ালকুড় সমান হনুমান্ তোলে ডেলা॥
এমন প্রাচীরদিন হৈল চারি পাড়।
বাউটী পাথরের বীর দিল ধনকাড়॥

তালতরু সম উচ্চ করিল প্রাচীর।
পাষাণের দাওয়া দিল হনুমান্ বীর ॥
মণ্ডলা রচিয়া তথি আরোপিল কাঠ।
চারি চালা খড়ে বিশাই ছাইল চারি পাট ॥

উপরোদ্ধৃত অংশে উল্লিখিত বেরুনিয়া, আওয়াস, বাউটি, পাথর, ঝনকাড় প্রভৃতি কোন শব্দই কোন বাঙ্গালা অভিধানে দেখিতে পাওয়া যায় না।

ক্ষেতে দেখে খন্দ যদি খেতে নাহি পায়।
কুতকাতে কায়েত কিফাতি করে তায় ॥
(শিবায়ন)॥

এই কুতকাতে কিফাতি করার অর্থ কোন বাঙ্গালা অভিধানেই পাওয়া যায় না।

খণ্ড শব্দের অনেক অর্থ দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু—

"খণ্ডকপালিনী তাম অভাগিনী
কেবা দিল শাপ গালি।"
"খণ্ডকপালিনী তুই বেহুলা চিরুণিদাঁতি।
বিভাদিনে খাইলি পতি না পোহাতে রাতি ॥"

এই "খণ্ডকপালিনী" শব্দের কোথাও উল্লেখ নাই।

"মধুকর" শব্দে দেখিতে পাই ভ্রমর প্রভৃতি নানা অর্থ দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে বণিক্‌গণের প্রধান নৌকার নাম যে মধুকর, তাহার কোথাও উল্লেখ নাই ; যথা—

"শুন সদাগর কোথা মধুকর
কহ তব পায়ে পড়ি।
সাধু হেনকালে সনকারে বলে
কালীদহে হৈল বুড়ি ॥"
(মনসার ভাসান)॥

"প্রথমে তুলিল তরী নামে মধুকর।
সকাশুদ্ধ সুবর্ণ যার বৈঠকির ঘর ॥"
(কবিকঙ্কণ)॥

প্রাচীন বাঙ্গালা কবিদিগের ব্যবহৃত এইরূপ অনেক শব্দ আছে, যাহাদের উল্লেখ বর্ত্তমান কোন বাঙ্গালা অভিধানে দেখিতে পাওয়া যায় না। এই সকল শব্দের ইতিহাস অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক। কয়েক জন কৃতবিদ্য ব্যক্তি কোন কোন প্রাচীন বাঙ্গালা কাব্যের সম্পাদন ও টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন। টীকাকারদিগের চিরন্তন প্রথানুসারে তাঁহারা দুর্ব্বোধ স্থলগুলি বিশেষ যত্নসহকারে পরিত্যাগ করিয়া স্পষ্টার্থ বিষয়ের সমাধানে যৎপরোনাস্তি চেষ্টা করিয়াছেন। এই শ্রেণীর টীকাকারদিগের প্রতি ভোজরাজের নিম্নোদ্ধৃত তীব্র উক্তি কখনও অন্যায় বলিয়া বিবেচিত হইবে না :—

"দুর্ব্বোধং যদতীব তদ্ বিজহতি স্পষ্টার্থ-
মিত্যুক্তিভিঃ
স্পষ্টার্থেষ্বতিবিস্তৃতিং বিদধতি ব্যর্থৈঃ
সমাসাদিকৈঃ।
অস্থানেঽনুপযোগিভিশ্চ বহুভির্জল্পৈর্ভ্রমং
তন্বতে
শ্রোতৄণামিতি বস্তুবিপ্লবকৃতঃ প্রায়েণ
টীকাকৃতঃ ॥"

অর্থাৎ দুর্ব্বোধ অংশগুলি অতি সহজ বলিয়া পরিত্যাগ করেন ; যে স্থলের অর্থ অতি স্পষ্ট সেই স্থলে বৃথা সমাসাদির আড়ম্বর করিয়া গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি করেন ; এবং অপ্রাসঙ্গিক বিবিধ বিষয়ের অবতারণা করিয়া থাকেন ; এইরূপ টীকাকারেরা অনেকস্থলেই গোলযোগ দূর না করিয়া তাহার বৃদ্ধিই করিয়া থাকেন। প্রবন্ধান্তরে এ বিষয়ের বিশেষ আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

ইংরাজী ভাষায় Shakespear এমন কি Shellyর পর্য্যন্ত Concordane প্রস্তুত হইয়াছে, আমাদের চণ্ডীদাস, কবিকঙ্কণ প্রভৃতির Concordance দূরের কথা, একখানি উল্লেখযোগ্য বাঙ্গালা অভিধানও এ পর্য্যন্ত প্রস্তুত হইল না!

সাময়িক অথবা সাময়িক পত্রাদিতে কোন কোন প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু সে সকল চেষ্টা অধিক দিন স্থায়ী হয় না। এই দুরূহ ও বিশাল ব্যাপারে ব্যক্তিবিশেষের চেষ্টা কখনও সফল হইতে পারে না, সমবেত চেষ্টার প্রয়োজন। সাহিত্য সংরক্ষার কোন সভা যদি এই বিষয়ে উদ্যোগী হইয়া এক এক জন উপযুক্ত ব্যক্তির উপর এক এক প্রসিদ্ধ প্রাচীন কবির বা এক এক যুগের স্বকীয় সাহিত্যের আলোচনার ভার অর্পণ করেন, ও কয়েক জন বিজ্ঞ ব্যক্তিকে বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে পারিভাষিক শব্দ প্রণয়নে নিয়োজিত করেন, তাহা হইলে এই সকল ব্যক্তির বহুবর্ষব্যাপী সমবেত চেষ্টায় বাঙ্গালা ভাষার একখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অভিধান প্রস্তুত হইতে পারে।

শ্রীসরোজরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় (এম্, এ)

গার্হস্থ্য রন্ধন-প্রক্রিয়া।

অনার্য্য আদিম ভারতবাসী, কৃষ্ণবর্ণ ও কদাকার, খর্ব্বাকৃত ও নগ্নকায় জাতি ছিল। তাহারা লৌহাদি ধাতুর অনভিজ্ঞতা বশতঃ প্রস্তর-ফলক-নির্ম্মিত অস্ত্র দ্বারা মৃগয়া কার্য্য সম্পাদন করিত। মৃগয়লব্ধ পশু-মাংস, এবং ইতস্ততঃ ভ্রমণে অপেক্ষাকৃত স্বল্পায়াস-সংগৃহীত ফলমূলাদি আম (অপক্ব) অবস্থাতে ভক্ষণ দ্বারা তাহাদের জীবিকা-নির্ব্বাহ হইত। পুরাতন ইতিবৃত্তে এরূপ পর্য্যন্ত পাওয়া যায়। অদ্যাপি মধ্য-ভারতে ও অন্যান্য স্থানে এই শ্রেণীর নর-নারী নিরীক্ষিত হয়। কিন্তু তাহারা অধুনা কথঞ্চিৎ উন্নত—সভ্য; তাহারা অগ্নি ও চুল্লী ব্যবহার করিয়া থাকে, এবং বস্ত্রদ্বারা কটিদেশাদি কোনরূপে আবৃত রাখে।

অনার্য্য জাতির কাহিনী সংক্ষেপতঃ এক রূপ বিবৃত হইল। এখন সুসভ্য আর্য্যজাতি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা আবশ্যক।

তৎকালে আর্য্যজাতি অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। মধ্য আশিয়া হইতে সমাগত হইয়া প্রথমে ইঁহারা ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে অধিষ্ঠিত করেন। পরে বুদ্ধি, কৌশল এবং ভুজবলে অনার্য্যগণকে বিতাড়িত করিয়া, হিমালয় হইতে বিন্ধ্যগিরি পর্য্যন্ত আধিপত্য বিস্তার করেন। এইজন্য উক্ত প্রদেশ আর্য্যাবর্ত্ত নামে অভিহিত। ইঁহারা বহ্নির সহায়তায় চুল্লীর ব্যবহারে অভ্যস্ত এবং কৃষিকার্য্যানুরাগী ছিলেন।

অগ্নি—প্রথমোঽগ্নিঃ "ধর্ম্মস্য বসুধার্য্যায়াং জাতঃ।" কাষ্ঠেন্ধন প্রভব ঊর্দ্ধ জ্বলনস্বভাবঃ পচনস্বেদাদিসমর্থঃ।" উক্ত তত্ত্ব পুরাণানুশীলনের ফল। এই অগ্নি, পাক ব্যতীত, হোমাদি বহুবিধ কার্য্যে ব্যবহৃত হইতেন। তদুল্লেখ এখানে নিষ্প্রয়োজন। আর্য্য জাতি কর্তৃক "চুল্লী" কি প্রণালীতে ব্যবহৃত হইত, তাহা নিম্নে প্রকটিত হইল :—

চুল্লী—"পাকার্থং অগ্নিস্থানম্"। এই "অগ্নিস্থানম্" সম্বন্ধে যাহা কিছু বিধি নিষেধ আছে, তাহা এই স্থানে লিপিবদ্ধ করা প্রয়োজনীয়। এতৎ সমুদয়ই অতীব প্রাচীন। পুরাণে যেরূপ বিবরণ পাওয়া যাইতেছে, নিম্নে তাহা নিবদ্ধ হইল :—

চুল্লী উত্তর-মুখস্থিত হইলে গৃহস্থ শ্রীকাম হইয়া থাকেন।

চুল্লী পূর্ব্ব-মুখস্থিত হইলে গৃহস্থ ধর্ম্মকাম হইয়া থাকেন।

চুল্লী পশ্চিম-মুখস্থিত হইলে গৃহস্থ পুত্র হইয়া থাকেন।

চুল্লী পশ্চিম-মুখস্থিত হইলে গৃহিণী পতিকাম হইয়া থাকেন।

চুল্লী অগ্নিকোণস্থ হইলে গৃহী অমৃতফল-কামী হইয়া থাকেন।

এই মত ব্যতীত অন্য যাহা "নিষেধ" রূপে বর্ণিত আছে, তাহার সহিত এতৎ প্রবন্ধের সংস্রব নাই। চুল্লী-নির্ম্মাণকালে উপরি উক্ত নিয়মগুলি স্মরণ রাখিয়া কার্য্য করিলেই পর্য্যাপ্ত হইল। এই নিয়মের উপর গৃহস্থের শুভাশুভ অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। অতি সামান্য কারণে সহজ নিয়ম ভঙ্গেও যে, অনেক সময়ে গুরুতর ব্যাপার সংঘটিত হয়, তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত।*

চুল্লী কি ভাবে নির্ম্মিত হইবে, তাহা বিবৃত হইয়াছে; এক্ষণে "ইন্ধনের ব্যবস্থা।

* একটি উপন্যাস স্মরণ হইল। উহা উত্তম উপদেশপ্রদ। তাহা এই:—কোনও সময়ে দুই রাজার যুদ্ধ বিগ্রহ উপস্থিত হইয়াছিল। ছিদ্রান্বেষী দূত, বিপক্ষের একটি বিশেষ সংবাদ লইয়া, এক দ্রুতগামী অশ্বারোহণে প্রভুর নিকট যাইতে মনন করিল। সংবাদটি এত গুরুতর যে, তাহার উপর জয় পরাজয় নির্ভর করে,—সময়ে না পৌঁছাইলে পরাজয় সম্ভাবনা। ঘটনাক্রমে ঘোটকটির পদলগ্ন নালের একটি পেরেক খুলিয়া গিয়াছিল। অশ্বারোহী দূত তাহা লাগাইবার (বাঁধাইবার) জন্য কাল বিলম্ব করিল না—এক প্রকার উপেক্ষা করিয়া ঘোটক চালাইয়া দিল। সামান্য দূর গিয়াই, এক প্রকাণ্ড প্রান্তর মধ্যে ঘোটকের পদস্থ নাল খুলিয়া গেল। ঘোটক আর এক পদও অগ্রসর হইতে পারিল না। দূত কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ়। জনপ্রাণী কিংবা লোকালয় নাই। পদব্রজে ত্বরিতগমনে সময়ে পৌঁছাইবার সম্ভাবনা মাত্র নাই। সংবাদ অভাবে প্রভুর পরাজয় ও তৎসঙ্গে রাজ্যচ্যুতি! একটি সামান্য পেরেকের জন্য কি অনর্থ

ইন্ধন—পুরাণ-মতে, যজ্ঞডুমুর, করমচা, কদম্ব, শাল, শিরীষ, শাল্মলী, ভেরেণ্ড, বয়ড়া এই সমস্ত কাষ্ঠে রন্ধন নিষিদ্ধ। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য ইন্ধন প্রশস্ত। প্রাচীন শাস্ত্রকার মহর্ষিদিগের এই মত গভীর গবেষণাপ্রসূত।

অধুনা সভ্য সমাজে যে কয়েক প্রকার ইন্ধন-ব্যবহার প্রচলিত, তদ্বিষয়ের পর্য্যবেক্ষণ আবশ্যক।

পল্লীগ্রামে অদ্যাপি অনেক স্থলে কেবল মাত্র শুষ্ক গোময় (ঘুঁটিয়া বা কাণ্ডা) জ্বালাইয়া পাক কার্য্য সম্পাদিত হইতেছে। রন্ধন কার্য্যে তদ্ব্যতীত অন্য কোন দাহ্য পদার্থ ব্যবহৃত হয় না। শুষ্ক গোময় দ্বারা প্রস্তুত ও পক্ক খাদ্য সাধারণতঃ পুষ্টিকর। শিশুদিগের পক্ষে (পোড়ের অন্ন) বিশেষ মঙ্গলজনক রোগী-দিগের পক্ষেও উপকারক—"পথ্যরূপে" ইহা বৈদ্য সম্মত।

কোন বিখ্যাত ইংরাজী পত্রিকার মতে কিন্তু গোময় দগ্ধ করা অনুমোদিত নহে এবং কোন কোন স্থানের কৃষকেরা আদৌ গোময় দগ্ধ করে না।

নগর ও উপনগরের নানাস্থানে শাস্ত্র সংগত কাষ্ঠ ইন্ধনরূপে ব্যবহৃত হয়, এবং এতৎপ্রস্তুত খাদ্য স্বাস্থ্যকর ও রুচিদায়ক। কিন্তু এক্ষণে নানাবিধ বৃক্ষসমাকুল অরণ্য সমূহের জননিবাস গ্রামে ও কৃষি-ক্ষেত্রে হতে পরিণতি বশতঃ বহুতর বৃক্ষ বিনষ্ট হইতেছে। সুতরাং কাষ্ঠ দুষ্প্রাপ্য, অপিচ দুর্মূল্য। সামান্য গৃহস্থের পক্ষ কাষ্ঠের জ্বালে রন্ধন অসম্ভবপ্রায় হইয়াছে। আর অধিক দিন চলিবে কি না, সন্দেহস্থল; ইহাও একটি চিন্তনীয় বিষয়। কোন্ প্রণালী অবলম্বনে কাষ্ঠের পরিবর্ত্তে সমফলপ্রদ ইন্ধন প্রস্তুত হইতে পারে, বৈজ্ঞানিক মহোদয়গণের পক্ষে অবশ্যই তদাবিষ্কারে যত্নশীল হওয়া বিধেয়

নয় কি? কে বলিতে পারে, তাঁহাদিগের গবেষণা ব্যর্থ হইবে? বিজ্ঞান শাস্ত্র এত দূর উন্নতিপ্রাপ্ত যে, কিছু পূর্ব্বে যাহা অসম্ভব ছিল, বিজ্ঞানবলে এখন তাহা প্রত্যক্ষ ফলপ্রদাতা!

কাঠের পরিবর্ত্তে সংপ্রতি ভদ্রপরিবারেও পাথুরিয়া কয়লায় রন্ধন-কার্য্য সমাহিত হইতেছে। যে সমস্ত কারণে এখন প্রায় সকলেরই স্থূলভোর দিকে লক্ষ্য—উপকারিতা বা অপকারিতার পক্ষে একরূপ দৃষ্টিশূন্য, তাহাতে অনেকে বলেন দারিদ্রতাই ইহার মূল। অনেকে ইহা সুবিধা বিবেচনা করেন। কাঁচা পাথুরিয়া কয়লা, কিয়ৎ পরিমাণে দগ্ধীভূত হইলে, রন্ধনোপযোগী (Soft coke) হইয়া থাকে; এবং তাহা কাঠের প্রায় অর্দ্ধমূল্য ও আনায়াসলব্ধ, কারণ, বহুতর খনি আবিষ্কৃত হওয়াতে পাথুরিয়া কয়লা অতি সুলভ। কিন্তু তাহাতে অন্নও দাইল ভিন্ন ব্যঞ্জনাদি সুসিদ্ধ হয় না। অর্দ্ধপক্ক অথবা অসিদ্ধাবস্থাতেই ভক্ষিত হইয়া থাকে এবং সেই কারণে অনেকে অম্ল-রোগ গ্রস্থ হইয়া থাকেন।

প্রসঙ্গক্রমে এখানে আর একটি কথার উত্থাপন করিতে হইল।

কেরাণি মহাশয়গণের প্রাতে ১০।১১ ঘটিকার মধ্যে কর্ম্মস্থানে উপস্থিত আবশ্যক, এজন্য তাঁহাদিগকে বেলা ৯টার মধ্যে আহারাদি সমাপন করিতে হইবে। রবিবার অথবা অন্য অবসর দিবসে, আলস্য ও অন্যান্য কারণে প্রায়শঃ অপরাহ্ণ ২ ঘটিকায় আহার হইয়া থাকে, এবং রাত্রিতে বন্ধুবান্ধবের সহিত আমোদ প্রমোদাদিতে সাধারণতঃ দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া যায়। তাহার পর আহার। কাজেই পর দিবস বেলা ৯ ঘটিকায় ক্ষুধার উদ্রেক অসম্ভব, অথচ যথাসময়ে আফিসে উপস্থিতি আবশ্যক, ক্ষুধা না থাকিলেও আহার ক'রতে হয়। আরও কয়লার আলের অংশক দ্রব্য ভক্ষিত হইয়াছে। এই কারণ সর্ব্বই অজীর্ণ, অম্ল প্রভৃতি রোগের উত্তেজক।

রাজপুতানার অন্তর্গত বিকানীর নামক স্থানস্থ কয়লা-খনির অধ্যক্ষ সাহেব, গত শীত কালে লাহোর শিল্প-প্রদর্শনীতে এক প্রকার চুল্লী পাঠাইয়াছিলেন। চুল্লীর বিশেষত্ব এই যে, উহার ইন্ধন কাঁচা কয়লা (পাথুরিয়া) হইলেও একেবারে ধূমশূন্য। এজন্য তাঁহাকে প্রথম স্বর স্বর্ণ-পদক সম্মান পত্র সহ প্রদত্ত হইয়াছে।

ষ্টীম-রন্ধন।

শ্রীক্ষেত্রে একরূপ রন্ধন প্রথা বহুকাল হইতে প্রচলিত আছে। সর্ব্ব নিম্নের চুল্লীতে কাঠের আগুন। তদুপরি উপর্য্যুপরি ৪।৫টি মৃৎপাত্রে অন্ন, দাইল ও অন্যান্য ব্যঞ্জনাদি পাক হইয়া থাকে। নিম্নস্থ উপাদেয় না হইলেও সমস্ত দ্রব্যই সুসিদ্ধ অবস্থায় প্রাপ্ত হওয়া যায়। বলা বাহুল্য, ষ্টীম দ্বারা এই পাক ক্রিয়া সম্পাদিত হয়।

খ্যাতনামা ডাক্তার শ্রীযুক্ত ইন্দুমাধব মল্লিক মহাশয় কর্ত্তৃক একপ্রকার চুল্লী নির্ম্মিত হইতেছে। নির্ম্মাণ-কৌশল নির্ম্মাতার অদ্ভূত বিজ্ঞান-পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিতেছে। সামান্য পরিমিত স্পিরিট (Spirit) অথবা কিরোসিন তৈলে রন্ধন-কার্য্য সমাহিত হয়; অথচ স্পিরিট বা কিরোসিন তৈলের সহিত খাদ্যদ্রব্যের কোনও সংস্রব নাই। ভিতরে একটি বারিপূর্ণ পাত্রের নিম্নদেশে স্পিরিট বা কিরোসিনের একটি (অবস্থানুসারে ২।৩টি) ল্যাম্প (Lamp) স্থাপিত। উত্তাপে উপরিস্থ জল শীঘ্রই ষ্টীমে পরিণত হয়; এবং সেই ষ্টীম উপর্য্যুপরি স্থাপিত খাদ্যদ্রব্য পূর্ণ পাত্র গুলির চতুর্দ্দিকে পরিচালিত হইয়া রন্ধন কার্য্য সম্পন্ন করে।

ইংরেজি ভাষার কতকগুলি কথ সচরাচর বাঙ্গালায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ষ্টোভ (Stove) কথাটি সেই শ্রেণীভুক্ত। প্রবন্ধের এই স্থলে "উনান" বা "চুল্লীর" পরিবর্ত্তে "Stove" বলাই যুক্তিযুক্ত। ডাক্তার ইন্দুমাধব মহাশয়ের Stove বিবিধ প্রয়োজন সাধনার্থে বিবিধ প্রকারে গঠিত। তদ্বিবরণ নিয়ে প্রদর্শিত হইল। বিস্তারিত রূপে লিখিতে গেলে প্রবন্ধের কলেবর কেবল বর্দ্ধিত হইবে, এজন্য সংক্ষেপে বিবৃত হইল।

পর্য্যটকদিগের জন্য গোলাকার (ঢোলকের ন্যায়) Stove অনায়াসে হস্তে ঝুলাইয়া লইতে পারা যায়। আবশ্যকমতে পদব্রজে বা যানাদি আরোহণে ভ্রমণকালে সঙ্গে সঙ্গে রন্ধন সম্ভবপর Stoveটি হস্তে ঝুলিতেছে কিম্বা যান-নিবদ্ধাবস্থায় রহিয়াছে, অথচ তন্মধ্যে রন্ধন চলিতেছে। এইরূপ Stove ক্ষুদ্রায়তন ও লঘু; এবং ইহাতে দুই জনের উপযুক্ত আহার্য্য প্রস্তুত হইতে পারে। অপেক্ষাকৃত বৃহদাকারে নির্ম্মিত Stove ৫।৬ জনের খাদ্যোপযোগী। অন্নব্যঞ্জনাদি সুপাকের পক্ষে কোনও গোল নাই—কেবল ভোজনকালে পাত্র বাহির করিয়া সাঁতলাইয়া লইতে হয়। এই প্রক্রিয়া দ্বারা ইচ্ছামতে খাদ্য, ঘৃতাদি সংযুক্ত করিতে পারা যায়। আবার প্রায় দুই ঘণ্টা কাল মধ্যে মাংস পর্য্যন্ত গলিয়া পঙ্কবৎ বা কর্দ্দম-সম (কাদা) হইয়া থাকে।

অপর এক প্রকারে গঠিত Stove এর জন্য ডাক্তার মহোদয় সভ্য সম্প্রদায়ের নিকট ধন্যবাদার্হ। একটি চতুষ্কোণ লণ্ঠনের মধ্যে একটি মাত্র চিম্‌নি সংযুক্ত Kerosine lamp জ্বলিতেছে। শিরোভাগে ৩।৪টি পাক-পাত্র সুকৌশলে উপর্য্যুপরি স্থাপিত। লণ্ঠন এবং পাকপাত্রগুলির ব্যবধান মধ্যে অদ্ভুত বিধান (পর্দ্দা)। টেবিলের উপর এই লণ্ঠন সংযুক্ত Stove স্থাপিত করিয়া এক ত্র চারি জনের লেখা পড়া চলে—রন্ধনও চলিতে থাকে।

পাক-পাত্র।

তাম্র পাত্রে পাক শাস্ত্রানুসারে নিষিদ্ধ। মৃৎপাত্রে রন্ধন সার্ব্বকালিক প্রথা। কিন্তু নিত্য নূতন ভাণ্ডে পাকই প্রাচীন কালে কর্ত্তব্য কর্ম্ম সমূহের অন্তর্গত ছিল। তদভাবে "পক্ষ পর্য্যন্তং ততস্ত্যাজ্যং", ১৫ দিনের পর পরিত্যাজ্য। অপিচ, "মাসে পক্ষে তথাষ্টৌচ তৎপাকং বিসৃজেদ্ গৃহী।" গৃহীলোকের পক্ষে অষ্টাহ, পক্ষান্ত অথবা মাসান্তে পাকের পাত্র (হাঁড়ি ইত্যাদি) পরিবর্জ্জনীয়। অতএব স্থির হইল যে, তাম্রনির্ম্মিত আধারে কদাচ পাক করিবে না। অধুনা অনেক স্থলে তাম্রপাত্র রঙ্গ (রাং) কলায় (আবরণ কিম্বা প্রলেপ) করাইয়া রন্ধন চলিতেছে। তাম্রের কষ অতীব বিষাক্ত। তাহার দূরীকরণার্থে রঙ্গের কলায়। ইহাও সর্ব্বত্র নিরাপদ নহে। যাহা হউক, যেখানে কোনরূপ ভয়ের কারণ থাকে, তৎপরিবর্জ্জনই বিধেয়। অতএব মৃৎপাত্র ব্যবহারই পরামর্শ সিদ্ধ! আবার তাহাও প্রত্যহ পরিত্যাগ করা বিধিসঙ্গত। কিন্তু গৃহস্থের পক্ষে তাহা একপ্রকার অসম্ভব বিবেচনায় শাস্ত্রকরেরা অসমর্থ পক্ষে অষ্টাহ, পক্ষ, মাস পর্য্যন্ত সময় নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন।

ধাতুপাত্রে বিশেষতঃ পিত্তল-পাত্রে পাক এরূপ নিষিদ্ধ যে স্বর্গীয় প্রসিদ্ধ কাদার সাহেব বিদ্যালয়ে কোনরূপ পিত্তলসংযুক্ত দ্রব্য ব্যবহার করিলে, পর মুহূর্ত্তে হস্ত ধৌত এবং বিড়াল-চর্ম্ম (Cats Skin) মার্জ্জনে বিশুদ্ধ করিতেন। সুতরাং এই মতে পিত্তল-পাত্রে একরূপ অব্যবহার্য্য ও পরিত্যাজ্য।

রন্ধন-শালা।

যে স্থানে ভক্ষ্যবস্তু প্রস্তুত হয়, তাহা সর্ব্বতোভাবে পরিষ্কার হওয়া উচিত। খাদ্যের সহিত স্বাস্থ্যের অতি ঘনিষ্ঠ-সম্বন্ধ হেতু বিশেষে বিষম অনিষ্টপাত সম্ভাবনা।

নগরের ও পল্লীগ্রামের রন্ধনাগারের তুলনা করিতে গেলে, প্রথমোক্ত অপেক্ষা শেষোক্ত অনেক পরিমাণে উৎকৃষ্ট। সহরে স্থানের সংকীর্ণতা, সুতরাং পাকশালাও অপ্রশস্ততর স্থলের ভিতরেই প্রস্তুত হয় পল্লীগ্রামে স্থানের অসদ্ভাব কোথায়? অতএব তত্রত্য রন্ধন-ভবন অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত

কিন্তু বর্ত্তমানে স্বাস্থ্যের যাদৃশী দশা তাহাতে এবিষয়টি আদৌ উপেক্ষণীয় নয়। যে সে স্থানের প্রস্তুত খাদ্যদ্রব্যে দেহের ভদ্রাভদ্র নির্ভর করিতেছে, তৎপ্রতি ঔদাসীন্য কদাচ বিজ্ঞজনের অনুমোদনীয় হইতে পারে না—হওয়াও বিধেয় নয়।

পাকালয় যতই ক্ষুদ্র হইবে, রন্ধন কালে ততই উহা অপরিষ্কৃত হইয়া যাইবে। অপরিচ্ছিন্ন স্থানের পক্ব বা অপক্বদ্রব্যও সুতরাং তাদৃশ স্বাস্থ্যবিধায়ক হইবে না। এতৎসম্বন্ধে কয়েকটী নিয়ম নিম্নে দেওয়া গেল:—

১। পাকস্থান উচ্চতম, অভাবে উচ্চতর (দ্বিতলের উপর) হওয়া উচিত।

১। পাকগৃহ, "আগ্নেয়্যাং পচনালয়ম্" বাটীর অগ্নিকোণে নির্ম্মাণ কর্ত্তব্য।

২। রন্ধনশালায় উচ্চতর আকাশ হইতে সমাগত আলোক (Sky-light) প্রাপ্তির উপযোগী বাতায়ন অথবা অন্যরূপ বৃহত্তর বা বহুবিধ রন্ধ্র, যথা—চিমনী প্রভৃতির ন্যায় ছিদ্র থাকা একান্ত আবশ্যক। তাহা হইলেই পাক-গৃহে মালিন্যের (ধূম, ময়লা ইত্যাদির) সম্ভাবনা ঘটিবেনা। সম-সমুখীন (ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র) নাতিক্ষুদ্র জানালাদ্বারা রৌদ্র ও বাতাস আবশ্যকমত সমাগত হইতে পারে, তৎপক্ষে ঔদাসীন্য পরিহার্য্য।

৪। রন্ধন-নিকেতন, পরিতঃ ও সুপ্রশস্ত—সতত পরিচ্ছন্ন ও পরিষ্কৃত হওয়া নিতান্তই বাঞ্ছনীয়।

আমাদের পাকালয়, প্রতিদিন দুইবার কখনও তিনবার পর্য্যন্ত সুমর্জ্জিত এবং ধৌত করা হয়। এটি একটি সুন্দর বিধান।

৫। কিন্তু যাহাতে উহাতে কোন মতেই আর্দ্রতা না ঘটে তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। অধিক কি, অনার্দ্রভূমির উপর এই উদ্দেশে গৃহ নির্ম্মিত হওয়া বিধেয়। যদি কোন কোন অপরিহার্য্য কারণে নিম্নভূমিতে কিংবা আর্দ্রস্থানে রন্ধনগৃহ নির্ম্মাণে গৃহস্থকে বাধ্য হইতে হয়, তাহা হইলে "সিমেণ্ট" দ্বারা মেঝে পাকা করা কর্ত্তব্য। নিতান্ত নিরুপায় এবং অসমর্থ পক্ষে, কাঁচা মেঝে হইলে সদ্যস্ক গোময় (Indian Phenyle) দ্বারা প্রত্যহ পরিষ্কার করা বিধেয়।

৬। তন্নিকটে মলমূত্রাদির সম্বন্ধ মূলেই না থাকে।

৭। পাকগৃহের অনতিদূরে কৃত্রিম পয়ঃপ্রণালী (যথা, ড্রেন, নর্দ্দমা বা ছোট খাল) থাকা কদাপি সঙ্গত নহে। ড্রেণ প্রভৃতি না থাকিলে, কৃমি-কীটাদিও রন্ধনালয়ে প্রবিষ্ট হইতে পারে না।

৮। আবর্জ্জনাদি সুদূরে নিক্ষিপ্ত হওয়া উচিত।

৯। গৃহ-ভিত্তি-ভূমি (মেজে) ও তৎসঙ্গে গৃহ-প্রাচী ও গৃহের বহির্ভাগও অহরহঃ পরিষ্কৃত করা বিধি-সঙ্গত কার্য্য, তাহার আর সন্দেহ নাই।

অগ্নি, চুল্লী ও পাকশালা প্রভৃতির বিষয় একরূপ আলোচনা হইল, একণে আহার্য্য বস্তু সমূহ সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক।

(ক্রমশঃ।)

লীলাবতী দাস।

সংস্কৃত ভাষা এবং উহার ভাবগতি।

সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের ভাবগতি পাঠের জন্য সভাপতি মহোদয় কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়াছি। সভ্য মহোদয়গণের অধিকাংশ ব্যক্তি বিশেষ বিজ্ঞ ও নানা শাস্ত্রপারদর্শী সুতরাং তাঁহাদিগের সমক্ষে নিরর্থক কতকগুলি বাক্যের শাখা পল্লবে প্রবন্ধটী বিস্তৃত না করিয়া সংক্ষেপ ফলিতার্থের কথাগুলি প্রকাশ করিলেই বোধ হয় বক্তার বাচলতা অথবা অকৃতার্থতা দোষ মার্জ্জিত হইতে পারে। এরূপ বৃহৎ বিষয় সংক্ষিপ্তরূপে লিখিত হইলে নীরস হয় সুতরাং অনেক শ্রোতা তজ্জন্য দুষিতে পারেন। কিন্তু তদ্রূপ আড়ম্বর করিলে বিষয় নির্দ্দেশে ত্রুটি জন্মে। বিষয় নির্ণয় করাই প্রধান উদ্দেশ্য। বাক্য বিন্যাসের চাতুর্য্য ও মনোহারিত্ব দেখাইতে গিয়া প্রকৃত বিষয় হইতে পথচ্যুত হওয়া কর্ত্তব্য নহে। তদনুসারে বক্তব্য বিষয়ের সূত্রপাত করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

সংস্কৃত ভাষা।

সংস্কৃতা ইতি যা ভাষা বেদগীরিতি কথ্যতে।
সা নিত্যা পৌরুষেয়াচ চতুর্বর্গফলপ্রদাঃ॥
তস্যাং বুদ্ধিমতাং বুদ্ধিরীশ্বরং পশ্যতি ধ্রুবং।
প্রভুস্ববচনংতত্র নাস্তি তস্য বিচারণা॥
তস্মাৎ সংজায়তে জ্ঞানং তত্তু বেদ ইতি স্মৃতঃ।
প্রবিভাগেষু দৃশ্যন্তে বৃত্তান্তানিচ সর্ব্বথা॥
সম্ভূতে ধুর্দ্ধৈঃ সর্ব্বৈ ধ্যানযোগেন নিত্যশঃ।
তত্তিরূপণ কার্য্যেষু সন্তিশ্রুত্যাদয়ঃ পৃথক্॥
দর্শনাদিচ শাস্ত্রাণি মুনির্ভি লিখিতানিচ।
এতানি তু সুপাঠ্যানি বিজ্ঞৈঃ সুপ্রযত্নতঃ॥
স্মৃত্যাদিষু পুরাণেষু বিষয়াঃ সন্তি যে পুরঃ।
প্রাণুক্তানপ্যত্র কারণে মিত্রোক্তি রীতিতঃ॥
কাব্যাদিষু সুবিস্তরে গিরঃশ্রুতিমনোহরাঃ।
তাশ্চকান্তা কথাতুল্যা অনায়াসেন বোধকাঃ॥

কার্য্যের সূত্রপাতে প্রকাশ হইল যে সংস্কৃত ভাষা বেদমূলক অর্থাৎ অপৌরুষের এবং নিত্য। ইহার ভাষা ঈশ্বরের বাক্য। তিনি তাহার পুত্রগণের হিতার্থে সুমধুর ও সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন সুসঙ্গত কথায় যাহা কহিয়াছেন, তাহাই সংস্কৃত ভাষা। উহা তাঁহার আজ্ঞা স্বরূপ। ঐ আদেশ প্রভুর আদেশের ন্যায় অলঙ্ঘ্য ও প্রতিপালনীয়। কিন্তু ঐ আজ্ঞাগুলির মর্ম্মার্থ বুঝিতে গেলে আমরা এই বুঝিব যে বেদের বাক্যগুলির কতক চিরস্থায়ী, কতক সঞ্চারী। যাহা স্থায়ী তাহা অপরিবর্ত্তনীয়। যাহা সঞ্চারী তাহাই পরিবর্ত্তনশীল। সুতরাং আমরা কালদেশ পাত্রানুসারে অস্থায়ী অংশগুলির পরিবর্ত্তন, পরিমার্জ্জন ও পরিবর্দ্ধন দ্বারা সংসারের লোকস্থিতি ও উন্নতির পথ পরিষ্কার ও সুগম করিতে পারি। তদনুসারে বেদ হইতে শ্রুতির বিভাগ দেখা যায়। প্রথমে জ্ঞান যোগ মাত্র ছিল। উহা অনায়াসসাধ্য ছিল না, পরে শ্রুতিপরম্পরায় জ্ঞানকাণ্ডের বিকাশ হইল। এখন ইহা দেখা আবশ্যক যে, বেদ কিরূপ বস্তু। তাহাতে দেখা যায় যে ইহা সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন অর্থাৎ ইহার কোন অংশে কোন প্রকার ন্যূনতা দৃষ্ট হয় না। ইহা ষড়ঙ্গে পরিবর্দ্ধিত। ১ শিক্ষা, ২ কল্প, ৩ ব্যাকরণ, ৪ নিরুক্ত, ৫ জ্যোতিষ, ও ৬ ছন্দঃ। এই ছয়টী বেদের অঙ্গ। অর্থাৎ চক্ষুকর্ণ নাসিকাদি স্বরূপ।

১। শিক্ষা—বেদের উচ্চারণবিষয়ক শাস্ত্র।

২। কল্প—বেদের কার্য্য কারণের নির্দ্দেশক বিধি।

৩। সাধু শব্দের প্রয়োগ যাহাতে আছে তাহাকে ব্যাকরণ বলে।

৪। যাহাতে বর্ণাগম ও বর্ণের বিপর্য্যয়, বর্ণের বিকার ও বর্ণের বিনাশ ও ধাতুর

* সাহিত্য সভার অধিবেশনে পঠিত।

অর্থের পৃথকত্ব জ্ঞান জন্মে, তাহার নাম নিরুক্ত।

৫। জ্যোতিষ কালবোধক শাস্ত্র। ইহা দেখিয়া কোন্ সময়ে কি কাজ করিতে হইবে, তাহার নির্ণায়ক গ্রন্থ।

৬। ছন্দঃ—মন্ত্রাদির পদপরিচায়ক বর্ণ ও মাত্রা-জ্ঞানের শাস্ত্র।

এক্ষণে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ কহিয়া থাকেন যে, সমস্তই পরিবর্ত্তনশীল। অতএব সংস্কৃত ভাষা মূলভাষা নহে। সংস্কৃত এই শব্দ দ্বারাই উহা প্রতিপন্ন হয়। আমরা সে কথার উত্তরে কহিব যে সংস্কৃত মূলভাষা। যদি উহার মৌলিকতা না থাকিত তাহা হইলে সমস্ত ভূমণ্ডলের সমস্ত জাতির সাংসারিক কথা এভাষায় থাকিবে কেন? বস্তুতঃ কেবল ইহাই নহে যদি অন্য কোন ভাষাকে পরিমার্জ্জন করিয়া সংস্কৃত ভাষার উৎপত্তি হইয়া থাকে তবে সে ভাষার কিছুমাত্র চিহ্ন নাই কেন? অপিতু সেই ভাষায় যে জাতি কথা কহিত, সে জাতির বা লেশ মাত্র কেন পরিদৃষ্ট হয় না? সুতরাং ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের ঐ কথাগুলি স্বকোপলকল্পিত মাত্র।

ভারতীয় পুরাণ গ্রন্থে শক যবন ম্লেচ্ছাদি জাতিকে ভারতীয় সন্তান বলিয়া নির্দ্দেশ করে। সগর রাজার সন্তানগণ ও যযাতির পুত্রপঞ্চক ম্লেচ্ছ যবন চীন হুন শকাদি বর্গে (জাতিতে) পরিগণিত আছে। উহারা (বৃষল অর্থাৎ ধর্ম্মভ্রষ্ট) ব্রাত্য ক্ষত্রিয় বলিয়া স্পর্দ্ধা করে। সুতরাং ভূমণ্ডলের কোন জাতিকেই ভারতীয় আর্য্য সন্তানের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া অনুমিত হয় না।

সংস্কৃত ভাষার মূলান্বেষণ করিতে গেলে আমরা শব্দ ও ধ্বনি (স্বর) স্বরের সাহায্য দেখিতে পাই। বোধ হয় সেই সহায়তায় শব্দ সঙ্গীতাদিতে উচ্চারণ কালে সংশোধন হইত তজ্জন্যই ইহার নাম সংস্কৃত। বেদের মন্ত্রগুলি ছয় প্রকার স্বরে অর্থাৎ সুরে ধ্বনিতে সংগীত হইয়া থাকে। ষড়জ, মধ্যম, ঋষভ, গান্ধার, ধৈবত ও পঞ্চম। এইগুলি পশুপক্ষির রবসূত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অর্থাৎ তাহাদিগের রবের অনুকৃতিতে সংশোধিত বলিয়াই ইহার নাম সংস্কৃত।

ষড়জং রৌতি ময়ূরোহি।
অজা রৌতি গান্ধারং।
গাবো নর্দ্দন্তি চার্ষভং
অশ্বশ্চ ধৈবতং রৌতি
কুঞ্জরো রৌতি মধ্যমং
পুষ্প সাধারণে কালে
কোকিলা রৌতি পঞ্চমং।

রঘুবংশে মহাকবি কালিদাস এ বিষয়েরই উল্লেখ করিতে বিস্মৃত হয়েন নাই। যথা—

ষড়জসংবাদিনীঃ কেকাঃ দ্বিধাভিন্নাঃ শিখণ্ডিভিঃ।

বর্ণ-বিভাগে কণ্ঠতালব্যাদির বিচার কোন বিদেশীয় ভাষাতেই ছিল না। সংস্কৃতের অনুসরণ করিয়া বিদেশীয় ভাষার সংস্করণ ও শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে।

এ সকল সাদৃশ্য যখন বিভিন্ন দেশীয় ভাষার মধ্যে বিশেষরূপে প্রতিভাত হয়, তখন দেশীয় ভাষা সমূহের মূলপ্রকৃতি বা প্রসূতি যে সংস্কৃত ভাষা তৎ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। সুতরাং এক্ষণে সংস্কৃত ভাষার বিষয় বলা আবশ্যক। তদনুসারে বলিতে হয় যে এরূপ সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন ও সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর সুমধুর ভাষা আর জগতের কোন স্থানে পরিদৃষ্ট হইবে না। এই ভাষার বর্ণমালা দেখিলেই জানা যায় যে কণ্ঠ-তালব্যাদি বর্ণ-বিভাগ এবং হ্রস্ব, দীর্ঘ ও প্লুতাদির উচ্চারণ ভেদে শব্দার্থের সঙ্গতি এবং অসঙ্গতি অনায়াসে সম্যক হইয়া থাকে। অন্যকোন বিদেশীয় ভাষায় এরূপ কোন নিয়ম-পরতন্ত্রতা পরিদৃষ্ট হয় না।

প্রথমতঃ অক্ষরের নাম নির্দ্দেশেই অক্ষর উচ্চারণের স্থান অনুভূত হয় অর্থাৎ কণ্ঠ, তালু, মূর্দ্ধা দন্ত, ওষ্ঠ, এই কয় স্থানের কোন্‌টি স্পর্শ করিয়া বর্ণটী উচ্চারিত হইতেছে, উহা অনায়াসে বুঝা যায় যথা—অ, কবর্গ এবং হ কণ্ঠ। ই, চবর্গ শ, এ, ঐ এবং য তালব্য। ঋ, টবর্গ, র এবং ষ মূর্দ্ধণ্য। ৯, তবর্গ, ল এবং স দন্ত। উ, পবর্গ, এবং ও এবং ঔ ওষ্ঠ। বিদেশীয় অনেক জাতিরই ভাষায় বর্গীয় দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ণ নাই, এমন কি কোন কোন স্থলে কেবল ন ও ম দ্বারা পঞ্চম বর্ণের ও চন্দ্রবিন্দুর কার্য্য কোন প্রকারে সমাধা হইয়া থাকে। অপিতু টবর্গের স্থলে তবর্গ ও উহার বিপরীত হইয়া থাকে।

এতৎপ্রমাণ জন্য সংস্কৃত ভাষায় প্রত্যেক অক্ষরের নাম সংক্ষেপে বলা হইল। বিদেশীয় ভাষায় অক্ষরের নাম অভ্যাস করিবার সময় অক্ষরের উচ্চারণ স্থান কদাচ অনুভূত হয়। যথা—

Alfa, Bita ইত্যাদি Greek

আলেফ, বে, পে, টে, ছে, জিম্ ইত্যাদি পারস্য শব্দ দ্বারা বর্ণ নির্ণয় হইলেও সেই সেই বর্ণের মধ্যে কোন্ শব্দটি কোন্ স্থান হইতে উচ্চারিত হইয়াছিল, এবং কেই বা অগ্রে লোকমণ্ডলীতে উহা প্রচার করেন তন্নির্দ্দেশ বিষয়ে শাস্ত্রে বলে ওঁকার এবং অথ শব্দ প্রথমে ব্রহ্মার কণ্ঠ ভেদ করিয়া নির্গত হইয়াছিল। তজ্জন্য ঐ দুইটী শব্দ মাঙ্গলিক।

ওঁকার মধ্যে তিনটি অক্ষর আছে অ, উ, ম। কাজেই এই শব্দ হইতে স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের সংশ্রব জানা গেল। শব্দ, ব্রহ্ম, ও নিত্য ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। যে শব্দ শুনিয়া আমরা পরমতত্বের জ্ঞান লাভ করি তাহারই নাম বেদ। এই শব্দের ব্যুৎপত্তি লাভ করিলেই জানা যায় যে, যে শাস্ত্রে ব্রহ্ম-বিদ্যা জানা যায়, তাহার নাম বেদ—বিদ্ ধাতুর অর্থ জ্ঞান, তাবেক্ষ। বেদ।

যে সংস্কৃত ভাষার মূলে অর্থাৎ বেদে একটী অক্ষরে ও মন্ত্রার অর্থের সুসঙ্গতি ও অসঙ্গতি নিবন্ধন পৃথক পৃথক দেবতার নির্দ্দেশ হইয়া থাকে, অপিতু মন্ত্রাত্মক বীজের অর্থ পরিজ্ঞানে অন্তঃকরণে নিবৃত্তি জন্মে এবং ঈশ্বরে ভক্তি ও কর্ত্তব্য কর্ম্মে প্রবৃত্তি প্রধাবিত হয়, তাহা জ্ঞানকাণ্ডের প্রধান বস্তু। ঐ বস্তু হইতে পারমার্থিক ও সাংসারিক তাবৎ বিষয়ের সমাধা হয় বটে কিন্তু অনক্ষর ব্যক্তির সহজ উপায়ে সংসাধিত হইবার নানবিধ প্রতিবন্ধক দেখিয়া ঋষিবর্গ অশেষাবধ সুগম শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন।

তাঁহারা জানিতেন বেদ-বাক্য প্রভুর আদেশের ন্যায় অলঙ্ঘনীয় এবং তর্ক বিতর্কাদি দ্বারা বিচারাসহনীয় বরং সর্ব্ব প্রকারেই শিরোধার্য্য। কারণ উহাতে যাহা উক্ত হইয়াছে তৎসমুদয় লোকহিত মূলক হিতজনক। যাহা সর্ব্বলোকের শুভসাধক তাহা উপদেশ স্বরূপ। উপদেশ কথা সকল সময়ে মনে স্থায়ী হয় না। সুতরাং বেদের ভাষা নীরস।

(ক্রমশঃ)

শ্রীলালমোহন বিদ্যানিধি।

২১১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিশন প্রেসে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত।

সাহিত্য-সংহিতা।

দ্বাদশ খণ্ড] ১৩১৮ সাল, পৌষ ও মাঘ। [৯ম ও ১০ম সংখ্যা।

পঞ্জিকা-সংস্কার।

পাঠকগণ অবগত আছেন, গত ১৯ ৫ জানুয়ারী মাসে দ্বারকা-মঠের অধীশ্বর জগদ্গুরু শঙ্করাচার্য্য, ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে প্রধান প্রধান সিদ্ধান্ত-শাস্ত্রজ্ঞ, আধুনিক গণিতশাস্ত্রে সুনিপুণ ব্যক্তিগণ, পঞ্জিকাকারগণ এবং ধর্ম্মশাস্ত্র-বিশারদ পণ্ডিতমণ্ডলীকে সমবেত করিয়া, সিদ্ধান্ত-শাস্ত্র ও ধর্ম্মশাস্ত্রের অবিরোধ, শ্রৌতস্মার্ত্ত-কর্ম্মোপযোগী যথার্থকালজ্ঞাপক পঞ্জিকার গণনা কিরূপ করিতে হইবে, তাহার সুমীমাংসার জন্য এক মহতী সভা স্থাপিত করেন। আট দিন বিচারের পর সমাগত পণ্ডিতগণ সকলেই পঞ্জিকা-সংস্কারের অনুকূলে মত প্রকাশ করিয়াছেন। ঐ সভায় স্থিরীকৃত নিয়মানুসারে ভারতবর্ষের বহু প্রদেশে পঞ্জিকা-সংস্কার ঘটিয়াছে। বঙ্গদেশে বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা, সংস্কারের পক্ষপাতী হইলেও বর্ত্তমান সময়ে ঐ পঞ্জিকা কোন কোন বিষয়ে বোম্বাই পঞ্জিকা-সংস্কার-সভার বিরুদ্ধ নিয়মে যেরূপ গণিত হইতেছে, তাহাতে উক্ত পঞ্জিকা হিন্দুর ধর্ম্মকার্য্যের উপযোগিনী হইতেছে না তাহা পাঠকগণের ও উক্ত পঞ্জিকাকারগণের অবগতির জন্য ক্রমশঃ বিবৃত করিতেছি।

সিদ্ধান্ত-শাস্ত্রের মতে সায়ন সূর্য্য হইতে অয়নাংশ বিয়োগ করিলে, নিরয়ণ সূর্য্য হয় এবং নিরয়ণ সূর্য্যে অয়নাংশযোগ করিলে সায়ন সূর্য্যের পরিমাণ হইয়া থাকে। ভাস্করাচার্য্য সিদ্ধান্ত-শিরোমণিতে লিখিয়াছেন, "ছায়াতোঽগ্রাতো বা ভানুঃ সংক্রান্তিপাত এবস্মাৎ। পাতো নঃ স্ফুটভানুঃ স্ফুটভানুনো ভবেৎ পাতঃ।" ছায়া হইতে এবং অগ্রা হইতে বেধদ্বারা যে সূর্য্য জানা যায়, তাহা ক্রান্তিপাত (অয়নাংশ) যুক্ত অর্থাৎ সায়ন সূর্য্য। সায়ন সূর্য্য হইতে অয়নাংশ বিয়োগ করিলে নিরয়ণ সূর্য্যের পরিমাণ হয় এবং সায়ন সূর্য্য হইতে নিরয়ণ সূর্য্য অন্তর করিলে অয়নাংশের পরিমাণ হয়। উক্ত বচনে পাত শব্দের অর্থ ক্রান্তিপাত অর্থাৎ অয়নাংশ। অগ্রা শব্দের অর্থ সূর্য্যোদয় কালে ক্ষিতিজবৃত্তে (Horizon) পূর্ব্বচিহ্ন হইতে সূর্য্যের অন্তর। অয়নাংশ শব্দের অর্থ ক্রান্তিবৃত্ত (Cliptic) ও বিষুববৃত্তের (Equator) সম্পাত (Equinoctial points) হইতে মেষের আদি বিন্দুর অন্তর। অয়নাংশের গতি সম্বন্ধে সিদ্ধান্তকারদিগের মতভেদ থাকিলেও ভাস্করাচার্য্য বলিয়াছেন, সিদ্ধান্তশাস্ত্রে সুনিপুণ পণ্ডিতগণ যখন যে অয়নাংশ উপলব্ধি করেন তাহাই অয়নাংশ। তাঁহার উক্তি এই—"যদা যেঽংশানিপুণৈররূপ লভ্যন্তে তদা তে এব অয়নাংশাঃ।" বোম্বাই পঞ্চাঙ্গ-শোধন-সভার পণ্ডিতমণ্ডলী স্থির করিয়াছেন, সূর্য্যসিদ্ধান্ত-অনুসারে নির্ণীত মেষসাংক্রমণকালে যে সায়ন সূর্য্যের

পরিমাণ তাহাই অয়নাংশ। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে নিরয়ণ সূর্য্য ও সায়ন সূর্য্যের অন্তর অয়নাংশ। মেষসংক্রমণকালে নিরয়ণ সূর্য্য ০ শূন্য, সুতরাং তৎকালে সায়ন সূর্য্য তুল্যই অয়নাংশ হইবে। বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকায়ও এই নিয়মেই অয়নাংশ গণিত হয় এবং ঐ অয়নাংশ তাঁহারা নাবিকপঞ্জিকার সায়ন গ্রহ হইতে বিয়োগ করিয়া নিরয়ণ গ্রহ করেন এবং তাহা হইতে নক্ষত্র, যোগ, গ্রহসঞ্চারাদি গণনা করেন। কিন্তু তাঁহাদের মেষসংক্রমণ গণনায় দেশান্তর গ্রহণে অশুদ্ধি থাকায় অয়নাংশ ও মেষসংক্রমণ অশুদ্ধ হইতেছে সুতরাং পঞ্জিকা খানির প্রায় সকল অংশই অশুদ্ধ হইতেছে।

৩০০ বৎসরের অধিককাল হইল বঙ্গদেশে রাঘবাচার্য্য নামক একজন জ্যোতির্ব্বিদ্ পঞ্জিকা গণনার জন্য দিনচন্দ্রিকা নামক একখানা ও গ্রহস্ফুট ও গ্রহণাদি গণনার জন্য সিদ্ধান্তরহস্য নামক অপর একখানা পুস্তক প্রণয়ন করেন। পাঠকগণ অবশ্যই স্বীকার করিবেন, সে সময় কলিকাতায় রাজধানী হয় নাই, সুতরাং উক্ত রাঘবাচার্য্য তাঁহার নিজের দেশের জন্যই এই পুস্তক লিখিয়াছেন; কলিকাতার জন্য দেশান্তরাদি সন্নিবেশিত করা তিনি আবশ্যক বোধ করেন নাই। যদিও তাঁহার নিবাস কোথায় ছিল তাহা তিনি নির্দ্দেশ করেন নাই, তথাপি তাঁহার গ্রন্থে তিনি স্বদেশে পলভা ৫ অঙ্গুল ১০বাঙ্গুল ও দেশান্তর ধং২।৩৪ পল লিখিয়াছেন। ইহা হইতে বিক্রমপুরের নিকটবর্ত্তী স্থানে তাঁহার বাসস্থান ছিল ইহা অনুমান করা যায়। এস্থলে বাঙ্গুল শব্দের অর্থ অঙ্গুলির ৬০ ভাগের ১ ভাগ। যে দিবস দিন রাত্রি সমান হয়, সেই দিবস মধ্যাহ্নকালে ১২ দ্বাদশাঙ্গুল শঙ্কুর যে ছায়া হয় তাহার নাম পলভা। এই পলভা হইতে জানিতে পারা যায় সে স্থানের অক্ষাংশ (Latitude) ২৩।২০´ কলা, কিন্তু কলিকাতার অক্ষাংশ ২২।৩২´ কলা মাত্র এবং উজ্জয়িনী হইতে কলিকাতার দেশান্তর ধং ২।২ পল মাত্র। বোম্বাই পঞ্চাঙ্গ-শোধন-সভার পদ্ধতিতে বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকার উজ্জয়িনী হইতে কলিকাতার দেশান্তর ধং ২।৮ পল গৃহীত হইত, কিন্তু ইদানিং দেশান্তর পুনর্ব্বার ধং ২।৩৪ পল গৃহীত হওয়ায় প্রায় ১৩ মিনিট সংক্রমণ-কালের তফাৎ পড়িতেছে। ১৩১৪ সনের বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকার ভূমিকায় "গণকের নিবেদন" শীর্ষক প্রস্তাবে গণক শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন, "মহাবিষুব সংক্রান্তি উজ্জয়িনীর লওয়া প্রথা আছে এবং অদ্যাপি তাহাই লওয়া হইতেছে পূর্ব্বে বিক্রমপুরে পঞ্জিকা প্রস্তুত হইত এবং বিক্রমপুরের সময় দেওয়া হইত। উজ্জয়িনী হইতে বিক্রমপুরের দেশান্তর ধং ২।৩৪ এবং উজ্জয়িনী হইতে কলিকাতার দেশান্তর ধং ২।৮ পল। বিক্রমপুর হইতে নবদ্বীপে পঞ্জিকা প্রস্তুত আরম্ভ হইলেও দেশান্তর আর বদল হইল না; উজ্জয়িনী হইতে নবদ্বীপের দেশান্তরও সেই ধং ২।৩৪ থাকিল। এক্ষণে কলিকাতায় পঞ্জিকা প্রস্তুত হইতেছে কিন্তু দুঃখের বিষয় প্রচলিত পঞ্জিকা সমূহে দেশান্তর বদল হয় নাই, সেই ধং ২।৩৪ পল রহিয়া গিয়াছে। যখন সকল বিষয়ে বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকার সংশোধন করা হইয়াছে, তখন ঐ বিষয়ে কেন অশুদ্ধ থাকে এই বিবেচনায় আমি গত বৎসর হইতে উজ্জয়িনীর মহাবিষুব সংক্রান্তি সময়ে কলিকাতার দেশান্তর ২।৮ যোগ করিয়া পঞ্জিকায় লিখিতেছি।" পাঠক তাঁহাদের উক্তি হইতেই জানিতেছেন যে, পূর্ব্বে তাঁহারা অশুদ্ধি ত্যাগ করিয়া শুদ্ধ করিয়াছিলেন। এইক্ষণ তাঁহারা পুনর্ব্বার

অশুদ্ধ করিতেছেন। বর্ত্তমান সময়ে তাঁহারা প্রচলিত পঞ্জিকার সংক্রমণ কালে রিফ্রাকসন যোগ করিয়া তাহাকে সংক্রমণকাল বলেন। বর্ত্তমান বৎসরে গুপ্তপ্রেসে বৈশাখ প্রবেশ ৪৬।৪৩, ২ মিনিট অর্থাৎ ৫ পল যোগ করিয়া ৪৬।৫১ পল স্থানে ৪৬।৫২ লিখিয়াছেন। তাঁহাদের এই সংক্রমণ কাল অশুদ্ধ হওয়ায় অয়নাংশ ও নক্ষত্রযোগ সঞ্চারাদি অশুদ্ধ হইয়াছে। সাহিত্য-সংহিতার পাঠকগণের মধ্যে যাঁহারা ইংরেজী জ্যোতিষ শাস্ত্রের আলোচনা করেন, তাঁহারা রিফ্রাক্সন (Refraction) কি তাহা জানেন, অন্যান্য পাঠকগণের জন্য আমি সংক্ষেপে এ সম্বন্ধে বলিতেছি। কোনও বাটীতে একটী রৌপ্য মুদ্রা রাখিয়া এবং ঐ রৌপ্য মুদ্রার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া পাঠক ক্রমশঃ পশ্চাদ্দিকে ধীরে ধীরে গমন করিতে করিতে যে স্থানে রৌপ্য মুদ্রাটি প্রথম দেখা যাইবে না সেই স্থানে দণ্ডায়মান হউন; অপর এক ব্যক্তি ধীরে ধীরে ঐ বাটীতে জল দিলে রৌপ্য মুদ্রাটি দেখিতে পাইবেন। রৌপ্য মুদ্রা জলে ভাসে না সুতরাং রৌপ্য মুদ্রা বাটীর সহিত সংলগ্ন রহিয়াছে। তবে যে উহা দেখা যায় তাহা জলের স্বচ্ছতা জন্য মুদ্রার প্রতিবিম্ব মাত্র, যথার্থ মুদ্রা দর্শন ঘটে না। ঐরূপ জলের তীরে দাঁড়াইলে জলের ভিতরে বৃক্ষ-মনুষ্যাদির প্রতিবিম্ব দেখা যায় কিন্তু জলে ঐ সকল মনুষ্যাদি নাই। এইরূপ দর্পণ প্রভৃতি যে কোন স্বচ্ছ পদার্থেই এই প্রকার প্রতিবিম্ব দেখা যায় কিন্তু তাহা যথার্থ দ্রব্য নহে। পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে স্বচ্ছ জলীয় বাষ্প থাকায় যথার্থ সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই প্রতিবিম্বিত সূর্য্যোদয় দেখিতে পাওয়া যায়। বিশুদ্ধ সিদ্ধান্তে এই প্রতিবিম্বিত সূর্য্যোদয় হইতে দিনের আরম্ভ গণিত হইয়া থাকে। এই প্রতিবিম্বিত সূর্য্যোদয় ও যথার্থ সূর্য্যোদয়ের অন্তর রিফ্রাক্সন (Refraction)। পৃথিবীর চতুর্দ্দিকস্থ জলীয় বাষ্পের শীতলতার ন্যূনাধিক্য বশতঃ প্রতিদিন রিফ্রাক্সন ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে। এক বৎসর বা ৬মাস পূর্ব্বে পঞ্জিকার গণনা করা হয় সুতরাং তাহাতে যথার্থ রিফ্রাক্সন গুণিত হইতে পারে না, এজন্য বিশুদ্ধ সিদ্ধান্তের গণকমহাশয়গণ প্রতিদিন মোটামুটী উদয়কালে ২ মিনিট ও অস্তকালে ১ মিনিট রিফ্রাক্সন স্বীকার করিয়া লইতেছেন। ইহাতে যথার্থ সূর্য্যোদয়ের ২ মিনিট পূর্ব্বে সূর্য্যোদয় ও যথার্থ সূর্য্যাস্তের ২ মিনিট পর সূর্য্যাস্ত ধরিয়া লওয়া হয়। এইরূপে তাঁহারা প্রতিদিন দিনমানে ৪ মিনিট অর্থাৎ ১০ পলের বৃদ্ধি ও রাত্রিমানে ১০ পলের হ্রাস করিতেছেন। যথার্থ সূর্য্যোদয় কি তাহা পাঠকগণের অবগতির জন্য বলা হইতেছে। সুবিস্তীর্ণ প্রান্তরে দণ্ডায়মান হইলে নীলবর্ণ আকাশ চতুর্দ্দিকে ভূমির সহিত সংলগ্ন রহিয়াছে বোধ হয়; চতুর্দ্দিকে ঐরূপ গোলাকার ভূমির বেষ্টনকে ক্ষিতিজবৃত্ত (Horizon) বলে। ক্ষিতিজের নীচে গ্রহাদি থাকিলে তাহাদিগকে আমরা দেখিতে পাই না। ক্ষিতিজে আসিলে দেখিতে পারি। ইহাকে সিদ্ধান্তকারগণ উদয় বলিয়াছেন—ইহাই যথার্থ উদয়। রিফ্রাক্সান দ্বারা প্রতিদিন ১০ পল বৃদ্ধি করিলে বিষুবদিনে দিনমান ৩০ ত্রিশ দণ্ড স্থলে বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত মতে দিনমান দং ৩০।১৮ পল। যে দিবস যথার্থ দিনমান ২৯।৫০ পল, সে দিবস বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত মতে দিনমান ত্রিশদণ্ড। এইরূপে বিষুবদিনে দিনরাত্রি সমান না হওয়ায় "সমরাত্রিন্দিবে কালে বিষুবদ্বিষুবঞ্চ তৎ" এই বিষুব লক্ষণের অব্যাপ্তি এবং অন্যদিনে বিষুব লক্ষণের অতিব্যাপ্তি দোষ হইতেছে সুতরাং

রিক্রাস্মন গ্রহণ হিন্দুশাস্ত্র-বিরুদ্ধ। সিদ্ধান্ত শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন এবং জ্যোতির্ব্বিদগণ অবগত আছেন সূর্য্যোদয়কালে সূর্য্যের রাশ্যাদি অবয়ব অর্থাৎ রবিস্ফুট লগ্নের রাশ্যাদি অবয়ব অর্থাৎ লগ্নস্ফুটের তুল্য। পূর্ব্বদিকে ক্ষিতিজ-বৃত্তের সহিত ক্রান্তিবৃত্তের (Ecliptic) যে বিন্দু যখন সংলগ্ন হয় সেই বিন্দুই তখন লগ্ন। ঐ লগ্ন বিন্দু হইতে নিরয়ণ মেষাদি বিন্দু পর্য্যন্ত লগ্নস্ফুট রাশ্যাদি। ভাস্করাচার্য্য সিদ্ধান্ত শিরোমণিতে বলিয়াছেন—"প্রাক্‌ক্ষিতিজে লগ্নং লগ্নমণ্ডলং কুজে তদ্‌গৃহাস্তমিহলগ্নমুচ্যতে প্রাচি" রিক্রাস্মান ব্যবহার করিলে সূর্য্য ক্ষিতিজে আসিবার পূর্ব্বেই সূর্য্যোদয় বলা হয় সুতরাং লগ্ন তুল্য সূর্য্য হয় না। ইহাতে কোন কোন মাসে এরূপও হইতে পারে যে, সূর্য্য এক রাশিতে উদয় কালে লগ্ন অন্য রাশিতে। কল্পনা করা যাউক বৈশাখ মাস—মেষের প্রথম বিন্দুতে সূর্য্য, বিশুদ্ধ সিদ্ধান্তের সূর্য্যোদয়ের দুই মিনিট মধ্যে জাত বালকের মীন লগ্ন হইতে পারে। রাত্রিতে লগ্ন স্থির ধরিতে হইলে জ্যোতির্ব্বিদগণ সূর্য্য যে রাশিতে অবস্থিত তাহার সপ্তম রাশিতে অস্ত লগ্ন ধরিয়া তাহার ভোগ্য কালের আশ্রয়ে লগ্ন স্থির করেন কিন্তু রিক্রাস্মান ব্যবহৃত হইলে কখন কখন সূর্য্যাবস্থিত রাশির অষ্টম রাশিতেও কখন কখন সপ্তম রাশিতে অস্ত লগ্ন হইবে, ইত্যাদি বহুবিধ দোষ দৃষ্ট হয়। বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত ব্যতীত ভারতবর্ষীয় অন্য কোন পঞ্জিকাতেই রিক্রাস্মন ব্যবহৃত হয় না। বোম্বাই-পঞ্চাঙ্গ-শোধন সভাও রিক্রাস্মান গ্রহণ করিতে মত প্রকাশ করেন নাই। এজন্য আমরা রিক্রাস্মান ব্যবহার ধর্ম্মবিরুদ্ধ বলিয়া মনে করি। আমরা বলি সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে অরুণোদয়রূপে সূর্য্যকিরণ দৃষ্ট হইলেও তাহা যেরূপ সূর্য্যোদয় রূপে গণ্য হয় না, সেইরূপ যথার্থ সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে প্রতিবিম্বিত সূর্য্য-কিরণ দৃষ্ট হইলেও তাহাকে যথার্থ সূর্য্যোদয় রূপে গণ্য করা আমরা শাস্ত্রবিরুদ্ধ মনে করি। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেও অরুণরূপে সূর্য্য-কিরণের বিদ্যমানতা রঘুনন্দন মলমাসতত্ত্বে উল্লেখ করিয়াছেন। "যে মাঘে মাস্যুষসি সূর্য্যকরাভিতাম্রে স্নানং সমাচরতি চ রুনদীপ্রবাহে। উদ্ধৃত্য সপ্ত পুরুষাণ্‌ পিতৃমাতৃবংশ্যান্‌ স্বর্গং প্রয়াত্যমর-দেহধরো নরোঽসৌ।" যে সময় নক্ষত্র কিরণ ম্লান হয়, সেই সময় হইতে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত উষাকাল। উষাকাল অর্থাৎ সূর্য্যোদয় হয় নাই অথচ সূর্য্যকিরণ দ্বারা পূর্ব্বদিক্‌ তাম্রবর্ণ হইয়াছে, এ কথার মীমাংসার জন্য রঘুনন্দন বলিয়াছেন "সূর্য্যোদয়াৎ প্রাগপিতৎকরাস্তাস্ত্বেবাৎ" সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে অরুণোদয় রূপে সূর্য্য-কিরণের বিদ্যমানতা থাকে; প্রতিবিম্ব জন্য আরও কিঞ্চিৎ অধিক কাল তাহার বিদ্যমানতা গণ্য হইবে কিন্তু যাহাকে সূর্য্যোদয় বলিলে আমাদের শাস্ত্রবিরুদ্ধ হয় তাহা আমরা গ্রহণ করিতে স্বীকৃত নহি। এইরূপে রিক্রাস্মন ব্যবহার হেতু বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা হিন্দুধর্ম্ম-কার্য্যের কাল নিরূপণে অনুপযোগী হইয়াছে।

হিন্দুশাস্ত্রে সাবন দিন অনুসারে ধর্ম্ম কার্য্যের ব্যবস্থা হইয়াছে। সূর্য্যের উদয় হইতে পুনর্ব্বার উদয়ের নাম এক সাবন দিন। নক্ষত্র দিন হিসাবে সাবন দিনের পরিমাণ প্রতিদিন ভিন্ন ভিন্ন হইলেও সর্ব্বত্রই তাহার নাম সাবন। এক একদিন বা সাবন ৬০ দণ্ড। সাবন দিন ও নক্ষত্র দিনের (Sideral zinc) অবগতির জন্য সংক্ষেপে বর্ণিত হইতেছে। কল্পনা করা যাউক কোনও একদিন সূর্য্য ও কোন নক্ষত্রকে এক সময়েই উদিত হইতে দেখা গেল। তৎপরদিন অর্থাৎ নাক্ষত্র ৬০

দণ্ড পর পুনর্ব্বার সেই নক্ষত্রের উদয় হইবে, কারণ নক্ষত্রের গতি নাই। কিন্তু সূর্য্যের গতি থাকায় সূর্য্য নিজ গতিতে কিঞ্চিৎ পূর্ব্বদিকে গমন করিয়াছেন। সূর্য্য যে পরিমাণ [illegible] গমন করিয়াছেন, তাহার উদয় হইতে যে কাল লাগে, তাহা ঐ নক্ষত্র (Sideral) ৬০ দণ্ডে যোগ করিলে নক্ষত্র কাল হিসাবে এক সাবন দিনের পরিমাণ হয় কিন্তু ইহার নাম সাবন ৬০ দণ্ড বা সাবন এক দিন। সিদ্ধান্তে উক্ত হইয়াছে "উদয়াদুদয়ং ভানোর্ভূমি সাবন বাসরঃ।" প্রতিদিনের সূর্য্যগতির ভিন্নতা ও প্রতি রাশির উদয়কালের ভিন্নতা হেতু নাক্ষত্রকাল হিসাবে এই সাবন দিনের পরিমাণ প্রতিদিন ভিন্ন হইয়া থাকে সত্য কিন্তু সাবন হিসাবে তাহার পরিমাণ ৬০ দণ্ডই হইবে। একটী পকেট ঘড়ীর ৬০ ভাগের একভাগ এক মিনিট, একটী বড় ওয়ালক্লকের ৬০ ভাগের এক ভাগও এক মিনিট। স্কেল অনুসারে ধরিতে গেলে ছোট ঘড়ীতে অল্প পরিমাণে বড় ঘড়ীতে অধিক পরিমাণে মিনিট হয় মাত্র কিন্তু সকল প্রকার ঘড়ীতেই ৬০ মিনিটেই ঘণ্টা থাকে তাহার কিছু কমবেশী নাই; তদ্রূপ নক্ষত্র হিসাবে নির্ণীত সাবন দিনকে ৬০ ভাগে বিভক্ত করিলে তাহার এক এক ভাগের নাম সাবন একদণ্ড। নাক্ষত্র দণ্ড হিসাবে এই দণ্ড গুলির পরিমাণ কমবেশী হইলেও সমষ্টিতে সাবন ৬০ দণ্ডই হইবে—এক এক ভাগ সাবন এক দণ্ডই হইবে। হিন্দু-শাস্ত্রে এই সাবন দিনেরই ব্যবহার হইয়া থাকে। গুপ্ত প্রেশাদি যে কোন পঞ্জিকা দেখুন সকলেরই দিনমান ও রাত্রিমান যোগ করিলে ৬০ দণ্ডই হইয়া থাকে। কেবল বঙ্গদেশ কেন ভারতবর্ষের যে কোন প্রদেশের পঞ্জিকা দেখুন সকল পঞ্জিকাতেই দিনমান ও রাত্রিমান যোগ করিলে ৬০ দণ্ড হইয়া থাকে। পূর্ব্বে এ দেশে ঘড়ীর প্রচলন ছিল না সুতরাং মধ্যম কাল (Meantime) ব্যবহৃত হইত না। শঙ্কু যন্ত্র দ্বারা বা পাদচ্ছায়া প্রভৃতি অনুসারে লোক স্পষ্টকাল অবগত হইত। সুতরাং স্পষ্ট কালই আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুমোদিত। সূর্য্য ঠিক যাম্যোত্তর বৃত্তে (Meridian) আসিলে সিদ্ধান্ত শাস্ত্রকারগণ যথার্থ মধ্যাহ্ন কাল (Apparent-noon) বলেন। ইহাকেই শাস্ত্রকারগণ আবর্ত্তকাল বলিয়াছেন। স্মার্ত্ত রঘুনন্দন শ্রাদ্ধতত্ত্বে লিখিয়াছেন "আবর্ত্তনং পশ্চিমদিগবস্থিত ছায়ায়াঃ পূর্ব্বদিগ্গমনারম্ভকালঃ।" প্রাতঃকালে বস্তুর ছায়া পশ্চিম দিকে থাকে। এই ছায়া যে সময় পশ্চিমদিক্ হইতে পূর্ব্বদিক্ যাইতে আরম্ভ করে, সেই সময়ের নাম আবর্ত্তন (Apparent-noon)। মলমাসতত্ত্বে লিখিয়াছেন—"আবর্ত্তনাৎ বাসরস্য ছায়া পরিবর্ত্তনাৎ।" চতুর্ব্বর্গচিন্তামণির পরিশেষ খণ্ডে শ্রাদ্ধপ্রকরণে হেমাদ্রি লিখিয়াছেন, "পূর্ব্বাহ্নো দ্বিধা কুতপস্যাহ্নঃ পূর্ব্বোভাগঃ।" তথাচ স্কন্দপুরাণে—"আবর্ত্তনাত্তু পূর্ব্বাহ্নো হ্যপরাহ্নস্ততঃপরঃ ইতি আঙামর্য্যাদায়াং ছায়ায়াঃ পরিবর্ত্তনং মর্য্যাদী কৃত্য যঃ কালঃ স পূর্ব্বাহ্নঃ।" আঙ্ উপসর্গটী এখানে মর্য্যাদা (সীমা) বোধক ছায়ার পরিবর্ত্তনকে সীমা করিয়া যে কাল তাহার নাম পূর্ব্বাহ্ন। পাঠকগণ ইহা হইতে জানিতে পারিতেছেন হিন্দুশাস্ত্রে যে মধ্যাহ্নের (Noon) ব্যবহার আছে, উহা স্পষ্ট মধ্যাহ্ন (Apparent-noon) মধ্য মধ্যাহ্নের (Mean-Noon) ব্যবহার নহে। আবর্ত্তন কালটী স্পষ্টকাল সুতরাং তাহার সহিত তুলনায় যে সকল দণ্ডাদি ব্যবহৃত হইয়াছে তাহাও স্পষ্টকাল (Apparent-time) যথা কালমাধবীয়ে ব্যাসঃ "কুতপ প্রথমে ভাগে

একোদ্দিষ্ট মুপক্রমেৎ। আবর্ত্তন সমীপেবা তত্রৈব নিয়তাত্মবান্। আবর্ত্তনং পশ্চিম দিগবস্থিতচ্ছায়ায়াঃ পূর্ব্বদিগ্গমনারম্ভকালঃ। তৎসমীপে কুতপ শেষদণ্ডে দিনমানের ১৫ ভাগের ১ ভাগের নাম মুহূর্ত্ত, অষ্টম মুহূর্ত্তের নাম কুতপ। ব্যাস বলিয়াছেন কুতপের প্রথম ভাগে একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ আরম্ভ করিবে অথবা আবর্ত্তনের সমীপ কালে অর্থাৎ কুতপের শেষ দণ্ডে আরম্ভ করিবে। এইরূপ আবর্ত্তন কালের সহিত সম্বন্ধ জন্য মুহূর্ত্ত দণ্ডাদি সকলই স্পষ্টকাল।

মধ্যম কালের ব্যবহার হিন্দু শাস্ত্রে নাই। বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকায় নাবিক-পঞ্জিকার লিখিত মধ্যম কাল অনুসারেই তিথ্যাদি গণিত হয় এবং স্মৃতির বা স্থাপক মহাশয়ও সিদ্ধান্ত জ্যোতিষ শাস্ত্র না জানায় ঐ মধ্যম কাল অনুসারেই ধর্ম্ম কার্য্যের ব্যবস্থা দিয়া আসিতেছেন। ইহাতে ঐ পঞ্জিকা হিন্দুদিগের ধর্ম্ম কার্য্যের অযোগ্য হইয়াছে। নাবিক-পঞ্জিকা অনুসারে গণনা করিয়াও মধ্যম কালকে কাল সমীকরণ (Equation of Time) দ্বারা স্পষ্ট কালে পরিণত করিয়া পঞ্জিকা গণনা করা যায় কিন্তু উক্ত পঞ্জিকায় তাহা হইতেছে না। কলিকাতা গবর্ণমেণ্ট ভূতপূর্ব্ব জ্যোতিষ-শাস্ত্রাধ্যাপক স্বর্গীয় পঞ্চানন সাহিত্যাচার্য্য মহাশয়ের আদেশানুসারে আমরা ১৩১৮ সনের জন্য যে পঞ্চানন-পঞ্জিকা নামক দৃক্‌সিদ্ধ পঞ্জিকা গণনা করিয়াছিলাম তাহাতে আমরা উক্ত দোষ সকল পরিত্যাগ করিয়া যথার্থ হিন্দু-শাস্ত্রানুমোদিত দৃক্‌গণিতৈক্য পঞ্জিকা প্রস্তুত করতঃ প্রকাশ করিয়াছিলাম, কিন্তু কোনও ধনী ব্যক্তির সাহায্য না পাওয়ায় আপাততঃ তাহা হইতে বিরত আছি। আমরা আশা করি বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকার কর্ত্তৃপক্ষগণ অতঃপর বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকার সংস্কার করিয়া যথার্থ বিশুদ্ধ করিতে মনোযোগী হইবেন।

শ্রীরাধাবল্লভ জ্যোতিস্তীর্থ।

সংস্কৃত ভাষা এবং তাহার ভাবগতি।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

বেদের নাম ত্রৈবিদ্য অর্থাৎ ঋক্, যজু, সাম এই তিন ভাগে প্রধানতঃ বিভক্ত। অথর্ব্ব বেদ এই তিনেরই অংশ বিশেষ; উহাতে আয়ুর্ব্বেদ, গন্ধর্ব্ববেদ, সঙ্গীত, ধনুর্ব্বেদ, যুদ্ধবিদ্যা, মোহিনীবিদ্যা অর্থাৎ লোক-রহস্য বিশেষরূপে কথিত হইয়াছে। ইন্দ্রজাল, কিমিয়া বিদ্যা ও অস্ত্র-চিকিৎসাদির ব্যবস্থা বিশেষরূপে নির্দ্দিষ্ট আছে, সুতরাং সাধারণ বুদ্ধির সুগম নহে। ইত্যাদি হেতু বশতঃ প্রজাপতিবর্গ স্মৃত্যাদি ধর্ম্মশাস্ত্র ও ন্যায়-মীমাংসাদি দর্শনশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া ধর্ম্মোপদেশ এবং লৌকিক আচার ব্যবহারের পরমার্থ তত্ত্বের পথ পরিষ্কার ও সুগম করিয়া দিয়াছেন। তথাপিও তাহা সাধারণ বুদ্ধির সুগম বলিয়া বোধ হয় না। কারণ ঐ সকল গ্রন্থের বাক্যগুলি মিত্রের উপদেশের ন্যায় দৃঢ় সারবান, তর্ক ও যুক্তির বিষয়ীভূত, সুতরাং অনায়াসবোধ্য নহে। সেই কারণে তাঁহারাই মনুষ্য মাত্রের হিতকামনায় পুরাণের অর্থাৎ ইতিহাসের সৃষ্টি করেন। তাহাতেই লোকের মনে অনায়াসে ধর্ম্মে প্রবৃত্তি ও কর্ত্তব্য কর্ম্মে দৃঢ়তা জন্মে। তাহাতে রামায়ণ ও মহাভারতাদি পুরাণের সৃষ্টি হয়। তাহার উদ্দেশ্য এই,—

"রামাদিবৎ প্রবর্ত্তিতব্যং ন রাবণাদিবৎ কার্য্যং।"

এই মূল সূত্রকে ধরিয়া ভারতীয় আর্য্য সন্তান মাত্রেই সত্য পথের পথিক ও সৎ অসৎকর্ম্মে ও অসৎ পথে পদার্পণ করিতে নিতান্তই কুণ্ঠিত। ইহারা স্মৃতি ও পুরাণাদি ধর্ম্ম-শাস্ত্রকে প্রিয় বন্ধুর উপদেশ জ্ঞান করিয়া হিতাহিত ও পাপপুণ্য বিচার করিয়া লয়। তাহাতেই লোকস্থিতি ও সংসারের উন্নতি দেখা যাইতেছে। পুরাণের ও স্মৃতি শাস্ত্রের ভাষা বৈদিক ভাষা অপেক্ষা সহজ এবং নানা প্রকারে আলোচিত হয় এবং সাংসারিক কার্য্যে ও আচার ব্যবহারে নিয়তকাল সুপ্রযুক্ত হয় বলিয়া কাহারও নিকট কঠিন ও অরুচিকর বলিয়া বোধ হয় না। বরং মনুষ্যগণ অসৎপথ পরিত্যাগ ও সৎপথের পথিক হইয়া পাপকার্য্যে বিরত ও পুণ্যকর্ম্মে একান্ত অনুরক্ত হইয়া থাকে। আমরা যদি নিতান্ত মূর্খকেও জিজ্ঞাসা করি, "তুমি তোমার পুত্র ও প্রতিবাসীর প্রতি কি উপদেশ দান করিতে পার?" সে কহিবে- "মিথ্যা কথা কহিতে বারণ করি, সত্য কথা বলিতে অনুরোধ করি। অসৎ কর্ম্মের নাম গন্ধের সংশ্রবেও থাকিতে নিষেধ করি।" তাহার প্রতিবাদে যদি বলি, "তুমি কেন এরূপ বল?" সে তখনই কহিবে, "যুধিষ্ঠির 'অশ্বত্থামা হত।' এই কথাটি বলিয়া কত অনুতাপ করিয়াছিলেন। শেষে তজ্জন্য তাঁহাকে নরক পর্য্যন্ত দর্শন করিতে হইয়াছিল। পঞ্চ পাণ্ডব সৎপথে ছিলেন বলিয়াই ভারতের সমস্ত রাজা ও প্রজা তাঁহাদিগের সপক্ষ হইয়াছিল। রাম ও সীতা সৎপথের পথিক ছিলেন বলিয়া এখনও সকল মনুষ্যই তাঁহাদিগকে সর্ব্বান্তঃকরণে ধ্যান, পূজা ও কীর্ত্তন করিয়া থাকে। রাবণাদি দুষ্ট ব্যক্তি বর্গকে ঘৃণাপূর্ব্বক তাহাদিগের নামে ভূমিতে পদাঘাত করিয়া অসৎ কার্য্যের পরিণাম মন্দ ইহা বুঝাইয়া দেয়।" ইহা অপেক্ষা পুরাণের কথা শ্রবণের উদ্দেশ্য আর কতদূর উচ্চ এবং মনোহারী হইতে পারে? অন্য কোন দেশেরই কোন লোকের স্ত্রী, বালক, বৃদ্ধ ও যুবার মধ্যে এমন ধর্ম্মভাব কায়মনো-বাক্যে দেখা যায় না। মুখে রাম রাম বলা, কার্য্যে প্রণাম ও পূজা, শরীরে রামকবচ ধারণ, এরূপ ক্রিয়া বাল্মীকির শিক্ষিত কুশ-লবের সুমনোহর সুস্বরে সঙ্গীত রামায়ণের পদাবলী অনুশীলনেই হইয়াছে ইহা স্বীকার করিতে হইবে। পুরাণের মধ্যে নানাবিধ হিতোপদেশ ও কর্ত্তব্য কর্ম্মের বিধি আছে, তাহা দেখিলেই সকলেরই মনে ক্রমোন্নতির পথ আবিষ্কারের ইচ্ছা জন্মে।

পুরাণে দশ অবতারের বর্ণন আছে। ঐ বিষয় লইয়া ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ কত রসিকতা ও উপহাসজনক কথা প্রচার করিয়াছেন তাহা বলা যায় না। আমরা যাহা বুঝি তাহা এই,—মৎস্যাবতারে বেদের উদ্ধার কল্পনা নহে। মহা প্রলয়ের জলে জগন্মণ্ডল নিমগ্ন হইলে,জীবের মধ্যে একমাত্র মৎস্য ছিল। মৎস্য প্রাণী বলিয়া গণ্য। প্রাণ থাকিলেই জ্ঞান থাকে, সুতরাং মৎস্যের দ্বারা বেদের উদ্ধার হইল। নারায়ণ মধু কৈটভ নামক অসুরদ্বয়ের সঙ্গে দৈব পরিমিত পাঁচহাজার বৎসর বাহুযুদ্ধ করিলেন। শেষে তাহাদিগেরই নিজের কথায় তাহাদিগকে বিনাশ করিলেন। মধু অর্থাৎ জলীয় কীট। কৈটভ কীটবৎ ভাতি ইতি কৈটভ। কীট ও কীটসম অর্থাৎ কীটাণুদিগকে নিপাত করিতে নারায়ণের পাঁচ সহস্র বৎসর কাল গত হয়। ইহার তাৎপর্য্য আর কিছুই নহে। জলীয় জগতের

কীট ও কীটাণু ও পতঙ্গাদি বিনাশ করিতে খপরূপী নারায়ণের পাঁচ সংস্র বৎসর গত হয়। তৎপরে তাহাদিগেরই মেদ দ্বারা মেদিনীর উৎপত্তি হইয়াছিল। এখন মধুকৈট-ভের পরাক্রমের রূপক ভাল হইল কি না?

দ্বিতীয় কথা—কূর্ম্মাবতার। কূর্ম্ম মেদিনীকে পৃষ্ঠে ধারণ করিয়া জল হইতে উত্তোলন করে ও এখন সর্পের মস্তকে অবস্থানপূর্ব্বক পৃথ্বীকে রক্ষা করিতেছে, ইহা অনেকেই অলীক কথা বলিয়া উপহাস করিবেন অথবা উড়াইয়া দিবেন। আমরা উহার সত্যতা প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করি। জগন্মণ্ডলের রক্ষার জন্য পরমেশ্বর উনপঞ্চাশৎ বায়ু সৃষ্টি করিয়াছেন, তন্মধ্যে দশবিধ বায়ু ভূমণ্ডলে পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে। বাহ্য বায়ু নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর, ধনঞ্জয় ও দেবদত্ত। অন্তর্ব্বায়ু প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান।

নাগ বায়ু পৃথিবীকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ধারণ করেন নাই। উহার উপরে কূর্ম্মনামক বায়ু আছে, সুতরাং সর্পের উপরিভাগে অর্থাৎ মস্তকে কূর্ম্মের অবস্থান। কূর্ম্মই ধরাকে ধারণ করিয়া আছে। নাগে টলিলেই ভূমিকম্প হয়। এখন দেখ ভূপৃষ্ঠের বস্তু মণ্ডলের প্রকম্পনে ভূমির কম্প হয় কি না। কৃকর বায়ু দ্রব্যের রং পরিবর্ত্তন করে। ধনঞ্জয় বায়ু জীব সংস্থানকারী। দেবদত্ত বায়ুর কার্য্য পুষ্টিসাধন। নাগ বায়ুর কার্য্য আকুঞ্চন ও প্রসারণ। কূর্ম্ম বায়ুর ক্রিয়া স্থিতি ও বিস্তৃতি, প্রাণ বায়ুর কার্য্য শ্বাস ও প্রশ্বাস পরিত্যাগ। অপান বায়ু মলমূত্রাদি নিঃসরণ করিয়া দেয়। সমান বায়ু শরীরে রস অর্থাৎ রক্তের সামঞ্জস্য বিধান করে। উদান বায়ু ঊর্দ্ধদিকে নির্গত করায় শোণিত সঞ্চার করিয়া দেয়। ব্যান বায়ু রক্ত রাঙ্গা নাড়ীর সর্ব্বত্র রক্ত বিস্তার করিয়া থাকে।

নাগস্যাকুঞ্চনপ্রসারণং
কূর্ম্মস্য স্থিতিবিস্তারং
কৃকরস্য বর্ণবিশ্লেষং
ধনঞ্জয়স্য জীবসংস্থানং
দেবদত্তস্য পুষ্টিঃ
ইত্যেতানি বাহ্য বায়ুনা
মন্তর্ব্বায়ুনা ক্রিয়া শৃণু
প্রাণাঃ নিশ্বাসপ্রশ্বাসৌ
অপানো মলমূত্রাণিতু
সমানো রক্তসঞ্চারে
সামঞ্জস্য বিধীয়তে
উদানো ঊর্দ্ধগতাবায়ুঃ
সতু শূন্যতাইতি কার্য্যতে
সমানো রক্তবহগামী
সাম্য প্রকৃতিরিতি কথ্যতে
ব্যানো রসং বিস্তারয়তি সহা।

জগন্মণ্ডলের প্রথমাবস্থায় শূন্যের উপরি বায়ুমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী জলরাশি। উহার অন্তর্বর্ত্তী পৃথিবী সুতরাং জলীয় জগতে মৎস্য কূর্ম্মাদির সৃষ্টি তাহাতে মৎস্য ও কূর্ম্মাবতার। কূর্ম্ম উভচর জল ও স্থলসঞ্চারী জীব।

দ্বিতীয়াবস্থায় বরাহাদি পশুর সৃষ্টি। এ সময়ে ভূভাগে জলজ ও স্থলজ প্রাণী, বৃক্ষলতাদির উৎপত্তি দেখা যায়। তাহাতেই বরাহের দ্বারা জল হইতে ক্ষৌণীদেবীর উদ্ধার সাধন। কারণ তখন বরাহ অপেক্ষা বৃহত্তর জীবের উদ্ভব হয় নাই। তৎপরে মহিষাসুরের যুদ্ধ-বর্ণন সংবাদ। মহিষাসুরের যুদ্ধের সময়ে ছিক্ষুর (চামর) হস্তী, সিংহ, বিড়ালাদি পশুর সঙ্গে দেবীর সংগ্রাম অর্থাৎ বন্য পশুর উৎপাত নিবারণ দ্বারা দেবতা ও মানুষের স্থিতি সাধনের উপায় বিধান।

তৃতীয়াবস্থায় নরসিংহের অবতার বর্ণন। এই সময় পার্থিব অবস্থায় মনুষ্যের পশুভাব অধিক ছিল। সুতরাং অর্দ্ধপশু ও অর্দ্ধ-

মানবাকৃতির বিবরণ অর্থাৎ সম্পূর্ণভাবে মনুষ্যের দয়া-দাক্ষিণ্যাদি পরিপুষ্ট হয় নাই, হিংসা প্রবৃত্তিই বলবতী। তাহাতেই হিরণ্যকশিপুর বিনাশ নিমিত্ত ধর্ম্ম প্রবৃত্তি প্রহ্লাদের সংরক্ষণ।

তৎপর অবস্থায় মনুষ্যের ষড়রিপুর বশীভূততা এবং স্ত্রৈণভাবের প্রাধান্য। তাহার প্রামাণ্য সংস্থাপন জন্য উত্তানপাদ রাজার সুরুচির প্রতি একান্ত স্ত্রৈণভাব। উহার নিবৃত্তি—সদ্ভাবের আবির্ভাব দেখাইবার জন্য পঞ্চমবর্ষীয় শিশু ধ্রুবের তপস্যা ও পরমতত্ত্বজ্ঞানের নির্দ্দেশ।

চতুর্থাবস্থায় সম্পূর্ণরূপে মানবমণ্ডলে অহঙ্কার এবং অভিমানাদি প্রবৃত্তির বৃদ্ধি। সেইজন্য বলিরাজের অতিদান প্রবৃত্তি এবং সর্ব্ববিষয়ের আতিশয্য দমন জন্য বামন অবতারে বলির নিকট হইতে স্বর্গ মর্ত্ত্য গ্রহণ এবং তাহাকে পাতালে প্রেরণ। ইহাতে তিনি কহেন, একজন মূর্খ সংস্রবেও তিনি স্বর্গ ভোগ ইচ্ছা করেন না, পাঁচজন পণ্ডিতের সঙ্গে পাতাল-গমনও তাহার পক্ষে সুখজনক ও শ্রেয়স্কর। বামন অবতারে ছলনা দেখান হইল এবং মনুষ্যের অবয়বে সকল সময়ে সর্ব্বাঙ্গ সম্পূর্ণতা হয় না তাহাও প্রদর্শিত হইল। যাহার আকৃতি বৈলক্ষণ্য দেখা যায় ইহাই বিশেষরূপে প্রকাশিত হইল।

তৎপরবর্ত্তী অবস্থায় পরশুরামের জন্ম। ইনি কুঠারহস্ত। এ সময়ে মণ্ডলীতে হিংসা প্রবৃত্তির বাহুল্য হইয়াছিল তাহার ধ্বংস সাধন মূল উদ্দেশ্য। তদনুসারে মানবজাতির স্থিতি মানসে একবিংশতিবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করা, অর্থাৎ হিংস্রক লোকের তিরোধান বিধান।

তৎপরবর্ত্তী অথচ সমসাময়িক অবস্থায় দাশরথী রামের আবির্ভাব। ইহা হইতেই পরশুরামের অদ্বিতীয় বীরত্বাভিমানের দমন, এবং ভূমণ্ডলের শান্তি বিধান। প্রজার মধ্যে একপ্রাণতা এবং রমণী মধ্যে পতিপ্রাণতা প্রদর্শন প্রধান উদ্দেশ্য।

পঞ্চমাবস্থায় কৃষ্ণাবতারের বৃত্তান্ত। এ অবস্থায় যত প্রকার কূট নীতি আছে, তাহার প্রকাশ ও নিবারণোপায় বিধান, ধর্ম্মভাবের একান্ত বিকাশ এবং অলৌকিক ভাবের উদ্ভব প্রদর্শন।

এই সমস্ত দেখিয়া আমরা কহিব, আমাদিগের শাস্ত্রে যাহা নাই, তাহা কোথাও এখনও বর্ণিত হইতে পারে না। ইউরোপীয় মহাপণ্ডিত ডারুইন সাহেব কহিলেন, কীটাণু হইতে ক্রমোন্নতিতে অবশেষে বানরের লাঙ্গুল খসিয়া মনুষ্যের উৎপত্তি। আমরা কহিব ভারতীয় শাস্ত্রে নানা জীবের অশীতি যোনি পরিভ্রমণ পরে মনুষ্যের উৎপত্তি। ডারুইন সাহেবের মতে বানরের লাঙ্গুল খসিয়া মানুষ হয়। যদি হইয়া থাকে না হইতে পারে, তবে তাহাদিগের জাতি মধ্যে দেখা দিবে। ভারতের মনুষ্য, মনুষ্য যোনিতেই উদ্ভূত হইয়া আসিতেছে, তাহাই হইবে। এইত ক্রমোন্নতির বিবরণ। পুরাণাদির বর্ণন দেখিয়া সকলেরই মনে হবে যে, ঐ সকল গ্রন্থে যে সকল সংসারীর ভাব ও ধর্ম্মভাব আছে, তৎসমুদয়ই বন্ধুর উপদেশ তুল্য অর্থাৎ সর্ব্বদাই সুরুচিকর ও সুখদায়ক হয় না, কিন্তু কর্ত্তব্য জ্ঞান বিশেষরূপে স্থিরিকৃত হয়। সুতরাং সহজ উপায় অন্বেষণ করা কর্ত্তব্য। তদনুসারে মানবমণ্ডলীতে পুরাণ, স্মৃতি ও দর্শন শাস্ত্রাদির কর্ত্তব্য বিষয় সৃষ্টি হইল।

কাব্যে প্রয়োজনে ইহা প্রধান রূপে জানা যায় যে, পত্নীরা যে ভাবে সংসারাশ্রমের সুখসাধন উপলক্ষ্যে সদা সর্ব্বপ্রকারে অনায়াসে সৎপ্রবৃত্তির উদ্রেক করিয়া দেন

এবং অসৎ প্রবৃত্তির নিবরণ করেন কাব্য গ্রন্থ তদ্রূপে মানব-হৃদয়ে সুখোপায়ে সর্ব্ব প্রকার অবস্থার বর্ণন সময়ে কালদেশ পাত্র ভেদে নানা রসে মধুরতা সম্পাদন পূর্ব্বক লৌকিক ও ধর্ম্ম উপদেশাদি প্রদর্শন করে। সেই কারণে কবির বাক্য সর্ব্বাপেক্ষা হৃদয়গ্রাহী, প্রীতিপদ ও হিতকর বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। সেই হেতু কাব্যপ্রকাশকার কহিয়াছেন,—নিয়তিকৃত নিয়মরহিতাং হ্লাদকময়ীমনন্যপরতন্ত্রাং। নবরসরুচিরাং নির্ম্মিতা মাদধতি ভারতি কবের্জ্জয়তি॥

যে কবির যেরূপ বর্ণনায় পারদর্শিতা ও শ্রেষ্ঠত্ব থাকুক না কেন, তাঁহার চরম উদ্দেশ্য সাংসারিক বিষয় বর্ণনের সঙ্গে তাৎকালীন জাতীয় ভাবের উদ্রেক সহ পরমার্থ তত্ত্বের জ্ঞান সাধন।

এই নিমিত্ত কেহ বক্রোক্তির প্রশংসা পরতন্ত্র হইয়া তদ্বিষয়ে নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন। কোন কবি কেবল শ্লেষালঙ্কারের পদ বিন্যাসে বিচিত্রতা দেখাইতে পশ্চাৎপদ হয়েন নাই। কেহবা যমকরচনার পারিপাট্য অনর্গলতা প্রদর্শন করিতে ত্রুটি করেন নাই। কেহবা কেবল অলঙ্কারের দিকে দৃষ্টি না করিয়া নানা ছন্দে নিজ কৃতির সৌন্দর্য্য সম্পাদনে ব্যতিব্যস্ত। কেহবা ব্যাকরণের সিদ্ধ পদের প্রয়োগ সাধনে একান্ত অনুরক্ত। ফলকথা কেহই তদীয় গ্রন্থের নির্ম্মাণ প্রয়োজন অভিধেয় ও সম্বন্ধ হইতে পশ্চাৎ হয়েন না। লোকব্যবহারের নিজ ধীশক্তির উন্মেষসহ সুমধুর উপদেশে পরমার্থ তত্ত্বের জ্ঞান সাধনের বিশেষ বর্ণন করিতে পরাঙ্মুখ হয়েন না। রত্নাবলীকার সপত্নীর ঈর্ষ্যাভাবের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন জন্য দুর্গা ও লক্ষ্মীকৃত শিব ও বিষ্ণুর প্রতি যথাক্রমে গঙ্গা ও সরস্বতীকে লক্ষ্য করিয়া স্বীয় স্বীয় স্বামীর নিন্দা করিতেছেন। উহা শ্লেষাকারে সমাহিত হইয়াছে।

সৎকাব্য পাঠ কালে যখন যে রসের ও ভাবের কবিতা দেখা যায়, পাঠকের অন্তঃকরণে তৎকালে সেই ... সেই ভাব উদয় হইয়া থাকে। এখানে একটী দৈন্য ভাবের কবিতা উদ্ধৃত করিলাম শ্রোতৃবৃন্দের অন্তঃকরণে কবিতা শুনিয়া সংসারের সদ্‌গৃহিণীর অন্তঃকরণের সম্পূর্ণ ছবি দেখিতে পাইবেন। সে এরূপ চিত্র, চিত্রকরে চিত্রিত করিতে পারে না। চিত্রকর বাহ্য লক্ষণেরই যথাযথ চিত্র করিতে সমর্থ কিন্তু অন্তঃকরণের ভাব প্রকাশ করিতে কবি যেমন সমর্থ তেমন আর কেহই নহেন।

বৃদ্ধোঽন্ধঃ পতিরেষমঞ্চকগতঃ স্থূনাবশেষং গৃহং
কালোঽভ্যর্ণজলাগমোকুশলিনী বৎসস্য বার্ত্তাপি ন।
যত্নাৎসঞ্চিততৈলবিন্দুঘটিকা ভগ্নেতি পর্য্যাকুলা
দৃষ্ট্বা গর্ভভরালসাং নিজবধূং শ্বশ্রূশ্চিরং রোদিতি॥

শ্রীহর্ষ সপত্নীজনের প্রতি ঈর্ষা ভাবের ঐকান্তিকতা প্রদর্শনোপলক্ষ্যে লক্ষ্মী ও ভগবতী কর্ত্তৃক শিব ও নারায়ণের প্রতি ভর্ৎসনা পূর্ব্বক প্রণয় তাচ্ছিল্য করিতেছেন। বস্তুতঃ কবির মূল উদ্দেশ্য নিজ কাব্যের মঙ্গলাচরণ বিধানে পরমার্থতত্ত্ব জ্ঞানলাভ ও বিঘ্নবিনাশ সাধন।

যথাঃ—

"সংপ্রাপ্তংমকরধ্বজ মথনং" ইত্যাদি।

কোন কবি নিন্দকের প্রকৃতি প্রদর্শন মানসে নারিকেল বৃক্ষকে লক্ষ্য করিয়া ছলে অর্থাৎ অপ্রস্তুত ও প্রশংসালঙ্কারের একটী কবিতা লিখিয়াছেন দেখ। নিন্দকের স্বভাব অনায়াসে অনুভূত হইবে। যথা—

ধিক্‌সর্ব্বর্ত্তুফলোদয়ং বিসমৃতাস্বাদোপমেয় ফলং
ধিক্‌পনসং ঘুংপুর সারসদৃশং ধিক্‌তে বিশালোন্নতিম্
[illegible] যে চ বিহগাস্তেঽপি ক্ষুধাপীড়িতা
যান্ত্যন্যত্র ফলার্থিনস্তব ফলৈঃ কিং নারিকেল দ্রুম ॥

ব্যঙ্গছলে—

জননী ও বিমাতার কলহোপলক্ষে নিজ জননীর গৃহত্যাগ বর্ণনে কৃপণ ধনীর নিকট হইতে যাচকের যাচ্ঞার বৈমুখ্য প্রদর্শন যথা।—

মাতা মেতু সরস্বতী প্রতিদিনং লক্ষ্যা বিমাত্রা সহ
মৌখর্য্যং বিদধাতি সাথচপলা রুষ্টা গৃহান্নির্গতা।
তমন্বেষয় তাময়া তু ভবতো দ্বারি প্রবিষ্টং মু।
মস্তেতদ্বচনাত্র নাগতবতী স্থানান্তরং গম্যতে ॥

ফল।কথা কবি যে প্রকারে সংসারের ছবির চিত্র করিতে পারেন, তেমন আর কেহই পারেন না।

কালিদাসাদি কবিগণ যখন যে রস বর্ণন করিয়াছেন, তাহা যেন প্রত্যক্ষ পরিদৃষ্ট হইতেছে। তাঁহাদিগের কৃতিত্বের সুখ্যাতি অখ্যাতি অথবা বিষয়ের তারতম্য করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। কেবল কাব্য হইতে আমরা কি উপকার পাই তাহাই দেখান আবশ্যক। কাব্যামাশ্চযে কেচিদ্‌-গীতকাব্যখিনানিচ শব্দ মূর্ত্তিধরস্যৈত বিষ্ণোবংশামহাত্মনঃ॥ এই প্রস.ই জয়দেবের গীতগোবিন্দ কাব্য প্রণয়-প্রসঙ্গের একশেষ দেখাইয়াছে। কালিদাস ভবভূতি, মাঘ, ভারবি ও শ্রীহর্ষাদির কৃতিত্ব বর্ণন করিতে আমরা অল্প কথায় বলিতে সমর্থ নহি, সুতরাং এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট যে, তাঁহারা যে প্রসঙ্গে যাহা বর্ণন করিয়াছেন, তাহার জাজ্বল্যমান ছবি সেইখানেই চিত্র করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলেই মোহিত হইতে হয়।

কাব্যের ভাবে লোকমণ্ডলী কার্য্যানুরক্ত হয়। নাটকীয় ইতিবৃত্তের অভিনয় দেখিয়া অতি কঠিনহৃদয় ব্যক্তিরও তাৎকালীন প্রদর্শিত রঙ্গভঙ্গীর ভাবে মোহিত হইয়া অনুকরণে প্রবৃত্তি জন্মে এবং তৎক্ষণেই তাহার গুণ বিচার করিয়া সৎপথ গ্রহণ ও অসৎপথ পরিত্যাগ স্থিরীকরণ পূর্ব্বক কর্ত্তব্যের প্রতি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়। ইহা কি অসামান্য সুখের বিষয় নহে? এইজন্য নাটকীয় বস্তুকে প্রত্যক্ষ রসসমন্বিতভাবা যায়। অভিনয় কার্য্য না দেখিলেও কেবল পাঠেও অন্তঃকরণে প্রীতি সমুৎপাদন করে। কেহ শোকাকুল হইয়া যদি কাব্য পাঠ করে, তবে তাহার শোক অনেকাংশ দূরীভূত হয়। সে উহার উপদেশে চিত্ত বৃত্তিকে শান্তিমার্গে প্রবৃত্ত করিতে আর তাদৃশ ভগ্নমনোরথ হয় না। কাব্যের ভাবগতি দেখিয়াই সংসারে নানাপ্রকার সঙ্গীত রচিত হইয়াছে। কাব্য হইতে শিশু শিক্ষা প্রাপ্ত হয়। স্ত্রীজাতি গৃহকার্য্যের অশেষ প্রকারে রত হইয়া থাকে, যুবক যুবতী মনোমোহন ভাবপ্রাপ্ত হয়, বৃদ্ধের পরমার্থ তত্ত্বজ্ঞানের—ভাবুকের আত্মোন্নতি প্রদীপের জ্যোতি প্রদীপ্ত হয়। যে জাতির কাব্য নাটকে সংসার-চিত্র সুন্দররূপে চিত্রিত হয় সেই জাতিই সংসারে শ্রেষ্ঠ হইয়া থাকে। কাব্য হইতে শিল্প, সাহিত্য, ব্যাকারণ, ছন্দঃ ও জ্যোতিষাদির প্রভাব হইয়াছে। শব্দ-বিদ্যা কাব্যের প্রধান অঙ্গ স্বরূপ। শব্দবিদ্যা দ্বারা আমরা জগতের

যাবতীয় পদার্থের নামকরণ পূর্ব্বক নিয়ম ও প্রক্রিয়ার ব্যবস্থা করিয়া থাকি। যে ভাষার যে দ্রব্যের বা যে বিষয়ের কথা অর্থাৎ শব্দের অভাব আছে, সে জাতি তদ্বিষয়ে হীন অর্থাৎ ক্ষুদ্র। জাতীয় মহত্ত্বের প্রধান লক্ষণ সর্ব্বপ্রকারে ক্রিয়া প্রয়োগে নিরঙ্কুষতা দেখান। অঙ্গ সৌষ্ঠব ও সর্ব্বাঙ্গসৎপূর্ণতায় সভ্যতার লক্ষণ অনুমিত হয়।

সংস্কৃত ভাষা জগতে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে কেন? উহার শব্দ ও ধাতুতে যাহা নাই, তাহা কোন খানে নাই এবং উহাতে প্রয়োগ না করা যায়, এমন শব্দ বা ক্রিয়া অসম্ভব।

যাহা স্বচ্ছ পদার্থ, তাহাতে সমুদয়ই প্রতিবিম্বিত হইতে পারে। মৃত্তিকাতে কিছু প্রতিফলিত হয় না। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য স্বচ্ছ পদার্থ, উহার নিকট যাহা অবস্থান করে, তাহা সুন্দররূপে প্রতিফলিত হয় অর্থাৎ কার্য্য কারণ রস ভাব গুণ রীতি অলঙ্কার ও ছন্দঃ সমুদাই অবিকলভাবে প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে। ভাবগ্রাহীর নয়নে ও চিত্তক্ষেত্রে কিরূপ আনন্দস্রোতের উদ্রেক হয় তাহা বলা কঠিন। সুতরাং সংস্কৃত ভাষা সকল ভাষার আদর্শ স্বরূপ। ইহাতে বর্ণিত রস সমূহ প্রত্যক্ষবৎ প্রতীয়মান হয় ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, পুনরুল্লেখ পৃষ্ঠপেষণমাত্র। তথাপি একটী বীররসের উদাহরণ দিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব। তাহা দেখাইবার কারণ অন্য কিছুই নহে। ইংরাজী ভাষায় পারদর্শীগণ মনে করেন, ... কবিগণ কেবল আদারস করুণরস ও শান্তরসের রচনাতেই নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন। বীররসে যেমন পাশ্চাত্য কাব্যের স্ফূর্ত্তি দেখা যায়। তেমন সংস্কৃত কাব্যে দেখা যায় না। তাহাদিগের ভ্রান্তি নিরাস জন্য ভট্টনারায়ণের কৃতিত্বে বীররসের একটী কবিতা দেখান গেল। উহা অশ্বত্থামার উক্তি যথা—

দগ্ধুং বিশ্বং দহনকিরণৈর্নোদিতা দ্বাদশার্কাঃ
বাতংবাতা দিশিদিশি ন বা সপ্তধা সপ্তভিন্নাঃ
ছন্নং মেঘৈন গগনতলং পুষ্করাবর্ত্তকাদ্যৈঃ
পাপংপাপাঃ কথমতঃ কথং শৌর্য্যবাশে
পিতুর্মে॥

ভূমণ্ডলের সমস্ত ভাষাই যে সংস্কৃত হইতে জাত তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, তবে পরম্পরাক্রমে রূপান্তরিত হইয়াছে এই মাত্র যথা—তরু শাখা পল্লব মুকুল পুষ্প ফল শস্য বীজ। অন্য প্রকারেও আর একটা উদাহরণ দেখান গেল যথা শুক্র শোণিত মাংস মেদ মজ্জা অস্থি চর্ম্মাদি পৃথক পৃথক শারীরিক পদার্থ।

শ্রীলালমোহন বিদ্যানিধি।

সংস্কৃত কাব্যে রামায়ণ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গের সন্নিবেশ চাই, তন্মধ্যে একটী ফলরূপে গৃহীত হওয়া চাই, কিন্তু রামায়ণে মোক্ষের কথা নাই বলিলেই হয়। যেমন বেদসংহিতায় মোক্ষের কথা নাই, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এই ত্রিবর্গের কথা প্রচুর পরিমাণে আছে, অর্থ, আছে, কাম আছে, নাই কেবল, মোক্ষ, মোক্ষ আছে যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে, মোক্ষ আছে রামায়ণের পরিশিষ্টে। অর্থ, কামের

গৃহীদিগের পক্ষে অর্থ, কামের প্রয়োজনীয়তা আছে ঋষিরা বুঝিতেন, শাস্ত্রেও তাহার ব্যবস্থা দিয়াছেন। বস্ত্র, ছত্র, পাত্র, উপানৎ অর্থ ভিন্ন হয় না, গৃহ, শয্যা, আসন, ভূষণ অর্থ ভিন্ন হয় না; ... ফুল এও অর্থ ভিন্ন হয় না; অতিথিকে আহার দিবে, অর্থের প্রয়োজন, দেবতাকে ফল পুষ্পদল উপহার দিবে, অর্থের প্রয়োজন। আবার "ন গৃহং গৃহমিত্যাহু গৃহিণী গৃহমুচ্যতে"। গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, গৃহকর্ম রাজ্যের রাজ-রাজেশ্বরী পত্নী ভিন্ন গৃহ গৃহ নয়, গৃহ অরণ্য—মহাশ্মশান। সুতরাং কামেরও প্রয়োজনীয়তা আছে। যে অর্থ কাম ধর্ম্মে ডুবিয়া গিয়াছে, ধর্ম্মের নিমিত্ত যে অর্থ কামের সেবা করিতে হয়, সে অর্থকাম উপাস্য, সম্পাদ্য, অনবদ্য ধর্ম্মবর্জ্জিত অর্থ, কামনিন্দিত গর্হিত ও একান্ত পরিহার্য্য। কোন বিপুলকায়া নদীর বিপুল প্রবাহ আসিয়া যদি গঙ্গার ক্ষীণ ধারায় মিলিত হয়, তখন আর তাহার পৃথক অস্তিত্ব থাকে না, তখন তাহা আর্য্যধর্ম্মাবলম্বীদিগের নিকটে গঙ্গা বলিয়াই কথিত, বন্দিত পূজিত ও আদৃত হয়। এমন কি নেত্র উদ্ধৃত জল চণ্ডাল-ভাণ্ডস্থ হইলেও ব্রাহ্মণের দেবপূজায় ও পিতৃপূজায় ব্যবহৃত হয়। রামায়ণের সর্ব্বত্র অর্থকাম গঙ্গা-প্রবাহে মিলিত অন্য প্রবাহের মত ধর্ম্মপ্রবাহে মিশিয়া একত্র তরঙ্গে চলিয়াছে। যেখানে ধর্ম্মপ্রবাহের পরিহার করিয়া স্বাধীন ভাবে নবীন খাতের উৎপাদন করিয়াছে, মহাকবি বাল্মীকির অকম্পিত সিদ্ধহস্তের সুচিক্কণ মার্জ্জিত তুলিকায় উজ্জ্বল বর্ণ বিন্যাসে তাহা ফুটিয়া উঠিয়াছে। বৃদ্ধ তারস্বরে বুঝাইয়া দিয়াছেন, উহা গঙ্গাসম্বন্ধশূন্য কর্ম্মনাশা, পাঠক পাঠিকাকে শ্রোতা শ্রোত্রিকে সাবধান করিয়া দিয়াছেন, উহা অস্পৃশ্য, উহার জল অপেয়। তৃষ্ণার তাড়নায় বিস্মৃতির মোহে, পান করিলে সর্ব্বনাশ হইবে, স্বার্থপরতার উন্মাদনায় মাতা কর্ম্মনাশার সৃষ্টি করিয়াছেন, পুত্র আবার বেগ ঘুরাইয়া গঙ্গার পবিত্র খাতে মিশাইয়া মাতৃকৃত সেই অপবিত্রভাবে কর্ত্তিত সেই অপবিত্র খাতকে জলশূন্য করিয়া দিয়াছেন। স্বার্থমদিরার তীব্র উন্মাদনায় মানুষকে এত উন্মত্ত করে যে, তখন তাহার তাহাতে ধর্ম্মের বিন্দুমাত্র সম্বন্ধ থাকে না, ধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে ভক্তি, প্রীতি, বাৎসল্য, কৃতজ্ঞতা, দয়া, দাক্ষিণ্য প্রভৃতি কোমল স্বাভাবিক বৃত্তিগুলি তৎক্ষণাৎ তাহাকে পরিত্যাগ করে। লোক-লজ্জা ও চক্ষুলজ্জায় লজ্জিত হইয়া তৎক্ষণাৎ সরিয়া পড়ে। মাতালের মুখের তীব্র মদিরা-গন্ধে পুত্র পত্নী পর্য্যন্ত নাসিকা কুঞ্চন করিতেছে, কিন্তু মাতালের লজ্জা নাই, সে তাহার দুষ্ট হৃদয়ে পরিপোষিত পাপ অভিলাষগুলি অনায়াসে ব্যক্ত করিয়া সকলে একশেষ ঘৃণার পাত্র হইতেছে। কুটমতি মন্থরা, কৈকেয়ীর কর্ণকুহরে যে তাম্রগন্ধি সুতীব্র মদিরা ঢালিয়া দিয়াছে, তাহার উত্তেজনায় কৈকেয়ী আজ একান্ত উন্মত্ত। তিনি তাহার তীব্র উত্তেজনায় এত উত্তেজিত যে, চিরবশীভূত দাসবৎ অবস্থিত বৃদ্ধস্বামীর জীবনের প্রতি পর্য্যন্ত লক্ষ্য করিলেন না। যে রামের নিকট হইতে মাতৃনির্ব্বিশেষে ভক্তি, শ্রদ্ধা ও পূজা লাভ করিয়াছেন, তাঁহার উপরে সকরুণ কৃতজ্ঞ দৃষ্টিক্ষেপ করিলেন না, সেই শিরীষমৃদ্বী সীতার উপরে তাঁহার নির্ম্মম দৃষ্টি কৃতার্থতা লাভ করিল!! আরাধ্য দেবতা স্বামীর নিকটে সেই পাপ প্রার্থনা করিতে তাঁহার জিহ্বা অবাধ্যতা গ্রহণ করিল না। রামের ন্যায় সজ্জনপ্রিয় সর্ব্বগুণাধার অনুরক্তক পুত্রের নিকটে সেইরূপ অপ্রিয় কঠোর নির্দেশ প্রচার করিতেও কুণ্ঠা আসিয়া

জিহ্বাকে আশ্রয় করিল না—বাক্যেও জড়তায় প্রকাশ পাইল না। জ্যেষ্ঠার ন্যায় মাননীয়া সপত্নীর নিকটে, স্নুষার নিকটে, পুত্রের নিকটে, পৌরজনপদের নিকটে প্রচার করিতে তিনি লজ্জিত হইলেন না, স্বার্থ মোহের বায়ুতে তাঁহার লজ্জার যবনিকা বিপর্য্যস্ত একেবারে উৎসাদিত হইয়া গেল। বাল্মীকির সিদ্ধ লেখনীই এইরূপ চরিত্রের উন্মেষ করিতে পারেন, অন্যে তাহা একান্ততঃ অসম্ভব।

এস্থলে ইহাও বাক্তব্য যে দীর্ঘিকা শোভিত মালতী মল্লিকার সুমধুর স্নিগ্ধগন্ধে উদ্ভাসিত উপবনবীথিকাকেও কখন কখনও মরুভূমির উত্তপ্ত জলকণাশূন্য কঠোর ঝঞ্ঝাবায়ু আসিয়া স্পর্শ করে ও মুহূর্ত্তের মধ্যে তাহাকে শ্রীহীন করিয়া তুলে; কিন্তু তাই বলিয়া তাহাকে তাহার স্বাভাবিক বায়ু বলিতে পারি না। উপবনের স্বাভাবিক বায়ু মন্দ মন্থর, স্নিগ্ধশীতল, সৌগন্ধ্যবাহী মলয়ানিল। সাগরের ন্যায় বিস্তৃত জলকণাশূন্য লতাগুল্মশূন্য দুনিরীক্ষ্য অগ্নিবর্ষী প্রখর সূর্য কিরণে অগ্নির ন্যায় অস্পৃশ্য ভীষণ মরুভূমিও যেমন উৎকট, তাহার অগ্নিস্পর্শী বালুকাবর্ত্ত গাত্রদাহী প্রতপ্ত ঝঞ্ঝাবায়ুও সেইরূপ বিকট। সেই বায়ুই তাহার স্বাভাবিক। এই প্রখর উত্তপ্ত বায়ু কখনও উদ্যানে প্রবেশ করে, কিন্তু উদ্যানের শীতল মনোজ্ঞ স্নিগ্ধ বায়ু মরুভূমিকে কখনও স্পর্শ করিতে পারে না। বিশ্ববিধাতা বুঝিয়াই এইরূপ প্রতপ্ত বায়ুর আশ্রয়স্থান অগ্নিকুণ্ডবৎ মরুভূমির সৃষ্টি করিয়াছেন, আর বাল্মীকিও জনসংহারকগুণের উপযুক্ত আধারে উপযুক্ত রূপের সমাবেশ করিয়াছেন—বিদ্বেষানলের উপযুক্ত কুণ্ড নির্ম্মাণ করিয়াছেন। বিদ্বেষ পরশ্রীকাতরতা, যাহার মানসভূমির নিত্য অধিবাসী, দুর্নীতি, যাহার নিত্য সহচর; সেই মন্থরার রূপের চিত্র অঙ্কিত করিতে যাইয়া বাল্মীকির সুনিপুণ দক্ষহস্তের বিশেষরূপে দক্ষতা প্রকাশ পাইয়াছে। মন্থরায় যাহা স্বাভাবিক, কৈকেয়ীতে তাহা ~~[illegible]~~ বাল্মীকি মন্থরার রূপের আদর্শে কৈকেয়ীর রূপের সৃষ্টি করিতে পারেন নাই। করিলেও তাঁহার রামায়ণের বীজ নষ্ট হইয়া যাইত। বীজের অভাবে এই মহান্ কল্পবৃক্ষের সৃষ্টি হইত না। শাখা-প্রশাখায় কাণ্ড-প্রকাণ্ডে বিভূষিত এই প্রকাণ্ড বৃক্ষকে দেখিয়া সেই নয়নের সার্থকতা উৎপাদন করিতে পারিত না। যে সবল তেজস্বী গগনচুম্বী মহাবৃক্ষের এমন একটিও পত্র নাই, পুরাতন হইলেও যাহা বীজের কোমলতায়, উজ্জ্বলতায় ও সৌন্দর্য্যে নবীন পত্ররাশিকে ন্যক্কৃত করে নাই। এমন একটীও পুষ্প নাই, অতীত যুগে প্রস্ফুটিত হইয়াও যাহা নিজের বিম্লানতায় মনোহারিতায় ও জগদ্ব্যাপী মধুর সৌগন্ধ্যে স্বর্গীয় পুষ্প পারিজাতকে পরাজিত করে নাই। এমন একটীও ফল নাই, আজন্ম সুপক্ক হইলেও যাহা নিজের মনোহর সৌরভে, সৌগন্ধে ও মধুরতায় অমর্ত্ত্য-সেবিত রক্ষিত অমৃতকেও পরাভূত করে নাই। সেইরূপ পত্র-পুষ্প-ফলের ঘন-সন্নিবেশে যাহার শাখা প্রশাখা অলঙ্কৃত হইয়া চতুর্দ্দিক পরিব্যাপ্ত হইয়াছে; সেই মহাবৃক্ষের স্নিগ্ধ নিবীড় দূরব্যাপী ছায়ার আশ্রয়গ্রহণ করিয়াও কেহ শীতল হইতে পারিত না, ত্রিতাপদগ্ধ মনঃ, প্রাণ, আত্মার শীতলতা উৎপাদন করিতে পারিতনা, আর সংসার কান্তারে পথভ্রান্ত পথিক এই উচ্চ বৃক্ষকে দেখিয়া নিজের গন্তব্য পথের নির্ণয় করিতে সমর্থ হইত না!

কৈকেয়ীর সৌন্দর্য্যে মহাকবী বাল্মীকির

চিন্তামার্জ্জিত কবিত্বের মূর্ত্তিমান বিকাশ। রাজা দশরথ উচ্চকুলীন ক্ষত্রিয় বৈবস্বত বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সসাগরা সদ্বীপা পৃথিবীর অধীশ্বর হইয়াছেন, শৌর্য্যে, বীর্য্যে ঐশ্বর্য্যে [illegible] অদ্বিতীয়, দেবতারাও তাঁহার ভুজবলচ্ছায়ার আশ্রয় গ্রহণ করিবার জন্য প্রার্থী ও দ্বারস্থ। সবল সুস্থ সুন্দর দেহ, সেই দেহে বেলাপ্লাবী যৌবনতরঙ্গের হিল্লোল, সম্মুখে স্বহস্তে সেবানিরতা অনিন্দ্যসুন্দরী পত্নী। যাঁহার আজ্ঞায় ইঙ্গিতে শতকিঙ্করী আসিয়া রাজার দেশকালোচিত সেবা করিবার জন্য চক্ষু ও কর্ণকে সতর্ক করিয়া দণ্ডায়মান, সেই রাজরাজেশ্বরী সৌন্দর্য্য ও কমনীয়তার লীলানিকেতন, উদ্দামযৌবনের পূর্ণ বিলাসভূমি রাজ্ঞী কৈকেয়ী কাহাকেও কিছু করিতে দেন না, তিনি অক্লান্ত পরিশ্রমে স্বামিসেবা করিতেছেন, স্বামি পরিচর্য্যার জন্য অষ্টপ্রহর তাঁহার পল্লবপেলব পাণিকমল নিযুক্ত রহিয়াছে। এইরূপ পত্নীতে দশরথকে অনুরক্ত করিয়া বাল্মীকি স্বাভাবিকতা রক্ষা করিয়াছেন। এই বিশ্বস্ত পত্নীতে দশরথ অবিশ্বাস আনিতে পারেন নাই, নব উপাদানে নবনির্ম্মিত বিবরশূন্য বিলাসনিকেতনে সর্পবাসের আশঙ্কা কেহ করিতে পারে না। কালসর্পের সহিত যাহার নিত্যবসতি, কালসর্পে যাহার নিত্য অনুরক্তি, কালসর্পের প্রভাবে যাহার নিত্য উপার্জ্জন এইরূপ কুব্জা বৃদ্ধা ব্যাধবধূ ঈর্ষ্যানলে উদ্দীপ্ত হইয়া সেইরূপ অট্টালিকায় যদি গোপনে মুহূর্ত্তের জন্য কাল ভুজঙ্গমের সঞ্চার করিয়া দেয়, তজ্জন্য গৃহস্বামীকে একান্ত অসতর্ক অসাবধান বলিতে পারি না। আজ রাজা দশরথ সুখশয্যায় শয়ান, নিদ্রায় তাঁহার অধীর নয়নদ্বয় মুকুলিত, বিশ্বস্তচিত্তে তিনি নিদ্রাদেবীর উপাসনা করিতেছেন, তাঁহার পাদমূলে মূকভাবে জাগ্রৎ কালভুজঙ্গম শয়ান, নিদ্রাপহৃতচিত্ত দশরথের বুঝিবার সামর্থ্য নাই। হঠাৎ তাঁহার মর্ম্মস্থানে কালভুজঙ্গম কর্ত্তৃক দংশন। জগতে কোনও কালে এরূপ কোন বিষবৈদ্য নাই, যাহার সুচিকিৎসাগুণে এইরূপ উদ্দীপ্ত তীব্রকালসর্পের কালানল সদৃশ প্রাণসংহারক প্রদীপ্ত হলাহলের প্রশমন হইতে পারে। সেই বিষের তীব্র জ্বালায় দশরথের মৃত্যু; আর অঞ্জলি পাতিয়া সেই বিষগ্রহণ করিয়া রাজকুমার রামের মৃত্যু হইল না বটে, কিন্তু চতুর্দ্দশ বর্ষ ব্যাপিয়া রামচন্দ্র এই বিষের তীব্র জ্বালায় জর্জ্জরিত হইলেন, সীতা, লক্ষ্মণ, ভরত, কৌশল্যা, সুমিত্রা জর্জ্জরিত হইলেন। বিপৎরাশির মধ্যে নিপতিত মানবেরই চরিত্র পরীক্ষা, অগ্নিজ্বলদঙ্গারে পাতিত কুবর্ণেরই বিশুদ্ধি ও শ্যামিকার পরীক্ষা। ধনরাশির স্তূপের উপরে উপবিষ্ট ভূমি, ধনধারা বর্ষণ করিয়া পিপাসিত প্রার্থিবৃন্দকে প্রীত করিতে, তোমার প্রশংসা নাই; প্রশংসা আছে তাঁহার যিনি নিজে বিপন্ন হইয়াও বিপন্নের অশ্রু মোচন করিবার জন্য ব্যাকুলহৃদয়ে প্রণোদিত—পাণি! চতুর্দ্দশ বর্ষব্যাপী প্রচণ্ড প্রবাতঝঞ্ঝা প্রভঞ্জন, বিদ্যুত-করকাধারাবর্ষী অবিশ্রান্ত প্রবর্ষণ; তাহার ভিতরে অনাবৃত-মস্তকে উন্মুক্তদেহে অনাবৃতস্থানে এই বীরপুরুষত্রয়কে দাঁড় করাইয়া মহাকবি বাল্মীকি তাঁহাদিগের যে পৌরুষমিশ্রিত উজ্জ্বল অলৌকিক চরিত্রবলের প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা মর্ত্ত্যভূমিতে অসম্ভব, দেবভূমিতেও দুর্লভ আর আদর্শসতী সীতা পতির সহচারিণী হইয়া সজ্জনামুখে পূর্ণকুম্ভের ন্যায় অবলীলায় দুঃখরাশিকে মস্তকে বহন করিয়া

পাদস্পর্শে অরণ্যভূমিকে পূণ্যভূমি করিতেছেন; ইহাতে সীতার পরীক্ষা হয় নাই, অগ্নিপরীক্ষার প্রয়োজন। যে অগ্নিপরীক্ষা দিয়া তিনি তাঁহার স্বামীর বিশ্বাস উৎপাদন করিয়াছিলেন, সেইরূপ পরীক্ষা দেখিবার জন্য অযোধ্যাবাসীর আগ্রহ থাকিতে পারে, জগতের কোন আগ্রহ নাই। জগতের সম্মুখে তিনি দশমাসব্যাপী যে ভীষণ অগ্নিপরীক্ষা দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার সেই সাধু মহিমায় জগত নতকন্ধর, মস্তকে তাঁহার পূতচরণপদ্ম স্পর্শ করিবার জন্য লালায়িত। ত্রিলোকীপতি বলোন্মত্ত রাবণ যে দিন সীতাকে সবলে তাঁহার আকাশচারী রথে আরোপিত করিলেন, সেইদিন হইতেই তাঁহার কঠোর পরীক্ষার আরম্ভ। সে সময়ে রাবণের তুল্য বীর কেহ ছিলেন না। সীতা স্বচক্ষে দেখিলেন, রাবণের মুহূর্ত্তকালের যুদ্ধে মহাবীর মহাকায় গরুড়-কুমার জটায়ুর জীবলীলার অবসান। লঙ্কায় উপস্থাপিত সীতা স্বচক্ষে রাবণের ঐশ্বর্য্য প্রত্যক্ষ করিলেন, সেইরূপ অনর্ঘ্য-রত্নখচিত মেঘচুম্বী প্রাসাদ মর্ত্ত্যভূমিতে নাই, দেবভূমিতেও নাই। ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ প্রভৃতি দেববৃন্দ ভৃত্যের ন্যায় বদ্ধাঞ্জলিতে নতকন্ধরে আজ্ঞার প্রতীক্ষায় সম্মুখে সভয়ে দণ্ডায়মান। রাবণের ন্যায় অপ্রতিহত-প্রভাব ঐশ্বর্য্যশালী রাজা দ্বিতীয় নাই, তাঁহার তুলনা তাঁহাতেই বিদ্যমান। লঙ্কায় আচরিত কলঙ্কের বার্ত্তা ভারতে পৌঁছিবে, আশঙ্কা নাই, বিপুলজলধি নিজের বিপুল বিস্তৃত ভীষণ অলঙ্ঘ্য দেহকে মধ্যে পাতিত করিয়া তাহাতে বাধা প্রদান করিতেছে। দেবতারা অমর হইয়াও যাঁহার বাহুবলে ভীত, দাসবৎ অবস্থিত, কোন ছার মৃত্যুধর্ম্মা ক্ষীণজীবী দুর্ব্বল মনুষ্য ছাগশাবকের ন্যায় রাক্ষসের ভক্ষ্য হইয়া কোন সাহসে সেই দুর্দ্দম্য বলোন্মত্ত রাক্ষসাধিপতির সম্মুখে যুদ্ধের জন্য অগ্রসর হইবে? সুতরাং সেরূপ আশঙ্কারও কোন কারণ নাই; সম্মতিতে রাবণের ন্যায় ত্রিলোকীপতি স্বামি লাভ, লোভনীয় বিশ্ব[illegible] ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ প্রভৃতি দেববৃন্দের উপরে আধিপত্য-বিস্তার; আর অসম্মতিতে অষ্টপ্রহর কেবল চেড়ীর হস্তে দুর্বিসহ অত্যাচার নয়, অশনাভাব, বসনাভাব, শয়নাভাব নয়, চেটীর হস্তে বা রাবণের হস্তে প্রতিক্ষণে পিপীলিকাবৎ প্রাণবায়ু নিঃশেষের ভীষণ বিভীষিকা আছে, আবার বলোন্মত্ত কামোন্মত্ত উদ্দামচরিত্র রাবণের হস্তে প্রতিক্ষণে সতীত্বনাশের আশঙ্কা আছে। ক্ষুধার্ত্ত বলোন্মত্ত সিংহ হরিণীকে স্ববশে আনিয়া সম্মুখে রাখিয়া সতৃষ্ণনয়নে তাহার দিকে তাকাইয়া আছে, কিন্তু সবলে তাহার কণ্ঠনালী ছিন্ন করিয়া উষ্ণশোণিতে তাহার পিপাসার নিবৃত্তি করে নাই, তাহার কারণ বাল্মীকি উজ্জ্বলবর্ণে লিখিয়া গিয়াছেন, কিন্তু সীতা তাহা জানিতেন না, সুতরাং তাঁহার সে আশঙ্কার তিরোধান হয় নাই।

সীতা এই সমস্ত দোষগুণ জানিয়া শুনিয়াও প্রলোভনের মদিরায় অধীরা হইয়া আত্মবিসর্জ্জন করেন নাই, বা জগদ্বিধ্বংস-কারী আগ্নেয়গিরির উদ্গমের মত ঘোর বিভীষিকা দেখিয়াও আত্মসংযমে বিরত হন নাই। সীতার প্রলোভন উৎপাদন ও ধর্ষণের জন্য রাবণের কোনরূপ ক্রটী ছিল না। তিনি প্রথমতঃ অন্তঃপুরের মহামূল্যরত্নসম্ভারে সজ্জিত কোন এক প্রকোষ্ঠে সীতাকে স্থাপিত করিয়া তিনি তাহাতে যদৃচ্ছারূপে আহার, বিহার, শয়ন, উপবেশন করিতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা ও আজ্ঞাবাহী শতকিঙ্করীর উপরে তাঁহার আধিপত্যের প্রতিষ্ঠা করিয়া দিয়াছিলেন;

তাহাতেও তাঁহাকে স্ববশে আনিতে পারেন নাই। গজদন্তনির্ম্মিত-হীরক-বৈদূর্য্য-খচিত শতস্তম্ভে নিবদ্ধ মণিমুক্তাখচিত সুবর্ণজালে আবৃত শতশত গবাক্ষে উদ্ভাসিত রাবণ- [illegible] মেঘচুম্বি-প্রাসাদেও সীতার প্রীতি উৎপাদন হয় নাই। প্রীতি উৎপাদন দূরের কথা, তিনি সেই দেবলোকদুর্লভ প্রাসাদের উপরে মণিসোপানিকা কাচস্বচ্ছ-সলিলা দীর্ঘিকার উপরে, নানাচিত্রে অলঙ্কৃত কাঞ্চনময় গৃহাবতরণিকার উপরে বা সুধা ধবল বহুমূল্য রত্নপ্রাঙ্গণের উপরে দৃষ্টিক্ষেপ মাত্র করেন নাই। তুমি এই অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বরী হইবে, এইরূপ বলিয়া কামোন্মত্ত রাবণ কামে অধীর হইয়া সীতার চরণে যখন তাঁহার মস্তক লুণ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন, তুমি আমার উপর প্রসন্ন হও, আমি তোমার একান্ত আজ্ঞাবহ দাস, এই ভাবে রাবণ যখন নিজের কামোন্মত্ততা জানাইতেছিলেন, তখন সীতা সেই অসহায় অবস্থায় আপতিত হইয়াও ঘৃতাহুতিতে প্রদীপ্ত অগ্নিশিখার ন্যায় ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। যে রাবণের সম্মুখে সাহস্ক কথা বলিতেও দেবদানব-রাক্ষসের জিহ্বা ভয়ে জড়ীভূত হইয়া যায়, সেই দুরাধর্ষ অমর্ষণ দশগ্রীবকে তৃণতুল্য মনে করিয়া সীতা বলিলেন,—

ন শক্যা যজ্ঞমধ্যস্থা বেদিঃ স্রগ্‌ভাণ্ডমণ্ডিতা।
দ্বিজাতিমন্ত্রসম্পূতা চণ্ডালেনাবমর্দ্দিতুং।
যথা দ্রষ্টুং ন শক্যাহং রাক্ষসাধম পাপিনা।
ক্রীড়ন্তী রাজহংসেন পদ্মষণ্ডেষু নিত্যশঃ।
হংসী সা তৃণমধ্যস্থং কথং দ্রক্ষেত মদগুকং।

কি তেজের কথা! কি নির্ভীকতার কথা! কি আত্মমর্য্যাদার কথা! কি দেবনির্ব্বিশেষ-স্বামীর উপরে ভক্তির আতিশয্য! পূতচরিত্র বেদজ্ঞব্রাহ্মণে ও চণ্ডালে যে প্রভেদ, স্বামী রামচন্দ্রে ও ত্রিলোকীপতি ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ দেববৃন্দে নিষেবিত বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর রাবণেও সেই প্রভেদ; এই প্রভেদ টুকু ঐশ্বর্য্যোন্মত্ত বলোদৃপ্ত রাবণের সম্মুখে কে বুঝাইয়া দিতে সমর্থ? সাধ্বী-শিরোমণি সীতাতে ইহা সম্ভবে। কবিগুরু বাল্মীকির পবিত্র অরণি ঘর্ষণে এই নির্ধূম বিশুদ্ধ বহ্নিশিখার উৎপত্তি; ইহার তুলনা জগতে নাই। বিশুদ্ধ স্বচ্ছ স্ফটিকাধারে ইহা স্থাপিত হইয়া জগৎ উদ্ভাসিত ও আলোকিত করিতেছে, এই নারীরত্ন রামের ন্যায় উদাত্তচরিত পুরুষোত্তমে সংযোজিত হইয়াছিল বলিয়া আরও আমরা ইহার পবিত্র-প্রভায় পবিত্র হইতেছি। লৌহপিঞ্জরবদ্ধ সিংহী কখনই মানুষের তেজে অভিভূত হয় না—মানুষের নিকটে অবনত হয় না। মনুষ্য-দত্ত সদ্যঃকর্ত্তিত মাংসখণ্ডে অবজ্ঞার দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। সীতাও তাহাই করিয়াছেন; তেজস্বিনী সীতার মুখেও তাহাই প্রকাশ। সীতা কহিতেছেন—“রাম পুরুষসিংহ, সেই সিংহের ভার্য্যা আমি সিংহী, তুমি জম্বুক হইয়া সেই সিংহীকে ইচ্ছা করিতেছ?” কামোন্মত্ত বলোদ্দৃপ্ত রাবণকে দগ্ধ করিবার জন্য পৃথিবীর ন্যায় পৃথিবীদুহিতার মুখে যে অগ্নিময় উৎপ্রস্রবণের সৃষ্টি হইয়াছিল, পাঠক পাঠিকার সন্তোষার্থ তাহা হইতে আমরা এই স্থলে দুই একটী বাক্য উদ্ধৃত করিতেছি,—

“ত্বং পুনর্জম্বুকঃ সিংহীং মামিহেচ্ছসি দুর্লভাং।
নাহং শক্যা ত্বয়া স্প্রষ্টুমাদিত্যস্য প্রভা যথা।
পাদপান্ কাঞ্চনান্ নূনং বহূন্ পশ্যসি মন্দভাক্।
রাঘবস্য প্রিয়াং ভার্য্যাং যস্ত্বমিচ্ছসি রাক্ষস।
ক্ষুধিতস্য চ সিংহস্য মৃগশত্রোস্তরস্বিনঃ।
আশীবিষস্য বদনাদ্দংষ্ট্রামাদাতুমিচ্ছসি।
মন্দরং পর্ব্বতশ্রেষ্ঠং পাণিনা হর্ত্তুমিচ্ছসি।
কালকূটবিষং পীত্বা স্বস্তিমান্ গন্তুমিচ্ছসি।
অক্ষি সূচ্যা প্রমৃজসি জিহ্বয়া লেঢ়ি চ ক্ষুরং।
রাঘবস্য প্রিয়াং ভার্য্যামধিগন্তুং ত্বমিচ্ছসি।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযাদবেশ্বর তর্করত্ন।

যৎকিঞ্চিৎ।

"সাহিত্য-সংহিতার" বিগত ভাদ্র সংখ্যায় শ্রীযুক্ত পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধি মহাশয়ের লিখিত "শ্রীহর্ষের অন্বয় বর্ণন" শীর্ষক একটী ক্ষুদ্র প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। ঐ প্রবন্ধে কায়স্থ-কুল-তিলক মহারাজচক্রবর্ত্তি আদিশূর কর্ত্তৃক আনীত বিপ্রপঞ্চকের মধ্যে মহাকবি ও নৈয়ায়িক শ্রীহর্ষের এবং তাঁহার বংশধরগণের গুণানুকীর্ত্তন করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। সেই চেষ্টা কতদূর সফল হইয়াছে তাহার বিচার পাঠকগণ করিবেন। আমরা উহার অভ্যন্তরে স্থিত নিতান্ত অনাবশ্যক অপ্রাসঙ্গিক ও বিদ্বেষ-বিষদূষিত কায়স্থ-নিন্দার প্রতিবাদ করা আবশ্যক বোধ করিয়াছি এবং তজ্জন্যই এই কতিপয় পংক্তি লিখিয়া সংহিতার মূল্যবান স্থান অধিকারে প্রয়াসী হইয়াছি। আশা করি সম্পাদক মহাশয় এই অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন।*

সুপণ্ডিত বিদ্যানিধি মহাশয়ের লেখনী কায়স্থ-নিন্দাবাদে বেশ পুষ্ট, তাহা আমরা অনেক দিন হইতেই জানি। তাঁহার প্রধান পুস্তক সম্বন্ধ নির্ণয়ের বহু স্থানে—স্থানে অস্থানে সেই পটুতার পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। যদি এই নিন্দা "সাহিত্য-সভার" মুখপত্র "সাহিত্য-সংহিতার" প্রকাশিত না হইয়া হিতবাদিতে অথবা অন্য কোন পত্রিকায় প্রকাশি হইত, তাহা হইলে আমরা উহার প্রতিবাদ করিতাম না। "সাহিত্য-সংহিতা" পত্রে এরূপ নিন্দাবাদ অনুচিত বলিয়াই আমরা এই প্রতিবাদ করিতে বাধ্য হইয়াছি। "সাহিত্য-সভা" সকল জাতির—সকল সমাজের—পবিত্র মিলন-মন্দির; এখানে জাতীয় কলহ,—সামাজিক বিবাদ নিতান্ত গর্হিত। এই সভা ও তাহার মুখপত্র কায়স্থ-সম্পর্কশূন্য নহে। পুনশ্চ, প্রবন্ধটীতে যে মহাপুরুষের গৌরবগীতি প্রকাশিত হইতেছে,—সেই মহাপুরুষ এক চিরপ্রসিদ্ধ পুণ্যপূতকীর্ত্তি কায়স্থনৃপতি কর্ত্তৃক কান্যকুব্জ হইতে আনীত হইয়াছিলেন এবং তাঁহারই প্রদত্ত সম্মান এবং বৃত্তিতে সম্মানিত ও পরিপুষ্ট হইয়াছিলেন। সেই মহাকবির আশ্রয়দাতা ও অন্নদাতা ভূপতির জাতির নিন্দায় কি ফল লাভ হইবে? আমাদের মনে হয়, "বিদ্যানিধি" স্মৃতি-শাস্ত্রের তত্ত্ব অবগত নহেন। নতুবা কায়স্থ জাতিকে শূদ্র বলিয়া পরিচয় দিতে গিয়া, তাঁহাদের আনীত ও আশ্রিত কান্যকুব্জাগত বিপ্রশ্রেষ্ঠদিগকেও কেন অবমানিত করিবেন? শ্রীহর্ষাদি পঞ্চবিপ্র কি শূদ্রযাজী ব্রাহ্মণ ছিলেন? হায়! বিদ্বেষ-বুদ্ধি মনুষ্যকে সদসৎ বিবেচনাশূন্য করিয়া দেয়, নচেৎ "বিদ্যানিধি" মহাশয় অনর্থক কায়স্থ জাতির মনঃপীড়া উৎপাদন করিতে গেলেন কেন? তিনি যে নিজেই নিজের গৌরব হানি করিলেন তাহা কি বুঝিলেন না? এই ভারতবর্ষে—অথবা এই বঙ্গদেশে এমন ব্রাহ্মণ কে আছেন, যিনি বুকে হাত দিয়া

* পাঠক মহাশয় বিদ্যানিধি মহাশয়ের প্রবন্ধটী পাঠ করিয়া দেখিবেন, ইহাতে কায়স্থ-নিন্দা করিবার কোন আবশ্যকতা ছিল না অথবা ঐ নিন্দাবাদ উঠাইয়া দিলে প্রবন্ধের কোন অঙ্গ হানি হয় না। পণ্ডিত মহাশয় পেনশন লইয়া বৃদ্ধ বয়সে এরূপ অযথা পরনিন্দায় কেন প্রবৃত্ত হইলেন তাহা তিনিই জানেন।

বলিতে পারেন যে, তিনি আজও স্বতঃ অথবা পরম্পরিতভাবে কায়স্থের সম্পর্কশূন্য আছেন? কায়স্থ শূদ্র হইলে বঙ্গীয় ব্রাহ্মণেরাও স্মৃতি-শাস্ত্রানুসারে যে পাতিত্য প্রাপ্ত হন, তাহা কি তিনি বিস্মৃত হইয়াছেন?

কায়স্থদিগের ক্ষত্রিয়ত্ব অপলাপ করিবার নিমিত্ত তিনি যে যুক্তি বাহির করিয়াছেন, তাহা দেখিলে তাঁহার পাণ্ডিত্যের প্রতি ঘোর সন্দেহ জন্মে। তিনি বলিতেছেন,—"যাঁহাদিগের কথায় সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় হয়, তাঁহাদিগের শরীর রক্ষার জন্য আবার পাঁচজন ক্ষত্রিয়ের সঙ্গ আবশ্যক হইয়াছিল! যে পাঁচজন মহর্ষি আদিশূরের যজ্ঞে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই সিদ্ধপুরুষ ও পরমেশ্বরের সাক্ষাৎকারে সদাতৎপর। তাঁহাদিগের কি শত্রু থাকার সম্ভব?" বিদ্যানিধি মহাশয়ের বিদ্যার দৌড় দেখিলে প্রকৃতই বিস্মিত হইতে হয়। আর্য্য ধর্ম্মশাস্ত্র পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন যে, রাজা নিজ রাজ্যস্থ ঋষিদিগকে সর্ব্বদাই সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিবেন, এবং ঋষিগণ রাজকরস্বরূপ তাঁহাদের পুণ্যের ষষ্ঠাংশ অর্পণ করিবেন। সত্য ত্রেতা ও দ্বাপরের মহর্ষি ব্রহ্মর্ষিদিগকে শত্রু কবল হইতে রক্ষা করিবার জন্য সর্ব্বদাই ক্ষত্রিয় বাহুবলের আবশ্যকতা ছিল এবং পুরাণশাস্ত্রে এরূপ আবশ্যকতার ভূরি ভূরি নিদর্শন পাওয়া যায়। কলিযুগে,—মুসলমান কর্ত্তৃক ভারত-বিজয় ও সোমনাথ প্রভৃতি পবিত্র তীর্থ লুণ্ঠনের কিঞ্চিৎকাল পূর্ব্বের গৃহস্থ ব্রাহ্মণগণ কি সেই সত্যত্রেতার ঋষিদিগের অপেক্ষা অধিকতর তপোবল বা ব্রহ্মবিদ্যাসম্পন্ন ছিলেন? তাহা হইলে কি বিজয়ী মুসলমান বীরবৃন্দের মুদ্গরাঘাতে লক্ষ লক্ষ হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তি চূর্ণবিচূর্ণ এবং অগণ্য হিন্দু শাস্ত্র তাহাদিগের প্রদত্ত অগ্নিতে ভস্মীভূত হইত? পণ্ডিত মহাশয় বিশ্বামিত্র ও রামের নজীর তুলিয়া নিজপক্ষ সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু রামায়ণ খুলিয়া পাঠ করিলেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন যে নজীরটী তাঁহার প্রতিকূলই হইয়াছে। শ্রীরামচন্দ্র বিষ্ণুর অবতার বলিয়াই এবং অনন্তসাধারণ বলবীর্য্যসম্পন্ন বলিয়াই যজ্ঞবিঘ্ন-বিনাশার্থ বিশ্বামিত্র তাঁহার শরণ লইয়াছিলেন এবং আজিও অসংখ্য ব্রাহ্মণ সেই ক্ষত্রিয়কুমারের পূজা করিতেছেন। ব্রাহ্মণ যতই কেন ব্রহ্মতেজসম্পন্ন হউন না, তাঁহার যে ক্ষত্রিয়-বাহুবল আবশ্যক একথা শাস্ত্রজ্ঞ মাত্রেই স্বীকার করিবেন। শ্রীহর্ষাদির তদ্রূপ সাহায্যের আবশ্যকতা ছিল না এ যুক্তি নিতান্তই অসার।

পণ্ডিতপ্রবর বিদ্যানিধি মহাশয়ের দ্বিতীয় যুক্তিটীর মাধুর্য্য দেখুন। "যাঁহারা কায়স্থদিগকে ক্ষত্রিয় বলেন, তাঁহারা কহেন, কায়স্থগণ হস্তিপৃষ্ঠে এবং এবং মহর্ষিপঞ্চক গোযানে আগমন করেন। কথা সত্য হইলেও বিচার করিতে গেলে হস্তী অথবা অশ্বপৃষ্ঠে অতি দূরপথে ভৃত্যের আগমনে প্রভুর মর্য্যাদার ন্যূনতা হয় না। বিশেষতঃ তাঁহারা সভার্য্য এদেশে আগমন করেন। আর্য্যজাতীয় মহিলাবর্গের কেহই হস্তী অথবা অশ্বারোহণ করে না। সুতরাং মহর্ষিপঞ্চককে সস্ত্রীক গোযানে আগমন করিতে হয়। বিশেষতঃ অতিদূরপথে ও দীর্ঘ কালের জন্য প্রবাসী হইতে হইলে, গৃহস্থালীর উপকরণ সামগ্রীর প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলি সঙ্গে না আনিলে প্রতিদিনের শয়নোপবেশন ও ভোজনাদির নিতান্ত অসুবিধা জন্মে। তাহারই পরিহার জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যজাত হস্তীপৃষ্ঠে ও অশ্বপৃষ্ঠে সংস্থাপন পূর্ব্বক ভৃত্যপঞ্চককে শ্রান্তিহরণ মানসে তাহাদিগকে হস্তী বা অশ্বের পৃষ্ঠে

আরোহণ পুরঃসর সঙ্গে আগমন করিতে অনুমতি করেন।"

আহা! বিদ্যানিধি মহাশয়ের যুক্তির পরম্পরা কি মনোহারিণী! তাঁহার ভাষার ছটা কি মোহময়ী! কুলগ্রন্থে কোন ব্রাহ্মণ কুলাচার্য্য লিখিয়াছেন যে, কনৌজ হইতে ব্রাহ্মণগণ গোযানে, ঘোষ, বসু ও মিত্রজ অশ্বারোহণে, দত্তজ মহাশয় হস্তিপৃষ্ঠে এবং গুহ মহাশয় নরযানে বা পালকীতে বঙ্গদেশে আগমন করিয়াছিলেন। এই কথার উপর পণ্ডিত মহাশয় স্বীয় সূচীসূক্ষ্ম মেধাবী সহায়ে সুযুক্তির আকাশ-সৌধ সংস্থাপিত করিয়াছেন। যাঁহার ভাষার জটিলতা ও দুরবগাহতা ত্যাগ করিয়া সোজা বাঙ্গালায় বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, শ্রীহর্ষাদির সঙ্গে যে পাঁচজন কায়স্থ আসিয়াছিল তাহারা ক্ষত্রিয় নহে, শূদ্রাধম দাস। তাহার প্রমাণ এই যে, তাহারা সে কালের অতিশয় নিন্দিত যান সমূহে—যাহাতে সেকালে ব্রাহ্মণ ঠাকুরদের হাঁড়ি কুড়ি কুলা ডালা ইত্যাদি ঘরের মূল্যবান আসবাব আনা হইত—অর্থাৎ হাতী ঘোড়া এবং পালকীতে চড়িয়া কনৌজ হইতে বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন আর তাঁহাদের ভাগ্যবান্ প্রভুবৃন্দ—ব্রাহ্মণঠাকুরেরা ব্রাহ্মণীটীকে লইয়া সে কালের সেই কাঁচা রাস্তা দিয়া অতি সুখকর "ক্যাঁচ-ক্যাঁচ শব্দোদ্গারী" ও "হঠং হঠং" গতিশীল গোযান অর্থাৎ গরুর গাড়ী করিয়া আসিয়াছিলেন। যদি বলেন,—তাঁহারা হস্তী অশ্ব অথবা পালকীতে আসিলেন না কেন?—তাহার উত্তর—তাঁহাদের সঙ্গে ব্রাহ্মণীঠাকুরাণীগণ, তাঁহারা ত আর হাতী ঘোড়া কি পালকীতে চড়িতে পারেন না,—আর ব্রাহ্মণী ছাড়িয়া ব্রাহ্মণ ঠাকুরেরা কি করিয়া "একাকী হয়মারুহ্য" বাঙ্গালায় আসিবেন? তাই ঠাকুরদের শান্তি স্বরূপ তাহাদিগকে "হস্তী বা অশ্বের পৃষ্ঠে আরোহণ পুরঃসর" সঙ্গে আসিতে হুকুম দিয়াছিলেন।

পণ্ডিত মহাশয়ের মতে (১) আর্য্য মহিলারা হস্তী অথবা অশ্বের পৃষ্ঠে (এবং পালকীতেও বুঝি) *আরোহণ করিতে পারেন না; (২) দূরদেশে যাইতে হইলে ঘরের আসবাব হাতী ও ঘোড়ার পিঠে (এবং পালকীতে) চাপাইয়া চাকরকে "হস্তীর বা অশ্বের পৃষ্ঠে আরোহণ পুরঃসর" আনিতে হয় এবং মনিবকে সস্ত্রীক অতিশয় সুখকর গরুর গাড়ীতে যাইতে হয়। অতএব কায়স্থেরা যখন হাতী ঘোড়া ও পালকীতে চড়িয়া অত দূরদেশ হইতে আসিয়াছেন এবং গরুর গাড়ীর যোগাড় করিতে পারেন নাই—তখন স্থির সিদ্ধান্ত এই যে তাহারা দাস অর্থাৎ শূদ্র।

পণ্ডিত মহাশয়ের বংশগত জীবিকা ঘটকালী সুতরাং ইতিহাস পড়িবার সময় কোথায়? নচেৎ তিনি "আর্য্য মহিলাবর্গের কেহই হস্তী অথবা অশ্বারোহণ করে না।" এরূপ অদ্ভুত কথা বলিতে সাহস করিতেন না। ব্রাহ্মণকন্যা হস্তী ও অশ্বারোহণ করিতেন না, এরূপ বলিলেও কথা ছিল, কিন্তু "আর্য্য মহিলাবর্গের কেহই" হাতী ঘোড়া চড়িতেন না এরূপ বলা অজ্ঞতার পরিচয় দেওয়া মাত্র। সে কালের রাজকন্যারা বাহিরে যাইতে হইলেই "করেণুকামরুহ্য" যাইতেন—একথা কি পণ্ডিত মহাশয় সংস্কৃত কাব্য নাটকাদিতে দেখেন বা শুনেন নাই? শত শত ক্ষত্রিয় মহিলা অশ্বপৃষ্ঠে যোদ্ধ্রীবেশে শত্রুশির খণ্ড খণ্ড করিয়াছেন, তিনি কি সে সংবাদও রাখেন না? রাজপুত-ইতিহাস খুলিয়া দেখুন,—দেখিবেন ক্ষত্রিয়-রমণী অশ্বারোহণে বিশেষ পটু। সে দিনও ঝান্সীর রাণী

---

* পালকীর বেহারা ত আর সজ্জন হয় না, সুতরাং তাহারা দুর্জ্জন। সুতরাং তাহাদিগের দ্বারা বাহিত পালকীতে যাওয়া নীতিশাস্ত্রবিরুদ্ধ।

লক্ষ্মীবাই অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া নিজ সৈন্যদিগের সেনাপত্য করিয়াছেন।

আমাদের মনে হয়, পণ্ডিত মহাশয় যদি বলিতেন যে, কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণগণ নীতি শাস্ত্রের বড়...ছিলেন, এবং তাঁহারা হস্তী দেখিলে সহস্র হস্ত, অশ্ব দেখিলে শত হস্ত, শৃঙ্গী দেখিলে দশ হস্ত দূরে যাইতেন এবং দুর্জ্জন দেখিলে সে স্থান পরিত্যাগ করিতেন এবং কনৌজের রাজা তাঁহাদের সম্মানার্থ তাঁহাদের জন্য যে হস্তী, অশ্ব, নরযান এবং গোযান দিয়াছিলেন,—তাহার মধ্যে হস্তী, অশ্ব এবং নরযান * চাকরদিগকে দিয়া গোযানের পশ্চাদ্দিক হইতে ব্রাহ্মণীদের উঠাইয়া দিয়া নিজেরা বলীবর্দ্দ হইতে ঠিক দশ হাত দূরে দূরে ভূমিতে পদব্রজে বঙ্গে আসিয়াছিলেন, তাহা হইলে তাঁহার যুক্তির মাধুর্য্য শতগুণে বর্দ্ধিত হইত সন্দেহ নাই।

ফলতঃ নিরপেক্ষ পাঠকগণ নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিবেন যে, চাকরেরা হাতী ঘোড়া এবং পালকীতে চড়িয়া আসে না,—কোন কালেই আসিত না। রাজরাজেশ্বর আদিশূরের স্বজাতি কায়স্থ বীর পুরুষগণ গোযানস্থিত ব্রাহ্মণদিগের রক্ষকস্বরূপই স্ব স্ব পদমর্য্যাদানুরূপ যান বাহনে আসিয়াছিলেন। তাঁহারাও "সভার্য্য" আসিয়াছিলেন। বিদ্যানিধি মহাশয় যদি সত্যানুসন্ধিৎসা-প্রণোদিত হইয়া পক্ষপাতশূন্য মনে কায়স্থ-সাহিত্য অধ্যয়ন করেন, আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে তিনি নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিবেন যে কায়স্থ জাতি ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণের নমস্য ও নিত্য পূজার্হ শ্রীশ্রী চিত্রগুপ্ত দেবের বংশসম্ভূত বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়। বেদ, স্মৃতি, পুরাণ, কাব্য, নাটক, ইতিহাস, কিম্বদন্তী, প্রস্তরফলক, তাম্রলিপি প্রভৃতি অসংখ্য প্রমাণ এসম্বন্ধে বিদ্যমান রহিয়াছে। আর যদি আমাদের ভাগ্য দোষে তিনি এই সকল প্রমাণ অবলোকনেও কায়স্থ জাতির ক্ষত্রিয়ত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান থাকেন, তাহা হইলেও "সাহিত্য-সংহিতায়" সে সন্দেহের কথা প্রকাশ করিয়া সমগ্র কায়স্থজাতিকে অবমানিত করা উচিত নহে। সাহিত্য-সংহিতা জাতীয় বিদ্বেষ প্রকাশের উপযুক্ত স্থান নহে। পত্রান্তরে অথবা পুস্তিকাকারে তিনি কায়স্থ নিন্দা প্রকাশিত করিলে আমরা তাহা উপেক্ষা করিতে পারিব। পবিত্র মিলনক্ষেত্রে বিবাদের কণ্টক রোপণ করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে অগপতি বিস্তরেণ।

শ্রীসত্যবন্ধু দাস।

* অধুনা দেখা যায় যে সম্পত্তিশালী ব্যক্তিগণ স্থানান্তরে যাইতে হইলে গৃহস্থালীর দ্রব্য আসবাব তক্তা তোষক ইত্যাদি ভৃত্যদিগকে গোযানে দিয়া আপনারা হস্তী, অশ্ব, গাড়ী, পালকী প্রভৃতিতে যান।

সাংখ্য কি নাস্তিক ?

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

এক্ষণে কপিল ৯৫ সংখ্যক সূত্রে যে কথা বলিয়াছেন, তাহা স্পষ্টীকৃত হইতেছে।

সাংখ্য বলিলেন—আমি যে প্রত্যক্ষ প্রমাণের লক্ষ্য করিলাম, উহাতে ইন্দ্রিয় আবশ্যক, কিন্তু ঈশ্বর ইন্দ্রিয়াতীত, সুতরাং তিনি প্রত্যক্ষপ্রমাণের গম্য নহেন। এবং তিনি এইরূপ প্রত্যক্ষগম্য না হওয়ায়, আমার কৃত সংজ্ঞাও অব্যাপ্তি দোষদুষ্ট নহে, কারণ আমার সংজ্ঞার পরিধি ইন্দ্রিয় পর্য্যন্ত, অতীন্দ্রিয় পদার্থের জন্য আমার এ সংজ্ঞা নহে।

কপিল স্পষ্টাক্ষরে ইন্দ্রিয়াতীত বলায়

যাঁহারা ঈশ্বরকে কোনও বেশধারীরূপে দর্শনেচ্ছায় অস্থির, তাঁহারা যে তাঁহাকে নাস্তিক বলিবেন, তাহায় আর বৈচিত্র্য কি? বোধ হয় এইরূপ স্পষ্টবাদীতাই কপিলকে নাস্তিক সাজাইয়াছে। যাহাই হউক বেশ বুঝা গেল "ঈশ্বরাহসিদ্ধেঃ" বলিয়াছেন বলিয়া তিনি কখনই নাস্তিক নহেন। এক্ষণে অপর দুই একটী সূত্র উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব যে সেগুলির উপর দোষারোপও অমূলক।

১ম অধ্যায় ৯৩ শ্লোক—

মুক্তবদ্ধয়োরন্যতরাভাবান্নতৎসিদ্ধিঃ।

মুক্ত ও বদ্ধ এই দুইয়ের মধ্যে অন্যতরের অভাব হইলে তাঁহার সিদ্ধি হইবে না।

অর্থাৎ যদি তুমি ঈশ্বরকে মুক্ত বলিয়া স্বীকার কর, তবে তিনি পূর্ব্বোক্ত প্রত্যক্ষ লক্ষণের বিষয়ীভূত হ'ন না, এবং যদি বদ্ধ বল, তাহা হইলে ঈশ্বরত্বই থাকে না (অর্থাৎ প্রত্যক্ষগোচর বলিলে, ঈশ্বরত্ব অসিদ্ধ); যখন উভয় পক্ষই দুষ্ট, তখন ঈশ্বরের অসিদ্ধিরূপ দোষ উপস্থিত হইতেছে। ইহার মীমাংসার জন্যই ব্রহ্মর্ষি কপিল প্রত্যক্ষ সংজ্ঞার পরই যোগিপ্রত্যক্ষ পৃথক স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। সেই যোগিপ্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয় সর্ব্বথা অনাবশ্যক, একমাত্র আত্মাই তখন দ্রষ্টা। সুতরাং প্রথম প্রত্যক্ষপ্রমাণের বহির্ভূত হইয়া তিনি যোগিপ্রত্যক্ষে সিদ্ধ হইতেছেন, এই হেতু তাঁহাকে মুক্ত বলিয়া স্বীকার করা যায় এবং তাহা হইলে তাঁহার অসিদ্ধি কদাপি ঘটিবে না। ঈশ্বর সাধারণ-প্রত্যক্ষগোচর না হইলেও তিনি যে যোগি-প্রত্যক্ষগত এবং সেহেতু তিনি বদ্ধ নহেন, নিত্যমুক্ত, ইহারই বুঝাইবার জন্য এই সূত্রটী এবং পরবর্ত্তী সূত্র রচিত হইয়াছে।

১।৯৪—উভয়থাপ্যসৎকরত্বম্॥

উভয়প্রকারেই ব্যর্থ। ঈশ্বর যদি বদ্ধ হয়েন, তবে তিনি প্রত্যক্ষপ্রমাণের সীমাগত হ'ন বটে, কিন্তু তাঁহার আর ঈশ্বরত্ব থাকে না। আর যদি মুক্ত হ'ন, তবে তাঁহার ঈশ্বরত্ব থাকিলেও প্রথমোক্ত প্রত্যক্ষ-প্রমাণের অন্তর্গত হয়েন না। [illegible] হেতে ঈশ্বরত্ব সিদ্ধ হয় তাহাই স্বীকার্য্য, অন্যথা উভয়পক্ষই ব্যর্থ হইবে। এই সমস্যার মীমাংসার্থই ভগবান্ কপিল "যোগিপ্রত্যক্ষ" বলিয়া পৃথক্ প্রমাণ স্বীকার করিয়াছেন। যদি ঈশ্বরের অসিদ্ধিই তাঁহার মনোগত হইবে, তবে কেন তিনি অতীন্দ্রিয় পদার্থ দর্শনের জন্য "যোগিপ্রত্যক্ষ" স্বীকার করিতে যাইবেন? ঈশ্বরের অতীন্দ্রিয়ত্ব শাস্ত্রসিদ্ধ এবং সেই অতীন্দ্রিয় দর্শনশক্তি যোগীর আছে, একথা স্বীকার করিলে কি তাঁহার ঈশ্বর স্বীকার করা হয় না? অতএব পূর্ব্বে যে বাহ্যেন্দ্রিয়-সম্পর্ক ব্যতীতও যোগী-দের প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয় বলা হইয়াছে, তাহাই ঠিক; এবং এইরূপ স্বীকার করিলেই প্রত্যক্ষ লক্ষণটীও আর ঈশ্বরবিষয়ক যোগিপ্রত্যক্ষে অব্যাপ্ত থাকিবে না। এই হেতু সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, ঈশ্বর অতীন্দ্রিয়, মুক্ত ও যোগি-প্রত্যক্ষগোচর।

৯৫—মুক্তাত্মনঃ প্রশংসোপাসা সিদ্ধস্যবা॥

পূর্ব্বসূত্রে বলা হইয়াছে, ঈশ্বরকে যদি বদ্ধ বলা যায়, তবে পূর্ব্বোক্ত প্রত্যক্ষ লক্ষণা-গত হন বটে, কিন্তু ঈশ্বরত্ব অসিদ্ধ হয়, এবং তাঁহাকে মুক্ত বলিলে গৃহীত প্রত্যক্ষ লক্ষণান্বিত হ'ন না, সুতরাং স্থূলদর্শীর নিকট তিনি অসিদ্ধ হ'ন, এরূপ স্থলে উভয়পক্ষেই দোষারোপ ঘটে।

এই সন্দেহনিরাকরণার্থ কপিলদেব "যোগিপ্রত্যক্ষ" নামক লক্ষণাক্রান্ত প্রত্যক্ষ স্বীকার করিয়াছেন; তদনুসারে ঈশ্বরের মুক্তত্বই তাঁহার অভিপ্রেত; অতএব তিনি বলিতেছেন:—

ঈশ্বরকে বদ্ধ ও মুক্ত উভয় প্রকার বলাই দুলদৃষ্টিতে যুক্ত বোধ হইলেও বেদাদি শাস্ত্র যখন তাঁহাকে "মুক্ত" বলিয়া প্রশংসা করিয়া থাকে এবং যখন তিনি যোগিপ্রত্যক্ষসিদ্ধ, বদ্ধ বলিলে তাঁহাকে নিত্যমুক্ত, যোগিপ্রত্যক্ষসিদ্ধ না বলিয়া প্রত্যক্ষগত করিবার জন্য বদ্ধ বলিয়া, ঈশ্বরে দোষারোপ পূর্ব্বক নাস্তিকতার প্রশ্রয় দিবে ? সুতরাং ঈশ্বর মুক্ত এবং যোগিপ্রত্যক্ষসিদ্ধ।

যাঁহারা স্বকীয় হৃদয়ের নাস্তিক্য গোপন পূর্ব্বক সাংখ্যের নাস্তিকতা প্রমাণের জন্য বদ্ধকোটি, এই সূত্রের ব্যাখ্যা কালে তাঁহারা প্রমাদ গণিয়াছেন ; তাঁহারা এবম্বিধ ব্যাখ্যান করিয়াছেন :—শ্রুতিতে যে ঈশ্বরের কথা আছে, তাহা মুক্ত ও সিদ্ধাত্মার প্রশংসা মাত্র।

ইহাদের মতে সিদ্ধ ও মুক্তাত্মারাই ঈশ্বর এবং তাহাই সাংখ্যের লক্ষ্যস্থল; এই সূত্রে সেইরূপ ঈশ্বরের কথাই স্বীকার করিতেছেন। এই শ্রেণীর লোক সাহস পূর্ব্বক আরও বলেন যে, শ্রুতিতে এইরূপ সিদ্ধ ও মুক্তগণকেই ঈশ্বরের অভিধান দত্ত হইয়াছে। ভাল জিজ্ঞাসা করি, শ্রুতি ও সাংখ্য যখন এইরূপ ঈশ্বর স্বীকার করিতেছে, তখন নাস্তিক্যটা শ্রুতির স্কন্ধে না চাপাইয়া সাংখ্যের স্কন্ধে দেওয়া হইল কোন্ ন্যায়বলে ? যদি নাস্তিক হয়, তবে শ্রুতিই অগ্রে নাস্তিক, সাংখ্য তদনুগামী মাত্র। অসাধারণ ধর্ম্মশাস্ত্রবেত্তা বেদপ্রাণ মনু বলিয়াছেন—"শ্রুতিস্তু বেদোবিজ্ঞেয়" শ্রুতিই বেদ ; অর্থাৎ উভয়ই একপর্য্যায়বাচী। সাংখ্যকে নাস্তিক বলিলে প্রকৃত পক্ষে শ্রুতিকেই নাস্তিক বলা হয় ; শ্রুতি নাস্তিক হইলে বেদই নাস্তিক্যের উৎস বলিতে হয়, কিন্তু কোন্ হিন্দু—কোন্ বেদদর্শী তাহা বলিতে—এমন কি কল্পনা করিতে সাহস করিতে পারেন ? ভগবান্ মনু বলিয়াছেন, "নাস্তিকো বেদনিন্দকঃ"। যিনি বেদের উপর মিথ্যাদোষারোপ করেন তিনিই নাস্তিক ; এক্ষণে দেখুন ! যাঁহারা সাংখ্যকে নাস্তিক বলেন, তাঁহাদেরই স্বকীয় নাস্তিক্য প্রকাশিত হইল কি না ?

এক্ষণে আরও একটী সূত্র উদ্ধৃত করিতেছি যাহাতে দেখিবেন, সাংখ্য কিরূপ সরল ভাষায় ঈশ্বরের স্তিত্ব স্বীকার করিয়া গিয়াছেন :—

৩য় অ ৫৭ সূঃ—ঈদৃশেশ্বরসিদ্ধিঃ সিদ্ধা ॥

এইরূপ ঈশ্বরের সিদ্ধি যুক্তি, বেদাদিশাস্ত্রের প্রমাণ ও যোগিপ্রত্যক্ষসিদ্ধ।

এইরূপ ঈশ্বর বলিতে কি বুঝায় ? উঃ—প্রকৃতি যাঁহার তন্ত্রাধীন, যিনি সর্ব্ববিৎ সর্ব্বকর্ত্তা। সুতরাং স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে—যিনি প্রকৃতির নিয়ন্তা, সর্ব্ববিদ্ ও সর্ব্বকর্ত্তা তিনিই ঈশ্বর, এবং তদ্রূপ ঈশ্বরই যুক্তি ও শাস্ত্রাদিসিদ্ধ।

এক্ষণে বলুন, সাংখ্যকে কোন্ হিতৈষী ব্যক্তি নাস্তিক বলিতে সাহস করিতে পারেন ? ধন্য তাঁহারা, যাঁহারা এবম্বিধ স্পষ্টোক্তিতেও দোষানুলেপনে কৃতসংকল্প।

ঐ সূত্রের অর্থ কেহ কেহ এইরূপ করিয়া, গাত্রদাহ নিবারণ করিয়াছেন—নিত্য ঈশ্বর নাই, জন্য ঈশ্বর সর্ব্বপ্রমাণসিদ্ধ। জিজ্ঞাসা করি, এই নিত্য ও জন্য শব্দদ্বয় কোথা হইতে আমদানি করিলেন ? পূর্ব্বসূত্রে ঈশ্বরকে সর্ব্ববিদ্ ও সর্ব্বকর্ত্তা বলা হইয়াছে, এবং এক্ষণে বলিতেছেন ঐরূপ ঈশ্বরই সিদ্ধ হইতে পারেন, অ.জ, সর্ব্বকর্ত্তার ঈশ্বরত্ব সর্ব্বথৈব অসিদ্ধ। আরও কথা—ঈশ্বর স্বীকার করিয়া তাঁহার নিত্যত্বের অস্বীকার করিলে ঈশ্বরেরও কি অস্বীকার করা হয় না ? বলা বাহুল্য নিত্য ব্যতীত জন্য ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব

প্রতিপাদ্য বলিয়া তাহাকে বেদান্তপাঠের স্থায় বৃথা প্রয়াস মাত্র। সাংখ্য যে ঈশ্বরের নিত্যত্ব ও মুক্তত্ব অকপটরূপে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, অধুনা তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে—"নিত্যমুক্তত্বম্" ।১অ, ১৬২॥

ঈশ্বর নিত্যমুক্ত। "প্রকৃতি পুরুষয়ো-রন্যৎসর্ব্বমনিত্যম্" ।৫।৭২॥ ৫

প্রকৃতি, জীব ও ঈশ্বর এই উভয়বিধ পুরুষ ব্যতীত সকলই অনিত্য। সুতরাং ঈশ্বরের নিত্যত্ব কপিলের স্বীকার্য্য ছিল, আর ও বহু সূত্রে নিত্যত্বের সূচনা প্রদান করিয়াছেন। অতএব কপিল অনেশ্বরবাদী একথা অমূলক।

সাংখ্যে নাস্তিকতার আরোপকগণ যে সকল সূত্র ঈশ্বরের নিষেধক বলিয়া উল্লেখ করেন তন্মধ্যে কয়েকটীর মীমাংসা পূর্ব্বে করা হইয়াছে, এক্ষণে অপরগুলি মীমাংসার চেষ্টা করা যাউক।

নেশ্বরাধিষ্ঠিতে ফলনিষ্পত্তিঃ কর্ম্মণা তৎসিদ্ধেঃ ॥৫।২॥

না—তাহা নহে; কি নহে? উঃ—একমাত্র কর্ম্মই কর্ম্মফলদাতা হইতে পারে না; কিন্তু ঈশ্বরের অধিষ্ঠিত কর্ম্মে ফলের সিদ্ধি হইতে পারে; এবং কর্ম্মদ্বারাও ফলসিদ্ধি হইতে পারে, ঈশ্বরের অধিষ্ঠাতৃত্ব-সিদ্ধ হইলে। অর্থাৎ কর্ম্ম স্বয়ং ফলদাতা হইতে পারে না, ঈশ্বর কর্ম্মে অধিষ্ঠিত থাকেন, তবে তাঁহার অধিষ্ঠাতৃত্বে, কর্ম্ম-ফল প্রসব করে। এই সূত্রের অন্বয় এইরূপ (ন) কর্ম্মৈব কেবল স্বতন্ত্রং ফলদা-য়কং ন। কিন্তু (ঈশ্বরাধিষ্ঠিতে) কর্ম্মণিফলতি (ফলনিষ্পত্তিঃ) ভবতি। (কর্ম্মণাচ) কর্ম্ম-হেতুনাচ ফলনিষ্পত্তিঃ (তৎসিদ্ধেঃ) ঈশ্বরাধি-ষ্ঠিতত্বস্য সিদ্ধেঃ॥

তাৎপর্য্য এই যে কেবলমাত্র কর্ম্ম হইতে কর্ম্মফল মিলিতে পারে না, কারণ জড় কর্ম্মে ব্যবস্থাপকতা শক্তি থাকিতেই পারে না; এবং ঈশ্বরও কর্ম্মব্যতীত ফলদান করিতে পারেন না; কারণ তদ্রূপ করিলে ন্যায়ের বিরুদ্ধাচরণ করা হয়, এই ন্যায়বিরুদ্ধে ফল প্রদান ঈশ্বরও করিতে পারেন না।

বিশেষতঃ ঈশ্বর কর্ম্মের অধিষ্ঠাতা ইহা শ্রুত্যাদি প্রমাণ ও সিদ্ধ; এইহেতু ঈশ্বরের অধিষ্ঠাতৃত্বে কর্ম্মফল প্রাপ্ত হওয়া যায় ইহাই নিশ্চিত পূর্ব্বসূত্র হইতে এইসূত্রে "চ" কারের অনুবৃত্তি গৃহীত হইয়াছে।

স্বার্থপ্রিয়গণ এইসূত্রের অর্থ এবম্বিধ করিয়া থাকেন—ঈশ্বরের অধিষ্ঠাতৃত্বে ফলনি-ষ্পত্তি হয় না, কর্ম্মদ্বারাই তৎসিদ্ধি হইয়া থাকে। কি সুন্দর অর্থ। জিজ্ঞাসা করি কর্ম্ম জড় না চেতন? সকলেই বলিবে জড়। জড় কি কখনও স্বয়ং যথাকালে, যথাযথরূপে ফল প্রদানের সুনিয়মিত অভ্রান্ত ব্যবস্থা করিতে পারে? যদি জড় কর্ম্মই কর্ম্মফলের দাতা হইত, তবে উদোর পিণ্ড বুধোর ঘাড়ে পড়িত। কখনই এই সুনিয়মিত ফল প্রাপ্ত হওয়া যাইত না; শুভকর্ম্মের শুভ, অশুভের অশুভ ফল প্রদান করা চেতনকর্ত্তা ব্যতীত হইতেই পারে না সুতরাং চৈতন্যময় ঈশ্বরের অধিষ্ঠাতৃত্বেই কর্ম্মফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতঃ স্বকীয় পূর্ব্বোক্ত অর্থ মনঃ-কল্পনা মাত্র।

অন্যাচ্চ—স্বোপকারাদধিষ্ঠানং লোকবৎ ॥৫ অ, ৩ সূ॥

যদি বল লৌকিক রাজা যেমন কর্ম্মা-নুসারে প্রজাকে ফলদান করেন বলিয়া তাঁহার অধিষ্ঠাতৃসিদ্ধ, সেইরূপ ঈশ্বরও স্বোপকার সাধন জন্যই অধিষ্ঠাতা তাহা হইলে বলিতে হয়—"লৌকিকেশ্বরবদিতর-থা।" ৫ম অ, ৪ সূত্র। তিনিও লৌকিক রাজার মত তাঁহাতে কিছুই বিশেষত্ব নাই।

অথবা "পারীভাষিকোবা' ॥৫অ, ৫সূ ॥ এইরূপ ঈশ্বর কেবল লৌকিক রাজার একটী পারিভাষিক শব্দ মাত্র ; কারণ ঈশ্বর যদি নিজের মঙ্গলের জন্যই কর্ম্মফল প্রদান করেন, তবে ... ঈশ্বর কখনই নিরপেক্ষ পূর্ণকাম হইতে পারেন না—তিনি কেবল নামধারী ঈশ্বর। প্রশ্ন—যদি তিনি নিজের উপকারের জন্য কর্ম্মফল না দিলেন, তবে তাঁহার অধিষ্ঠাতৃত্ব সিদ্ধ হইবে কিরূপে ? উঃ—ন, রাগাদৃতে তৎসিদ্ধিঃ প্রতিনিয়ত কারণত্বাৎ ॥৫অ, ৬সূ॥

না, তাঁহার নিজের উপকার কিছুই নাই; কোনওরূপ আসক্তি ব্যতীতই তাঁহার অধিষ্ঠাতৃত্ব সিদ্ধ ; কারণ তিনি জগতের প্রতিনিয়ত কারণ। যদি বল তাঁহাতে দয়ারূপ রাগ থাকিতে পারে, তদুত্তরে বলি "তদ্যোগেঽপি ন নিত্যমুক্তঃ ॥"৫অ, ৭সূ ॥ পরমেশ্বরে দয়ারূপ রাগের যোগ হইলে তাঁহার নিত্যমুক্তত্বে দোষ আসে না ; কারণ তাঁহাতে কোনও অভূতপূর্ব্ব দয়া নাই, দয়াই তাঁহার স্বরূপ অতএব তাঁহার স্বাভাবিক দয়ারূপ স্বরূপ হইতেই জগজ্জনের কর্ম্মফলের ব্যবস্থা হইয়া থাকে। সুতরাং সিদ্ধান্ত হইল ঈশ্বরের অধিষ্ঠাতৃত্বে জীব কর্ম্মফল প্রাপ্ত হয়। এই কর্ম্মফলদান বিষয়ে ঈশ্বরের স্বকীয় কোনও উপকার নাই, কারণ স্বকীয় উপকার স্বীকার করিলে, ঈশ্বরত্ব অসিদ্ধ হয় এবং ঈশ্বর জগতের প্রতিনিয়ত কারণ বলিয়া কোনওরূপ রাগ ব্যতীতও তাঁহার অধিষ্ঠাতৃত্বসিদ্ধ ; এবং যদিই দয়ারূপ রাগের কথা বল, তবে বলি যে সেই দয়া তাঁহারই স্বরূপ, যে দয়া তাঁহার স্বাভাবিক ; সুতরাং তাহা স্বীকার করিলেও তাঁহার নিত্যমুক্তত্ব ও অধিষ্ঠাতৃত্বে কোনও দোষ আসে না। এতদ্বিষয়ে ব্রহ্মাত্মা কৃষ্ণ দ্বৈপায়ণ ব্যাস যোগভাষ্যে বলিয়াছেন—"তস্যাত্মানুগ্রহাঽভাবেঽপি ভূতানুগ্রহঃ প্রয়োজনম্ ॥" ঈশ্বরের যে অনুগ্রহ, তাঁহার প্রয়োজন এই যে, তদ্দ্বারা জীবকুল অনুগৃহীত হইবে, নিজের উপর অনুগ্রহবর্ষণ তদুদ্দেশ্য নহে। মহর্ষি গৌতম ন্যায়দর্শনে বলিয়াছেন—"ঈশ্বরঃ কারণং পুরুষকর্ম্মাফল্যদর্শনাৎ ॥" পুরুষ, যে কর্ম্মের ফল যেরূপ, যে পরিমাণ ও যখন পাইতে ইচ্ছা করে, তদ্রূপ প্রাপ্ত হয় না, ইহা হইতেই সিদ্ধ হয় যে, পুরুষার্থের ফল ঈশ্বরাধীন। মহর্ষির এই উক্তির সহিত কপিলের যুক্তির কি সুন্দর সাদৃশ্য! দেখুন উভয়ে বিভিন্ন যুক্তিদ্বারা কর্ম্মফলে ঈশ্বরের অধিষ্ঠাতৃত্ব কিরূপভাবে সিদ্ধ করিলেন! এতৎ সম্বন্ধে বেদান্ত দর্শনের খ্যাতনামা রচয়িতা মহামুনি ব্যাস কি বলিয়াছেন দেখা যাউক—"ফলমত উপপত্তেঃ" ॥

শুভাশুভ কর্ম্মের ফল, ঈশ্বরই যে জীবকে দান করেন, এ কথা যুক্তিসিদ্ধ। সুতরাং বুঝা গেল, ঈশ্বরই অধিষ্ঠাতারূপে কর্ম্মের ফল দেন।

৫অধ্যায়ের ৮, ৯, ১০, ১১, ১২শ সংখ্যক সূত্রগুলিও কেহ কেহ নাস্তিক মতের সমর্থক মনে করিয়া উদ্ধৃত করেন। দেখা যাউক ঐগুলি বাস্তবিকই এবম্বিধ দোষদুষ্ট কি না। প্রধানশক্তিযোগাচ্চেৎসঙ্গাপত্তিঃ ॥

যদি বল, প্রধানরূপিনী শক্তির সংযোগ বশতঃ ঈশ্বরের অধিষ্ঠাতৃত্ব সিদ্ধ তাহা হইলে ঈশ্বরে সঙ্গদোষ আসিবে, কারণ পূর্ব্বে ঈশ্বরকে অসঙ্গ বলা হইয়াছে। সুতরাং প্রকৃতি সম্বন্ধ ব্যতীতই ঈশ্বরের অধিষ্ঠাতৃত্ব সিদ্ধ। যদি বল সত্তামাত্রে চেতনের অধিষ্ঠাতৃত্বসিদ্ধ, তবে বলিতে হয়—

সত্তামাত্রাচ্চেৎসর্ব্বৈশ্বর্য্যম্ ॥

(চেৎ) যদি (সত্তামাত্রাৎ) ঈশ্বরের সত্তামাত্রেই তাঁহার অধিষ্ঠাতৃত্ব সিদ্ধ হয়, (সর্ব্বৈশ্বর্য্যম) সমগ্র সংসারকেই ঈশ্বর বলিতে হয়। কিন্তু—

প্রমাণাভাবান্ন তৎসিদ্ধিঃ ॥

সকল পদার্থেরই ঈশ্বরত্ববিষয়ে প্রত্যক্ষ প্রমাণ না থাকায়, (সর্ব্ব-ঐশ্বর্য্যম্) সকল পদার্থই ঈশ্বর, এইরূপ সিদ্ধ হইতে পারে না। অধিকন্তু—

সম্বন্ধাভাবান্নানুমানম্ ॥

সম্বন্ধ (ব্যাপ্তি) না হওয়ায় সকল পদার্থই ঈশ্বর, অনুমানপ্রমাণ বলেও তাহা সিদ্ধ হয় না। তথা—

শ্রুতিরপি প্রধানকার্য্যত্বস্য ॥

শ্রুতি ও প্রধানের কার্য্যত্বের সাধিকা, অর্থাৎ শ্রুতিও সত্তামাত্র ঈশ্বরকে সমস্ত সংসারের উপাদান-কারণ মানিয়া, জগতকে ঈশ্বরের কার্য্য বলে না, কিন্তু জগতকে প্রকৃতির কার্য্য বলিয়াই ঘোষণা করে। যথা শ্বেতাশ্বতরোপনিষদি—

"ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে"।

উক্ত উপনিষদে আরও আছে—

অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং
বহ্বীঃপ্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাঃ।
অজোহ্যেকো জুষমাণোহনুশেতে
জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোহন্যঃ ॥

যাহা এক, এবং আপনার তুল্য বহুপ্রজা উৎপন্নকারিণী, যাহা রজঃ সত্ত্ব ও তমগুণান্বিতা, সেই অনাদি প্রকৃতিকে এক অজন্মা জীবাত্মা সেবন করিয়া তাহাতে লিপ্ত হয়; কিন্তু অন্য অজন্মা পরমাত্মা জীবদ্বারা ভুক্ত এই প্রকৃতিতে লিপ্ত হন না। এস্থলে তিনটী অজ পদার্থের উল্লেখ আছে, প্রথমতঃ প্রকৃতি অজা; ইহা রজঃ-সত্ত্ব-তমগুণান্বিতা এবং ইহা হইতে তত্তুল্য বহুপদার্থ সৃষ্ট হয় এবং উহা অপর অজ পদার্থের ~~অর্থাৎ জীবাত্মার ভোগ্য~~ ২য়তঃ—জীবাত্মা অজ; ইহা উক্ত প্রকৃতির সেবনকারী ও উহাতে লিপ্ত হয়। ৩য়তঃ—অজ অর্থাৎ প্রকৃতি ও জীবাত্মা হইতে ভিন্ন পরমাত্মা অজ; তিনি জীবাত্মা-সেবিত প্রকৃতিতে অলিপ্ত। অতএব দেখা যাইতেছে শ্রুতিও জগতকে প্রকৃতির কার্য্য বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন। সুতরাং স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে যে, পূর্ব্বকথিত সূত্রগুলি নিরীশ্বর বাদের সমর্থক হইতেই পারে না; বরং সম্পূর্ণ সেশ্বরবাদের প্রতিষ্ঠাপক। আমরা ষড়দর্শন, অন্যান্য দর্শন, পুরাণ, মহাভারত এবং সাংখ্য সম্বন্ধীয় বিবিধ দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ, ভাষ্যাদি তথা ভারতীয় আচার্য্যকুলের শিরোমণিস্বরূপ আর্য পণ্ডিতগণের ব্যাখ্যাদি সংগ্রহপূর্ব্বক সূত্রগুলির সুমীমাংসিত, পারম্পর্য্যরক্ষিত অর্থ প্রকাশ করিয়া সাংখ্যের নাস্তিকবাদ মোচনের চেষ্টা করিলাম, জানি না বিদ্বৎ সমাজে ইহা কিরূপে গৃহীত হইবে। যদি কেহ মানবমাত্রেরই হিতার্থে, যথার্থ আত্ম জ্ঞানানুসারে অপক্ষপাতে এই প্রবন্ধের প্রতিবাদ করেন, সাধ্যানুসারে উত্তর দানের প্রয়াস করা যাইবে। ইতি শান্তিরোম্ ॥

শ্রীসিদ্ধেশ্বর বাৎস্য বেদার্থী।

বঙ্কিম বাবুর সহিত এক ঘণ্টা।

সে অনেক দিনের কথা—১২৯১ সাল। মধুর বাসন্তী প্রভাতে ভ্রমণে চলিয়াছি। ঝুরঝুরে বসন্তের বাতাস আসিয়া প্রাণ আমোদিত করিতেছিল।

আমার সঙ্গীটি, পূর্ব্বাকাশের দিকে দৃষ্টি দান করিয়া বলিলেন,—'দেখুন, উষারাণী, রবির প্রতি সঘৃণ কটাক্ষপাত করিয়া, কেমন ছুটিয়া পলাইতেছেন! রমণী এতও ছুটিতে পারে?'

'পারে। অন্য কিছুর জন্য নহে—সতীত্ব

রক্ষার জন্ত। রবি, উষার জন্ত পাগল. কিন্ত উষা, সতী সাধ্বী নারীর স্তায় কিছুতেই রবিকে ধরা দেন না।'

পর মুহূর্ত্তেই হতাশ প্রেমিকের ন্যায় রবি, রক্তরাগ... মূর্চ্ছিত পূর্ব্বাকাশে দেখা দিলেন।

সঙ্গী বলিলেন, 'রবির নয়নে যেমন প্রদীপ্ত অনল, হৃদয়-কাননেও সেইমত দাবানল অহরহ জ্বলিতেছে। রবি যেমন সমস্ত জগৎ জ্বালাইতেছে, তেমনি নিজে জ্বলিয়া মরিতেছে।'

'কামুক পুরুষের দশাই ঐ।'

তখন আমরা ঠনঠনিয়ায় উপস্থিত হইয়াছি। সঙ্গীকে সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলাম,—'বঙ্কিম বাবু আপনাকে চিনিতে পারিবেন ত?'

'কি জানি।' সঙ্গী বলিলেন, 'কি জানি— বহুবর্ষ দেখা হয় নাই—'

বাধা দিয়া বলিলাম—'বেশ কথা! আমি ভাল মুরুব্বির সঙ্গে আসিতেছি!'

হাস্তসহকারে সঙ্গী বলিলেন,—'তবে কি ফিরে যাইতে চান?'

আমি বলিলাম, 'এতদূর আসিয়া—'

সঙ্গী বলিলেন, 'ভয় নাই, চলুন। আমি জানি, বঙ্কিম বাবুর সহিত একবার যাঁহার আলাপ হইয়াছে, বঙ্কিম বাবু তাঁহার মুখ দেখিলেই তাঁহাকে চিনিতে পারেন।'

'বেশ কথা! এই দীর্ঘকাল এজলাসে বসিয়া তিনি হাজার হাজার অপরাধীকে জেলে পাঠাইয়াছেন। আপনি কি বলিতে চান, তিনি সেই সব কয়েদীকে দেখিলেই চিনিতে পারেন?'

'এজলাস-কাটগড়ার আলাপ আর ভদ্র লোকের সহিত আলাপের কি পার্থক্য নাই? ভাল, তিনি দেখিয়া চিনিতে না পারেন, পরিচয় দিব।'

এখানে সঙ্গীটীর পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের নাম পাঠকবর্গের মধ্যে বোধ হয় অনেকেই জানেন। তাঁহারই এক মাত্র সহোদর—অনুজ ছিলেন—৺বাবু রামচন্দ্র গুপ্ত। ঈশ্বরচন্দ্র নিঃসন্তান ছিলেন। রামচন্দ্রেরও পুত্র ছিল না—কেবল এক মাত্র কন্যা। তিনি এখনও জীবিতা। সেই কন্যার সহিত আমার এই সঙ্গীর বিবাহ হয়। ইঁহার নাম বাবু গোঁসাই দাস গুপ্ত। তিনি তখন ভাগলপুরের ছোট আদালতের হেড্ ক্লার্ক ছিলেন। দুঃখের বিষয় এক্ষণে তিনি স্বর্গবাসী।

ঈশ্বরচন্দ্র এবং রামচন্দ্রের সমস্ত স্নেহ টাই জামাতা গোঁসাই দাস বাবুর উপর পড়িয়াছিল। অল্পবয়স্ক গোঁসাই দাস বাবু, কবি ঈশ্বরচন্দ্রের নিকট উৎসাহ প্রাপ্ত হইয়া বঙ্গসাহিত্য আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। তাঁহার রচিত অনেক কবিতা তখন সংবাদ প্রভাকরে প্রকাশিত হইয়াছিল।

সে সময়ে কবি ঈশ্বরচন্দ্রের গৌরব— প্রতিপত্তি দেশ বিদেশে ব্যাপ্ত হইয়াছিল। বঙ্গ-সাহিত্যের আলোচনা এবং কবিতা রচনা সূত্রে সে সময়ে অনেক শিক্ষিত যুবক ঈশ্বর গুপ্তের ছাত্রত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে বঙ্কিম বাবুও একজন। বঙ্কিম বাবু তখন সময়ে সময়ে কলিকাতায় আসিয়া, ঈশ্বরচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। সেই স্থানেই তাঁহার সহিত গোঁসাই-দাস বাবুর আলাপ পরিচয় হইয়াছিল। তাই তাঁহাকে মুরুব্বি খাড়া করিয়া, বঙ্কিম-সম্ভাষণে চলিয়াছি।

তখন বঙ্কিম বাবু, ভবানী চরণ দত্তের লেনে ৺বাবু রামকমল সেনের বাটীর সম্মুখের এক বাটীতে বাস করিতেন।

বাটীর প্রবেশ দ্বারে ঢুকিয়াই দেখিলাম, বাম পার্শ্বের একটী কক্ষে বসিয়া একটী,

নবীন যুবক। চিনিলাম না। গোঁসাইদাস বাবুর প্রশ্নে যুবকটী মধুরস্বরে 'তিনি উপরে আছেন।' বলিয়া সোপানশ্রেণী দেখাইয়া দিলেন। পরে জানিয়াছিলাম, যুবকটী বঙ্কিম বাবুর অন্যতম জামাতা। নাম বাবু রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। এক্ষণে তিনি স্বর্গগত।

সোপানশ্রেণী উত্তীর্ণ হইয়া একটা কক্ষে প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম সে স্থানে জনপ্রাণী নাই। কয়েকটি আলমারিতে বঙ্কিমবাবুর স্বরচিত গ্রন্থগুলি সজ্জিত দেখিলাম।

ভিতরের কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, একটী প্রশান্ত সৌম্য মূর্ত্তি পুরুষ কাষ্ঠাসনে বসিয়া আছেন। উজ্জ্বল মধুর প্রতিভা যেন মুখমণ্ডলকে উদ্ভাসিত করিতেছে। সেকেলে ধরণের মেরজাই বরবপু আচ্ছাদিত করিয়া রহিয়াছে। সম্মুখে রৌপ্য ফুরষী। নলটীতে এক একবার চুম্বন করিয়া ধূম উদ্গীরণ করিতেছেন। ইনিই বঙ্কিম বাবু।

অগ্রে আমার সঙ্গী গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইবামাত্র বঙ্কিম বাবু সহাস্য আস্যে 'আসুন' বলিয়া সাদর সম্ভাষণ করিলেন। সঙ্গীকে চিনিলেন দেখিয়া, আমার একটা উদ্বেগ দূর হইল।

সে কক্ষে আর একটী মূর্ত্তি দেখিলাম। মূর্ত্তিটী সরল—সুন্দর—প্রসন্ন।

কুশলপ্রশ্নের পর বঙ্কিম বাবু, সেই প্রসন্নমূর্ত্তি পুরুষের নিকট আমার সঙ্গীর পরিচয় দিলেন। পরে সঙ্গীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'ইঁহার নাম বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। ইনি এক্ষণে বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের অনুবাদক।'

পরিচয় পাইয়া বড়ই আনন্দ হইল। একত্র দুইটী মহাপ্রাণ পুরুষের সাক্ষাৎ পাইলাম। রাজকৃষ্ণ বাবুর ন্যায় বহু ভাষাবিদ্ বাঙ্গালী তখন আর দ্বিতীয় ছিলেন না। আমি আনন্দ সহকারে রাজকৃষ্ণ বাবুর প্রতি দৃষ্টি দান করিয়া বলিলাম, 'আপনি অনুবাদক হওয়ায়, বাঙ্গালা সংবাদপত্র-সম্পাদকদিগের একটা ভয় দূর হইয়াছে।'

সাগ্রহে রাজকৃষ্ণ বাবু প্রশ্ন করিলেন, 'কি ? কি ?' আমি বলিলাম 'পূর্ব্ব[illegible]দক রবিন্সন্ সাহেব অনেক সময়ে সংবাদ পত্রের সম্পদকীয় মন্তব্যের বিচিত্র অর্থহীন অনুবাদ করিতেন। এক সময়ে সমাচার চন্দ্রিকায় "মেও ধরিবে কে ?" শীর্ষক একটী সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশিত হয়। সাহেব তাহার অনুবাদ করেন—Who will catch Lord Mayo ?"

সকলে হাসিয়া উঠিলেন।

'অনেক সাহেবের বাঙ্গালা ভাষা জ্ঞান ঐরূপ। ফিলিপ সাহেব কপালকুণ্ডলার অনুবাদ করিয়াছেন। তিনি ঐরূপ অনেক স্থান অর্থশূন্য বিচিত্র অনুবাদ করিয়াছেন।' বঙ্কিম বাবু এই কথা বলিয়াই গোঁসাই দাস বাবুকে ইসারা করিলেন। আমি কে, এইটা জানাই তাঁহার উদ্দেশ্য। এপর্য্যন্ত ত আমার পরিচয় দেওয়া হয় নাই।

গোঁসাই দাস বাবু তখন আমার নামটী বলিলেন। রাজকৃষ্ণ বাবু আমার একটু লেজুড় যুড়িয়া দিলেন। প্রবীণ বিচারকেরা এজলাসে বসিয়া যেমন বাদী প্রতিবাদী বা সাক্ষীদের উপর কটাক্ষ করিয়া, তাহারা কি ধাতুতে গঠিত, ইহা জানিয়া লইবার চেষ্টা করেন, বঙ্কিম বাবুর তীব্র কটাক্ষ সেই মত আমার উপর পতিত হইল।

তখন ঈশ্বর গুপ্তের কথা উঠিল। বঙ্কিম বাবু, গোঁসাই দাস বাবুকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, 'আপনাকে দেখিয়া আজ গুপ্ত কবিকে মনে পড়িতেছে। তাঁহার কোন কোন কবিতার অংশ স্মৃতিপথে আসিতেছে।'

'আপনিত তাঁহার ছাত্র ছিলেন ?' রাজ

কৃষ্ণ বাবু ইহা বলিলেন। বঙ্কিম বাবু বলিলেন, 'আমি একা নহি। দ্বারকানাথ, দীনবন্ধু, রঙ্গলাল প্রভৃতি অনেকেই তাঁহার ছাত্র।'

'বঙ্গের বর্ত্তমান প্রায় সমগ্র বিখ্যাত লেখকই তাঁহার ছাত্র।' গোঁসাই দাস বাবু সহর্ষে ইহা বলিলেন।

আমি বলিলাম, 'কেবল তাহা নহে। এই কয়জন ব্যতীত আরও অনেক যুবক তাঁহার ছাত্র ছিলেন। যাঁহারই একটু রচনা-শক্তি আছে দেখিতেন, তিনি তাঁহাকেই উৎসাহিত করিতেন। তিনি একবার লিখিয়াছিলেন—

ভাবুক প্রেমিক হও যুবক সকলে।
মধুকর হয়ে বোসো কবিতা কমলে॥
সুখে খাও মধুরস লও তার গুণ।
হোয়ে প্রীত গাও গীত করি গুণগুণ॥
হৃদয়ে উদয় কর অনুরাগ রবি।
কবিতার ভাব লও নিজে হও কবি॥
গদ্য হয়, পদ্য হয়, যাহা লয় মনে।
পরম প্রবন্ধ লেখ বিশেষ যতনে॥
আপনি লিখিতে শেখ পার যে প্রকারে।
লেখাও শেখাও সবে সাধ্য অনুসারে॥
হাতে লেখা, মুখে বলা, দুই যেন চলে।
সমাজে বিখ্যাত হও বক্তৃতার বলে॥'

গোঁসাই দাস বাবু বলিলেন, 'তাঁহার নিকট গদ্য অপেক্ষা পদ্যেরই অধিক আদর ছিল। এক সময় তিনি পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়কে লক্ষ্য করিয়া লিখিয়া ছিলেন,—

হও তুমি সুপণ্ডিত বিদ্যার সাগর।
গদ্য লিখে বাধ্য করি হও প্রিয়বর॥
কবিতার প্রতি যদি প্রেম নাহি ধর।
কবির কবিতাগুণ ব্যাখ্যা নাহি কর॥
কি রস নীরস তুমি বিরস বিকট।
কিসে তুমি যশ পাবে গুণির নিকট?
ভাব রস প্রেম আছে কোথায় তোমার?
কার বলে কর তুমি পুস্তক প্রচার?
কবিগণ মহাজন নাহি রাখে ধার।
ব্যয় করে পুঁজি পাটা শুধু আপনার॥
তোমার আছে কি পুঁজি সকলেরি ধারো।
ধার করা ভাব লয়ে যা করিতে পারো॥
ধেরো হয়ে হেরো হলে মুখে বল জিৎ।
জানিতে না পার কিছু কারে বলে হিত॥

এই "সকলেরি ধারো" আর "ধেরো হয়ে হেরো হলে" কথাটা ঠিক। তাঁহার অনুবাদ ভিন্ন মৌলিক কোন গ্রন্থই নাই।'

বঙ্কিম বাবু বলিলেন,—'অমন নির্ভীক চিত্তে সত্য কথা বলিতে তখন কাহারও সাহস ছিল না। আমার মনে হয়, একবার নববর্ষের কবিতায় পড়িয়াছিলাম,—

বিড়ালাক্ষী বিধুমুখী মুখে গন্ধ ছুটে।
আহা তায় রোজ রোজ কত রোজ ফুটে॥
ঢল ঢল টল টল বাঁকা ভাব ধরে।
বিবিজান চলে যান লবেজান করে।'

'ইংরেজি নববর্ষেই আছে।' গোঁসাই দাস বাবু এই কথা বলিয়া আওড়াইলেন,—

"ধন্য ধন্য ক্ষুদ্র জীব ধন্য তুই মাছি।
তোর মত গোটা দুই পাখা পেলে বাঁচি॥
সুখে ভাসি সুন্দকান্তি দম্পতী হেরিয়া।
ভন্ ভন্ ডাক ছাড়ি বদন ঘেরিয়া॥
উড়ে গিয়ে ফুঁড়ে বসি বগির উপরে।
সঙ্গে সঙ্গে ছুটে যাই গির্জ্জার ঘরে॥
খানার টেবিলে বসি করি খুব ভুল।
এঁটো করা সেরির গেলাসে দিই হুল॥
কখন গাউনে বসি কভু বসি মুখে।
মাঝে মাঝে ভিজে গায় পাখা নাড়ি
সুখে॥'

রাজকৃষ্ণ বাবু সহাস্য আস্যে বলিলেন,— 'গুপ্ত কবির কবিতাগুলিত আপনাদের বেশ মনে আছে।'

গোঁসাই দাস বাবু বলিলেন, 'সব কবিতা

মনে নাই, তবে ব্যঙ্গ কবিতা গুলির মধ্যে অনেক গুলি মনে আছে। সে সময়ের যাঁহারা সংবাদ প্রভাকর পাঠ করিতেন, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই মনোমুগ্ধকর কবিতা গুলি কণ্ঠস্থ করিতেন।'

রাজকৃষ্ণ বাবু প্রশ্ন করিলেন, 'তখন সংবাদ প্রভাকরত প্রত্যহ প্রকাশ হইত? তাহাতে প্রত্যহই কি কবিতা প্রকাশ হইত?'

আমি বলিলাম, 'না। দৈনিক প্রভাকরের সম্পাদনের ভার ছিল বাবু শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর। তবে গুপ্ত কবি কখন কখন দুই একটী কবিতা প্রাত্যহিক প্রভাকরে প্রকাশ করিতেন। প্রতি মাসের ১লা তারিখে যে দীর্ঘাকার মাসিক প্রভাকর প্রকাশ হইত, তাহাতেই গুপ্ত কবির নানাবিধ কবিতা প্রকাশিত হইত।'

'আর সেই মাসিক প্রভাকর দেখিবার জন্যই দেশশুদ্ধ লোক প্রতীক্ষা করিয়া থাকিত। এমন কি ১লা তারিখে প্রাতঃকালে বহুশত লোক প্রভাকর কার্য্যালয়ে আসিয়া প্রভাকর লইয়া যাইত। গুপ্ত কবির লোকেরা যে গ্রাহকগণের বাটীতে গিয়া প্রভাকর দিয়া আসিবে, গ্রাহকগণ সে সময় অপেক্ষা করিতে পারিতেন না।' গোঁসাই দাস বাবু এই কথাগুলি বলিলেন।

'ঈশ্বরচন্দ্রের গৌরব-প্রতিপত্তি তখন সমগ্র বঙ্গদেশেই ব্যাপ্ত হইয়াছিল। অনেক সম্রান্ত ধনবান লোকে তাঁহার বৈঠখানা প্রায় পূর্ণ থাকিত।' বঙ্কিম বাবু এই কথা বলিয়া শেষ কহিলেন,—'আমরা তখন বালক ছিলাম। আমরা তাঁহার সহিত দেখা করিতে যাইলে, তিনি সাদরে আহ্বান করিয়া তাঁহার স্বরচিত নুতন কবিতা পাঠ করিয়া আমাদের উপভোগ করিতেন।'

'অন্য পক্ষে বিদ্যোৎসাহী ধনবান মাত্রের সহিত তাঁহার বন্ধুত্বও জন্মিয়াছিল। মফঃস্বলের ধনবান জমীদারগণ তাঁহাকে নিজ নিজ দেশে লইয়া যাইবার জন্য বড়ই চেষ্টা করিতেন। কবিও শীতকালে নৌকারোহণে জলপথে এক এক সময়ে বঙ্গের এক এক অঞ্চলে যাইতেন।' গোঁসাই দাস বাবু ইহা বলিলেন।

আমি বলিলাম, 'কলিকাতা এবং উপনগরের প্রায় সমস্ত সম্রান্ত ধনবান, গুপ্ত কবিকে ভাল বাসিতেন বটে কিন্তু তিনি সর্ব্বাপেক্ষা সভাবাজার-রাজকুল-গৌরব স্বর্গীয় মহারাজ কমলকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের অতি প্রিয় ছিলেন। মহারাজ নিজে একজন মাতৃভাষানুরাগী ছিলেন। তাঁহার সময়ের সমস্ত সাহিত্যসেবীই তাঁহার নিকট আদর পাইতেন। কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র তাঁহার এতদূর প্রিয় ছিলেন যে, তিনি খড়দহস্থ স্বীয় মনোরম উদ্যানবাটীকার মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্রের বাস জন্য এক খানি স্বতন্ত্র বাটী প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র গ্রীষ্মকালে তথায় বাস করিতেন এবং নিত্য নব নব কবিতা রচনা করিয়া মহারাজকে তুষ্ট করিতেন। সে বাটী এখনও সেই উদ্যানে সেই ভাবেই আছে এবং তাহা ঈশ্বরচন্দ্রের বাটী বলিয়া এখনও পরিচিত।'

রাজকৃষ্ণ বাবু বলিলেন, 'তবে ইহাই গুপ্ত কবির স্মৃতি-মন্দির—বাঙ্গালী জাতির তীর্থস্থান।'

'ইয়ুরোপ হইলে তাহাই হইত।' বঙ্কিম বাবু এই কথা বলিয়া, কহিলেন, 'ঈশ্বরচন্দ্র একজন খাঁটী বাঙ্গালী কবি ছিলেন। অনেক সময়ে তাঁহার তীব্র কষাঘাতে, অনেক মেকীকে ছট ফট করিতে হইত। ব্যঙ্গ বর্ণনায় তিনি বাঙ্গালী কবিদিগের অগ্রণী।'

গোঁসাই দাস বাবু কহিলেন, 'মেকী

ব্রাহ্মণদিগকে লক্ষ্য করিয়া তিনি একস্থানে লিখিয়াছিলেন,—

মণ্ডালোভা দধিচোষা, চোসাদল যত।
কোশাভরা গোসাভরা, তপে জপে রত॥
প্রভাতে উঠিয়া মরে, মিছে ফুল তুলে।
পূজার আসনে বসে মন্ত্র যায় ভুলে॥
শিবেরে ঠেকায়ে কলা, কলা আগে চায়।
খপকরে তুলে নিয়ে গপ করে খায়॥
ভূতপানে ফেলে দিয়ে, নিজ পেট পানে
কোশা ধরে ঢক ঢক, জল ঢালে গালে।'

'সে সময়ের অনাচার দেখিয়া কবি লিখিয়াছিলেন—

কালগুণে এই দেশে বিপরীত সব।
দেখে শুনে মুখে আর নাহি সরে রব॥
একদিকে দ্বিজ তুষ্ট গোল্লা ভোগ দিয়া।
আর দিকে মোল্লা বসে মুর্গি মাস নিয়া॥
এক দিকে কোশা কুশী আয়োজন নানা॥
আর দিকে টেবিলে ডেভিলে খায় খানা॥
ভূতের সংসারে এই হয়েছে অদ্ভুত।
বুড়া পূজে ভূতনাথ ছোঁড়া পূজে ভূত॥
পিতা দেয় গলে সূত্র পুত্র ফেলে কেটে।
বাপ পূজে ভগবতী বেটা দেয় পেটে।
বৃদ্ধ ধরে পশুভাব অশুভাব শিশু।
বুড়া বলে রাধাকৃষ্ণ ছোঁড়া বলে ঈশু॥
হাসি পায় কান্না আসে কব আর কাকে?
যায় যায় হিঁদুয়ানী আর নাহি থাকে॥'

আমার দিকে চাহিয়া রাজকৃষ্ণ বাবু বলিলেন, 'আপনি এই যে কবিতা আবৃত্তি করিতেছেন, তাতে দেখিতেছি, আপনার বেশ মনে আছে।'

গোঁসাই দাস বাবু হাসিয়া বলিলেন, 'প্রভাকরের ১ম সংখ্যা হইতে গুপ্ত কবির লিখিত শেষ সংখ্যা পর্য্যন্ত সমস্ত প্রভাকর পাঠ করিয়া ইনি সমস্তই একরকম কণ্ঠস্থ করিয়াছেন।'

আমি বলিলাম 'সব কবিতা আমার মনে নাই, মনে থাকিতেও পারে না, তাহা অসম্ভব। তবে বারবার আলোচনা সূত্রে অনেক কবিতার অনেক স্থল মনে আছে। গুপ্ত কবি আর এক স্থলে আচার ভ্রংসতা সম্বন্ধে একটী গান রচনা করিয়াছিলেন—

যত কালের যুবো, যেন সুবো,
ইংরাজি কয় বাঁকা ভাবে।
ধরে গুরু পুরুত মারে জুতো,
ভিকারী কি অন্ন পাবে?
যদি অনাথ বামুন হাত পেতে চায়,
ঘুসি ধরে ওঠেন তবে।
বলে গতোর আছে খেটে খেগে,
তোর পেটের ভার কেটা ববে?
যাদের পেটে নেড়া, মেজাজ টেড়া,
তাদের কাছে কেটা চাবে?
বলে জো বাঙালি, ড্যাম গো টু হেল,
কাছে এলেই কোঁৎকা খাবে।
আমি স্বপনে জানিনে বাবা,
অধঃপাতে সবাই যাবে॥
হয়ে হিঁদুর ছেলে, ট্যাঁসের চেলে,
টেবিল পেতে খানা খাবে।
এরা বেদ কোরাণের ভেদ মানে না,
খেদ করে আর কে বোঝাবে?
ঢুকে ঠাকুর ঘরে কুকুর নিয়ে,
জুতো পায়ে দেখতে পাবে।
হল কর্ম্মকাণ্ড লণ্ড ভণ্ড,
হিঁদুয়ানী কিসে রবে?
যত দুধে শিশু ভজে ঈশু
ডুবে মল ভবের টবে।'

'সে সময়ের সামাজিক পরিবর্ত্তনের সুন্দর চিত্রই লেখা হইয়াছে।' রাজকৃষ্ণ বাবু এই কথা বলিলেন।

তখন গোঁসাই দাস বাবু বলিলেন, 'উহার শেষাংশটী আরও সুন্দর। কবি লিখিয়াছেন,—

আগে মেয়েগুলো ছিল ভালো,
ব্রত ধর্ম্ম কোর্ত্তো সবে।
একা বেথুন এসে শেষ করেছে,
আরকি তাদের তেমন পাবে?
যত ছুঁড়ী গুলো তুড়ী মেরে,
কেতাব হাতে নিচ্চে যবে।
তখন এ, বি, শিখে, বিবি সেজে,
বিলাতী বোল কবেই কবে।
এখন আর কি তারা সাজি নিয়ে,
সাঁজ সেঁজোতির ব্রত গাবে?
সব কাঁটা চামচে ধরবে শেষে,
পিঁড়ি পেতে আর কি খাবে?
ও ভাই আর কিছুদিন বেঁচে থাকলে,
পাবেই পাবে দেখতে পাবে।
এরা আপন হাতে হাঁকিয়ে বগী,
গড়ের মাঠে হাওয়া খাবে।
আছে গোটাকতক বুড়ো যদিন,
তদিন কিছু রক্ষা পাবে।
ও ভাই তারা মলেই দফা রফা,
এক্‌কালে সব ফুরিয়ে যাবে।
যখন আসবে শমন, করবে দমন,
কি বলে তায় বুঝাইবে?
বুঝি হুট বলে, বুট পায়ে দিয়ে,
চুরুট ফুঁকে স্বর্গে যাবে।'

বঙ্কিম বাবু মৃদু হাস্য সহকারে বলিলেন, 'কবির কথাগুলি যেন অনেকটা খাঁটী ভবিষ্যদ্বাণী।'

তখন গোঁসাই দাস বাবু বলিলেন, 'কবি পাদরীদিগকেও এক হাত লইতে ছাড়েন নাই। একস্থলে বলিয়া গিয়াছেন,—

'ও গড, ও গড গড লেখে বাইবেলে।
যীশু কি তোমার শিশু ঔরষের ছেলে?
এ বড় গোপন ভাব আপন হারায়ে।
বপন করেছে বীজ স্বপন দেখায়ে॥
নিজের বীজের ফল যীশু যদি হয়।
দোষের ত নয় তবে ঘোষের তনয়॥
দিশিকৃষ্ণ বিবিকৃষ্ণ এদেশ ওদেশ।
উভয়ের কার্য্য আছে বিশেষ বিশেষ॥
বিলাতের ব্রহ্ম যদি মেরিমার বাছু।
এদেশের ব্রহ্ম তবে যশোদার বাছু॥'

'ডফ সাহেবের আমলে মিশনরীদের বড়ই প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। কবি তদুপলক্ষে লিখিয়াছেন—'বলিয়া আবৃত্তি করিলাম—

'মিশনরী রাঙ্গা নাগ দংশে ভাই যারে।
একেবারে বিষদাঁতে মেরে ফেলে তারে॥
ব্যাঘ্র ভয়ে ব্যগ্র হই যদি পাই বাগে।
লাঠি অস্ত্র থাকিলে কি ভয় করি বাঘে?
হেদোবনে কেঁদো বাঘ রাঙ্গামুখ যার।
বাপ বাপ বুক ফাটে নাম শুনে তার॥
বাগ করা বাঘ আছে হাত দিয়া শিরে।
ধরিয়া ধর্ম্মের গলা নখে ফেলে চিঁরে॥
ছেলে কালে ছেলে ধরা শুনিয়াছি কাণে।
এখন হইল বোধ বিশেষ প্রমাণে॥
কহিতে মনের খেদ বুক ফেটে যায়।
মিশনরী ছেলেধরা ছেলে ধরে খায়॥
চুপ চুপ ছেলে সব হও সাবধান।
কাণকাটা কৃষ্ণবন্দ্যো কেটে নেবে কাণ॥'

'উহার আরও একটু আছে।' বলিয়া গোঁসাইদাস বাবু বলিলেন,—

'বিদ্যাদান ছল করি মিশনরি ভব।
পাতিয়াছে ভাল এক বিধর্ম্মের টব॥
মধুর বচন ঝাড়ে জানাইয়া লব।
যীশুমন্ত্রে অভিষিক্ত করে শিশু সব॥
কিন্তু সবে ত্রাণকর্ত্তা জ্ঞান করে ভবে।
বিপরীত লভে পড়ে ডুব দেয় টবে॥'

আমি বলিলাম, 'পাদরী মার্শম্যান সাহেবের বিদায় কালে কবি, নিম্নলিখিত উপহার দিয়াছিলেন,—

"বম্ বম্ বম্ বম্ বম্ বম্ বম্।
কিসে তুমি কম?
বাজাও ব্রিটিস শিঙ্গে ভম্ ভম্ ভম্।

শ্রীধাম শ্রীরামপুর কৈলাস শিখর।
বিশ্বমাঝে অপরূপ দৃশ্য মনোহর॥
কোম্পানির প্রতিষ্ঠিত তুমি বুড়া শিব।
তথায় বিরাজ করি তরাতেছ জীব।
ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া বৃষতে আরোহণ।
অহঙ্কার অলঙ্কার ভুজঙ্গ-ভূষণ।
পক্ষপাত হাড়মালা সদা সুশোভন।
মিথ্যা, ছল, তোষামোদ ত্রিশূল ধারণ॥
টাউনসেণ্ডর বার্টসন নন্দী ভৃঙ্গী দুটো।
নিয়ত নিকট আছে দাঁতে করি কুটো॥
লাঞ্ছনার বাঘছাল বঞ্চনার ঝুলি।
একমুখে পঞ্চাননস্যনে বলি শূলী?'

গোঁসাইদাস বাবু বলিলেন, 'উহার শেষ অংশে আছে,—

শুনিতেছি রাবাজান এই তব পণ।
সাক্ষ্য দিতে করিতেছ বিলাত গমন॥
যোড়করে পশুপতি করি নিবেদন।
সেখানে করো না গিয়া প্রজার পীড়ন।
ভূত প্রেত সঙ্গীগুলি সঙ্গে লয়ে যাও।
এখানে বসিয়া আর মাথা কেন খাও?
বাজাই বিদায় বাদ্য টম টম টম।
বম্ বম্ বম্ বব বম্ বম্ বম্।
কিসে তুমি কম?
বাজাও ব্রিটিস শিঙ্গে ভম্ ভম্ ভম্।
বম্ বম্ বম্ বব বম্ বম্ বম্॥'

বঙ্কিমবাবু বলিলেন, 'এরূপ সাহসের সহিত বলিতে তখন গুপ্ত কবি ভিন্ন অন্য বাঙ্গালী কেহই ছিল না।

'তাঁহার নিজের যে শক্তিটুকু ছিল, অন্য বাঙ্গালী কবির সে শক্তি ছিল না।' রাজকৃষ্ণ বাবু এই কথা বলিলেন।

আমি বলিলাম, 'নীলকরেরাও কবির হাত হইতে এড়াইতে পারেন নাই। যখন নীলকরদের অনরারি ম্যাজিষ্ট্রেট করা হয়, তখন কবি গান বাঁধিয়াছিলেন. আমার সব মনে নাই, কতক কতক আছে।'

'কি মনে আছে বলুন শুনি।" রাজকৃষ্ণ বাবু বলিলেন।

আমি তখন আবৃত্তি করিলাম,—

'হলো নীলকরদের অনারারি
মেজেষ্টার ভার।
কুইন মা মাগো।
পড়েছে সব পাথর বুকে, অভাগা প্রজার পকে,
বিচারে রক্ষা নাইক আর।
নীলকরের হদ্দ নীলে, নীলে নিলে সকল নিলে
দেশে উঠছে এই ভাব।
যত প্রজার সর্ব্বনাশ,
কুটিয়াল বিচারকারী, লাটিয়াল সহকারী,
বানরের হাতে হল কালের খোন্তা,
নোন্তা জলে চাষ।
হল ডাইনের হাতে ছেলে সোপা
চীলের বাসায় মাচ।
হবে বাঘের হাতে ছাগের রক্ষে
শুনেনি কেউ শুনবে না।
আর এক স্থানে আছে,—
জমি চুশচে, কিন শুনচে, কেবল বুনচে বীজ,
দোহাই না শুনচে, একটী বার।
নীলের দাদন, ঠেঙ্গার শাসন বাঁধন চমৎকার।
করে ভিটে মাটী চাটি সার।
যত নীলের সাদা, মুলুকচাঁদা, সাদা কেহ নয়,
করে নীলের কর্ম্ম, কি অধর্ম্ম,
মনের কালী হয় প্রকাশ।
না বুনলে নীল, মেরে কিল,
কিল করে নীলকরে
দেশের ছোটকর্ত্তা, ছিলেন তাদের
হর্ত্তা কর্ত্তা করে।
জোরে বেঁধে আনে ধরে।
যেমন কাজীরে সুধালে পরে হিঁদুর পরব
নাই, তেমনি সব নীলকরের আচার, বিষম
বিচার গোস্বামী ভক্ষণের গোঁসাই।'

রাজকৃষ্ণ বাবু বলিলেন, 'গুপ্ত কবির অন্ত ছাত্র দীনবন্ধু বাবুও নীলদর্পণ লিখিয়া, গুরুর ব্রত উদ্‌যাপন করিয়াছেন।'

এই সময়ে বঙ্কিম বাবু গুড়গুড়ির নল টানিয়া ধূমোদগীরণ করিতে করিতে বলিলেন, 'আমার মনে হয় প্রভাকরে একবার তামাকের গুণ গান পাঠ করিয়াছিলাম। আপনাদের মনে আছে কি?'

আমি বলিলাম আছে

'তাম্রকূট তরু চারু দৃশ্য সুখ তার।
সারি সারি বাতাসের সুরে সারি প্রায়॥
এক পত্রে কত গুণ পত্রে লেখা তার।
সেই জানে যে পেয়েছে তামাকের তার॥
শুকাইলে পত্র তার গুড় মিসাইয়া।
ফুড়ুক ফুড়ুক টানি গুড়ুক করিয়া॥
শত শত মহীপাল উজীর নবাব।
তামাকে আদর করে ফেলিয়া কাবাব॥
শ্রম চিন্তা উভয়ের বিশ্রামের বাটী॥
বুদ্ধির প্রদীপে ইনি উস্কিবার কাটী॥
বড় বড় সাহেবেরা করেতে ধরিয়া।
মধুর অধরে ধরে চুরুট করিয়া॥
সর্ব্ব শাস্ত্রে সুপণ্ডিত অধ্যাপক যাঁরা।
সদাকাল সঙ্গী করে সঙ্গে লন তাঁরা॥
না হইলে সর্ব্বনাশ নাম তার নাশ।
বিচারের স্থানে হয় বুদ্ধি শুদ্ধি নাশ॥
পণ্ডিতেরা আছে শুদ্ধ নস্য গুণে বেঁচে।
নাকে দিয়া রাখে প্রাণ হ্যাঁচ হ্যাঁচ হেঁচে॥'

গোঁসাই দাস বাবু বলিলেন আরও একটু আছে,—

বিশেষতঃ ধনী লোকে সার গুণ জানে।
পেঁচাও কৌশল আসে পেঁচেয়োর টানে॥
আলবোলা বোলবোলা বৃদ্ধি খুব পায়।
শীতকালে বন্ধু তার তাম্রকূট তায়॥
মোটা বুদ্ধি মোটা টান দুঃখী সব হাবা।
আমাদের প্রাণকর্ত্তা খোলো দার্‌ডাবা॥'

রাজকৃষ্ণ বাবু বলিলেন, 'শুনিয়াছি, কবি সুরাপান করিতেন।' গোঁসাই দাস বাবু বলিলেন, 'সে কথা ঠিক। তবে তিনি পেসাদার মাতাল ছিলেন না। তিনি লিখিয়া গিয়াছেন, এক, দুই, তিন, চারি, ছেড়ে দেছে ছয়।

পাঁচেরে করিলে হাতে রিপু রিপু নয়॥
ভক্ষ ছাড়া পক্ষ সেই অতি পরিপাটি।
বাবু সেজে পাটির উপরে রাখি পাটি।
পাত্র হয়ে পাত্র লয়ে চোলে মারি চাটি।
খোল মাখা মাস লয়ে চাটি করে বাটি॥'

আমি তখন বলিলাম, 'আর এক স্থলে কবি লিখিয়াছেন,—

'কামিনীর হার দিয়া কামিনীর গলে।
কামিনী যদ্যপি দিই তার করতলে॥
এক ঠাঁই দৃষ্টি করি কামিনী কামিনী।
দাস হয় ছেড়ে কাম আপন কামিনী॥'

হাসিতে হাসিতে গোঁসাই দাস বাবু বলিলেন, 'আর এক স্থলে আছে,—

'বৃন্দাবনে মথুরায় দ্বারকায় হলী।
হলিরে বলাই দাদা পান করে হলী॥
কি জানে হলীর স্বাদ নিজে যেই হলী।
পরের ছত্রটি আমার স্মরণ হইতেছে না।'

বঙ্কিম বাবু বলিলেন, 'গুপ্ত কবি ব্যঙ্গ বর্ণনায় যেমন অদ্বিতীয় ছিলেন, সেই মত অনেকগুলি উৎকৃষ্ট পারমার্থিক ও নৈতিক কবিতাও লিখিয়া গিয়াছেন। সেগুলি পাঠ করিলে গুপ্ত কবিকে পরম ঈশ্বরভক্ত বলিয়া বোধ হয়

'সেরূপ কবিতার সংখ্যা ও সামান্ত নহে।'

আমি এই কথা বলিয়া, আবৃত্তি করিলাম,—

'হে নাথ অনাথ-নাথ দীন দয়াময়।
আমি দীন বোধহীন ক্ষীণ অতিশয়॥
কি ভাবে ভাবিব ভাব না পাই ভাবিয়া।
কৃপাকর কৃপা কর নিজ জ্ঞান দিয়া॥
জগতে যে কিছু দেখি সকলি তোমার।
জগতে করিব পূজা কি আছে আমার?

তুমি প্রভু আমি দাস তোমারি হয়েছি।
দিয়েছ পেয়েছি দেহ রেখেছ রয়েছি॥
আমারে করেছ দান, এই দেহ তুমি।
তাহাতে দিয়েছ প্রাণ, প্রাণনাথ তুমি॥
আমার না জেনে আমি, আমি আমি কই।
তুমি যদি স্বামী হও 'আমি' আমি কই?
আমি 'আমি' নই ফলে আর কেহ নই।
জগদাত্মা পরমাত্মা তব সত্তা হই॥
মাটির নির্ম্মিত ঘটে নহে মাটি বই।
সলিলের বিম্ব আমি সলিলেই রই॥
যে সময় নিজ প্রভা করিবে হরণ।
পাঁচে পাঁচ মিশাইবে, হইবে মরণ॥'

'কবি আর একস্থানে ঈশ্বরকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন,—

তুমি আমি দুই পাখি এক গাছে বাস।
তোমার গোপন ভাব না হয় প্রকাশ॥
খিচি মিচি করি আমি ডাকিয়া ডাকিয়া।
তুমি আছ সমভাবে নীরব হইয়া॥
এ প্রকার চমৎকার কব কার কাছে?
এমন আশ্চর্য্য নাকি আর কোথা আছে?
বলহীন হইতেছি আমি খেয়ে ফল।
ফলভোগ না করিয়া তুমি পাও বল॥
ফলাহার করি আমি তথাচ অস্থির।
কিরূপেতে অনাহারে আছ তুমি স্থির?
প্রাণেশ্বর বিহঙ্গম সবিশেষ বল।
বিফলের ফলভোগে কি হইবে ফল?
এইভাবে কতকাল হারাইব বল।
কতকাল ভোগ হবে এ গাছের ফল?'

গোঁসাই দাস বাবু আবৃত্তি করিলে, রাজকৃষ্ণ বাবু বলিলেন, 'ভাব অতি সুন্দর। আর একটি কথা জিজ্ঞাসা করি, গৌরী শঙ্কর ওরফে গুড় গুড়ে ভট্টাচার্য্যের সঙ্গে কবির কবিতা যুদ্ধ চলিত শুনিয়াছি। উহা কি প্রভাকরে প্রকাশ—'

গোঁসাই দাস বাবু বলিলেন, 'না। তাহা পাষণ্ড পীড়নে প্রকাশ হইত।'

'সে অতি অদ্ভুত ব্যাপার। এখনকার লোকদিগের পক্ষে তাহা পাঠ করা ও সংবাদ পত্রে প্রকাশ করা অসম্ভব। তাহা অশ্লীলতায় পরিপূর্ণ। তবে সে কালের রুচিতে তখন কার লোকেরা তাহা পাঠ করিয়া আনন্দ উপভোগ করিত।' বঙ্কিম বাবু ইহা বলিলেন।

'তবে গুপ্ত কবি সকল সময়ে অশ্লীলতার আশ্রয় লইতেন না। একবার কবি লিখিয়াছিলেন, কার্ত্তিক পূজার বিসর্জ্জনের দিন চিৎপুর রোডে কার্ত্তিক ঠাকুর বাহির হইয়াছে। রাজপথ লোকে লোকারণ্য। একখানি ঠাকুর বাগবাজারের মোড় হইতে আসিতেছে। ঢুলী নৃত্য করিতে করিতে বুলি বাজাইতেছে—তাকসিন তা, তাক সিনতা, তাকাসিনতা তা। তিনিক্ তিনিক্ তিনিক্ ধিনিক্ ধিনিক্ ধিনিক্ ধা। ঠাকুর ক্রমে বাগবাজারের গোঁসাই পাড়ার সম্মুখে আসিল। ঢুলী বোল বদলাইয়া বাজাইতে লাগিল—ছ্যাড্ড্যাং ড্যাং ড্যাং ছ্যাড্ড্যাং ছাড্যাং ডাং ডাং।'

রাজকৃষ্ণ বাবু হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 'এটি গোঁসাই পাড়ার সম্মুখে বলিদানের বাজনা!'

বঙ্কিম বাবু বলিলেন 'ঐ টুকুই রগড়।'

গোঁসাই দাস বাবু বলিলেন, 'তারপর ঠাকুর রাজবল্লভপাড়ার মোড়ে আসিলেন। ঢুলী অন্য বুলি ধরিল—বিল্বা খিলা পাকা মোনা, ডালভাতে ভাত চড়িয়ে দেনা। তার পর প্রতিমা রাজার রাস্তার মোড়ে আসিলেন, সকল ঢুলীই মহোৎসাহে বুলি ধরিল—'জয় রাজা রাজকৃষ্ণ, জয় রাজা রাজকৃষ্ণ, জয় রাজা রাজকৃষ্ণ।'

রাজকৃষ্ণ বাবু বলিলেন, 'বুঝিতে পারিলাম না।'

আমি বলিলাম, 'রাজা রাজকৃষ্ণ বাহাদুর

এক সময়ে বাঙ্গালার সমস্ত খ্যাতনামা কবিদিগের বিশেষ উৎসাহদাতা ছিলেন। সকল কবিই তাঁহার প্রাসাদে আসিয়া স্ব স্ব কবিত্ব শক্তির পরিচয় দিয়া, শালদোশালা এবং নগদ অর্থ পুরস্কার লইতেন। সুবাদক ঢুলীরাও পাইত। এই জন্য তাৎকালীন ঢুলীরা আসরে নামিলেই অগ্রে রাজা রাজকৃষ্ণের নামে জয় বাদ্য বাজাইত। এখনও অনেকে তাহাই করে।

তখন গোঁসাই দাস বাবু আবার বলিলেন, 'কার্ত্তিক প্রতিমা পরে বালাখানা লেনের মোড়ে আসিলেন। এখন বালাখানার অর্দ্ধাংশ গ্রেষ্ট্রীটের সামীল পড়িয়াছে। এই বালাখানা লেনেই গুড়গুড়ে ভট্টাচার্য্য বাস করিতেন। ঠাকুর এই বালাখানার মোড়ে আসিবা মাত্র ঢুলীরা মহোল্লাসে বুলি ধরিল —গুড়গুড়ে টা গু-ওটা, গুড়গুড়েটা গুওটা, গুড়গুড়েটা গুওটা।'

সকলে হাসিয়া অধীর হইলেন।

'গুপ্ত কবির কবিতাগুলি গ্রন্থাকারে এখন প্রকাশ করা কর্ত্তব্য। প্রকাশ না হওয়া বাঙ্গালীর কলঙ্কের কথা।' রাজকৃষ্ণ বাবু ইহা বলিলে, বঙ্কিমবাবু বলিলেন, 'প্রকাশ না হওয়ার জন্য উঁহারাই দায়ী।'

'বোধ হয় আপনিও কিছু কিছু দায়ী?' আমি এই কথা বলিবামাত্র বঙ্কিম বাবু বলিলেন, 'উঁহারা যে কবিতা গুলির স্বত্বাধিকারী। এগুলি আপনাদিগের পক্ষে প্রকাশ করা উচিত।'

'সেই জন্যই আজ আমরা আপনার দ্বারস্থ হইয়াছি।'

রাজকৃষ্ণ বাবু তখন বঙ্কিম বাবুকে এ বিষয়ে সহায়তা করিতে অনুরোধ করিলেন। তিনিও সম্মত হইলেন। স্থির হইল যে, বঙ্কিম বাবুই কবিতা নির্ব্বাচন ও সম্পাদন করিবেন। আমি বলিলাম, আপনার নামেই প্রকাশ হইবে।

'নামে কি আসে যায়?' বঙ্কিম বাবু হাসিতে হাসিতে এই কথা বলিলেন। তখন গোঁসাই দাস বাবুও অনুরোধ করিলে, বঙ্কিম বাবু, 'তা বটে। মুচিরাম গুড়ে নাম নাই'—বলিয়া একটু হাসিলেন। পাঠক! মুচিরাম গুড় কাহার লিখিত জানেন কি? নাম থাকিলে এতদিন বহু সংস্করণ হইত।

এক ঘণ্টাকাল এই আলাপের পর আমরা প্রীতচিত্তে বিদায় গ্রহণ করিলাম। *

ভারদ্বাজ।

হৃদয়-রাণী।

নবম পরিচ্ছেদ।

পোর্ত্তুগীজ পাদরীর আবাসের একটী সজ্জিত কক্ষে তিনটী প্রাণী উপবিষ্ট। তিন জনের মধ্যে যেন কত কথারই আলোচনা হইতেছিল। তিনজনের মুখমণ্ডলে যেন উৎকণ্ঠা—উদ্বেগের রেখা প্রভাসিত।

কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া, শেষ পাদরী দৃঢ়স্বরে বলিলেন, 'বৎস মেরি! আমাদিগের অনুরোধ রক্ষা করা কি তোমার পক্ষে কর্ত্তব্য নয়?'

'কে বলিল নয়?' সেইরূপ দৃঢ়স্বরে মেরি বলিলেন,—'পিতঃ! কে বলিল নয়? আপনাদের প্রত্যেক আজ্ঞা পালন করিতে পারিলে, আমার জীবনকে সার্থক জ্ঞান করি। কিন্তু—'

* মল্লিখিত (অপ্রকাশিত) স্মৃতি-কথার এক অধ্যায়।

বাধা দিয়া পাদরী বলিলেন, 'এস্থলে আর 'কিন্তু' শব্দের ব্যবহার করা কর্ত্তব্য নয়।'

'তবে কি আপনি বলিতে চান যে, আপনাদের প্রত্যেক আজ্ঞা পালন করাই আমার কর্ত্তব্য?' মেরি সতেজে এই প্রশ্ন করিয়া, শেষ বলিলেন—'আমি কি ক্রীতদাসী?—আমার কি 'আমিত্ব' কিছুই নাই?'

'কে বলিল তুমি ক্রীতদাসী?—কে তোমাকে অসৎ উপদেশ দিতেছে?' গঞ্জালিস একটু ক্ষুণ্ণভাবে এই কথা বলিলেন।

'তবে কেন আপনারা আমাকে এমত কার্য্য করিতে উপদেশ দিতেছেন, যাহাতে আমার মত হইতেছে না?—যে কার্য্যকে আমি আমার অনিষ্টকর মনে করিতেছি?'

পাদরী গম্ভীরভাবে বলিলেন, 'দেখ বৎসে! তোমার সে ভ্রমটী এখনও দূর হয় নাই, তাই এখনও সেই কথা বলিতেছ। তুমি সবে মাত্র যৌবন-সীমায় পদার্পণ করিয়াছ। সাংসারিক জ্ঞান তোমার কিছুই হয় নাই। তোমার মঙ্গলের জন্য—ভাবি উন্নতি ও সুখ-শান্তির জন্য যে আমরা এত চেষ্টা করিতেছি, দুঃখের বিষয় তুমি তাহা বুঝিতে পারিতেছ না। আবার তুমি আমাদিগের সেই সৎপরামর্শকে অসৎ বলিতেছ।' ইহা বলিয়া পাদরী শেষ ক্রুদ্ধভাবে বলিলেন, 'মেরি! তবে কি তুমি বলিতে চাও, আমার ধর্ম্মযাজকতা কেবল ভাণ মাত্র? আমি এত কাল প্রভু যিশুর নামে কেবল অসৎকার্য্যের প্রশ্রয় দিয়া আসিতেছি?'

গঞ্জালিসও সেইভাবে বলিলেন, 'আমি যে এতকাল তোমাকে লালন পালন করিয়া আসিতেছি—এত স্নেহ করিতেছি, আমাকেও কি তুমি অসৎকার্য্যের প্রশ্রয়দাতা জ্ঞান কর?'

মেরি ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন,—'দেখুন, আপনারা উভয়েই আমার হৃদয়ের ভাবটী অনুভব করিতে পারিতেছেন না, ইহাই আমার দুঃখের বিষয়। আপনি ধর্ম্মযাজক পিতা আর আপনি জন্মদাতা পিতা, আপনাদিকে যে দিন আমি অসৎ জ্ঞান করিব, সেই দিনই যেন আমার মৃত্যু হয়। আমি চিরকৌমার্য্য-ব্রত অবলম্বন করিব, ইহাই আমার অন্তরের অন্তস্তলের বাসনা। আমার ধারণা তাহাতেই আমার উন্নতি সুখ ও শান্তি হইবে। তাহাতেই আমি প্রভু যিশুর সেবা করিয়া আত্মাকে পবিত্র করিব। একথা পূর্ব্বে বারবার বলিয়াছি আর এখনও বলিতেছি।'

'ভাল কথা। প্রভু যিশুর তুষ্টি সাধন করাইত তোমার উদ্দেশ্য? আমারও কি সে উদ্দেশ্য নয়?'

মেরি বলিলেন—'অবশ্য।'

'দেখ মেরি! তুমি চিরকৌমার্য্য ব্রত অবলম্বন করিলে, প্রভু যিশু তুষ্ট হইবেন এবং তোমার শান্তিলাভ হইবে, তাহার সন্দেহ নাই। তাহাতে তোমার নিজের ব্যক্তিগত শান্তি লাভ হইল। জগতের হইবে না—খৃষ্টানধর্ম্মের হইবে না—কোটি কোটি হিন্দুস্থানবাসী হিন্দু ও মুসলমানের হইবে না। কিন্তু তুমি যদি আমাদের প্রস্তাবমত কার্য্য কর, তাহা হইলে তোমার দ্বারা এই হিন্দুস্থানে স্বর্গীয় রাজ্য নিস্তৃত হইবে। তাহাতে প্রভু যিশু আরও তোমার প্রতি পরিতুষ্ট হইবেন। ইতিহাসে তোমার নাম অক্ষয় হইবে—খ্রীষ্টান-ধর্ম্মরাজ্যে তোমার কীর্ত্তি-গাথা হীরকাক্ষরে গ্রথিত হইবে।' পাদরী ইহা বলিয়া মেরির প্রতি তীব্র দৃষ্টি দান করিলেন।

গঞ্জালিস বলিলেন, 'কোন্‌টী ভাল?—চিরকৌমার্য্য ব্রত অবলম্বন করিয়া, কোন

পুরুষের মুখদর্শন না করিয়া কোন নিভৃত নিবাসে বাস করা তোমার পক্ষে শ্রেয়ঃ কি এই বিশাল হিন্দুস্থানে প্রভু যিশুর ধর্ম্ম বিস্তার করিবার বীজবপন করা শ্রেয়ঃ ?'

'আপনারা যে প্রস্তাব করিতেছেন, তাহাতে আমার দ্বারা এ কার্য্য কিরূপে হইবে তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। আপনাদের কি দৃঢ় বিশ্বাস যে আমার দ্বারা এই কার্য্য হইতে পারে ?' মেরি ইহা বলিয়া উত্তরের প্রতি দৃষ্টিদান করিলেন।

পাদরী সোৎসাহে বলিয়া উঠিলেন. 'আমাদের তাহা সম্পূর্ণ বিশ্বাস। আমরা দেখিতেছি, প্রভু যিশুর সদয় হস্ত তোমার শিরে অর্পিত হইয়াছে। প্রত্যক্ষ প্রমাণও আমরা পাইয়াছি।'

'কি প্রমাণ ?' মেরি এই কথা বলিয়া সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিলেন।

তখন পাদরী বিভা বলিলেন, 'তুমি বালিকা, তাই তুমি তাহা দেখিতে পাইতেছ না—বুঝিতেও পারিতেছ না। সয়তান তোমার চক্ষু আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছে। তুমি জান এই বিস্তৃত হিন্দুস্থানের সম্রাট আকবর প্রবল প্রতাপান্বিত।—তিনি বিধর্ম্মী। তিনি আমাদের সম্মুখে বলিয়াছেন, "মেরি মনে করিলে আমাকে খৃষ্টান করিতে পারে।" একথা গুলি কেন তাঁহার মুখবিবর হইতে বহির্গত হইল ?'

'পিতঃ! আপনি কি তাঁহার কথা বিশ্বাস করেন ?' মেরির উক্ত কথার উত্তরে পাদরী সাহেবের সহিত বলিলেন, 'সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি। আকবর বিধর্ম্মী হইলেও সত্যবাদী বলিয়া বিখ্যাত।'

মেরি তখন সলজ্জভাবে ভূপৃষ্ঠে দৃষ্টি অর্পণ করিয়া কহিলেন,—'রূপমুগ্ধ কামুক পুরুষেরা কি স্বার্থ সাধন জন্য ঐরূপ নানা বৃথা আশ্বাস প্রদান করে না ?'

'করে। কিন্তু তাহার পরস্ত্রীর প্রতি। সম্রাট আকবর যখন তোমাকে বিবাহ করিতে অভিলাষী, তখন এ প্রশ্ন উঠিতেই পারে না। আর একটী কথা —আমরা তাঁহার রাজ্যে আসিয়াছি। এখানে আমাদের কোন সহায়ই নাই। সম্রাট প্রবল পরাক্রান্ত। তাঁহার যদি সেই পাপ উদ্দেশ্য থাকিত, তাহা হইলে তিনি মনে করিলে, অনেক দিন পূর্ব্বেই তোমাকে হরণ করিয়া স্বার্থ সাধন করিতে পারিতেন। তাহাত তিনি করেন নাই, করিতেছেন না, করিবেনও না। তাঁহার উদ্দেশ্য সাধু. সেই জন্যই তিনি বিবাহের প্রস্তাব করিয়াছেন।'

'ভাল, স্বীকার করি, সম্রাটের খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বনের ইচ্ছা আছে। তিনি খৃষ্টান হইলেও হইতে পারেন। কিন্তু তাহাতে এই হিন্দুস্থানের নানা ধর্ম্মাবলম্বী অধিবাসীদিগের মধ্যে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারের কি সুবিধা হইবে ?'

'তুমি বালিকা তাই বুঝিতে পারিতেছ না। রাজা যে ধর্ম্মাবলম্বী হন, প্রজারা সেই ধর্ম্মেরই আশ্রয় গ্রহণ করে, ইহা ঐতিহাসিক সত্য কথা। তুমি কি জান না, সমস্ত ইয়ুরোপে এই রূপেই খৃষ্টধর্ম্ম বিস্তৃত হইয়াছিল ? আর একটী কথা— এই হিন্দুস্থানের প্রতি দৃষ্টিদান কর। এই হিন্দুস্থানে প্রথমতঃ কেবল মাত্র হিন্দুধর্ম্ম ছিল। পরে বৌদ্ধধর্ম্ম ও জৈনধর্ম্ম প্রচলিত হয়। বৌদ্ধ রাজাদিগের শাসনকালে হিন্দুধর্ম্ম প্রায় অস্তমিত হইয়াছিল। রাজধর্ম্ম বলিয়া হিন্দুরা বৌদ্ধ ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করে। তার পর আবার যখন সংখ্যাবদ্ধ মুসলমান এই হিন্দুস্থান জয় করে, তখন রাজধর্ম্ম বলিয়া অনেক হিন্দু ও বৌদ্ধ আবার মুসলমান ধর্ম্মের আশ্রয় লইয়াছে, লইতেছে, এবং শীঘ্রই যদি প্রভু যিশুর পবিত্র

ধর্ম্মজ্যোতিঃ এখানে বিস্তৃত না হয়, তাহা হইলে পরিণামে মুসলমান-সংখ্যা আরও বাড়িবে। আজ যদি সম্রাট আকবর খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া অন্ধকার হইতে আলোকে আসেন, তাহা হইলে দেখিবে রাজধর্ম্ম বলিয়া, হিন্দুস্থানের সমস্ত নরনারী খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিতে মুহূর্ত্ত মাত্র বিলম্ব করিবে না। তখন প্রভু যিশুকে ত্রাণকর্ত্তা বলিয়া, এই অগণিত হিন্দু ও মুসলমান নরনারী সহজে মুক্তিলাভ করিবে।' এই কথাগুলি উৎসাহের সহিত বলিয়া পাদরী পুনরায় বলিলেন, 'প্রভুর পবিত্র নাম—পবিত্র খৃষ্টধর্ম্ম সমগ্র জগতে প্রচার করা আমাদের ধর্ম্মের প্রথম ও প্রধান আদেশ তাহা কি তুমি জান না? সেই জন্যই কি আমি এই দূরদেশে আসি নাই?"

মেরি বলিলেন, 'অবশ্য!'

'তবে আমার সহায়তা করা কি তোমার কর্ত্তব্য নয়?'

মেরি আবার বলিলেন, 'অবশ্য। কিন্তু—'

'আবার কিন্তু কেন?' পাদরী সবিস্ময়ে এই প্রশ্ন করিলেন।

'ভাল, আমার একটি কথা বলিবার ছিল, আপনারা শুনিতে চাহেন না।' মেরি ইহা বলিয়া একটু বিষণ্ণ ভাব প্রকাশ করিলেন।

'কেন শুনিব না? তোমার কি বলিবার আছে বল?' পাদরী ইহা বলিয়া মেরির উপর দৃষ্টি দান করিলেন।

মেরি বলিলেন, 'দেখুন, আপনাদের উপদেশেই আমি আত্ম বলিদান করিতে প্রস্তুত—পবিত্র খৃষ্টধর্ম্ম বিস্তারের জন্যই আমি সেই আত্মবলিদান করিতে প্রস্তুত।'

'ইহাতে তোমার কীর্ত্তি অক্ষয় এবং পুণ্য অনন্ত হইবে।' পাদরী ইহা বলিয়া শেষ প্রশ্ন করিলেন,—'তোমার আর কি বলিবার আছে বল?'

'প্রথম কথা এই যে, আপনারা যেমন ভাবিতেছেন যে, সম্রাট আকবর, খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিলেও করিতে পারেন—'

বাধা দিয়া পাদরী কহিলেন,—'হা কেন? —তিনি প্রভু যিশুর চরণে শরণ লইবেন, তাহার কোন সন্দেহই নাই, আমাদের এমত দৃঢ় বিশ্বাস।'

গঞ্জালিস বলিলেন, 'কিন্তু একার্য্যে প্রধানতঃ তোমাকেই উদ্যোগী হইতে হইবে।'

পাদরী সমর্থন করিয়া বলিলেন,—"তাত বটে।'

'অবশ্য প্রভু যিশুর দয়া হইলে আমি সাধ্যমত চেষ্টা করিব।' মেরি ইহা বলিলেন।

সন্তোষ সহকারে সহাস্য আস্যে পাদরী বলিলেন, 'বৎসে মেরি! এতক্ষণে জানিলাম যে, তোমার জ্ঞাননেত্র উন্মিলিত হইয়াছে। প্রভু যিশু অবশ্যই এই সৎকার্য্যে তোমার সহায় হইবেন।'

'উত্তম। কিন্তু একটি কথা এই যে, সম্রাটের পুত্র সন্তান আছেন কি?' মেরি দৃঢ়স্বরে এই প্রশ্ন করিলে, পাদরী যেন একটু বিমর্ষ হইলেন। মেরি তখন পুনরায় কহিলেন, 'পিতঃ! আমি শুনিয়াছি, সম্রাটের একটী পুত্র আছেন। তিনি হিন্দু রাজকন্যার গর্ভজাত।'

গঞ্জালিস বলিলেন, 'হাঁ তুমি যাহা বলিলে তাহা ঠিক। তাঁহার নাম সেলিম'

'তিনিই কি এক্ষণে যুবরাজ এবং পরে সম্রাট হইবেন না?' মেরি এই প্রশ্ন করিয়া পুরুষদ্বয়ের প্রতি দৃষ্টিদান করিলেন।

পাদরী ও গঞ্জালিস উভয়ে কিছুক্ষণ নীরবে রহিলে, মেরি পুনরায় বলিলেন 'কে বলিতে পারে যে, ভাবিষ্য সম্রাট খৃষ্টধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিবেন?'

'সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাক। কুমার সেলিম

এক্ষণে শিশু। সম্রাট দীক্ষিত হইলেই সেই দিনই তাঁহাকেও দীক্ষিত করিব।' পাদরী সগর্ব্বে এই কথাগুলি বলিলেন।

'উত্তম।' এইকথা বলিয়া মেরি সলজ্জভাবে বলিতে লাগিলেন,—'খৃষ্টান পিতা ও খৃষ্টান মাতার খৃষ্টান পুত্র, ভারতের ভবিষ্য সম্রাট হইলে কি খৃষ্টধর্ম্ম-প্রচারের অধিক সুবিধা হইবে না?'

পাদরী চমকিত হইলেন। গঞ্জালিস বিচলিত হইলেন। উভয় পুরুষই বুঝিলেন, মেরির উদ্দেশ্য কি। তখন উভয় বলিলেন, 'ভাল কথা।'

মেরি প্রশ্ন করিলেন,—'আমার গর্ভজাত পুত্রই ভারতের ভবিষ্য সম্রাট হইবেন এরূপ ব্যবস্থা হইতে পারে না?'

'তোমার প্রস্তাবটী অতি উত্তম। কিন্তু সম্রাটের কাছে আমরা যতদূর কথা কহিয়াছি, তাহাতে এখন আবার এই প্রস্তাব উপস্থিত করিলে—'

পাদরীর ঐ কথায় বাধা দিয়া মেরি বলিলেন,—'আমার উপর ভার দিউন। সম্রাট যদি আমার প্রস্তাবে সম্মত হন, তাহা হইলেই আমি তাঁহাকে পতিরূপে বরণ করিব।'

'প্রথমেই এত চাপাচাপি করিলে আমাদিগের মূল উদ্দেশ্য ব্যর্থ—'

পুনরায় বাধা দিয়া মেরি কহিলেন, 'আমার সামর্থ্য থাকে, তাহা হইলে দেখিবেন সম্রাট এই প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইবেনই হইবেন।'

এমত সময়ে একজন পরিচারক আসিয়া সম্রাট আকবরের উপস্থিতি সংবাদ বিজ্ঞাপিত করিল। পাদরী এবং গঞ্জালিস দ্রুতগতি গাত্রোত্থান করিয়া সম্রাটকে গ্রহণ জন্য কক্ষ ত্যাগ করিলেন। আর মেরি? মেরির অনুপ রূপরাশি তখন অতীব সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সম্রাট আকবরের হৃদয়াধিকার জন্য তাঁহার সমস্ত শক্তিকে জাগরিত করিয়া তুলিলেন। তখন তাঁহার কোমল হৃদয়ে একটা অননুভূতপূর্ব্বভাবের উদয় হইল। মেরি কক্ষতলে অর্দ্ধাবনতশিরে দৃষ্টি রাখিয়া সম্রাটের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। অনতিবিলম্বে কক্ষদ্বারে পদশব্দ আসিয়া, মেরির কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। মেরির জীবনের সেই সময়টি যেন অনন্ত মুহূর্ত্ত স্বরূপ। মেরি, সেই ভাবেই সেই অর্দ্ধাবনতমস্তকে বসিয়া রহিলেন।

যে রমণীর দুইটী চক্ষু দেখিয়াই সম্রাট অধীর, আত্মহারা, আজি সেই যুবতীর পূর্ণমূর্ত্তি দর্শন করিবেন বলিয়া সম্রাট আকবর আনন্দে অধীর। তাঁহারও জীবনের এই সময়টুকু যেন অনন্ত মুহূর্ত্ত। সৌমমূর্ত্তি সম্রাট আনন্দোদ্বেলিত হৃদয়ে পরক্ষণেই কক্ষমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। মেরি তখনও সেইভাবে উপবিষ্টা।

মেরির সেই অনিন্দ্য কমনীয় কান্তি—সেই স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যরাশি প্রথম দর্শনেই সম্রাট আকবর অননুভূতপূর্ব্বপূর্ব্ব পুলক প্রাপ্ত হইলেন। মেরির অতুলনীয় মুখমণ্ডল হইতে বিশ্ববিমোহিনী শক্তি বৈদ্যুতিক বেগে সম্রাটের হৃদয়ে আসিয়া, নীরবে কি যেন বলিয়া দিল। রূপজমোহমুগ্ধ সম্রাট কক্ষমধ্যে আর একপদ অগ্রসর হইলেন। মেরি তখনও সেইভাবেই উপবিষ্টা। সম্রাট কক্ষমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছেন, ইহা যেন তিনি তখনও জানিতে পারেন নাই! হা রমণী-চরিত্র!

চুম্বক যেমন ধীরে ধীরে লৌহকে আকর্ষণ করে, মেরির রূপরাশি সেইমত সম্রাটকে আকর্ষণ করিতে ক্ষান্ত হইল না। প্রমোদ-পয়োধিজলমগ্ন সম্রাট আর একপদ অগ্রসর হইলেন। সম্রাটের কটিবদ্ধ অসিকোষ হঠাৎ

কাষ্ঠাসনে লাগিল—শব্দ হইল তখন মেরি উন্নতগ্রীব হইয়া যেন সবিস্ময়ে সম্রাটের প্রতি স্নিগ্ধ কোমল অথচ অতীব তীব্র দৃষ্টি প্রদান করিলেন। হীরক মুক্তা-মাণিক্যালঙ্কার-শোভিত সুরমবপু সম্রাটের মুখমণ্ডল হইতেও কি এক শক্তি যেন বৈদ্যুতিক বেগে বহির্গত হইয়া মেরির হৃদয়ে আঘাত করিল। মেরির অধর প্রান্তে মধুর হাস্যসুধা ক্ষরিল। সম্রাট সহাস্য আস্যে আর একটু অগ্রসর হইলেন। মেরি তখন গাত্রোত্থান করিয়া অভিবাদন করিলেন। সম্রাট তখন বহুমূল্যবান হীরকাঙ্গুরী-শোভিত সুন্দর করপল্লব বাড়াইয়া দিলেন। স্বজাতির প্রথমত মেরি তখন স্বীয় করপল্লব বিস্তার করিতে বিলম্ব করিলেন না। দুইটী বিভিন্ন করপল্লব সংমিলিত হইবা মাত্র উভয়ের শরীরেই বৈদ্যুতিক কি এক শক্তি প্রবাহিত হইল। তাহা কি?—অপরে কি জানিবে? কেবল উভয়েই জানিলেন।

সম্রাট আকবরের চক্ষে পলক নাই। প্রাণ ভরিয়া মেরির অতুল-রূপ-সৌন্দর্য্য-সুধা পান করিতে লাগিলেন। মেরির দৃষ্টি একবার—আকবরের প্রিয়দর্শন মুখমণ্ডলের প্রতি—একবার সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব সমুজ্জ্বল হীরকালঙ্কারগুলির প্রতি এবং পরক্ষণে যেন লজ্জাভারাবনত হইয়া কক্ষতলে পতিত। উভয়েরই ইচ্ছা বাক্যালাপ আরম্ভ করেন, কিন্তু উভয়েই নীরব।

কিয়ৎক্ষণ পরে সম্রাট মধুর স্বরে ধীরে ধীরে সহাস্য আস্যে বলিলেন,—'আজি আপনাকে দর্শন করিয়া যে আনন্দ অনুভব করিতেছি, এজীবনে কখনও এমত আনন্দ লাভ করিতে পারি নাই।

মেরি হঠাৎ বক্রগ্রীব হইয়া স্বীয় বিস্তৃত নয়ন যুগল হইতে তীব্র প্রভা বিকীর্ণ করিয়া, ক্ষীণস্বরে কহিলেন, 'জাঁহাপনা! কথা গুলি স্তাবকের উপযুক্ত নহে কি?'

'হাঁ। নতমস্তকে স্বীকার করি স্তাবকের উপযুক্ত। কিন্তু ভগবান কি আপনাদিগকে স্তব সংগ্রহের শক্তি দান আর আমাদিগের জিহ্বাকেও স্তব করিবার শক্তি দেন নাই?' সম্রাট এই কথা বলিয়া একটু হাস্য করিলেন।

যুবতী বলিলেন,—'একথা গুলিও কি সেই স্তাবকশ্রেণীর উপযুক্ত নহে?'

'তাহাও স্বীকার করি—একথা গুলিও স্তাবকের উপযুক্ত।' ইহা বলিয়া সম্রাট মৃদুহাস্য সহকারে প্রশ্ন করিলেন,—'এই সসাগরা ধরাধাম সকলেই কি সকলের স্তাবক?'

'না।' মেরি বলিলেন,—'না।'

'সকলেই কি স্তবের উপযুক্ত পাত্র পাত্রী?'

'না।'

'স্তব করিতে প্রবৃত্তি হয় কেন?' সম্রাট সাগ্রহে এই প্রশ্ন করিলেন। মেরি উত্তর দানে বিলম্ব করিলেন না। বলিলেন,—'স্বার্থসাধন জন্য।'

'এস্থানে স্বার্থসাধনের প্রকৃত অর্থ কি? কে আমাকে স্তব করিবার জন্য প্রবৃত্তি দিতেছে?'

'এস্থানে স্বার্থসাধনের অর্থ ভালবাসা।'

'উত্তম।' বলিয়া, সম্রাট সোৎসাহে বলিলেন, 'আপনার বাঁদীর সহিত এই মাত্র দেখা হইয়াছিল, তাহার স্তব করি নাই কেন?'

'স্বার্থসাধনের অস্তিত্ব নাই বলিয়া।'

'সাদা কথায় বলুন ভালবাসা নাই বলিয়া।'

'হাঁ।'

'তবে আমি আপনার স্তাবক হইয়াছি, ইহার কারণ, আপনাকে ভালবাসি বলিয়া, ইহা আপনি প্রকারান্তরে স্বীকার করিলেন দেখিয়া, আজ আমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইল।'

মেরির অধরপ্রান্তে ঈষৎ হাস্যরেখা দেখা

দিল। ক্ষণমাত্র বিলম্ব করিয়া পুনরায় বলিলেন,—'জাঁহাপনা! আপনি এই হিন্দুস্থানের অদ্বিতীয় অধীশ্বর, আমি অশিক্ষিতা বিদেশী রমণী। আপনার সহিত তর্কযুদ্ধে আমার যে পরাজয় হইবে, তাহা বিচিত্র নহে। কিন্তু একটী কথা জিজ্ঞাসা করি, ভালবাসার কি ধারা এ প্রকার নানাবিধ নাই?'

'অবশ্য আছে। কোন ভালবাসা ক্ষণিক, কোন ভালবাসা অল্পদিনস্থায়ী, কোন ভালবাসা চিরস্থায়ী—আজীবনস্থায়ী। কোন ভালবাসা মনকে দগ্ধ করে, শেষে প্রাণ সংহার করে। কোন ভালবাসা মনে মনে—প্রাণে প্রাণে মিশিয়া গিয়া যোগের চূড়ান্ত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। সেই অবস্থায় স্বর্গীয় শান্তিনীরে নিমজ্জিত হইয়া, আজীবন দেবদুর্লভ সুধাপান করিতে থাকে।'

যুবতী ধীরে ধীরে, প্রশ্ন করিলেন,—'সেরূপ ভালবাসা কি এ জগতে আছে না থাকিতে পারে?'

'অবশ্যই আছে। যাহার অস্তিত্ব নাই, তাহার সম্বন্ধে কোন কথাই বলা যায় না। সেরূপ ভালবাসা আছে বলিয়াই আমি এই কথাগুলি বলিতে পারিলাম। আমার একটী কথা—প্রকৃত ভালবাসা, প্রেমিক প্রেমিকার অন্তরের অন্তস্তলে অটল পর্ব্বতের ন্যায় দৃঢ়ভাবে বিরাজ করে। সে ভালবাসার মধুময় মূর্ত্তি অপরে কেহ দেখিতে পায় না—দেখাইবার উপায়ও নাই। সেই দুইটী হৃদয়—দুইটী প্রাণ এক হইয়া, সেই ভালবাসা দেবীর অজ্ঞাতসারে পূজা করে।' সম্রাট এই কথা গুলি বলিয়া যুবতীর অনাঘ্রাতা কুসুমকলিকার ন্যায় মুখমণ্ডলের প্রতি সপ্রেম দৃষ্টিদান করিলেন।

'এমন ভালবাসারূপ অমূল্যধনের অধিকারী কি এ জগতে থাকিতে পারে?' মেরি সুমধুর স্বরে এই প্রশ্ন করিলেন।

'অবশ্যই আছে। এ জগতে নরনারীর সংখ্যা অনন্ত, শ্রেণীর সংখ্যাও অনেক এবং অবস্থাও ভিন্ন ভিন্ন। পথের ভিখারী ভিখারিণী ধনাভাবে ভিক্ষা দ্বারা আত্মপালন করে, বৃক্ষতল তাহাদিগের আশ্রয়। তাহাদিগের মধ্যেও এই প্রকৃত ভালবাসা-ধনাধিকারী নরনারী বিদ্যমান। আবার পর্ণকুটীরবাসী যে শ্রেণী শ্রমলব্ধ অর্থে অতিকষ্টে আত্মপালন করিতেছে, তাহাদিগের মধ্যেও এই প্রকৃত ভালবাসাধনাধিকারী নরনারী বর্ত্তমান। আবার যাহারা সম্পত্তিপন্ন গৃহস্থ, তাহাদিগের মধ্যেও এই প্রকৃত ভালবাসাধনাধিকারী নরনারীর অভাব নাই। আবার যে শ্রেণী মানবমণ্ডলীর মধ্যে উচ্চ শ্রেণীর লোক বলিয়া মান্য, তাহাদিগের মধ্যেও এই প্রকৃত ভালবাসাধনাধিকারী বর্ত্তমান। মৃত্তিকাপ্রোথিত গুপ্তধনের ন্যায় এই প্রকৃত ভালবাসা ধন গোপনেই থাকে, অপরে দেখিতে পায় না। অধিকারী, অপরকে দেখাইতেও চাহে না। সেই জনাই আপনার ন্যায় অনেকেই সন্দেহ করেন যে, প্রকৃত ভালবাসা এ জগতে আছে কি না?'

'যদিই এইরূপ প্রকৃত ভালবাসা ধনের অধিকারী নরনারী এ জগতে থাকে, তবে তাহারাই প্রকৃত সুখী।' মেরি ইহা বলিলেন।

সম্রাট বলিলেন, 'তাহার সন্দেহ কি? ভাল, যদি অনুমতি করেন, তাহা হইলে একটী কথা বলিতে পারি?'

মেরি বিস্মিত হইয়া বলিলেন, 'আমি সামান্য রমণী, আপনি সম্রাট, আপনাকে আবার আমি কি অনুমতি দিব? কি আজ্ঞা করিতে ইচ্ছা করেন করুন।'

সহাস্য আস্যে সম্রাট ধীরে ধীরে বলিলেন,—'আপনার কি ঐ প্রকৃত ভালবাসা ধনের অধিকারিণী হইতে ইচ্ছা হয় না?'

যুবতী কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া, পরে

বলিলেন, 'অবশ্য হয়। আমার সে ভাগ্য কোথায়?'

'সে ধন অর্জ্জনের উপায় আপনারই হাতে। আমি কি জন্য আজি এখানে আসিয়াছি, তাহা আপনি জানেন ত?' সম্রাট আকবর ইহা বলিয়া, উত্তর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

মেরি কয়েক মুহূর্ত্ত পরে বলিলেন,— 'জানি।'

সম্রাট তখন সহাস্য-আনন্দে বলিলেন,— 'আমি আপনার নিকট এই দেহ বিক্রয়— আপনার করে আত্মবিসর্জ্জন করিতে আসিয়াছি। আপনার দয়া হইলে, আমি আপনাকে সেই প্রকৃত ভারত সাম্রাজ্যের অধিকারিণী করিতে পারি।'

যুবতী মেরি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 'আপনার মন কি আপনার আছে? আপনার অন্তঃপুরে কি শত শত নয়—সহস্র সহস্র মহিষী নাই?'

বিনা বিলম্বে সম্রাট হাসিতে হাসিতে বলিলেন—'দেখুন, যখন এ জগতে হেম-হীরকাদি রত্নের আবিষ্কার হয় নাই, তখন সকলে কড়ির অলঙ্কার ধারণ করিত। পরে কাংস্য অলঙ্কার—তার পর পিত্তলের অলঙ্কার —তৎপরে স্বর্ণালঙ্কারের সৃষ্টি হয়। তাহার পর মুক্তা—তৎপরে হীরকালঙ্কারের সৃষ্টি। যতই শোভনীয় মূল্যবান অলঙ্কারের সৃষ্টি হইতে থাকে, লোকেই ততই পূর্ব্বসৃষ্ট অলঙ্কার অপেক্ষা মূল্যবান হীরকালঙ্কারকে অধিক আদর করিতে থাকে। এই দেখুন আমার দেহে বহুমূল্যবান মুক্তা ও হীরকাদি অলঙ্কার বিরাজ করিতেছে। এই গুলির মধ্যে আবার সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান বৃহৎ হীরকখণ্ড আমার বক্ষে শোভা পাইতেছে।'

সম্রাট ও মেরির মধ্যে যতক্ষণ আলাপ চলিতেছিল, মেরি ততক্ষণ সম্রাটের শরীরস্থ মূল্যবান সমুজ্জ্বল অলঙ্কার গুলির প্রতিই সতৃষ্ণ অর্দ্ধ দৃষ্টি দান করিতেছিলেন। সম্রাটের উক্ত উক্তিতে মেরি পূর্ণ দৃষ্টিতে অলঙ্কার-গুলি দেখি। লইয়া বলিলেন—'তাহাত দেখিতেছি।'

তখন সম্রাট আকবর বলিলেন, 'সেই কড়ি, সেই কাংস্য, সেই পিত্তল, সেই রৌপ্য, সেই হেম, সেই মুক্তার ন্যায় আমি অনেক রমণী রত্ন সময়ে সময়ে সঞ্চয় করিয়াছি। কিন্তু আমার অন্তঃপুরে হীরকস্বরূপ রমণী নাই। আপনি সেই হীরক-স্থানীয়। এই বক্ষে—যেমন হীরক দেখিতেছেন, আপনার অনুগ্রহ হইলে, এইমত আপনাকে এই বক্ষেই সযত্নে রক্ষা করিব।'

মেরি ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন,—'আমি যে খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বিনী?'

'হলেনই বা? আমার অন্তঃপুরে হিন্দু প্রভৃতি অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বিনী মহিষীও ত আছেন। আমি কখনও তাঁহাদিগের ধর্ম্মাচরণে হস্তক্ষেপ করি নাই। হিন্দু মহিষীরা হিন্দুভাবেই আছেন, হিন্দুধর্ম্ম পালন করিতেছেন—তাঁহাদিগের আচার ব্যবহার, আহার সমস্তই হিন্দুর মত। আপনিও আপনার স্বেচ্ছামত ধর্ম্ম পালন ও আচার ব্যবহার করিতে পারিবেন।'

মেরি—বলিলেন, 'প্রভু যিশুর প্রতি আপনার—

'সম্পূর্ণ ভক্তি আছে। আমি কোন ধর্ম্মের বিরোধী নহি। আর একটী কথা— তবে নিশ্চিত বলিতে পারি না—আপনার সাহচর্য্যে চাই কি আমি স্বয়ং যিশুমন্ত্রে দীক্ষিতও হইতে পারি।' সম্রাট ইহা বলিয়া মেরির মুখ প্রতি সপ্রেম দৃষ্টি দান করিলেন।

মেরির দৃষ্টি তখন সম্রাটের গলদেশে লম্বমান মহামূল্য মুক্তা-গ্রথিত সমুজ্জ্বল হীরকহারের উপর অর্পিত ছিল। সম্রাট

বিনা বিলম্বে দণ্ডায়মান হইয়া, সেই হীরক-হারছড়াটী মেরির গলদেশে পরাইয়া দিলেন।

রমণী জাতির অলঙ্কারপ্রিয়তা চিরপ্রসিদ্ধ। মেরি সেই মহামূল্য অলঙ্কার লাভ করিয়া, প্রফুল্ল-আননে সম্রাটকে অভিবাদন করিলেন।

মেরিকে প্রফুল্ল দেখিয়া, সম্রাটের হৃদয়ও প্রফুল্ল হইল।

'আর একটী কথা আছে। যদিই আমি আপনাকে আত্মবিক্রয় করি, তাহা হইলে আপনাকে আর একটী প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে।' মেরি ইহা বলিলেন।

'কি প্রতিজ্ঞা বলুন?"

'আমার গর্ভে যে সন্তান জন্মিবে, সেই-ই ভবিষ্যতে আপনার সিংহাসনের অধিকারী হইবে, এক্ষণে সভা মধ্যে আপনাকে সেই প্রতিজ্ঞা ঘোষণা করিতে হইবে।'

'অবশ্য করিব।' সম্রাট, মেরির ন্যায় রূপ সুন্দরী নারীরত্ন লাভ করিয়াছেন জানে আনন্দে অধীর হইয়া বারবার বলিতে লাগিলেন, 'অবশ্য করিব—আগামী কল্যকার দরবারেই ইহা ঘোষণা করিব।'

উভয়েরই অন্তর অনন্ত আনন্দে উৎফুল্ল। উভয়েই তখন যেন আত্মহারা। সম্রাট সাদরে প্রশ্ন করিলেন,—'আপনি আমাকে বিবাহ করিতে সম্মত হইলেন?'

সলজ্জভাবে ক্ষীণস্বরে মেরি বলিলেন,— 'হইলাম।'

সম্রাট আনন্দভরে বলিয়া উঠিলেন,— 'আপনি আজ হইতে "আমার হৃদয়রাণী" হইলেন। আমার হৃদয়ে অক্ষয় অক্ষরে লিখিত হইল,—"মেরি, আকবরের হৃদয়-রাণী।"

এহেন সময়ে মেরির পরিচারিকা, সম্রাট ও মেরি যে কক্ষ মধ্যে আছেন, ইহা যেন সে জানে না এমত ভাণ করিয়া, কক্ষমধ্যে প্রবিষ্ট হইল। সম্রাট, তাহাকে দেখিয়াই বুঝিলেন যে, পাদরী ও বণিক চর পাঠাইয়াছেন। তিনি উভয়কে ডাকিবার জন্য পরিচারিকাকে অনুমতি করিলেন।

বিনা বিলম্বে পাদরী ও বণিক কক্ষমধ্যে প্রবিষ্ট হইবামাত্র সম্রাট গাত্রোত্থান করিয়া, 'আপনারা মেরীর মুখে সমস্ত শুনিবেন, আমি এক্ষণে বিদায় হইলাম।' আনন্দে এই কথা বলিয়া কক্ষ ত্যাগ করিলেন। বলা বাহুল্য যাইবার সময় মেরির প্রতি সপ্রেমদৃষ্টি দান করিতে বিস্মৃত হন নাই।

মেরির মুখে সমস্ত শুনিয়া, গঞ্জালিস বুঝিলেন, কার্য্য সিদ্ধ হইয়াছে। পাদরী বুঝিলেন, ভারতীয় নানা ধর্ম্মাবলম্বী নরনারীদিগের জন্য স্বর্গদ্বার উদ্ঘাটনের উপক্রম হইয়াছে, শীঘ্রই স্বর্গীয় আলোক আসিয়া হিন্দুস্থানের উপর পতিত হইবে। তিনি এই সমাচার গোয়াতে প্রেরণ করিতে আর কাল বিলম্ব করিলেন না।

ধর্ম্মতত্ত্ব-পরিশিষ্ট।

অধুনা অনেক স্থলে অনেক রকমের ধর্ম্ম-সভা সংস্থাপিত হইতেছে, অনেকে প্রচারক-পদবী অধিরূঢ় হইয়া স্ব স্ব রুচি ও সুবিধা অনুসারে বিবিধ সমন্বয় প্রকটিত করিয়া যশোভাগী হইতেছেন। কিন্তু কি জানি কেন প্রকৃত হিন্দুযাভিমানী ব্যক্তি তাহাতে সন্তোষ লাভ করিতেছেন না। তাঁহাদের মতে ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধে অধুনা যে প্রবন্ধ পাঠ বা সমালোচনা হইতেছে, তাহাতে ধর্ম্মের যথার্থ স্বরূপ নির্ণীত না হইয়া, ধর্ম্ম বিষয়ে অনেকগুলি অসহনীয় সন্দেহ আসিয়া, অনেকের চিরন্তন বিশ্বাসের জীর্ণমূলকে শিথিল

করিয়াছে। অনেকের হয়ত তীব্র জ্ঞান পিপাসা চরিতার্থ না হইয়া বর্দ্ধিত হয় নাই, বরং আপনাআপনি নিবৃত্তপ্রায় হইয়াছে। অনেকে অনেক রকম আপাতমধুর বাক্য, যুক্তি ও পরামর্শের সহিত সমুদাহৃত করিতেছেন কিন্তু জলের পিপাসা সুমধুর দুধে যাইবার নহে। সম্মুখে পিযূষসন্নিভ পবিত্র পেয়-পরিপূর্ণ-হিরণ্ময় কুম্ভ থাকিলেও তৃষিত ব্যক্তি সুশীতল এক পাত্র জল ছাড়া আর কিছুই চায় না। এই কথা নৈষধকার কবি শ্রীহর্ষ স্পষ্টাক্ষরেই বলিয়াছেন—

"পিপাসুতা শান্তিমুপৈতি বারিণা
ন জাতু দুগ্ধান্মধুনোঽধিকাদপি।"

আমাদের ধর্ম্ম-সভাতে নানা শ্রেণীর মত মতান্তর মীমাংসিত হইলেও ইহা হিন্দু-প্রধান। হিন্দু ভগবদুক্তিতে অচলা ভক্তি ও অটল বিশ্বাস রাখিয়া থাকে। ভগবান স্বয়ং বলিয়াছেন—

"শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ
পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ।"
ইতি।

নিজের ধর্ম্ম গুণহীন হইলেও সম্যক্ অনুষ্ঠেয়, পরধর্ম্ম হইতে তাহা অতি শ্রেয়স্কর। স্বধর্ম্মে মৃত্যু শ্রেয়ঃ, পরন্তু পরের ধর্ম্ম ভয়াবহ। সুতরাং এতাদৃশ সভায় হিন্দুধর্ম্মতত্ত্ব-জিজ্ঞাসু ব্যক্তি যে তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন না ইহা সহজবোধ্য। এই সব সভা হিন্দু-ধর্ম্মতত্ত্ব-জিজ্ঞাসুবৃন্দের ধর্ম্ম প্রবৃত্তি উন্মেষার্থ প্রতিষ্ঠিত। জিজ্ঞাসুগণ সভা হইতে শিক্ষণীয় বিষয় শিখিবে ও সভায় বলিবে এবং সেই সূত্রে স্ব স্ব চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গে স্বীয় ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি ও বাক্‌শক্তির উন্নতি সাধন করিবে। আধুনিক অধিবেশনে সভা স্বীয় আদর্শস্থানীয়তা রক্ষা করিতে না পারিলেও পথভ্রষ্ট হইয়া যে গণ্ডীর বাহিরে যায় নাই, ইহা অবশ্য আনন্দের বিষয়। নানা লোকের নানাবিধ সমালোচনা ও স্ব স্ব রুচিসঙ্গত নানা রকম ব্যাখ্যা দেখিয়া হয়ত অনেকে বলিতে পারেন, এতাদৃশ সন্দেহ পরম্পরায় বিশ্বাসের ব্যাঘাৎ জন্মাইয়াছে—অনেকে সন্দেহ-দোলায় দোদুল্যমান হইতেছেন। আমাদের মতে তাহা নহে। এরূপ বলিলে স্বীয় আন্তরিক দুর্ব্বলতা ও অসহিষ্ণুতার পরিচয় দেওয়া হয়। সহিষ্ণু জিজ্ঞাসু সর্ব্বাগ্রে সন্দেহ বা সংশয় অপেক্ষা করে। নির্ণয় সংশয়-সাপেক্ষ। সংশয় না থাকিলে নির্ণয় হইবে কাহার? প্রয়োজন থাকিলে প্রবৃত্তি হয়, আর প্রবৃত্ত হইয়া পদে পদে সন্দিগ্ধ হইলে পূর্ব্বপক্ষ উপস্থিত হইয়া থাকে। তদনন্তর অভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারা যায়। ইহাই শাস্ত্রের নিয়ম ও প্রত্যক্ষসিদ্ধ। বৈয়াসিক ন্যায়মালা সর্ব্বাদৌ বলিয়াছেন ও কার্য্যতঃ করিয়াছেন যে—

"একো বিষয়সন্দেহ পূর্ব্বপক্ষাবভাসকঃ
শ্লোকোঽপরস্ত সিদ্ধান্তবাদী সঙ্গতয়ঃ
স্ফুটাঃ।"

এক একটী অধিকরণ পঞ্চাবয়ব যথা—বিষয়, সন্দেহ, সঙ্গতি, পূর্ব্বপক্ষ ও সিদ্ধান্ত। শঙ্করাচার্য্য, ব্যাসদেবকৃত সূত্রনিচয়ের প্রাঞ্জল ভাষ্য লিখিয়া থাকিলেও ব্যাসাধিকরণমালা গ্রন্থে বৈয়াসিক ন্যায়মালা-রচয়িতা পঞ্চাবয়ব প্রদর্শনে অধিকরণ গুলিকে আরও প্রাঞ্জলতর করিয়া পাঠার্থীর যথেষ্ট সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। রচয়িতার নাম জানিতে পারা যায় নাই, পরন্তু অজ্ঞাতনামা নিঃস্বার্থপর সেই মহাত্মা আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পবিত্রস্থল সন্দেহ নাই। তিনি দুই দুইটী শ্লোকে এক একটি অধিকরণের সংগ্রহ করিয়াছেন। প্রত্যেক অধিকরণে সঙ্গতি না দেখাইলেও ;অথবা দেখান আবশ্যক মনে না করিলেও বিষয়, সন্দেহ,

পূর্ব্বপক্ষ ও সিদ্ধান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। আমাদের ধর্ম্মসভায় ধর্ম্মতত্ত্বরূপ বিষয়টীর সন্দেহ মাত্র উল্লিখিত বা আলোচিত হইয়াছে, পূর্ব্বপক্ষ পর্য্যন্ত যায় নাই, সুতরাং সিদ্ধান্তান্বেষী ব্যক্তি যদি তাহাতে বিরক্তি বা ঔদাস্য প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে সে তাঁহার অসহিষ্ণুতা বা ধৈর্য্যচ্যুতি বলিতে হইবে। হয়ত কেহ ভাবিতে বা বলিতে পারেন, ধর্ম্মতত্ত্ব বিষয়ে ওরূপ সন্দেহ বা পূর্ব্বপক্ষ সঙ্গত নহে। তদ্দ্বারা অনাস্থা আসিয়া ধর্ম্মের মূলোচ্ছেদের সহায়তা করে। আমরা ব'ল সিদ্ধান্তান্বেষী ব্যক্তি ত একথা বলিতেই পারেন না, সাধারণে বলিলেও হাস্য সম্বরণ করা যায় না। এ সভা বা কোন্ ছার বা ইহার আলোচ্য ধর্ম্মতত্ত্ব, ধর্ম্মতত্ত্ববিষয়ক সন্দেহ বা কোন্ ছার, হিন্দুর ধর্ম্মতত্ত্ব অচ্ছেদ্য, অভেদ্য, নিত্য ও অব্যয়। বৌদ্ধগণের যুক্তিজালে—কৌশলজালে এমন কি প্রজ্জ্বলিত বিশাল অগ্নিকুণ্ডেও যাহা ভস্মীভূত হয় নাই, ম্লেচ্ছ যবন কুলের শাণিত করবাল সংঘর্ষে যাহা খণ্ডিত হয় নাই, অসহিষ্ণু অসূয়াবশবর্ত্তীর দল বিবিধ উপায়ে যাহার অনুমাত্র অন্যথাভাব করিতে পারে নাই, কয়েকটা নগণ্য ব্যক্তির নগণ্য সন্দেহে তাহা বিকৃত বা বিপর্য্যস্ত হইবে, ইহা চিন্তা করা বিষম ভুল নহে কি? আমাদের মতে ধর্ম্মতত্ত্বের সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে সন্দেহ চাই, পূর্ব্বপক্ষ চাই, তবেই ত অগ্নিপরীক্ষিত হইবে ও অভ্রান্ত সিদ্ধান্তের বিমল জ্যোতিঃ সন্দেহকালিমাবিহীন পরিষ্কৃত অন্তঃকরণে পবিত্র ধর্ম্মভাবের আনন্দময় স্ফুরণ করাইবে। তখন ধর্ম্মপিপাসু মানব, হিন্দু ধর্ম্মের মৌলিকতা ও সনাতনতা অনুভব করিয়া উচ্চৈঃস্বরে গাহিবে—

"দগ্ধং দগ্ধং ত্যজতি ন পুনঃ কাঞ্চনং চারুরূপং ঘৃষ্টং ঘৃষ্টং ত্যজতি ন পুনঃ চন্দনং চারু গন্ধং ছিন্নং ছিন্নং ত্যজতি ন পুনঃ স্বাদুতামিক্ষুদণ্ডং প্রাণান্তেঽপি প্রকৃতি বিকৃতির্জায়তে নোত্তমানাং।'

কাঞ্চন শতবার দগ্ধ হইলেও তাহার মনোহর রূপ পরিত্যাগ করে না; চন্দন সহস্রবার ঘৃষ্ট হইলেও মনোহর গন্ধ পরিত্যাগ করে না; ইক্ষুদণ্ড শতধা ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইলেও স্বীয় স্বাদুতা পরিত্যাগ করে না; যাহা উত্তম যাহা মৌলিক প্রাণান্তেও তাহার বিকৃতি হয় না।

হিন্দুধর্ম্ম অন্যকর্ত্তৃক উপহসিত, ঘৃণিত, লাঞ্ছিত, অবজ্ঞাত, আক্রান্ত—যাহা হইতে পারে হউক কিন্তু বিপর্য্যস্ত হইবে না, হয় নাই বা হইতেই পারে না। স্বয়ং ভগবান তাহার রক্ষক ইহা নিঃসন্দেহ। ভগবান স্বয়ং বলিয়াছেন—

"ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে"

সৃষ্টিস্থিতি ও প্রলয়কর্ত্তা ভগবানের অনবাপ্ত বা অবাপ্তব্য কিছুই নাই, তথাপি তিনি ধর্ম্মরক্ষার্থ সংসারী হইবেন, ইহা ধর্ম্মের পক্ষে কম গৌরবের কথা নহে। স্বয়ং বিধাতা পুরুষ যাঁহার প্রহরী, তাহার অন্যথা শঙ্কা করা অল্পজ্ঞতা বা অজ্ঞতার পরিচায়ক। অনেকে অনেক প্রকারে স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া আপাতমধুর পরধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছেন, কিন্তু সে মধুরিমা বেশিদিন ভোগ করিতে সমর্থ হন নাই। কেহ বা উদ্দাম ভাব অবলম্বনে বেজায় মাধুর্য্য ভোগ করিয়া আধিব্যাধিগ্রস্ত হইয়াছেন, কাহারও বা মাধুর্য্যে মুখ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ইচ্ছা হইতেছে, স্বধর্ম্ম-অম্লরসে মুখটা ছাড়াইবেন; কিন্তু হায়! স্বধর্ম্ম অম্লরস হাতছাড়া হইয়া পড়িয়াছে। না মধুর পরধর্ম্ম রুচিতেছে, না স্বধর্ম্ম অম্লরস আর হস্তগত হইতেছে। ত্রিশঙ্কুর অবস্থায় "কাশী বা মক্কা বা" করিতে-

ছেন। এতাদৃশ যথেচ্ছাচার-সম্প্রদায়ের ঈদৃশ ব্যাপারে আর কিছুই হউক বা না হউক, স্বধর্ম্মের মৌলিকতা ও সনাতনতা এবং ধর্ম্মান্তরের আগন্তুকতা ও আপাতমধুরতা প্রতিপন্ন হইতেছে। পলান্ন বা খেচরান্ন আপাততঃ উপাদেয় হইতে পারে, কিন্তু তাহা মৌলিক বা অবিমিশ্র হইতে পারে না। একমাত্র অবিমিশ্র বিশুদ্ধ অন্নই পথ্য। প্ররোচনায় পড়িয়া জঙ্গলি ধাঙ্গড় গুলা সপরিবারে কুলি হইয়া আসামে যায়। যাইবার সময় আহা! তাহাদের কি উৎসাহ। পুত্র, পিতাকে না বলিয়া, কন্যা, স্নেহময়ী জননীর স্নেহ ভুলিয়া— এমন কি স্নেহের পুতুল কোলের ছেলেকে পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়া কত গোপনে কত সন্তর্পণে আত্মবিক্রয় করে। কিন্তু হায়! গন্তব্যস্থানে উপস্থিত হইয়া দেখে যে সর্ব্বত্র সেই সুবিশাল কর্ম্মক্ষেত্র। বরং তাহাদের প্রিয়তম গন্তব্যস্থানটী স্বার্থের অচিন্তনীয় লীলাক্ষেত্র ও পিশাচের মর্ম্মস্পর্শী তাণ্ডবে ভীষণ হইতে ভীষণতর। যত উৎপীড়িত হইতে থাকে, ক্রমে স্বদেশ, স্বজন ও স্বজাতির কথা মনে করিয়া আকুল হইয়া পড়ে। কিন্তু তখন আর উপায় নাই—নির্ব্বাতিক। অনুতাপের তীব্র উষ্মা অন্তরকে জর্জ্জর করিয়া থাকে। হা হতোঽস্মি! বলিয়া স্বদেশের দিকে তাকায়, কিন্তু হায়! সে যে অনেক দূরে চোখ পাইবার নহে। প্ররোচনায় বশবর্ত্তী হইয়া পরধর্ম্মগ্রাহী অনেকের অবস্থাও প্রায় তদ্রূপ কি না চিন্তাশীল বিজ্ঞমণ্ডলী তাহা বিবেচনা করিবেন। এত করিয়াও অন্যস্থি-সম্প্রদায় যে সনাতন ধর্ম্মের অণুমাত্র অন্যথা করিতে পারে নাই, আজ কি না এই সব সভার কয়েকটা নগণ্য সন্দেহে সেই সনাতন ধর্ম্ম বিকৃত হইবে! ইহা যে উপহাসের কথা। সনাতন ধর্ম্মটাকে বিপর্য্যস্ত করিবার উদ্দেশে ভারতে কত জায়গায় কত ডিপোর প্রতিষ্ঠা না হইয়াছে? কত সুচতুর পণ্ডিতগণ আড়কাটীর কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন, কত ধাঙ্গড়কে ভুলাইয়া কুলি চালান দিতেছেন। কিন্তু সনাতন ধর্ম্মের সনাতনতা ও মৌলিকতা নষ্ট করিতে সমর্থ হইয়াছেন কি? যে সনাতন, সে সনাতনই আছে ও থাকিবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ করা অজ্ঞতার পরিচায়ক।

ভূমিকাটা বাড়িয়া গেল, শ্রোতৃবর্গের ধৈর্য্যচ্যুতির কারণ হইতে পারে। ক্ষমা করিবেন। এই প্রবন্ধে ধর্ম্ম সম্বন্ধেই অল্পাধিক আলোচনা হইবে। এই ধর্ম্মতত্ত্বের আলোচনা বহুস্থলে হইয়া থাকায় উপস্থিত প্রবন্ধটার "ধর্ম্মতত্ত্ব-পরিশিষ্ট", নাম দিয়া সভ্যগণের সম্মুখে পাঠার্থ দণ্ডায়মান হইয়াছি। প্রবন্ধের সারবত্তা প্রদর্শন করিয়া যশোলাভে আমার আকাঙ্খা নাই। সভায় সন্দিগ্ধ ব্যক্তিবৃন্দের সন্দেহ ভঞ্জনার্থ বদ্ধপরিকর হই নাই। ধর্ম্মশাস্ত্রের আদেশ ও স্বীয় হিন্দুত্বকে স্মরণ করিয়া, আমি আমার কর্ত্তব্য প্রতিপালনে বাধ্য হইয়াছি। মনু বলিয়াছেন—

"ধর্ম্মোবিদ্ধস্ত্বধর্ম্মেন সভাং যত্রোপতিষ্ঠতে
শল্যঞ্চাস্য ন কৃন্তন্তি বিদ্ধাস্তত্র সভাসদঃ।

সভায় অধর্ম্ম কর্ত্তৃক ধর্ম্মবিদ্ধ হইলে যদি সভ্যগণ শল্যস্বরূপ অধর্ম্মকে সদ্বিচারের দ্বারা উদ্ধার না করেন, তাহা হইলে সভাসদ সকলেই অধর্ম্ম শল্যে বিদ্ধ হন।

আবার বলিয়াছেন—

"সভাং বা ন প্রবেষ্টব্যং বা সমঞ্জসং
অব্রুবন্ বি ব্রুবন্ বাহপিনরো ভবতি কিল্বিষী।"বরং সভাতে যাইবে না গেলে কিন্তু সত্যই বলিবে। তথায় মৌনাবলম্বন করিলে বা মিথ্যা কহিলে পাপী হইতে হয়। সভায় সন্দেহকে স্থান দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং এরূপ অবস্থায় নীরব থাকা গর্হিত বিবেচনায়

কিছু বলিতে ইচ্ছুক হইয়াছি। আমি আমার নিজের কিছু লইয়া দণ্ডায়মান হই নাই, মহাত্মাগণের ধর্ম্মোপদেশের সারাংশ মাত্র সঙ্কলন করিয়া, সভায় সমুপস্থিত করিলাম, সভ্যগণ ভুলভ্রান্তি সংশোধন করিয়া, সারাংশের সারাংশ গ্রহন করুন, ইহাই সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ।

সামান্য বা গুরুতর কোনও বিষয়ের অনুষ্ঠান করিতে হইলে, প্রায় অধিকারী, বিষয়, সম্বন্ধ ও প্রয়োজন, এই অনুবন্ধ চারিটীর আবশ্যকতা উপলব্ধ হয়। যে বিষয়ের অনুষ্ঠান করা হইবে, তাহার যদি কেহ অধিকারী না থাকে, তাহা হইলে অনুষ্ঠানে প্রবৃত্তি হইবে কেন? আবার অনুষ্ঠিত বিষয়ের সহিত সেই অধিকারীর যদি কোনও সম্বন্ধ থাকে,তবেই অনুষ্ঠান সার্থক হইবে। নিরর্থক কার্য্যে প্রকৃতিস্থ ব্যক্তির স্বেচ্ছায় প্রবৃত্তি হয় না। সামান্য একজন সূত্রধরের কার্য্য কলাপ পর্য্যবেক্ষণ করুন। সূত্রধর (ছুতোর) জীবিকা নির্ব্বাহার্থ কাঠের বিবিধ প্রকারের ব্যবহারোপযোগী পদার্থ প্রস্তুত করে। প্রস্তুত করিবার পূর্ব্বে সে গ্রাহক বা "অধিকারী নিশ্চয় করিয়াই কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। বাবুগণ চেয়ার, টেবেল, ছড়ি, গাড়ী নিশ্চিতই খরিদ করিবেন, ইহা সে স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছে। তাই তাহার প্রবৃত্তি হইয়াছে। আবার প্রস্তুত করা জিনিস গুলির সহিত বাবুগণের একটা ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে বলিয়াই বাবুগণকে প্রকৃত অধিকারী বলিয়া নির্ব্বাচিত করিয়া, সূত্রধর কার্য্যে নিঃসন্দেহ প্রবৃত্ত হইয়াছে।

সামান্য সূত্রধরের কার্য্যেও সেই চারিটী অনুবন্ধ বর্ত্তমান। সভ্য বাবুগণ "অধিকারী" চেয়ার, টেবেল আদি "বিষয়"—গ্রাহ্য গ্রাহক "সম্বন্ধ"। ও জীবনোপায় "প্রয়োজন" আমাদের আজকার আলোচ্য ধর্ম্মতত্ব বিষয়েও এই চারিটী অনুবন্ধ যে অত্যাবশ্যক তাহা বলাই বাহুল্য।

প্রকৃত ধর্ম্মজিজ্ঞাসু ব্যক্তিই ইহার অধিকারী। ধর্ম্মতত্বটী বিষয়। প্রতিপাল্য প্রতিপালক বা সেব্য সেবক সম্বন্ধ। মুক্তি পর্য্যন্ত ইহার প্রয়োজন। ধর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে স্বয়ং দেবীপার্ব্বতী, পিতা হিমাচলকে জ্ঞানোপদেশ দিবার সময় বলিয়াছেন—

জ্ঞানাৎ সংজায়তে মুক্তির্ভক্তির্জ্ঞানস্য কারণং।
ধর্ম্মাৎ সংজায়তে ভক্তির্ধর্ম্মোযজ্ঞাদিকো মতঃ।

জ্ঞান হইতে মুক্তি। ভক্তি হইতে জ্ঞান। ধর্ম্ম হইতে ভক্তি এবং যজ্ঞাদি কর্ম্মই ধর্ম্ম। কি জ্ঞানযোগ, কি ভক্তিযোগ, কি কর্ম্মযোগ সর্ব্বত্র ধর্ম্মের সাক্ষাৎ বা পরম্পরায় প্রয়োজনীয়তা। ধর্ম্মাচরণের দ্বারা মানব প্রকৃতিস্থ হয়। প্রকৃতিস্থ হইলেই নিজের প্রকৃত স্বরূপ জানিতে পারে। এইখানে আর একটী কথা বলা আবশ্যক মনে করি যে, ধর্ম্মরাজ রের কথিত প্রাচীন একটী বাক্য আছে যে--

"বেদাবিভিন্নাঃ স্মৃতয়োবিভিন্নাঃ
নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নং।
ধর্ম্মস্য তত্বং নিহিতং গুহায়াং
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ॥"

বেদ সমস্ত বিভিন্ন বিভিন্ন। স্মৃতি সমস্তও বিভিন্ন। তিনিই মুনিই নহেন, যাঁহার মত ভিন্ন নহে। এরূপ অবস্থায় ধর্ম্মতত্ব গুহায় নিহিত হইয়াছে অর্থাৎ জটিল হইয়া পড়িয়াছে সুতরাং মহাজনগণ যে পথে চলিতেছেন বা চলিয়াছেন, তাহাই পথ। তাহাই ধর্ত্তব্য।

কথাটী শুনিলে আপাততঃ এই বোধ হয় যে, বেদে ও স্মৃতিতে নানা প্রকারের নানামত সন্নিবেশিত হইয়াছে। যখন যে মুনি হইয়াছেন,তখনই তিনি একটা ভিন্ন মত সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। মুনির সংখ্যা নাই, মতেরও সংখ্যা নাই। এরূপ অবস্থায় ধর্ম্ম-

তত্ত্বটী জটিল হইয়া পড়িয়াছে। মত-মতান্তর আলোচনা না করিয়া শিষ্টব্যক্তিগণ যে পথে গিয়া গিয়াছেন, সেই পথেই চলা উচিত। পরন্তু কথাটী যে সে লোকের কথা নহে, স্বয়ং ধর্ম্মাবতার যুধিষ্ঠিরের উক্তি। দুঃখের বিষয় আজকাল এই উক্তির সুদূরবর্ত্তী লক্ষ্যের দিকে কাহারও লক্ষ্য নাই। উক্তিটীকে অন্ধ বিশ্বাসের সূত্র বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে থাকেন। আমাদের মনে হয়, বক্তা প্রবৃত্তি-পরাঙ্মুখ কুতর্কী ও সন্দিগ্ধ ধর্ম্মজিজ্ঞাসু ব্যক্তিগণের আপাত প্রবৃত্তির জন্যই "শিষ্টাচার" ধর্ম্মের উপদেশ দিয়াছেন এবং "নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নং।" তিনি মুনি নহেন যাঁহার মত ভিন্ন নয়, এ কথাটীর প্রকৃত অর্থ বা ভাবার্থ বোধ হয় এই হওয়া সঙ্গত মনে হয় যে, যিনি ধর্ম্মজিজ্ঞাসু ব্যক্তিগণের ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা চরিতার্থ করিবার কোনও একটী উপায় করিয়া দিয়া যান নাই, তিনি মুনি নহেন। কোনও মুনির লক্ষ্য ভিন্ন নহে, আবিষ্কৃত পথই ভিন্ন ভিন্ন। এতদ্দ্বারা তাঁহারা জগতের নৈসর্গিক হিতৈষণার পরিচয় দিয়াছেন। দুঃখের বিষয় অধুনাতন অনেকে মনে করেন যেন মুনিগুলা পরস্পর ঝগড়া ঝাটী করিয়া নিজ নিজ বাহাদুরী ফলাইবার জন্য যাহার যাহা ইচ্ছা এক একটা পথ দেখাইয়া গিয়াছেন। বেদ সংহিতা পুরাণ স্মৃতি আদি সর্ব্বজনাদরণীয় গ্রন্থবেত্তা ও গ্রন্থকর্ত্তাগণ এরূপ গুলিখোরী করিয়া গিয়াছেন, ইহা শুনিলে যেরূপ হাস্যের উদ্রেক হয়, বলিতেও তদ্রূপ লজ্জা বোধ করে। পথের নানাত্ব দেখিয়া পথকর্ত্তার লক্ষ্য ভেদ স্থির করা সঙ্গত মনে করি না। এ সম্বন্ধে একটী দৃষ্টান্ত দেখুন।

পতিতপাবনী গঙ্গা সাগর-সঙ্গমে চলিয়াছেন। পথে কত কোটী জীব গঙ্গাজল স্পর্শে সদগতি লাভ করিতেছে। গঙ্গা স্নানাভিলাষীগণের সুবিধার জন্য কত জায়গায় কত পুণ্যাত্মা এক একটী ঘাট প্রস্তুত করিয়া দিয়া স্নানার্থীগণের অশেষ সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। যাঁহারা কাশী, কলিকাতা প্রভৃতি গঙ্গাতীরবর্ত্তী প্রধান প্রধান নগরগুলিতে গিয়াছেন, তাঁহারাই সে ঘাটের বাহুল্য ও স্নানার্থীগণের অহমহমিকাপূর্ণ স্নানেচ্ছা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। তত্তৎ নগর-বাসী এমন পুণ্যাত্মা বড়লোক নাই, যিনি সাধারণের হিতার্থ একটী ঘাট প্রস্তুত করিয়া যান নাই। তাই মিত্রের ঘাট, বসুর ঘাট, রাজা বাবুর ঘাট, অমুক মারওয়াড়ীর ঘাট ইত্যাদি অসংখ্য ঘাটই আছে। আমাদের ধর্ম্মতত্ত্বও সেই পতিতপাবনী গঙ্গার স্রোতঃ। ইহাতে ভাসিতে পারিলে ইহার প্রবাহও গঙ্গার ন্যায় সচ্চিদানন্দ-সাগরে পঁহুছিয়া দিবে। গঙ্গার ঘাটের ন্যায় ইহারও অসংখ্য মত বা পথ, গঙ্গার ঘাট আবিষ্কর্ত্তার ন্যায় ইহারও মত-আবিষ্কর্ত্তা অসংখ্য। গঙ্গাতীরবাসী এমন বড়লোক নাই, যিনি শক্তি অনুসারে আলাহিদা একটী ঘাট করিয়া দেন নাই। ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধেও তদ্রূপ "নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নং।—তিনি মুনিই নন যিনি ধর্ম্ম সম্বন্ধে একটী মত করিয়া যান নাই।" ঘাট আবিষ্কর্ত্তাদের মধ্যে যেমন পরস্পর জিগীষা বা অসূয়ার কারণ নাই, জীবের উপকার একমাত্র লক্ষ্য, তদ্রূপ ধর্ম্মসম্বন্ধেও ভিন্ন ভিন্ন মতের আবিষ্কর্ত্তাগণের পরস্পরে বিরোধ নাই। জগতের হিতৈষণাই একমাত্র লক্ষ্য। ঘাটের বাহুল্য দেখিয়া যদি কেহ এটায় যাইব না, সেটায় যাইব, কোন্ ঘাটটা ভাল? ওটা পিচ্ছিল নাকি, ইত্যাদি বিবিধ সন্দেহ ও তর্ক করিয়া অনর্থক কালক্ষেপ করেন, তাঁহার পক্ষে নিরপেক্ষ ব্যক্তির এই উক্তি বোধ হয় শ্রেয়স্কর হইতে পারে যে, মহাশয়েরা বৃথা কেন এটা

সেটা করিয়া কাল ক্ষেপ করিতেছেন? এত স্নানার্থী যে ঘাট দিয়া স্নান করিয়া যাইতেছে আপনিও সেই পথে নামিয়া স্নান করুন না? কোন্‌টা ভাল কোন্‌টা মন্দ এরূপ বিচারে ফল কি? ধর্ম্মাবতার যুধিষ্ঠিরও যেন এই শ্রেণীর সন্দিহান ব্যক্তির জন্য বলিয়াছেন "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ।"

শ্রৌত ও স্মার্ত্ত-ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, সন্দেহাকুল ধর্ম্মজিজ্ঞাসুর ত্বরা প্রবৃত্তির জন্য শিষ্টাচার ধর্ম্মটারই কেবল উপদেশ দিয়াছেন। কেহ কেহ বলিতে পারেন, শ্রুতি স্মৃতি আদির মতান্তর দেখিয়া যখন সদাচারে চলিবারও উপদেশ আছে, তখন আর বৃথা ধর্ম্মতত্ত্ব আলোচনায় ফল কি? বিড়ম্বনা মাত্র। একথা আপাত সত্য বা মনোরম হইলেও এতদ্দ্বারা আন্তরিক দুর্ব্বলতার পরিচয় দেওয়া হয়। বিশেষতঃ সর্ব্ব ধর্ম্মের ক্রমাবনতির সহিত সদাচারবিশিষ্ট ব্যক্তির অবনতি যেরূপ ঘটিয়াছে, তাহাতে আদর্শ অন্বেষণ করিয়া হতাশ হওয়া অপেক্ষা আদর্শস্থানীয় মহাজনগণের আচরিত সদাচার সমষ্টি, যাহা শ্রৌত স্মার্ত্তগণ আমাদের মত সংকীর্ণ বুদ্ধি মানবগণের জন্য লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার আলোচনা করা শ্রেয়স্কর মনে করি। বিশেষতঃ মুনিগণের মত মতান্তরকে উপলক্ষ্য করিয়া যাহা—"ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ।" বলা হইয়াছে, তাহা সম্ভবতঃ ব্যষ্টি বা বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মকেই লক্ষ্য করিতেছি। সমষ্টি বা সামান্য ধর্ম্ম সম্বন্ধে ধার্ম্মিক সাধারণের মতানৈক্য দেখা যায় না। যেমন মনে করুন, শৈব শাক্ত গাণপত্য বৈষ্ণব ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন উপাসকগণ স্বীয় অব্যভিচারিণী ভক্তি প্রণোদিত হইয়া স্ব স্ব উপাস্য দেবতার প্রাধান্য প্রখ্যাপনার্থ পরস্পরে বাদানুবাদ করিতে পারেন, কিন্তু সকলের উপাসনার মধ্যে সেই এক শৌচ-সদাচারাদি, সাধারণ ধর্ম্মরূপে অঙ্গীকৃত ও অনুষ্ঠিত হইতেছে। মত মতান্তর বিবেক-দৃষ্টির নিকট স্থান পাইবার নহে। অতএব অনভিজ্ঞ বা অচিন্তাশীল ধর্ম্মজিজ্ঞাসুর প্রবৃত্তির উন্মেষ করাইবার ব্যপদেশেই যেন বলা হইয়াছে—"মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ।" ভগবান নিজেও বলিয়াছেন—"যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতুমিচ্ছতি তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহং।" ভক্তগণও বলেন—"আকাশাৎ পতিতং তোয়ং যথা গচ্ছতি সাগরং সর্ব্বদেব নমস্কারঃ কেশবং প্রতি গচ্ছতি।"

চিন্তা করিয়াও দেখুন না কেন, কি গাণপত্য, কি শৈব, কি বৈষ্ণব সকলেই এক একটা উপাস্য স্থির করিয়া আত্মসমর্পণ করিয়াছেন সত্য কিন্তু গণপতি, শিব, বিষ্ণু এই কয়টা ধাতু প্রত্যয়-ঘটিত শব্দগুলি বাদ দিয়া সমষ্টি দৃষ্টিতে দেখিলে সকলেই দেবভক্ত ছাড়া অপর কেহই নহে। ভক্তি একমাত্র সকলের লক্ষ্য।

একটী দৃষ্টান্ত আছে—

কয়েকজন জন্ম-অন্ধ একদিন একটা হাতীর কেহ বা পায়ে, কেহ বা উদরে, কেহ বা শুঁড়ে, কেহ বা মাথায়, কেহ বা লেজে ধরিয়া পরস্পর তর্ক আরম্ভ করিল। যে পায়ে ধরিয়াছে, সে বলিল, ভাই আমি হাতী ধরিয়াছি, হাতীটা ঠিক থামের মত। যে পেটে ধরিয়াছে, সে রাগে বলিল, সে কি? আমিই ঠিক হাতী ধরিয়াছি, হাতীটা ত মস্ত একটা জালার মত। যে শুঁড়ে ধরিয়াছিল, সে তর্ক করিয়া বলিল, হাতীটা বড় সাপের মত। যে মাথায় ধরিয়াছিল, সে বলিল, মৃৎকুম্ভের মত। যে লেজে ধরিয়াছিল, সে বলিল, ঝাড়ুদারের ঝাঁটার মত। শ্রোতৃবর্গ বিবেচনা করুন সকলে সেই এক হাতী ধরিয়াছে কি

না ? এবং কল্পিত নাম গুলি বাদ দিয়া অন্ধগণ কর্ত্তৃক ধৃত অংশ গুলির সমষ্টি হাতী কি ? তাই বলিতেছিলাম ব্যষ্টি দৃষ্টিতে মত মতান্তর এবং ব্যষ্টি দৃষ্টির কলহেই ধর্ম্ম গুহান্বিত হইয়া "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ" এই বাক্যকে অবসর দিয়া থাকে। অন্ধগণের হস্তী স্বরূপ নির্ব্বাচন কলহে যেরূপ চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তির অনাস্থা স্বাভাবিক, ব্যষ্টি ধর্ম্মের কলহে সনাতন ধর্ম্মজিজ্ঞাসুর অচাঞ্চল্যও সেইরূপ স্বাভাবিক। মুনি ভিন্ন হইতে পারেন, মত ভিন্ন হইতে পারে কিন্তু তাঁহাদের লক্ষ্য ভিন্ন নহে—এক। অত্যন্ত পরিতাপের সহিত বলিত হইতেছে যে, আজ কাল সেরূপ ধর্ম্মজিজ্ঞাসু বা ধর্ম্মোপদেষ্টা অতি বিরল। শিক্ষিত সম্প্রদায় ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসার প্রকৃত অধিকারী। অধুনা যাঁহারা শিক্ষিতাভিমানী, তাঁহারা বিলাস-পরিপুষ্ট এবং ব্যসন-অপভ্রষ্ট শরীরটীকে কষ্টসাধ্য শৌচ-সদাচারাদি সনাতন ধর্ম্মে নিয়োজিত করিতে সমর্থ হন না ; অধিকন্তু হিন্দুর ব্যষ্টি ধর্ম্মের প্রতি কটুকটাক্ষ করিতে বিলক্ষণ পাটব প্রদর্শন করেন। পরন্তু প্রকৃত ধর্ম্মজিজ্ঞাসুর ইহাতে বিচলিত হওয়া উচিত নয়। অন্ধগণের হস্তী ধরা ব্যাপারে চক্ষুষ্মান্ই বলিতে পারিবে যে,অন্ধ সকলেই হাতী স্পর্শ করিয়াছে, কিন্তু অন্য কেহ অন্ধ কি এই অন্ধগণের কলহে মত মতান্তর দেখিয়া হাসিবে না ? অবশ্য হাসিবে। ধর্ম্মাচরণভীরু বা অসমর্থ ব্যক্তি যে, নানা মুনির নানা মত দেখাইয়া একটা গোল পাকাইয়া ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষা হইতে বিরত হইবে, উপহাস করিবে বা বিরত করিবার চেষ্টা করিবে, তাহাতে আর বৈচিত্র্য কি ? অলস চায় সংসার অলস হইলে তাহার আলস্য দোষটা নিরাপদ হয়। ফল কথা সনাতন ধর্ম্ম সম্বন্ধে ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসু মাত্রেই একমত।

অতঃপর সনাতন ধর্ম্ম ও তাহার ক্রমাবির্ভাব বলিব।

গরুড় পুরাণে উক্ত আছে,—

"শ্রুত্যুক্তঃ পরমোধর্ম্মঃ স্মৃতিশাস্ত্রগতোঽপরঃ
শিষ্টাচারেন শিষ্টানাং ত্রয়ো ধর্ম্মাঃ সনাতনাঃ।"

শ্রুত্যুক্ত অর্থাৎ বৈদিক ধর্ম্ম প্রধানতম, স্মার্ত্ত ধর্ম্ম প্রধানতর এবং শিষ্টাচার প্রধান। এই ত্রিবিধ ধর্ম্মই সনাতন ধর্ম্ম।

ভাগবতে দ্বাদশ স্কন্দে উক্ত আছে,—

"ক্ষীণায়ুষঃ ক্ষীণসত্ত্বান্ দুর্ম্মেধান্ বীক্ষ্য কালতঃ।
বেদান্ ব্রহ্মর্ষয়ো ব্যস্যন্ হৃদিস্থাচ্যুতচোদিতাঃ ॥৪২॥৬অ
অস্মিন্নপ্যন্তরে ব্রহ্মন্ ভগবান লোকভাবনঃ।
ব্রহ্মেশাদ্যৈর্লোকপালৈর্যাচিতো ধর্ম্মগুপ্তয়ে ॥৪৩॥৬অ
পরাশরাৎ সত্যবত্যামংশাংশ কলয়া বিভূঃ।
অবতীর্ণো মহাভাগ বেদং চক্রে চতুর্ব্বিধং ॥৪৪॥৬অ
ঋগথর্ব্ব যজুঃ সাম্নাং রাশীনুদ্ধৃত্য বর্গশঃ।
চতস্রঃ সংহিতাশ্চক্রের্মন্ত্রৈর্মণিগণা ইব ॥৪৫॥৬অ
তাসাং স চতুরঃ শিষ্যানুপাহূয় মহামতিঃ।
একৈকাং সংহিতাং ব্রহ্মন্নেকৈকস্মৈ দদৌ বিভুঃ ॥৪৬॥৬অ
পৈলায় সংহিতামাদ্যাং বহ্বৃচাখ্যামুবাচ হ।
বৈশম্পায়ন সংজ্ঞায় নিগদাখ্যাং যজুর্গণং ॥৪৭॥৬অ
সাম্নাং জৈমিনয়ে প্রাহ তথা ছন্দোগ সংহিতাং
অথর্ব্বাঙ্গিরসীং নাম স্ব শিষ্যায় সুমন্তবে ॥৪৮॥৬অ

কাল সহকারে লোক সকলকে ক্ষীণায়ু, দুর্ব্বুদ্ধ ও হীনবল দেখিয়া মহর্ষিগণ হৃদিস্থিত অন্তর্যামিকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া দ্বাপর যুগের শেষভাগে বেদ সকলকে ক্রমশঃ বিভক্ত করিলেন

হে ব্রহ্মন্! এই সময়ে ধর্ম্মরক্ষা করিবার জন্য ব্রহ্মাদি লোকপাল কর্ত্তৃক ধর্ম্মরক্ষার্থ প্রার্থিত হইয়া, ভগবান্ ভূতভাবন নারায়ণ পরাশর হইতে সত্যবতীর গর্ভে অংশ কলারূপে অবতীর্ণ হইয়া বেদকে চারি ভাগে বিভক্ত করিলেন। এবং সামান্য মণির খনি হইতে পদ্মরাগাদি মণি উদ্ধারের ন্যায় ঋক্, যজুঃ, সাম, অথর্ব্ব রাশি হইতে বর্গক্রমে মন্ত্র সকল উদ্ধার করিয়া সেই সকল মন্ত্রেতে চারিটী সংহিতা প্রণয়ণ করিলেন। পরে মহামতি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন চারিজন শিষ্যকে আহ্বান করিয়া এক একজনকে এক এক সংহিতা প্রদান করিলেন। প্রথমতঃ বহ্বৃচ নামক ঋক্ বেদ সংহিতা, পৈলকে শিক্ষা দিলেন। পরে নিগদাখ্য যজুর্বেদ সংহিতা বৈশম্পায়নকে উপদেশ করিলেন। ছান্দোগ নামক সামবেদ সংহিতা জৈমিনিকে কহিলেন এবং আঙ্গীরসী নামধেয় অথর্ব্ব সংহিতা সুমন্তকে অধ্যয়ন করাইলেন।

মূলতঃ এই সংহিতা-যুগ পর্য্যন্ত শ্রৌত বা বৈদিক ধর্ম্মের বহুলপ্রচার অনুমিত হয়। ক্রমে মানবগণকে ক্ষীণায়ু দুর্ব্বুদ্ধি ও হীনবল দেখিয়া করুণানিলয় ব্যাস বাদরায়ণ বেদগত জটিলত্ব অপনোদনার্থ বেদকে চারিভাগে বিভক্ত করিলেও সেই প্রত্যেক ভাগ বৈদিক কর্ম্ম, উপাসনা ও জ্ঞান এই তিন তিন কাণ্ডে বিভক্ত। মহামুনি জৈমিনি কর্ম্মিগণের জন্য কর্ম্মকাণ্ডাত্মক বেদভাগ ও জৈমিনির গুরু বেদবিভাগকর্ত্তা বাদরায়ণ ব্যাস জ্ঞানিগণের জন্য উৎকৃষ্ট মীমাংসা প্রণয়ণ করিয়া জগতের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়া গিয়াছেন। জৈমিনি কৃত কর্ম্মরহস্য পূর্ব্বমীমাংসা ও ব্যাসকৃত তত্ত্বজ্ঞানরহস্য উত্তরমীমাংসা বা বেদান্ত নামে অভিহিত। আমাদের আলোচ্য—ধর্ম্মতত্ত্বের সহিত ব্যাস কৃত মীমাংসার পারম্পরিক সম্বন্ধ থাকিলেও জৈমিনি মুনিকৃত পূর্ব্বমীমাংসার সহিত ইহার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ।

জৈমিনি দর্শনের প্রথম সূত্রই হইতেছে—

"অথাতো ধর্ম্মজিজ্ঞাসা।"

জৈমিনি অভিপ্রায় যে—"নহিকশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্য কর্ম্মকৃৎ।" অকর্ম্মা হইয়া যখন কেহ ক্ষণমাত্র তিষ্ঠিতে পারে না, তখন জীবনিবহের জন্য কর্ম্মমার্গ প্রশস্ত করিয়া দেওয়া উচিত। তাহা হইলে কর্ম্মী জীবনিচয় ধর্ম্মসাধক নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মে লিপ্ত থাকিয়া বিমলচিত্ত হইবে ও সদ্গতি লাভ করিবে। জৈমিনি এক প্রকার স্বীয় গুরু বাদরায়ণ ব্যাসের প্রবর্ত্তিত উত্তরমীমাংসার অধিকারী প্রস্তুত করিয়া দিতেছেন।

কর্ম্মের সহিত জ্ঞানের তেজ তিমিরের ন্যায় বিরোধ অঙ্গীকৃত হইলেও এবং তন্নিবন্ধন কর্ম্মী জ্ঞানীকে "চিনি হওয়া ভাল নয়। চিনির স্বাদ গ্রহণ করিয়া তৃপ্ত হওয়া উচিত।" এই বলিয়া কটাক্ষ করিলেও এবং জ্ঞানী কর্ম্মীকে "ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকে বিশন্তি" পুণ্য ক্ষীণ হইলে আবার মর্ত্ত্যলোকে ফিরিতে হইবে এই বলিয়া—"ধর্ম্মকৈবৈক লভ্য" স্বর্গাদির ফলাদি দোষ কীর্ত্তন করিয়া শুনাইলেও জৈমিনি কৃত কর্ম্মকাণ্ডের সহিত ব্যাস প্রবর্ত্তিত জ্ঞানকাণ্ডের যে একটা অচ্ছেদ্য পূর্ব্বাপরীভাব বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহা স্বীকার না করিয়া পারা যায় না। বিমল দর্পণেই প্রতিবিম্ব পড়িয়া থাকে। কর্ম্ম শাস্ত্রীয় ধর্ম্মাচরণে চিত্ত নির্ম্মল হইলেই জ্ঞানকাণ্ডের তত্ত্বজ্ঞান স্ফুরিত হইবে। কর্ম্মকাণ্ড জ্ঞানকাণ্ডের সোপান। ষড়্দর্শনের টীকাকার জ্ঞানভাণ্ডার বাচস্পতি মিশ্র বেদান্ত দর্শনের—৩য় অধ্যায়ের ৪র্থ পাদে ২৬ সূত্র—

"সর্ব্বাপেক্ষা চ যজ্ঞাদি শ্রুতেরশ্ববৎ।"

এই সূত্রের ভাষ্যের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে—তথাহি আশ্রমবিহিত নিত্যকর্ম্মানুষ্ঠানাৎ

ধর্ম্ম সমুৎপাদঃ ততঃ পাপ্মা বিনীয়তে। স হি তত্বতোঽনিত্যাশুচি দুঃখানাত্মনি সংসারে ভি। নিত্য শুচি সুখাদি লক্ষণেন বিভ্র মেন মলিনবৃত্তি চিত্তসত্ত্বঃ অধর্ম্ম নিবন্ধনত্বাৎ বিভ্রমাণাং অতঃ পাপ্মনঃ প্রক্ষয় প্রত্যক্ষোপপত্তি দ্বারা পাবরণ সতি প্রত্যক্ষোপপত্তিভ্যাং সংসারস্য তাত্বিকী অনিত্য শুচি দুঃখরূপতাং অপক্ষ্যাহং বিনিশ্চিনোতি। ততো অস্মিন্ অনন্তি ভিসঙ্গঃ বৈরাগ্যমুপজায়তে ততস্তাজ্জিহাসা অস্য উপাবর্ত্তত ততো হানোপায়ং পর্য্যেষতে। পর্য্যেষমানশ্চ আত্মতত্ত্বজ্ঞানমস্যোপায় ইতি শাস্ত্রাৎ আচার্য্য বচনাচ্চ উপশ্রুত্য তজ্জিজ্ঞাস্যতে।

স্ব স্ব আশ্রমবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান জন্য ধর্ম্ম অর্থাৎ শুভাদৃষ্টের উৎপত্তি, তন্নিবন্ধন পাপের ক্ষয় হয়। এই পাপ বা অধর্ম্ম অনিত্য অপবিত্র ও দুঃখজনক সংসারক্ষেত্রে নিত্য পবিত্র সুখাদি রূপ পরিভ্রম দেখাইয়া মানবের অন্তঃকরণকে কলঙ্কিত করে। সাংসারিক সুখ বা দুঃখ সকলের মূলেই অধর্ম্ম নিহিত আছে. পরন্তু কোথাও বা তাহা প্রকট আর কোথাও বা প্রচ্ছন্ন। পাপক্ষয় হইলেই নির্ম্মল মনী, প্রত্যক্ষ জ্ঞান তর্কাদিতে সমধিক সমর্থ হয়; সুতরাং সে সংসারের স্বরূপ অবগত হইয়া তাহাতে বিরক্ত হয় এবং তাহাকে ত্যাগ করিতে অভিলাষী হয়। পরে ত্যাগের উপায় অন্বেষণ করতঃ শাস্ত্র বা সদ্গুরুর নিকটে আত্মতত্ত্ব জ্ঞানের উপায় অবলম্বন করিয়া তদ্বিষয়ে যত্নশীল হয়।

এতদ্দ্বারা সহজে বুঝা যায় যে জ্ঞানকাণ্ড, কর্ম্মকাণ্ডকে পরিত্যাগ করে না। দুঃখের বিষয় অধুনাতন অভূতপূর্ব্ব জ্ঞান-কাণ্ডীগণ রাতারাতি "অহং ব্রহ্মাস্মি—একমেবাদ্বিতীয়ং" হইয়া যান। কর্ম্মকাণ্ডের "ক"কারের সহিত সম্বন্ধ নাই অথচ তাঁহারা বিষয়লিপ্ত! বিলাসের ক্রোড়ে বসিয়াও একবার হাঁটু গাড়িয়া চোখ বুজিলেই সমাহিত। উদরের বেলায় একমেবাদ্বিতীয়ং। আব্রহ্মস্তম্ভ পর্য্যন্ত এক জ্ঞানে উদরসাৎ করিয়া ফেলেন। আদরের বেলায় কিন্তু স্ত্রী কন্যা মাতা ভগিনী জ্ঞান পূর্ণ থাকে। যাক বাজে লোকের বাজে আলোচনায় লাভ নাই।

যাঁহারা কর্ম্ম ও জ্ঞানের পারম্পর্য্য ভাব না বুঝিয়া মিথ্যা হট্টগোল করেন তাঁহাদিগকে বলি যে জৈমিনি ও ব্যাস—শিষ্য ও গুরু। তাঁহারা আবার আজকালকার গুরু শিষ্য নহেন। তাঁহাদের উক্তিগুলি পরস্পর বিরুদ্ধ হইবে ইহা যে ভাবাই ভুল। অন্য কথায় অনেকদূর আসিয়া পড়িলাম ক্ষমা করিবেন। অতঃপর ধর্ম্মতত্ত্বের কয়েকটী স্তর দেখাইবার জন্য চেষ্টা করিব। প্রথমে বেদের কথাই বলা উচিত মনে করি। পরে দর্শনের কথা বলিব। বেদের সিদ্ধান্ত এই যে "ধর্ম্মঞ্চর"—"ধর্ম্মেণ সুখমাসীৎ" অর্থাৎ ধর্ম্ম আচরণ কর, ধর্ম্মের দ্বারাই সুখ হয়। এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে, যে ধর্ম্মে সুখ লাভ হইয়া থাকে, সে ধর্ম্ম কি? বৈশেষিক দর্শন প্রণেতা কণাদ বলিতেছেন,

"যতোঽভ্যুদয় নিঃশ্রেয় সিদ্ধিঃ স ধর্ম্মঃ"।

অর্থাৎ যাহা দ্বারা লৌকিক সুখ এবং নিঃশ্রেয় সাধিত হয় তাহাই ধর্ম্ম। নিঃশ্রেয় সম্বন্ধে দর্শনকর্ত্তারা প্রায় অনেকে লিখিয়াছেন যে প্রবৃত্তির নাশ হইলে জন্ম নাশ হয়। জন্ম নাশ হইলে তাবৎ দুঃখই নষ্ট হয়। দুঃখ নাশ হইলে অপবর্গ লাভ হয়। এই অপবর্গের অন্যতম নামই নিঃশ্রেয়ঃ এবং এই নিঃশ্রেয়ঃ সিদ্ধিই ধর্ম্ম। মহামুনি কণাদের বাক্যানুসারে এই নিঃশ্রেয় প্রাপ্তি বা অপবর্গ লাভই ধর্ম্ম সাধনের পরম পুরুষার্থ। এই প্রকার ন্যায়দর্শনকার মহর্ষি গৌতম স্থির করিয়াছেন যে, তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইলেই ধর্ম্ম

লাভ হয়। তাঁহার মতে তত্ত্বজ্ঞান হইতে মিথ্যাজ্ঞান নষ্ট হয়। মিথ্যাজ্ঞান নষ্ট হইলে, নিখিল দোষ বিনষ্ট হইয়া থাকে এবং দোষ নষ্ট হইলে সকল প্রকার দুঃখের শান্তি হইয়া থাকে। এই দুঃখ শান্তির নাম পুরুষার্থ। পুরুষার্থই অন্তিম ধর্ম।

সাংখ্যদর্শনকার সিদ্ধশিরোমণি কপিল দেবের সিদ্ধান্তানুসারে স্থূলতঃ দেখা যায় প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগানুসারে সৃষ্টি হইয়াছে। এই সৃষ্টি চতুর্বিংশতি তত্ত্ব বিভক্ত। এই সকল তত্ত্ব হইতে অতীত হইতে পারিলেই দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হয়। এই আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তিই পরম ধর্ম। ব্যাস শিষ্য জৈমিনিরও মত সৎকর্মের অনুষ্ঠান করিতে করিতে চিত্ত শুদ্ধ হইয়া যায়। চিত্ত শুদ্ধ হইলেই যে সদা সন্নিহিত আত্মচৈতন্যের তাহাতে প্রকাশ পাইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

যে দর্শন গুলির স্থূল স্থূল মত উদ্ধৃত করা হইল, মেধাবীগণ প্রণিহিত হইয়া চিন্তা করিলে বিলক্ষণ ধারণা করিতে পারিবেন যে, এই পাঁচখানি দর্শনের যাহা সাধনক্রম, তাহাই ভগবান বাদরায়ণ ব্যাসদেব-প্রবর্ত্তিত বেদান্তদর্শনের সিদ্ধান্ত ও প্রায়শঃ তদতিরিক্ত নহে। বেদান্তও ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই চতুর্ব্বিধ পুরুষার্থ স্থির করিয়া, মোক্ষকে পরম পুরুষার্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেও পূর্ব্ব মীমাংসার একমাত্র লক্ষ্য সেই আলোচ্য সনাতন ধর্ম্মকে সর্ব্বপ্রথমে স্থান দিয়াছেন। সনাতন ধর্ম্মেরই দার্শনিক স্তর দেখান হইল। সনাতন ধর্ম্ম অন্যান্য নানা ধর্ম্মের ন্যায় সঙ্কুচিত স্বরূপ নহে। অন্যান্য ধর্ম্ম সমূহে কেবল ঈশ্বর সম্বন্ধীয় কিছু কিছু নিয়ম এবং সামাজিক অন্নাধিক কতকগুলি নিয়ম প্রতিপাদনের কথা উল্লিখিত আছে, কিন্তু সনাতন ধর্ম্মের বিচারে ধর্ম্মাধর্ম্মের অতিরিক্ত পদার্থ কিছু সংসারে কিছুই নাই। সনাতন ধর্ম্মাবলম্বীরা স্নানে, ভোজনে, শয়নে, জাগরণে, উপবেশনে, উত্থানে, কথনে, শ্রবণে ইত্যাদি প্রত্যেক কর্ম্মে সনাতন ধর্ম্মের বিরাট স্বরূপ পর্য্যবেক্ষণ করেন এবং অধর্ম্মের ভীষণ বিভীষিকা প্রত্যক্ষ করেন। অধর্ম্ম প্রাকৃতিক নিয়ম নষ্ট করিয়া তাঁহাদের উৎসাদ সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছে দেখিলে, তাঁহারা ধর্ম্মের সাহায্যে তাহা হইতে রক্ষা পান। ধর্ম্মের ব্যুৎপত্তি-গত অর্থ-"নিয়ম।" ধাতুগত অর্থ-"ধারণ করে যে।" এই উভয় অর্থ হইতে তাৎপর্য্যার্থ গ্রহণ করিলে স্থূলতঃ বলা যাইতে পারে যে, যে নিয়ম এই সৃষ্টি-ক্রিয়াকে ধারণ বা সংরক্ষণ করিয়া আছে, তাহাই ধর্ম্ম। এক্ষণে বিচার করিয়া দেখা উচিত কোন্ নিয়ম সৃষ্টি-ক্রিয়াকে সংরক্ষণ করিতেছে এবং সেই নিয়ম কোন্ অবস্থায় ধর্ম্ম বলিয়া অভিহিত হয় এবং কি অবস্থায় উপনীত হইলে অধর্ম্ম বলিয়া বিঘোষিত হইয়া থাকে?

ভগবান বলিয়াছেন,—"ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরং।" প্রকৃতি জগৎকর্ত্রী। সেই প্রকৃতি সত্ত্ব, রজ ও তম এই ত্রিগুণ-ময়ী বলিয়া সৃষ্টি-ক্রিয়াও ত্রিগুণাত্মিকা। রজো গুণে উৎপত্তি, সত্ত্ব গুণে স্থিতি ও তমো গুণে লয় হয়।

বেদান্তপরিভাষা বলেন—

"স চ পরমেশ্বর একোঽপি স্বোপাধিভূত মায়ানিষ্ঠ সত্ত্ব রজঃ তমোগুণ ভেদেন ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরাদি শব্দবাচ্যতাং ভজতে।

তথা সৃজ্যমান প্রাণি কর্ম্মবশেন পরমেশ্বরোপাধিভূত মায়ায়া বৃত্তি বিশেষা ইদমিদানীং স্রষ্টব্যং ইদমিদানীং পালয়িতব্য-মিদমিদানীং সংহর্ত্তব্যমিত্যাকারা জায়ন্তে।"

এক পরমেশ্বর স্বীয় উপাধিভূত মায়ার বৃত্তি-বিশেষ বিশেষাবচ্ছিন্ন হইয়া রজঃগুণ-

প্রাধান্যে ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্ত্তা, সত্ত্বগুণপ্রাধান্যে বিষ্ণু পালয়িতা, ও তমোগুণপ্রাধান্যে রুদ্র নাম গ্রহণ করিয়া সংহারকর্ত্তা হইয়া থাকেন, অতএব ফলকথা রজোগুণে উৎপত্তি, সত্ত্বগুণে স্থিতি ও তমোগুণে লয়। বিশ্ব-সংসার এই তিন গুণের লীলাক্ষেত্র। এমন কোন সাংসারিক পদার্থ নাই, যাহা সৃষ্টি স্থিতি লয় এই তিন অবস্থা হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারে বা হইয়াছে। ব্রহ্মাণ্ডের অগণিত গ্রহ সমূহ হইতে সামান্য তৃণটী পর্য্যন্ত এই অবস্থার অধীন। এই প্রকার জীবপ্রবাহও যে এই নিয়মের অধীন তাহা বলাই বাহুল্য। অহংতত্ত্বের দ্বারা জীব বিমোহিত হইয়া ধর্ম্মপ্রবাহের মধ্যে প্রবাহিত হয়। পুনরায় ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের উত্তাল উর্ম্মিমালার আলোড়নে সৃষ্টির মধ্যে ভাসিতে থাকে। এক আবর্ত্ত হইতে গিয়া আবর্ত্তান্তরে ডুবিতে থাকে। এক জন্মের পর আবার জন্ম লাভ করিতে থাকে। যেমন নদীগর্ভে পতিত কীট একটী আবর্ত্ত হইতে অন্য আবর্ত্তে অন্য আবর্ত্ত হইতে অপর আবর্ত্তে গিয়া আবর্ত্ত-পরম্পরায় জর্জ্জর হইতে থাকে, তদ্রূপ সৃষ্টি-স্রোতে ভাসমান জীবও জন্মপরম্পরায় জর্জ্জর হইতে থাকে। নদীর আবর্ত্তে পতিত কীটকে যেমন কোন কৃপালু ব্যক্তি দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া যদি তীরে তুলিয়া দেন, তাহা হইলে সে কীট যেমন তীরস্থ তরুর ছায়ায় গিয়া বিশ্রাম লাভ করিয়া, ক্লেশ-পারাবার হইতে রক্ষা পায়, তদ্রূপ জন্মাবর্ত্ত প্রপীড়িত সৃষ্টিসাগরে ভাসমান জীবনিবহ পরমকারুনিক গুরুর সাহায্যে আত্মজ্ঞানরূপী অবিনশ্বর তরুর শান্তিচ্ছায়ায় বিশ্রান্ত হইয়া, সাংসারিক ক্লেশ-পরম্পরা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করে। এই তিন অবস্থা জীবের স্বাভাবিক। তাহাই ধর্ম্ম, যাহা এই ক্রিয়ার স্বাভাবিক নিয়মে বাধা না জন্মায়। এবং তাহাই অধর্ম্ম যাহা এই স্বাভাবিক নিয়মে বাধা প্রদান করিয়া থাকে।

স্মৃতি বলেন—

"ধর্ম্মো রক্ষতি রক্ষিতো নমু হতো হন্তি
ধ্রুবং প্রাণিনো
হন্তব্যো ন ততঃ স এব শরণং সংসারিণাং
সর্ব্বথা।"

ধর্ম্ম রক্ষিত হইলে রক্ষা করেন, হত হইলে অর্থাৎ ধর্ম্ম রক্ষা না করিলে, ধর্ম্ম হত হইয়া, প্রাণীগণকেও হত করেন। অতএব ধর্ম্ম রক্ষা করা কর্ত্তব্য। সংসারিগণের ধর্ম্মই একমাত্র শরণ।

এই পদ্যোল্লিখিত ধর্ম্মটী একমাত্র সেই সনাতন ধর্ম্মের সমষ্টি স্বরূপকেই লক্ষ্য করিতেছে। সংসারী বলিতে কেবল এক দেশবাসী বা এক ধর্ম্মাবলম্বী কোনও একটী সম্প্রদায়কে বুঝায় না; অবশ্য একটী বিরাট্ সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করিতেছে সুতরাং এস্থলে ধর্ম্মের সমষ্টি স্বরূপকে গ্রহণ না করিলে সমন্বয় হয় না। তাই বলিতেছিলাম গুণময়ী প্রকৃতি-সৃষ্ট ত্রিগুণাত্মক সৃষ্টি কার্য্যের রক্ষক বা অবাধে পরিচালকই ধর্ম্ম, এবং তদিতর অধর্ম্ম। ভগবান্ বলিয়াছেন—

"কার্য্যতেহ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ"

সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ের দ্বারা পরিচালিত হইয়া জীব অবশভাবে হয় অন্তরে অন্তরে না হয় বাহিরে কোন না কোন কার্য্য অবশ্য করিবে। কার্য্য করিয়া জীব যে কর্ম্ম সঞ্চয় করিবে, তাহাই ভাবি জন্মে প্রারব্ধরূপে পুনরায় সেই জীবকে ব্যাপৃত করিবেই করিবে। সেই প্রারব্ধ কর্ম্মই ধর্ম্মাধর্ম্ম ছাড়া অপর কিছু নহে। আবার সেই ধর্ম্মাধর্ম্ম-প্রণোদিত হইয়া যে কার্য্য করিবে, তাহাও ধর্ম্মরূপে ও অধর্ম্মরূপে প্রারব্ধ কোটিতে পরিগণিত হইবে। সুতরাং ধর্ম্মাধর্ম্মই জীবের স্বভাব বা সৃষ্টির স্বভাব।

জীব কর্ম্মাধীন হইলেও তাহার স্বাতন্ত্র্য একেবারে নাই বলা সঙ্গত নহে। তাহা হইলে বিধি-নিষেধ-ঘটিত ধর্ম্মশাস্ত্রগুলি নিষ্প্রয়োজন হইয়া উঠে। নেত্মা আসামী কর্ম্মের দোহাই দিয়া নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে সুতরাং কর্ম্মের অধীনতার মধ্যে জীবের যে স্বাতন্ত্র্যটুকু আছে, তাহাই আমাদের আলোচ্য ধর্ম্মতত্ত্বের আলোচনার ভিত্তি।

জীব, সৃষ্টিপ্রবাহের মধ্যে পড়িবার পর ক্রমশঃ আপনার গুণোন্নতি দ্বারা উন্নত হইয়া শেষে বিশুদ্ধ সত্ত্ব স্বরূপে যাইবে ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম; কেন যাইবে? সে "কেনর" উত্তর সহজ নহে। বিশেষতঃ পঠ্যমান প্রবন্ধে তাহার আলোচনাও সঙ্গত নহে। তবে এই মাত্র বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, কর্ম্মদোষে মহারাজ পদবীচ্যুত ব্যক্তি যখন দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে জর্জ্জরিত হইবেন, তখন যে তিনি ক্ষমতা সত্ত্বেও পুনরায় সেই সুখময় রাজপদবী লাভের আকাঙ্খা না করিবেন বা তদর্থ যত্ন না করিবেন, ইহা কি কখনও স্বাভাবিক নিয়ম হইতে পারে? সুতরাং জীবের স্বরূপাবস্থা লাভেচ্ছা স্বাভাবিক। জীবের এই স্বাভাবিক উন্নতিলাভের সহায় বা অনুকূল কার্য্যকলাপই ধর্ম্ম। প্রতিকূল কার্য্য কলাপই অধর্ম্ম। সত্ত্বগুণোন্মেষিত প্রবৃত্তিই ধর্ম্মের অনুকূল। রজঃ ও তমোগুণোন্মেষিত প্রবৃত্তিই প্রতিকূল। রজঃ ও তমোগুণের কার্য্য যে সময়, অবস্থা, দেশ ও পাত্র বিশেষে ধর্ম্ম নয় তাহা বলিতেছি না। কারণ আপদ্ধর্ম্ম বলিয়া যে ধর্ম্মের একটী ব্যষ্টিস্বরূপ উক্ত হইয়াছে, তাহা সর্ব্বাংশে সত্ত্বপ্রধান বলিতে পারি না। মনে করুন গৃহস্থাশ্রমী যদি আশ্রমোচিত কার্য্য অর্থাৎ যাহাতে রজঃপ্রধান কৃত্যগুলি কর্ত্তব্যরূপে নির্দ্ধারিত আছে, তাহা না করিয়া রাতারাতি ব্রহ্মজ্ঞানী সাজিয়া বসে, তাহা কি তাহার পক্ষে ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে? অথবা বলিষ্ঠ হিংস্রক ষাঁড় কর্ত্তৃক সাংঘাতিক ভাবে আক্রান্ত হইয়া, তৎকালে অগত্যা প্রতিহিংসা করিয়া স্বীয় প্রাণ রক্ষা করিলে, সেই প্রতিহিংসা তমোগুণোদ্দীপ্ত বলিয়া অধর্ম্ম হইবে কি?

তাই বলিতেছিলাম সত্ত্বগুণোপেত ধর্ম্ম বিশুদ্ধ হইলেও দেশ, কাল, পাত্র, ও অবস্থা বিশেষে রজঃ ও তমোগুণের কার্য্যও অধর্ম্ম নহে। গুণময়ী সৃষ্টি-ক্রিয়ার প্রবাহ চালাইবার জন্য গুণত্রিতয়েরই আবশ্যকতা। যাহাই হউক সনাতন ধর্ম্মের ব্যষ্টি স্বরূপ দেখাইবার সময় সে সমস্ত গুণাগুণের বিশেষ ভাবে আলোচনা করা যাইবে। সম্প্রতি সৃষ্টি স্থিতিকারক সত্ত্বগুণোন্মেষিত ধর্ম্মের কথাই বলা সঙ্গত বিবেচনা করি। সমষ্টি দৃষ্টিতে সনাতন ধর্ম্মরক্ষক একমাত্র সাত্ত্বিক প্রবৃত্তি। এই সাত্ত্বিক প্রবৃত্তিই অন্যতম সনাতন ধর্ম্ম এবং ইহার বিরোধী যাহা তাহাই অধর্ম্ম। কাম, ক্রোধ, অসূয়া, দম্ভ ইত্যাদি তামসিক বৃত্তিগুলি জীবের স্বাভাবিক উন্নতিলাভের বিরোধী অতএব ইহারা অধর্ম্ম এবং বৈরাগ্য ক্ষান্তি ঔদার্য্য ইত্যাদি তাহার অনুকূল বলিয়া ইহারা ধর্ম্ম। কেবল ইহা যে জীবের জীবত্ব নষ্ট করিয়া ব্রহ্মরূপে অবস্থান করাইবার জন্য ধর্ম্ম নাম গ্রহণ করিয়াছে তাহা নহে। ধর্ম্ম সুবিশাল জগৎকে ধারণ করিয়াছে বা রক্ষা করিতেছে বলিয়াই ধর্ম্ম।

কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, রাজনীতি, সমাজনীতি, আয়ুর্ব্বেদ ধনুর্ব্বেদ, স্থপতিবিদ্যা, আলেখ্য-বিদ্যা, সঙ্গীত, দেশাচার, দিগ্বিজয়, ভাষা, সাহিত্য ইত্যাদি চিন্তাযোগ্য বিষয় মাত্রেই ধর্ম্মের রক্ষণশীলতা দেদীপ্যমান রহিয়াছে। ব্যষ্টি ধর্ম্ম আলোচনার সময় ইহার প্রত্যেকটীতে ধর্ম্মের ওতপ্রোতভাব দেখাইবার বাসনা রহিল।

আজ কেবল সনাতন ধর্ম্মের সমষ্টি স্বরূপই দেখান হইবে। ধর্ম্মই মানবকে সংসারের অশেষ বিপদরাশির মধ্যে সুখের পথ প্রদর্শন করে। ভবসাগরে ধর্ম্মই মানবকে পোত-প্রদীপ স্বরূপ সমুজ্জ্বল জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিয়া প্রবল ঝটিকান্দোলিত উত্তাল তরঙ্গমালার মধ্য দিয়া তীরস্থ করে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র প্রবরাজ।

বাজে কথা।

ও হরি!—কও কথা!—সারা জগৎটা জুড়ে এত লোক থাকতে শেষটা কি না আমায় নিয়ে টানাটানি! না হবেই বা কেন? ঐটাই জগতের মূল রহস্য।

তোমরা জগতের মূল রহস্যটা কি জান? বোধ হয় না। বেদ বাইবেল কোরাণ পুরাণ ষড়দর্শন প্রভৃতি তন্ন তন্ন করিয়া দেখ, প্রত্যেক গ্রন্থের প্রত্যেক পত্র ছিন্ন বিছিন্ন করিয়া দেখ, কোথাও জগতের মূল রহস্য খুঁজিয়া পাইবে না।

হাসিও না, আমার কথাটা শুনিবে কি? জগতের মূল রহস্য—টানাটানি। তুমি ইহা স্বীকার কর কি? যদি না কর, একবার আমার সঙ্গে দ্যুলোকে এস দেখি।

ঐ দেখ—প্রথমেই সম্মুখে পড়িতেছেন—রবি। রবির সহস্র কর যেন সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডটাকে লইয়া টানাটানি করিতেছে। এই অনন্ত বিশ্বের যেখানে একবিন্দু রস, সেই খানেই রসিকরাজ রবির প্রখর দৃষ্টি। ঐ দেখ পচা পাঁকে বসে পঙ্কজিনী হাসছে—রবি তার রসটুকু চুষে খেয়ে আপনাকে তৃপ্ত করছেন। আর ঐ দেখ, কলিকাতা সহরের রাজপথ দিয়ে মলভাণ্ডবাহিনী যুবতী মেথরাণী চলিয়াছে, রবির তীব্র দৃষ্টি যেমন যুবতী মেথরাণীর সৌন্দর্য্য-রসপানে ব্যস্ত, সেইমত তাহার শিরস্থিত ক্রিমিপূর্ণ মলভাণ্ডের উপরও সাগ্রহে পতিত। রবির হৃদয় কি উদার! রবি কি বিশ্বপ্রেমিক! রবি কি রসিক! এই জন্যই রবি এক সম্প্রদায়ের মধ্যে দেবতা রূপে পূজিত।

রবি কি কেবল রস পানেই প্রমত্ত? তা নয়। রবি, সমগ্র বিশ্বটাকে লইয়াই টানাটানি করিতেছে। দ্যুলোকের সমস্ত গ্রহ উপগ্রহকে লইয়া যেমন টানাটানি করিতেছে, সইমত রবি, ভূলোককে লইয়াও টানাটানি করিতেছে। টানাটানিই রবির নিত্যকর্ম্ম—টানাটানিই তাহার মূল মন্ত্র। রবি, জানাইতেছে যে, বিশ্বের যে জিনিষটা তাহার টানাটানির বাহিরে পড়িতেছে, সেইটাই কক্ষভ্রষ্ট হইয়া বিলুপ্ত হইতেছে।

দ্যুলোকে রবির পরই চাঁদের আসন। কিন্তু এই চাঁদ লইয়াই বিষম বিভ্রাট। প্রথমেই একটা মহা গোল উপস্থিত। চাঁদটা কোন্ লিঙ্গ? হাসিলে যে? বলিতেছ—'লোকটার লিঙ্গ জ্ঞানও নাই! চাঁদ পুংলিঙ্গ।'

আমি বলি, 'ওটা তোমার মস্ত ভুল। চাঁদ পুংলিঙ্গ নহে।'

আর তুমি কি বলিতেছ?—'লোকটা কি গণ্ডমূর্খ!'

অর্দ্ধ শতাব্দীরও অধিক পূর্ব্বে আমাকে এইমত একবার 'গণ্ডমূর্খ' উপাধি লইতে হইয়াছিল। ব্যাপারটা শুনিবে কি?

তখন আমি সংস্কৃত কলেজে পড়িতাম। প্রগাঢ় পণ্ডিতমণ্ডলীতে সংস্কৃত কলেজ তখন বিভূষিত ছিল। শীর্ষস্থানে পণ্ডিত ই, বি, কাউয়েল। অধ্যাপকশ্রেণীতে জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন, ভরতচন্দ্র শিরোমণি, তারানাথ তর্কবাচস্পতি, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, নাটুকে রামনারায়ণ তর্করত্ন প্রভৃতি বিরাজ করিয়া কলেজের গৌরব বৃদ্ধি করিতেছিলেন। তখন কলেজে চতুর্দ্দশটী শ্রেণী ছিল। অনেক অধ্যাপক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের সন্তান বিনা বেতনে পড়িতেন—আর আমাদিগের মত ছাত্রদিগের বেতন এক টাকা। সেই সময়ের কথা বলিতেছি।

একদিন পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্ন পড়াইতেছিলেন। সেই পাঠসূত্রে চন্দ্রের কথা উঠিল। তিনি চন্দ্র সম্বন্ধে অনেক কথা শিখাইলেন।

তিনি বলিলেন, 'চন্দ্র, অত্রি মুনির পুত্র। চন্দ্র যখন পুত্র, তখন পুংলিঙ্গ ইহা তোমরা জানই। ১৭টী অতি শ্বেত অশ্ব চন্দ্রের রথ টানিয়া থাকে। দক্ষের ২৭টী কন্যার সহিত চন্দ্রের বিবাহ হয়।'

কথাটা শুনিয়া আমি বিস্মিত হইলাম। বলিলাম—'চন্দ্র কি কুলীন? তাই একদম ২৭টী ভগিনীকে বিবাহ করিয়াছিলেন? আপনার কুলীনকুলসর্ব্বস্ব নাটকেত একথার কোন উল্লেখ নাই।'

আমার সতীর্থগণ হাসিল।

পণ্ডিত মহাশয়ও হাসিয়া বলিলেন, 'দূর গণ্ডমূর্খ। দেবতাদের মধ্যে কি কুলীন ও বংশজ থাকিতে পারে?' পরে তিনি বলিতে লাগিলেন,—'সেই ২৭টী স্ত্রীর মধ্যে চন্দ্র রোহিণীকে বড় ভালবাসিতেন, কাজেই ২৬টীর প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিতেন। সুতরাং সেই ২৬টী স্ত্রী মনের দুঃখে তাঁহাদিগের পিতা দক্ষের নিকট চন্দ্রের সেই পক্ষপাতিতার কথা জানায়। দক্ষ, চন্দ্রকে ডাকিয়া সাবধান করিয়া দেন ও বলেন যে, সকল স্ত্রীর প্রতি সমান দৃষ্টি দেওয়া কর্ত্তব্য। চন্দ্র, সে কথা কাণ দিলেন না। চন্দ্রকে দক্ষ অভিশাপ দিলেন যে, তোমার যক্ষ্মারোগ হউক। তাহাই হইল। চন্দ্র পরে প্রভাস তীর্থে তীর্থকৃত্য সমাধা করিয়া, দক্ষের আজ্ঞামত বাকি ২৬টী স্ত্রীর প্রতি সমদৃষ্টি দান করিলে, রোগ হইতে মুক্ত হইলেন।'

আমি তখন বলিলাম, 'মহাশয়! চন্দ্রের ২৭টী পত্নী; তিনি সকলকে ভালবাসিতেন না বলিয়া যক্ষ্মারোগগ্রস্ত হইয়াছিলেন। আর এখানকার কুলীন ব্রাহ্মণদের যে কারও ৫০টা, কারও ৭০টা, কারও বা ১০০টা বিবাহ, তাদের এ রোগে ধরে না কেন?'

পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন, 'দক্ষের মত অভিশাপ দিবার উপযুক্ত পিতা থাকিলে, অবশ্য কুলীন বামুনদের ঐ রোগে ধরিতে পারে।'

আমার কোন সহপাঠী বলিয়া উঠিল,—'মহাশয়! যে ঐ প্রশ্ন করিতেছে, সেও একজন কুলীন।'

পণ্ডিত মহাশয় তখন সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমার কয়টা পত্নী?'

আমি তখন গম্ভীর ভাবে চক্ষু বুজিয়া, গা দুলাইয়া বলিলাম,—'একমেবাদ্বিতীয়ম্।'

'ভাল, দেখিও যেন আর বিবাহ করিও না।' এই কথা বলিয়া, পণ্ডিত মহাশয় আবার বলিলেন,—'বৃহস্পতির ভার্য্যা তারাকে চন্দ্র হরণ করিয়াছিলেন। চন্দ্রের ঔরষে তারার গর্ভে বুধের জন্ম হয়। বৃহস্পতি ভার্য্যাহারা হইয়া মহা ক্রুদ্ধ হইয়া উঠেন। চন্দ্র বেগতিক দেখিয়া, অসুরদিগের গুরু শুক্রাচার্য্যের ও অসুরদিগের শরণাপন্ন হন। তখন সেই সূত্রে দেবাসুরের মধ্যে মহাযুদ্ধ ঘটিবার উপক্রম হয়। ব্রহ্মা দেখিলেন

মহা বিপদ। তিনি তখন চন্দ্রকে ডাকিয়া তারাকে পরিত্যাগ করিতে বলিলেন। চন্দ্রও গত্যন্তর না দেখিয়া, অগত্যা তারাকে পরিত্যাগ করিলে, বৃহস্পতির ক্রোধ শান্ত হইল।'

এমন সময়ে ঘণ্টা বাজিল। পণ্ডিত মহাশয় আসন ত্যাগ করিয়া উঠিলেন। পণ্ডিত মহাশয় যেমন রসিক, সেইমত মিষ্টভাষী ছিলেন। তিনি কক্ষ ত্যাগ করিবামাত্র মাষ্টার মহাশয় দেখা দিলেন। ছাত্রদিগের মুখমণ্ডলের ভাব পরিবর্ত্তিত হইল। কারণ মাষ্টার মহাশয় কিছু গম্ভীর —কিছু উঁচু চালে চলেন। তাঁহার নাম বাবু রসিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

পাঠ আরম্ভ হইল। ইংরাজিতে স্বভাব বর্ণনার একটা কবিতা পাঠ আরম্ভ হইল। কবিতার একস্থানে Moon আছেন। মাষ্টার মহাশয় Moonকে She বলিলেন। কি সর্ব্বনাশ! আমি ত শুনিয়াই অবাক্! সভয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'চন্দ্রটা কোন্ লিঙ্গ?'

মাষ্টার মহাশয় গম্ভীরভাবে দৃঢ়স্বরে বলিলেন, 'স্ত্রীলিঙ্গ।' আমি বলিলাম 'সে কি? চন্দ্রটা যে পুংলিঙ্গ?'

মাষ্টার মহাশয় সক্রোধে বলিলেন,—'না তুমি গণ্ড মূর্খ। Moon স্ত্রীলিঙ্গ।'

গণ্ডমূর্খ বলাতে বুকে বড় বাজিল। ভাবিলাম কি এ? পণ্ডিত ও মাষ্টার দুজনের মধ্যে কার লিঙ্গ জ্ঞান নাই?

বেলা ১টার সময় জলখাবার ছুটীতে ধরিলাম পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয়কে। তিনি তখন বঙ্গের অদ্বিতীয় বৈয়াকরণিক নামে প্রসিদ্ধ। দেখিলাম, সেই বেলের ন্যায় গোলাকার মস্তকটী কামান। চাদর খানি বগলের মধ্যে। কাছা ও কোঁচা যেন স্থানভ্রষ্ট হইবার চেষ্টা করিতেছে। সাহসভরে তাঁহার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলাম। তিনি আমার মুখের দিকে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'কি?'

'আজ্ঞে একটী প্রশ্ন—'

তিনি বলিলেন 'কি প্রশ্ন?'

'আজ্ঞে চন্দ্রটা কোন লিঙ্গ?'

আমার মুখের প্রতি সবিস্ময়ে দৃষ্টি দান করিয়া বলিলেন,—

'কোন্ শ্রেণীতে পড়?—তোমাদের অধ্যাপক কে?'

'পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্ন।'

'কি ব্যাকরণ পড়?'

'মুগ্ধবোধ।'

তিনি তখন সবিস্ময়ে বলিলেন, 'মুগ্ধবোধ পড়, এখনও তোমার লিঙ্গ জ্ঞান হয় নাই?'

সলজ্জভাবে বলিলাম,—'আমার কিছু কিছু লিঙ্গ জ্ঞান হইয়াছে, তবে একটা সমস্যা উপস্থিত।'

'কি সমস্যা?"

'আমি জানি চন্দ্র পুংলিঙ্গ, ব্যাকরণেও তাহাই বলে। অধ্যাপক মহাশয়ও তাহাই বলেন। কিন্তু আমাদের মাষ্টার মহাশয় বলিতেছেন চন্দ্র, স্ত্রীলিঙ্গ।'

'তোমাদের মাষ্টার কে?'

'রসিক বাবু।'

'তাঁকে আমার সঙ্গে একবার দেখা করিতে বলিও। চন্দ্র, পুংলিঙ্গ। যাও।'

হৃদয়ে মহানন্দের উদয় হইল। তখনও ঘণ্টা বাজে নাই, ক্লাসও বসে নাই, তখনও পণ্ডিত ও মাষ্টার মহাশয়েরা বিশ্রামাগারে বসিয়া ধূম পান করিতেছিলেন। ঊর্দ্ধশ্বাসে সেই দিকে দৌড়িলাম। কিন্তু সে বিশ্রামাগারে আমাদের প্রবেশের অধিকার ছিল না। দ্বারদেশে গিয়া উঁকি মারিতে লাগিলাম। দেখিতে পাইয়া পণ্ডিত রামনারায়ণ জিজ্ঞাসা করিলেন,'কি?'

একটু সাহস হইল। ভিতরে ঢুকিয়া দেখিলাম, রসিক বাবু বসিয়া আছেন।

তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলাম, 'তর্ক-বাচস্পতি মহাশয় একবার আপনাকে তাঁহার সহিত দেখা করিতে বলিয়াছেন।'

তিনি সবিস্ময়ে বলিলেন,—'আচ্ছা।'

মনে বড়ই আনন্দ। তর্কবাচস্পতি মহাশয় যখন চন্দ্রকে পুংলিঙ্গ বলিয়াছেন, অধ্যাপক রামনারায়ণও বলিয়াছেন, অপর সকলেই বলে, তখন মাষ্টার মহাশয়ের নিশ্চয়ই লিঙ্গ জ্ঞান নাই।

পর দিন যথা সময়ে রসিক বাবু কেলাসে আসিয়াই আমাকে ডাকিলেন। নিকটে যাইবা মাত্র তিনি বলিলেন,—'দেখ × × × কাল বলিয়াছিলাম, চন্দ্রের ইংরেজি নাম Moon। Moon স্ত্রীলিঙ্গ। তুমি তর্ক করিয়া বলিয়াছিলে, চন্দ্র পুংলিঙ্গ। আমি র্ভৎসনা করিয়া তোমাকে গণ্ডমূর্খ বলিয়াছিলাম। তুমি পরে তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের নিকট জানিতে গিয়াছিলে, চন্দ্র কোন্ লিঙ্গ। কেমন? কথা সত্য কি না?'

'আজ্ঞা হাঁ। কোন্‌টা ঠিক জানিতে গিয়াছিলাম।'

'শুন।' এই কথা বলিয়া, সমস্ত ছাত্র-দিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, 'আমি তোমা-দের ইংরেজি পড়াই। ইংরেজি ভাষায় চন্দ্রটা স্ত্রীলিঙ্গ, পুংলিঙ্গ নহে। ভারতবর্ষে চন্দ্র দেবরূপে পূজ্য য়ুরোপে নহে। সংস্কৃত বা বাঙ্গালায় চন্দ্র পুংলিঙ্গ বলিয়াই জানিবে, কিন্তু ইংরেজি ভাষায় তোমাদিগকে চিরদিনই Moon কে স্ত্রীলিঙ্গ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবেই হইবে।'

হরি হরি বল! তখন বুঝা গেল, চন্দ্র যখন ভারতাকাশে উদিত হন, তখন তিনি ২৭টী স্ত্রীর পতি—কুমুদিনীর প্রাণকান্ত—বিরহিণীর কৃতান্ত। আর যখন তিনি ইয়ুরোপের আকাশে দেখা দেন, তখন তিনি রমণী—ধবলাঙ্গিনী—অভিসারিকা! শুক্লের দিন সেখানে একটু একটু করিয়া ঘোমটা দেন, আর শোনের দিন একটু একটু করিয়া ঘোমটা খোলেন! কি বাহার!

এইত গেল লিঙ্গ-বিভ্রাট। আসল কথাটা—টানাটানি। চন্দ্র, টানাটানিটা বুঝেন ভাল। চন্দ্র, ধরণীকে টানিতেছেন, ধরণীও চন্দ্রকে টানিতেছেন। টানাটানি চলিতেছে বটে, কিন্তু পরস্পরে ছুঁয়াছুঁয়ি নাই। কেবল দুজনে পরস্পরে ২৪ ঘণ্টা টানাটানি করিয়া রবিকে প্রদক্ষিণ করিতেছেন। দুজনেই বলিয়া দিতেছেন—এ জগতের মূল রহস্য—টানাটানি।

দ্যুলোক ছাড়িয়া ভূলোকের প্রতি দৃষ্টি দাও, দেখিবে সকল বিষয়ে—সকল কাজেই টানাটানির লীলা চলিতেছে। ধাত্রী টানাটানি করিয়া জননীজঠর হইতে বাহির করিতেছেন। আর অন্তে টানাটানি করিয়া, 'বল হরি! হরি বোল' বলিয়া চিতায় চড়াইয়া দিতেছে। এই আদি ও অন্তে টানাটানির মধ্যে সকল দিকেই যে টানাটানির অনন্ত খেলা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতেই বুঝা যায় যে, এ জগতের মূল রহস্য টানাটানি। সাহিত্য-সংহিতার সম্পাদক মূল রহস্যটা ভাল বুঝেন বলিয়াই আমাকে লইয়া টানাটানি করিতে-ছেন। কিন্তু তিনি বড় ভুল করিতেছেন।

আর একটী কথা—এখন কাল ফিরি-য়াছে, সে দিন আর নাই। এখন বঙ্গীয় সাহিত্য-সংসারে একদিকে 'সাহিত্যরথী,' 'সাহিত্য-মহারথী,' 'সাহিত্য-অতিরথী' দেখা দিয়াছেন, আর এক দিকে 'সাহিত্য-রায় সাহেব,' 'সাহিত্য রায় বাহাদুর,' 'সাহিত্য-রাজা' এবং 'সাহিত্য-মহারাজ' প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন, আবার অন্যদিকে 'কাব্যকুঞ্জ-পিকবর,' 'কবিকুলবোদয়,' 'কবিকমলীধর' ও 'কবি-সম্রাট' দেখা দিয়াছেন। মধ্যে মধ্যে দুই একটী 'কবি খাঁ সাহেব' দেখা

দিয়াছেন। ইহার মধ্যে কেহ কেহ কবিরূপেই জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া প্রমাণ। যেমন বীরশ্রেষ্ঠ কপিরাজ, জন্মগ্রহণ করিয়াই রবিকে ধরিতে ধাবমান হইয়াছিলেন, সেইমত কোন কবি জন্মিয়াই রবির ন্যায় প্রজ্বলিত কিরণানলে বঙ্গভাষাকে জ্বালাইতেছেন। এতদ্ব্যতীত এখন অলি গলিতে গ্রামে গোঠে—মাটে ঘাটে সাহিত্যসেবী লেখক কবি বিদ্যমান। বঙ্গভাষার এখন স্বর্ণযুগ। এত লোক থাকিতে সাহিত্য-সংহিতার সম্পাদক আমাকে ধরিয়া টানা-টানি করিতেছেন, এইটাই তাঁহার মহা ভুল।

আমরা সেকেলে লোক—অকর্ম্মণ্য। কর্ম্মঠই বা কবে ছিলাম? বঙ্গ ভারতীর সেকালের বরপুত্রগণের মধ্যে এখন আছেন একমাত্র—বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকার। চুঁচুড়ার কদমতলায় এখন হেলায় জীবনের শেষ ভাগটা কাটাইতেছেন। আর সকলেই একে একে বৈজয়ন্ত ধামে প্রস্থান করিয়াছেন। অক্ষয় বাবু বিদ্যার Dreadnought, বুদ্ধির Sub Marine Boat, জ্ঞানের Torpedo Destroyer কিন্তু আলস্যের গাধা-বোট। আগু পাছু দুইখানা লঞ্চ টানিলে ও ঠেলিলে তবে ঘণ্টায় দশ হাত চলেন। যদি এই আলস্য না থাকিত, তাহা হইলে আজ তাঁহার দ্বারা বঙ্গ ভারতী প্রাণমনোমুগ্ধকর অনুপ রত্নহারে সুশোভিতা হইয়া বাঙ্গালী জাতির গৌরব বৃদ্ধি করিতেন।

যখন অক্ষয় বাবু স্বনামী বেনামীতে বঙ্গদর্শনে প্রবন্ধ লিখিতেন, তখন তাহা পাঠ করিয়া আমরা পুলকিত হইতাম। সে এক একটী প্রবন্ধ—অমূল্য। এমন কি বঙ্কিম বাবু, বলিখিত কমলাকান্তের দপ্তরের মধ্যে অক্ষয় বাবুর প্রবন্ধ সংযোজিত করিয়া আনন্দ উপভোগ করিয়াছেন। লোকে ভাবিত তাহা বঙ্কিম বাবুর লেখনীপ্রসূত। পরে প্রকাশ হইল তাহা অক্ষয় বাবুর রচনা। এখন হঠাৎ একটা বহুদিনের কথা মনে পড়িল। যেদিন প্রকাশ হইল যে অক্ষয় বাবুর সাধারণীর নিজের যম হইয়াছে, সে দিন মনে মনে অক্ষয় বাবুকে ভাগ্যবান বলিয়া আনন্দিত হইয়াছিলাম। আর অমৃতবাজার পত্রিকাও সে দিন সাধারণীর যম হইয়াছে বলিয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

সাধারণীর লীলা খেলা শেষ হইলে, অক্ষয় বাবু নবজীবন লইয়া সাহিত্য-ক্ষেত্রে দেখা দেন। সেই নবজীবন বঙ্গসাহিত্যকে নবজীবন দান করিয়াছিল, ইতিহাস ইহা বলিয়া দিবে। আবার বলি সেকালের মধ্যে আছেন কেবল অক্ষয় বাবু। না, আমার ভুল হইয়াছে, আর একজন আছেন—'তারা মা'—শ্রীযুক্ত তারাকুমার কবিরত্ন মহাশয়। কবিরত্ন মহাশয় নিজের কবিত্ব শক্তিতে মাতৃ ভাষাকে যেমন অনেকগুলি অলঙ্কার পরাইয়াছেন, সেইমত আর এক শ্রেণীর 'কবি' সৃষ্টি করিয়াছেন। যে সকল যুবতী ও প্রৌঢ়া বঙ্গরমণী আজ কাল গ্রন্থকর্ত্রী রূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই কবিরত্ন মহাশয়ের ছাত্রী। কবিরত্ন মহাশয়ের সাহায্য, যত্ন ও উৎসাহই তাঁহাদিগের খ্যাতি লাভের মূল কারণ। কবিরত্ন মহাশয় তাঁহার ছাত্রী ও পাঠিকাদিগের দত্ত 'বড়ী' খাইয়া এখন বামাবোধিনীতে আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন। শক্ত ভাঙ্গা বড়ী খাইবার দন্ত এখনও তাঁহার আছে!

আবার বলি, সাহিত্য-সংহিতা-সম্পাদক আমাকে ধরিয়া টানাটানি করিয়া ভাল করেন নাই। কারণ বঙ্গ সাহিত্যের সহিত আমার স্থায়ী সম্বন্ধ কিছুই নাই। তবে

এক সময়ে—সে বহু বর্ষ পূর্ব্বে সম্বন্ধের উপক্রম হইয়াছিল বটে। সে সময়ে 'গ্রন্থকার' হইবার বড় সাধ হইয়াছিল, তখন সবে মাত্র শিক্ষা সমাপ্ত করিয়াছি। সেই সাধ পূর্ণ করিবার জন্য আমার মস্তিষ্কটাকে অনেক টোকাটুকি দিয়া, কল্পনাকে খেদাইয়া তাড়াইয়া, লেখনীকে (তখন ষ্টিলপেন ছিল না খাকের কলম) টিপিয়া টিপিয়া, সকালি দোয়াতকে হেলাইয়া দুলাইয়া এক গ্রন্থ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। সেই গ্রন্থ খানি শেষ করিতে, দুই বৎসর ৯ মাস, ২৯ দিন, ২৩ ঘণ্টা, ১৩ মিনিট ৭॥০ সেকেণ্ড লাগিয়াছিল।

যে মধ্য-রজনীতে গ্রন্থখানির রচনা শেষ হয়, সেই মধ্যরজনী আমার জীবনের চিরস্মরণীয় রজনী। গ্রন্থ সমাপ্তিতে হৃদয় সাগরে আনন্দের বীচিমালা উত্তাল তরঙ্গ বিস্তার করিয়া রঙ্গে ভঙ্গে নাচিতে লাগিল। ভাবিলাম এইবার কেল্লা ফতে হইল—বঙ্গ ভাষার মাথায় এইবার কহিনুর বসাইলাম। তখন মনে হইল, এই গ্রন্থ বাহির হইলেই আমার নামটা বঙ্গ বিহার উড়িষ্যার প্রত্যেক গ্রামে গ্রামে জাহির হইবে। বঙ্কিম বাবু ও দীনবন্ধু বাবুর গৌরব-জ্যোতিটাও নিশ্চয়ই এইবার ম্লান হইয়া পড়িবে।

সেই মধ্য-রজনীতে আমি আত্মহারা। যেমন উঠিতে যাইব, অমনি আমার হাত লাগিয়া ডেস্কের উপর হইতে (তখন টেবিল চেয়ার ব্যবহার প্রচলিত হয় নাই) জলের গেলাসটী মেজেতে পড়িয়া গিয়া ঝনাৎ করিয়া শব্দ করিল। (এখানে বলিয়া রাখি, গ্রন্থ রচনা করিবার সময় কণ্ঠনালী শুষ্ক হইয়া যাইত, কাজেই মধ্যে মধ্যে জল খাইতে হইত।) গেলাসের সেই পতন-শব্দে নিদ্রিতা গৃহিণী জাগিয়া উঠিলেন।

গৃহিণী সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ব্যাপার খানা কি?' আনন্দে উত্তর দিলাম—'ব্যাপার ভাল, বইখানা লেখা আজ শেষ হইল।'

গৃহিণী জানিতেন না যে, আমি গ্রন্থ রচনা করিতেছি এবং এই গ্রন্থ দ্বারাই বিশ্বব্যাপী গৌরব লাভ করিব।

তিনি সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'কি বই?— নাম কি?'

গ্রন্থের খাতা খানি দেখাইয়া সগর্ব্বে বলিলাম—'এ বইয়ের নাম মেয়ে মানুষের মাথায় টিকি।'

শুনিয়াই গৃহিণী হাসিয়া গড়াইতে গড়াইতে শয্যা হইতে মেজেতে পড়িয়া গেলেন। তাঁহার পতন শব্দে খুকুমণি জাগিয়া কাঁদিয়া উঠিল। আমি তখন আনন্দে আত্মহারা, সে দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই।

যে সাহারার ন্যায় উর্ব্বর মস্তিষ্করূপ জমিতে এমত উৎকৃষ্ট গ্রন্থ জন্মিয়াছে, সেই মস্তিষ্ককে শীতল করিবার জন্য সদরে ধূম পান করিতে যাইলাম। ফিরিয়া আসিয়া দেখি, ও হরি! গৃহিণী সেই মেয়ে মানুষের মাথায় টিকি গ্রন্থ খানি প্রদীপে ধরাইয়া, তাহার উত্তাপে খুকুমণির দুধ তাতাইতেছেন!! কি সর্ব্বনাশ! মস্তকে যেন সহস্র বজ্র পড়িল—যেন সহস্র সর্প আমার প্রত্যেক ধমনীতে ভীষণ দংষ্ট্রা নির্গত করিয়া ছোবল মারিতে লাগিল! কাতর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'করিলে কি?'

উত্তর হইল—'অগ্নি-পরীক্ষা।'

'কি রকম?'

মধুর অধরে ভুবনমোহিনী হাসি হাসিয়া বলিলেন, 'অগ্নি-পরীক্ষায় তোমার টিকি টেঁকিতেছে না।'

তখন অনন্যোপায় হইয়া, ঋগ্বেদের মন্ত্রানুসারে অগ্নির স্তব করিতে বসিলাম।

'অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজম হোতারং রত্নধাতমম্।'

স্তবে তুষ্ট হইয়াই যেন অগ্নি আরও প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। আবার আরম্ভ করিলাম,—

"অগ্নিঃ পূর্ব্বেভির্ঋষিভিরীড্যো নূতনৈরুত।"

গৃহিণী ফুৎকার দিলেন, অগ্নি ভীষণ হইতে ভীষণতর মূর্ত্তি ধরিলেন। তখন মন্ত্র পড়িলাম,—

"স দেবা এং বক্ষতি।"

অমনি আমার এত সাধের গ্রন্থ খানি একেবারে ভস্মীভূত হইয়া গেল! বঙ্গ সাহিত্যের সহিত ইহাই আমার সম্বন্ধ সূত্রপাত। ইহাই প্রথম—ইহাই শেষ।

এখন হয়ত কোন কোন পাঠক জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, গ্রন্থখানিতে ছিল কি?

সে বহুকালের কথা। তাতে কি ছিল না ছিল বলা বড়ই কঠিন। তবে মোটামুটি বলিতে পারি। এখনকার লেখকেরা গ্রন্থারম্ভে মঙ্গলাচরণ বা দেবদেবীর বন্দনা লিখেন না, তখন সে প্রথা ছিল, কাজেই আমও তাহাই করিয়াছিলাম। তবে আমার নূতনত্বের মধ্যে এই যে আমি মূল দেবদেবীর বন্দনা না করিয়া তাঁহাদিগের বাহনগণের আরাধনা করিয়াছিলাম। গণেশ-বন্দনাস্থলে ইন্দুরকে বন্দনা করিয়াছিলাম। তাহার কয়েক ছত্র মাত্র মনে আছে,—

ইন্দুর! তোমার প্রভু গণেশ ঠাকুর।
হাঁদাপেটা ন্যাদারাম মুখে তাঁর শুঁড় ॥
ইট কাঠ কাট তুমি কুটুর কুটুর।
যাহা পাও তাহা কাট (ভাসুর শ্বশুর) ॥

এই ভাসুর শ্বশুর পাঠ করিয়া হাসিবেন না। সে সময়ে ছন্দ মিলাইতে পারি নাই বলিয়া প্যারাস্থিসের মধ্যে ভাসুর শ্বশুর বসাইয়াছিলাম। মনে করিয়াছিলাম যে প্রূপ সংশোধন কালে মিলাইয়া দিব। আর একটা কথা—এখনকার কবি-সম্রাটেরা এইমত করিয়া থাকেন। কারণ কবিদিগের যথেচ্ছ লিখিবার লাইসেন্স আছে যথা—

"ওগো আমার লক্ষী।
তুমি আমার ফক্কী।"

তার পর শিব-বন্দনা স্থলে বৃষভ-বন্দনা;—

হাড়সার বুড়া ষাঁড় মুখে নাই দাঁত।
এখন তখন বুঝি হবে কুঁপোকাত ॥
কৈলাস পাহাড়ময় নাহি তৃণ চাষ।
খাইতে নাহিক পাও এক মুঠা ঘাস ॥
তোমার ভায়ের শৃঙ্গ বাজান মহেশ।
কোন দিন তব শৃঙ্গ বাজাবেন শেষ ॥
তাই আমি দিইতেছি সাবধান করে।
ঐ শুন নন্দী ভৃঙ্গী বলে হরে হরে ॥

তার পর উপক্রমণিকা। উপক্রমণিকার কি ছিল জানেন?—বটতলার পাঁচনের ফর্দ্দ। সেই পাঁচনের ৩২ খানা মসলা মানুষের শরীরের ৩২ টা নড়ীর খবর রাখিত। আমি তাহারই বৈজ্ঞানিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, আদিদৈবিক এবং জৈবিক ব্যাখ্যা করিয়াছিলাম। সেই গ্রন্থ বাহির হইলে আমার ব্যাখ্যামত আপনারা সেই পাঁচন খাইলে, অমর ত হইতেনই তদ্ব্যতীত প্রত্যেকই এক একটী এক রকমের মূর্ত্তিমান কার্ত্তিক হইতেন। এ বলিতেন আমার দেখ ও বলিতেন আমার দেখ, স্বয়ম্বর-সভায় দময়ন্তী যেমন চারিদিকেই নলের মূর্ত্তি দেখিয়া ফাঁপরে পড়িয়াছিলেন, তেমনি এই পাঁচনপানকারী দেশময় সকল পুরুষকেই এক রকম কার্ত্তিক দেখিয়া তাঁহাদিগের গৃহিণীরাও মহাবিপদেই পড়িতেন। ইহা ভাবিয়াই বোধ হয় অগ্নিদেব আমার গ্রন্থ খানিকে উদরসাৎ করিয়াছেন।

ও হরি! আপনারা হাসিতেছেন! তবে আর নয়—এই খানেই ইতি করা যাক।

বাজে লোক

দুষ্মন্তের অনুতাপ

শেল সম হায়! কঠিন বচনে,
বিঁধেছি তাহার কোমল বুক।
আর কি পাইব সে অমূল্য ধনে?
দিয়াছি যাহারে অশেষ দুঃখ?
সজল নয়নে—লাজমাখা মুখে,
কত যে বলিল বিনয় করি।
পাষাণ হৃদয়, হলোনা বিকল,
শ্রবন না দিনু বচনে তারি।
লৌহ দ্রব হতো, সে বাণী শুনিলে—
হেরিলে আহা! সে বিষাদ মুখ
নির্ম্মম নিষ্ঠুর প্রত্যাখ্যানে হায়!
ভেঙ্গেছি তাহার স্বপন-সুখ!
স্মৃতির দুয়ার, খোলেনি তখন,—
এখন স্মৃতির তাড়নে মরি,—
অনুতাপানলে, জ্বলি অহরহ—
শয়নে স্বপনে তাহারে স্মরি।
রাজার মহিষী আহা! অভাগিনী—
হৃদয়ে বহিয়া নিরাশা-ভার!
দারুণ সন্তাপে, কোথা গেল চলি?
দেখিতে তাহারে পাব কি আর?
বনের প্রসূন, ছিল ফুল্ল মনে,
আমোদে কানন উজল করে।
আমিরে নিঠুর, পথের ধুলায়—
দিলাম ফেলিয়া ছিঁড়ি নখরে!
অযতনে হায়! গিয়াছে শুকায়ে,
হৃদয় রতন সুবর্ণ লতা
পাব কি তাহারে?—শুনিব কি আর
তাহার সে মুখে প্রণয় গাথা?
সিন্ধু পানে যথা, ধায় স্রোতস্বিনী,—
তেমনি মিলনে করিয়া আশা।
এসেছিল মরি স্বর্ণ বিহঙ্গিনী,
ভেঙ্গেছি তাহার সে সুখ-বাসা।
সহকার ভাবি সে নব বল্লরী,
আদরে জড়িত হইবে বলে।
নবীন উল্লাসে, কত সাধ করি
কানন ত্যজিয়ে এসেছে চলে—
আমিরে পাষাণ প্রত্যাখ্যান তারে,
করেছি দারুণ অবজ্ঞা ভরে!
সে অমূল্য ধন, কণ্ঠের রতন—
আর কি সে আছে ভব ভিতরে?
স্বরগ সুন্দরী মলিন ধরায়,
থাকিতে তাহার নাহিক স্থান।
ক্ষমা কর দেবী! চরণে তোমার,
উদ্দেশে ঢালিয়া দিলাম প্রাণ।

শ্রীমতী সরলাসুন্দরী মিত্র।

হয়েছে ত মিটিয়াছে সাধ

"হয়েছে ত!—মিটিয়াছে সাধ!"
অসীম সে অতীতের কোলে
মিশিয়াছে সুখের শর্ব্বরী;
তার পর হৃদয় মাঝারে
কত বজ্র পড়িছে ঝর্ঝরি।
সেই কথা!—তারপর কভু
হেরিনি সে বদন-চন্দ্রিমা;
স্বপনেও শুনেনি কখন
প্রেমের সে ভাষা মধুরিমা!
হৃদয় আকাশে কাল মেঘ
ঝরে যবে গভীর ঝর্ঝরে,
ফুটে উঠে অতীতের স্মৃতি,
ক্লেদ মুছি হৃদয় মর্ম্মরে।
জীবনের "ফনোগ্রাফে" যদি
পড়িত সে মধুর ঝঙ্কার
তাহলেরে পশিত না বুকে
হতাশের গম্ভীর হুঙ্কার।
আজি এই অসময় ঘোর
তবু মনে জাগে সারা রাত
অতীতের গত সেই কথা,—
"হয়েছে ত!—মিটিয়াছে সাধ!"
ছায়ারূপে তিলেকের দেখা যদি পাই
এত জ্বালা অভিযোগ সব ভুলে যাই।

শ্রীজগৎপ্রসন্ন রায়

সাহিত্য-সংহিতা।

দ্বাদশ খণ্ড] ১৩১৮ সাল, ফাল্গুন ও চৈত্র। [১১শ ও ১২শ সংখ্যা।

প্রাচীন ভারতের আহার-প্রণালী ও খ

প্রাচীন ভারতের আহার-প্রণালী এবং খাদ্যাখাদ্য সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। এই আলোচনা সূত্রে আমরা জানিতে পারিব যে, পূজ্য আর্য্য ঋষিগণ এ সম্বন্ধে কিরূপ বিধি-ব্যবস্থার সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। এবং ইহাও আমরা বিদিত হইতে পারিব যে, প্রাচীন আহার-প্রণালীর ও খাদ্যাখাদ্যের সহিত বর্ত্তমান আহার-প্রণালী ও খাদ্যাখাদ্যের মিল আছে কি না?—কোনরূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছে কি না?

'ভারতবর্ষ' নাম সৃষ্টির পূর্ব্বকার সময়ের তথ্য গুলি অগ্রে সংগ্রহ করা প্রয়োজন—সে সময়টী কৃতযুগ। সেই কৃতযুগের কথা জানিতে হইলে, আমাদিগকে বেদের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। ঋকাদি বেদ চতুষ্টয় প্রথম অবলম্বনীয় হইলেও আমরা এস্থলে বেদের ন্যায় ব্রাহ্মণ-আরণ্যকাদি বেদাঙ্গ এবং উপনিষদাদি বেদান্তকেও অবলম্বন করা কর্ত্তব্য বোধ করি। বেদ, বেদাঙ্গ এবং বেদান্ত, এই তিনটী আমাদিগের আলোচনার পক্ষে কি সহায়তা করিতে পারে, তাহা প্রথমেই দেখা যাউক।

আহারের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আমরা বেদান্তে দেখিতে পাইতেছি,—

'১১। খাদ্যই আত্মার মহোচ্চ মূর্ত্তি, কারণ এই প্রাণ, আহারের দ্বারাই রক্ষিত হয়। যদি আহার না করে, অনুভব করিতে, শ্রবণ করিতে, স্পর্শ করিতে, দর্শন করিতে, আঘ্রাণ করিতে এবং স্বাদ গ্রহণ করিতে সক্ষম হয় না, এবং ইহার মূল শক্তি নষ্ট হইয়া যায়। এই জন্যই বলা হইয়াছে,—

প্রাণ যদি আহার করে, তাহা হইলে মূল শক্তি পূর্ণরূপে অধিকার করে; ইহা অনুভব করিতে, শ্রবণ করিতে, স্পর্শ করিতে, কথা কহিতে, স্বাদ গ্রহণ করিতে, আঘ্রাণ করিতে এবং দর্শন করিতে সক্ষম হয়। এবং আরও বলা হইয়াছে,—

এ জগতের সমস্ত জীব, খাদ্য হইতে উৎপন্ন; তাহারা পরে খাদ্য দ্বারা জীবিত থাকে, এবং অন্তিমে (যখন তাহারা মৃত্যু মুখে পতিত হয়) তাহারা পুনরায় সেই খাদ্যে পরিণত হয়

১২। এবং এই জন্যই অন্যত্র বলা হইয়াছে,—বাস্তবিক এই সমস্ত জীব দিবারজনী আহারান্বেষণে ঘুরিতেছে। সূর্য্য স্বীয় কিরণ-রাজীর দ্বারা খাদ্য গ্রহণ করিতেছেন। বায়ুতে আহার্য্য প্রদান করিলে, তিনি তাহা আহার করেন। অগ্নি খাদ্য দ্বারা প্রজ্জলিত হন। এবং ব্রহ্মা (প্রজাপতি) খাদ্য ইচ্ছা করিয়াই এই সমস্ত সৃষ্টি করিয়াছেন। কারণ বলা হইয়াছে,—

খাদ্য হইতে জীব সকল সৃষ্ট; তাহারা সৃষ্ট হইলে খাদ্য দ্বারা বর্দ্ধিত হয়, কারণ তাহারা আহার করে এবং তাহারা জীবকে আহার করে, সেই জন্য ইহার নাম অন্ন।

১৩। এবং অন্যত্র বলা হইয়াছে,— এই অন্ন পূত বিষ্ণুর শরীরস্বরূপ—বিশ্বভুৎ (বিশ্বরক্ষক) নামে অভিহিত। প্রাণই অন্নের সার, প্রাণের মন, মনের জ্ঞান, জ্ঞানের আনন্দ। যিনি অন্নের এই সকল শক্তি জ্ঞাত হন, তিনি অন্ন, প্রাণ, মন, জ্ঞান এবং আনন্দ প্রাপ্ত হন।' মৈত্রায়ণ-ব্রাহ্মণ-উপনিষৎ, ৭ম পাঠক।

এই স্থলে আমরা ছান্দোগ্য উপনিষৎ হইতে এই অন্ন সম্বন্ধীয় উক্তি নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি,—

'অন্ন, শক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; সেই জন্যই যদি কোন মনুষ্য, দশ দিন অনাহারে অবস্থান করে তাহা হইলে, সে জীবিত থাকিতে পারে বটে, কিন্তু দর্শন করিতে, শ্রবণ করিতে, চিন্তা করিতে, কার্য্য করিতে. কোন কিছু বুঝিতে সমর্থ হয় না। কিন্তু সে অন্ন প্রাপ্ত হইলে, শ্রবণ করিতে, দর্শন করিতে, চিন্তা করিতে, কার্য্য করিতে এবং সমস্ত বুঝিতে সমর্থ হয়।

যিনি অন্নকে ব্রহ্মস্বরূপে চিন্তা করেন, তিনি এ জগতে প্রচুর অন্ন এবং পানীয় প্রাপ্ত হন। যিনি অন্নকে ব্রহ্ম জ্ঞান করেন, তিনি অন্ন সম্বন্ধে প্রভু স্বরূপ (অন্নদাতা) হন।' ছান্দোগ্য উপনিষদ্, ৭ প্রপাঠক, ৯ খণ্ড।

আমরা উপরে দুইখানি উপনিষদ্ হইতে যাহা উদ্ধৃত করিলাম, পাঠকগণ তৎপাঠে জানিতে পারিলেন যে, আর্য্য ঋষিগণ. যুগ যুগান্তর পূর্ব্বে বলিয়া গিয়াছেন, মূল শক্তি অপেক্ষা অন্ন শ্রেষ্ঠ। জীব মাত্রেরই আহারের প্রয়োজন। আহার না করিলে জীবের শক্তি বিনষ্ট হয়। তাঁহারা আরও বলিয়াছেন যে অন্নই ব্রহ্ম। যাঁহারা অন্নকে ব্রহ্ম স্বরূপ জ্ঞান করেন, তাহারা অন্নদানের অধিকারী হন।

অন্ন ব্রহ্মস্বরূপ, এই কথাটী এখনকার শিক্ষিতগণের পক্ষে বিচিত্র বোধ হইতে পারে, কিন্তু আর্য্যধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞদিগের নিকট এই কথাটী অভ্রান্ত সত্যরূপে গণ্য।

আর একটী কথা—ঋষিদিগের উক্তি— খাদ্য হইতে সমস্ত জীবের উৎপত্তি; খাদ্য দ্বারাই সমস্ত জীব জীবিত থাকে এবং মৃত্যুর পর তাহারা আবার খাদ্যে পরিণত হয়। কিন্তু এই খাদ্য হইতে জীবের উৎপত্তি এবং মরণের পর পুনরায় জীবের খাদ্যে পরিণতি, একথা এক্ষণে সাধারণের সহজে বোধগম্য নহে। কিন্তু বিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিলে এই ঋষিবাক্য যে সত্য, তাহা ধর্ম্মতত্ত্বজিজ্ঞাসু ব্যক্তিগণ সহজেই বুঝিতে পারিবেন।

আহারের প্রয়োজনীয়তা এবং খাদ্য সম্বন্ধে ঋষিদিগের অভিমত জানিতে পারিলাম। এখন দেখা যাউক, কাহাদিগের পক্ষে কয়বার আহারের বিধি ব্যবস্থা আছে,—

'একদা সৃষ্ট জীব সমূহ প্রজাপতির নিকট গমন করিয়া বলিল, "আমরা কিরূপে জীবন ধারণ করিব তাহার বিধান করুন।"

দেবগণ যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়া, দক্ষিণ জানু অগ্রে পাতিত করিয়া প্রজাপতির সমক্ষে উপনীত হইলেন। প্রজাপতি তাঁহাদিগকে বলিলেন,—"যজ্ঞাগ্রভাগই আপনাদিগের ভক্ষ্য। অমৃত আপনাদিগের পানীয়, এবং সূর্য্য আপনাদের আলোক।"

পিতৃগণ দক্ষিণস্কন্ধে উপবীত ধারণ করিয়া বামজানু পাতিত করিয়া নিকটস্থ হইলে, প্রজাপতি তাহাদিগকে বলিলেন, "তোমরা প্রতিমাসে এক বার করিয়া আহার করিবে। তোমাদিগের পানীয় স্বধা, এবং চন্দ্র তোমাদিগের আলোক।"

মানবগণ বেশাদি পরিধান করিয়া,

প্রণতদেহে প্রজাপতির নিকট উপনীত হইল। তাহাদিগকে তিনি বলিলেন, "তোমরা অপরাহ্ণে এবং প্রাতঃকালে দুই বার মাত্র আহার করিবে। অগ্নি তোমাদিগের আলোক।"

পশুসকল তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইল। তিনি তাহাদিগের নিজের প্রার্থনা গ্রাহ্য করিলেন। বলিলেন—"সময়ে বা অসময়ে যে কোন স্থানে তোমরা যখন যে খাদ্যদ্রব্য প্রাপ্ত হইবে, তাহাই আহার করিবে।" এই জন্যই পশুগণ যে স্থানে যে কিছু আহার্য্য প্রাপ্ত হইবেই আহার করে।

দেবগণ, পিতৃগণ এবং পশুগণ উক্ত বিধি লঙ্ঘন করেন নাই, কিন্তু মনুষ্যদিগের মধ্যে অনেকে এই বিধি লঙ্ঘন করিয়াছে।'—শতপথ ব্রাহ্মণ, ২।৪।২।

আহারের নাম আত্মযজ্ঞ। সেই আত্মযজ্ঞ সম্বন্ধীয় নিম্নলিখিত বিধিটী আমাদিগের অগ্রে পঠনীয়,—

'প্রথমত অন্নের চারিদিকে জলধারা দিয়া গণ্ডূষ করিবেন। পরে "প্রাণায় স্বাহা, অপানায় স্বাহা, ব্যানায় স্বাহা, সমানায় স্বাহা, উদানায় স্বাহা" মন্ত্র পাঁচ বার (মুখমধ্যস্থ অগ্নিতে) প্রদান করিবেন। তাহার পরে নীরবে আহার করিবেন। আহার সমাপ্ত হইলে, পাত্রের চারিদিকে পুনরায় জলধারা দিয়া গণ্ডূষ করিবেন।' মৈত্রায়ণ-ব্রাহ্মণ-উপনিষদ্, ৬ প্রপাঠক।

উক্ত প্রাচীন বিধিটী এখনও সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণরূপে প্রচলিত রহিয়াছে।

অন্নের চারিদিকে কেন জলধারা দেওয়া হয়, এসম্বন্ধে প্রকাশ,—

'তিনি (অন্ন) বলিলেন, "আমার বেশ কি হইবে?" তাঁহারা উত্তর করিলেন,—"জল।" এই জন্য বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ আহারের পূর্ব্বে এবং পরে পাত্রের চারিদিকে জলধারা প্রদান করেন।' ছান্দোগ্যোপনিষদ্, ৫ প্রপাঠক।

আহারের পর নিম্নলিখিত বিধি পালনীয়,—

'আত্মযজ্ঞের পর মুখ হস্ত প্রক্ষালন পূর্ব্বক আত্মাসম্বন্ধে নিম্নলিখিত দুইটী মন্ত্রে চিন্তা করিবে,—"পরমাত্মা, যিনি সর্ব্বরক্ষক, তিনি শ্বাসস্বরূপ, অগ্নিস্বরূপ, পঞ্চ প্রাণবায়ু-স্বরূপ, শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া, নিজে পরিপুষ্ট হউন, সকলকে পরিপুষ্ট করুন।"—"তুমি বিশ্ব, তুমি বৈশ্বানর, প্রত্যেক সৃষ্ট জীব তোমার দ্বারা জীবিত, সমস্তই তোমাতে প্রবিষ্ট হউক, তুমি সকলকে অমরত্ব দান কর, সেই জন্যই সকল জীব জীবিত থাকে।" যে ব্যক্তি এই বিধানমত আহার করে, সে অপরের আহার্য্য হয় না।' মৈত্রায়ণ-ব্রাহ্মণ-উপনিষদ, ৬ প্রপাঠক।

উপরি উদ্ধৃত শেষ বিধিটী যে আর্য্য ধর্ম্মাবলম্বী মাত্রেরই মঙ্গলকর এবং পালনীয় তাহা বলা বাহুল্য।

এক্ষণে নিম্নে উদ্ধৃত কয়পংক্তির প্রতি পাঠকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা কর্ত্তব্য বোধ করিতেছি,—

'ইহা পরিত্যক্ত অন্নই হউক, পরিত্যক্ত অন্নদ্বারা উচ্ছিষ্ট হউক, পাপী ব্যক্তির দ্বারা প্রদত্ত অন্ন হউক, মৃতব্যক্তির নিকট হইতে আগত হউক, অথবা সদ্যপ্রসূতার নিকট হইতে আনীত অপবিত্র অন্নই হউক, বসু এবং অগ্নির পবিত্রতা-সাধন-শক্তি এবং সাবিতার কিরণ ইহা পবিত্র করুন এবং আমার সমস্ত পাপ বিনাশ করুন।' মৈত্রায়ণ-ব্রাহ্মণ-উপনিষদ্, ৬ প্রপাঠক।

উক্ত মন্ত্রপাঠ দ্বারা আমরা বুঝিতেছি যে, অন্ন উচ্ছিষ্ট ও অপবিত্র হইলে, সেই অপবিত্রতা দোষ নিবারণ জন্য আহারের পূর্ব্বে উক্ত মন্ত্র পাঠ করা হইত।

উপরে যাহা উদ্ধৃত হইল, তাহাতে আহারের প্রয়োজনীয়তা এবং আহার-প্রণালী সম্বন্ধে আমরা অনেকটা জানিতে পারিলাম। এক্ষণে খাদ্য সম্বন্ধে কি কি জানিতে পারা যায়, তাহার একটু আলোচনা করা যাউক।

প্রথমেই মনে এই প্রশ্নের উদয় হয় যে, তৎকালে কৃষিকার্য্য প্রচলিত ছিল কি না, এবং মনুষ্যের আহার্য্য শস্য উৎপন্ন হইত কি না? মূল ঋগ্বেদই এই প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া দিতেছে। সেই ঋগ্বেদ হইতে নিম্নে কয়েকটী প্রমাণ উদ্ধৃত হইল,—

'কৃষক যেমন গো দ্বারা বারম্বার যবের চাষ করিয়া থাকে।' ঋগ্বেদ, ১ম মণ্ডল, ২ সূক্ত, ১৫ ঋক।

'তোমরা হলদ্বারা যব কর্ষণ করিতেছ।' ঋগ্বেদ, ৮ ম মণ্ডল. ২২ সূক্ত, ৬ ঋক।

'যেরূপ কৃষক ধান্য মর্দ্দন করিবার সময় পুরাতন ধান্যস্তম্ভ অনায়াসেই মর্দ্দন করে।' ঋগ্বেদ, ১০ম মণ্ডল, ৪৮ সূক্ত, ৭ ঋক।

'যেমন যবের মরাই হইতে যব বাহির করে।' ঋগ্বেদ, ১০ম মণ্ডল, ৬৮ সূক্ত, ৩ ঋক।

উক্ত চারিটী প্রমাণে আমরা জানিতে পারিলাম যে, সে সময়ে কৃষি কার্য্য হইত এবং তাহাতে যব উৎপন্ন হইত।

এই কৃষিকার্য্য কালেও যজ্ঞের অনুষ্ঠান হইত। আমরা সেই যজ্ঞের মন্ত্রটী এই স্থানে উদ্ধৃত করা আবশ্যক বোধ করিতেছি, কারণ এতৎপাঠে পাঠকগণ সে কালের কৃষি-কার্য্যের অনেক তথ্য জানিতে পারিবেন।

'আমরা মিত্রস্বরূপ ক্ষেত্রপতির সহিত ক্ষেত্র জয় করিব। তিনি আমাদিগের গো ও অশ্বের পুষ্টসাধন করুন।

হে ক্ষেত্রপতি! ধেনু যেমন দুগ্ধ দান করে, সেইমত মধুস্রাবী সুপূত ঘৃতের ন্যায় মাধুর্য্যোপেত এবং প্রচুর জল প্রদান কর। এই যজ্ঞের অধিপতিগণ আমাদিগকে সুখান্বিত করুন।

ওষধি সমূহ (যবাদি) আমাদিগের নিমিত্ত মধুময় হউক, দ্যুলোক সমূহ, জল সমূহ ও অন্তরীক্ষ আমাদিগের জন্য মধুমাখা হউক, এবং ক্ষেত্রপতি আমাদিগের জন্য মধুযুক্ত হউন, আমরা অহিংসিত হইয়া তাঁহার অনুসরণ করিব।

বলীবর্দ্দ সমূহ সুখে বহন করুক, নরগণ সুখে কার্য্য করুক, লাঙ্গল সুখে কর্ষণ করুক, প্রগ্রহ সমূহ সুখে বদ্ধ হউক, এবং প্রতোদ সুখে প্রেরণ কর।

হে শুন!—হে শীর! তোমরা আমাদিগের এই স্তোত্র গ্রহণ কর। তোমরা দ্যুলোকে যে জল সৃষ্টি করিয়াছ, তদ্দারা এই পৃথিবীকে সিক্ত কর।

হে সৌভাগ্যশালিনী সীতা! (লাঙ্গল) তুমি অগ্রবর্ত্তিনী হও, আমরা তোমার কামনা করিতেছি. তুমি আমাদিগকে সুন্দর ধন ও সুফল প্রদান কর।

ইন্দ্র, সীতাকে গ্রহণ করুন, পূষা তাহাকে পরিচালিত করুন, তিনি জলময়ী হইয়া বর্ষে বর্ষে শস্য দোহন করুন।

ফালসকল ভূমি কর্ষণ করুক, রক্ষকগণ বলীবর্দ্দের সহিত সুখে গমন করুক, পর্জ্জন্য মধুর জলদ্বারা পৃথিবীকে সিক্ত করুন। হে শুন!—হে শীর! আমাদিগকে সুখ প্রদান কর।'—ঋগ্বেদ ৪র্থ মণ্ডল, ৫৭ সূক্ত।

নিম্নে উদ্ধৃত সূক্তটী কৃষিকার্য্য সম্বন্ধীয় আরও অনেক তথ্য জ্ঞাপন করিতেছে,—

'হে সখাগণ! একমন হইয়া জাগরূক হও, অনেকে একস্থানবর্ত্তী হইয়া অগ্নিকে প্রজ্বলিত কর। দধিক্রা এবং উষাদেবী ও ইন্দ্রকে রক্ষা কামনায় আহ্বান করিতেছি।

গম্ভীরস্বরে স্তব কর, অরিত্র সহযোগে পরপারে উত্তীর্ণ হওয়া যায়, এরূপ নৌকা প্রস্তুত কর; অস্ত্র সকল শাণিত ও শোভিত কর, হে সখাগণ! উৎকৃষ্ট যজ্ঞের অনুষ্ঠান কর।

লাঙ্গলগুলি যোজনা কর, যুগগুলি বিস্তারিত কর। এইস্থানে যে ক্ষেত্র প্রস্তুত করা হইয়াছে, তাহাতে বীজ বপন কর। আমাদিগের স্তবের সহিত আমাদিগের অন্ন পরিপূর্ণ হউক। সৃণিগুলি (কাস্তে) নিকটবর্ত্তী শস্যে পতিত হউক।

লাঙ্গল যোজিত হইতেছে, কর্ম্মকারগণ যুগ সমস্ত পৃথক করিতেছে, ব্রাহ্মণগণ সুন্দর স্তব পাঠ করিতেছেন।

পশুদিগের জলপান-স্থান প্রস্তুত কর। বরত্রা (চর্ম্মরজ্জু) যোজনা কর; এই উদ্রিক্ত অক্ষয় ও সৌকর্য্যযুক্ত গর্ত্ত হইতে জল সেচন কর।

পশুদিগের জলপান-স্থান প্রস্তুত হইয়াছে; এই উদ্রিক্ত অক্ষয় জলপূর্ণ গর্ত্তে সুন্দর চর্ম্মরজ্জু বিদ্যমান আছে, অক্লেশে জল সেচন করা যায়, ইহা হইতে জল সেচন কর।

ঘোটকদিগকে পরিতৃপ্ত কর; ক্ষেত্রে সংস্থাপিত ধান্য গ্রহণ কর, নিরুপদ্রবে বহন করিতে পারে, এতাদৃশ রথ প্রস্তুত কর। এই জলপূর্ণ পশুদিগের পানীয় জলাধার এক দ্রোণ প্রমাণ হইবে। ইহাতে প্রস্তর নির্ম্মিত চক্র আছে। আর মনুষ্য দিগের পানোপযোগী জলাধার স্কন্দ পরিমিত হইবেক। ইহা জলপূর্ণ কর।

গোষ্ঠ প্রস্তুত কর; সেইস্থানই মনুষ্যদিগের জলপান করিবার পক্ষে উপযুক্ত। বহুসংখ্যক স্থূল কবচ সীবন কর, দৃঢ়তর লৌহময় পাত্র নির্ম্মিত কর, চমস দৃঢ়ীভূত কর, ইহা হইতে যেন জল পরিস্রুত না হয়।

হে দেবগণ! তোমাদিগকে ধ্যান আবৃত্তি করিতেছি। অভিপ্রায় যে তোমরা রক্ষা কর। সেই ধ্যান যজ্ঞের উপযোগী। সেই ধ্যান তোমাদিগকে যজ্ঞভাগ প্রদান করে। যেমন তৃণ ভোজন করিয়া গাভী সহস্রধারায় দুগ্ধ দেয়, তদ্রূপ সেই ধ্যান যেন আমাদিগের অভিলাষ পূর্ণ করে।

কাষ্ঠময় পাত্রে সংস্থাপিত হরিৎবর্ণ সোমরসে দুগ্ধ সেক কর, প্রস্তরময় কুঠারদ্বারা পাত্র প্রস্তুত কর। দশ অঙ্গুলি দ্বারা পাত্রটী বেষ্টন পূর্ব্বক ধারণ কর। বহনকারী পশুকে রথের ধুরাতে যোজিত কর।

বহনকারী পশু রথের দুই ধুরা শব্দায়মান করিয়া বিচরণ করিতেছে, যেন দুই ভার্য্যার স্বামী রতিক্রিয়া করিতেছে। কাষ্ঠনির্ম্মিত শকটে ইহার কাষ্ঠময় আধারে আরোপণ কর। উত্তমরূপে সংস্থাপন কর, ইহার মূলদেশ যেন খনন করিও না অর্থাৎ শকট যেন আধারভ্রষ্ট না হয়।

হে কর্ম্মাধ্যক্ষগণ! এই ইন্দ্র সুখদাতা, ইঁহাকে সুখময় সোম দান কর, অন্ন দিবার জন্য ইঁহাকে প্রেরণ কর—অনুরোধ কর। সেই ইন্দ্র আদিতির পুত্র, তোমাদের সকলেরই সমান পীড়াভয় অতএব রক্ষার জন্য তাঁহাকে এখানে আহ্বান কর, তিনি সোমপান করিবেন।' ঋগ্বেদ, ১০ম মণ্ডল, ১০১ সূক্ত।

এক্ষণে অথর্ব্ববেদের নিম্নলিখিত মন্ত্রের প্রতি পাঠকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি,—

'হে শস্য! তোমার স্বশক্তিতে প্রচুর পরিমাণে পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠ, প্রত্যেক বীজ হইতে বহির্গত হও। স্বর্গের বিদ্যুৎ তোমাকে ধ্বংস করিবে না।

হে শস্যদেব! যখন আমরা তোমার নিকট প্রার্থনা করিতেছি এবং তুমি তাহা শ্রবণ করিতেছ, তখন তুমি আকাশের

ন্যায় সমুচ্চ হইয়া উঠ এবং সমুদ্রের ন্যায় অসীম হও।

যাহারা তোমার সেবায় নিযুক্ত আছে, তাহারা প্রচুর পরিমাণে লাভবান হউক; তুমি নিম্নে প্রচুর পরিমাণে একত্রীভূত হও। যাহারা তোমাকে উপহারস্বরূপ দেয়, তাহাদিগের শস্যভাণ্ডার অক্ষয় হউক, এবং যাহারা তোমাকে আহার করে, তাহারাও অবিনাশী হউক।' অথর্ব্ববেদ, ৬।১৪২।

সে সময়ে কয়প্রকার শস্য উৎপন্ন হইত, তাহা জানিবার জন্য কৌতূহল উপস্থিত হইতে পারে। সে সম্বন্ধে বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ বলিতেছেন,—

'গ্রাম্য শস্য দশবিধ যথা—ধান্য, ব্রীহি, যব, তিল, তিলমাষা, অনুপ্রিয়ঙ্গু, গোধুম, মসূর, খল্ব এবং খলকুল।' বৃহদারণ্যকোপনিষদ্, ৬।৪।

এপর্য্যন্ত যতদূর আলোচিত হইল, তাহাতে আমরা বিলক্ষণ জানিতে পারিলাম যে, সে সময়ে কৃষিকার্য্য প্রথা প্রচলিত ছিল এবং আর্য্যগণের আহার্য্য বিবিধপ্রকার শস্য উৎপাদিত হইত।

প্রাচীন আর্য্যগণ মাংসাহার করিতেন কি না, এক্ষণে সে সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা যাউক।

বেদের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন মন্ত্রে বিবিধ পশুবধের উল্লেখ দেখা যায়। আমরা কয়েকটী মাত্র প্রমাণ ঋগ্বেদ হইতে নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি,—

'ঋত্বিকগণ উৎসর্গার্থ ছাগ ধরিয়া লইয়া যাইতেছেন।'—ঋগ্বেদ, ১ম মণ্ডল ১৬২ সূক্ত, ১ ঋক।

'—ইন্দ্রের মিত্রভূত অগ্নি, স্বীয় বন্ধু ইন্দ্রের কার্য্যে সহায়তা করিবার জন্য সত্বর তিনশত মহিষ পাক করিলেন।' ঋগ্বেদ, ৫ম মণ্ডল, ২৯ সূক্ত, ৭ ঋক।

'—হে ইন্দ্র! যখন তুমি তিনশত মহিষের মাংস ভক্ষণ করিয়াছিলে।' ঋগ্বেদ ৪ম মণ্ডল, ২৯ সূক্ত, ৮ঋক।

'—বলশালী বৃষ ও ধেনুগণ তোমার নিকট পূর্ব্বোক্তরূপ হব্য হউক।"—ঋগ্বেদ, ৬ মণ্ডল, ১৬ সূক্ত, ৪৭ ঋক।

'—তোমার জন্য পূষা ও বিষ্ণু শত মহিষ পাক করুন।'—ঋগ্বেদ, ৬ মণ্ডল, ১৭ সূক্ত, ১১ ঋক।

'—তাহারা বৃষভ সমূহ পাক করে, তুমি তাহা ভোজন কর।'—ঋগ্বেদ, ১০ মণ্ডল, ২৮ সূক্ত, ৩ ঋক।

"—তোমার বৃষদিগকে ইন্দ্র ভক্ষণ করুন।' ঋগ্বেদ, ১০ মণ্ডল, ৮৬ সূক্ত, ১৩ ঋক।

'—যে অগ্নির উপর বিস্তর ঘোটক, বলবান বৃষ, পুরুষত্বহীন মেষ আহুতিরূপে অর্পণ করা হইয়াছে।'—ঋগ্বেদ, ১ মণ্ডল, ৯১ সূক্ত, ১৪ ঋক।

'—গাভীগণ আপনাদিগের শরীর দেবতাদিগের জন্য যজ্ঞে দিয়া থাকে।'—ঋগ্বেদ, ১০ মণ্ডল, ১৬৯ সূক্ত, ৩ ঋক।

'—যেরূপ গোহত্যা-স্থানে গাভীগণ হত হয়।'—ঋগ্বেদ, ১০ মণ্ডল, ৮৯ সূক্ত, ১৪ ঋক।

'—যাহারা চারিদিক হইতে অশ্বের পাক দর্শন করে, যাহারা বলে উহার গন্ধ মনোহর হইয়াছে, এখন নামাও এবং যাহারা মাংস ভিক্ষার জন্য অপেক্ষা করে, তাহাদিগের সঙ্কল্প আমাদেরই সঙ্কল্প হউক।' ঋগ্বেদ, ১ মণ্ডল, ১৬২ সূক্ত, ১২ ঋক।

বেদ হইতে যে কয়টী প্রমাণ উদ্ধৃত হইল, তৎপাঠে আমরা বিলক্ষণরূপে জানিতে পারিলাম যে, পুরাকালে আর্য্যজাতির মধ্যে ছাগ, মহিষ, বৃষ, গাভী এবং অশ্ব দেবোদ্দেশে যজ্ঞে বলি দেওয়া হইত, তাহা পাক করা হইত এবং আর্য্যগণ তাহা আহার করিতেন।

একক্ষণে বেদাঙ্গের প্রতি দৃষ্টি দান করা যাউক।

১ 'যজ্ঞে বলি প্রদত্ত পশুর কোন্ কোন্ অংশ কে কে পাইবেন, এক্ষণে তাহা বলিতেছি। দুইটী চোয়ালের অস্থি এবং জিহ্বা প্রস্তোতা পাইবেন। বক্ষস্থল উদ্গাতার প্রাপ্য। গলদেশ এবং তালু প্রতিহর্ত্তা, কটীর দক্ষিণদিগের নিম্নের অংশ হোতা, বাম অংশ ব্রহ্মা, দক্ষিণ উরু ব্রহ্মণাচ্ছংসী, স্কন্ধের দক্ষিণ দিক অধ্বর্য্যু, উহার বামদিক সামগায়কদিগের সহগমনকারী, বামস্কন্ধ প্রতিপ্রশস্তা, দক্ষিণ বাহুর নিম্নভাগ নেস্তা, বামবাহুর নিম্নাংশ পোতা, দক্ষিণ উরুর উপরাংশ অচ্ছাবাক, বাম অংশ অগ্নিধ্র, দক্ষিণ বাহুর উপরাংশ আত্রেয়, বাম অংশ সদস্য, মেরুদণ্ড এবং কোষ গৃহপতি (যজমান), দক্ষিণ পদ গৃহপতি (যিনি ভোজ দান করেন), বামপদ গৃহপত্নী (যিনি ভোজ দান করেন), উপরের ওষ্ঠ যজমান ও গৃহপত্নী উভয়েই পাইবেন। স্ত্রীদিগকে লাঙ্গুলটী দেওয়া হয়, তাঁহারা ইহা কোন ব্রাহ্মণকে দিবেন। গলার মাংসল অংশ এবং কোমলাস্থি গ্রাভস্তত, অপর তিনটি কোমলাস্থি এবং অর্দ্ধাংশ মাংসলখণ্ড উন্নেতা, অপর অর্দ্ধাংশ মাংসল খণ্ড পশুহননকারীকে দিবে কিন্তু সে যদি নিজে ব্রাহ্মণ না হয়, তবে ইহা কোন ব্রাহ্মণকে দিবে। মস্তক ও চর্ম্ম সুব্রহ্মণ্যকে দিবে।'—ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ৭।১।৭।

উপরে উদ্ধৃত বিধি দৃষ্টে প্রতীয়মান হইতেছে যে, যে সকল ব্রাহ্মণ ঋত্বিকরূপে যজ্ঞে নিযুক্ত হইতেন, তাঁহারাই বলিপ্রদত্ত পশুর উক্তরূপে নির্দ্দিষ্ট মাংস লাভ করিতেন। ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কোন বর্ণ তাহা পাইতেন না।

মাংসাহারের আর একটী প্রমাণ যথা,—

'রাজা এবং ব্রাহ্মণের জন্য লোকে বৃহৎ বৃষ এবং অজ পাক করে, কারণ নরলোকে অতিথিকে তাহা দিবার প্রথা আছে।' শতপথ ব্রাহ্মণ, ৩।৪।১।

উক্ত কথায় বুঝা যাইতেছে যে, ক্ষত্রিয় রাজা এবং ব্রাহ্মণ অতিথি উপস্থিত হইলে, তাহার সম্মান জন্য গোবধ করিয়া, তাহার মাংস পাকপূর্ব্বক অতিথিকে আহার করান হইত। উপরে দেখা গিয়াছে যে, ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কোন বর্ণ যজ্ঞে উৎসর্গীকৃত পশুর মাংস পাইতেন না। এখানে দেখা যাইতেছে যে, ক্ষত্রিয় রাজার সম্মান জন্য গোবধ করিয়া, তাহার মাংস সেই ক্ষত্রিয় রাজাকে আহার করিতে দেওয়া হইত। ক্ষত্রিয় রাজগণ গোমাংসাহারে অভ্যস্ত না হইলে, কখনই অতিথিরূপে তাহা আহার করিতেন না। সুতরাং আমরা স্থির করিতে পারি যে, ক্ষত্রিয় বর্ণের মধ্যেও মাংসাহার প্রথা প্রচলিত ছিল।

যখন ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় বর্ণের মধ্যে মাংসাহার প্রথা প্রচলিত ছিল, তখন বৈশ্য এবং শূদ্র বর্ণের মধ্যেও যে অবশ্য চলিত ছিল, তাহা সহজেই অনুমেয়। তাহার একটু আভাসও আমার পাইতেছি,—

'যেমন গোহত্যা-স্থানে গাভীগণ হত হয়।' ঋগ্বেদ ১০ম মণ্ডল,৮৯ সূক্ত, ১৪ ঋক।

উক্ত প্রমাণে জানা যাইতেছে যে, যজ্ঞস্থলে পশুবলি ব্যতীত সাধারণ গোহত্যা স্থানে গোবধ করা হইত। সেই হত গোমাংস অবশ্যই সাধারণে আহার করিত, এমত অনুমান অসঙ্গত নহে।

এক্ষণে প্রশ্ন উঠিতেছে যে, সে কালে আর্য্যজাতির মধ্যে মাংসাহারের ন্যায় মৎস্যাহার-প্রথা প্রচলিত ছিল কি না? এতৎসম্বন্ধেও একটু আভাস পাইতেছি।

'ধীবরগণ যেমন মৎস্য ধৃত করে, আমি

সেইমত তাহাদিগের মস্তক একত্রিত করিতেছি।' অথর্ববেদ, ১০।৪।১৯।

যখন সেকালে ধীবর ছিল, এবং তাহারা মৎস্য ধৃত করিত, তখন সহজেই বলা যাইতে পারে যে, তখন মৎস্যাহারও প্রচলিত ছিল।

এখনকার অনেকের ধারণা যে, প্রাচীন আর্য্যগণ যজ্ঞস্থলে গবাদি পশু হনন করিতেন বটে, কিন্তু তাঁহারা মন্ত্রবলে সেই নিহত পশুদিগকে পুনর্জীবিত করিতেন। এই উক্তি সত্য হইলে বড়ই সুখের বিষয় হইত, কিন্তু বেদের কুত্রাপি এই উক্তির অনুকূল প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

বেদ, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক এবং উপনিষৎ অবলম্বনে আমরা এতক্ষণ আলোচ্য বিষয়ের তথ্য এবং সত্যগুলির উদ্ধার করিলাম। এক্ষণে কল্পসূত্রগুলি আমাদিগের অবলম্বনীয়। এই কল্পসূত্রগুলি বিভিন্ন ঋষি-প্রণীত এবং তাহার সংখ্যাও অনেক। কল্পসূত্রগুলির বিধি-ব্যবস্থানিচয় বিশদভাবে সংগ্রথিত। এবং এই কল্পসূত্রানুসারেই সমগ্র আর্য্যজাতি শাসিত হইতে থাকেন। খাদ্যাখাদ্য সম্বন্ধে এই কল্পসূত্রগুলি হইতে আমরা কি কি প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারি, তাহা দেখা যাউক।

পশু এবং পক্ষীর মাংসাহার সম্বন্ধে গৌতম ধর্ম্মসূত্রে নিম্নলিখিত বিধি দেখা যাইতেছে,—

'সজারু, খরগোস, শ্বাবিৎ (শূকর বিশেষ), গণ্ডার, এবং কচ্ছপ ব্যতীত অন্য কোন পঞ্চনখী পশুর মাংস অবশ্য আহার করিবে না। যে জন্তুর দুইপাটী দন্ত আছে, যাহাদিগের দেহ অতিরিক্ত লোমাচ্ছন্ন, যাহাদিগের দেহে আদৌ লোম নাই, একক্ষুরবিশিষ্ট জন্তু, চটক পক্ষী, প্লবনামক মৎস্যাহারী পক্ষী, পাতিহংস, এবং হংসমাংস আহার করিবে না। কাক, শকুনি, বাজ, জলজাত পক্ষী, যে সকল পক্ষীর ওষ্ঠ এবং পদ লোহিতবর্ণবিশিষ্ট, দুগ্ধবতী গাভী এবং বৃষ আহার করিবে না। যে সকল জন্তুর মুখে দাঁত পড়িয়া যায় নাই, যে সকল পশু পীড়িত, এবং যেসকল পশু যজ্ঞকার্য্যে নিহত হয় নাই, তাহাদিগের মাংস অভক্ষ্য। হাড়গিলা, ক্রৌঞ্চ, কপোত, মৎস্যখাদক পক্ষী, এবং যে সকল পক্ষী রাত্রিচর, তাহাদিগের মাংস অখাদ্য। কোন কদাকার মৎস্য খাইবে না। হিংস্র জন্তু দ্বারা নিহত কোন পশুর মাংস ধৌত করিয়া, যদি কোন দোষ না থাকে এবং কোন ব্রাহ্মণ যদি খাইতে বলেন, তবে তাহা আহার করিবে।' গৌতমধর্ম্মসূত্র, ১৮।

ঋষি বৌধায়ন ব্যবস্থা দিতেছেন,—

'গৃহপালিত জন্তু আহার করিবে না। হিংস্র এবং গৃহপালিত পক্ষীও আহার করিবে না। গ্রাম্য কুক্কুট এবং গ্রাম্য শূকর আহার্য্য নহে। উক্ত নিষিদ্ধ জন্তুর মধ্যে ছাগ এবং মেষ আহার্য্য। পঞ্চনখী জন্তুর মধ্যে সজারু, খরগোস, এবং কচ্ছপ আহার্য্য। বিক্ষুর জন্তুর মধ্যে নীলগাই, সারঙ্গ, মৃগ, চিত্রিতদেহ মৃগ, মহিষ, বন্যশূকর, এবং কৃষ্ণসার মৃগ আহার করিবে। নিম্নলিখিত মৎস্য আহার্য্য—সহস্রদংষ্ট্রী, চিনিচিম, রামী, বৃহচ্ছির, মসকরী, রোহিত, এবং রাজি।' বৌধায়ন ধর্ম্মসূত্র—১।৫।১২।

ঋষি আপস্তম্ব বলিতেছেন,—

'একক্ষুরবিশিষ্ট পশু, উষ্ট্র, গয়াল, গ্রাম্যশূকর এবং শরভের মাংস অখাদ্য। দুগ্ধবতী গাভী এবং বৃষমাংস আহার্য্য। বাজসনেয়ক বলেন, বৃষমাংস যজ্ঞে প্রদান করিবার উপযুক্ত। মাংসাশী পক্ষী, হংস, ভাস, পাতিহাঁস, বাজ, এবং সারস-মাংস আহার

করিবে না। কচ্ছপ, শ্বাবিৎ নামক শূকর, সজারু, গণ্ডার, খরগোস, এবং পুত্রীবস ব্যতীত অন্য কোন পঞ্চনখী জন্তুর মাংস খাইবে না। মৎস্যের মধ্যে চেত মৎস্য অখাদ্য। যেসকল মৎস্যের মস্তক সর্পের ন্যায় সেই সকল মৎস্য, কুম্ভীর এবং মাংসভূক জলচর, এবং কদাকার মৎস্য আহার করিবে না।'—আপস্তম্ব ধর্ম্মসূত্র ১।৫।১৭।

কল্পসূত্রগুলির শাসনকালে গোবধ এবং গোমাংসাহার সম্বন্ধে কি বিধি ছিল, এক্ষণে তাহার আলোচনা করা যাউক। কল্পসূত্রকারগণ বলিতেছেন, কেবল মাত্র তিনটী কার্য্যে গোবধ কর্ত্তব্য। সে তিনটী— (১) যজ্ঞে, (২) শ্রাদ্ধে এবং (৩) মাননীয় অতিথি-সৎকারে।

ঋষি আপস্তম্ব বলিতেছেন,—

'তিনটী কার্য্যে গোহত্যা বিধি আছে,— আলয়ে সম্ভ্রান্ত অতিথি উপস্থিত হইলে, পিতৃলোকের মাংসাষ্টকা শ্রাদ্ধকালে এবং বিবাহকালে।' আপস্তম্ব গৃহ্যসূত্র, প্রথম পটল, তৃতীয় অধ্যায়।

ঋষি বশিষ্ট বলিতেছেন,—

'অতিথিকে মধুপর্ক দান কালে, যজ্ঞ কালে এবং পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ কালে— এই তিনটী স্থলে পশুবধ বিধি আছে মনু এমত বলিয়াছেন। মাননীয় ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় অতিথি উপস্থিত হইলে, তাঁহার সম্মান এবং ভোজন জন্য বয়স্ক বৃষ বা অজ বধ করিয়া রন্ধন করিতে পারিবে।' বশিষ্ঠ ধর্ম্মসূত্র, ৪র্থ অধ্যায়।

উপরে উদ্ধৃত দুইটী ঋষিবাক্যে আমরা জানিতে পারিলাম যে, যথেচ্ছ গোবধ করিয়া, তন্মাংস আহার-প্রথা যাহা পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল, এই সময়ে সেই প্রথা রহিত হইয়া যায়।

আপস্তম্ব অন্যত্র বলিতেছেন,—

'কেহ বিশেষ কারণ ব্যতীত (যজ্ঞকার্য্য ব্যতীত) দুগ্ধবতী গাভী এবং বয়স্ক বৃষ হত্যা করিলে, তাহার পক্ষে পূর্ব্বমত প্রায়শ্চিত্ত বিধি।'—আপস্তম্ব—১।৯।২৬।

গৌতম বলিতেছেন,—

'বৈশ্যকে হত্যা করিলে যে প্রায়শ্চিত্ত বিধি আছে, গোহত্যা করিলে, সেই প্রায়শ্চিত্ত বিধি।' গৌতম ধর্ম্মসূত্র, ১২।

বশিষ্ট বলিতেছেন—

'কেহ গোহত্যা করিলে, গোচর্ম্ম ধারণ করিয়া ছয়মাসকাল কৃচ্ছ্র এবং তপ্ত কৃচ্ছ্র প্রায়শ্চিত্ত করিবে।'—বশিষ্ঠ ধর্ম্মসূত্র, ২৩ অধ্যায়।

উপরি উদ্ধৃত প্রমাণে আমরা বিলক্ষণ রূপেই জানিতে পারিলাম যে, পূর্ব্বে আর্য্যগণ যজ্ঞ ব্যতীত স্বেচ্ছামত যে আহার জন্য বৃষ এবং দুগ্ধবতী গাভী হত্যা করিতেন, তাহাতে মহদনিষ্ট হইতেছে দেখিয়াই চিন্তাশীল ঋষিগণ সেই প্রথা একেবারে রহিত করিয়া দেন এবং গোহত্যা পাপরূপে পরিগণিত করিয়া দেন। তাহার প্রায়শ্চিত্ত বিধিও সেইমত কঠোর করেন। এই সূত্রে যে আর্য্যভূমিতে সাধারণ্যে গোবধ-প্রথা রহিত হইয়া যায়, তাহা বলা বাহুল্য।

কল্পসূত্র হইতে উদ্ধৃত নিম্নলিখিত বিধি গুলি এক্ষণে আমাদিগের পাঠ্য,—

'গাভী, ছাগী, মহিষি প্রসব করিলে, দশ দিন পর্য্যন্ত তাহার দুগ্ধ পান করিবে না। মেষ, উষ্ট্র, এবং একক্ষুরবিশিষ্ট জন্তুর দুগ্ধ কোন কালে কোনমতে আহার করিবে না। মৃতবৎসা গাভীর দুগ্ধ পান করিবে না।'— গৌতম ধর্ম্মসূত্র, ১৭।

'পেঁয়াজ এবং লশুন আহার করিবে না। অশুচি শূদ্র দ্বারা আনীত অন্ন

আহার করিবে না। কোন খাদ্যে কোন কীট থাকিলে ও কুক্কুর স্পর্শ করিলে আহার করিবে না। অযোগ্য লোকদিগের সহিত এক পঁক্তিতে আহার করিবে না। আহারের সময় শূদ্র স্পর্শ করিলে, আহার ত্যাগ করিয়া উঠিয়া যাইবে। নৌকা বা কাষ্ঠ খণ্ডে আহার করিবে না। কোন প্রকার মাদক দ্রব্য খাইবে না। বাজার হইতে প্রস্তুতীকৃত কোন খাদ্য দ্রব্য ক্রয় করিয়া আহার করিবে না। যে বাটীতে অনেকের নিমন্ত্রণ হইয়াছে, তথায় আহার করিবে না। যাহারা জমি বা বাটী ভাড়া দিয়া জীবিকার্জ্জন করে, যাহারা চিকিৎসক, যাহারা কুসীদগ্রাহী, যাহারা নপুংসক, যাহারা রাজদূত এবং যাহারা গুপ্ত চর তাহাদিগের প্রদত্ত খাদ্য আহার করিবে না।' আপস্তম্ব ধর্ম্মসূত্র, ১।৫।

'শূদ্রদত্ত অন্ন আহার করিবে না। বিবাহিতা স্ত্রীর উপপতি-দত্ত বা যে স্বামী স্বীয় স্ত্রীকে উপপতির সহিত সহবাস করিতে দেয়, তাহার দত্ত অন্ন আহার করিবে না। আচার্য্য ব্যতীত অপরের উচ্ছিষ্ট অন্ন আহার করিবে না।' বশিষ্ঠ ধর্ম্মসূত্র, ১৪ অধ্যায়।

কল্পসূত্র গুলির শাসনের বহুকাল পরে আর্য্যজাতির মধ্যে ধর্ম্মশাস্ত্র বা সংহিতাগুলির প্রাদুর্ভাব হয়। এক্ষণে সেই সংহিতা-গুলিই আমাদিগের অবলম্বনীয়।

সম্বর্ত্ত সংহিতায় লিখিত হইয়াছে,—

'দ্বিজগণের দিবাভাগে ও রাত্রিকালে— এই দুই সময়ে দুইবার মাত্র ভোজন করা বেদে নির্দ্দিষ্ট আছে। ইহা ব্যতীত তৃতীয়বার ভোজন করিতে নাই। যেমন অগ্নিহোত্র কার্য্য দিবাভাগে একবার এবং রাত্রিকালে একবার কর্ত্তব্য, তদ্রূপ ভোজন কার্য্যও দুইবার মাত্র কর্ত্তব্য জানিবে।'

হারীত বলিতেছেন,—

'পূর্ব্বমুখ বা উত্তরমুখ হইয়া, মৌন হইয়া বা অল্পভাষিত্ব অবলম্বন করিয়া প্রহৃষ্ট-চিত্তে প্রথমে অন্নকে নমস্কার করত তৎপরে পৃথক পৃথক মন্ত্রের দ্বারা প্রাণাদির আহুতি প্রদানান্তে সমাহিতচিত্তে স্বাদু অন্ন ভোজন করিবে। আহারান্তে আচমন করিয়া, ইষ্টদেবতাকে স্মরণ পূর্ব্বক উদর স্পর্শ করিবে।'—হারীত সংহিতা, ৪র্থ অধ্যায়।

কল্পসূত্রকারগণ দ্বিজাতির পক্ষে মৌনী হইয়া আহার করিবার বিধি দিয়া গিয়াছেন, কিন্তু এস্থলে অল্পভাষিত্বের ব্যবস্থা প্রথম দেখা যাইতেছে।

এক্ষণে কাহার কাহার অন্ন ভক্ষ্য এবং কাহার কাহার অন্ন অভক্ষ্য, তৎসম্বন্ধীয় বিধি পাঠ করা যাউক,—

'বেদানভিজ্ঞ ব্রাহ্মণ যে যজ্ঞের ঋত্বিক, যে যজ্ঞে বহুযাজক ব্রাহ্মণ হোম করেন, যে যজ্ঞে স্ত্রীলোক বা ক্লীব হোতা, তথায় ব্রাহ্মণ কখনও ভোজন করিবে না। মত্ত, ক্রুদ্ধ ও ব্যাধিযুক্ত ব্যক্তির অন্ন, কেশকীটাদি-যুক্ত অন্ন, এবং পদস্পৃষ্ট অন্ন কদাচ আহার করিবে না। ভ্রূণহত্যাকারী কর্ত্তৃক দৃষ্ট অন্ন, ঋতুমতী নারী কর্ত্তৃক সংস্পৃষ্ট অন্ন, পক্ষীগণ কর্ত্তৃক অবলীঢ় অন্ন, কুক্কুর কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট অন্ন কখনও ভোজন করিবে না। গাভী কর্ত্তৃক আঘ্রাত অন্ন, বেশ্যার অন্ন, চিকিৎসকের, ব্যাধের, উচ্ছিষ্টভোজনকারীর এবং নিষ্ঠুর কর্ম্মকারীর অন্ন ভোজন করিবে না। পতিপুত্রবিহীনা অবীরা স্ত্রীর অন্ন, শত্রুর অন্ন, মিথ্যা সাক্ষ্যদাতার অন্ন, ভোজন করিবে না। যে ধনলোভে যজ্ঞ-ফল বিক্রয় করে, যে নটবৃত্তি করে, যে বস্ত্রাদি সীবনদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তাহাদিগের অন্ন আহার করিবে না।'— মনুসংহিতা, ৪র্থ অধ্যায়।

যম-সংহিতার বিধি,—

'দাস, নাপিত, গোপাল, কুলমিত্র, অর্দ্ধসীরী এবং যে আত্মসমর্পণ করে, শূদ্রদিগের মধ্যে ইহাদিগের অন্ন ভোজন করা যাইতে পারে।'

পরাশর বিধি দিতেছেন,—

"'যদি শূদ্রের গৃহ হইতে অপক্ক অন্ন বা চাউল, দুগ্ধ, ঘৃত, তৈল প্রেরিত হয়, এবং যদি তাহা গৃহেই পাক করা হয়, তবে তাহা পবিত্র বিপ্রেরও ভোজ্য। যদি কোনরূপ বিপদকালে বিপ্র, শূদ্রগৃহে ভোজন করেন, তবে তাহাতে তাঁহার মনস্তাপ জন্মিলেই শুদ্ধ হইবেন, অথবা শতবার গায়ত্রী জপ করিবেন। দাস, নাপিত, গোপাল, কুলমিত্র, অর্দ্ধসীরী কিম্বা যে আত্মসমর্পণ করিয়াছে, শূদ্রের মধ্যে এই কয়জনের অন্ন ভোজন করা যায়। শূদ্র-কন্যা হইতে ব্রাহ্মণের ঔরষজাত অথচ ব্রাহ্মণের দ্বারা সংস্কার প্রাপ্ত হইলে, তাহাকে দাস বলা যায়, কিন্তু অসংস্কৃত থাকিলে, সে নাপিত হয়। যে পুত্র, শূদ্র-কন্যার গর্ভে ক্ষত্রিয়ের ঔরষে জন্ম গ্রহণ করে, তাহাকে গোপাল বলিয়া জানিবে। ব্রাহ্মণ নিশ্চয়ই তাহার গৃহে ভোজন করিতে পারেন।' পরাশর-সংহিতা, ১১শ অধ্যায়।

আঙ্গীরস সংহিতার বিধি,—

'যে ব্যক্তি নিরন্তর একমাস শূদ্রান্ন ভোজন করে, সে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয় এবং মৃত্যুর পর কুক্কুরযোনি প্রাপ্ত হয়। শূদ্রান্ন ভোজন, শূদ্রের সহিত বিশেষ সংসর্গ, শূদ্রের সহিত একত্র অবস্থান, এবং শূদ্রের নিকট হইতে কোনরূপ জ্ঞানোপার্জ্জন, ব্রহ্মতেজঃসম্পন্ন ব্রাহ্মণকেও পতিত করে। যে অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণ, শূদ্রান্ন ভোজন করে, তাঁহার আত্মা, বেদাধ্যয়ন, এবং গার্হপত্য, আহবনীয় ও দক্ষিণ নামক তিন অগ্নি, এই পাঁচটী বস্তু নষ্ট হয়। যে দ্বিজ শূদ্রান্নভোজী হইয়া পুত্র উৎপাদন করে, সেই পুত্র প্রকৃতপক্ষে যাহার অন্ন তাহারই হয়, কেন না অন্ন হইতেই শুক্রের উৎপত্তি। ব্রাহ্মণের অন্ন সকল দিনই ভোজন করা যায়। ক্ষত্রিয়ান্ন পর্ব্বোপলক্ষে, বৈশ্যান্নও আপৎকালে আহার্য্য কিন্তু শূদ্রান্ন কখনও ভোজ্য নহে। ব্রাহ্মণান্নে দরিদ্রত্ব হয়, ক্ষত্রিয়ান্নে পশুত্ব হয়, বৈশ্যান্ন ভোজনে শূদ্রত্ব প্রাপ্তি এবং শূদ্রান্ন ভোজনে নিশ্চয় নরক গমন হয়। ব্রাহ্মণান্ন অমৃত, ক্ষত্রিয়ান্ন দুগ্ধ বলিয়া স্মৃত, বৈশ্যান্ন অন্ন মাত্র এবং শূদ্রান্ন নিশ্চয়ই রক্ত।'—আঙ্গীরস-সংহিতা।

মহর্ষি অঙ্গীরার উক্ত কঠোর বিধান দৃষ্টে জানা যায় যে, এই সময়ে সাধারণ্যে শূদ্রান্নভোজন-প্রথা একেবারে রহিত হইয়া গিয়াছিল।

মানব-ধর্ম্ম শাস্ত্রে অর্থাৎ মনুসংহিতায় খাদ্যাখাদ্য সম্বন্ধে যে বিধি আছে, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল,—

'লশুন, গৃঞ্জন, পলাণ্ডু কবক, এবং, বিষ্ঠাদিতে সঞ্জাত দ্রব্যাদি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের অভক্ষ্য জানিবে। বৃক্ষের রক্তবর্ণ নির্যাস, যাহা কঠিনতা প্রাপ্ত হইয়াছে, এবং বৃক্ষচ্ছেদনকালে যে রস নির্গত হয়, তাহা অভক্ষ্য। শেলু, এবং নবপ্রসূতা গাভীর দুগ্ধ (একমাসের জন্য) ব্রাহ্মণ আহার করিবে না। গৃধ্র প্রভৃতি যে সকল পক্ষী মাংসাহার করে, পারাবতাদি গ্রামবাসী পক্ষী, গর্দ্দভাদি একক্ষুরবিশিষ্ট পশু, এবং টিট্টিভ, এ সকল ভক্ষণ করিবে না। চড়ুই, জলকাক, হংস, চক্রবাক, গ্রাম্য কুক্কুট, সারস, রজ্জুদল, ডাক, শুক ও সারিকা অভক্ষ্য। যে সকল পক্ষী চঞ্চু দ্বারা খাবিয়া

খায়, যে সকল পক্ষীর পদ জোড়া, শ্যেন এবং পানকৌড়ী প্রভৃতির মাংস আহার করিবে না। বক, বলাকা, কাঁকোল, খঞ্জন, মৎস্যভক্ষক জন্তু, বিষ্ঠাভক্ষক শূকরাদি এবং সকল প্রকার মৎস্য ভোজন করিবে না। যে যাহার মাংস খায়, তাহাকে তন্মাংসাদ বলে। যেমন নকুলকে সর্পাদ, এবং বিড়ালকে মুষিকাদ বলে। মৎস্যভোজী সর্ব্বমাংসাদ, এজন্য মৎস্য ভোজন পরিত্যাগ করিবে। বোয়াল এবং রোহিত মৎস্য, রাজীব, শকুল, সিংহতুণ্ড, এবং আঁইসবিশিষ্ট যাবতীয় মৎস্য দৈব-পৈত্রাদি কর্ম্মে ভক্ষণীয়। পঞ্চনখীর মধ্যে সজারু, শল্যক, গোসাপ, গণ্ডার, কচ্ছপ, ও খরগোস, এই কয়টী ভোজন করা যায়। একপাটীদন্তবিশিষ্ট পশুর মধ্যে উষ্ট্রমাংস ভোজন করা যায়। যজ্ঞের হুতাবশিষ্ট মাংস ভক্ষণীয়। বহু ব্রাহ্মণের অনুরোধে মাংস ভক্ষণ করা যায়; যথাশাস্ত্র শ্রাদ্ধাদিতে নিযুক্ত মাংস আহার্য্য; এবং ব্যাধি হেতু ও আহারাভাবে প্রাণ যায়, এমত স্থলে মাংস খাইতে পারে।' মনুসংহিতা, ৫ম অধ্যায়।

যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন,—

'যে দুরাচার অবিধি পূর্ব্বক (যজ্ঞাদি ব্যতীত) পশু হত্যা করে, সে সেই পশুর গাত্রে যতগুলি রোম থাকে, ততদিন ঘোর নরকে বাস করে।' যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা, ১ম অধ্যায়।

মহর্ষি মনু বলিতেছেন,—

'পশু হননে অনুমতিদাতা, হত পশুর মাংসবিভাগকারী, স্বয়ং পশুহন্তা, মাংস বিক্রয়কারী, মাংস পাককারী, মাংস পরিবেশক, এবং মাংসভক্ষক, এই আট জনকেই পাতক বলা যায়। যে ব্যক্তি শত বৎসর ধরিয়া বর্ষে বর্ষে অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন, এবং যে ব্যক্তি যাবজ্জীবন মাংস ভোজন না করেন, এই উভয়েরই পুণ্যফল সমান। সম্যক প্রকারে মাংস পরিত্যাগ করিলে যাদৃশ ফল লাভ হয়, পবিত্র ফলমূল ভোজে অথবা নীবারাদি মুনিজন-সেবিত অন্নগ্রহণে তাদৃশ মহাফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না।' মনুসংহিতা, ৫ম অধ্যায়।

সংহিতাকারগণের শাসনকালে আর্য্য জাতির মধ্যে হইতে কেবল যে গোমাংসাহার রহিত হইয়া যায়, তাহা নহে, তাহার জন্য সকলপ্রকার পশু বধই মহাপাপ বলিয়া গণ্য হয়। কেবল তাহাই নহে, মৎস্যভক্ষণও নিষিদ্ধ হয়, উপরের উদ্ধৃত প্রমাণে তাহা প্রতিপন্ন হইতেছে। শ্রাদ্ধে গোমাংস দানের প্রথাও এই সময়ে একেবারে রহিত হইয়া যায়।

গোহত্যা এবং গো-মাংসাহারের বিরুদ্ধে প্রত্যেক সংহিতাকারই একবাক্যে একমতে প্রবল বিধির সৃষ্টি করেন। এ সময়ে গোহত্যা যেমন মহ পাপজনক বলিয়া ধার্য্য হয়, সেইমত কঠোর প্রায়শ্চিত্তেরও ব্যবস্থা হয়,—

'গোহত্যাকারী প্রথম মাসে যবমণ্ড ভক্ষণ করিয়া মুণ্ডিতশিরা ছিন্নশ্মশ্রু এবং গোচর্ম্ম-আচ্ছাদিত দেহ হইয়া গোষ্ঠে বাস করিবে। দ্বিতীয় এবং তৃতীয়মাসে একদিন উপবাসানন্তর দ্বিতীয় দিনের সায়ংকালে কৃত্রিম লবণবর্জিত পরিমিত হবিষ্যভোজী হইবে; সংযতেন্দ্রিয় থাকিবে এবং গোমূত্র দ্বারা স্নান করিবে। মাসত্রয় পর্য্যন্ত দিবাভাগে গাভীসকলের অনুগমন করিবে, এবং দণ্ডায়মান থাকিয়া ঐসকল গাভীদ্বারা সমুত্থিত ধুলি সেবন করিবে। কণ্ডূয়ণাদির দ্বারা গো-পরিচর্য্যা করিয়া এবং গাভীদিগকে প্রণাম করিয়া রাত্রি-কালে তথায় বীরাসনে উপবিষ্ট থাকিবে।

গো সকল উত্থিত হইলে উত্থিত হইবে, গমন করিলে, তাহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিবে। উপবিষ্ট হইলে স্বয়ং উপবিষ্ট হইবে। বীতমৎসর ভাবে নিয়ত তাহাদিগের এইরূপ সেবা করিবে। গো ব্যাথিত বা চৌরকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে, পতিত বা পঙ্কমগ্ন হইলে, যথাশক্তি সর্ব্বোপায়ে তাহাদিগকে মোচন করিবে। গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত বা প্রবল বাত্যা উপস্থিত হইলে, যথাশক্তি গাভী সকলকে রক্ষা না করিয়া আত্মরক্ষা করিবে না। আপনার বা অপরের গৃহে, ক্ষেত্রে বা ধান্য মাড়িবার স্থানে গাভী শস্য ভক্ষণ করিতেছে, বা বৎস দুগ্ধ পান করিতেছে, ইহা দেখিয়া, গৃহপতিকে বলিয়া দিবে না। যে গোহত্যাকারী এই বিধিতে গো-সেবা করে, সে তিনমাসে গোহত্যা-জনিত পাপ হইতে মুক্তিলাভ করে। এইরূপ প্রায়শ্চিত্ত ব্রত সম্যক আচরিত হইলে একটী বৃষ ও দশটী গাভী দক্ষিণা দিবে। যদি উহা না থাকে, তবে যথাসর্ব্বস্ব বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে দান করিবে।' মনুসংহিতা, ১১শ অধ্যায়।

প্রবন্ধটি সুদীর্ঘ হইয়াছে, সুতরাং বাহুল্যভয়ে আমরা অন্যান্য সংহিতা হইতে আর অধিক প্রমাণ উদ্ধৃত করা কর্ত্তব্য বোধ করিলাম না। আহার-প্রণালী এবং খাদ্যাখাদ্য সম্বন্ধে সকল সংহিতাকারই একমত। আর্য্য জাতির মধ্যে পশুহত্যা বিশেষতঃ গোহত্যা নিবারণ জন্য সকলেই কঠোর বিধি সৃষ্টি করেন। সেই সূত্রেই আর্য্যজাতির মধ্যে সাধারণ্যে মাংসাহার একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যায়। সংহিতা গুলির মধ্যে মনুসংহিতা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, কিন্তু কলিতে পরাশর সংহিতাই সর্ব্বাপেক্ষা মান্য। সেই পরাশরও মনুর সহিত একমতে গোহত্যা এবং গোমাংসাহারের বিরুদ্ধবাদী। মহর্ষি মনু এই সময়ে নিরামিষ আহারই সর্ব্বাপেক্ষা—এমন কি মুনিদিগের নীবারাদি আহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ফলপ্রদ বলিয়া গিয়াছেন।

শ্রীগোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

ধর্ম্মতত্ত্ব-পরিশিষ্ট।

(পূর্ব্বপ্রকাশিত পর।)

জগতে মানব ব্যষ্টিভাবে দুর্ব্বল অসহায় হইলেও সমষ্টিভাবে প্রভূত শক্তির আধার। মানব সমাজবদ্ধ হইয়া সমবেত চেষ্টা দ্বারা জাতীয় সাধনার গুণে স্বকীয় শ্রীবৃদ্ধি সাধন যত্নশীল। যে জাতীয় সাধনার গুণে মানব এ জগতে অন্য প্রাণী অপেক্ষা এত উন্নত, ধর্ম্মই সে সাধনার জীবাতু।

মানব সমাজবদ্ধ হওয়া অবধি পরিবারবর্গে বেষ্টিত হইয়া লোকালয়ে বসবাস করে। অসংখ্য ভিন্ন পরিবার লইয়া এক এক সমাজ গঠিত হয়। সামাজিক অসংখ্য সম্বন্ধ নিরূপণ করতঃ সমাজকে সুশৃঙ্খলার সহিত পরিচালনা করা ধর্ম্মের এক মহৎ কর্ত্তব্য। এই কারণে বোধ হয় পুরাকাল হইতে ধর্ম্ম, সকল দেশে বিবাহাদি সংস্কার গুলি স্বহস্তে পরিচালিত করে এবং সমাজের পারিবারিক গঠন পদ্ধতি অটুট রাখিবার জন্য সর্ব্বত্র নানাবিধ অবশ্য প্রতিপাল্য নিয়ম বা রীতি নীতির ব্যবস্থা করে

মানবের এই বাহ্যিক প্রাকৃত ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়া অন্তরের ব্যাপার দেখিলে সেখানেও ধর্ম্মের রক্ষণশীলতা মূর্ত্তিমতী। স্থূলতঃ বলা যাইতে পারে যে, তিন প্রকার প্রবৃত্তি লইয়া মানবের মন গঠিত। স্বার্থ প্রবৃত্তি, পরার্থ-প্রবৃত্তি, ও বুদ্ধিবৃত্তি ইহাদের মধ্যে স্বার্থ-প্রবৃত্তি নিকৃষ্ট অর্থাৎ মানবের রিপু। পরার্থ-প্রবৃত্তিগুলি উৎকৃষ্ট; উহাই ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি। স্বার্থ-প্রবৃত্তি না হইলে সংসার চলে না সত্য, কিন্তু তাহা যথা চরিতার্থ হইলে তাহাতে কি সমাজ, কি পরিবার, কি সম্বন্ধ সর্ব্বত্র অমঙ্গলের আশঙ্কা হয়। পরার্থ-প্রবৃত্তিগুলি যথাভাবে কৃতকার্য্য হইলে সমাজের প্রভূত মঙ্গল হয়। স্বার্থ ও পরার্থ প্রবৃত্তির অবিশ্রান্ত সংঘর্ষ চলিয়াছে। এই ভয়াবহ সংঘর্ষে ধর্ম্মই একমাত্র মধ্যস্থ করিতেছেন। তাহা না হইলে এ সাংঘাতিক বিগ্রহ দাবাগ্নির ন্যায় সমস্ত অরণ্যকে ভস্মস্তূপ করিয়া দিত—সৃষ্টি লোপ পাইত। ধর্ম্ম, সমাজের উপযোগিতা অনুসারে স্বার্থ-প্রবৃত্তিগুলি দমিত করিয়া অর্থাৎ উহাদের অযথা চরিতার্থতা নিবারণ করিয়া পরার্থ-প্রবৃত্তিগুলির সম্যক্ স্ফূর্ত্তি করায় তখন বুদ্ধি-বৃত্তিও তাহাতে সামঞ্জস্য সুধা মাখাইয়া দেয়; তদ্দ্বারা জনসমাজ শ্রীসম্পন্ন, সুখী ও সমৃদ্ধ হয়। যাঁহারা জন্মান্তর স্বীকার করেন না, তাঁহারা যাহা বলিতে বা ভাবিতে পারেন থাকুন। আমাদের হিন্দুপ্রধান ধর্ম্ম-সভার সভাগণ এরূপ মনে না করেন যে, ধর্ম্ম কেবল সমাজ পরিচালন বা পারিবারিক নিয়ম সংস্করণ ইত্যাদি ঐহিক কৃত্য কলাপেই সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে।

আমাদের এই সনাতন ধর্ম্ম মৃত্যুর পরেও আত্মার অনুগমন করে। হিন্দুগণ বলেন—

"এক এব সুহৃদ্ধর্ম্মো নিধনেঽপ্যনুযাতি যঃ।
শরীরেণ সমং নাশং সর্ব্বমন্যত্তু গচ্ছতি॥"

শরীরের সহিত সমস্ত বিনষ্ট হয় কিন্তু একমাত্র সুহৃৎ ধর্ম্মই সঙ্গে যায়। যাঁহাদের বিচার-শক্তি ইহ জীবনেই সীমাবদ্ধ, তাঁহারা এ সম্বন্ধে যাহাই বলুন, তাঁহাদের মত সর্ব্বথা ঐকদেশিক।

হিন্দুর আধ্যাত্মিক প্রবৃত্তি যেরূপ তাহাতে ধর্ম্মই আমাদের প্রধান অবলম্বন। ইহাই আমাদিগকে অনন্তকাল ধারণ করিয়া আছে ও করিবে।

অবশ্য আমি নিন্দা করিতেছি না কিন্তু এই জন্যই বলিতে ইচ্ছা হয় যে, পাশ্চাত্য শিক্ষা ও পাশ্চাত্য দীক্ষায় আমরা ধর্ম্মের অতি সঙ্কুচিত স্বরূপ নিশ্চয় করিয়া থাকি। সে শিক্ষা ও দীক্ষা আমাদের সনাতন ধর্ম্মের বিরাট্ স্বরূপ দেখাইতে সমর্থ নহে। তাহা জ্ঞানকরী হইতে পারে কিন্তু সে স্থূল জড় পদার্থের জ্ঞান। আমাদের সনাতন ধর্ম্ম এই জড়বিজ্ঞানের সীমায় আবদ্ধ নহে। সনাতন ধর্ম্ম, স্থূল জড়বিজ্ঞানের যেরূপ অজেয় সম্রাট, সূক্ষ্ম অধ্যাত্মবিজ্ঞানেরও সেইরূপ রাজচক্রবর্ত্তী।

দুঃখের বিষয় আজকাল স্থূল জড় তত্ত্বর জ্ঞানোন্নতির সহিত সূক্ষ্ম জ্ঞানতত্ত্ব ক্ষীণপ্রভ হইয়া পড়িয়াছে। পণ্ডিতপ্রবর শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয় এ সম্বন্ধে বেশ একটী দৃষ্টান্ত দেন। তিনি বলেন, অন্তঃকরণের স্থূল ও সূক্ষ্ম চিন্তা করা যেন দুইটী অঙ্গ। সম্প্রতি অন্তঃকরণের স্থূল বিষয় চিন্তা করা এত প্রবল হইয়া পড়িয়াছে যে, সূক্ষ্ম চিন্তা একবারে ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে। অন্তঃকরণ এখন যেন ঠিক পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগী। এক অঙ্গ অন্তঃকরণের পুষ্ট, অন্য অঙ্গ নষ্টপ্রায়। বাস্তবিক সম্প্রতি জড়-তত্ত্বেরই যুগ। অধ্যাত্ম-তত্ত্ব একটা কথার কথা হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু সুখের বিষয় অধুনা ভারতবর্ষীয় সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী অনেক

মহাপুরুষ জড়বিজ্ঞানের রাজ্যে গিয়া অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের বিমল মধুরিমা দেখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। জড়বিজ্ঞানীগণের অন্তঃকরণের (সূক্ষ্মতত্ত্ব বিচাররূপ) লুপ্তপ্রায় অঙ্গ ক্রমে যেন পুনরস্ফুরিত হইবে এরূপ আশা করা যাইতেছে। দুঃখের বিষয় স্বদেশের অন্তঃকরণ যেই অসাড় সেই অসাড়ই আছে। ভগবানই জানেন এ পক্ষাঘাত সারিবে কি না? এই দুরারোগ্য ব্যাধির ঔষধ একমাত্র সনাতন ধর্ম্ম। সনাতন ধর্ম্মাবলম্বীর হৃদয় জড়বিজ্ঞানের সাহায্যে অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের রাজ্যে বিচরণ করিবার জন্য সতত উন্মুখ। তাহাদের এই আধ্যাত্মিক প্রকৃতি ধর্ম্মের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ও ধর্ম্ম কর্তৃক সংরক্ষিত।

যে জীবাত্মা পরব্রহ্ম হইতে বিচ্যুত পার হইয়া ত্রিগুণাত্মিকা মায়ার দ্বারা কিছুদিনের জন্য জড়দেহে নিবদ্ধ, যে জীবাত্মা যুগধর্ম্মানুসারে ক্রমশঃ কলুষিত ও অধঃপতিত হয়, সেই জীবাত্মার আধ্যাত্মিকতা স্ফুর্ত্তির জন্য ধর্ম্মই প্রধান সহায়। জীবাত্মা সংসারী হইয়া কর্ম্মানুসারে শরীর, মন ও ইন্দ্রিয় ইত্যাদির সহিত সম্বদ্ধ হয়। তন্নিবন্ধন অশেষ সুখ দুঃখের ভাগী হইয়া থাকে। কর্ম্মফলানুসারে ভিন্ন ভিন্ন লোকে কত শত বার পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিতে থাকে। সাত্ত্বিক প্রবৃত্তির স্ফুর্ত্তির দ্বারা এই জীবাত্মার কর্ম্মসূত্র ছিন্ন করিয়া নির্ব্বাণোন্মুখ করিতে একমাত্র ধর্ম্মই প্রধান সহায়। অতএব আধ্যাত্মিক উন্নতির দ্বারা জীবাত্মার স্বরূপাবস্থান করাইয়া দেওয়া সনাতন ধর্ম্মের একটী চরম প্রয়োজন।

এই আধ্যাত্মিকতার স্ফুর্ত্তির দ্বারা মানব মনের উৎকর্ষ সাধন সনাতন ধর্ম্মের ২য় প্রয়োজন। এই মানসিক উৎকর্ষই সমাজ ও পরিবারকে রক্ষা করিতেছে। সমাজ রক্ষা করিতে হইলে, পরিবার প্রতিপোষণ করিতে হইলে, ভক্তি প্রেম দয়া দাক্ষিণ্য ইত্যাদি যে কয়েকটী উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তির আবশ্যকতা তৎসমস্ত সেই সনাতন ধর্ম্মের এক একটী বিকাশ।

মানব-মনের স্বভাবতঃ বলবতী নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি গুলির দমন সনাতন ধর্ম্মের ৩য় প্রয়োজন। এই সমস্ত নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির দমনের জন্য সনাতন ধর্ম্ম যেরূপ সংযমপ্রধান ক্রিয়াযোগের উপদেশ দেয়, অন্য কোনও ধর্ম্ম এতটা সমর্থ কি না শ্রোতৃমণ্ডলী তাহার বিবেচনা করিবেন।

স্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবন লাভ সনাতন ধর্ম্মের ৪র্থ প্রয়োজন। ধর্ম্ম ব্রতোপবাসাদি দ্বারা স্বাস্থ্যের পন্থা যেরূপ নিরাপদ করে, যম নিয়ম ধ্যান ধারণা সমাধি ইত্যাদি যোগমার্গের উপদেশ দিয়া দীর্ঘজীবন লাভের পথও পরিষ্কৃত করিয়া দেয়। আমার ত মনে হয় হিন্দুর ধর্ম্ম ক্রিয়াযোগ বিষয়ে উচ্চাসন পাইবার যোগ্য। অন্য ধর্ম্মে ঈশ্বরের অস্তিত্ব মাত্র উপলব্ধি করিয়া তদুদ্দেশ্যে • গুটিকতক স্তুতিব্যঞ্জক শব্দ ব্যবহার বা আড়ম্বর পূর্ণ দয়া দাক্ষিণ্যাদির কথা কহিয়া ধর্ম্মের উপসংহার করা হয়, কিন্তু হিন্দুর সনাতন ধর্ম্ম, সংযমপ্রধান ক্রিয়াযোগের দ্বারা ধর্ম্মপিপাসুর হৃদয় ধর্ম্মময় করিয়া দেয়; যাহা বলে, কার্য্যতঃ তাহা প্রতিপন্ন করাইয়া ধর্ম্মের মূল সুদৃঢ় করে। বাস্তবিক মৌখিক শিক্ষা বা মৌখিক বলা অপেক্ষা কার্য্যতঃ যাহা করা যায়, তাহাই প্রকৃত চেষ্টার ফল। প্রথম পাঠারম্ভ কালে বর্ণমালা গুলি লিখিয়া লিখিয়া শিখিয়াছি বলিয়া আজীবন "ক খ গ ঘ" ইত্যাদি হৃদয়ে খোদিত হইয়া আছে। এই খানে পুণ্যাত্মা যোগী রামকৃষ্ণ পরমহংসের উপদেশ গুলি মনে আসে। একদিন এক

শিষ্য পরমহংস দেবকে জিজ্ঞাসা করে, "গুরো! ঈশ্বরের উদ্দেশে এত স্তব স্তুতি করা সত্ত্বেও ঈশ্বর প্রসন্ন হন না কেন? ধর্ম্ম শাস্ত্রাদির এত পাঠ—এত আলোচনা করা সত্ত্বেও ঈশ্বরের দর্শন লাভ ঘটে না কেন?" পরমহংস দেব বলিলেন, "বাপু মুখে বলিলে কার্য্য হয় না, কার্য্যতঃ তাহা করিতে হয়। ভাঙ্গ ও আফিমে নেশা আছে সত্য কিন্তু ভাঙ্গ ভাঙ্গ বা আফিম আফিম বলিয়া চীৎকার করিলেত নেশা হয় না; তাহা খাইলেই নেশা হয়। পাঁজিতে কত আঢ়ক জলের কথা লেখা থাকে কিন্তু পাঁজি ঝাড়াঝাড়ি করিলে কুশাগ্র বিন্দুও পড়ে না কেন?" তাই বলিতেছিলাম কেবল ধর্ম্ম ধর্ম্ম বলিয়া চিৎকার করিলে চিত্তশুদ্ধি হয় না বা ধর্ম্মগ্রন্থের পাতা উল্টাইয়া কর্ত্তব্য শেষ করিলে ঈশ্বর প্রাপ্তি হয় না। হিন্দুর সনাতন ধর্ম্ম তাই ক্রিয়াযোগের সুব্যবস্থা দিয়াছেন। অতএব ইহা অসাধারণতার অধীশ্বর হইবার যোগ্য কি না শ্রোতৃমণ্ডলী তাহার বিবেচনা করিবেন।

পরাৎপর ব্রহ্মা প্রজা সৃষ্টি করিতে অভিলাষী হইয়া অতিশয় চিন্তাপরায়ণ হইয়াছিলেন। তিনি চিন্তা করিলে তাঁহার দক্ষিণাঙ্গ হইতে শ্বেতকুণ্ডলধারী এবং শ্বেতমাল্য-অনুলেপনাদিযুক্ত একটি পুরুষ প্রাদুর্ভূত হইল। ব্রহ্মা তাহাকে দেখিয়া কহিলেন তুমি চতুষ্পাদ বৃষাকৃতি। তুমি জ্যেষ্ঠ হইয়া প্রজাপালন কর। এই বলিয়া স্থির হইলেন। সেই ধর্ম্ম সত্যযুগে চতুষ্পাদ, ত্রেতায় ত্রিপাদ, দ্বাপরে দ্বিপাদ, এবং কলিতে একপাদ দ্বারা প্রজাদিগকে পালন করেন। তিনি ব্রাহ্মণদিগকে সম্পূর্ণরূপে ক্ষত্রিয়দিগকে তিন ভাগে বৈশ্যদিগকে দ্বিভাগে এবং শূদ্রদিগকে এক ভাগ দ্বারা রক্ষা করিয়া থাকেন। গুণ দ্রব্য ক্রিয়া ও জাতি এই চারিটী পাদ। তিনি বদে ত্রিশৃঙ্গ বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন, তাঁহার আস্তম্ভ ওঁকার, দুটী শিরা এবং সপ্ত হস্ত।

ব্রহ্মার হৃদয় দেশ হইতে ধর্ম্ম এবং পৃষ্ঠ দেশ হইতে অধর্ম্মের উৎপত্তি। শ্রুতি-স্মৃতি-বিরুদ্ধ আচারের নাম অধর্ম্ম। এই অধর্ম্মও ব্রহ্মার একটী পুত্র বিশেষ। মিথ্যা তাঁহার ভার্য্যা; এই মিথ্যার গর্ভে দম্ভ (পরপ্রতারণা) নামে এক পুত্র এবং মায়া (পর প্রতারণার উপযোগী চেষ্টা) নামে এক কন্যা জন্মে। দম্ভ ও মায়া উভয়ে স্ত্রী পুরুষ হয়। দম্ভ মায়ার উদরে লোভ নামে এক পুত্র এবং শঠতা নামে এক কন্যা উৎপাদন করে। তাহাদিগের হইতে ক্রোধ এবং হিংসা উৎপন্ন হয়। কলি সেই ক্রোধ ও হিংসার পুত্র। দুরুক্তি কলির সহোদরা। কলি ঐ দুরুক্তির গর্ভে ভীতি নামে এক কন্যা এবং মৃত্যু নামে এক পুত্র উৎপাদন করেন। তাহাদিগের হইতে যাতনা ও নরক উৎপন্ন হয়। এইরূপে সংক্ষেপে অধর্ম্মের বংশ কীর্ত্তিত হইল। এই অধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিলেই মনুষ্যের পুণ্য সঞ্চয় হয়। (ভাগবতপুরাণ ৪—৮ অধ্যায়।)

ধর্ম্মাধর্ম্মের সুখ-দুঃখ সাধকত্ব বিষয়ে জৈমিনি সূত্রে কথিত আছে যে—কো ধর্ম্মো যো ভূপোয়ায়। কোহধর্ম্মো যো ন ভূপোয়ায়। অর্থাৎ ধর্ম্ম কি? যাহা সুখের নিমিত্ত উৎপন্ন হয়। অধর্ম্ম কি? যাহা দুঃখের নিমিত্ত উৎপন্ন হয়

(১) ধারণ করেন এই অর্থে ধর্ম্ম নাম হইয়াছে। ধর্ম্ম দ্বারা সমস্ত প্রজা ধৃত হইয়া থাকে, যে হেতু একমাত্র ধর্ম্মই এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক ত্রিলোকীকে ধারণ করেন। •

(১) বাঃ রামাঃ ৬৬১।৭

(২) বেদাদি শাস্ত্রবিহিত ক্রিয়াজন্য পুরুষের যে গুণ তাহাই ধর্ম্ম। আর বেদাদি শাস্ত্র-নিষিদ্ধ ক্রিয়াজন্য পুরুষের যে গুণ তাহাই অধর্ম্ম।

(৩) বেদ ও পুরাণ শাস্ত্র-বিহিত যে কর্ম্ম তাহা মানবগণের ইষ্টদায়ক। তদ্বিরুদ্ধ যে কর্ম্ম, তাহা তাহাদিগের অনিষ্টদায়ক।

(৪) যাগ যজ্ঞ, ব্রতাদির অনুষ্ঠান, সদাচার, ইন্দ্রিয়সংযম, অহিংসা, দান ও বেদাধ্যয়ন এ সকল কার্য্যের নাম ধর্ম্ম; আর যোগাবলম্বন (চিত্তের বাহ্য বৃত্তি নিরোধ করতঃ জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার সংযোগ) দ্বারা আত্মদর্শনের নাম পরম ধর্ম্ম।

(৫) ধৃতি (সন্তোষ), ক্ষমা (অপকারীর প্রত্যপকার না করা), দম (বিষয় সংসর্গেও মনের অবিকার অথবা শীতাতপাদি দ্বন্দ্ব-সহিষ্ণুতা), অস্তেয় (অচৌর্য্য বা পরধন হরণ না করা), শৌচ (মৃদ্বারি দ্বারা যথা শাস্ত্র দেহ শোধন), ইন্দ্রিয়নিগ্রহ (রূপ রসাদি পঞ্চ বিষয় হইতে চক্ষুরাদি পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের আকর্ষণ), ধী (শাস্ত্রাদি তত্ত্বজ্ঞান), বিদ্যা (আত্মজ্ঞান), সত্য (যথার্থ কথন), এবং অক্রোধ (ক্রোধের কারণ সত্ত্বেও ক্রোধ সংবরণ করা) ধর্ম্মের এই দশবিধ লক্ষণ জানিবে।

(৬) অদত্ত দ্রব্যের অনুপাদান (অগ্রহণ), দান, অধ্যয়ন, তপস্যা, বিদ্যা, বিত্ত, তপঃ, প্রভাব, কুলে জন্ম, অরোগ এবং সংসার বন্ধনের উচ্ছেদের হেতু ধর্ম্ম হইতেই প্রবৃত্ত হয়। ধর্ম্ম হইতে সুখ ও জ্ঞান সমুৎপন্ন হয় এবং জ্ঞান হইতে মোক্ষ লাভ হইয়া থাকে।

(৭) সত্যযুগে সকল ধর্ম্মই চতুষ্পাদ বিশিষ্ট ছিল। মনুষ্যগণের সত্য বাক্য ছিল এবং অধর্ম্ম দ্বারা অর্থাগম ছিল না। বাস্তবিক ধর্ম্মের পাদ চতুষ্টয় না থাকিলেও কাল্পনিক পাদচতুষ্টয়ের দ্বারা তাঁহার সম্পূর্ণত্ব বর্ণনা করা যায়। যেমন লৌকিক ব্যবহার সাধনার্থ ষোড়শপণাত্মক কার্ষাপণের এক চতুর্থাংশকে পাদরূপে কল্পনা করে এবং কার্ষাপণ চতুষ্পাদবিশিষ্ট এইরূপ লৌকিক প্রতিপত্তি হয়। ধর্ম্মও সেইরূপ চতুষ্পাদ কিন্তু গবাদির ন্যায় চতুষ্পাদ নহেন।

(৮) সত্যযুগে লোকের রোগ ছিল না এবং সর্ব্ব কামনাই সিদ্ধ হইত এবং চারিশত বৎসর পরমায়ু ছিল, তদনন্তর ত্রেতাদি যুগে এক এক পাদ করিয়া পরমায়ু হ্রাস হইতে লাগিল।

(৯) যে নিয়মানুসারে মানবগণের সত্যযুগে চারিশত, ত্রেতায় তিনশত, দ্বাপরে দুইশত এবং কলিতে একশত বৎসর পরমায়ু নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সেই নিয়ম সৃষ্টির আদি হইতেই প্রসিদ্ধ রহিয়াছে। পরন্তু মনুষ্যের আয়ুর নিমিত্তীভূত কর্ম্ম, দেশ, কাল, ক্রিয়া এবং দ্রব্যের বিশুদ্ধতা ও অবিশুদ্ধতাই পরমায়ুর ন্যূনাতিরেকের কারণ। স্বীয় বিহিত কর্ম্মের হ্রাস হইলেই আয়ুর হ্রাস, বিহিত কর্ম্মের বৃদ্ধি হইলেই আয়ুর বৃদ্ধি ও বিহিত কর্ম্ম সমভাবে থাকিলেই আয়ুও সমতা প্রাপ্ত হয়। বালকগণের মৃত্যুপ্রদ কর্ম্মদ্বারা বালকগণ; যুবকগণের মৃত্যুপ্রদ কর্ম্মদ্বারা যুবকগণ ও বৃদ্ধগণের মৃত্যুপ্রদ কর্ম্মদ্বারা বৃদ্ধগণ মৃত্যু প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি শাস্ত্রানুসারী হইয়া স্বধ

---

(২) স্মৃতি।
(৩) স্মৃতি।
(৪) যাজ্ঞবল্ক্য সং।
(৫) মনুসংহিতা।
(৬) গরুড় পুরাণ, ১।২০৬।৯—১০।
(৭) মনুসংহিতা ১।৮১।
(৮) মনুসংহিতা ১।৮৩।
(৯) যোঃবাঃ রামায়ণ।

অবস্থিতি করে, সেই শ্রীমান্ ব্যক্তিই যথাশাস্ত্র পরমায়ু লাভ করিয়া থাকে।

(১০) এই ভারতবর্ষেই সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারিযুগ বিদ্যমান আছে, অন্য কোন বর্ষে এরূপ যুগভেদ নাই। এই বর্ষে যোগীগণ তপস্যা, যাজ্ঞিকগণ যজ্ঞানুষ্ঠান ও ধার্ম্মিকগণ পরলোকের মঙ্গল বিধানার্থ আদরপূর্ব্বক বিবিধ বস্তু দান করিয়া থাকেন। জম্বুদ্বীপের লোকেরা বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া যেরূপে যজ্ঞময় সনাতন বিষ্ণুর অর্চ্চনা করেন, অন্যান্য দ্বীপে সেরূপ লক্ষিত হয় না। জম্বুদ্বীপের মধ্যে ভারতবর্ষই কর্ম্মভূমি। অন্যান্য সমুদায় স্থান ভোগভূমি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। প্রাণীগণ সহস্র সহস্র জন্মের পর অতি কষ্টে বহু পুণ্যে এই স্থানে মানবদেহ প্রাপ্ত হয়।

অতএব আমি আজকার প্রবন্ধে ভারতীয় সনাতন ধর্ম্মের সমষ্টি স্বরূপ যথাশক্তি চিত্রিত করিলাম; ব্যষ্টিস্বরূপ পরবর্ত্তী প্রবন্ধগুলিতে সময় মত আলোচিত হইবে।

গত অধিবেশনে ধর্ম্মতত্ত্ব-পরিশিষ্ট শীর্ষক প্রবন্ধের যে অংশ পঠিত হইয়াছে, সম্প্রতি তাহার ব্যষ্টি স্বরূপ আলোচিত হইবে। ব্যষ্টি স্বরূপ অঙ্কনের পূর্ব্বে ধর্ম্মের একটী সাধারণ লক্ষণ স্থির করা সঙ্গত মনে করি।

সাধারণে ধর্ম্মের লক্ষণ বলিয়া থাকেন—"ধ্রিয়তে যেন স ধর্ম্মঃ।" ইহার স্থূলতঃ অর্থ যে ধারণ করে সেই ধর্ম্ম। বৈষ্ণব মালা ধারণ করেন, বাবু ছড়ি ধারণ করেন, অতএব বৈষ্ণব বা বাবু ধর্ম্ম তাহা নহে। ধর্ম্ম শব্দটী রূঢ়। "গচ্ছতীতি গৌ" যে গমন করে সে গরু, ইহা ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ হইলেও গমনশীল পদার্থ মাত্র গরু না হইয়া, যেরূপ গল কম্বলাদিবিশিষ্ট চতুষ্পদ জন্তু বিশেষ গো শব্দের প্রতিপাদ্য; তদ্রূপ ধারণশীল পদার্থ মাত্র ধর্ম্ম না হইয়া, জগৎরক্ষণসমর্থ সত্ত্বগুণোদ্ভাসিত প্রাকৃতিক নিয়মই ধর্ম্ম।

যাহার অন্যথাভাব হইলে জগদ্বিপ্লুত হয় তাহাই ধর্ম্ম। আমরা ধর্ম্ম বলিতে অনেক গুলি কথা প্রতিপাদ্যের অন্তর্ভূত করিয়া থাকিলেও আপাততঃ শৌচ সদাচারকে ধর্ম্ম বলিয়া বুঝি। একজন হয়ত খুব চিতা ফোঁটা কাটিয়া মুখে মন্ত্রোচ্চারণ করিতে করিতে দেবালয়ে ফিরাফিরী করিতেছেন, তাহা দেখিয়া সিদ্ধান্ত করা হইল ইনি, ধার্ম্মিক। আর একজন হয়ত শৌচে নাই সদাচারে নাই অথচ চিত্তকে নির্ব্বাত দীপবৎ অকম্পিত রাখিয়া নির্ব্বিকল্প সমাধিতে নিয়োজিত করিয়া জড়বৎ নিশ্চল নিস্তব্ধ। তাহা দেখিয়া স্থির করা হইল ইনি একটি অকর্ম্মা অলস ধর্ম্মাচরণে অসমর্থ পুরুষ। এরূপ সিদ্ধান্ত আজ কাল ভূরি ভূরি দেখিতে পাওয়া যায়। ধর্ম্ম শব্দের সঙ্কীর্ণ অর্থ গ্রহণ করায় আজকালকার এই অভিনব সিদ্ধান্ত শিক্ষিত সমাজে স্থান পাইয়াছে। বাস্তবিক বলিতে গেলে ধর্ম্ম শব্দের সেরূপ সংকীর্ণ অর্থ গ্রহণ করিয়া আমরা স্ব স্ব কপোলকল্পিত এক একটা ধর্ম্মে যাহা গোঁড়ামি আরম্ভ করিয়া থাকি তাহাই আমাদের ধর্ম্মবিপ্লবের অন্যতম বিশিষ্ট কারণ। ব্রাহ্মণের সন্ধ্যা-বন্দনাদি, ক্ষত্রিয়ের প্রজাপালনাদি, বৈশ্যের কৃষি-গোরক্ষাদি ও শূদ্রের সেবাদি যেরূপ ধর্ম্ম, জলের শৈত্য, অগ্নির উত্তাপ, পৃথিবীর কাঠিন্যও তদ্রূপ এক একটী ধর্ম্ম। কিন্তু আমরা ব্রাহ্মণের সন্ধ্যাবন্দনাদিকে ধর্ম্ম বলিয়া থাকি এবং জলের শৈত্যাদিকে স্বভাব বলি। স্বভাব প্রকৃতি বা ধর্ম্ম এই তিনটী প্রায় এক পর্য্যায়।

১। অতীত্যৈব গুণান্ সর্ব্বান্ স্বভাবো মূর্দ্ধি বর্ত্ততে।

৩। এক এব সুহৃদ্ধর্ম্মো নিধনেঽপ্যনুযাতি যঃ।

এই তিনটী পদ্যাংশের ভাবার্থ অনুশীলন করিলে সহজে বুঝা যাইবে যে, স্বভাব, প্রকৃতি বা ধর্ম্ম এই তিনটী শব্দ প্রায় এক পর্য্যায়। ব্যবহারেও দেখা যায় বিপত্তি পতনের পূর্ব্বে যখন লোক ধর্ম্মের প্রতি অনাস্থাসম্পন্ন হয়, তখন সাধারণে বলিয়া থাকে যে লোকটার স্বভাব খারাপ হইয়াছে—প্রকৃতি ছাড়া হইয়াছে। তাহা হইলেই দেখুন স্বভাব, প্রকৃতি বা ধর্ম্ম এক প্রতিপাদ্যের অন্তর্ভূত কি না? দার্শনিকগণ জীবের সঞ্চিত কর্ম্ম প্রারব্ধে পরিণত হইলে, তাহাকে কেহ কেহ স্বভাব, কেহ প্রকৃতি, কেহ বা ধর্ম্মাধর্ম্ম বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন। দুঃখের বিষয় ধর্ম্ম বলিতে আমরা কেবল পূজা, পাঠ, দয়া-দাক্ষিণ্য বা শৌচসদাচার ধরিয়া, ভারতীয় হিন্দুধর্ম্মের বিশাল শরীরকে নিতান্ত সঙ্কুচিত করিয়া ফেলি। সমুদ্রকে রত্নাকর না বলিয়া হীরকাকর বলা যেরূপ তাহার খ্যাতির সংকোচক, আমাদের সনাতন হিন্দুধর্ম্মকেও তদ্রূপ এক একটী নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে আবদ্ধ রাখা তাহার গৌরবের অবরোধক। তবে ব্যষ্টি স্বরূপ আলোচনার সময় তদ্রূপ সংকোচ করা অমঙ্গলজনক নহে। কারণ সংকীর্ণবুদ্ধি অধিকারী বিশাল সনাতন ধর্ম্মের বিরাট স্বরূপ ধারণা করিতে সমর্থ হইবে না। ব্যষ্টি হইতে সমষ্টিতে যাওয়াই প্রাকৃতিক নিয়ম। অতএব ধর্ম্মের ব্যষ্টি স্বরূপ আলোচনার পূর্ব্বে আমাদের জানিয়া রাখা উচিত যে, এই ব্যষ্টি স্বরূপ আলোচনার প্রসঙ্গে আমাদের সনাতন ধর্ম্মের সমষ্টি স্বরূপ একমাত্র লক্ষ্য থাকিলেও আমরা অপাততঃ ধর্ম্মের ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপ দেখাইতে বাধ্য হইব।

ধর্ম্ম আপাততঃ বাহ্যিক ও আন্তর দুইভাগে বিভক্ত হইতে পারে। দেবোদ্দেশে তুলসী চয়ন, তীর্থপর্য্যটন, গঙ্গাস্নান ইত্যাদি ইত্যাদি বাহ্যেন্দ্রিয় নির্ব্বাহ্য ক্রিয়াকলাপ বাহ্যিক ধর্ম্ম। বৈরাগ্য, ক্ষান্তি, ঔদার্য্য ইত্যাদি অন্তরেন্দ্রিয় মনের অন্তর্মুখীন বৃত্তিগুলি আন্তর ধর্ম্ম। আন্তরধর্ম্ম জ্যেষ্ঠ ও বাহ্যিকধর্ম্ম কনিষ্ঠ। লক্ষ্মণের মত এ ক্ষেত্রে কনিষ্ঠই জ্যেষ্ঠের প্রধান সহায়। আজকাল অনেকেই বাহ্যিক ধর্ম্মের প্রতি বিবিধ প্রকার উপহাস করিয়া থাকেন। দুঃখের বিষয় তাঁহারা প্রণিধান পূর্ব্বক চিন্তা করেন না যে, তাঁহাদের অভীপ্সিত আন্তর ধর্ম্মটী বাহ্য ধর্ম্মের সহিত দুগ্ধে ঘৃতের ন্যায়, তপ্ত-অয়ঃপিণ্ডে অগ্নির ন্যায় অভেদ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ। যাঁহাদের অনুভব আছে, অবশ্য তাঁহারা জানেন যে, কাষায় বাস পরিধান করিয়া ত্রিপুণ্ড্র কাটিয়া কমণ্ডলু হস্তে বহির্গত হইলে স্বভাবতই মনে আসে যে—

"বম বম হর হর শিব শঙ্কর" বলি—

কিন্তু তেড়ি কাটিয়া ছড়ি ধরিয়া জামাজোড়া পরিয়া বাহির হইলে, তখন নিধুবাবুর টপ্পা ও গোপাল উড়ের কবির গানগুলি স্বভাবতই মনে আসিয়া উদিত হয়। তাই বলিতেছিলাম, বাহ্যিক ধর্ম্মের সহিত আন্তর ধর্ম্ম ঘনিষ্ট সম্বন্ধে সম্বদ্ধ। ইহা যে কেবল আমরা সিদ্ধান্ত করিতেছি তাহা নহে। পঞ্চদশীকার বিদ্যারণ্য মুনিও স্পষ্টতঃ বলিয়াছেন—

"ন হৃদ্যাকার মাধাতুংবাহ্যস্যাপেক্ষিতত্বতং"

হৃদ্যাকার অর্থাৎ আন্তর পদার্থ প্রস্তুত করিতে বাহ্যের অপেক্ষা অবশ্যম্ভাবী। অতএব ধর্ম্ম সম্বন্ধে বাহ্যাড়ম্বর দেখিয়া সন্দিহান হওয়া অথবা উপহাস করা বিজ্ঞোচিত কার্য্য নহে। স্নান আহ্নিক শৌচ সদাচারাদি যাহা কিছু নৈষ্টিক হিন্দুর বাহ্যানুষ্ঠান সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, সেই সমস্ত অনুষ্ঠান হইতে আরম্ভ করিয়া অন্তরে অন্তর্য্যামীর সাক্ষাৎকার

পর্য্যন্ত কোনটীই ধর্ম্মবহির্ভূত নহে, সমস্তই ধর্ম্ম।

সাধারণতঃ আজকাল নব্যশিক্ষিত বাবু দিগকে এই বাহ্যিক ধর্ম্মের প্রতি কটাক্ষ করিতে দেখিলে যুগপৎ ক্ষোভ ও বিস্ময় হয়। বৈষ্ণবের সর্ব্বাঙ্গব্যাপ্ত হরেকৃষ্ণ নামের ছাপ দেখিয়া বাবুরা বলিয়া থাকেন,—আহা বৈষ্ণব ঠাকুরটী যেন "ডেড্‌লেটার আফিসের ফেরৎ চিঠি।" হাতে নামের ঝোলা দেখিলে বলেন "কুঁড়াজালী." মুণ্ডিত মুণ্ড—তাহাতে শিখাস্পর্শী তিলক ও ছোট্‌হীন বহির্বাস দেখিয়া বলিয়া থাকেন, "বাবাজী যাচ্ছেন না আস্‌ছেন?" ইত্যাদি বিবিধ উপহাস করিয়া থাকেন। কথা গুলি হাস্যোদ্দীপক হইলেও ধার্ম্মিকের দুঃখজনক সন্দেহ নাই। আমরা বলি ব্যবসাদার অর্থাৎ সাজা বৈষ্ণবকে বাদ দিয়া ইহাঁরা যদি প্রকৃত বৈষ্ণবের প্রতি এরূপ বিদ্রূপ বা ব্যঙ্গ করিয়া থাকেন, তাহা তাঁহাদের অনভিজ্ঞতার পরিচায়ক। বাবুরা ইহা বিলক্ষণ জানেন যে, ইস্কুলে যাইবার পোষাক পরিচ্ছদ ও বেড়াইতে যাইবার পোষাক পরিচ্ছদ একরূপ নহে। যে সময়ে যে পরিচ্ছদ যে কার্য্যের অনুকূল সে সময়ে সেই পরিচ্ছদ যে সর্ব্বথা গ্রাহ্য ইহা বোধ হয় কি বাবু কি গোঁড়া সকলেই স্বীকার করিবেন।

বাবুগণ বহুমূল্য কাপড়ে আবৃতাঙ্গ হইয়া বিলাসিতার পরিচয় দিতেছেন, বৈষ্ণব, নগণ্য একখানি কাপড় ছেঁড়ায় কটি আবৃত করিয়া দীনতার পরিচয় দিতেছেন। বাবু সর্ব্বাঙ্গে যুথী-চামেলি-ফুলেলা তৈলে এবং লেভেণ্ডার এসেন্স ইত্যাদি সদগন্ধবিশিষ্ট পদার্থে দেহ-খানি সৌরভময় করিয়া বিলাসিনীর বিলাস-লীলার উপযুক্ত করিতেছেন, বৈষ্ণব, চন্দন উশীর তুলসীর দ্বারা অভিব্যাপ্ত শরীর হইয়া জগদ্ধাত্রী বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীমতী রাধিকার করুণা-কণা পাইবার পথ উন্মুক্ত করিতেছেন। বাবুরা হাতের কব্জায় চামের দড়িতে ঘড়ি বাঁধিয়া সময় দেখিবার সুবিধা করিতেছেন, বৈষ্ণব, নামের ঝোলা লইয়া রসময়কে ডাকিবার সুবিধা করিতেছেন। মন বিশাল জগতে বিরাট পুরুষের বিরাট আকার নির্ণয় করিতে গিয়া হতভম্ব হইয়া পড়িবে। অতএব মনকে বিশাল জগত হইতে প্রত্যাহৃত করিয়া হস্তে আনিয়া যেন একটী লক্ষ্যের গণ্ডীতে আবদ্ধ রাখা হইতেছে। তাহা হইলে দেখুন উপহাস্য বৈষ্ণব ও উপহাসক বাবু উভয়ে স্ব স্ব উদ্দেশ্যের অনকূলে একটা নয় একটা বাহ্যিক আড়ম্বর গ্রহণ করিয়াছেন কি না? এরূপ অবস্থায় নিজের ঔপাধিক ভাবটী বিস্মৃত হইয়া পরের ঔপাধিক ভাবটী লইয়া হাস্য বিদ্রূপ করিলে একদেশদর্শী বলিয়া প্রতিপন্ন হওয়া যায় না কি? বাবু ও বৈষ্ণবের উদ্দেশ্য দ্বিতয়ের মধ্যে কোনটী সাধু, সুধীগণ তাহার বিবেচনা করুন।

তাই বলিতেছিলাম বাবুগণের স্বীয় দোষের অনম্বেষণ ও পর দোষের ব্যাখ্যান দেখিলে যুগপৎ ক্ষুব্ধ ও বিস্মিত হইতে হয়। ধর্ম্মকে বাহ্য ও আন্তর দুইভাগে বিভক্ত করিলে ও আন্তর ধর্ম্ম যে বাহ্যসাপেক্ষ ইহা এক প্রকার বলা হইল। অতঃপর সামাজিক ধর্ম্মের কথা বলিব।

কতকগুলি সংপৃক্ত ব্যক্তি লইয়া এক একটী পরিবার গঠিত হয়। এবং অসংখ্য পরিবার লইয়া এক একটী সমাজ গঠিত হয়। সমস্ত পরিবার গুলিকে এক সূত্রে গ্রথিত করিয়া সুনিয়মে ও সুশৃঙ্খলায় চালিত করতঃ সমাজ-শরীরকে যে অক্ষুন্ন রাখে তাহাই সামাজিক ধর্ম্ম।

পারিবারিক ধর্ম্ম ভিন্ন ভিন্ন হইলেও সামাজিক ধর্ম্ম এক। আপত্তি হইতে পারে সমাজের শরীর স্বরূপ পরিবার গুলি ভিন্ন ভিন্ন

ধর্ম্মাক্রান্ত হইলে সামাজিক ধর্ম্ম এক হইবে কিরূপে? তাহা হইতে পারে—ধর্ম্মের অধিকাংশে আমাদের ভিন্ন ভিন্ন মত থাকিলেও এমন একটী অংশ আছে, যাহাতে আমরা সকলে এক মত আছি, ও থাকিব তাহাই সামাজিকধর্ম্ম।

* এক রজ্জুতে ২০।২৫টী গরু গ্রথিত থাকিলেও তাহাদের নাসারজ্জু পৃথক পৃথক। নাসারজ্জুর পার্থক্য থাকিলেও গ্রথনরজ্জু যেমন ভিন্ন নহে, তদ্রূপ পারিবারিক ধর্ম্মে পার্থক্য থাকিলেও সামাজিক ধর্ম্ম এক। এই সামাজিক ধর্ম্মের আকার ও প্রকার কিরূপ ও এই সামাজিক ধর্ম্ম অব্যাহত থাকিলে সমাজ যে প্রকারে উন্নত হয় এবং ইহার বিপর্য্যয়ে সমাজ কি প্রকার বিপর্য্যস্ত হয়, অতঃপর তাহারই আলোচনা করিব। আজ এই পর্য্যন্ত। হরে ওঁ তৎসৎ।

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র প্রহরাজ

গার্হস্থ্য রন্ধন-প্রক্রিয়া

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

দুগ্ধ

দুধই মানুষের প্রধান আহার্য্য। মনুষ্য কেন, পশুজাতিও এই দুগ্ধ এক প্রকারে না এক প্রকারে (মাতৃদুগ্ধ বা অন্য দুগ্ধ) পান করিয়া বর্দ্ধিত হয়। বয়োবৃদ্ধি সহকারে দুগ্ধপান কমিয়া যায়। "যব্ দাঁত নখে তব্ দুধ দিও।" এই মহাজন-বাক্যের অর্থ কি? যতদিন দাঁত উঠে নাই, ততদিন দুগ্ধ (স্তন্য) দিয়াছিল। আবার "Milk is wine for children, and wine is milk for old men." অর্থাৎ শিশুদিগের পক্ষে দুধ সুরার কার্য্য করে, এবং বয়োধিক্যে সুরা, দুগ্ধের ন্যায় উপকারী। এটি সাহেবি মত। হিন্দুগৃহে—নিষ্ঠাবান্ মুসলমানদিগের মধ্যেও—সুরা অস্পৃশ্য, এজন্য দুগ্ধই সার্ব্বকালিক ব্যবস্থা। সকল অবস্থাতেই দুগ্ধ (স্বল্লাধিক পরিমাণে) মহোপকারী—শৈশবে স্তন্যদুগ্ধ, মৃত্যুশয্যায় গঙ্গাজলমিশ্রিত গাভীদুগ্ধ। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, "দুধ ফিরে গলি গলি, আউর সুরা বৈঠ্‌কে বিকায়।" অর্থাৎ দুধ লইয়া বিক্রয়ার্থ গোয়ালারা গলি গলি ফেরি করিয়া বেড়ায়, কিন্তু সুরা একস্থানে বসিয়া বিক্রীত হইয়া থাকে। হায়রে আমাদের দেশ! হায়রে আমাদের সভ্যতা! হায়রে আমাদের Temperance Society! সুরার প্রাধান্য কিছুতেই কমিতেছে না। ইহাতে যে কত লোকের—কত নিরীহ গৃহস্থের সর্ব্বনাশ সাধিত হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। সকল জানিয়া শুনিয়াও সেই হলাহল পানে অনেক ভদ্র ভেকধারী যুবক ইহাতে কুণ্ঠিত নহে। তাহারা নরাধম, পশু অপেক্ষাও হীন, ইতর হইতেও ইতর।

আজন্ম কেবলমাত্র দুগ্ধপানে শরীর ধারণ সম্ভব, ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। ব্রহ্মচর্য্যের সহিত আজন্ম কেবল দুগ্ধপান কান্তি ও পুষ্টিবর্দ্ধক, তাহার সন্দেহ নাই। অনেক মহাপুরুষ এই পন্থা অবলম্বনে দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়াছেন। তাঁহাদিগের তেজঃপুঞ্জ শরীর দেখিলে স্তম্ভিত হইতে হয়।

পল্লীগ্রামে দুগ্ধ বিশুদ্ধ অথচ সুলভ।

সহরে বা নগরীতে ওরূপ সম্ভাবনা বিরল; এবং দুগ্ধপোষ্য শিশুগণের অধিকাংশই যকৃৎ রোগগ্রস্ত। নিকৃষ্ট দুগ্ধই ইহার মূলীভূত কারণ। গোয়ালা মহাশয়েরা খাঁটিদুধের ধার ধারেন না। আবার তাঁহারাই গৃহস্থদিগের প্রধান অবলম্বন; অবস্থা বিশেষে গরু পোষা সম্ভবে না। সুতরাং শিশুগণ যে যকৃৎরোগাক্রান্ত হইবে তাহার বিচিত্র কি?

আরও দেখিতে পাওয়া যায়, দুগ্ধব্যবসায়ীগণ অনাবৃত পাত্রে দুগ্ধ লইয়া যায়। এটি একটি সামান্য বিষয় নহে। কারণ, পথিমধ্যে বহুতর দুর্গন্ধময় স্থান আছে। দুগ্ধের আকর্ষণ-শক্তি-বলে তত্তৎ স্থানে বিদ্যমান কীটাণু অনাবৃত পাত্রস্থ দুগ্ধ কলুষিত করে। সামান্য অগ্নির উত্তাপে কীটাণু বিনষ্ট হওয়া সন্দেহস্থল।

এতদ্ভীতি নিরাকরণার্থে সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার ইন্দুমাধব মল্লিক মহাশয় এক প্রকার (Stove) চুল্লী আবিষ্কার করিয়াছেন। ষ্টীম (বাষ্প) দ্বারা দুগ্ধকে sterilize করা হয়। sterilize শব্দে অনুর্ব্বরা, অর্থাৎ কীটাণুশূন্য। ভদ্র-মহিলাগণের সংস্কার এই যে, দুগ্ধ অগ্নি-উত্তাপে জ্বাল দিতে দিতে যতবার ফাঁপিয়া (ওতলাইয়া) উঠে, ততই ভাল—রসনা পরিতৃপ্তিকর হয়। কিন্তু তাহা শীঘ্র পরিপাক না হইতে পারে। Sterilize হইলে দুগ্ধ গুমে গুমে সিদ্ধ হয়—ওতলায় না। ইহার অপর গুণ এই যে, প্রক্রিয়াক্রমে দুগ্ধ ২৪ ঘণ্টা কাল অবিকৃত থাকে। ওতলান হইলে তাহা একপ্রকার অসম্ভব। অগ্নির সামান্য উত্তাপে বসাইয়া রাখিলে কিছুকাল অবিকৃত থাকিতে পারে, কিন্তু ঘনীভূত হইয়া অধিকতর দুষ্পচ্য হইয়া উঠে।

সহরের গোয়ালারা যে সকল প্রণালীতে দুগ্ধে অপদ্রব্য মিশ্রিত করে, তাহার কয়েকটী নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল,:—

১। দুইটী সুবৃহৎ কটাহ। একটীতে অর্দ্ধমণ যথার্থই খাঁটি দুগ্ধ; অপরটিতে সেই পরিমাণে জল। দুইটি কটাহই জ্বালে চড়ান হইয়াছে—দুধ ও জল উভয়ই ফুটান হইতেছে। একটি বড় হাতা দ্বারা এক হাতা জল, দুগ্ধের কটাহে দেওয়া হইতেছে; আবার, এক হাতা দুধ, জলের কটাহে নিক্ষিপ্ত হইতেছে। এই প্রক্রিয়া পর্য্যায়-ক্রমে চলিতেছে। ক্রমে দুইটি কটাহই খাঁটি দুগ্ধে (!) পরিণত ও পরিপূর্ণপ্রায় হইয়া উঠিল। জ্বালের গতিকে দুই তিন সের কমিয়া যাওয়া সম্ভব। আস্বাদন প্রীতিকর করিবার জন্য, কিছু বাতাসা মিশ্রিত করা হইল। মূল্য ধার্য্য হইল টাকায় পাঁচ সের। অতি সুলভ! শীঘ্রই সমস্ত দুধ বিক্রয় হইয়া গেল।

২। গৃহস্থকে ভুলাইবার জন্য, এরারুট প্রভৃতি মিশাইয়া "খেঁড়ো" গাইয়ের (যাহার অনেক দিন বৎস হইয়াছে) দুধ—গাঢ় যেন "বটের আঠা," বলা হয়। বাতাসা ত আছেই!

৩। পর্য্যুসিত দুগ্ধে কিয়ৎ পরিমাণে উষ্ণ জল ও বাতাসা মিশ্রিত করিয়া ঈষদুষ্ণাবস্থায় আনিয়া, "এইমাত্র দোহন হইয়াছে, সুতরাং গরম রহিয়াছে। বিন্দু মাত্র জল সংযোগ হইতে পারে নাই।" বলা হয়।

৪। গোয়ালা, টাকায় সার্দ্ধ-তিন সের মূল্য ধার্য্যে, গৃহস্থের বাড়ীতে গরু আনিয়া, সর্ব্ব-সমক্ষে দোহন করিয়া দিবে। রাত্রিতে গরুকে একপেট লবণাক্ত জল, জোর করিয়া চোঙ্গা দ্বারা গলাধিকৃত করা হইল। প্রাতে, গৃহস্থের সম্মুখে খাঁটি (শাদা জল) দুধ, আবশ্যকমত দোহন করিয়া দিল!

৫। কলিকাতার গোয়ালারা, গরুর উপর যেরূপ অত্যাচার করে, তাহা শুনিলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়। প্রথমতঃ তাহারা সবৎসা দুগ্ধবতী আনিয়াই বৎসটী কসাইকে বিক্রয় করে। তাহার পর, একটী মৃত বৎসের চর্ম্ম সংগ্রহ করিয়া, বিচালীপূর্ণ করিয়া, কতকটা বাছুরের আকারে পরিণত করে। দোহন কালে সেইটী গাভীর সম্মুখে রাখে গাভীটী যতদিন দুগ্ধবতী থাকে, ততদিন একরূপ চলে। দুগ্ধ কমিয়া আসিলে, "ফুকা" প্রক্রিয়া আরম্ভ করে। পরে, যখন একেবারে দুধ বন্ধ হয়, তখন গাভীটী কসাইকে বিক্রয় করিয়া থাকে—যাহা কিছু আদায় হয়। গো-শালায় গরু, মহিষ যেরূপ কদর্য্যভাবে রক্ষিত হয়, সে দৃশ্যও অতি শোচনীয়। এই সকল দুষ্কৃতের জন্য, পল্লীগ্রামের সরল গোপগণ, কলিকাতার গোয়ালাদিগকে "কসাই" শ্রেণীভুক্ত করিয়া থাকে, এবং তাহাদিগকে অতিশয় ঘৃণা করে।

৬। গৃহস্থ বাটীতে গরু রাখিয়াছেন। তত্ত্বাবধানের জন্য গোয়ালা নিযুক্ত রাখিয়াছে। গোয়ালাটী কিন্তু বড় চতুর। নিভৃতে গাভী দোহন কালে, দুগ্ধ, পাত্রে না পড়িয়া, গোয়ালার মুখে পড়িতেছে। দোহন পাত্রটি অর্দ্ধ-জল-পূর্ণ; তাহাতেই দোহন, সুতরাং সফেন। ক্ষতি পূরণ জল দ্বারা হইল।

৭। অনেক দরিদ্র গৃহস্থ জীবিকানির্ব্বাহার্থে গাভী পালন করিয়া থাকেন, অর্থাৎ তজ্জাত দুগ্ধ বিক্রয় করেন। প্রকারান্তরে গোয়ালার ব্যবসায় ভিন্ন, ইহাকে আর কিছুই বলা যায় না। ভদ্র (অপেক্ষাকৃত সম্পত্তিশালী) ব্যক্তিগণ, বিশুদ্ধ দুগ্ধ পাইবার প্রত্যাশায়, তাঁহাদিগকে অগ্রিম থাকেন। ফলে, কিন্তু তাহা ঘটে না। কারণ, অতি প্রত্যুষে, ক্রেতৃ-সমাগমের পূর্ব্বে, দোহন ক্রিয়া সম্পাদিত হইয়া, দুগ্ধ-পূর্ণ ভাণ্ড এক স্থানে রক্ষিত হইয়াছে। প্রাতে গৃহস্বামী শৌচে যাইতেছেন। সম্মুখেই দুগ্ধভাণ্ড। খাঁটি দুধ এরূপে রাখা অকর্ত্তব্য ভাবিয়া, হস্তস্থিত জলপাত্র (গাড়ু) হইতে কিঞ্চিৎ জল (যে জলই হউক) তাহাতে দিলেন। পরে কর্ত্রীঠাকুরাণী। খাঁটি দুধ দিলে গরুর বাঁট আগা করে, অতএব কিছু জল দেওয়া হইল। তাহার পর বধূমাতার পালা। গিন্নী ভুলিয়া গিয়াছেন ভাবিয়া, তিনিও জল (খিড়কির পুকুরের) সংযোগে কুণ্ঠিতা হইলেন না। ইত্যাদি। পরে ক্রেতা ভদ্রলোক বিশুদ্ধ পাইয়া চরিতার্থ হইলেন!

এবম্বিধ বহু কদর্য্য প্রণালী দ্বারা, গোপালকগণ, এবং হিতাহিত জ্ঞানশূন্য ভৃত্যগণ দুগ্ধ কলুষিত করে। তৎসমুদয় লিপিবদ্ধ করিলে, প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি সম্ভব।

এই সমস্ত ব্যাপার পর্য্যবেক্ষণ করিলে, বিশুদ্ধ দুগ্ধ প্রাপ্তির আশায় একরূপ হতাশ হইতে হয়। প্রহরী যতই দক্ষ এবং সতর্ক হউক না কেন, চতুর চোর, চক্ষে ধূলি দিয়া প্রায়শঃ স্বকার্য্য সাধন করে। গৃহস্বামী স্বয়ং, অথবা বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী দ্বারা দুগ্ধ আহরণ বা পর্য্যবেক্ষণ করা ভিন্ন গত্যন্তর দৃষ্ট হয় না। শরীর ধারণের জন্য নিজের এবং পুত্র কলত্রদিগের স্বাস্থ্যের অনুরোধে, তাঁহার এই পরিশ্রম স্বীকার অবশ্য কর্ত্তব্য।

• পর্য্যাসিত দুগ্ধ গুরু এবং শীঘ্র পরিপাক হয় না। উষ্ণ দুগ্ধ কফনাশক। ধারোষ্ণ দুগ্ধ হিতকারী। কাঁচা (অপক্ক) অথবা লবণ-মিশ্রিত দুগ্ধ পান নিষিদ্ধ। দুগ্ধের

গো-দুগ্ধ ঈষৎ হরিদ্রাবর্ণ, লঘু এবং তেজ-বর্দ্ধক। মহিষ-দুগ্ধ, শ্বেতবর্ণ, গুরু ও বলবর্দ্ধক, কিন্তু বাতরোগীর পক্ষে অনিষ্ট-সাধক। গো-দুগ্ধ হইতে মহিষ-দুগ্ধে অধিক পরিমাণে ঘৃত উৎপন্ন হয়। রন্ধন কার্য্যে দুগ্ধ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

বৎসরাধিক কাল দুগ্ধ অবিকৃত রাখিবার প্রয়োজন হইলে, উহা একটি বোতলে পুরিয়া মুখ অনাবৃত অবস্থায় জল-পূর্ণ কটাহে এরূপে সংরক্ষণ আবশ্যক যে, বোতলের মুখ জলের উপর থাকে,—যেন জল প্রবেশ করিতে না পারে। পরে উক্ত কটাহ ১৫।২০ মিনিট কাল (দুগ্ধের বোতল সহিত) জ্বাল দেওয়া হইলে, দুগ্ধপূর্ণ বোতলটি নামাইয়া লইয়া, উহার মুখ (airtight) বাতাস-নিরোধক ছিপিবদ্ধ করিলেই হইল।

দুগ্ধ হইতে নবনীত, মাখন, তক্র, ঘৃত, ছানা, দধি, ক্ষীর ও রাবড়ী প্রভৃতি বহুবিধ উপাদেয় সামগ্রী প্রস্তুত হয়। তন্মধ্যে যেগুলি রন্ধন কার্য্যে ব্যবহৃত হয়, তত্তৎ সমূহের প্রস্তুতীকরণ প্রক্রিয়া লিপিবদ্ধ হইল। অপরাপর গুলির আভাস মাত্র দেওয়া গেল। পাক-ক্রিয়ায় দুগ্ধেরও আবশ্যকতা আছে।

নবনীত।

সদ্যজাত দুগ্ধ মন্থনে ইহার উৎপত্তি। গো-দুগ্ধ-জাত নবনীত, স্নিগ্ধ এবং শূল, বাত ও কাসনাশক। মহিষ-দুগ্ধোদ্ভূত নবনীত পিত্তঘ্ন ও বলকারী। নবনীত উঠাইয়া লইলে, দুগ্ধের ন্যায় যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাকে (Skimmed milk) সর তোলা দুগ্ধ বলে। বহুমূত্র রোগে ইহা মহোপকারী; কিন্তু রন্ধনকার্য্যে ব্যবহৃত হয় না।

মাখন।

দুগ্ধ গাঢ় করিয়া জ্বাল দিয়া ধৎসামান্য অগ্নির উত্তাপে চুল্লীতে বসাইয়া রাখিতে হয়। তাহাতে দুগ্ধ আরও ঘনীভূত হইয়া পুরু (Thick) সর পড়ে। সেই সর মর্দ্দিত করিলে মাখন উৎপন্ন হয়। আবশ্যক মত সঞ্চিত মাখন জ্বাল দিয়া উৎকৃষ্ট ঘৃত প্রস্তুত করা যাইতে পারে। সুগন্ধ করিবার জন্য, জ্বাল দিবার সময় উহাতে গোটা কত লেবুর পাতা দিলেই হইল। তিন চারি দিন সর সঞ্চয় করিলে উহা পচিয়া যাওয়া সম্ভব। এজন্য উহাতে কিছু অম্লরস সংযোগ আবশ্যক।

অনেক সম্ভ্রান্ত (কিন্তু ভ্রান্ত) ভদ্রলোক বাজারে বিক্রীত মাখন হইতে ঘৃত প্রস্তুত করিয়া লয়েন। তাঁহাদের ধারণা যে, ঐ মাখন জ্বাল দিয়া বিশুদ্ধ মাখন পাওয়া যায়। বাজারের মাখন যে কতরূপ অপদ্রব্য-মিশ্রিত, বোধ হয় তাঁহারা অবগত নহেন। উত্তমরূপে মর্দ্দিত সুপক্ব কদলী, ইহার পরিমাণ-বর্দ্ধক। জ্বাল দিলে কিন্তু ধরা পড়ে—অসঙ্গতরূপে কমিয়া যায় ও নিম্নে অনেক অসার দ্রব্য (খাঁকরি) অবশিষ্ট থাকে।

আলীগড়ে উৎকৃষ্ট মাখন প্রস্তুত হয়। তাহাতে অপদ্রব্য মূলেই নাই। সেখান হইতে একেবারে শিল-মোহরাঙ্কিত টিন আনাইলে বিশুদ্ধ মাখন প্রাপ্তির সম্ভাবনা! কিন্তু রেইল-কর্ম্মচারী মহাশয়দিগের অনুগ্রহে অনেক ইতর বিশেষ হওয়া সম্ভব। এমন কি, টিন কাটিয়া প্রায় অর্দ্ধেক মাখন বহিষ্কৃত হইল। ওজন ঠিক রাখিবার জন্য ইষ্টক, প্রস্তর-খণ্ড, মৃত্তিকা (শুষ্কাবস্থায়) সন্নিবেশিত হইল; এবং টিনটি বেমালুম ঝালিয়া পূর্ব্ববৎ করা হইল। টিনটির নীচের দিকেই কাটা হয়, পরে পূর্ব্বোক্ত অপদ্রব্য মিশ্রণ এবং অবশেষে ঝালা হইয়া থাকে। ইহাতে বিশুদ্ধ মাখন প্রাপ্তির সম্ভাবনা কোথায়?

মাখন প্রস্তুত কালে প্রায়ই একটু জল সংযোগ আবশ্যক হয়। প্রস্তুত হইলে যে অবশিষ্ট শ্বেতবর্ণ দ্রব পদার্থ থাকে, উহা তক্র বা ঘোল নামে অভিহিত। ইহা পাক কার্য্যে ব্যবহৃত হয় না। তবে ভোজনের অর্দ্ধ ঘণ্টা পূর্ব্বে ইহা (ঘোল) পান করিলে অম্লরোগ নাশ করে; এবং অজীর্ণাদি রোগ আক্রমণ করিতে পারে না। আহারের মধ্যে এবং অব্যবহিত পরেই জল পান অনুচিত। বাজারে যে "ঘোল" বিক্রয় হয়, তাহা পান সর্ব্বথা নিষিদ্ধ। গৃহে দধি প্রস্তুত করিয়া মর্দ্দিত করিলে বিশুদ্ধ তক্র পাওয়া যায়।

নবনীত এবং মাখনে প্রভেদ এই যে, প্রথমোক্তটী কাঁচা (আম বা অপক্ব) দুগ্ধ হইতে প্রস্তুত হয়, এবং দ্বিতীয়টি পক্ব দুগ্ধ-সম্ভূত। নবনীতের সহিত অত্র প্রবন্ধের (পাক কার্য্যের) কোনও সংস্রব নাই। মাখনের সহিত যে সম্বন্ধ, তাহাও পরোক্ষ। মাখন হইতে ঘৃত, এবং ঘৃতের সহিত সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ। ঘৃত, রন্ধন-ক্রিয়ার একটি প্রয়োজনীয় উপকরণ।

ঘৃত।

আগ দিয়া ঘৃত প্রস্তুত করে। মাখন বিশুদ্ধ হইলে, ঘৃত যে পরিমাণে পাওয়া যায়, এবং অসার পদার্থ (সুপক্ক রম্ভা প্রভৃতি) মিশ্রিত হইলে যেরূপ হয়, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এখানে তাহার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। সুপক্ক কদলীর তো কথাই নাই, অধুনা চিনা বাদামের এবং রেড়ির তৈল প্রভৃতি মিশ্রিত হইতেছে। এ সমস্ত অপদ্রব্য তো পদে আছে। কাণ্ড-জ্ঞানশূন্য কতকগুলি ব্যবসাজীবী, বসা পর্য্যন্ত মিশ্রিত করিতে কুণ্ঠিত নহেন। বাজারের ঘৃত প্রায়ই দুর্গন্ধময়। এই সমস্ত ইহার কারণ। ঘৃতে যখন বসা মিশ্রিত হইতেছে, তখন আর উহাতে আস্থা থাকে না। এজন্য অনেকে ঘৃত কিম্বা ঘৃতপক্ক খাদ্য আদৌ ব্যবহার করেন না।

মুঙ্গেরের মট্‌কি এবং চন্দ্রকোণার ঘৃত সুপ্রসিদ্ধ। কিন্তু অধুনাতন সময়ে ব্যবসাজীবীর চরিত্র যে নিষ্কলঙ্ক থাকিবে তাহা কে বলিতে পারে? এই সমস্ত স্থানে যে ভেজাল চলিতেছে না তাহার প্রমাণ কি? হইতে পারে, তত্তৎ স্থানের মহাজনেরা বড় ধার্ম্মিক, এবং নিষ্ঠাবান্, এবং প্রথম প্রথম স্বয়ং সমস্ত পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। একবার সুখ্যাতির সহিত ব্যবসা চলিলে, উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধির সহিত ব্যবসা বৃদ্ধি হইয়া থাকে। তখন আর স্বচক্ষে সমস্ত তত্ত্বাবধান অসম্ভব। তখন যে নীচপ্রকৃতি স্বার্থপরায়ণ কর্ম্মচারিগণ অপদ্রব্য চালাইয়া নিজ নিজ উদরপূর্ত্তি করিবে, তাহার সন্দেহ নাই। সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, গৃহে দুগ্ধ হইতে মাখন ও ঘৃত প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করাই যুক্তিসঙ্গত। বাজারের ঘৃতপক্ক খাদ্য একেবারেই অব্যবহার্য্য।

খুরজা মোকামের পাতিরাম, এবং অন্ন-পূর্ণা অথবা রাধাকৃষ্ণ প্রভৃতি মার্কা ঘৃত, এখন গৃহস্থের প্রধান অবলম্বন হইয়াছে। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় গৃহস্থের অন্য পন্থা নাই বলিলেই হয়। অপদ্রব্য-মিশ্রিত ঘৃতে একটু লেবুর রস দিয়া, নাসিকা এবং রসনা উভয়ের সন্তোষ সাধন করা হয়।

ক্ষীর।

সামান্য মিষ্ট সংযোগে বিশুদ্ধ দুগ্ধ জাল দিলে ঘনীভূত হইয়া উত্তম ক্ষীর প্রস্তুত হয়। ইহা অতিশয় উপাদেয়, কিন্তু শীঘ্র হজম হয় না। উত্তম ক্ষীর গাঢ়তা প্রযুক্ত ভোজন পাত্রের যে স্থানে দেওয়া যায়, সেই স্থানেই থাকে। যাহা ভাল নয়, তাহা গড়াইয়া

পাত্রস্থ অন্যান্য খাদ্য-সম্মিলিত হইয়া একরূপ ভাব ধারণ করে। এরারুট প্রভৃতি মিশ্রিত করিয়া গাঢ়তা সম্পাদনে গোয়ালা মহাশয়েরা ত্রুটি করেন না।

অধিক পরিমাণে আগুন দিয়া জলীয় পদার্থ যথাসম্ভব নিষ্কাশিত করিলে, ক্ষীর কঠিনতা প্রাপ্ত হয়। মিষ্টান্ন বিক্রেতারা এতন্মিশ্রিত সন্দেশাদি প্রস্তুত করিয়া, প্রচুর লাভ করিয়া থাকে। কারণ, অল্পমাত্র ক্ষীর দিয়া সন্দেশাদিতে প্রভূত পরিমাণে চিনি চালাইতে পারে—ক্ষীরের সদ্‌গন্ধ থাকিলেই হইল। ছানার সন্দেশে তাহা পারে না; কারণ চিনি অধিক হইলে সন্দেশ ভাল হয় না—মূল্যেও কমিয়া যায়। রন্ধন কার্য্যে ইহার ব্যবহার বিরল হইলেও, ভোজনের শেষে ইহা এক প্রকার প্রধান আহার্য্য।

দধি।

দুগ্ধে অম্ল সংযোগে দধির উৎপত্তি, এবং ইহা রন্ধন কার্য্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সদ্যদধি স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী, এবং উহা সামান্য মাত্র অম্লাস্বাদী। বহুমূত্র এবং অতিসার রোগনাশক। মিষ্ট সংযোগে জীর্ণকারক। ইহার প্রমাণ এই যে, ভোজনের শেষে এই প্রকরণে দধি সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়। কিন্তু সাহেবি মতে, "Nothig is more prejudicial to health than sour mixed with sugar" অর্থাৎ অম্লের সহিত মিষ্টমিশ্রিত খাদ্যের ন্যায় স্বাস্থ্যহানিকর আর কিছুই নাই। যাহাই হউক, দধিতে মিষ্ট না মিশাইয়া, লবণ সংযুক্ত করিলে মন্দ উপাদেয় হয় না। বোধ হয়, তাহাই কর্ত্তব্য।

দধির সর—গুরু অথচ পুষ্টিকর; শীতল ও কফপ্রদ হইলেও বলকারী।

গব্যদধি—সুস্বাদু, ক্ষুধাবর্দ্ধক, বাতনাশক, এবং বলকারক।

মহিষদধি—শীতল, গুরু, কফবর্দ্ধক, রক্ত-পিত্ত রোগ-বৃদ্ধিকারক, কিন্তু পুষ্টি-কারক ও মধুর।

পশ্চিমাঞ্চলের অনেক স্থানের লোকেরা দধি একেবারেই ব্যবহার করে না। তাঁহাদের যুক্তি এই যে, দুগ্ধ অতি পবিত্র পদার্থ, তাহাকে নষ্ট করিয়া দধি উৎপাদিত হইল। সুতরাং দধি অতি অপবিত্র, এবং অখাদ্য মধ্যে পরিগণিত। তাঁহারা ছানাকেও ঐ শ্রেণীভুক্ত করেন, এজন্য, ছানার সন্দেশের পরিবর্ত্তে ক্ষীরের দ্রব্য ব্যবহার করিয়া থাকেন।

ঘাটাল নামক স্থান হইতে বিস্তর দধি আমদানী হয়। দূর হইতে আনীত বহু দিনের দধির ভাণ্ড মধ্যে উপরিভাগে (সরে) কীটাদি লক্ষিত হয়। আস্বাদন অতি তীব্র। মূল্য সুলভ। সচরাচর ইতর লোকেই ইহা ব্যবহার করিয়া থাকে। কলিকাতার গোয়ালারা কিন্তু ফরমায়েসী দধির সহিত ইহা চালাইতে (মিশাইতে) ত্রুটি করে না। অধিকন্তু, ছোট ছোট খুরি করিয়া (পাত্রান্তর মাত্র) আনিয়া গৃহস্থকে বেশী মূল্যে বিক্রয় করে।

ছানা।

দুগ্ধ বিনষ্ট করিয়া যে রূপে দধি প্রস্তুত হয়, ছানাও প্রায় তদ্রূপ। তবে, দধি তরল পদার্থ, কিন্তু ছানা (প্রক্রিয়া ক্রমে) গাঢ়ত্ব প্রাপ্ত হয়। ইহা অম্লনাশক ও বলবর্দ্ধক। সন্দেশ, রসগোল্লা প্রভৃতিতে ব্যবহৃত হয়। মফস্বল হইতে রেলযোগে এক জাতীয় ছানা আমদানী হয়, কলিকাতাস্থ মিষ্টান্ন-বিক্রেতারা উহার প্রধান গ্রাহক। কেবল প্রসিদ্ধ কয়েকজন মিষ্টান্নবিক্রেতা, নিজ নিজ আপনে বিশুদ্ধ দুগ্ধ হইতে (ফুট দিয়া) ছানা প্রস্তুত করিয়া লয়েন। এতদ্ভিন্ন উক্ত আমদানী ছানা বহুতর স্থানে বিক্রীত হয়। অল্প

রোগের প্রশমনকারী বলিয়া তত্তৎ-রোগগ্রস্ত স্বল্পবেতনভোগী কেরাণি বাবুদিগের উহা এক প্রকার নিয়মিত বৈকালিক খাদ্য, এবং তাঁহারা প্রচুর পরিমাণে ক্রয় করিয়া থাকেন। অনেক প্রকার উপাদেয় এবং বহুপোপযোগী সামগ্রী ইহা হইতে প্রস্তুত হয়।

রাবড়ী।

বিশুদ্ধ দুগ্ধ জালে চড়াইয়া ফুটিতে থাকিলে উহাতে তালবৃন্তের বাতাস দেওয়া হয়। এই প্রক্রিয়াতে সর পড়িতে আরম্ভ হয়। ঐ সর ক্রমশঃ সংগৃহীত হইয়া শর্করা সংযোগে মিষ্টতা প্রাপ্ত এবং বিশেষ উপাদেয় "রাবড়ী" নামে অভিহিত হয়। ইহা রন্ধন কার্য্যে ব্যবহৃত না হইলেও ভোজনের শেষে ক্ষীরের পরিবর্ত্তে ভুক্ত হইয়া থাকে। জাল দিতে দিতে দুগ্ধ খুব ঘন হইলে, উহা ঐ সরের সহিত মিশ্রিত করা হয়। কেহ কেহ দুগ্ধ জালে চড়াইবার পূর্ব্বে সামান্য মাত্রায় চুণের জল মিশাইয়া থাকেন।

সুইজারল্যাণ্ড (Switzerland) দেশ হইতে (condensed) ঘনীভূত দুগ্ধ টিনের কৌটা করিয়া আইসে। উহা মিষ্টসংযুক্ত থাকে। এক চামচ সেই দুগ্ধ, উষ্ণজলের সাত চামচ, মিশ্রিত করিলে, সেই পরিমাণে উত্তম দুগ্ধ পাওয়া যায়। রন্ধন কার্য্যে ব্যবহৃত না হইলেও প্রাতরাশ কালে "চা" প্রস্তুতে ইহা বড়ই উপযোগী। বিদেশ ভ্রমণে ২।৪ কৌটা (আবশ্যক মতে বেশী) সঙ্গে রাখিলে অনেক উপকার দর্শে। কৌটা খুলিলে ২।৩ দিবস অবিকৃত রাখা যায়।

এতদ্দেশেও (condensed) জমাট দুগ্ধ প্রস্তুত করা যাইতে পারে। চুল্লির উপর একটি বড় কটাহে জল রাখিয়া, অপেক্ষাকৃত ছোট কটাহে দুগ্ধ, তদুপরি, জল সংযোগ না হইতে পারে এরূপে বসাইয়া জাল দিতে হইবে। ক্রমে ক্ষুদ্রায়তন পাত্রস্থ দুগ্ধ ঘনীভূত (বাজারের ক্ষীরের ন্যায়) হইলে, পূর্ব্বমত একটি শীতল জলপূর্ণ কটাহে স্থাপিত করিয়া, কিঞ্চিৎ মিছরির সংযোগে মিষ্টতা সম্পাদন করত শীতলাবস্থায়, ইচ্ছামত ক্ষুদ্র বা বৃহৎ (airtight) বায়ুনিরোধক পাত্রস্থ করিলে condensed milk) ঘনীভূত দুগ্ধ রূপে পরিণত হইবে।

পক্ষান্তরে, দুগ্ধের গুঁড়াও (powder) প্রস্তুত হইয়া থাকে। দুগ্ধ হইতে জলীয় পদার্থ একেবারে নিষ্কাশিত করিয়া উহা প্রস্তুত করা হয়। ব্যবহার কালে জল মিসাইলেই হইল। সৈন্যদিগের মধ্যে ইহা প্রচলিত।

জল।

এ বিষয়ে অনেকে অনেক রূপ বলিয়াছেন। নদীর জল, পুষ্করিণীর জল, কূপ-জল ইত্যাদি বহুপ্রকার জলের আলোচনা হইয়াছে অতএব সে সমুদায়ের উল্লেখ পুনরুক্তি মাত্র —নিষ্প্রয়োজন; তবে উহাদিগের আভাস মাত্র দেওয়া যাইবে। যখন নির্ম্মল কলের জল (pipe water) অজস্র পাওয়া যাইতেছে, তখন অন্য জল রন্ধন বা পানে কেন না হৃত হইবে? ভারতের প্রধান প্রধান নগর সমূহে এই জলের বন্দোবস্ত হইয়াছে। যে যে প্রদেশে মেলা উপলক্ষে বহুলোক-সমাগম হয়, তত্তৎস্থানে মহামারী নিবারণার্থে এই জলের সাময়িক বন্দোবস্ত হইয়া থাকে। কোম্পানি বাহাদুর প্রজার স্বাস্থ্যের জন্য ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত নহেন। কোথায় পলতা (ইছাপুর) সেখান হইতে বিশুদ্ধীকৃত ও আনীত হইয়া প্রকাণ্ড কল সমূহ-সাহায্যে, উপযুক্ত লৌহনির্ম্মিত নল দ্বারা কলিকাতা সহরে ও সহরতলী সমূহে বিতরিত হইতেছে। এক্ষণে আবার এই নির্ম্মল জলের জন্য টালা অঞ্চলে যে বিরাট ব্যাপার হইয়াছে,

তাহাতে না জানি কত লক্ষ মুদ্রা ব্যয়িত হইয়াছে। এ সমস্তই প্রজার সুখের জন্য।

এই পানীয় কলের জল যে কত অপব্যয়িত হইতেছে, কে বলিতে পারে? এতন্নিবারণার্থে যাঁহারা নিজ ভবনে নল (pipe) সংযোগে জল লইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগকে সরকার বাহাদুর (meter) পরিমাণ যন্ত্র রাখিতে আদেশ দানে বাধ্য হইয়াছেন। তদ্দ্বারা ব্যয়িত জলের পরিমাণ জ্ঞাত হওয়া যায়। যিনি যে মাত্রায় জল খরচ করিতে পারেন, তাহা নির্দ্ধারিত আছে। তদধিক ব্যয় জন্য দায়ী হইতে হয়। ইহাতে অনেক বিরক্ত; কিন্তু কোম্পানি বাহাদুরের অপরাধ কি? অপব্যয়, অপচয় নিবারণ করিতে হইলে অপর নিয়ম (দণ্ড স্বরূপ) আর কি হইতে পারে?

কলের জলের নির্ম্মলতা সকলেই স্বীকার করেন; কিন্তু একবার একজন সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার সাহেব, একস্থানে চিকিৎসা করিতে আসিয়া এই জলকে দূষিত বলেন, এবং (distilled water) চুয়ান জল ব্যবস্থা করিয়া যান। যাহাই হউক; ২।৫ দিন একভাবে রক্ষিত হইলে, তাহাতে কীট লক্ষিত হয়, ইহা সকলেই অবগত আছেন। কিন্তু, গঙ্গাজল ২।৩ মাস অবিকৃত থাকে, ইহাও পর্য্যবেক্ষিত হইয়াছে।

পূর্ব্বে অনেক বড় গৃহস্থ, মাঘ মাসের দশমী তিথিতে গঙ্গাজল আহৃত করিয়া বৃহৎ বৃহৎ পাত্রে (জালায়) সংরক্ষণ করিতেন; কারণ ঐ সময়ের গঙ্গোদক বড়ই পরিষ্কার থাকে। ঐ জল, এমন কি, বৎসরাবধি পান করা হইত। এই প্রথা, কষ্ট এবং ব্যয়সাধ্য বলিয়া অনেকের আয়ত্তাধীন নহে।

অনেক হিন্দুগৃহিণী গঙ্গাজল ভিন্ন পান করেন না অথচ অধিক পরিমাণে সঞ্চিত করা ক্ষমতাতীত। তাঁহাদের জন্য একটী বৃহৎ পাত্রে (জালায়) উহা রাখিয়া, "নির্ম্মল" নামে এক প্রকার বীজ সামান্য মাত্র জলে ঘষিয়া, জালায় জলে মিশ্রিত করিয়া, উহা পরিষ্কার করা হয়। ফটকিরি সংযোগেও জল নির্ম্মল করা যাইতে পারে।

কেহ কেহ বলেন যে, কলের জল উদরাময় পীড়ার আকরস্বরূপ। মিউনিসিপাল কর্তৃপক্ষীয়েরাও উহা একেবারে নির্দ্দোষ বলিতে কুণ্ঠিত। পক্ষান্তরে প্রকাশ যে মিউনিসিপালিটী, কলের জল যে উদরাময়ের প্রতিপোষক নহে, ইহ মুক্তকণ্ঠে ব্যক্ত করিয়াছেন। যাহা হউক কোন কোন মতে জল পানে মন্দাগ্নির উৎপত্তি হয়।

ছোট ছোট চারাগাছ এবং লতাদি, কলের জল অপেক্ষা নদীজল সেচনে, অধিকতর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

নদীর জল।

সাধারণতঃ ইহা বায়ু এবং অগ্নিবর্দ্ধক ও লঘু। কোন নদীর জল স্বাস্থ্যপ্রদ এবং আস্বাদী, আবার কোন নদীর জল বিষবৎ পরিত্যাজ্য। অধুনা পল্লীগ্রামের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদীর জল প্রায়ই দূষিত এবং মেলেরিয়ার (malaria) আকরস্বরূপ হইয়াছে। এই রোগে যে কত লোক কালগ্রাসে পতিত হইতেছে, তাহার সীমা নাই। অনেক গ্রাম প্রায় জনশূন্য হইয়াছে। সরকার বাহাদুর এতৎ প্রতিকারে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন।

সংপ্রতি গঙ্গাজল বড়ই কলুষিত হইতেছে। চটের কলকারখানা (jute Press, mills.) সমূহ হইতে ময়লা জল প্রায় ১৫।২০ ফিট প্রস্থে কিনারার জলকে দুর্গন্ধময় এবং হরিদ্বর্ণ করিয়া তুলে। অগত্যা অনেকে ঐ দূষিত জলে, স্নান এবং পাকাদি জন্য উহা আহরণ পর্য্যন্ত করিয়া থাকেন।

পুষ্করিণীর জল।

লঘু ও বলকারক। কিন্তু এমন অনেক

তড়াগ দেখা যায় যে, তাহার জল পানে বা স্নানে জ্বর নিশ্চিত। সেই জলে পক্ক খাদ্য বড়ই অস্বাস্থ্যকর। আবার পল্লীগ্রামের দরিদ্র গৃহস্থের ইহাই সম্বল।

কূপজল

লঘু ও কফনাশক; পিত্ত এবং অগ্নিবর্দ্ধক। পশ্চিমাঞ্চলের কূপজল প্রায়ই অগ্নিবর্দ্ধক এবং সুস্বাদ। সেস্থানের অধিবাসীগণের ছুপচা ভর্জ্জিত শস্ত প্রধান আহার। কিন্তু এক 'লোটা" কূপজল পানে সমস্ত জীর্ণ হইয়া যায়। ভর্জ্জিত দ্রব্য সমূহ চর্ব্বণে দন্তের যথোচিত কার্য্য হইয়া থাকে; এজন্য তত্রত্য লোকদিগের দন্ত অধিকাংশই সুদৃঢ়। বাঙ্গালা এবং অন্যান্য স্থানে কোমল দ্রব্যই গলাধঃকৃত হয়, দন্তের ব্যবহার প্রায়ই নাই। সুতরাং অকালেই দন্তবিহীন হইতে হয়।

উক্ত প্রদেশ সমূহের নদীর নিকটস্থ কূপজল সুস্বাদু; কিন্তু দূরস্থ কূপ নিচয়ের "ক্ষারা" পানি (লবণাক্ত)। সমুদ্রতীরস্থ কূপের জল স্বভাবতঃ লবণাক্ত; কিন্তু দুই একটি কূপজল সুস্বাদু দেখা যায়। ভালই হউক আর মন্দই হউক, অনেক গৃহস্থকে ইহা ব্যবহার করিতে বাধ্য হইতে হয়।

লবণ

সাধারণতঃ ইহা পাচক, অগ্নিবৃদ্ধিকর, সারক এবং লঘুপাক। কিন্তু অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হইলে, বল ক্ষয় এবং দৃষ্টিহীনতা সম্ভাবনা। ব্যঞ্জনাদি রন্ধনে বিশেষ আবশ্যক। ইহা ব্যতীত পাক কার্য্য একেবারেই সুসম্পন্ন হয় না। সূপকারের দক্ষতা ইহার ব্যবহারে প্রকাশ পায়—সামান্য মাত্রার ইতর বিশেষে ভক্ষ্যদ্রব্য উপাদেয় হয় না।

কোন কোন পণ্ডিতের মতে "নুনে ঘুণ" অর্থাৎ বংশে যেরূপ ঘুণ ধরে, লবণে স্বাস্থ্যের তদ্রূপ হানি করিয়া থাকে এবং শরীরস্থ অস্থি সমূহ জর্জ্জরিত হইয়া যায়। সিদ্ধান্ত এই যে, লবণ একেবারেই নিষিদ্ধ বস্তু। পক্ষান্তরে, অন্যান্য পণ্ডিতমণ্ডলীর মতে ইহার সামান্য মাত্রায় ব্যবহার অনিবার্য্য। যাহাই হউক, কি ধনী, কি দরিদ্র, সকলেরই ইহা আবশ্যক। এতদূর প্রয়োজনীয় যে, কোম্পানী বাহাদুর ইহা একাধিকার (monopoly) করিয়াছেন—সরকারী অনুমতি ব্যতীত ইহার ব্যবসায় এবং কোন রূপ প্রস্তুতও নিষিদ্ধ।

এমন কি, এক সময়ে এক দীনা, হীনা বৃদ্ধার লবণ-ভাণ্ড আর্দ্র স্থানে থাকাতে, ভাণ্ডস্থ লবণ গলিয়া যায়। দরিদ্রা বর্ষীয়সী অনন্যোপায় হইয়া সেই দ্রব পদার্থকে অগ্নি-সন্তাপ দ্বারা শুষ্ক লবণে পরিণত করে। সন্ধান পাইয়া, লবণ প্রস্তুত অপরাধে সরকার হইতে তাহার ৫০ টাকা দণ্ড নির্ধার্য্য হইল; বৃদ্ধা টাকা কোথায় পাইবে? সুতরাং কারাবদ্ধা হইল!

লবণ পঞ্চজাতীয়:—(১) কৃষ্ণ লবণ, (২) বিট লবণ, (৩) সৈন্ধব, (৪) করকচ, (৫) পাঙ্গা। এতদ্ব্যতীত শ্রীক্ষেত্র প্রভৃতি স্থানে একরূপ লোহিত বর্ণ লবণ পাওয়া যায়। ইহা অতি তীব্রাস্বাদ এবং পাচক। তত্রত্য-বাসীরা ইহাতে রন্ধনাদি সম্পন্ন করিয়া থাকেন।

(১) কৃষ্ণ লবণ (কচলবণ)—রুচিপ্রদ; শূল, বাত, গুল্মনাশক; কিন্তু পিত্তবৃদ্ধি কর।

(২) বিটলবণ—দুর্গন্ধজনক, অগ্নিবর্দ্ধক। মলবদ্ধতা, দুষ্টবায়ু, অজীর্ণাদি রোগনাশক।

(৩) সৈন্ধব লবণ—ত্রিদোষ (বায়ু, পিত্ত ও কফজনিত দোষ) নাশক। চক্ষুর উপকারী; পুষ্টিসাধক, অগ্নিবর্দ্ধক। নিষ্ঠাবান্ সংসারে ইহার ব্যবহার সমধিক দৃষ্ট হয়।

(৪) কর্কচ্ লবণ—পাচক, ভেদক, শূলঘ্ন, পিত্তবৃদ্ধিকারী। হিন্দু গৃহে রন্ধনাদিতে ব্যবহৃত হয়।

(৫) পাঙ্গালবণ—সুদূর হইতে আনীত এবং আনয়ন কালে বহুতর মৃত জীব ইহাতে জারিত হয় বলিয়া হিন্দুর অব্যবহার্য্য। ইতর লোকদিগের মধ্যে ইহা প্রচলিত।

রুষ দেশের অন্তর্গত পোলাণ্ড নামক স্থানে যে লবণের আকর আছে, তাহা এত বৃহৎ যে, দুই সহস্র বৎসর সেই লবণ সমগ্র পৃথিবীর লোক ব্যবহার করিলেও ফুরাইবে না, এরূপ অনেকে অনুমান করেন।

লীলাবতী দাস।

জ্যোতিষ-প্রসঙ্গ

সূর্য্য।

আলোক, উত্তাপ, গতি, জীবন ও সৌন্দর্য্যের মূল, সৌরজগতের কেন্দ্র ও প্রাণ সূর্য্য অতি প্রাচীন কাল হইতে সকল দেশে সকল লোকের আন্তরিক পূজা পাইয়া আসিতেছেন। অনভিজ্ঞেরা ইঁহার এক অনির্ব্বচনীয় শক্তির কতক আভাস পাইয়া, ভক্তিভরে ইঁহার গুণগান করেন, বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা তাঁহার অদ্ভুত প্রভাব সম্যক উপলব্ধি করিয়া বিস্ময়ে ও আনন্দে মুগ্ধ হইয়া যান; সৌন্দর্য্য-উপাসক চিত্রকর ইঁহাকেই সকল সৌন্দর্য্যের মূল জানিয়া কৃতজ্ঞতার সহিত ইঁহার অভিবাদন করেন। সূর্য্য যে কেবলমাত্র অলোক ও উত্তাপদাতা এরূপ নহে, তিনি সমস্ত সৌরজগতের জীবনদাতা। তাঁহার উত্তাপেই বাতাস বহে, মেঘ সৃষ্টি হয় ও সেই মেঘ হইতে বৃষ্টি রূপে বারিধারা পতিত হইয়া ধরাকে সুফলা শস্যশ্যামলা করে, তাঁহারই উত্তাপে নদী প্রবাহিত হয়, বৃক্ষাদি ফল ফুলে শোভিত হয় এবং ঐ সমস্ত ফল সুপক্ব হয়, এবং তাঁহারই উত্তাপে মনুষ্য ও অন্যান্য জীব জন্তু জীবিত থাকে।

আমরা হয় ত না জানিতে বা না ভাবিতে পারি, কিন্তু জগতে যাহা কিছু সচল ও সজীব, সূর্য্য হইতেই তাহার উৎপত্তি। আমরা যে সকল পুষ্টিকর খাদ্য খাইয়া জীবন ধারণ করি, সমস্তই সূর্য্য হইতে প্রাপ্ত হই। গ্রীষ্মের সময় আমরা যে নানারূপ সিরাপ বা সরবৎ পান করিয়া স্নিগ্ধ হই, তাহাও সূর্য্য-রশ্মির রূপান্তর মাত্র। যে কাষ্ঠ হইতে আমরা অগ্নি লাভ করি তাহা সূর্য্যেরই কৃপায় জন্মায়। যে সকল কল প্রভৃতি বায়ু বা জল দ্বারা চালিত হইতে দেখিতে পাই, বাস্তবিক সূর্য্যের দ্বারাই তাহারা চালিত হয়। অন্ধকার রজনীতে, ঝড় বৃষ্টি অগ্রাহ্য করিয়া ভীষণনাদে যে রেলগাড়ি কখনও মাঠের ধার দিয়া, কখনও বা পর্ব্বতের সুড়ঙ্গ ভেদ করিয়া, কখন বা নদীর উপরস্থ সেতু পার হইয়া, বিদ্যুৎবেগে গিরি, নদী, বন, নগর পশ্চাতে ফেলিয়া অবিরাম ধাবিত হয়, সেই অদ্ভুত আধুনিক জীব বিশেষ মনুষ্যের অসাধারণ বুদ্ধি ও পরিশ্রমের পরিচায়ক হইলেও, উহা এক প্রকার সূর্য্যেরই সন্তাপ, কারণ উহা যে সকল পদার্থের দ্বারা নির্ম্মিত ও চালিত (যথা লৌহ, কাষ্ঠ ও কয়লা প্রভৃতি) তাহার প্রত্যেকটিই সূর্য্য হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

সূর্য্যের উত্তাপ না থাকিলে তরল ও বাষ্পীয় পদার্থ আদৌ থাকিত না, কেবল

মাত্র কঠিন পদার্থই থাকিত, অর্থাৎ বায়ু ও জল এখনকার মত তরল থাকিত না, উহারাও কঠিনাকারে পরিণত হইত, তাহা হইলে কোনও প্রাণীই জীবিত থাকিতে পারিত না। পবন-হিল্লোলে, সলিল-কল্লোলে, ঝটিকা-নিস্বনে বা বিহগ-কূজনে সেই সূর্য্যেরই শক্তির পরিচয় পাই। সেই সূর্য্যই পর্ব্বত হইতে নদী প্রবাহিত করিতেছেন, সেই সূর্য্যই বজ্র ও বিদ্যুতে নিজ শক্তির কতক পরিচয় দিতেছেন, এবং সেই সূর্য্যই প্রতিগৃহে যে অগ্নিশিখা জ্বলিতেছে, তাহার প্রাণ দিয়াছেন। আবার যখন দুই বিপক্ষ দলে তুমুল যুদ্ধ বাধিয়া অস্ত্র ঝন ঝনে ও কামান-গর্জ্জনে, ভীষণ হুঙ্কার কোলাহল ও আর্ত্তনাদে দিক্‌দিগন্ত পুরিয়া যায়, উহাও মানব কর্ত্তৃক সূর্য্য-শক্তির অপব্যবহার মাত্র!

উপরে সূর্য্যের যে প্রভাব ও শক্তির কথা বলা হইল, সূর্য্যের প্রকৃত শক্তির সহিত তুলনায় উহা অতি তুচ্ছ! সমুদ্রের তরল অবস্থা, বায়ুমণ্ডলের বাস্পীয় অবস্থা, জল-তরঙ্গ, মেঘ সৃষ্টি, ঝটিকা, বৃষ্টি, নদীর স্রোত, পৃথিবীর যাবতীয় অরণ্যজাত কাষ্ঠ ও খনি হইতে উৎপন্ন কয়লা, সমস্ত প্রাণীর গতি ও জীবনীশক্তি এ সমস্ত অতীব বিস্ময়কর হইলেও ইহারা সূর্য্যের অনন্ত শক্তির সামান্য পরিচয় প্রদান করে মাত্র। সূর্য্য কেবল মাত্র এই পৃথিবীতে আলোক ও উত্তাপ দেন না, সমস্ত সৌরজগতই তাঁহার শক্তির দ্বারা চালিত ও প্রতিপালিত হয়, পৃথিবী সেই শক্তির সামান্য কণা মাত্র লাভ করে, দুই শত কোটী অংশের এক অংশ আলোক ও উত্তাপ পায় মাত্র। সৌরজগতের সমস্ত গ্রহগুলি একত্রে ২২ কোটী অংশের একাংশ মাত্র উত্তাপ সূর্য্য হইতে প্রাপ্ত হয়! ইহা ধারণার অতীত।

সূর্য্যের উৎপত্তি বা নীহারিকাবাদ

(Nebular Theory)

আমাদের দেশে যে প্রচলিত আছে—"কারণ-সলিল" হইতে বিশ্ব সৃষ্টি হইয়াছে, উহাই আধুনিক নীহারিকা হইতে বিশ্বের উৎপত্তির (Nebular Theory) নামান্তর মাত্র। পৃথিবী প্রভৃতি গ্রহগণের উৎপত্তি সূর্য্য হইতে, কিন্তু সূর্য্যের উৎপত্তি কোথা হইতে? পাশ্চত্য বিজ্ঞান বলে নীহারিকা (Nebula) হইতে। একটু আলোচনা করিয়া দেখিলে দেখা যায়, নীহারিকা বা Nebula "কারণ-সলিলের" নামান্তর মাত্র (কিন্তু সলিল অর্থে এখানে জল নয়, বাস্প বা গ্যাস বুঝিতে হইবে)।

আকাশে অনেক নীহারিকা আছে, কিন্তু দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য ব্যতীত তাহারা প্রায় খালি চোখে দৃষ্ট হয় না (কালপুরুষ বা Orion নক্ষত্রের নীহারিকা কেহ কেহ বলেন খালি চোখেও দেখা যায়, আমি কিন্তু খালি চোখে উহাকে দেখিতে পাই না)। নীহারিকা দেখিতে কতকটা মেঘের মত, কিন্তু মেঘে ও নীহারিকায় সম্পূর্ণ প্রভেদ।

মেঘ ও নীহারিকার প্রভেদ।

মেঘ জ্যোতিহীন, সূর্য্যের আলোকে উজ্জ্বল দেখায়, নীহারিকা জ্যোতির্ম্ময়, নিজের আলোকে উজ্জ্বল দেখায়। মেঘ ঘণ্টায় ঘণ্টায় পরিবর্ত্তিত হয়, নীহারিকার কয়েক বৎসরেও বিশেষ পরিবর্ত্তিত লক্ষিত হয় না। মেঘ পৃথিবী অপেক্ষা অনেক ছোট, ক্ষুদ্রতম নীহারিকা যাহা আমাদের জানা আছে, তাহাও সূর্য্য অপেক্ষা শত শত গুণে বড়। মেঘ পৃথিবীর অতি নিকটে থাকে (অর্থাৎ পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ভিতরে) নীহারিকা আকাশের কল্পনাতীত সুদূর অভ্যন্তরে নিহিত।

নীহারিকা হইতে সূর্য্যের উৎপত্তি।

কোটী কোটী যুগ পূর্ব্বে অনন্ত মহাকাশে বিক্ষিপ্ত বহু যোজনব্যাপী একই বাষ্পময় নীহারিকা কল্পনা করিতে হইবে। ঐ নীহারিকা বাষ্পাকারে অবস্থিত হইলেও জড় পদার্থে নির্ম্মিত। এ[illegible]শা সকলেই জানেন যে, অধিকতর উত্তাপ সংযোগে জড় পদার্থ কঠিন হইতে তরল ও তরল হইতে বাষ্পাকারে পরিণত হয়। কিন্তু জড় পদার্থের প্রত্যেক অণুরই (atom) স্বাভাবিক আকর্ষণ শক্তি আছে। পূর্ব্বে যে বহু যোজনব্যাপী বাষ্পময় নীহারিকার কল্পনা করা হইয়াছে, উহা সহস্র সহস্র ক্রোশ যে ঠিক সমভাবে বিক্ষিপ্ত তাহা সম্ভব নয়, মেঘ বা ধূমরাশির ন্যায় কোথাও বা অপেক্ষাকৃত ঘন কোথাও বা অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্মভাবে নিশ্চয়ই অবস্থিত। যে অংশ ঘন বা গাঢ় তাহাতে অধিকতর অণু আছে। একস্থলে এই সকল অণুর আধিক্য বশতঃ সেই স্থলের আকর্ষণ-শক্তিও অধিক হয়, অতএব অন্যান্য স্থলের অণুগুলিকে নিজ সন্নিধানে আকর্ষণ করে। অতএব চতুর্দ্দিক হইতে অণু ছুটিয়া ঐ অংশের দিকে ধাবিত হয়, তখন ঐ ঘন কেন্দ্রের কলেবর বৃদ্ধি হয়, ও চতুর্দ্দিক হইতে অণুগুলিকে আকর্ষণ করায় উহাতে একপ্রকার আবর্ত্তন, গতি (rotation) উৎপন্ন হয়। এই ঘন কেন্দ্রমূলক গোলকই ক্রমে তারকা বা সূর্য্যে পরিণত হয়। ক্রমে সূর্য্য হইতে গ্রহাদি কিরূপে উৎপত্তি হয়, পরের অধ্যায়ে বর্ণিত হইবে। পূর্ব্বোক্ত গতি বশতঃ ক্রমে সমুদয় নীহারিকা ঘুরিতে থাকে, কিন্তু কিরূপ আকারে? গোলকাকারে বা ডিম্বাকারে, কারণ ঐ আকারই সহজ- এক কৌটা পারদ স্বতই গোল আকার ধারণ করে।

সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে এই নীহারিকাবাদই (Nebular theory) আধুনিক বিজ্ঞানানু-মোদিত ও সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয়। অবশ্য সূর্য্যের জন্মের সময় কোনও ধাত্রী বা অপর কেহ উপস্থিত ছিল না যে, তাহাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা যায়, তবে যাহা যুক্তি-সঙ্গত ও কতক পরিমাণে প্রামাণ্য (?) তাহা বিশ্বাস না করিবার কোনও কারণ নাই। আমাদের দেশে সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে যাহা প্রচলিত আছে, আমার শ্রদ্ধাস্পদ অধ্যাপক যোগেশচন্দ্র রায়ের "আমাদের জ্যোতিষ ও জ্যোতিষী" হইতে উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না, পাঠক দেখিবেন যে উহা হইতে আধুনিক নীহারিকাবাদের কোনও প্রভেদ নাই।

"আমাদের জ্যোতিষী ও দার্শনিক, স্মার্ত্ত ও পৌরাণিক সকলেরই জগতের অভিব্যক্তি সম্বন্ধে এক মত, এবং শ্রুতিই সকলের উক্তির মূল। সূর্য্যসিদ্ধান্ত পাঠ করিলে জানা যায়, 'এই জগৎ প্রথমে অন্ধকারময় ছিল। সেই 'ঘোর অন্ধকারে বাসুদেব (যাঁহাতে সমস্ত জগৎ বাস করে, তিনি বাসু, দেবন বা দীপ্তিহেতু দেব), পরব্রহ্ম (যাহা কিছু আছে তাহাই যাঁহার মূর্ত্তি), পরমপুরুষ, অতীন্দ্রিয়, নির্গুণ, শান্ত, পঞ্চ বিংশতির (১৬ বিকৃতি, ৭ প্রকৃতি বিকৃতি, মূল প্রকৃতি, ও জীব—সাংখ্য) পর, অব্যয়, যে প্রকৃতি বাহিরে ও ভিতরে সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া আছে, সেই প্রকৃতি যাঁহাতে স্থিত, সেই সঙ্কর্ষণ (যিনি আকর্ষণ করেন), প্রথমে অপ্ সৃষ্টি করিয়া তাহাতে শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। সেই অপ্ শক্তির সহিত মিলিত হইলে একটি সুবর্ণ অণ্ড

সেই অণ্ডে অনিরুদ্ধ (যাঁহার নিরোধ হয় না) সনাতন প্রথমে ব্যক্তীভূত (অভিব্যক্ত) হইলেন (তিল হইতে তৈল যেমন অভিব্যক্ত হয়, পরন্তু উৎপন্ন হয় না)। এজন্য বেদে ইঁহার নাম হিরণ্যগর্ভ, প্রথমে অভিব্যক্ত বলিয়া আদিত্য, জগতের প্রসূতি বলিয়া সূর্য্য; এই সূর্য্য—যাঁহার অপর নাম সবিতা, যিনি অন্ধকারনাশক, প্রাণী সমূহের উৎপত্তি-স্থিতি-সংহারকারক (ভূতভাবন) ভুবন সমূহকে প্রকাশ করিতে করিতে সদা ভ্রমণ করিতেছেন। * * * * জগৎ সৃষ্টি নিমিত্ত তিনি ব্রহ্মা সৃষ্টি করিলেন। তাঁহা হইতে চন্দ্র, সূর্য্য, পঞ্চতারা-গ্রহ, নক্ষত্র, ভূমি, বিশ্ব সমুদায় উৎপন্ন হইল। সর্ব্বলোক-পিতামহ সেই অণ্ড মধ্যে প্রতিষ্ঠিত, এজন্য সেই অণ্ডই ব্রহ্মাণ্ড। ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্ভাগে যে আকাশ আছে, তাহাতেই ভূর্ভুবাদি এই জগৎ অবস্থিত, বাহিরে নহে। উহা গোলাকৃতি, যেন দুইটি সমান কটাহ সম্পুট (সম্মুখদিকে মিলিত) হইয়াছে।' * * * অপ্ অর্থে সকলেই জল বুঝিয়াছেন। জল বলিতে যে কেবল দ্রব জল বুঝিতে হইবে, এমন কোনও প্রমাণ নাই, জলীয় বাষ্প বা বাষ্প মাত্র অর্থ হইতে পারে। পরন্তু অপ্ সঙ্গে বায়ুও আছে, এবং ধাত্বর্থ ধরিলে উহা বাষ্প ও বায়ু বুঝায়। তবেই প্রথমে এই জগৎ অন্ধকারময় এবং বাষ্পপূর্ণ ছিল। তাহাতে শক্তি সঞ্চারিত হইলে একটি সৌবর্ণ অণ্ড হইল। সৌবর্ণ অর্থে উৎপলভট্ট তেজোময় সহস্রাংশু-সন্নিভ করিয়াছেন। সমস্ত সৃষ্টির নামান্তর ব্রহ্মা। তাহা অণ্ডাকার, অর্থাৎ দৃশ্য জগৎ ঠিক গোলাকার নহে। সঙ্কর্ষণ প্রভাবে তাহা হইতে নক্ষত্র সূর্য্য প্রভৃতি সকলের উৎপত্তি। সবিতা সেই অণ্ড মধ্যে সদা ঘূর্ণ্যমান রহিয়াছেন। অর্থাৎ সেই আদি অপের সঙ্কর্ষণ শক্তি ও ঘূর্ণন-শক্তিবশতঃ সমুদয় জগতের উৎপত্তি হইয়াছে।

উপরে যে ব্যাখ্যা দেওয়া গেল, তাহাতে কষ্টকল্পনা নাই। সুতরাং উহাই সহজ অর্থ বলিতে হইবে। তাহা হইলে আধুনিক নীহারিকাবাদের সহিত উহার প্রভেদ কোথায়?"*

সূর্য্য একটি দ্বিতীয় প্রভার তারকামাত্র।

যে সূর্য্য হইতে পৃথিব্যাদি গ্রহাদির উৎপত্তি ও যাহা আমাদের পক্ষে এত প্রকাণ্ড উহা একটি দ্বিতীয় প্রভার তারকা মাত্র। পৃথিবী হইতে আকাশে যে ১৯, ২০টি প্রথম প্রভার তারকা দৃষ্ট হয়, তাহাদের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল, উহাদের তুলনায় সূর্য্য অনেক ছোট:—

† ১। Sirius or Dog star (মৃগব্যাধ বা লুব্ধক (ঋগ্বেদে সরমা নামে খ্যাত), ২। Canopus (অগস্ত্য), ৩। Alpha Centauri (জহ্নু নক্ষত্রের প্রথম তারকা), ৪। Arcturas (স্বাতী), ৫। Vega (অভিজিৎ), ৬। Rigel or B orion (কালপুরুষের দ্বিতীয় তারকা), ৭। Capella or Alpha Auriga (ব্রহ্ম-হৃদয়), ৮। Procyon (প্রশ্বন), ৯। Betelgeuse or a Orionis (আর্দ্রা), ১০। B. Centauri (জহ্নুর ২য় তারকা), ১১। Acherner (শূল), ১২। Aldebaran (রোহিণী), ১৩। Antares (জ্যেষ্ঠার

---

* "আমাদের জ্যোতিষ ও জ্যোতিষী" ৪৫৪—৪৫৫ দ্রষ্টব্য

† ইংরাজি নক্ষত্র গণের বাঙ্গলা নাম অধিকাংশ যোগেশ বাবুর "আমাদিগের জ্যোতিষ ও জ্যোতিষী" হইতে গৃহীত।

যোগতারা), ১৪। Alpha of the Southern Cross (Alpha crucis), ১৫। Altair (শ্রবণার যোগ তারা), ১৬। Spica (চিত্রা), ১৭। Fomal hant, ১৮। B crucis, ১৯। Regulus (মঘার যোগতারা) কাহারও কাহারও মতে মিথুনরাশির পুনর্ব্বসু নামক দুইটি উজ্জ্বল তারাও (Castor and Pollux) প্রথম প্রভার।

সর্ব্বাপেক্ষা নিকটস্থ তারকা a centauri হইতে যদি সূর্য্যকে দেখা যায়, তাহা হইলে সমস্ত সৌরজগৎ সমেত সূর্য্যকে Cassiopcia নামক নক্ষত্রের সন্নিকটে একটি দ্বিতীয় প্রভার তারকার ন্যায় দৃষ্ট হইবে (অবশ্য বলা অনাবশ্যক গ্রহগুলি তথা হইতে আদৌ দৃষ্ট হইবে না)। ৬১ cygni (হংস) নামকতারকা হইতে সূর্য্যকে দেখিলে Argo নামক নক্ষত্রে অবস্থিত একটি তৃতীয় প্রভার তারকার ন্যায় দৃষ্ট হইবে।

Sirius বা লুব্ধক নামক তারকা হইতে দেখিলে, সূর্য্যকে Hercules নামক নক্ষত্রে একটি ৪র্থ বা ৫ম প্রভার তারকার ন্যায় দেখাইবে। আরও দূরস্থ তারকা হইতে আমাদের সৌরজগতের অধীশ্বরকে আদৌ দৃষ্ট হইবে না।

পৃথিবী হইতে সূর্য্যের দূরত্ব।

পৃথিবী হইতে সূর্য্যের দূরত্ব প্রায় সাড়ে নয় কোটি মাইল (৯ কোটি ৩০ লক্ষ)। এই দূরত্ব আন্দাজে বা কল্পনা-সাহায্যে নিরূপিত হয় নাই, ছয়টি ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে অতি সূক্ষ্মগণনার দ্বারা ইহা নিরূপিত হইয়াছে। ছয়টী উপায় দ্বারা একই ফল পাওয়া গিয়াছে, অতএব ইহা অকাট্য সত্য। সাধারণ পাঠকের পক্ষে নীরস ও একটু দুরূহ হইবে বলিয়া সেই উপায় গুলি আলোচিত হইল না, তাহাদের উল্লেখ করা গেল মাত্র যথা,—

প্রথম উপায়-সূর্য্যবিম্ব অতিক্রম (Transit of Venus) লক্ষ্য দ্বারা।

২য় ও ৩য়—আলোর গতি বা বেগ (velocity) নিরূপণ দ্বারা।

৪র্থ—চন্দ্রের গতি দ্বারা। ৫ম—গ্রহগণের ওজন ও গুরুভার পরীক্ষার দ্বারা।

৬ষ্ঠ—মঙ্গলগ্রহের পরীক্ষা দ্বারা।

আমাদের অস্তিত্ব যেরূপ ধ্রুব উপরোক্ত প্রমাণগুলিও তদনুরূপ ধ্রুব, বলিলে অত্যুক্তি হয় না। শুক্রের সূর্য্যবিম্ব অতিক্রম দর্শন সম্বন্ধে একটি সত্য ঘটনা, অবান্তর হইলেও এস্থলে পাঠককে উপহার না দিয়া থাকিতে পারিলাম না।

প্রতি ১১৩½বৎসর অন্তর ৮যোগ বা হরণ করিলে শুক্রের সূর্য্যবিম্ব অতিক্রম কালে অনায়াসে নির্দ্দেশ করা যায়, যথা—১৬৩১ খ্রীঃ দৃষ্ট হইয়াছিল, তাহাতে ৮ যোগ করিলে অর্থাৎ ৮ বৎসর পরে ১৬৩৯ খ্রীঃ আবার দৃষ্ট হয়। কিন্তু পরবর্ত্তী অতিক্রম ১৬৩৯+১১৩½+৮—১৭৬১ খ্রীঃ হইয়াছিল। তার পরবর্ত্তী ১৭৬৯+১১৩½ −৮=১৮৭৪ খ্রীঃ হইয়াছিল, তার ৮বৎসর পরে ১৮৭৪+৮=১৮৮২ খ্রীঃ আবার হয়। আবার ১৮৮২+১১৩½+৮=২০০৪ খ্রীঃ ৭ই জুনের পূর্ব্বে উহা দেখা যাইবে না! জুন ও ডিসেম্বর মাস ব্যতীত অপর কোনও মাসে ইহা হয় না।

লে জেন্তিল (Le Gentil) নামক জনৈক ফরাসী ১৭৬০ খ্রীঃ পরবর্ত্তী সালের (১৭৬১) অতিক্রম দেখিবার জন্য ভারতবর্ষে রওনা হন, কিন্তু তৎকালে ইংরেজদিগের সহিত যুদ্ধ হেতু তাঁহার পৌঁছিতে বিলম্ব হয় অর্থাৎ অতিক্রমের পর তিনি ভারতবর্ষে আসিয়া পৌঁছিলেন। অবশ্য হতাশ হইয়াছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহার গণিত জ্যোতিষে

সূর্য্যের দূরত্ব ও অঙ্কশাস্ত্রের সূক্ষ্মগণনায় প্রায় ৯২ কোটি মাইল (৯কোটি ৩০ লক্ষ) নিরূপিত হইল, কিন্তু উহা ধারণা করা যায় কিরূপে? নিম্নে কতিপয় সহজবোধ্য দৃষ্টান্ত

(Astronomy) এত প্রবল অনুরাগ ছিল যে, তিনি পণ্ডিচারিতে ৮ বৎসর থাকিয়া পরবর্ত্তী অতিক্রম (১৭৬৯) দেখিবেন স্থির করিলেন। জুন মাসে ভারতবর্ষের আকাশও পরিষ্কার থাকে, অতএব তাঁহার সফলকাম হইতে কিছুমাত্র সন্দেহ রহিল না। তিনি আর একটি ছোট মানমন্দির প্রস্তুত করিয়া উৎকৃষ্ট যন্ত্রাদি স্থাপন করিলেন এবং এ দেশের ভাষাও শিক্ষা করিলেন। ৮বৎসর অতিবাহিত হইল, মে মাস আসিল, আকাশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, জুন মাসের প্রথম দুইদিনও তদ্রূপ, কিন্তু তৃতীয় দিবসে (অর্থাৎ অতিক্রমের দিন) আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন হইল, সূর্য্যকে ঢাকিয়া ফেলিল এবং শুক্র অতিক্রম করিলে পর আবার পরিষ্কার হইয়া গেল! এত দিনের—এত বর্ষের আশা চূর্ণ হইয়া গেল! হতাশ হইয়া লে জেন্তিল দেশে ফিরিতে মানস করিলেন, (কারণ পরবর্ত্তী অতিক্রম আবার ১১৭৪—৮ অর্থাৎ ১০৫২ বৎসর পরে হইবে)। কিন্তু বেচারার এমনি অদৃষ্ট, পথে দুইবার জাহাজ মগ্ন হয়, কোনও প্রকারে রক্ষা পান। শুধু তাই নহে, ফ্রান্সে পৌঁছিলে শুনিলেন যে তাঁহার অবর্ত্তমানে তাঁহার কোনরূপ সংবাদ না পাওয়ায় তাঁহাকে মৃত মনে করা হইয়াছিল এবং Accademy of Science এ অঙ্গে তাঁহাকে অতিক্রম করিয়াছে। আরও দুঃখের কথা শুনুন, তিনি নিজ সম্পত্তির অধিকার হইতেও বঞ্চিত হইলেন, কারণ আইনে স্থির করিয়াছে তিনি মৃত! হতভাগ্য জেন্তিল তখন বাস্তবিক মরিলেন!

দেওয়া গেল, তাহা হইতে কতক ধারণা হইবে।

এখান হইতে সূর্য্য পর্য্যন্ত যদি একটি সেতু নির্ম্মাণ করিতে হয়, সেই সেতুর ভিত্তির স্বরূপ ১১,৬৪০টি পৃথিবী পাশাপাশি সাজাইতে হইবে অর্থাৎ ১১,৬৪০টি পৃথিবী পাশাপাশি সাজাইলে তবে সূর্য্যে পৌঁছিবে!

একটা ২ । গোলা প্রতি সেকেণ্ডে ১০০০ ফুট (অর্থাৎ ঘণ্টায় ৬৮১ মাইল) করিয়া যাইলে, ১৫২ বৎসর পরে সূর্য্যে পৌঁছিবে!

শব্দের গতি প্রতি সেকেণ্ডে ১১১৫ ফুট (অর্থাৎ ঘণ্টায় প্রায় ৭৬০ মাইল)। পৃথিবীতে একটি প্রকাণ্ড কামান ছুঁড়িলে যদি তাহার শব্দ সূর্য্যে পৌঁছান সম্ভব হয়, তবে উপরোক্ত গতিতে যাইলেও সূর্য্যে পৌঁছিতে প্রায় ১৪ বৎসর লাগিবে!

একখানি ট্রেন যদি অনবরত প্রতি ঘণ্টায় ৩০ মাইল করিয়া যায়, তবে সূর্য্যে পৌঁছিতে ৩৪৪ বৎসর লাগিবে। অর্থাৎ আজ যদি কেহ সপরিবারে সেই ট্রেনে যাত্রা করে, তবে তাহার সপ্তম পুরুষ সূর্য্যে পৌঁছিবে অর্থাৎ আকবর শাহ বা এলিজাবেথের সময় যদি কেহ যাত্রা করিয়া থাকে (১৫৬৬) তবে এখন (১৯১০খৃঃ) পৌঁছিবে!

অঙ্গুলির অগ্রভাগ যদি পুড়িয়া যায়, তবে আমরা প্রায় তৎক্ষণাৎ উহা অনুভব করি কিন্তু তথাপি অঙ্গুলির অগ্রভাগ হইতে স্নায়ু দ্বারা উহা মস্তিষ্কে পৌঁছিতে একটু সময় লাগে, যদিও সে সময় অতি সামান্য—এক সেকেণ্ডেরও ভগ্নাংশ। আচ্ছা যদি কল্পনা সাহায্যে এমন একটি শিশু মনে করা যায় যাহার সুদীর্ঘ হস্ত সূর্য্যে পৌঁছিতে পারে, তাহা হইলে সেই শিশুর অঙ্গুলির অগ্রভাগ যদি সূর্য্যে পুড়িয়া যায়, তবে সে ১৬৭ বৎসর পরে উহা অনুভব করিবে অর্থাৎ উহা অনু-

ভব করিবার বহুপূর্ব্বেই সে ভবলীলা শেষ করিবে!

আর একটি সহজ উদাহরণ দিব। যদি তিন দিন দিবা রাত্রি ক্রমাগত যথাসম্ভব দ্রুতভাবে এক হইতে গণনা করা যায় তবে তিন দিনে এক নিযুত বা ১০ লক্ষ গণনা করা যাইবে। এইরূপে ৯৩ বার গণনা করিলে তবে দূরত্ব সংখ্যা গণিত হইবে অর্থাৎ ৩×৯৩=২৭৯ দিন বা ৯মাস দিবা রাত্রি অনবরত খুব দ্রুত ভাবে গণিলে তবে সূর্য্যের দূরত্ব সংখ্যা গণিয়া শেষ করা যাইবে!

সূর্য্যের ওজন কত?

এ প্রশ্ন শুনিয়া অনেকে হয় ত হাসিবেন, কিন্তু ইহাও অতি সূক্ষ্ম হিসাব দ্বারা নিরূপিত হইয়াছে, উহা সহজে এস্থলে বুঝান অসম্ভব বলিয়া, এই বলিয়া ক্ষান্ত হইব যে, একা সূর্য্য তিন লক্ষ ২৪ হাজার (৩২৪,০০০) পৃথিবী অপেক্ষা ভারি!

সূর্য্যের উত্তাপ ও আলোক।

সূর্য্যের আলোক এত উজ্জ্বল যে, উহার সহিত তুলনায় উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলোকও (electric light) কাল বলিয়া বোধ হয়, অপর আলোর কথা দূরে থাক! সোণা, রূপা, প্লাটিনাম্ ও লৌহ গলাইতে অনেক উত্তাপ প্রয়োজন—১০০ ডিগ্রি (Centigrade or 2120. Fahrenheit) উত্তাপ প্রয়োগ করিলে তবে জল ফুটিবে, গন্ধক গলাইতে ১১৩ ডিগ্রি, টীন ২৪৫ ডিগ্রি, শিষা ৩২৫ ডিগ্রি, রূপা ১৪৫ ডিগ্রি, সোণা ১২৪৫ ডিগ্রি, লৌহ ১৫০০ ডিগ্রি, প্লাটিনম ১৭৭৫ ডিগ্রি, ইরিডিয়াম (iridium) গলাইতে ১৯৫০ ডিগ্রি উত্তাপ আবশ্যক! কিন্তু সূর্য্যের উত্তাপের তুলনায় ইহা বরফ বলিলে অত্যুক্তি হয় না!

সূর্য্য সম্বন্ধে অন্যান্য আবশ্যকীয় ও আশ্চর্য্যকর জ্ঞাতব্য বিষয় পর পরিচ্ছেদে বিবৃত হইবে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ সরকার এম, এ।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র-চাণক্য ও বাৎস্যায়ন।*

মুখবন্ধ—প্রথমেই বলিয়া রাখি, আমি বক্ষ্যমাণ ক্ষুদ্রপ্রবন্ধে অর্থশাস্ত্র বা নীতি শাস্ত্রের কোনও তত্ত্ববিশ্লেষণে বা স্বরূপবর্ণনে প্রবৃত্ত নহি। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র পাঠে কৌটিল্য-প্রণীত গ্রন্থসমুদয় সম্বন্ধে এবং রাজনীতির ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে কতটুকু জানা যায়, তাহাই আমার অত্র আলোচ্য। রাজনীতির বিবরণ অত্রকার প্রবন্ধের বিষয়ীভূত নহে।

আরম্ভ—বহুদিন পূর্ব্বে এই সভায় চাণক্য ও বাৎস্যায়ন এক ব্যক্তি কি না, এ বিষয়ে একটা বাদানুবাদ হইয়াছিল। এক্ষণে কৌটিল্য বা চাণক্যের প্রণীত প্রাচীন অর্থশাস্ত্র মহীশূর হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। আমার মনে হয় এই গ্রন্থ পাঠ করিলে, আর সন্দেহ থাকে না যে চাণক্যই বাৎস্যায়ন।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র আলোচনা করিয়া, বাৎস্যায়ন ও কৌটিল্য একই ব্যক্তি, ইহা প্রতিপাদন করিতে হইলে অগ্রে এই অর্থশাস্ত্র কৌটিল্যেরই কি না তাহা

---

* সাহিত্যসভার ১১শ বার্ষিক ২য় মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

আলোচনা করিতে হয়। তাহাতেও আবার দুইটি বিষয় দেখিতে হয়। প্রথমতঃ চাণক্যের পরবর্ত্তী কালে কোনও গ্রন্থকার এই অর্থশাস্ত্রের কোনও নির্দ্দেশ করিয়াছেন কি না এবং তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট বিষয় সমূহ এই অর্থশাস্ত্রের মধ্যে পাওয়া যায় কি না? দ্বিতীয়তঃ এই অর্থশাস্ত্রে ইহা চাণক্যেরই প্রণীত বলিয়া কোনও ইঙ্গিত বা উক্তি আছে কি না? এইরূপে দুইটি পথ অবলম্বন করিয়া, এই গ্রন্থ যে প্রকৃতই কৌটিল্যের তাহা দেখান আবশ্যক।

পূর্ব্বোক্ত দুইটি পথের মধ্যে দ্বিতীয় পথ অতি সুগম। গ্রন্থখানি একবার মাত্র আদ্যন্ত পাঠ করিলেই দেখা যায় যে চাণক্য বা কৌটিল্যই গ্রন্থকার। গ্রন্থের প্রথমাধিকরণের প্রথম অধ্যায়ের পরিসমাপ্তিতেই আছে—"কৌটিল্যেন কৃতং শাস্ত্রম্" এই শাস্ত্র কৌটিল্যেরই প্রণীত। তন্ত্রযুক্তি নামক চরম অধিকরণের ১ম অধ্যায়ের সমাপ্তিতে দেখি—"যেন শাস্ত্রং চ শস্ত্রং চ নন্দরাজগতা চভূঃ—অমর্ষেনোদ্ধৃতান্যাশু তেন শাস্ত্রমিদং কৃতম্"। চাণক্যের নির্দ্দেশ করিতে হইলে ইহা অপেক্ষা স্পষ্ট নির্দ্দেশ সম্ভবে না। ইহার উপর দেখা যায় যে, যেস্থলে নীতিশাস্ত্রবিদ্‌গণের বিপ্রতিপত্তি আছে, সেই স্থলেই কৌটিল্যের এই মত—এই সিদ্ধান্ত—এইরূপ উক্তি। ইহাতে এই গ্রন্থ যে কৌটিল্যপ্রণীত তাহাতে আদৌ সন্দেহ থাকিতে পারে না। তবে এদেশে নাকি প্রাচীন মহাত্মাদের নামের দোহাই দিয়া অনেক ভাল মন্দ জিনিষই চালান হইয়াছে, তাই ইহার পরেও প্রমাণ লইতে হয় যে, এই অর্থশাস্ত্র সম্বন্ধে প্রাচীন কোনও নিবন্ধাদি কিছু পাওয়া যায় কি না?

এই অর্থশাস্ত্রের বর্ত্তমান প্রকাশক মহীশূর প্রাচ্য পুস্তকালয়ের তত্ত্বাবধায়ক শ্রীযুক্ত শ্যাম শাস্ত্রী মহাশয় প্রকাশিত গ্রন্থের ভূমিকায় এই বিষয়ে অনেক প্রমাণেরই অবতারণা করিয়াছেন। তিনি দণ্ড্যাচার্য্য বিরচিত দশকুমারচরিত হইতে উদ্ধার করিয়াছেন—

অধীষ তাবদ্দণ্ডনীতিম্ ইয়মিদানীম্ আর্য্যবিষ্ণুগুপ্তেন মৌর্য্যার্থে ষড়্‌ভিঃ শ্লোকসহস্রৈঃ সংক্ষিপ্তা" ... "দণ্ডনীতি শাস্ত্র অধ্যয়ন কর, এই শাস্ত্র এক্ষণে আর্য্য বিষ্ণুগুপ্ত, চন্দ্রগুপ্তের নিমিত্ত ৬০০০ শ্লোকে সংক্ষেপ করিয়া প্রচার করিয়াছেন।" ইত্যাদি। [মনে রাখিবেন পূর্ব্বে মোটামুটি ৩২টি অক্ষরে একটি শ্লোক ধরা হইত— অর্থশাস্ত্র প্রধানতঃ গদ্যবদ্ধ] বাণপ্রণীত কাদম্বরী হইতে দেখাইয়াছেন—"যেষামতিনৃশংসপ্রায়োপদেশনির্ঘৃণং কৌটিল্যশাস্ত্রং প্রমাণং"—"যাঁহারা অতি নিষ্ঠুর উপদেশপরিপূর্ণ কৌটিল্যশাস্ত্রকে কর্ত্তব্যপথপ্রদর্শক বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন" ইত্যাদি। কামন্দকীয় নীতিসারের গ্রন্থারম্ভভাগ হইতে উপস্থাপিত করিয়াছেন,—

"নীতিশাস্ত্রামৃতং ধীমানর্থশাস্ত্রমহোদধেঃ।
সমুদ্দধ্রে নমস্তস্মৈ বিষ্ণুগুপ্তায় বেধসে॥

যে মহাপণ্ডিত নীতিশাস্ত্ররূপসুধা অর্থশাস্ত্র সমুদ্র হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, সেই (নীতি) বিধানকর্ত্তা বিষ্ণুগুপ্তকে নমস্কার।" তাহার পর প্রকাশক মহাশয় পঞ্চতন্ত্রের সেই প্রসিদ্ধ "চাণক্যাদীনি অর্থশাস্ত্রাণি" প্রভৃতি অংশ, নন্দিসূত্রনামক জৈনগ্রন্থের "ভারতরামায়ণংভীমাসুরীয়কং কৌটিলীয়কম্" ইত্যাদি অংশও প্রমাণরূপে আনায়ন করিয়াছেন।

প্রকাশক শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রদর্শিত এই সমস্ত প্রমাণ অবশ্যই চাণক্যপ্রণীত অর্থশাস্ত্রের অস্তিত্ব বিষয়ে অসন্দিগ্ধ সাক্ষ্য প্রমাণ করিতেছে। কিন্তু প্রকাশিত গ্রন্থের

অভ্যন্তরস্থ কোনও অংশ পরবর্ত্তী কোনও গ্রন্থকার কোনওরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন কি না তাহা না দেখাইলে এই প্রকাশিত গ্রন্থই যে কৌটিল্যের গ্রন্থ তাহা স্থির হয় না। এ বিষয়েও প্রকাশক শাস্ত্রী মহাশয় কিছু কিছু প্রমাণ দেখাইয়াছেন। তিনি রঘুবংশের ১৭শ সর্গের ৪৯ ও ৭৬ শ্লোকের মল্লিনাথ টীকায় উদ্ধৃত—"... কৌটিল্যঃ কার্য্যানাং নিয়োগবিকল্প সমুচ্চয়া ভবন্তি, অনেনৈবোপায়েন নান্যেন ইতি ইতি নিয়োগঃ, অনেন অনেন বা ইতি বিকল্পঃ, অনেন চেতি সমুচ্চয়ঃ" (তন্ত্রযুক্তির) এই অংশ এবং 'মন্ত্রপ্রভাবোৎসাহশক্তিভিঃ পরান্ সন্দধ্যাদিতি কৌটিল্যঃ' (৭ম অধিকরণ, ১৮শ অধ্যায়), এই দুই অংশের বরাত্ দিয়াছেন। এই দুই অংশই কৌটিলীয় শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় বটে কিন্তু একটু পরিবর্ত্তিতাকারে। যাহা হউক এই সর্গেরই ৫৫ ও ৫৬ শ্লোকদ্বয়ের মল্লিনাথ-টীকা শাস্ত্রী মহাশয় ধরেন নাই। ৫৫ শ্লোকের টীকাতে আছে—'অত্র কৌটিল্যঃ ক্ষীণাঃ প্রকৃতয়োলোভং লুব্ধা যান্তি বিরাগতাম্। বিরক্তা যান্ত্যমিত্রং বা ভর্ত্তারং ঘ্নন্তি বা স্বয়ম্" ইতি। ৫৬র টীকায়,—"অত্র কৌটিল্যঃ সমজ্যায়োভ্যাং সন্দধীত হীনেন বিগৃহ্নীয়াৎ" ইতি। ৫৫ শ্লোকের টীকায় উদ্ধৃত অংশ ৭ম অধিকরণ ৫ম অধ্যায়ে এবং ৫৬ শ্লোকের টীকায় উদ্ধৃত অংশ অর্থশাস্ত্রের ৭ম অধিকরণে তৃতীয় অধ্যায়ে অবিকল দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা ব্যতীত ভারবিটীকায় পঞ্চাঙ্গনয়বিবরণে মল্লিনাথ কর্ম্মনামরম্ভোপায়ঃ পুরুষদ্রব্যসম্পদ্ দেশকালবিভাগঃ, বিনিপাতপ্রতীকারঃ কর্ম্মসিদ্ধিঃ" এই অংশ কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রের ১ম অধিকরণের ১৫ শ অধ্যায় হইতে স্পষ্টতঃই উদ্ধার করিয়াছেন। কেবল কৌটিল্যের নামটি বাদ দিয়াছেন। তদ্ব্যতীত রঘুর ও কুমারের সেই যে প্রসিদ্ধশ্লোকের—অলকামতিবাহ্যৈব বসতিং বসুসম্পদাম্। স্বর্গাভিষ্যন্দবমনং কৃত্বেবোপনিবেশিতম্ (নিবেশিতা) ... ইহার টীকায় উভয়ত্রই মল্লিনাথ এই অর্থশাস্ত্রের অধ্যক্ষ প্রচার দ্বিতীয়াধিকরণ জনপদনিবেশপ্রকরণ হইতে "ভূতপূর্ব্বমভূতপূর্ব্বং বা জনপদং পরদেশাপবাহনেন স্বদেশাভিষ্যন্দবমনেন বা নিবেশয়েৎ" এই সূত্র তুলিয়া গ্রন্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। প্রকাশক মহাশয় এইগুলি নির্দ্দেশ করেন নাই কিন্তু পূর্ব্বোক্ত রঘুর অংশদ্বয়ের টীকা এবং রঘুর ও কুমারের এই টীকা এই অর্থশাস্ত্র যে কৌটিল্যেরই বিরচিত তদ্বিষয়ে অকাট্য সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। তদ্ব্যতীত সোমদেব প্রণীত নীতিবাক্যামৃত এবং কামন্দকীয় নীতিসার নামক গ্রন্থদ্বয়ের প্রতি পৃষ্ঠায় কৌটিল্য সূত্রের পূর্ণ আভাস পাওয়া যায়। কামন্দক যে কৌটিল্যের নিকটই ঋণী ইহা স্বমুখেই ব্যক্ত করিয়াছেন। নীতিবাক্যামৃতকার অনেক স্থলেই অবিকল চাণক্য-সূত্র উদ্ধার করিয়া বিবৃত করিয়াছেন। অর্থশাস্ত্রে বিনয়াধিকারিকে ইন্দ্রিয়-জয় প্রকরণে আছে—"ধর্ম্মার্থাবিরোধেন কামং সেবেত। ন নিসুখঃ স্যাৎ। সমং বা ত্রিবর্গং অন্যোন্যানুবন্ধম্। একো হ্যত্যা সেবিতো ধর্ম্মার্থ কামানামাত্মানমিতরৌ চ পীড়য়তি"। নীতিবাক্যামৃতে কাম-সমুদ্দেশে বিবৃতির সহিত অবিকল ঐ অংশ পরিদৃশ্যমান। এইরূপ অনেক স্থলেই। ফলতঃ এইরূপে চাণক্যের পরবর্ত্তী কালের অনেক গ্রন্থ হইতেই আলোচ্যমান অর্থ শাস্ত্রের বিষয়ে যে সমস্ত নিদর্শন পাওয়া যায় তাহাতে সন্দেহ থাকে না যে, এই অর্থ-শাস্ত্রই চাণক্যের। এমন কি পূর্ব্ববর্ণিত

মল্লিনাথটীকাদি দর্শনে স্পষ্টই বোধ হয় কালিদাস ও ভারবি এই উভয়েও চাণক্যের অর্থশাস্ত্র পাঠ করিয়াই স্বীয় স্বীয় গ্রন্থের অনেকাংশ রচনা করিয়াছেন। মাঘের সম্বন্ধেও এ কথা খাটে। যাহা হউক এ বিষয়ে অনেক কথাই বলা যাইতে পারে এবং তাহাতে অন্য একটা প্রবন্ধেরও সংকুলান হয়, কিন্তু অদ্যকার প্রবন্ধের বিষয়ীভূত নহে বলিয়া সেই আলোচনা হইতে নিরস্ত হইতে হইল। তবে একটি মাত্র কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য বলিয়া এ স্থলে বলিয়া রাখি।

চাণক্য স্বীয় অর্থশাস্ত্রে বিদ্যাসমুদ্দেশ প্রকরণে বিদ্যাসমূহকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। আন্বীক্ষিকী, ত্রয়ী, বার্ত্তা ও দণ্ড-নীতি। প্রসঙ্গ ক্রমে তিনি বলিয়াছেন যে, এই বিভাগ পূর্ব্বাচার্য্যগণের অনুমোদিত না হইলেও ইহাই সঙ্গত। তিনি বলিয়াছেন, মানবশাস্ত্রে ত্রয়ী, বার্ত্তা ও দণ্ডনীতি এইরূপ বিভাগ অনুমোদিত; বার্ত্তা ও দণ্ডনীতি এই দুই ভাগে বিভাগ বৃহস্পতির অনুমোদিত; এবং শুক্রাচার্য্যের মতে একমাত্র দণ্ডনীতিশাস্ত্রই সর্ব্ববিদ্যা প্রতিপাদক। যাহাই হউক দেখা যায় যে অর্থশাস্ত্রের পরবর্ত্তী গ্রন্থকারগণ সকলেই প্রায় চাণক্যের এই মতের সম্মান করিয়াছেন। কামন্দক ও নীতিবাক্যামৃতকার এই মতের অনুসরণ ত করিয়াছেনই; এমন কি কালিদাসও

ধিয়ঃ সমগ্রৈঃ স গুণৈ' রুদারধীঃ ক্রমাচ্চতস্র
শ্চতুরর্ণবোপমাঃ।
ততার বিদ্যাঃ পবনাতিপাতিভির্দিশোহরিদ্ভি
হরিতামিবেশ্বরঃ।

এই শ্লোকে চাণক্যের মতই অনুবর্ত্তন করিয়াছেন। অবশ্য রঘুতে অন্যত্র চতুর্দ্দশ বিদ্যার কথাও আছে কিন্তু সে স্বতন্ত্র কথা। ভারবি-"চতসৃষপি তে বিবেকিনী। নৃপ বিদ্যাসু নিরূঢ়িমাগতা" এই শ্লোকাংশে চাণক্য মতেরই অনুবাদ করিয়া গিয়াছেন। ভারবির প্রথমসর্গের অধিকাংশ স্থলে চাণক্য, নীতির প্রভাব সুস্পষ্ট লক্ষিত। মল্লিনাথ তত্তৎস্থলের টীকায় নীতিবাক্যামৃত কামন্দক প্রভৃতি হইতে উদ্ধার না করিয়া অনায়াসে [illegible] অর্থ শাস্ত্র হইতে উদ্ধার করিতে পারিতেন।

এক্ষণে অকুণ্ঠিতচিত্তে বলা যাইতে পারে যে, এই অর্থশাস্ত্র চাণক্যেরই বটে। কিন্তু এই অর্থশাস্ত্র পাঠ করিয়া আমরা আরও একটি তত্ত্বের অনুসন্ধান পাই। অভিনিবেশ সহকারে বাৎস্যায়ন-কৃত ন্যায়-সূত্র-ভাষ্য, বাৎস্যায়নকৃত কামসূত্র এবং কৌটিল্যকৃত এই অর্থশাস্ত্র একত্র রাখিয়া আলোচনা করিলে বেশ দেখিতে পাওয়া যায় গ্রন্থকারত্রয় একব্যক্তিতেই পর্য্যবসিত হন।

অগ্রে ধরুন অর্থশাস্ত্র ও কামসূত্র। প্রথমেই গ্রন্থদ্বয়ের রচনা-পদ্ধতি দেখিলেই বেশ উপলব্ধি হয় দুই গ্রন্থই এক লেখনী প্রসূত। উভয়েরই বিষয়বিভাগ প্রণালী একই প্রকারের। অর্থশাস্ত্রকার গ্রন্থের প্রারম্ভেই গ্রন্থস্থ প্রকরণ-বিভাগ দেখাইয়াছেন। কামসূত্রকারও তাহাই করিয়াছেন। যে ভাষায় এই বিভাগের অবতারণা করিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ অভিন্ন। কামসূত্রে আছে, (৭পৃঃ) তস্যায়ং প্রকরণাধিকরণ সমুদ্দেশঃ। অর্থশাস্ত্রেও আছে (১ পৃঃ) তস্যায়ং প্রকরণাধিকরণ সমুদ্দেশঃ। প্রকরণের নামও দুই এক স্থলে অভিন্ন। কামসূত্রের তৃতীয় প্রকরণ "বিদ্যাসমুদ্দেশঃ।" অর্থশাস্ত্রের প্রথম প্রকরণ 'বিদ্যাসমুদ্দেশঃ'। অর্থশাস্ত্রের উপান্ত্য অধিকরণ "ঔপনিষদিকম্"। কামসূত্রের অন্ত্যাধিকরণ "ঔপনিষদিকম্"।

প্রকরণও অধিকরণের নামে স্বার্থিকাদি তদ্ধিত প্রত্যয়ের উভয়ত্রই আধিপত্য।

কামসূত্রে—সাংপ্রয়োগিকং, কন্যা-সংপ্রযুক্তকম্‌, ভার্য্যাদিকারিকম্‌. পারদারিকম্‌, বৈশিকম্‌, ঔপনিষদিকম্‌।

অর্থশাস্ত্রে—আত্মরক্ষিকম্‌, বিনয়াধিকারিকম্‌, বিবহসংযুক্তকম্‌ —নিধিকম্‌, দাণ্ডকর্ম্মিকম্‌, সময়াচারিকম্‌, —র্বব্যায়ামিকম্‌, ব্যসনাধিকারিকম্‌, ঔপনিষদিকম্‌।

প্রকরণাধিকরণ সমুদ্দেশের পূর্ব্বে কামসূত্রে—সংক্ষিপ্য সর্ব্বমর্থ মল্লেন গ্রন্থেন কামসূত্রমিদং প্রণীতম্‌।

অর্থশাস্ত্রে—তানি সংহৃত্যৈকমিদম্‌ অর্থশাস্ত্রং কৃতম্‌।

আবার কামসূত্রের অন্তে আছে—পূর্ব্বশাস্ত্রাণি সংহৃত্য—সংক্ষেপেণ নিবেশিতম্‌।

অর্থশাস্ত্রের অন্তে গ্রন্থের ফল বলা হইয়াছে—

ধর্ম্মমর্থং চ কামং চ প্রবর্ত্তয়তি পাতি চ।

কামসূত্রের অন্তে ফল বলা হইয়াছে—

ধর্ম্মমর্থং চ কামং চ প্রত্যয়ং লোকমেব চ
পশ্যত্যেতস্য তত্ত্বজ্ঞো ন চ রাগাৎ প্রবর্ত্ততে।

এইরূপে গ্রন্থের বিষয়বন্ধ ও ভাষাবন্ধ একই রীতিতে অনুপ্রাণিত। তাহার পর উভয় গ্রন্থের সাধারণ বিষয় সম্বন্ধে উভয় গ্রন্থের উক্তি শ্রবণ করুন। অর্থশাস্ত্রে রাজার ইন্দ্রিয় জয় উপদিষ্ট হইয়াছে। ইহা তৃতীয় প্রকরণে। ইন্দ্রিয় দমন না করিলে রাজার যে বিষম অনিষ্ট ঘটে তদ্বিষয়ে অর্থশাস্ত্রকার বলিয়াছেন—

অবিরুদ্ধবৃত্তি রবশ্যেন্দ্রিয়শ্চাতুরন্তোঽপি রাজা সদ্যো বিনশ্যতি—অর্থাৎ ইন্দ্রিয় জয় না করিলে সসাগরা ধরিত্রীর অধীশ্বরকেও ধ্বংসমুখে পতিত হইতে হয়। উদাহরণ দিতেছেন—

যথা দাণ্ডক্যো নাম ভোজঃ কামাৎ ব্রাহ্মণকন্যামভিমন্যমানঃ সবন্ধুরাষ্ট্রো বিননাশ।

দাণ্ডক্য ভোজ নরপতি কামবশবর্ত্তী হইয়া ব্রাহ্মণ- কন্যাধর্ষণে প্রবৃত্ত হইয়া আত্মীয় স্বজন ও রাজ্যের সহিত বিনাশ প্রাপ্ত হন ইত্যাদি।

কামসূত্রে কেবলমাত্র কামচর্য্যার দোষ-কীর্ত্তন প্রসঙ্গে আছে,—

বহবশ্চ কামবশগাঃ সগণা বিনষ্টাঃ শ্রূয়ন্তে —পূর্ব্বে কত লোক কামবশবর্ত্তী হইয়া জ্ঞাতি পরিজন সমভিব্যাহারে বিনষ্ট হইয়াছে শুনা যায়—উদাহরণ দেখান হইতেছে.—

যথা দাণ্ডক্যো নাম ভোজঃ কামাদ্ব্রাহ্মণ-কন্যামভিমন্যমানঃ সবন্ধুরাষ্ট্রো বিননাশ। ইত্যাদি।

আবার দেখুন কামসূত্রে কামচর্য্যার উপদেশ প্রসঙ্গে আছে—বিভজ্য কাল মন্যোন্যানুবন্ধং পরস্পরস্যানুপঘাতকং ত্রিবর্গং সেবেত। অর্থশাস্ত্রে আছে—ধর্ম্মার্থাবিরোধেন কামং সেবেত সমং বা ত্রিবর্গ মন্যোন্যানুবন্ধম্‌।

এই সমস্ত দেখিয়া স্পষ্টই বুঝা যায় যে কামসূত্র ও অর্থশাস্ত্র একই হস্তের সৃষ্টি। এইবার ধরুন বাৎস্যায়নভাষ্য বা ন্যায়সূত্র ভাষ্য এবং অর্থশাস্ত্র।

অর্থশাস্ত্রকার বিদ্যা সমূহকে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া আন্বীক্ষিকী অর্থাৎ তর্ক-বিদ্যার উৎকর্ষ প্রসঙ্গে বলিলেন,—

প্রদীপঃ সর্ব্ববিদ্যানামুপায়ঃ সর্ব্বকর্ম্মণাম্‌।
আশ্রয়ঃ সর্ব্বধর্ম্মাণাং শশ্বদান্বীক্ষিকী মতা॥

তর্কশাস্ত্র দীপের ন্যায় সর্ব্ববিধ বিদ্যায় আলোক প্রদর্শন করে; এই শাস্ত্র পাঠ করিলে সকল কার্য্যেরই উপায় নির্দ্ধারণ করিতে পারা যায়, এবং এই তর্কশাস্ত্র আশ্রয় করিয়াই সকল ধর্ম্ম নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে।

আবার শুনুন ন্যায়সূত্র-ভাষ্যের প্রথম সূত্রের ভাষ্যেই ভাষ্যকার এই "আন্বীক্ষিকী" শাস্ত্র সম্বন্ধে কি বলিতেছেন—

সেয়মান্বীক্ষিকী প্রমাণাদিভিঃ পদার্থৈ-
র্বিভজ্যমানা
প্রদীপঃ সর্ব্ববিদ্যানামুপায়ঃ সর্ব্বকর্ম্মণাম্।
আশ্রয়ঃ সর্ব্বধর্ম্মাণাং বিদ্যোদ্দেশে
প্রকীর্ত্তিতা ॥

ভাষ্যকার ও অর্থশাস্ত্রকার এইরূপে উভয় শাস্ত্রের এক সাধারণ স্থলে যে একই ভাষায় আন্বীক্ষিকীর পরিচয় দিতেছেন তাহাই নহে; ভাষ্যে এই পরিচয় প্রসঙ্গে যে অংশটুকু পরিবর্জ্জন করিয়াছেন তাহাতে ভাষ্যকারই যে অর্থশাস্ত্রকার তাহাতে বড় সন্দেহ থাকে না। ভাষ্যে বলিতেছেন আন্বীক্ষিকী এইরূপে "বিদ্যোদ্দেশে প্রকীর্ত্তিতা" অর্থাৎ বিদ্যোদ্দেশে আন্বীক্ষিকী এইরূপ কীর্ত্তন করা হইয়াছে। এই বিদ্যোদ্দেশ কোথায়? দেখুন অর্থশাস্ত্রে বিদ্যাসমুদ্দেশ নামে প্রকরণ এবং তাহাতেই দেখিবেন অর্থশাস্ত্রকার এইরূপে সেই স্থলে আন্বীক্ষিকীর কীর্ত্তন করিয়াছেন। এ স্থলে আর একটি কথা মনে রাখিতে হইবে। অর্থশাস্ত্রে চাণক্য স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, তিনিই মানব, বার্হস্পত্য ও ঔশনস মত উপেক্ষা করিয়া আন্বীক্ষিকীকে চতুর্থ বিদ্যারূপে পরিগণিত করিয়াছেন। পূর্ব্বাচার্য্যগণ আন্বীক্ষিকীকে পরিগণন করেন নাই। (অর্থশাস্ত্র পৃঃ ৬) ন্যায়ভাষ্যেও (১ সূত্র) তাই আছে—"ইমাস্তু চতস্রো বিদ্যাঃ পৃথক্ প্রস্থানা প্রাণভৃতামনুগ্রহায়োদিশ্যন্তে—যাসাং চতুর্থীয় আন্বীক্ষিকী ন্যায়বিদ্যা।" চাণক্যের মতানুসারেই আন্বীক্ষিকী এই চতুর্থ স্থান অধিকার করিতে পাইয়াছে।

আবার দেখুন প্রত্যক্ষ প্রমাণ ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে ভাষ্যকার একস্থানে বলিতেছেন—পরমতমপ্রতিষিদ্ধমনুমতমিতিহি তন্ত্রযুক্তিঃ। অনুমত। তন্ত্রযুক্তিতে এইরূপই আছে। এখন এই তন্ত্রযুক্তি কোথায়? দেখিবেন অর্থশাস্ত্রেরই অন্ত্য প্রকরণ। শুনুন তাহাতে "অনুমতে"র লক্ষণ—

পরবাক্যমপ্রতিষিদ্ধমনুমতম্।

উভয়ত্র একরূপ ব্যাখ্যাও দেখা যায়—ভাষ্যে আছে "দৃষ্টেনাদৃষ্ট সিদ্ধেরুপমানম্" (১।১।৩৯), অর্থশাস্ত্রের তন্ত্রযুক্তিতে আছে—দৃষ্টেনাদৃষ্টস্য সাধনমুপমানম্। এইরূপে স্বীয় অর্থশাস্ত্রে প্রতিপাদিত ও বিবৃত অংশ সমূহ ভাষ্যকার স্বীয় ভাষ্যে স্পষ্টতঃই গ্রহণ করিয়াছেন।

আবার দেখুন—বাৎস্যায়ন-ভাষ্যে দার্শনিক মতের মধ্যে সাংখ্য, যোগ (১।১।২৯) (২।৩।১) (২।৪।৪৬) ও নাস্তিক মতের (২।৩।৬৫) নির্দ্দেশ আছে; অর্থশাস্ত্রে বিদ্যাসমুদ্দেশেও (১ম প্রকরণ) আন্বীক্ষিকীর পরিচয়ে সাংখ্য, যোগ ও লোকায়ত (নাস্তিকমত) এই তিনটিরই মাত্র উল্লেখ। ভাষ্যে (১।২।৫৫) ঋষি ছাড়া দুই জাতির কথা আছে, আর্য্য ও ম্লেচ্ছ, অর্থশাস্ত্রে দাস-কল্পে (৬৫) ঐ দুই জাতিরই নির্দ্দেশ।

তাহা হইলে এক্ষণে বলা যাইতে পারে যে, অর্থশাস্ত্রকার ও ন্যায়সূত্রভাষ্যকার একই ব্যক্তি। আর পূর্ব্বে অর্থশাস্ত্র ও কামসূত্রের তুলনায় সমালোচনা করিয়া বলা হইয়াছে অর্থশাস্ত্রকার ও কামসূত্রকার একই ব্যক্তি। এখন বাৎস্যায়ন ও চাণক্য যে একই ব্যক্তি ঐ তিন গ্রন্থের প্রণেতা ইহাতে আর কোনও সন্দেহের ত কারণ দেখিতেছি না।

অতঃপর কল্পনার আশ্রয় লইয়া এ বিষয়ে একটি আলোচনা করা যাইতে পারে কামসূত্রের প্রারম্ভে মহর্ষি বাৎস্যায়ন "ধর্ম্মার্থকামেভ্যো নমঃ" বলিয়া ধর্ম্ম অর্থ

কেন না—শাস্ত্রে প্রকৃতত্বাৎ—শাস্ত্রে ধর্ম্ম অর্থ ও কাম এই তিনটিই প্রস্তাবিত।

তাহার পর তিনি দেখাইয়াছেন পূর্ব্বে প্রজাপতি এই ত্রিবর্গ লইয়া এক মহাশাস্ত্র রচনা করেন,পরে স্বায়ম্ভুব মনু ধর্ম্মাধিকারিক, বৃহস্পতি অর্থাধিকারিক এবং শিবানুচর নন্দী কামসূত্রে, এইরূপে [illegible] শাস্ত্রকে পৃথক্ তিন পুরুষার্থ অনুসারে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া তত্তৎ সম্প্রদায় প্রবর্ত্তন করেন। এই ত্রিবর্গপ্রতিপাদক শাস্ত্রসমূহ অবশ্য কাল-ক্রমে নানারূপে পরিবর্ত্তিত ও কোনও কোনও অংশে লুপ্ত হইতে থাকে। যাহা হউক আমরা অর্থশাস্ত্র পাঠে বুঝি যে চাণক্য এই শাস্ত্র আবার উদ্ধার করেন। "যেন শাস্ত্রং চ শস্ত্রং চ নন্দরাজগতাচভূঃ—অমর্ষেণোদ্ধৃতান্যাশু তেন শাস্ত্রমিদং কৃতম্"। যিনি শাস্ত্র উদ্ধারে ব্রতী তিনি শুধু অর্থ-শাস্ত্রকে উদ্ধার করিলেই কি তাঁহার ব্রত সমাপ্তি হইতে প্যারে? শাস্ত্রে যে তাঁহারই মতে তিনটি বর্গ প্রস্তাবিত। সুতরাং ধর্ম্মশাস্ত্রে ও কামশাস্ত্রে তাঁহার উক্ত প্রয়াস অবশ্য অঙ্গীকার্য্য। বুঝিতে হইবে তিনি সমগ্র শাস্ত্র উদ্ধারে ব্রতী হইয়া, অর্থশাস্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া, অর্থপ্রতিপাদক শাস্ত্র, কামসূত্র প্রণয়ন করিয়া কাম-প্রতিপাদকশাস্ত্র, ন্যায়ভাষ্য রচনা করিয়া ধর্ম্মপ্রতিপাদক শাস্ত্র উদ্ধার করেন। বলা বাহুল্য তাঁহার মতে আন্বীক্ষিকী "আশ্রয়ঃ সর্ব্বধর্ম্মাণাম্" সুতরাং ধর্ম্ম-প্রতিপাদক। এইরূপে পূর্ব্বে এই গ্রন্থত্রয়ের তুলনা করিয়া যে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে, এই শেষোক্ত কল্পনা স্বয়ং দুর্ব্বল হইলেও সেই পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তের বিশেষ পরিপোষক। অতঃপর এই সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে আভিধানিকগণের প্রমাণ।

চিন্তামণি গ্রন্থে মর্ত্ত্যকাণ্ডে চাণক্যের নাম সমূহ এইরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

বাৎস্যায়নে মল্লনাগঃ কৌটিল্যশ্চণকাত্মজঃ।
দ্রামিলঃ পক্ষিলস্বামী বিষ্ণুগুপ্তোঽঙ্গুলশ্চসঃ॥

পুরুষোত্তমও স্বীয় ত্রিকাণ্ডশেষে ব্রহ্মবর্গে লিখিয়াছেন—

বিষ্ণুগুপ্তস্ত কৌটিল্যশ্চাণক্যো দ্রামিলোঽঙ্গুলঃ।
বাৎস্যায়নো মল্লনাগঃ পক্ষিলস্বামিনাবপি॥

দু একটা নামে লিপিকরপ্রমাদবশতঃ একটু তারতম্য ধর্ত্তব্য নহে। ফলতঃ উভয়েরই মতে বাৎস্যায়ন ও চাণক্য বা কৌটিল্য একই ব্যক্তি। এই আভিধানিক প্রমাণ কেহ কেহ যথেষ্ট বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন নাই। কিন্তু গ্রন্থত্রয়ের আলোচনায় ও যুক্তিতে যে সিদ্ধান্ত স্থির করা হইয়াছে, এই আভিধানিক প্রমাণ যখন তাহার অনুকূল তখন অগ্রাহ্য করিবার কোনও কারণ নাই।

কৌটিল্যের ধর্ম্মশাস্ত্র আলোচনা করিয়া, গ্রন্থকারের গ্রন্থসমূহ সম্বন্ধে যাহা অবগত হওয়া যায়, সেই বিষয়ে আমার যাহা বক্তব্য তাহা বলিলাম। এক্ষণে এই অর্থশাস্ত্র হইতে অর্থশাস্ত্রের ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে কত-টুকু নূতন তত্ত্ব পাওয়া যায় তাহাও দেখিতে ইচ্ছা হয়। অর্থশাস্ত্রের পূর্ব্ব ইতিবৃত্ত মহাভারতে এইরূপ আছে।

অতি সুদূর প্রাচীনকালে সত্যযুগে আর্য্যভূমিতে প্রজাতন্ত্র-প্রণালী প্রচলিত ছিল। "নৈব্য রাজ্যং ন রাজাসীৎ ন চদণ্ডো ন দাণ্ডিকঃ"। রাজাও ছিল না রাজ্যও ছিল না, কোনও শাসন বিধিরও প্রয়োজন হয় নাই। কারণ ধর্ম্মনীতিই তখন সকলের প্রাণ ছিল—"ধর্ম্মেনৈব প্রজাঃ সর্ব্বা রক্ষন্তিস্ম পরস্পরম্"। অনেককাল এই-

আসিল। ধর্ম্মনীতি অক্ষুণ্ণ থাকিল না। অধর্ম্মাগমে নানা লোকবিপ্লব ঘটিতে লাগিল। "অরাজকাঃ প্রজাঃ পূর্ব্বং বিনেশুরিতিনঃ শ্রুতম।" লোকতন্ত্ররীতি যখন এইরূপে অবসন্ন ও বিধ্বস্ত হইল তখন রাজতন্ত্রের প্রয়োজন হইল। রাজতন্ত্ররীতি প্রবর্ত্তিত হইল। বৈবস্বত মনু প্রথম লোকাধিকার গ্রহণ করিলেন। তিনি লোকমর্য্যাদা রক্ষা করিলেন এবং প্রজাগণ তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তন করিবেন ও তাঁহাকে করাদি প্রদান করিবেন এইরূপ একটা চুক্তির পর মনু অধিকার গ্রহণ করিলেন (রাজধর্ম্মপর্ব্ব—৬৭।)

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে লোকরক্ষার্থে কেবল ধর্ম্মনীতি কার্য্যকরী হয় নাই। কাজেই হীনতর অর্থনীতির প্রয়োজন হইল। ইহাই হইল রাজনীতি বা দণ্ডনীতি। প্রথমে এই দণ্ডনীতির মধ্যে লোকস্থিতি রক্ষার উপযোগী সকল বিষয়েরই সন্নিবেশ হইল। ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম ত্রিবর্গের বিষয়েই ইহাতে স্থান পাইল। "যত্র ধর্ম্মস্তথৈবার্থঃ কামশ্চৈবাভিবর্ণিতঃ।" (রাজধর্ম্ম (৫৯)।

প্রথমেই এই নীতিশাস্ত্র বিশাল আয়তনে প্রচারিত হইল। প্রচারক অবশ্য স্বয়ং প্রজাপতি। তাহার পর ক্রমে সংক্ষেপ হইতে থাকিল।

প্রথম সংক্ষিপ্ত করিলেন—শ্রীমহাদেব বা বিশালাক্ষ—সংক্ষিপ্ত শাস্ত্রের নাম হইল বৈশালাক্ষ। আবার সংক্ষিপ্ত হইল, এবার করিলেন ইন্দ্র—গ্রন্থের নাম হইল বাহুদন্তক। ইন্দ্রের একটি নাম বহুদন্তীপুত্র বা বাহুদন্ত। আবার সংক্ষেপ হইল বৃহস্পতির হস্তে। নাম হইল বার্হস্পত্য শাস্ত্র। সর্ব্বশেষে সংক্ষেপ করিলেন শুক্রাচার্য্য। নাম ঔশনস শাস্ত্র। সংক্ষেপের সংক্ষেপ হইলেও বোধ হয় এই শুক্রনীতিতে ত্রিবর্গের বিষয় উপনিবদ্ধ ছিল। এই জন্যই বোধ হয় চাণক্য ও কামন্দক উভয়েই বলিয়াছেন শুক্রাচার্য্যের মতে বিদ্যা একই —দণ্ডনীতিমাত্র। দণ্ডনীতিরেকা বিদ্যা ইত্যৌশনসাঃ। তস্যাংহি সর্ব্ববিদ্যারম্ভাঃ প্রতিবদ্ধাঃ ইতি। (১ম প্রকরণ)

"একৈব [illegible] নীতিস্তু বিদ্যেত্যৌশনসী স্থিতিঃ।" (কামন্দক)

এতদ্ব্যতিরিক্ত মহাভারতে প্রাচেতস মনু ভরদ্বাজ, গৌরশিরাঃ এই কয়জনকেও রাজশাস্ত্র প্রণেতা বলা হইয়াছে। (রাজধর্ম্ম ৫৮) মহাভারতে দণ্ডনীতির রচনা নির্দ্দেশ এইরূপ। এখন দেখা যাউক চাণক্য স্বীয় গ্রন্থে কোন্ কোন্ নীতিশাস্ত্রকারের নাম করিয়াছেন। দেখা যায় তিনি মহাভারতোক্ত নামসমূহ ব্যতিরিক্ত কৌণপদন্ত (ভীষ্ম), পিশুন (নারদ) ও বাতব্যাধির (উদ্ধবের) নাম করিয়াছেন। মহাভারতোক্ত মতসমূহের মধ্যে মানব, ঔশনস, বৈশালাক্ষ, বার্হস্পত্য ও বাহুদন্ত মত উদ্ধার করিয়াছেন। ইহা ছাড়া ইত্যাচার্য্যা বলিয়া অন্যান্য পূর্ব্বাচার্য্যেরও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই "আচার্য্যগণ" কাঁহারা বলা যায় না। তবে চাণক্যের অনুবর্ত্তী কামন্দক এতদ্ব্যতীত ময়, পুলোমা ও পরাশরের মত উদ্ধার করিয়াছেন। যাহা হউক বর্ত্তমান কালে এক শুক্রনীতির সংক্ষিপ্ত নিবন্ধ ব্যতিরেকে এবং মন্বাদির কিয়দংশ ব্যতিরেকে রাজনীতি সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত বৈশালাক্ষ, বার্হস্পত্য, বাহুদন্তক, ভারদ্বাজ গ্রন্থসমূহ এবং গৌরশিরার ময়ের পুলোমার পরাশরের পিশুনের কৌনপদন্তের বা বাতব্যাধির কোনও রাজনীতি গ্রন্থই পাওয়া যায় না। অবশ্য গরুড় পুরাণাদিতে মহাভারতে নীতির কথা আছে বটে কিন্তু

তাহা অন্যান্য আচার্য্যগ্রন্থের সার সংকলন বলিয়াই বুঝা যায়। মহাভারতকার প্রায় রাজধর্ম্মপর্ব্বাধ্যায়ে সর্ব্বত্রই অন্য নীতিশাস্ত্রকারের মত বর্ণন করিয়াছেন।

যাহা হউক বুঝা যাইতেছে চাণক্য বর্ত্তমান কালে অপ্রচলিত এই সমস্ত পূর্ব্বাচার্য্যগণের গ্রন্থ হইতে নীতিশাস্ত্রকে উদ্ধার করেন। তাঁহা[illegible] হইতে এইশাস্ত্র ধর্ম্মশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র ও কামশাস্ত্র এই বিবিধ শাখায় বিভক্ত হইয়া নানারূপে বিস্তৃত ও কচিৎ লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল একথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। তিনি স্বীয় অর্থশাস্ত্রে সেই পৃথগ্‌ভূত অর্থশাস্ত্রেরই সমুদ্ধার সাধন করেন। তাহাও আবার যতটুকু রাজার উপযোগী ততটুকুই মাত্র সংকলন করেন। এইজন্য এই গ্রন্থে লোকতন্ত্র সম্বন্ধে কিছুই পাওয়া যায় না। তাই বলিয়াছেন "কৌটিল্যেন নরেন্দ্রার্থে শাসনস্য বিধিঃ কৃতঃ" (অধ্যক্ষপ্রচার শাসনাধিকার ১০ম অধ্যায়)। ফলতঃ এই অর্থশাস্ত্র প্রণয়নের পর রাজনীতি বিষয়ক নিবন্ধ সকল কেবল রাজার নীতিশিক্ষা বিষয়েই উপনিবদ্ধ হয়। সাধারণের কার্য্যাকার্য্য এই সকল নিবন্ধে উপেক্ষিত হইতে থাকে। কামন্দকীয় নীতিসার নীতিবাক্যামৃত প্রভৃতি পরবর্ত্তী গ্রন্থে এই রীতিই অবলম্বিত হইয়াছে। কালিদাসের, ভারবির এবং তদুত্তরকালী কাব্য সমূহেও এই রীতির অনুশীলনেরই সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। বিশাখদত্তের মুদ্রারাক্ষসে বা পঞ্চতন্ত্র ও হিতোপদেশে এই নীতিরই অভিব্যক্তি। ইহাতেই বুঝা যায় পরবর্ত্তী সংস্কৃত সাহিত্যে চাণক্যের আধিপত্য ও প্রভাব কতদূর।

শ্রীভাগবতকুমার গোস্বামী শাস্ত্রী এম্, এ।

হৃদয়-রাণী।

দশম পরিচ্ছেদ।

উষার সমীর অধীর ভাবে যমুনা নদীর বুকের উপর খেলা করিয়া বেড়াইতেছে। নীলাঙ্গিনী যমুনা, তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলিয়া রঙ্গে ভঙ্গে অঙ্গ হেলাইয়া দুলাইয়া মৃদুল কুলুকুলু নাদে নাচিতে নাচিতে—যেন মোগল-রাজধানী দিল্লীকে নিদ্রা হইতে জাগরিত করিবার জন্য তটে আঘাত করিতেছে। প্রকৃতির সেই স্নিগ্ধ-সুন্দর-শান্তিময় মূর্ত্তি দেখিয়া সুকণ্ঠ পক্ষীকুল আকাশ-পথে প্রকৃতির মঙ্গল-গীতি গাহিতেছে। প্রকৃতি সুন্দরী বালার্ক সিন্দুর কৌটা পরিয়া হাসিতে হাসিতে জাগিয়া উঠিলেন। প্রকৃতির জাগরণে—প্রকৃতির হাস্যস্ফুরণে দিল্লীও জাগরিত হইয়া উঠিল। তখন অরুণের কোমল-মধুর-কিরণরাজি মোগল-প্রাসাদ-শিরে—সমুচ্চ সৌধশ্রেণীর উপরে পতিত হওয়ায় দিল্লী যেন হাসিয়া উঠিল। নানা ধর্ম্মাবলম্বী নানা জাতীয় দিল্লীবাসী নরনারী জাগরিত হইয়া, বিশ্বরূপ নাট্যশালায় স্ব স্ব অংশ অভিনয় করিতে পুনরায় প্রবৃত্ত হইল।

সেই মধুর প্রভাতে দিল্লীর বিখ্যাত চাঁদনীচক নানাবিধ পণ্যদ্রব্যে সমুজ্জ্বল মূর্ত্তি ধারণ করিল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পণ্য-বীথিকা গুলিও বিবিধ দ্রব্য-সম্ভারে সুসজ্জিত হইয়া ক্রেতাদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে

বিলম্ব করিল না। জনশ্রেণীর সমাগমে রাজপথগুলি ক্রমে কলরবময়— ক্রমেই সজীব হইয়া উঠিল।

চলিয়াছেন—সম্ভ্রান্ত আমীর ওমরাহগণ, অমাত্যগণ, অন্যান্য উচ্চপদস্থ রাজপুরুষগণ, বিশহাজারী, দশহাজারী, পাঁচহাজারী প্রভৃতি মনসবদারগণ এবং তদুপরিস্থ সেনাপতিগণ, সামন্তগণ এবং করদ রাজগণ চলিয়াছেন। সকলেরই গতি প্রাসাদাভিমুখে। কেহ মূল্যবান তাঞ্জামারোহণে, কেহ সজ্জিত অশ্বারোহণে, কেহ সুভূষিত বারণারোহণে চলিয়াছেন। কাহারও অগ্রে অগ্রে ডঙ্কা বাজিতেছে, কাহারও পশ্চাতে শরীররক্ষী সৈনিক চলিয়াছে। দরবারীগণ প্রতি প্রভাতেই এইমত প্রাসাদাভিমুখে গিয়া থাকেন বটে, কিন্তু আজ একটু বিশেষ লক্ষিত হইতেছে। যাঁহারা প্রতিদিন গমন করেন না, এমত অনেক রাজাত্মীয় এবং আমীরও আজি সুসজ্জিত হইয়া প্রাসাদাভিমুখে চলিয়াছেন। সেই জন্য পথের পথিকেরাও আজ একটু কৌতুহলাবিষ্ট হইয়া সেই গমনদৃশ্য দেখিতেছে। সকলেই ভাবিতেছে যে, সম্রাট-দরবারে বোধ হয় কিছু নবীন ব্যাপার ঘটিবে, সেই জন্যই আজ এত আমীর ও ওমরাহদিগের শোভাযাত্রা চলিয়াছে।

এজগতে ভূস্বর্গ দেওয়ানি আম দরবার-কক্ষের দ্বার আজ প্রত্যুষেই উদ্ঘাটিত হইয়াছে। একে একে সকল শ্রেণীর আমীর ওমরাহ প্রভৃতি সেই পরমরমণীয় সুসজ্জিত দরবার কক্ষে সমবেত হইতে লাগিলেন। অতি সম্ভ্রান্ত আমীর এবং উজীর প্রভৃতি একে একে উপনীত হইবামাত্র নকীব সসম্মানে মান্যজ্ঞাপক বয়েদ অবৃত্তি করিয়া সকলকে তাঁহাদিগের উপস্থিতি-সংবাদ বিজ্ঞাপিত করিতে লাগিলেন।

ক্রমে দেওয়ানি আম দরবারীদিগের দ্বারা পূর্ণ হইয়া গেল। সকলেই স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপবিষ্ট। মুসলমান এবং হিন্দুভেদে আসনের কোন পার্থক্য ছিল না। অনেক হিন্দুকেই বহুল মাননীয় মুসলমান অপেক্ষা মাননীয় আসনে উপবিষ্ট হইতে দেখা গেল। সম্রাট আকবর স্বজাতীয়দিগের ন্যায় হিন্দুজাতির প্র[illegible]ন অনুগ্রহ প্রদর্শন করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। বিশেষতঃ সম্রাট আকবর গুণগ্রাহী ছিলেন, সুতরাং কি মুসলমান কি হিন্দু, গুণী মাত্রকেই তিনি তাঁহার উপযুক্ত সম্মান দান করিতে কিছুতেই বিলম্ব করিতেন না। সেই সূত্রেই রাজপুত রাজগণ এবং রাজপুত বীরবৃন্দের মধ্যে অনেকেই তাঁহাদিগের নিজের গুণ এবং বীরত্বের বলে সম্রাটের প্রিয়পাত্র এবং দেশমধ্যে মহামান্য হইয়াছিলেন। কোন কোন উচ্চপদস্থ গোঁড়া মুসলমান, হিন্দুদিগকে অনেক বিষয়ে উন্নীত এবং সম্মানিত হইতে দেখিয়া, মনে মনে ঈর্ষানলে জ্বলিয়া মরিতেন বটে, কিন্তু সম্রাটের এই ন্যায় ব্যবহারের বিরুদ্ধে কেহই প্রকাশ্যে কোন অনুযোগ উপস্থিত করিতে কিছুমাত্র সাহস করিতেন না।

সম্রাট আকবরের অসাধারণ পুরুষত্ব এবং ব্যক্তিগত মোহিনী শক্তি ছিল। তিনি সকল ধর্ম্মাবলম্বীর প্রতি সমান সদয় ভাব প্রদর্শন করিতেন বলিয়া—বিশেষতঃ ভারতের স্থায়ী অধিবাসী হিন্দুদিগের প্রতি মুসলমান-দিগের সমতুল্য ব্যবহার করিতেন বলিয়া, কোন কোন ঈর্ষাপরায়ণ গোঁড়া মুসলমান, সম্রাট আকবরকে প্রকৃত মুসলমান বলিয়া স্বীকার করিতেন না বটে কিন্তু সম্রাটের সেই অসাধারণ পুরুষত্ব এবং শক্তি, তাঁহাদিগকে প্রকাশ্যে তাহা বলিবার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইত; সুতরাং তাঁহারা মনের ক্ষোভ মনেই পোষণ করিয়া তুষ্ট থাকিতেন।

গুণবান সম্রাট আকবর বিলক্ষণ জানিতেন যে, তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষ স্বীয় বীরত্ব এবং অসিবলে হিন্দুস্থান অধিকার করিলেও হিন্দুস্থান হিন্দুদিগেরই মাতৃভূমি এবং তিনি ও তাঁহার স্বজাতীয় মুসলমানগণ বিদেশী। রাজনীতিজ্ঞ আকবর বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন যে, সদয় ব্যবহার, ন্যায়বিচার এবং হিন্দু মুসলমান অভেদে নির্ব্বিশেষে প্রজাপালন না করিলে, এই বিদেশ হিন্দুস্থানে মুসলমান-শাসন স্থায়ী হইবে না। তিনি বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন যে, সদয় এবং ন্যায়ব্যবহারে প্রজাপুঞ্জের হৃদয় অধিকার করিতে না পারিলে, কখনই কোন বিদেশীয় রাজা স্বীয় রাজত্ব স্থায়ী করিতে পারেন না। তিনি আরও বুঝিয়াছিলেন যে, বাহুবলে এবং অসিবলে কোন বিদেশ জয় করিয়া পাশব অত্যাচারে স্বীয় শক্তির প্রাধান্য বিস্তার করিতে পারা যায় বটে, এবং তদ্দ্বারা প্রজাদিগের হৃদয়ে মহা ভীতির আবির্ভাব করা যাইতে পারে বটে, কিন্তু সেই ভীতি কখনই রাজশক্তিকে প্রবলরূপে স্থায়ী হইবার সাহায্য করে না। তিনি ইহাও জানিতেন যে, হিন্দুগণ স্বদেশীয় রাজশক্তির নিকট চিরদিন অবনত থাকিতে শিক্ষিত বটে, কিন্তু বিজাতীয় বিধর্ম্মী রাজশক্তির নিকট কখনই চিরদিন অবনত থাকিতে শিক্ষিতও নহে, অভ্যস্তও নহে। সুযোগ পাইলেই সেই পাশব অত্যাচারজনিত ভীতি, বিজীত জাতিকে সেই রাজশক্তির বিরুদ্ধে উত্তিক্ত করিয়া দিবেই দিবে তিনি তাহা বিলক্ষণ জানিতেন। সেই জন্যই তিনি বিজীত হিন্দুজাতির প্রতি পাশব অত্যাচার না করিয়া, এবং সেই অত্যাচারে চিরদিন রাজশক্তিকে প্রবল রাখা অসম্ভব জ্ঞান করিয়া, হিন্দুদিগকে অপত্যনির্ব্বিশেষে পালন করিতেন এবং গোঁড়া মুসলমানদিগের গুপ্ত অনুযোগের প্রতি সর্ব্বদা উপেক্ষা প্রদর্শন করিতেন। এবং অন্যপক্ষে হিন্দুজাতিও আকবরের বিবিধ সদ্গুণে মুগ্ধ হইয়া, তিনি মুসলমান হইলেও তাঁহাকে ঈশ্বর জ্ঞানে তাঁহার প্রতি অকৃত্রিম সম্মান প্রদর্শন করিত।

যাহা হউক, আজি দেওয়ানি আমে সমবেত হিন্দু মুসলমানগণের মধ্যে কয়েক জন ব্যতীত সকলেরই মনে যেন একটা কৌতুহল উপস্থিত। সকলেই পরস্পরে বলাবলি করিতে আরম্ভ করিলেন, আজি দরবারে প্রত্যেক দরবারীকে এমন কি সম্রাট, আত্মীয় জ্ঞাতিগণকেও, উপস্থিত হইবার জন্য অনুজ্ঞা প্রচার করিয়াছেন কেন? সমবেত সম্রান্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে দুই চারিজন ব্যতীত অপরে এ প্রশ্ন মীমাংসার কোন উপায় প্রাপ্ত হন নাই।

সম্রাট আকবরের প্রধান উজীর আবুল ফজল এবং তদীয় প্রগাঢ় পণ্ডিত ভ্রাতা ফৈজী সভাস্থলে সর্ব্বাপেক্ষা মহোচ্চ সম্মান-জ্ঞাপক স্থানে সমুপবিষ্ট, কিন্তু আজ তাঁহাদিগের অতি সন্নিকটেই পোর্ত্তুগীজ পাদরী একোয়াবিভা এবং পোর্ত্তুগীজ বণিক গঞ্জালিসকে উপবিষ্ট দেখিয়া, সকলেরই মনে একটা প্রশ্নের উদয় হইল। সকলেই পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন, উঁহারা দুইজনে ঐ সমুচ্চ সম্মান-স্থানে সমুপবিষ্ট কেন? কিন্তু এই প্রশ্ন মীমাংসা করিবার কাহারও শক্তি হইল না। কিন্তু সকলেই দেখিলেন যে, প্রধান উজীর আবুল ফজল এবং তদীয় ভ্রাতা ফৈজি প্রসন্নবদনে উক্ত বিদেশীয়দিগের সহিত আলাপ করিতেছেন। দরবারীগণ এতদ্দর্শনে আরও কৌতুহলাবিষ্ট হইয়া উঠিলেন। কিন্তু সেই কৌতুহল নিবৃত্তির কোন উপায় পাইলেন না।

অনতিবিলম্বেই রাজ-নকীব চিরপ্রথামত ফুকরাইতে আরম্ভ করিল—হিন্দু রাজগণের বৈতালিকদিগের ন্যায় রাজস্তোত্র পাঠ করিতে আরম্ভ করিল। সকলেই বুঝিলেন সম্রাট আকবর আসিতেছেন। সকলেই সসম্ভ্রমে আসন ত্যাগ করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। পরমুহূর্ত্তেই প্রিয়দর্শন সম্রাট আকবর দেওয়ানি আমে দর্শন দান করিলেন। সমবেত সম্ভ্রান্ত হিন্দু মুসলমান মণ্ডলী চিরপ্রচলিত আদবকায়দা প্রদর্শন সহ কুর্নীস্ করিতে বিলম্ব করিলেন না। সম্রাট সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলে, তাঁহার ইঙ্গিত মত সকলে উপবিষ্ট হইলেন।

চিরপ্রথামত রাজকার্য্য আরম্ভ হইল। উজীর আবুল ফজল চিরপ্রথামত স্বকার্য্য সাধন করিতে বিলম্ব করিলেন না। এহেন সময়ে সেই ভূস্বর্গ দেওয়ানি আমের উপরিভাগস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আবৃত গবাক্ষরাজি হইতে ক্ষীণ নুপুরধ্বনি সভামধ্যে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। অপরে না বুঝুন, সভাস্থ সদস্যগণ বুঝিলেন যে, সম্রাটের বেগমগণ, রাজকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ জন্য গবাক্ষ-পার্শ্বে আসিয়া আসন গ্রহণ করিতেছেন।

সম্রাট আকবরের মূর্ত্তি চিরপ্রসন্ন, কিন্তু আজি যেন অতি প্রসন্ন ভাব প্রকাশ করিতেছে।

জয়পুরের মহারাজ মান সিংহ স্বীয় নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবিষ্ট। তাঁহার পার্শ্বস্থ একজন মুসলমান আমীর ক্ষীণ স্বরে তাঁহাকে প্রশ্ন করিলেন, 'মহারাজ! কিছু বুঝিলেন কি?'

মহারাজ মান সিংহ বলিলেন, 'কিছুমাত্র না।'

প্রশ্নকর্ত্তা বলিলেন,—'শুনিয়াছি, সম্রাট নূতন বিবাহ করিতেছেন, তাই—'

বাধা দিয়া মহারাজ মান সিংহ বলিলেন, 'পাঁচ হাজারের অধিক হইয়া গিয়াছে। বেগম-মহলে আর স্থান নাই। এ ঘটনা নিত্য, ইহার জন্য আবার বিশেষ দরবারের কি প্রয়োজন?'

আমীর বলিলেন—'মহারাজ! প্রয়োজন আছে কি না, তাহা আবুল ফজল ও ফৈজী জানেন। তুমি বা আমি জানি বা না জানি, তাতে কি যায় আসে?'

জয়পুরেশ্বর এই কথাগুলি শুনিয়া একটু বিস্মিত হইলেন। কিন্তু আর কোন কথা কহিলেন না।

দৈনন্দিন রাজকার্য্য সমাধায় সমধিক বিলম্ব হইল না। কিন্তু পাদরী একোয়া বিভা এবং গণ্ডালিস যেন উৎকণ্ঠার ভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অধীরতা আসিয়া তাঁহাদিগের মুখমণ্ডলে দেখা দিল। পাদরী, উজীর আবুল ফজলকে কি যেন কি জিজ্ঞাসা করিলেন।

'একটু অপেক্ষা করুন।' সহাস্যবদনে উজীর, পাদরীকে এই উত্তর দান করিলেন।

সভাভঙ্গের পূর্ব্বলক্ষণ দেখা যাইতেছে বলিয়া, এদিকে সমাগত আমীর ওমরাহগণও পরস্পরে বিস্ময় ভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কি জন্য আজি প্রত্যেককে দরবারে উপস্থিত হইবার নিমিত্ত সম্রাট আদেশ প্রচার করিয়াছেন, এখনও তাহা কেহ জানিতে পারিলেন না বলিয়া সকলেই উৎকণ্ঠিত হইলেন।

এহেন সময়ে সম্রাট আকবর স্বভাবসিদ্ধ মিষ্টস্বরে ধীর গম্ভীর ভাবে দৃঢ়তা সহকারে বলিতে আরম্ভ করিলেন। সভাস্থ প্রত্যেকের দৃষ্টি তখন তাঁহার প্রতি অর্পিত হইল। সম্রাট বলিলেন—'আজিকার দরবারে আপনাদিগের সকলকে উপস্থিত হইবার জন্য আমন্ত্রণ করিয়াছি।'

'আহ্বান' কথার পরিবর্ত্তে 'আমন্ত্রণ' শব্দ প্রয়োগ করায় কূটরাজনীতিজ্ঞগণ বুঝিলেন ব্যপারটা সহজ নহে।

সম্রাট সহাস-আননে বলিলেন, 'আমি আর একটী বিবাহ করিতে অভিলাষী।'

পোর্ত্তুগীজ পাদরী একোয়া বিভা এবং গঞ্জালিস সর্ব্বাপেক্ষ সাগ্রহে সম্রাটের কথা গুলি শুনিতে লাগিলেন।

সম্রাট বলিলেন, 'কেবল এই বিবাহ-সংবাদ শুনাইবার জন্য আপনাদিগকে এত ক্লেশ স্বীকারে এখানে আসিতে অনুরোধ করি নাই। একটী বিশেষ কারণ আছে।'

দরবারের যে আবৃত গবাক্ষপার্শ্বে বেগমগণ উপবেশন করেন, এই সময়ে একবার সম্রাটের দৃষ্টি যেন চকিতভাবে সেই দিকে পতিত হইল সভাস্থ সকলে 'বিশেষ কারণ' কি, তাহা জানিবার জন্য ব্যগ্র হইলেন।

সম্রাট উচ্চৈস্বরে দৃঢ়তার সহিত বলিতে লাগিলেন, 'পোর্ত্তুগীজ বণিক, যাঁহাকে আপনারা উজীরের সন্নিকটে উপবিষ্ট দেখিতেছেন, উঁহার কন্যার পাণিগ্রহণ করিতে আমি অভিলাষী।'

বণিক গঞ্জালিস এই সময়ে আপনাকে যেন একজন মহোচ্চবংশীয় জ্ঞান করিয়া, সভার চারিদিকে সগর্ব্বে দৃষ্টিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। কিন্তু সভাস্থ কোন কোন সম্রান্ত মুসলমান ও হিন্দুর হৃদয়ে এই সংবাদে ঘৃণার উদ্রেক হইল।

নীরবতা ভঙ্গ করিয়া, 'এ বিবাহের একটী পণ আছে।' সম্রাট এই কথা বলিয়া চারিদিকে দৃষ্টিদান করিলেন। অবশ্য উপরিস্থ বাতায়নগুলির প্রতিও সে দৃষ্টি পতিত হইয়াছিল। পণটি কি জানিবার জন্য সকলে আরও ব্যগ্র হইলেন।

বলিলেন, 'আমি এই পণে আবদ্ধ হইয়াছি যে, যাঁহাকে আমি বিবাহ করিতে অভিলাষী হইয়াছি, আমার ঔরসে তাঁহার গর্ভে যে পুত্র সন্তান জন্মিবে, আমার সেই পুত্রই আমার উত্তরাধিকারী—এই সাম্রাজ্যের সম্রাট হইবেন।'

বিনামেঘে বজ্রাঘাতের ন্যায় এই সংবাদটী সভাস্থ অনেকেরই বক্ষে বিষম সংঘাত প্রদান করিল। কেবলমাত্র পাদরী বিভা এবং বণিক গঞ্জালিসের হৃদয়ে অননুভূতপূর্ব্ব আনন্দ আসিয়া দেখা দিল। পাদরী ও বণিক প্রসন্নবদনে সম্রাটের প্রতি দৃষ্টিদানং করিয়া কৃতজ্ঞতা জানাইতে বিলম্ব করিলেন না। মুসলমান আমীর এবং ওমরাহগণ এবং হিন্দুরাজগণ এই উত্তরাধিকারী-নির্ব্বাচন সম্বন্ধে প্রকাশ্যে কিছুই বলিলেন না। তাঁহাদের মনের ভাব মুখমণ্ডলেই প্রকাশ পাইতে লাগিল।

সম্রাট পণের কথা প্রকাশ করিয়া গাত্রোত্থান করিবার উদ্যোগ করিতেছেন, এহেন সময়ে সভাস্থ সকলের অজ্ঞাতসারে শিশুকুমার সেলিম সিংহাসন-সোপানে আরোহণ করিলেন। কুমার সেলিম যে অপ্রত্যাশিতরূপে এসময়ে এস্থানে উপস্থিত হইবেন, সম্রাট তাহা ভ্রমেও ভাবেন নাই। যাহা হউক তিনি তাঁহাকে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন বটে কিন্তু পরমুহূর্ত্তে সহাস্য-আননে সেলিমের করধারণ পূর্ব্বক সিংহাসন হইতে অবতরণ করিয়া, ধীরপাদবিক্ষেপে সভাস্থল ত্যাগ করিলেন।

সম্রাট সভাস্থল ত্যাগ করিবা মাত্রই সভাস্থ সকলে এই উত্তরাধিকারী-নির্ব্বাচন সম্বন্ধে পরস্পরে মতামত প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এ সম্বন্ধে অচিরেই মতভেদ দৃষ্ট হইতে লাগিল। সমধিকসংখ্যক রাজপুত এই

সম্রাটের জ্যেষ্ঠ পুত্র সেলিম রাজপুত-রাজ-কন্যার গর্ভজাত। সুতরাং তাঁহার পরিবর্ত্তে এক খৃষ্টান রমণীর গর্ভজাত পুত্র হিন্দুস্থানের অধীশ্বর হইবেন, ইহা তাঁহাদিগের সহ্য হইল না।

অন্য পক্ষে এসময়ে সম্রাট আকবরের সভায় রাজপুতদিগের বিশেষ প্রতিপত্তি বৃদ্ধি হওয়ায়, এক শ্রেণীর মুসলমান আমীর মনে মনে বড়ই অসন্তুষ্ট ছিলেন, কিন্তু আজিকার এই পণের সংবাদে তাঁহারা হৃষ্ট হইলেন, কারণ খৃষ্টান রমণী-গর্ভজাত সন্তান পরে সম্রাট হইলে, রাজপুতদিগের সে প্রতিপত্তি একেবারে বিলুপ্ত হইবে।

পাদরী একোয়া বিভা এবং বণিক গঞ্জালিস আনন্দোদ্বেলিত-হৃদয়ে গাত্রোত্থান করিয়া, উজীর আবুল ফজল ও ফৈজীর সহিত দু একটী কথা বলিয়া সভাস্থল ত্যাগ করিলেন। তাঁহাদিগের গমনকালে অনেকেরই সঘৃণ দৃষ্টি তাঁহাদিগের প্রতি পতিত হইল।

পাদরী গমনকালে পথিমধ্যে গঞ্জালিসকে বলিলেন, 'বৎস! প্রভু যিশুর সদয় হস্ত এই শুভকার্য্যের প্রত্যেক কণ্টকটীকে কেমন উৎপাটিত করিয়া দিতেছে! তুমি নিশ্চয় জানিও এই শুভ বিবাহের পরই এই দেওয়ানি আমকে আমি প্রভু যিশুর উপাসনা-মন্দিরে পরিণত করিব।'

কুমারী মেরী যখন শুনিলেন যে, সম্রাট আকবর দরবারে উত্তরাধিকারী নির্ব্বাচন ঘোষণা করিয়াছেন, তখন আর তাঁহার আনন্দের সীমা রহিল না। মেরী মনে মনে বলিলেন, 'সম্রাট দেখিতে কেমন সুন্দর!'

একাদশ পরিচ্ছেদ।

সম্রাট আকবরের দিল্লী এবং আগ্রার প্রাসাদে পাঁচ সহস্রাধিক বেগম বিরাজমান।

হইল। সম্রাট, যাহার দুইটী চক্ষু দেখিয়া আত্মহারা হইয়াছিলেন, আজি সেই অনুপ সুন্দরী কুমারী মেরীকে স্বজাতীয় শাস্ত্রানুসারে বিবাহ করিয়া, এই সুখ-দুঃখ-ভরা ধরাকে কেবল সুখময়—মধুময় স্বর্গ জ্ঞান করিতে লাগিলেন। এ জগতে যে রোগ, শোক, জরা, যন্ত্রণা, মরণ আছে, এ জগতে যে, ক্লেশ, কষ্ট, ক্লান্তি আছে, এ জগতে যে, বিষাদ, ব্যথা, বিরহ-বেদনা আছে, আজি তাহা বিস্মৃত হইয়াগেলেন। তিনি দেখিলেন, এ জগতে কেবল সুখ, শান্তি ও সুধার উৎসে উৎফুল্ল হইয়া সকলে আনন্দ-সাগরে ভাসিতেছে। দেখিলেন, এ জগৎ মরলোক নহে, এ জগৎ স্বর্গ। সম্রাট আকবর মনে মনে বলিলেন, আমার অন্তঃপুরে বিশ্ববিমোহিনী কুলকুলরাণী অনেক পদ্মিনী আছেন, সুগন্ধ-সৌরভময়ী সকল ফুলই আছে, স্বর্গের পরীও আছে, ছিল না কেবল—মেরী। মেরীর সঙ্গে তুলনা দিবার এ জগতে—কেবল জগতে কেন? স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে কিছুই নাই। মেরীর তুলনা মেরীতে। মেরীর তুলনা অপরে সম্ভবে না। সে হেন মেরীকে পত্নীরূপে লাভ করিয়া অননুভূতপূর্ব্ব প্রমোদ-পয়োধিতে আজি আকবর নিমগ্ন। আকবর যেমন স্বীয় বাহুবলে ভারতেশ্বর, স্বীয় গুণগ্রামে হিন্দুদিগের নিকট জগদীশ্বর, সেইমত আকবর অপক্ষপাতী সম্রাট, সেইমত রাজনীতিজ্ঞ, সেইমত অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রজাপালনকর্ত্তা, সেইমত অভেদজ্ঞানে হিন্দু মুসলমান প্রজাপুঞ্জের ব্যবহর্ত্তা। আকবর সেইমত রসিক, সেইমত প্রেমিক, সেইমত প্রকৃত ভালবাসা কাহাকে বলে, সে বিষয়ে অভিজ্ঞ। তিনি বিদেশীয়া খৃষ্টান যুবতী মেরীর দুইটী বিশ্ববিজয়ী চক্ষু দেখিয়া আত্মহারা হইয়া-

একবারে বিকৃত হয় নাই, কিন্তু আজি সেই অনুপমা, বিশ্ব-মনোরমা ললনা-ললামভূতা মেরীকে লাভ করিয়া, তিনি বাস্তবিকই আনন্দে আত্মহারা। যে প্রকৃত রসিক, প্রকৃত প্রেমিক, সেইই এহেন দিনে এইমত একেবারে আত্মহারা হয়। কারণ সেই রসিক—সেই প্রেমিক কেবল প্রার্থিত ধনলাভে আত্মহারা হইয়া ভাবে যে, এ জগতে আর কেহই নাই, আছে সে নিজে আর আছে তার প্রণয়িনী—তাহার বাঞ্ছনীয় ধন। আকবর, আজি সেই বাঞ্ছনীয় ধন লাভে আত্মহারা হইয়া ভাবিলেন যে, এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আর কেহই নাই—আছেন কেবল তিনি আর তাঁহার মেরী।

আর সুচতুর পোর্ত্তগীজ বণিক গঞ্জালিসের কন্যা মেরী ?—যে মেরী নিভৃতনিবাসে পর-পুরুষ-মুখদর্শন না করিয়া, সমস্ত জীবনটা বিশুর ধ্যানে কাটাইতে মনন করিয়াছিলেন, যে মেরী প্রথমে ভারতের প্রবল প্রতাপান্বিত সম্রাট আকবরকে বিবাহ করিতে প্রবল আপত্তি করিয়াছিলেন, সেই মেরী ?—সে মেরী যেন আজি সে মেরী নহেন। শুভ বিবাহের পূর্ব্বে যখন মহামূল্যবান কনক-খচিত পেসোয়াজ দ্বারা তাঁহার অঙ্গ আচ্ছাদিত করা হইল, তখন মেরীর নয়ন যুগল সেই বেশের সৌন্দর্য্যে ও মাধুর্য্যে ঝলসাইয়া গেল। তৎপরে যখন বহুলক্ষ মুদ্রামূল্যের রত্ন-মুক্তা-হীরকালঙ্কারে তাঁহাকে বিভূষিতা করা হইল, তখন মেরী যেন আপনাকে অদৃষ্টপূর্ব্ব নূতন রাজ্যে আনীতা বোধ করিতে বিলম্ব করিল না। তৎপরে যখন তাঁহার মস্তকে মহামূল্যবান সমুজ্জ্বল হীরক-মুকুট পরাইয়া দিল; তখন সেই অনাঘ্রাতা কুসুমকলিনী মেরীর কোমল হৃদয়ে সাহানার তান উঠিল। সে স্থানে মেরী ভাবিলেন, এ জগৎই স্বর্গ এবং এ স্বর্গে আছেন কেবল সম্রাট আকবর আর তিনি। প্রকৃত প্রেমিক প্রেমিকাগণ প্রেম-নাট্যা-ভিনয়ের প্রথম সূচনাতে এই মতই অনুভব করিয়া থাকেন।

শুভ পরিণয়ের পর মেরী কনকখচিত বস্ত্রাবরণে আবৃত শিবিকার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। মেরীর পক্ষে এ ঘটনা এই প্রথম। স্বাধীনা বনবিহঙ্গিনী আজি পিঞ্জরবদ্ধা হইল। মেরী ভাবিলেন, পতির প্রীতির জন্য যখন পতিপদপ্রান্তে আত্মদান করিয়া, পতির হৃদয়ে হৃদয় মিশাইয়া, আপনার অস্তিত্ব বিস্মৃত হইলাম, তখন স্বাধীনতা কোন্ ছার ?

প্রহরী-পরিবেষ্টিত শিবিকা দিল্লী-প্রাসাদের অন্তঃপুর-দ্বারে আসিয়া উপনীত হইল। বাহকগণ বিদায় লইল। বলিষ্ঠা কার্ম্মুক নারীগণ আসিয়া শিবিকা বহন পূর্ব্বক অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইল। অন্তঃপুরে প্রবেশের পথটীর দুই পার্শ্বে প্রফুল্ল ফুলরাজি-শোভিত পাদপশ্রেণী। তখন শিবিকার বস্ত্র উন্মোচিত হইল। বাহিকাগণ ধীরে ধীরে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। অন্তঃপুরের শত শত গবাক্ষ হইতে সহস্র সহস্র নারী-চক্ষু সুন্দরী মেরীর প্রতি পতিত হইল। সেই অন্তঃপুরবাসিনী বেগমগণ সকলেই সুন্দরী—এক একজন অতুলনীয়া সুন্দরী, কিন্তু আজি মেরীর রূপের সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য দর্শনে সকলেরই সৌন্দর্য্য-গর্ব্ব একেবারে খর্ব্ব হইয়া গেল। কারণ এরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী শ্বেতাঙ্গিনী রমণী তাঁহাদিগের কাহারও চক্ষে কখনও পতিত হন নাই।

মেরীর জন্য পূর্ব্ব হইতেই একটী স্বতন্ত্র মহল নির্দ্দিষ্ট এবং সুসজ্জিত করা হইয়াছিল। কার্ম্মুক নারীগণ সেই মহলের

শ্রেণীবদ্ধ ভাবে কতিপয় যুবতী দণ্ডায়মান ছিল। তাহারা মেরীকে লক্ষ্য করিয়া আদবকায়দামত কুর্ণীস করিতে বিলম্ব করিল না। ইহারা কে?—ইহারা মেরীর জন্য নির্ব্বাচিতা পরিচারিকা। ইহারা বয়সে যেমন যুবতী,' সেইমত সুন্দরী। সম্রাট আকবরের শাসনকালে তাঁহার অন্তঃপুরে কুৎসিতা কদাকারা প্রৌঢ়া বা বৃদ্ধা পরিচারিকা স্থান পাইত না।

পরমুহূর্ত্তেই একটী অসাধারণ রূপবতী যুবতী প্রবেশ-দ্বারে দর্শন দিলেন। ধীর পদে হাসিতে হাসিতে শিবিকার দিকে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার সেই অনুপ রূপ-রাশি—সেই কাঁচা সোণার ন্যায় স্নিগ্ধ সুন্দর উজ্জ্বলবর্ণ দেখিয়া এবং অঙ্গের নানাস্থানে মূল্যবান অলঙ্কার দর্শনে মেরী বুঝিলেন যে, ইনি অবশ্যই একজন প্রাধানা বেগম। বাস্তবিক ইনি কে? ইনি শিশু কুমার সেলিমের জননী—আকবরের প্রাধানা পত্নী রাজপুত-রাজকুমারী। তিনি মৃদুমন্দ হাস্যসহকারে অগ্রসর হইয়া মেরীর কর ধারণ করিয়া, শিবিকা হইতে উত্তোলন করিলেন।

মেরী বিনয়নম্রতাসহকারে সলজ্জভাবে অভিবাদন করিতে বিলম্ব করিলেন না। সেলিমের মাতা মেরীকে লইয়া, মেরীর নির্দ্দিষ্ট কক্ষে উপনীত হইলেন।

মেরীর সহিত মেরীর বাটী হইতে তাঁহার ভারতীয়া পরিচারিকা আসিয়াছিল। কিন্তু আজ তাহার মাথা ঘুরিয়া গিয়াছে। সেই বিরাট প্রাসাদের রমণীর বিরাট অন্তঃপুর। তার পর এই মহামূল্যবান দ্রব্যাদি শোভিত রাজকক্ষ দেখিয়া সে স্থির করিতে পারিতেছিল না, সে কোথায়? কিন্তু মধ্যে মধ্যে তাহার মনে একটী বিষম প্রশ্নের উদয় হইতেছিল। দেখিতেছিল যে, অন্তঃপুরের সকলেই এমন কি বাঁদীগণ পর্য্যন্ত অল্প বিস্তর সুন্দরী—আর দেখিতেছিল সকলেই যুবতী। সে নিজে কি? এক সময় সৌন্দর্য্য তাহার দেহরাজ্যে সিংহাসন স্থাপন করিয়াছিল,তাহার কতক চিহ্ন এখনও বিরাজমান। কিন্তু যৌবন? যৌবন কবে কোন্‌কালে পথের পথিকের মত—অতিথির মত একবার দেখা দিয়াই অদৃশ্য হইয়াছে। সে বৃদ্ধা। সেই জন্যই সে মনেমনে প্রশ্ন করিতেছিল যে, এই যুবতীমণ্ডলীর মধ্যে কিরূপে একাকিনী বৃদ্ধা কাল কাটাইবে? সে তখন বিধাতাকে র্ভৎসনা, করিয়া মনে মনে বলিতে লাগিল—নদীতে যেমন প্রত্যহ জোয়ার আসে, রমণীর দেহে আজীবন সেই মত নিত্যই যৌবনের জোয়ার আসে না কেন? সে এ প্রশ্নের মীমাংসা করিতে পারিল ন। কিন্তু সে বিধাতাকে গালি পাড়িতে ছাড়িল না। অনেক রমণীই প্রৌঢ়া বা বৃদ্ধাবস্থায় মনের দুঃখে এইমত বিধাতাকে গালি পাড়িয়া থাকে।

কুমার সেলিমের মাতার দৃষ্টি সেই বৃদ্ধার প্রতি অকস্মাৎ পতিত হইল। তিনি বুঝিলেন যে, এই বৃদ্ধা, মেরীর পরিচারিকা নতুবা এত বৃদ্ধা এ রাজ-অন্তঃপুরে স্থান পাইল কি রূপে? তিনি এতক্ষণ নীরবে ছিলেন, কারণ তিনি ভাবিয়াছিলেন যে, বিদেশীয়া বিজাতীয়া মেরী তাঁহার ভাষা বুঝিতে পারিবেন কি? তাই তিনি সেই বৃদ্ধা পরিচারিকাকে নিকটে ডাকিয়া ধীর ভাবে বলিলেন, বেগমকে বল যে, এই মহল তাঁহার জন্য সম্রাট স্থির করিয়া দিয়াছেন। উনি সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া লউন। যদি কোন বিষয়ের অভাব বোধ হয়, তাহা হইলে (নবনিয়োজিতা পরিচারিকাদিগের প্রতি হস্ত প্রসারিত করিয়া) ইহাদিগকে বলিলে, ইহারা সেই অভাব পূরণ করিয়া দিবে।'

মেরীর নিজস্ব পরিচারিকা উত্তর দান করিবার পূর্ব্বেই মেরী সহাস্য আস্যে কুমার সেলিমের মাতার ভাষাতেই প্রসন্নবদনে প্রশ্ন করিলেন,—'আপনি কে?'

প্রশ্নকারিণীর ভাষা শ্রবণে বিস্মিত হইয়া, 'আমি সম্রাটের ক্রীতদাসী।' এই কথা বলিয়া, সেলিমের মাতা বুঝিলেন যে, নবীনা বেগম এ দেশের প্রচলিত ভাষা জানেন।

আর মেরী? তিনি 'ক্রীতদাসী' শব্দ শুনিয়া একটু বিস্মিত হইলেন। তিনি জানিতেন যে, ভারতে দাস-ব্যবসায়-প্রথা প্রচলিত আছে, কিন্তু এহেন অসাধারণ রূপযৌবনসম্পন্না রমণী দাসীরূপে বিক্রীতা হয়, ইহা তিনি জানিতেন না। তিনি সোৎসুকে প্রশ্ন করিলেন, 'আপনি কত মূল্যে ক্রীত হইয়াছেন?'

পরমুহূর্ত্তেই উত্তর হইল, 'এক কড়া কাণা কড়ি মূল্যে।'

'কাণা কড়ি" শব্দের অর্থটা মেরীর হৃদয়ঙ্গম হইল না। তিনি স্বীয় বাঁদীর দিকে দৃষ্টিদান করিলেন। বাঁদী তাঁহার কাণে কাণে কি বলিল। মেরী তখন হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 'দেখুন বেগম সাহেবা! আপনি এককড়া কাণাকড়িতে আত্ম বিক্রয় করিয়াছেন, কিন্তু আমি বিনামূল্যে সম্রাটের চরণে আত্ম-বিক্রয় করিয়াছি। আপনি ক্রীতদাসী আর আমি বিনামূল্যে আত্মবিক্রীতা দাসী।' 'আপনি ভাগ্যবতী।'

সম্রাটের প্রধানা রাজপুত-মহিষী শুনিয়াছিলেন যে, ইয়ুরোপের রমণীরা কাষ্ঠাসন ব্যতীত মছলন্দে বসিতে পারেন না। তিনি পরমুহূর্ত্তে মেরীর দুইটীকর ধারণ করিয়া, কক্ষ-মধ্যস্থ কনকখচিত সিংহাসনে বসাইয়া দিলেন। আসিয়া কক্ষ মধ্যে প্রতিধ্বনিত হইল। সেলিমের জননী কক্ষ ত্যাগ করিতে মুহূর্ত্ত মাত্র বিলম্ব করিলেন না। পরিচারিকাগণও সেই মুহূর্ত্তেই কক্ষ ত্যাগ করিল। তাহারা জানিত যে, সম্রাটের অন্তঃপুরে আসিবার পূর্ব্বধ্বনি শুনা যাইতেছে। তাহারা মেরীর নিজস্ব পরিচারিকার হস্তধারণ করিয়া কক্ষ ত্যাগ করিল।

আজি মধুযামিনী। সেই মধুযামিনীর প্রত্যেক মুহূর্ত্ত যেন সম্রাট আকবরের পক্ষে এক একটী যুগ বলিয়া বোধ হইতেছিল। সে মুহূর্ত্ত যেন অনন্ত। যথা সময়ের পূর্ব্বে তিনি অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইলেন। বাসনা—পূর্ণ সুখ সম্ভোগ।

মেরীর কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, মেরী একাকিনী সিংহাসনে উপবিষ্টা। সম্রাট, দুইটী কর বিস্তৃত করিয়া দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইবামাত্র মেরীও সেইমত দুইটী কর বিস্তৃত করিয়া, লজ্জাবনতমুখে ধীর পাদবিক্ষেপে কয়েক পদ অগ্রসর হইলেন।

সম্রাট আকবর সাদরে সযত্নে ধীরে ধীরে মেরীর সেই সুকোমল ভুজবল্লী ধারণ করিয়া নিজের দিকে আকর্ষণ করিলেন। মেরী সম্রাটের বক্ষে নিজ মস্তক স্থাপন করিতে মুহূর্ত্তমাত্রও বিলম্ব করিলেন না। সেই সময়ে উভয়ের শরীর হইতে কি যেন এক তাড়িৎ-প্রবাহ বহির্গত হইয়া, উভয়কে বিচলিত করিল। উভয়েই আত্মহারা।

সম্রাট আকবর কোকিলকণ্ঠ-বিনিন্দিত স্বরে গান ধরিলেন,—

'আজি স্বরগের সুধা ঝরে।
আমার অন্তরে।
তুমি অনাঘ্রাতা প্রফুল্ল নলিনী,
আমার হৃদয়-সরসীবাসিনী,
শরীর শিহরে ভুবনমোহিনী,

সম্রাট আকবর ধীরে সাদরে মেরীকে আলিঙ্গন করিলেন। আবার গাহিলেন,—

'তুমি প্রাণের প্রাণ দেহ আলিঙ্গন,
তোমাতে মিশায়ে দিই এ জীবন,
নিরুপমা বামা দেহ গো চুম্বন,
মধুর অধরে।'

সুরসিক সুপ্রেমিক আকবর, সেই অনাঘ্রাতা ফুল্লনলিনী মেরীর মুখমধু পান করিয়া বলিলেন,—'মেরি! তোমার দ্বারা আমি এ জীবনেই স্বর্গলাভ করিলাম। যদি দেখাইবার হইত, তাহা হইলে এই হৃদয় চিরিয়া দেখাইতাম, এ জগতে একমাত্র মেরীই আকবরের হৃদয়-রাণী।'

সারস্বত-সম্মিলন।

শ্রীশ্রীসরস্বতী বিজয়তে।

(সংস্কৃতকলেজের সারস্বত-সম্মিলন উপলক্ষে পঠিত।)

মাতৃ-মন্দিরে—সংস্কৃত বিদ্যালয়ের অধিষ্ঠাত্রী জননী দেবীর চরণ-প্রান্তমূলে—আজ আবার মায়ের সন্তানগণ একত্র সমবেত। সারা বছর প্রবাসে থাকিয়া—কর্ম্মক্ষেত্রে নিজ নিজ কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিয়া —সারস্বত বর্ষারম্ভে আজ মাতার বর্ষীয়ান্ পুত্রগণ সারস্বত জননীর ক্রোড়স্থ সন্তানগণের সহিত আনন্দময় ভ্রাতৃ-সম্মিলনে সম্মিলিত। মিলনের এই শুভক্ষণে ভ্রাতৃগণের হৃদয়ে কত আশার কত স্নিগ্ধ উদার পবিত্র মঙ্গলময় ভাবের সঞ্চার ও সমাবেশে সমুচ্ছ্বসিত। কৃতী প্রতিষ্ঠাবান্ জ্যেষ্ঠের সমাগমে ও সন্দর্শনে কোন্ কনিষ্ঠের হৃদয় না আশার আলোকে উদ্ভাসিত হয়—শ্রদ্ধা ভক্তির বিমল রসধারায় পরিপ্লাবিত হয়? জ্যেষ্ঠও কি কখন এমন সময়ে এক অপূর্ব্ব স্নেহময়ী বৃত্তির মহাস্ফুরণ মনোমধ্যে অনুভব না করিয়া থাকিতে পারেন? অন্যোন্য পরিচয়ে অন্যোন্য প্রীতিও অবশ্যম্ভাবিনী। সহানুভূতি ও সমবেদনার সূত্রে সহোদরগণের একভাববন্ধনে আর কোন্ উপকরণের প্রয়োজন? ফলতঃ যে দিক্ দিয়াই দেখা সৌভ্রাত্র-সঞ্চারের এক সুখময়—কল্যাণময় উপাদান।

এই শুভ সম্মিলনে সম্মিলিত হইয়া আজ আমরা একবার অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ভবিষ্যতের কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লইতে পারি। জননীর চরণমূলে বসিয়া আমরা আমাদের সারস্বতজীবনের মহাব্রতের পর্য্যালোচনা করিতে পারি। এই পুণ্যময় ধামে আমরা যে সারস্বত-সংস্কার—সারস্বত জন্ম লাভ করিয়াছিলাম সে সংস্কারের মূল মন্ত্র কি,—সে জন্মের গভীর উদ্দেশ্য কি? প্রতীচ্যজ্ঞানের নবীন আলোকে প্রাচীন প্রাচ্যজ্ঞানের রহস্য প্রকাশ করিবার জন্য, আর্য্য ঋষিগণের প্রবর্ত্তিত চিন্তার স্রোতে ইদানীন্তন মনীষিগণের চিন্তার ধারা প্রবাহিত করিবার জন্য, সোজা কথায় ভারতের প্রাচীন শিক্ষার সহিত বর্ত্তমান পাশ্চাত্য শিক্ষার সামঞ্জস্য ও সমাবেশ সাধন করিয়া দেখিবার ও দেখাইবার জন্য আমরা এই সংস্কৃত বিদ্যামন্দিরে শিক্ষা লাভ করিয়াছি। এই বিদ্যামন্দিরের ইহাই বিশেষত্ব। আজ আমরা আমাদের পবিত্র সারস্বত-জন্মভূমিতে

এই মহৎ উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করিতেছি। আমাদের যে সকল কৃতী সম্ভ্রান্ত সহোদর এই মহান্ আদর্শের অনুসরণ করিয়া ধন্য হইয়াছেন, চক্ষের সমক্ষে তাঁহাদের অনেকের গৌরবময়ী সমুজ্জ্বল মূর্ত্তি দর্শন করিয়া আমরাও ধন্য ও কৃতার্থ হইতেছি। তাঁহাদের প্রতিষ্ঠা ও সম্মানে আমরা সকলেই প্রতিষ্ঠান্বিত ও সম্মানিত বলিয়া মনে করিতেছি।

যাঁহারা উপস্থিত নাই বা যাঁহারা আমাদের পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন, এই সংমিলনক্ষণে তাঁহাদের মহনীয় মূর্ত্তিও আমাদের স্মৃতিপটে আবির্ভূত হইয়া আমাদিগকে সমানভাবে অনুপ্রাণিত করিতেছে। ফল আমরা আজ সাক্ষাদ্ভাবে বা স্মৃতিদ্বারে, আমাদের জননীর সমস্ত সুসন্তানের—ধর্ম্মবীর, কর্ম্মবীর বা জ্ঞানবীর, গ্রন্থকার বা অধ্যাপক, সকলের,—প্রতিষ্ঠার ও গৌরবের ছবি সন্দর্শনে আনন্দে উৎফুল্ল হইতেছি, এবং তাঁহাদের সাধুপদবী অনুসরণে স্ব স্ব রুচি ও প্রবৃত্তি অনুসারে কৃত-সংকল্প হইতেছি।

কল্যাণ কল্যাণপরম্পরায় প্রসূতি। আমাদেরও তাই আশা হয় আমাদের এই বার্ষিক শুভসমাগম নানাবিধ মঙ্গলময় কার্য্যের ভিত্তিরূপে পরিণত হইবে। মনে হয় যেন আমরা অচিরে ভ্রাতৃমণ্ডলীর সমবেত শক্তিদ্বারা ব্যক্তিগত সৎসংকল্প ও সদুদ্যমের পৃষ্ঠপোষকতা করিতে পারিব। মনে হয় ধর্ম্ম জ্ঞান ও কর্ম্মের ক্ষেত্রে আমাদের সমবায় সমুত্থান একদিন বিশেষ কার্য্যকারী ও ফলোপধায়ক হইবে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের যে সমন্বয়মন্ত্রে আমরা দীক্ষা লাভ করিয়াছি, সকলে সেই মন্ত্রে অনুপ্রাণিত হইয়া বর্ত্তমান ভারতের ধর্ম্ম জ্ঞান ও কর্ম্মের সমস্যা সমূহ সমাধান করিতে প্রবৃত্ত হইলে কি আমরা নিজের ও দেশের অশেষ কল্যাণ সাধনে সমর্থ হই না? সংস্কৃত বিদ্যামন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী জননী কি আমাদের নিকট তাহাই আশা করেন না? এতগুলি কৃতী ভ্রাতার একত্র সমাগমে এরূপ ইচ্ছা আমাদের মনে উঠিলে তাহা দুরাকাঙ্ক্ষা বলিয়া বোধ হয় না।

সম্মিলনের উৎসাহে উৎসাহান্বিত হইয়া বলিতে ইচ্ছা হইতেছে, আমাদের এই সম্মিলন স্থায়িভাবে কার্য্যকারী হউক। উৎসব-সমিতি স্থায়ি-সমিতিতে পরিণত হউক। নবীন ও পুরাতনের প্রতিনিধিগণের তত্ত্বাবধানে সেই স্থায়ি-সমিতির কার্য্য পরিচালিত হউক। জননীর অভীষ্টসিদ্ধির জন্য, সংস্কারের মূলমন্ত্র সাধনের জন্য, সংস্কৃত কলেজের ভ্রাতৃসমবায় অগ্রসর হউন। বিদ্যামন্দিরের প্রথিতনামা কৃতকর্ম্মা বর্ত্তমান আচার্য্যমণ্ডলীর উৎসাহ আশীর্ব্বাদ ও আনুকূল্য রহিয়াছে, দেশবিখ্যাত স্বনাম ধন্য এতগুলি মহাপুরুষের সানুগ্রহদৃষ্টি রহিয়াছে, অবশ্যই শুভফল লাভ হইবে। জননীর কার্য্যে দ্বেষ তাপ ঈর্ষ্যা মন হইতে বিদূরিত করিয়া একযোগ, একপ্রাণ, একমত হইয়া, সৎসংকল্পের বশবর্ত্তী হইয়া, প্রবৃত্ত হইব; নিশ্চয়ই মঙ্গলনিদান পরমেশ্বর আমাদের সহায়তা করিবেন। কেবল আমাদের চাই আন্তরিকতা ও ঐকমত্য। দেবতার কার্য্যে উপাসকের ইহাই প্রধান ও শ্রেষ্ঠ সংযম। ঐ শুনুন সনাতন বেদময়ী সারস্বতবাণী ঐ আদেশই প্রচার করিতেছেন—

"সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাম্।
দেবা ভাগং যথা পূর্ব্বে সংজানানা উপাসতে॥
সমানো মন্ত্রঃ সমিতিঃ সমানী সমানং মনঃ সহচিত্তমেষাম্।
সমানং মন্ত্রমভিমন্ত্রয়ে বঃ সমানেন বো হবিষা জুহোমি॥
সমানী ব আকূতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ।
সমানমস্তু বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি॥

শ্রীভাগবতকুমার গোস্বামী শাস্ত্রী এম, এ।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময়

বঙ্গদেশের সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক এবং বাঙ্গালী সাহিত্যিকদিগের অন্যতর গুরুস্থানীয় শ্রদ্ধেয় ৺ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার প্রণীত প্রসিদ্ধ "কৃষ্ণচরিত্র" নামক পুস্তকে মহাভারতীয় কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের মত গ্রহণ করেন নাই, পক্ষান্তরে, এতদ্দেশীয় পণ্ডিতগণের মতও অগ্রাহ্য বোধে পরিত্যাগ করিয়াছেন। এতদ্দেশীয় পৌরাণিক পণ্ডিতদিগের সুদৃঢ় সিদ্ধান্ত এই যে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ বর্ত্তমান কলিযুগের প্রাক্‌কালে সংঘটিত হইয়াছিল। ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের মতে এই ঘোরতর জ্ঞাতি-বিরোধ খ্রীঃ পূঃ দ্বাদশ শতাব্দী হইতে চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যে ঘটিয়াছিল। বঙ্কিম বাবু পুরাণ সমূহ, প্রধানতঃ বিষ্ণুপুরাণ অবলম্বন করতঃ নানাবিধ যুক্তিতর্ক অবলম্বন করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ খ্রীঃ পূঃ ১৫৩০ অব্দের পূর্ব্বে কখনই ঘটিতে পারে না এবং খ্রীঃ পূঃ ১৪৩০ অব্দই ঐ যুদ্ধের অধিকতর নির্ভুল সময়। তাঁহার প্রণীত "কৃষ্ণচরিত্রে" উপক্রমণিকাভাগের পঞ্চম এবং ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে এই বিষয় লিখিত হইয়াছে। আমরা পাঠকবর্গকে অনুরোধ করিতেছি যে, তাঁহারা একবার এই পরিচ্ছেদ দুইটী পাঠ করিয়া লইবেন। তাঁহার সমস্ত যুক্তিতর্ক উদ্ধৃত করিতে গেলে প্রবন্ধের কলেবর অযথা বর্দ্ধিত হয় মাত্র এবং তাহাতে বিশেষ কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধির সম্ভাবনা নাই; তজ্জন্য আমরা অতি সংক্ষেপে তাঁহার বক্তব্য বিষয়ের পরিচয় দিয়া আমাদের কথা

বঙ্কিম বাবু বিষ্ণুপুরাণের চতুর্থ অংশের ২৪ অধ্যায়ের ৩৩।৩৪ শ্লোক বলিয়া উদ্ধার করিয়াছেন, যথাঃ—

"সপ্তর্ষীণান্তু যৌ পূর্ব্বৌ দৃশ্যেতে উদিতৌ দিবি।
তয়োস্তু মধ্যনক্ষত্রং দৃশ্যতে যং সমং নিশি।
তেন সপ্তর্ষয়ো যুক্তাস্তিষ্ঠন্ত্যব্দশতং নৃনাম্।
তে তু পারীক্ষিতে কালে মঘাস্বাসন দ্বিজোত্তম॥
তদা প্রবৃত্তশ্চ কলির্দ্বাদশাব্দশতাত্মকঃ।"

অর্থ—সপ্তর্ষিমণ্ডলের যে দুইটী তারা আকাশে পূর্ব্বদিকে উদিত দেখা যায়, ইহাদের সমসূত্রে যে মধ্যনক্ষত্র দেখা যায়, সেই নক্ষত্রে সপ্তর্ষি শত বৎসর অবস্থান করেন। সপ্তর্ষি পরীক্ষিতের সময়ে মঘা নক্ষত্রে ছিলেন, তখন কলির দ্বাদশ শত বৎসর প্রবৃত্ত হইয়াছিল।

অতএব এই কথামতে কলির দ্বাদশ শত বর্ষের পর পরীক্ষিতের সময়, তাহা হইলে উপরি উদ্ধৃত ৩৪ শ্লোক অনুসারে ১৯০০ খ্রীঃ পূঃ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময়।"

কলিযুগ খ্রীঃ পূর্ব্ব ৩১০০ অব্দে আরম্ভ হইয়াছে, বঙ্কিম বাবুর মতে পরীক্ষিতের সময় কলির দ্বাদশ শত বৎসর প্রবৃত্ত হইয়াছিল, সুতরাং তাঁহার মতে পরীক্ষিতের সময়, অথবা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময়, ১৯০০ খ্রীঃ পূঃ স্থিরীকৃত হইয়াছে। এই প্রসিদ্ধ লেখক কিন্তু এই গণনায় সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই, তাই তিনি লিখিয়াছেন :—

"কিন্তু ৩৩ শ্লোকে যাহা পাওয়া যায়, তাহার সঙ্গে এ গণনা মিলে না। ঐ ৩৩ শ্লোকের তাৎপর্য্য অতি দুর্গম,—সবিস্তারে

এই মন্তব্যের পর তিনি প্রকৃতপক্ষে অতি দুর্গম এবং সাধারণ পাঠকের দুর্ব্বোধ্য জ্যোতিষের গণনা অবলম্বন করিয়া দেখাইয়াছেন যে, মহাভারতের যুদ্ধ ১৪৩০ খ্রীঃ পূর্ব্বাব্দে সংঘটিত হইয়াছিল। তার পর পুনশ্চ দুরধিগম্য জ্যোতিষের সাহায্য লইয়া, মহাভারতীয় যুদ্ধের কুরুপক্ষের প্রধান সেনাপতি মহাবীর ভীষ্মের মৃত্যুর প্রাক্কালীন উক্তির—

"মাঘোঽয়ং সমনুপ্রাপ্ত মাসঃ সৌম্যো যুধিষ্ঠির।" শ্লোকার্দ্ধ ব্যাখ্যা করতঃ দেখাইয়াছেন যে, এই যুদ্ধ ১৫৩০ খৃঃ পূঃ অব্দে সংঘটিত হইয়াছিল। এইরূপ সিদ্ধান্তের পর তিনি বলিতেছেন,—

"ভরসা করি এই প্রমাণের পর কেহই বলিবেন না যে, মহাভারতীয় যুদ্ধ দ্বাপরের শেষে, ৫০০০ বৎসর পূর্ব্বে হইয়াছিল।"

বঙ্কিম বাবুর প্রমাণে আমরা কিন্তু সন্তোষ লাভ করিতে পারি নাই। আমাদের বিশ্বাস, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ দ্বাপরের শেষে না হউক, কলির প্রাক্কালে, প্রায় ৫০০০ বৎসর পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল, তাহা এই প্রমাণে কিছুমাত্র শিথিল হয় নাই। শিথিল না হওয়ার কারণ ক্রমশঃ নির্দ্দেশ করিতেছি। প্রথমেই একটী কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, বঙ্কিম বাবুর নিন্দাবাদ করা, অথবা তাঁহার সিদ্ধান্তের প্রতি কোনরূপ ইঙ্গিত বা কটাক্ষ করা আমাদের অভিপ্রায় নহে। তাঁহার সর্ব্বতোমুখিনী প্রতিভার নিকট সমগ্র বঙ্গদেশ,—কেবল বঙ্গদেশ কেন, সমগ্র ভারতবর্ষ যে বিশেষ ভাবে ঋণী তাহা বলাই বাহুল্য। যদিও প্রত্নতত্ত্বক্ষেত্রে বঙ্কিম বাবু মহাত্মা ৮ রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয়ের ন্যায় প্রগাঢ় পরিশ্রম করেন নাই, তথাচ তিনি যাহা করিয়াছেন, তাহারই জন্য আমরা আমাদের মত তাঁহার প্রদর্শিত আলোকে বিশেষ উপকৃত। এখন তিনি এমন স্থানে অবস্থিত যে, লৌকিক যশ ও অপযশের বার্ত্তা তথায় পৌঁছিতে পারে না। সত্যানুসন্ধিৎসা ও সত্যস্থাপন সর্ব্বথাই কর্ত্তব্য; এবং তজ্জন্যই আমরা সেই শ্রদ্ধেয় মহাপুরুষের প্রদর্শিত পথে, তাঁহারই অবলম্বিত শাস্ত্রসহায়ে এই বিষয়ের মীমাংসায় অগ্রসর হইয়াছি। দুর্ভাগ্যের বিষয় জ্যোতিষ শাস্ত্রে অধিকার লাভ আমাদের অদৃষ্টে ঘটে নাই; সুতরাং আমরা এই প্রবন্ধে সেই জটিল বিষয়ের অবতারণা করিব না। যাহাতে আমাদিগের মত অল্পাধিকারীগণও অক্লেশে সমুদায় বিষয় সুচারুরূপে বুঝিতে পারেন, সেই রূপভাবেই আমরা বক্ষ্যমান বিষয়ের আলোচনা করিব।

আমরাও বঙ্কিম বাবুর উদ্ধৃত বিষ্ণুপুরাণের চতুর্থ অংশ ২৪ অধ্যায়ে হইতে উদ্ধৃত করিতেছি :—

"যাবৎ পরীক্ষিতো জন্ম যাবচ্চন্দাভিষেচনম্।
এতৎ বর্ষসহস্রং তু জ্ঞেয়ং পঞ্চাশদুত্তরম
॥ ১০৪ ॥
সপ্তর্ষীণাং তু যৌ পূর্ব্বৌ দৃশ্যেতে হ্যুদিতে দিবি।
তয়োস্তু মধ্যনক্ষত্রং দৃশ্যতে যং সমং নিশি
॥ ১০৫ ॥
তেন সপ্তর্ষয়ো যুক্তাস্তিষ্ঠন্ত্যব্দশতং নৃনাম্।
তে তু পারীক্ষিতে কালে মঘাস্বাসন্ দ্বিজোত্তম
॥ ১০৬ ॥
তদা প্রবৃত্তশ্চ কলির্দ্বাদশাব্দশতাত্মকঃ ॥১০৭॥
যদৈব ভগবান্ বিষ্ণোরংশো যাতো দিবং দ্বিজ।
বসুদেবকুলোদ্ভূতস্তদৈবাত্রাগতঃ কলিঃ ॥১০৮॥
যাবৎ সঃ পাদপদ্মাভ্যাং স্পর্শৈমাং বসুন্ধরাম্
তাবৎ পৃথ্বী পরিষঙ্গে সমর্থো নাভবৎ কলিঃ

গতে সনাতনাস্যাংশে বিষ্ণোরত্র ভুবো দিবম্।
তত্যাজ সানুজো রাজ্যং ধর্ম্মপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ
॥ ১১০ ॥
বিপরীতানি দৃষ্ট্বা চ নিমিত্তানি হি পাণ্ডবঃ।
যাতে কৃষ্ণে চকারাহথ সোঽভিষেকং
পরীক্ষিতঃ ॥ ১১১ ॥

অর্থ—পরীক্ষিতের জন্ম হইতে মহারাজ নন্দের অভিষেক পর্য্যন্ত সময়ের সংখ্যা ১০৫০ বৎসর। সপ্তর্ষিমণ্ডলের মধ্যে যে দুইটী তারা আকাশে কিছু পূর্ব্বদিকে উদিত দেখা যায়, উহাদের সমসূত্রে রাশিচক্রের মধ্যস্থ যে যে, নক্ষত্র দেখিতে পাওয়া যায়, সেই নক্ষত্রে সপ্তর্ষি শত বৎসর অবস্থান করেন। পরীক্ষিতের সময়ে সপ্তর্ষিমণ্ডল মঘা নক্ষত্রে অবস্থিতি করিতেছিলেন; সেই সময়ে দিব্য দ্বাদশ শত বর্ষ পরিমিত কলিযুগ প্রবৃত্ত হইয়াছে। বসুদেবকুলোদ্ভূত ভগবান বিষ্ণুর অংশ শ্রীশ্রীকৃষ্ণচন্দ্র যে সময়ে স্বর্গারোহণ করিয়াছেন, সেই সময় হইতেই কলির আধিপত্য ঘটিয়াছে। যতদিন পর্য্যন্ত ভগবান তাঁহার পাদপদ্মদ্বারা ধরিত্রীকে স্পর্শ করতঃ পবিত্র করিতেছিলেন, কলি ততদিন পর্য্যন্ত পৃথিবীতে স্বাধিকার বিস্তারে সমর্থ হয় নাই। সনাতন ভগবান্ বিষ্ণুর অংশ শ্রীশ্রীকৃষ্ণ স্বর্গারোহণ করিলে, ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত রাজ্য ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। তিনি ভগবানের স্বর্গারোহণের পর কলির প্রাধান্যসূচক নানা দুর্নিমিত্ত দর্শনে ক্ষুণ্ণ হইয়া পরীক্ষিতের রাজ্যাভিষেক সম্পাদন করিয়াছেন।

পাঠক, অবশ্যই লক্ষ্য করিবেন যে, বঙ্কিম বাবুর ও আমাদের উদ্ধৃত শ্লোকাবলির প্রথমাংশ এক হইলেও অর্থ বিষয়ে বিলক্ষণ ভিন্নতা ঘটিয়াছে। বঙ্কিম বাবু যুগের দ্বাদশ শত বৎসর অতীত হইয়াছিল; কিন্তু আমরা অর্থ করিয়াছি যে, তাঁহার সময়ে দিব্য দ্বাদশ শত বৎসরাত্মককলিযুগ প্রবৃত্ত হইয়াছে। ঐ অর্থ আমাদের মনগড়া অর্থ নহে; মূলের "দ্বাদশাব্দশতাত্মক" শব্দটী কলির বিশেষণে প্রযুক্ত হইয়াছে। সুতরাং ইহার অর্থ কলিযুগের দ্বাদশ শত বৎসর অতীত হওয়া কিছুতেই হইতে পারে না। কলিযুগের সংখ্যা যে দিব্য দ্বাদশশতবৎসর তাহা শাস্ত্রজ্ঞমাত্রেই অবগত আছেন। এই বাক্যের টীকায় স্বামিপাদ শ্রীশ্রীশ্রীধর বলিতেছেনঃ—

"তদেতি॥ সন্ধ্যাংশাভ্যাং সহ দিব্য দ্বাদশাত্মকঃ সন্ধ্যারূপেণ পূর্ব্বমেব প্রবিষ্টোপি তদা প্রকর্ষেণ প্রবিষ্টং সন্ধ্যারূপমতিক্রম্য স্বেনৈব রূপেণ প্রবিষ্ট ইত্যর্থঃ॥"

সুতরাং বিষ্ণুপুরাণের উপরি উদ্ধৃত বাক্যাবলী হইতে এই মাত্র পাওয়া যাইতেছে যে, শ্রীশ্রীকৃষ্ণচন্দ্র স্বর্গারোহণ করিলে পরীক্ষিতের সময় কলির প্রভাব বর্দ্ধিত হইয়াছে। ইহা হইতে কলি আরম্ভ হইবার কত বৎসর পরে যে, পরীক্ষিতের রাজ্যাভিষেক ঘটিয়াছিল তাহা পাওয়া যাইতেছে না; সুতরাং ইহা হইতে মহাভারতীয় যুদ্ধের সময় নির্দ্দেশ সম্বন্ধে কোন সাহায্য পাওয়া যাইতেছে না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, জ্যোতিষ শাস্ত্রের সাহায্য লইয়া আমরা এ বিষয়ে মীমাংসায় অগ্রসর হইব না; সুতরাং রাশিচক্র, নক্ষত্রচক্র, সপ্তর্ষিমণ্ডল ও অয়ন চলন সম্বন্ধে কোন কথা আমরা কহিব না। কুরুক্ষেত্রের সময়ে শ্রীশ্রীকৃষ্ণচন্দ্রই পাণ্ডবপক্ষের সর্ব্বস্ব ছিলেন; সুতরাং সে সময়ে কলিযুগের বিস্তার ঘটে নাই, অর্থাৎ কলিযুগ অধিকতর অগ্রসর হয় নাই, এই তথ্যটুকু মাত্র আমরা এই শ্লোকাবলী হইতে পাইয়াছি. ইহার

বিষ্ণুপুরাণের ঋষি কিন্তু আমাদিগকে নিরাশ করেন নাই। তিনি এই চতুর্থ অংশেই অতি সরল ভাষায় মহাভারতীয় যুদ্ধের সময় নির্দ্দেশক যথেষ্ট সামগ্রীর সমাবেশ করিয়াছেন। এইবার আমরা সেইগুলি বিবেচক পাঠকমণ্ডলীর সমীপে উপস্থিত করিতেছি। সকলেই অবগত আছেন যে, মগধাধিপতি জরাসন্ধ কুরুপাণ্ডবদিগের সমসাময়িক সম্রাট ছিলেন। মহাভারতীয় যুদ্ধের কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তিনি মধ্যম পাণ্ডব ভীমকর্ম্মা ভীমসেনের হস্তে দ্বন্দযুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হইয়াছিলেন। বিষ্ণু-পুরাণকার সেই মহাবলপরাক্রান্ত জরাসন্ধ হইতে মৌর্য্যবংশীয় শেষ নরপতি পর্য্যন্ত মগধ-সিংহাসনের অধিকারী ভূপতিবর্গের বংশ, নাম ও প্রত্যেক বংশের নৃপতিদিগের রাজত্বের কালসমষ্টি ধারাবাহিকরূপে প্রদান করিয়াছেন; আমরা সেই তালিকা হইতে মহাভারতীয় যুদ্ধের সময় অতি সহজেই নির্দ্ধারিত করিতে পারি। পুরাণের মূল সংস্কৃতাংশ উদ্ধার করিতে গেলে প্রবন্ধের কলেবর অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইবার আশঙ্কায় কেবলমাত্র উহার বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল :—

জরাসন্ধ
|
সহদেব।
|
সমাপি।
|
শ্রুতশ্রবা।
|
অযুতায়ু।
|
নিরামিত্র।
|
সুনেত্র।
|
বৃহৎকর্ম্মা।
|
সেনজিৎ।
|
শ্রুতঞ্জয়।
|
বিপ্র।
|
শুচি।
|
ক্ষেম্য।
|
সুব্রত।
|
ধর্ম।
|
সুশ্রবা।
|
দৃঢ়সেন।
|
সুবল।
|
সুনীত।
|
সত্যজিৎ।
|
বিশ্বজিৎ।
|
রিপুঞ্জয়।

এই সকল বৃহদ্রথ-বংশীয় নৃপতিগণ ১০০০ বৎসর রাজত্ব করিবেন। ২৩ অধ্যায়।

রিপুঞ্জয়ের অমাত্য মুনিক রাজাকে হত্যা করিয়া স্বীয় পুত্র প্রদ্যোতকে সিংহাসনে অভিষেক করিবেন।

প্রদ্যোত।
|
বলাক।
|
বিশাখযূপ।
|
জনক।
|
নন্দিবর্দ্ধন।
|
নন্দী।

এই বংশীয় পাঁচজন রাজা ৮৩৮ বৎসর রাজত্ব করিবেন।

শিশুনাগ বা শিশুনাভ।
|
কাকবর্ণ।
|
ক্ষেমধর্ম্মা।
|
ক্ষতৌজা।

বিম্বিসার।
|
অজাতশত্রু।
|
অর্ভক।
|
উদয়ন।
|
নন্দিবর্দ্ধন।
|
মহানন্দী।

"শিশুনাগবংশীয় এই নৃপতিগণ ৩৬২ বৎসর রাজত্ব করিবেন।"

মহাপদ্ম নন্দ।
সুমালিপ্রভৃতি অষ্টপুত্র।

মহাপদ্মের অষ্ট পুত্র ১০০ বৎসর রাজত্ব করিবেন। কৌটিল্য নামক ব্রাহ্মণ এই নন্দবংশধ্বংস করিবেন। নন্দবংশের অভাবে মৌর্য্যবংশ রাজ্য প্রতিপালন করিবেন।

কৌটিল্য ব্রাহ্মণ (যিনি ইতিহাসে চাণক্য নামে ও গ্রন্থান্তরে বাৎসায়ণ ও মল্লনাগ নামে কথিত হইয়াছেন) মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্তকে রাজ্যে অভিষেক করিবেন। ২৮ শ্লোক, ২৪ অধ্যায়, চতুর্থ অংশ।

চন্দ্রগুপ্ত ইতিহাসপ্রসিদ্ধ রাজা; তাঁহারই সময়ে গ্রীক মহাবীর আলেকজাণ্ডার ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিলেন। বঙ্কিম বাবু লিখিয়াছেন যে চন্দ্রগুপ্ত খ্রীঃ পূঃ ৩১৫ অব্দে রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আমরা তাঁহারই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলাম। এখন দেখা যাইতেছে যে, চন্দ্রগুপ্তের পূর্ব্বে মগধ-রাজসিংহাসনে জরাসন্ধ-বংশীয় নৃপতিগণ ১০০০, প্রদ্যোত-বংশীয়গণ ৮৩৮ বৎসর, শিশুনাগবংশীয়গণ ৩৬২ বৎসর ও নন্দগণ ১০০ বৎসর রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং ৩১৫+১০০+৩৬২+৮৩৮+১০০০=২৬১৫ খ্রীঃ পূর্ব্বাব্দে সম্রাট্ জরাসন্ধ রাজত্ব করিতেছিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের কয়েক বৎসর পূর্ব্বে জরাসন্ধ নিহত হয়। এই গণনানুসারে কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধ যে খ্রীঃ পূঃ ২৬০০ অব্দে সংঘটিত হইয়াছিল তাহা নির্ব্বিবাদে বলা যাইতে পারে। বঙ্কিম বাবু বিষ্ণুপুরাণ অধ্যয়ন করিয়াও কেন যে এই সহজ গণনাটীর প্রতি দৃষ্টিপাত করেন নাই তাহা আমাদিগের ক্ষুদ্র বুদ্ধির অগম্য। বিষ্ণুপুরাণের এই গণনা গ্রহণ করিলেই দেশীয় প্রাচীন সিদ্ধান্ত এবং কাশ্মীরের বিখ্যাত রাজতরঙ্গিণীর সিদ্ধান্তের সহিত সামঞ্জস্য ঘটে। সম্প্রতি ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দ চলিতেছে; ২৬০০ খ্রীঃ পূর্ব্বাব্দে মহাভারতীয় যুদ্ধ সংঘটিত হইলে আজ হইতে প্রায় ৪৫০০ বৎসর পূর্ব্বে উহা ঘটিয়াছিল বলিতে হয়। অধুনা ৫০১৩ কল্যব্দ চলিতেছে সুতরাং কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ প্রায় ৫০০ কল্যব্দে হইয়াছিল দেখা যাইতেছে। রাজতরঙ্গিণী কারের মতে কলির প্রায় সাড়ে ছয় শত বৎসর গতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হইয়াছিল।

যে সকল পাঠকের জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রতি অনুরাগ আছে, তাঁহারা শ্রীযুক্ত বাল গঙ্গাধর তিলকের "Orion", শ্রীযুক্ত রাজকুমার সেনের "হিন্দুজ্যোতিষ," শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়ের "আমাদের জ্যোতিষ ও জ্যোতিষী" এবং শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্তের উপনিষদ গ্রন্থের বেদের সঙ্কলনকাল নামক অধ্যায় প্রভৃতি পুস্তকের যে কোন খানি পাঠ করিলেই জানিতে পারিবেন যে, বঙ্কিম বাবুর জ্যোতিষিক গণনা ভ্রান্ত, এবং ঐসকল বিখ্যাত জ্যোতিষী পণ্ডিতদিগের মতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ খ্রীঃ পূঃ ২৫০০ অব্দের পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে।

আমাদের প্রবন্ধে যদি কোন হিসাবের কোন ভ্রান্তি থাকে, সদাশয় পাঠকবর্গ কৃপা করিয়া তাহা সংশোধিত করিয়া দিলে কৃতার্থ হইব।

সাহিত্য-সভার কার্য্যবিবরণী।

১২শ বার্ষিক, ৪র্থ মাসিক অধিবেশন।

৩২শে শ্রাবণ, ১৩১৮ সাল।

বৃহস্পতিবার, অপরাহ্ণ ৬ ঘটিকা।

১। সভাস্থলে নিম্নলিখিত সভ্যগণ উপস্থিত ছিলেন :—

১। শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর।
২। ,, রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর এম্, এ।
৩। ,, রায় মতিলাল হালদার বাহাদুর।
৪। ,, পণ্ডিত রাজকৃষ্ণ শিরোমণি।
৫। ,, শীতলপ্রসাদ ঘোষ, বি, এল্।
৬। ,, রায় ডাক্তার চুণীলাল বসু বাহাদুর এম্, বি।
৭। ,, পণ্ডিত হরিদেব শাস্ত্রী।
৮। ,, কুমার প্রমোদকৃষ্ণ দেব বাহাদুর
৯। ,, গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
১০। ,, গোপালচন্দ্র সেন।
১১। ,, রোহিণীকুমার ভট্টাচার্য্য
১২। ,, যোগেন্দ্রচন্দ্র সাহা।
১৩। ,, রজনীকান্ত বিদ্যারত্ন বি, এ।
১৪। ,, কুমুদকান্ত দত্ত
১৫। ,, বলাই চাঁদ মল্লিক।
১৬। ,, অমূল্যচরণ মিত্র।
১৭। ,, জিতেন্দ্রনাথ বসু এম্,এ, বি,এল্
১৮। ,, কুমার সুরেন্দ্রনারায়ণ দেব বাহাদুর।
১৯। ,, বাণীকান্ত দে এম্, এ, বি, এল্।
২০। ,, কুমার প্রদ্যুম্নকৃষ্ণ দেব বাহাদুর।
২১। ,, বি, দে, এম্, এ।
২২। ,, ডাক্তার এস্, বি, মিত্র, বি,এস সি, এম্, বি।
২৩। ,, কুমুদবিহারী বসু।
২৫। ,, প্রসন্নকুমার শীল বি, এল্।
৩৬। ,, মহামহোপাধ্যায় কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ।
২৭। ,, কবিরাজ কেদারনাথ কাব্যতীর্থ
২৮। ,, রামচন্দ্র দত্ত।
২৯। ,, চণ্ডীচরণ স্মৃতিভূষণ।
৩০। ,, নগেন্দ্র কৃষ্ণ বসু।
৩১। ,, বৈ[illegible] বিদ্যারত্ন।
৩২। ,, কবিরাজ মাধবচন্দ্র বিদ্যারত্ন।
৩৩। ,, মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ বিজয়রত্ন সেন
৩৪। ,, আনন্দচন্দ্র তর্কবাগীশ।
৩৫। ,, কবিরাজ হেমচন্দ্র সেন কবিরত্ন।
৩৬। ,, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার এম্, এ।
৩৭। ,, ডাক্তার ডি, এন, চট্টোপাধ্যায়।
৩৮। ,, অর্দ্ধচন্দ্র রায় চৌধুরী।
৩৯। ,, ডাক্তার যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ
৪০। ,, ললিনাথ ভট্টাচার্য্য।
৪১। ,, সতীশচন্দ্র পাল চৌধুরী।
৪২। ,, কবিরাজ যতীন্দ্রনাথ সেন।
৪৩। ,, কবিরাজ সুরেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত,
৪৪। ,, ক্ষেত্রগোপাল মুখোপাধ্যায়।
৪৫। ,, হেমচন্দ্র সেন গুপ্ত।
৪৬। ,, অম্বিকাচরণ দেব।
৪৭। ,, শশধর গঙ্গোপাধ্যায়।

২। শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুরের সমর্থনে সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত ডাক্তার এস্, বি, মিত্র বি, এসসি,

। সাহিত্য-সভার অন্যতম হিতৈষী সভ্য রায় নরেন্দ্রনাথ সেন বাহাদুরের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশক প্রস্তাব উপস্থিত করিবার জন্য শ্রীযুক্ত সভাপতি মহাশয় কর্ত্তৃক শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর আহূত হইলে, তিনি সংক্ষিপ্ত অথচ হৃদয়-গ্রাহী বক্তৃতায় মৃত রায় বাহাদুরের গুণ-গ্রামের উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, মৃত রায় বাহাদুরের নিকট সাহিত্য-সভা বিশেষভাবে ঋণী। তাঁহার ন্যায় দেশহিতৈষী, মহানুভব, সত্যবাদী এবং চরিত্রবান লোক বিরল। বঙ্গ সাহিত্যের উপর তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। মহামহোপাধ্যায় কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ মহাশয়ের লিখিত সাহিত্য-সভায় পঠিত দার্শনিক প্রবন্ধগুলি ইংরাজীতে অনুবাদিত হইয়া প্রকাশিত হইলে, তৎপাঠে তিনি ইণ্ডিয়ান মিরারে যে মন্তব্য প্রকাশ করেন, তাহাতেই তাঁহার অনুরাগ বিশেষরূপে প্রকাশ পাইয়াছিল। তিনি সাহিত্য-সভার পরম হিতৈষী ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা আমার পক্ষে পবিত্র কর্ত্তব্য জ্ঞান করি। ...কে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় জ্ঞান ...র বংশের সহিত আমাদের বংশের চিরকাল আলাপ। শ্রীযুক্ত রাজা বাহাদুর পরে প্রস্তাব করিলেন,—

"রায় নরেন্দ্রনাথ সেন বাহাদুরের মৃত্যুতে সাহিত্য-সভা গভীর শোক প্রকাশ করিতেছে। তাঁহার বিয়োগে সাহিত্য-সভা অতীব ক্ষতি গ্রস্ত হইল। সাহিত্য-সভা তাঁহার শোক-সন্তপ্ত পরিজনবর্গের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করিতেছে।

এই প্রস্তাবের অনুলিপি তাঁহার শোক-সন্তপ্ত পুত্রের নিকট প্রেরিত হউক।"

শ্রীযুক্ত রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর যে, মৃত রায় বাহাদুর মহাশয় সাহিত্য-সভার অন্যতম সভাপতি ও পরিপোষক ছিলেন। নানাবিধ কার্য্যে ব্যস্ততা বশতঃ সর্ব্বদা সভার কার্য্যে যোগদানে ... হইলেও সভা কখনই তাঁহার সহায়তা বা সমবেদনা-লাভে বঞ্চিত হয় নাই। তাঁহার শোচনীয় মৃত্যুতে যে সাহিত্য-সভা বিশেষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। অতএব তিনি সর্ব্বান্তঃকরণে রাজা বাহাদুরের প্রস্তাবের সমর্থন করিতেছেন।'

৪। কয়েক মাস হইল, সাহিত্য-সভার অন্যতম সভাপতি শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ মহাশয় সংস্কৃত কলেজের দর্শনাধ্যাপকের পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট যাহাতে তাঁহাকে বিশেষ বৃত্তি দান করেন, সভাপতি মহাশয় এমন প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া, শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরকে এ সম্বন্ধে প্রস্তাব করিতে বলেন।

শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর বলিলেন, আমি ভক্তি-শ্রদ্ধা-প্রণোদিত হইয়া বলিতেছি যে, শ্রীযুক্ত তর্কবাগীশ মহাশয় সাহিত্য-সভার উন্নতিকল্পে নিঃস্বার্থভাবে যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন। তিনি এখন বঙ্গের অদ্বিতীয় দার্শনিক পণ্ডিত। যাহাতে গবর্ণমেণ্ট তাঁহার পাণ্ডিত্যের পুরস্কার স্বরূপ বিশেষ বৃত্তি (special pension) প্রদান করেন, তজ্জন্য সাহিত্য-সভা হইতে গবর্ণ-মেণ্টের নিকট আবেদন করা আবশ্যক। সভা ইতঃপূর্ব্বে ৺মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয়ের জন্যও রাজদ্বারে ঐরূপ আবেদন করিয়াছিলেন। অতএব তিনি প্রস্তাব করিতেছেন যে, "শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় কামখ্যানাথ তর্কবাগীশ মহাশয়ের যাহাতে বিশেষ বৃত্তি হয়, এজন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট সাহিত্য-সভার পক্ষ

শ্রীযুক্ত রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর উক্ত প্রস্তাব সমর্থন করিয়া বলিলেন, মহামহোপাধ্যায় কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ মহাশয়ের [illegible] রাজা বাহাদুর যে প্রস্তাবের অবতারণা করিয়াছেন, তাহার সমর্থনের আবশ্যকতা দেখা যায় না, কারণ ঐ সম্বন্ধে মতদ্বৈধ হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। তর্কবাগীশ মহাশয়ের বিদ্যাবুদ্ধি সাহিত্যানুরাগ, প্রতিভা প্রভৃতি সর্ব্বজনবিদিত। তিনি সাহিত্য-সভার একজন নিত্যোৎসাহী সভ্য। সভার কার্য্যে নিঃস্বার্থভাবে পরিশ্রম করিয়াছেন। তাঁহার বিদ্যাবত্তার পুরস্কারের জন্য সাহিত্যসভা যে গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন, ইহা বড়ই আনন্দের বিষয়। যে যে কারণে ইতঃপূর্ব্বে মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কলঙ্কার মহাশয়ের বিশেষ বৃত্তির জন্য আবেদন করা হইয়াছিল, এস্থলেও সেই সেই কারণ বর্ত্তমান। তিনি উক্ত প্রস্তাবের সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করিতেছেন।

মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ বিজয়রত্ন সেন কবিরঞ্জন বলিলেন, তর্কবাগীশ মহাশয় একজন অসাধারণ দার্শনিক, তাঁহার তুল্য দার্শনিক আর [illegible] তাঁহার আদর করিলে আমরা নিজেদেরই [illegible] র করিব। তাঁহার সম্বন্ধেও আমরা [illegible] মারি...ইত্যাদি শ্লোক আবৃত্তি করিতে পারি। প্রস্তাব সম্বন্ধে দ্বিতীয় মত নাই।

শ্রীযুক্ত রায় ডাক্তার চুনীলাল বসু বাহাদুর এম্ বি. বলিলেন, আমার এই প্রস্তাব সম্বন্ধে কোন ভিন্ন মত হইতে পারে না। আমি অন্তরের সহিত এই প্রস্তাবের সমর্থন করিতেছি। সাহিত্য-সভা তাঁহার নিকট বিশেষ ঋণী। সাহিত্য-সভার সহিত তিনি ওতঃপ্রোতভাবে বিজড়িত। আমি প্রস্তাব করিতেছি যে, তর্কবাগীশ মহাশয়ের বিশেষ বৃত্তির জন্য আবেদনাদি প্রেরণ করিবার ভার শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর ও শ্রীযুক্ত রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুরের উপর অর্পিত হউক।

প্রস্তাবটী সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

৫। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণী পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।

৬। অতঃপর সভাপতি মহাশয়, প্রবন্ধপাঠক শ্রীযুক্ত ডাক্তার যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের পরিচয় প্রদান করিলেন ও তাঁহাকে প্রবন্ধ পাঠার্থে অনুরোধ করিলেন।

৭। শ্রীযুক্ত ডাক্তার যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় "পূর্ণাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ—উপক্রমণিকা শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

৮। প্রবন্ধ পাঠান্তে শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর বলিলেন, এই প্রবন্ধ প্রণয়নে প্রবন্ধকার বিশেষ পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন। উহা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইলে তৎসম্বন্ধে মত প্রকাশ করাই যুক্তিসিদ্ধ। প্রবন্ধ সাহিত্য-সভার গ্রন্থপ্রচার বিভাগ হইতে মুদ্রিত হইতেছে। তিনি প্রবন্ধকারকে সভার পক্ষ হইতে ধন্যবাদ প্রদান [illegible]তেছেন।

শ্রীযুক্ত কবিরাজ [illegible] তীর্থ বলিলেন, আমরা আয়ুর্ব্বেদ-ব্যবসায়ী ও সাহিত্য সভার সভ্য অথচ আয়ুর্ব্বেদীয় ইতিহাস ঘটিত প্রবন্ধ একজন ডাক্তার সভ্য কর্ত্তৃক লিখিত হইল। তজ্জন্য আমি লজ্জিত। আমরা স্বীয় কর্ত্তব্য হইতে বিচ্যুত। প্রবন্ধকার কঠোর পরিশ্রম করিয়াছেন—সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষবুদ্ধি প্রবন্ধে স্থান প্রাপ্ত হয় নাই। সামান্য সামান্য ত্রুটী আছে। আর একটী কথা—প্রবন্ধে চিকিৎসাবিজ্ঞান পঞ্চমবেদ বলিয়া উক্ত হইয়াছে, ইহা প্রকৃত নহে। আয়ুর্ব্বেদের উৎপত্তি ৮০০ বৎসর হইয়াছে, একথাও ঠিক নহে। উহা যখন বেদের

অন্তর্ভুক্ত আর বেদ যখন অনাদি, তখন উহার উৎপত্তি কালের সীমা নির্দ্দেশ কতদূর যুক্তিযুক্ত তাহা বলা যায় না। প্রবন্ধে আয়ুর্ব্বেদতত্ত্বার্থী ভরদ্বাজের ইন্দ্র-সমীপে গমনোপলক্ষে ইন্দ্রের বাসস্থানের যেরূপ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে তাহাও কতদূর যুক্তি ও প্রমাণসহ তাহা বলা যায় না। প্রবন্ধকার "যুক্তিব্যপাশ্রয়" এই আয়ুর্ব্বেদোক্ত শব্দের অর্থ Scientific চিকিৎসা এইরূপ লিখিয়াছেন। ঐ শব্দে সেই অর্থের বোধ হয় না, উহার অর্থ ঔষধ বা পথ্যের যুক্তি বা যোগ। প্রবন্ধকার বর্ত্তমানে চিকিৎসাবিজ্ঞানের উন্নতির কথা বলিয়াছেন, কিন্তু দেশের বর্ত্তমান স্বাস্থ্যের অবস্থা বিবেচনা করিলে, উহা কাল্পনিক বলিয়াই বোধ হয়।

পরে ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী ... আয়ুর্ব্বেদ ... ব্রহ্ম ... অভিহিত হইয়াছে। ... এই বেদ প্রণয়ন করিয়া প্রদান করেন। ঐ ... সংকলন করিয়া ... তৎসম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, আয়ু... চিকিৎসার ... প্রথা ... সময় পর্য্যন্ত প্রধানতঃ মন্ত্রবলেই আরোগ্যের চেষ্টা হইত। তখন বোধ হয় ঔষধ ভক্ষণে লোকের অনিচ্ছা ছিল। এ সম্বন্ধে তিনি প্রবন্ধকারের মত সমর্থন করিতেছেন।

১১। ইহার পর শ্রীযুক্ত রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র ... বাহাদুর এম্, এ, বলিলেন, প্রবন্ধে কেবল আয়ুর্ব্বেদের ঐতিহাসিক তত্ত্বের সমালোচনা করা হইয়াছে। ঐ সমালোচনায় যথেষ্ট পরিশ্রম, চিন্তাশীলতা ও গবেষণার ... হঠাৎ সমালোচনা অসম্ভব। তবে সাধারণতঃ এই কথা বলা যাইতে পারে যে, প্রবন্ধে যে, আয়ুর্ব্বেদের উৎপত্তি কাল ৮০০০ ... বৎসর ধরা হইয়াছে, তাহা বোধ হয় যুক্তিবিচারসহ নহে। আর এক কথা—প্রবন্ধকার নিরবচ্ছিন্ন মন্ত্রকালের কথা বলিয়াছেন, তাহাও প্রকৃত বলিয়া বোধ হয় না। কোন কালেই যে রোগ নাশার্থ নিরবচ্ছিন্ন মন্ত্রের ব্যবহার ছিল, তাহা বলা যায় না। সকল যুগেই ঔষধ ও মন্ত্র উভয়েরই ব্যবহার দেখা যায়। তিনি প্রবন্ধকারকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ দিতেছেন।

১২। ... বলিলেন, ... তিনি কবিরাজ ... প্রশংসার পাত্র ... প্রতিবাদ ... সমালোচনার ...

১৩। শ্রীযুক্ত ... নাথ ... প্রাচ্য ... সময় ... কারণ, ... বিজ্ঞান ভ্রমশূন্য বলিয়া বোধ হয়।

১৪। সর্ব্বশেষে শ্রীযুক্ত ... বলিলেন আমার বিশেষ বক্তব্য নাই। প্রবন্ধ ভাল হইয়াছে। একটা কথা ... কালতত্ত্ব সংক্ষেপে ... ভাল হইত। প্রবন্ধে প্রলয় কালকে, ... ial period বলা হইয়াছে, প্রকৃত প্রলয় শব্দ তাহা বুঝায় না। প্রলয় অর্থ সর্ব্বধ্বংস — ... ial period এ সর্ব্ব ধ্বংস হয় না। আমরা সকল কালেই ইংরাজি মতের সহিত শাস্ত্রীয় মতের সামঞ্জস্য করিবার চেষ্টা ...

মন্ত্রযুগ কোনকালে ছিল, তাহা বোধ হয় না। সকল কালেই রোগনাশার্থ ঔষধের ব্যবহার ছিল। প্রমাণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, বনকার অনেক ঔষধ বন্য-দিগের নিকট হইতে গৃহীত হইয়াছে। তর্ক-বাগীশ মহাশয় যে ঋষিদিগকে অভ্রান্ত বলিয়াছেন, তাহা যুক্তিসহ নহে। জগতে কিছুই ভ্রমপ্রমাদশূন্য নহে। চরকাদিতে উক্ত চিকিৎসা-বিজ্ঞান অত্যুন্নত হইলেও উহা একেবারে ভ্রমপ্রমাদশূন্য নহে। স্বজাতির প্রতি অনুরাগ অপেক্ষা সত্যানুরাগ সর্ব্বাপেক্ষা বলবান হওয়া উচিত। উদাহরণ স্বরূপ বলিলেন যে, শুক্রতত্ত্ব সম্বন্ধে যাহা চরকে আছে, তাহা বিজ্ঞানসম্মত নহে। অনেক আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকের মতে বাত পিত্ত কফের মধ্যে বাত বাহ্য বায়ু হইতে অতিরিক্ত নহে ইত্যাদি। আমি প্রবন্ধকারকে ধন্যবাদ দিতেছি।

১৫। শ্রীযুক্ত সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীরাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী
সম্পাদক।

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ
সভাপতি।

১০ই ভাদ্র, সন ১৩১৮ সাল।